আমার-দেখা
রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

আবুল মনসুর আহমদ

আমার দেখা
রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, End of a Betrayal, বেশি দামে কেনা - কম দামে বেচা,
আত্মকথা, গালিভারের সফরনামা, জীবন ক্ষুধা, আয়না, আবেহায়াত,
আল-কোরআনের নসিহত, কাসাসুল আম্বিয়া, সত্য মিথ্যা,
বাংলাদেশের কালচার, ফুড কনফারেন্স, আসমানী পর্দা,
রাজনীতির বাল্য শিক্ষা প্রভৃতি বহু গ্রন্থের প্রণেতা
এবং
পাক-ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক
সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ

আবুল মনসুর আহমদ

খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা — ১১০০
ফোন ঃ ৭১১৭৭১০, ৭১১৭০৮৪

লেখক সম্পর্কে দু'টি কথা

মরহুম অবুল মনসুর আহমদ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইয়ের সপ্তম সংস্করণ প্রকাশনা উপলক্ষ্যে কয়েকটি কথা বলতে হয়।

আবুল মনসুর আহমদ-এর দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। সাহিত্যের সেই দিকটা তিনি বেছে নিয়েছিলেন যেটা ছিল সবচেয়ে কঠিন—ব্যঙ্গ-সাহিত্য। সাহিত্যের অন্যান্য আঙ্গিনায়ও স্বচ্ছন্দ্যে পদচারণা করেছেন তিনি। যে অঙ্গনেই তিনি কাজ করেছেন সেখানেই শীর্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ব্যঙ্গ-সাহিত্য বলতে গেলে উভয় বাংলায় তিনিই ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর প্রতিটি স্যাটায়ারই কালোত্তীর্ণ। সমাজপতি, ধর্মগুরু, রাষ্ট্রপতি, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী যেখানেই তিনি কোন দুর্নীতির সন্ধান পেয়েছেন সেখানেই করেছেন কশাঘাত। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রসাঘাত কশাঘাতে রূপ নিয়ে সমাজকে পরিশোধিত করত। এ আঘাত ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ আচার অনুষ্ঠানকেই আক্রমণ করেনি — যারা এসব প্রসঙ্গ নিয়ে মিথ্যার জাল বুনন করতেন তাদেরকেও তিনি নাস্তানাবুদ করেছেন। এসব রচনার পাঠকদের মনে হবে চরিত্রগুলো সবই চেনা। এদের কার্যকলাপও জানা।

'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' তাঁর দীর্ঘজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। যারা এদেশে রাজনীতি করতে আগ্রহী তাদের সকলের জন্যে এই বইটি অবশ্য পাঠ্য। এতে রয়েছে এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস। দেশীয় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে হলে এর সঙ্গে আরও পড়তে হবে তাঁর লেখা 'বাংলাদেশের কালচার', 'শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু', 'বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা' ইত্যাদি বইগুলো।

'রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' একজাতীয় স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী। রাজনীতির স্মৃতি এতে স্থান পেয়েছে। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ওকালতি ইত্যাদি কর্মজীবনের বহুমুখী স্মৃতি নিয়ে তিনি লিখেছেন 'আত্মকথা'। এসবের একত্রে মিশ্রণ ঘটেছে বিশালাকারের ইংরাজি গ্রন্থ 'End of a Betrayal'। ইংরেজি উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর দুটি অমর কীর্তি 'জীবন ক্ষুধা' ও 'আবেহায়াত'।

রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য দফতরসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরসমূহের

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্য সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, রসসাহিত্যে আজ পর্যন্ত উভয় বাংলার কেউ তাঁর প্রতিভার সমকক্ষ এমনকি কাছাকাছিও আসতে পারেননি। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কলকাতার খাদেম, সুলতান, দি মুসলমান, মোহাম্মদী প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও দৈনিক কৃষক, নবযুগ ও ইত্তেহাদের সম্পাদনাকালে তিনি অনেক ক্ষণজন্মা সাংবাদিক ও সম্পাদকের গুরু, প্রশিক্ষণদাতা ছিলেন। কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, রশীদ করিম, আহসান হাবিব, ফররুখ আহমদ, খোন্দকার আবদুল হামিদ, রোকনুজ্জামান খান, কে. জি. মুস্তাফা প্রমুখ ব্যক্তিগণ কোন না কোন সময়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

এসব অভিজ্ঞতার মধ্যে খ্যাতি, যশ, সম্মান যেমন ছিল তেমনি ছিল সামরিক শাসনকালের কারাযন্ত্রণা। সে কারণেই তিনি 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' লিখেছেন। 'শোনা' বা 'পড়া নয়'। বিশাল ও বিস্তৃত কর্মজীবনে তিনি মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, সৈয়দ নওশের আলী, খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মিঞা ইফতেখারউদ্দিন, মিঞা মাহমুদ আলী কাসুরী, জি. এম. সৈয়দ, মিঞা মমতাজ দৌলতানা, আবুল হাশিম প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রিটিশ ভারত ও পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর ছিল ব্যক্তিগত পরিচয় ও গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল 'তুমি তুমি' পর্যায়ের। জাতীয় কবি নজরুলের সঙ্গে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সগৌরবে লেখককে লীডার বলতেন এবং নিজেকে তাঁর শিষ্য বলতেন সেই কলকাতার কলেজ জীবন থেকেই।

তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট।

এদেশে রাজনীতি করেছেন অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য চর্চা করেছেন অনেক মহীরূহ। সাংবাদিকতা করেছেন অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এসবের সমারোহ ঘটাতে পেরেছেন কয়জন?

সে হিসেবে আবুল মনসুর আহমদ এক ও অদ্বিতীয়।

— মহবুব আনাম

বিনীত আরয

পাক-ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ মরহুম আবুল মনসুর আহমদ-এর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইখানির ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

লেখক আজ জীবিত নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্লভ সাহিত্যকর্ম জাতির সামনে চিরদিন তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

এখন যাঁহারা রাজনীতি করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে যাহারা রাজনীতির মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় নিজদিগকে উৎসর্গ করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাঁহাদের সকলের জন্য আবুল মনসুর আহমদ-এর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইখানি দিগ-দর্শন হিসাবে কাজ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আবুল মনসুর আহমদ-এর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' উদীয়মান প্রজন্মের সামনে একটি জীবন্ত ইতিহাস। মূলত ইহা শুধু একখানি গ্রন্থ নয় — ইহা একটি জাতির জীবন্ত ইতিহাস বা রাজনৈতিক দলিল (পলিটিক্যাল ডকুমেন্ট)। এই ডকুমেন্ট দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং মাস্টার্স শ্রেণীতে অবশ্য পাঠ্য থাকা উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য জাতির, যাঁহারা কর্ণধার তাঁহারা এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই।

সাধারণভাবে প্রকাশক হিসাবে নয় — দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে মরহুম আবুল মনসুর আহমদ-এর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' অর্থাৎ এই মূল্যবান পলিটিক্যাল ডকুমেন্ট আহরণের জন্য আমি আজ দেশের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাজনীতিবিদগণের নিকট জানাইতেছি বিনীত আরয।

ঢাকা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ — মহীউদ্দীন আহমদ

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

ছাত্রাবস্থা হইতেই সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী এবং স্যার সৈয়দ আহমদ-এর একজন অনুসারী হিসাবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তা এবং আদর্শে বিশ্বাসী হইয়া আমার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে।

মরহুম আবুল মনসুর আহমদ-এর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইখানিতে আমার আজীবনের লালিত স্বপ্ন এবং সেই চিন্তা ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে।

এই ঐতিহাসিক বইখানি ছাপাইবার জন্য অনেক প্রকাশক লালায়িত আছেন। আমি জানি তাহাদের সেই লালসা শুধু আর্থিক কারণে— রাজনৈতিক বা জাতীয় কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নহে। কিন্তু এই বইখানি ছাপাইবার পিছনে আমার লালসা — আদর্শের, অর্থের নহে।

বইখানির লেখক মরহুম আবুল মনসুর আহমদ আমার মনের গভীরের সেই চিন্তা ও আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই জীবদ্দশায় তিনি কখনই তাঁহার এই অমূল্য বইখানি প্রকাশনার সুযোগ হইতে আমাকে বঞ্চিত করেন নাই।

তাঁহার ইনতেকালের পর সময়ের বিবর্তনে সাময়িক পরিবর্তন হইলেও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র এককালের সংগ্রামী ছাত্রনেতা, প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক, দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক এবং দেশের সর্বাধিক প্রচারিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার কলামিস্ট ভ্রাতৃপ্রতিম জনাব মহবুব আনাম তাঁহার সুযোগ্য পিতার মনের খবর জানিতেন বলিয়াই এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' প্রকাশনার দায়িত্ব এখনও পর্যন্ত আমার উপরেই রাখিয়াছেন।

জনাব মহবুব আনাম ইচ্ছা করিলে বইখানি প্রকাশনার দায়িত্ব অন্যকে দিয়া প্রচুর অর্থ পাইতে পারেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই — তাঁহার এই উদারতা ও মহানুভবতার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ — প্রকাশক

ফিরিস্তি

পয়লা অধ্যায়

রাজনীতির ক খ

১. পরিবেশ

পথ চলিতে-চলিতে গলা ফাটাইয়া গান গাওয়া পাড়া-গাঁয়ে বহুৎ পুরান রেওয়াজ। খেতে-খামারে মাঠে-ময়দানে ভাটিয়ালি গাওয়ারই এটা বোধ হয় অনুকরণ। আমাদের ছেলেবেলায়ও এটা চালু ছিল। আমরা মকতব-পাঠশালার পড়ুয়ারাও গলা ফাটাইতাম পথে-ঘাটে। তবে আমরা নাজায়েয গান গাইয়া গলা ফাটাইতাম না। গানের বদলে আমরা গলা সাফ করিতাম ফারসী গযল গাইয়া, বয়েত যিকির করিয়া এবং পাঠ্য-পুস্তকের কবিতা ও পুঁথির পয়ার আবির্তি (আবৃত্তি) করিয়া। এ সবের মধ্যে যে পয়ারটি আমার কচি বুকে বিজলি ছুটাইত এবং আজো এই বুড়া হাড়ে যার রেশ বাজে তা এই ঃ

আল্লা যদি করে ভাই লাহোরে যাইব
হুথায় শিখের সাথে জেহাদ করিব।
জিতিলে হইব গাযী মরিলে শহিদ
জানের বদলে যিন্দা রহিবে তৌহিদ।

একটি চটি পুঁথির পয়ার এটি। তখনও বাংলা পুঁথিতে নযর চলে নাই। 'মহাভা-মহাভা-রতে-রক'র মত বানান করিয়া পড়িতে পারি মাত্র। কারণ তখন আমি আরবী-ফারসী পড়ার মাদ্রাসা নামক মকতবের তালবিলিম। চাচাজী মুন্‌শী ছমিরদ্দিন ফরাসী ছিলেন আমাদের উস্তাদ। শুধু পড়ার উস্তাদই ছিলেন না। খোশ এল্‌হানে কেরাত পড়া ও সুর করিয়া পুঁথি পড়ারও উস্তাদ ছিলেন তিনি। চাচাজী এবং হুসেন আলী ফরাযী ও উসমান আলী ফকির নামে আমার দুই মামুও পুঁথি পড়ায় খুব মশহুর ছিলেন। মিঠা দরায গলায় তাঁরা যে সব পুঁথি পড়িতেন তার অনেক মিছরাই আমার ছিল একদম মুখস্থ্। উপরের পয়ারটি তারই একটি। কেচ্ছা-কাহিনীর শাহনামা। আলেফ-লায়লা, কাছাছুল আম্বিয়া, শহিদে কারবালা, মসলা মসায়েলের ফেকায়ে-মোহাম্মদী ও নিয়ামতে-দুনিয়া ও আখেরাত ইত্যাদি পুঁথি কেতাবের মধ্যে দু'চার খানা ছোট-ছোট জেহাদী রেসালাও ছিল আমাদের বাড়িতে। পশ্চিম হইতে জেহাদী মৌলবীরা বছরে দুই-তিনবার আসিতেন আমাদের এলাকায়। থাকিতেন প্রধানতঃ আমাদের বাড়িতে। তাঁরাই বস্তানিতে

লুকাইয়া আনিতেন এ সব পুস্তক। আমাদের বাড়িতে থাকিয়া এঁরা মগরেবের পর ওয়াজ করিতেন। চাঁদা উঠাইতেন। লেখাপড়া-জানা লোকের কাছে এই সব কিতাব বিক্রয় করিতেন 'নাম মাত্র মূল্যে'।

এ সবের পিছনে একটু ইতিহাস আছে। আমার বড় দাদা অর্থাৎ দাদার জ্যেষ্ঠ সহোদর আশেক উল্লা 'গাযী সাহেব' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি শহিদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মোজাহিদ বাহিনীতে ভর্তি হন। কিভাবে এটা ঘটিয়াছিল, তার কোন লিখিত বিবরণী নাই। সবই মুখে মুখে। তবে জানা যায় দাদা 'জেহাদে' যান আঠার-বিশ বছরের যুবক। প্রায় ত্রিশ বছর পরে ফিরিয়া আসেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের বুড়া! প্রবাদ আছে তিনি বাংলা ভাষা এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে তিনি বাংলা রফত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের এবং এ অঞ্চলের আলেম-ফাযেল ও বুড়া মুরুব্বীদের মুখেই এসব শোনা কথা। আমার জন্মের প্রায় ত্রিশ বছর আগে গাযী সাহেব এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে এ অঞ্চলে বহু প্রবাদ প্রবচন ও কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তিনি বালাকুটের জেহাদে আহত হইয়া অন্যান্য মোজাহেদদের সাহায্যে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। বহুদিন বিভিন্ন স্থানে ঘুরা-ফেরা ও তবলিগ করিতে করিতে অবশেষে দেশে ফিরিয়া আসেন। পঞ্চাশ বছরের বুড়া জীবনের প্রথমে বিয়া-শাদি করিয়া সংসারী হন। এক মেয়ে ও এক ছেলে রাখিয়া প্রায় পয়ষট্টি বছর বয়সে মারা যান। বন্দুকের গুলিতে উরাতের হাড্ডি ভাংগিয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি একটু খুঁড়াইয়া চলিতেন। তাছাড়া শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি সুস্থ সবল ছিলেন এবং গ্রামের যুবকদের তলওয়ার লাঠি ও ছুরি চালনার অদ্ভুত-অদ্ভুত কৌশল শিক্ষা দিতেন। ঐ সব অদ্ভুত উস্তাদী খেলের মধ্যে কয়েকটির কথা আমাদের ছেলেবেলাতেও গাঁয়ের বুড়াদের মুখে-মুখে বর্ণিত হইত। অনেকে হাতে-কলমে শিখাইবার চেষ্টাও করিতেন। ঐসব কৌশলের একটি ছিল এইরূপ ঃ চারজন লোক চার ধামা বেগুন লইয়া চার কোণে আট-দশ হাত দূরে দূরে দাঁড়াইত। দাদাজী তলওয়ার হাতে দাঁড়াইতেন চারজনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে। তামেশগিররা চারদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইত। একজন মুখে বুড়া ও শাহাদত আংগুল ঢুকাইয়া শিস দিত। খেলা শুরু হইত। ধামাওয়ালা চারজন একসংগে দাদাজীর মাথা সই করিয়া ক্ষিপ্র হাতে বেগুন ছুরিতে থাকিত। দাদাজী চরকির মত চক্রাকারে তলওয়ার ঘুরাইতে থাকিতেন। একটা বেগুনও তাঁর গায় লাগিত না। ধামার বেগুন শেষ হইলে খেলা বন্ধ হইত। দেখা যাইত, সবগুলি বেগুনই দুই টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে।

দাদাজী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুলিশের নযরবন্দী ছিলেন। সপ্তাহে একবার থানায় হাযির দিতে হইত। 'তখনও ত্রিশাল থানা হয় নাই' কতোয়ালিতেই তিনি হাযিরা দিতে যাইতেন।

আশেক উল্লা সাহেব ছিলেন আছরদ্দিন ফরাযী সাহেবের তিন পুত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তখন মাদ্রাসার ছাত্র। এই সময় আমাদের গ্রাম ধানীখোলা ওহাবী আন্দোলনের ছোট খাট কেন্দ্র ছিল। ডব্লিও, ডব্লিও, হান্টার সাহেবের 'স্ট্যাটিসটিক্ স-অব-বেংগল' নামক বহু তথ্যপূর্ণ বিশাল গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠায় ধানীখোলাকে 'ময়মনশাহী' জিলার পঞ্চম বৃহৎ শহর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ পুস্তকের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে ঃ "জিলার সমস্ত সম্পদ ও প্রভাব ফরাযীদের হাতে কেন্দ্রিভূত। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড়-বড় জমিদারও আছেন। এঁরা সবাই ওহাবী আন্দোলনের সমর্থক। অবশ্য এদের অধিকাংশই গরীব জোতদার। এদেরই মধ্যে অল্প-কয়েকজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহী ধর্মান্ধদের শিবিরে যোগ দিয়াছিল।"

হান্টার সাহেব-বর্ণিত এই 'অল্প-কয়েকজন' আসলে কত জন, কোথাকার কে কে ছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গবেষকরাই তা ঠিক করিবেন। ইতিমধ্যে আমি সগৌরবে ঘোষণা করিতেছি যে আমার বড় দাদা গাযী আশেক উল্লা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। আমাদের পারিবারিক প্রবাদ হইতে জানা যায়, টাংগাইল (তৎকালীন আটিয়া) মহকুমার দুইজন এবং জামালপুর মহকুমার একজন মোজাহেদ-ভাই তাঁর সাথী ছিলেন। দাদাজী জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে দাদাজীর এন্তেকালের প্রায় ষাট বছর পরে আমি তাঁরই এইরূপ এক মোজাহেদ-ভাইর প্রপৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছি।

ঐ সব বিবরণ হইতে বুঝা যায় ধানীখোলা এই সময় ওহাবী আন্দোলনের ছোট খাট আখড়া ছিল এবং সেটা ছিল আমাদের বাড়িতেই। আমার আপন দাদাজী আরমাল্লা ফরাজী সাহেবের এবং আরও বহু মুরুব্বি আলেম-ফাযেলের মুখে শুনিয়াছি যে শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী সাহেবের সহকর্মীদের মধ্যে মওলানা এনায়েত আলী এবং তাঁর স্থানীয় খলিফা মওলানা চেরাগ আলী ও মওলানা মাহমুদ আলী এ অঞ্চলে তবলিগে আসিতেন এবং আমাদের বাড়িতেই অবস্থান করিতেন। এঁদের প্রভাবে আমার প্রপিতামহ আছরদ্দিন ফরাযী সাহেব তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং তৎকালে একমাত্র অধ্যয়ন-রত পুত্রকে মোজাহেদ বাহিনীতে

ভর্তি করান। তার ফলে প্রতিবেশীও আত্মীয়-স্বজনের চক্ষে আমার পরদাতার মর্যাদা ও সম্মান বাড়িয়া যায়। তাই অবশেষে পারিবারিক মর্যাদায় পরিণত হয়।

আমরা ছেলেবেলায় এই ঐতিহ্যেরই পরিবেশ দেখিয়াছি। জেহাদী মওলানাদের আনাগোনা তখনও বেশ আছে। বিশেষতঃ মগরেবের ও এশার নমাযের মাঝখানে মসজিদে এবং এশার নমাযের পর খানাপনা শেষে বৈঠকখানায়, যেসব আলোচনা হইত তার সবই জেহাদ শহিদ হুর বেহেশ্ত দুযখ ইত্যাদি সম্পর্কে। এই সব আলোচনার ফলে আলেম-ওলামাদের সহবতে আমার শিশু-মনে ঐ সব দুর্বোধ্য কথার শুধু কল্পিত ছবিই রূপ পাইত। ফলে আমার মধ্যে একটা জেহাদী মনোভাব ও ধর্মীয় গোঁড়ামি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

দাদাজী সম্বন্ধে কিম্বদন্তিগুলি আলেম-ফাযেল মোল্লা-মৌলবীদের মুখে বরঞ্চ কিছুটা সংযত হইয়াই বর্ণিত হইত। কিন্তু পাড়ার বুড়ারা চোখে দেখা বলিয়া যে সব আজগৈবি কাহিনী বয়ান করিতেন, তাতে আমার রোমাঞ্চ হইত এবং দাদাজীর মত 'বীর' হওয়ার খাহেশ দুর্দমনীয় হইয়া উঠিত। আমি জেহাদে যাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিতাম। কান্নাকাটি জুড়িয়া দিতাম। বেহশতে হুরেরা শরাবন-তহুরার পিয়ালা হাতে কাতারে কাতারে শহিদানের জন্য দাঁড়াইয়া আছে, অথচ আমি নাহক বিলম্ব করিতেছি, এটা আমার কাছে অসহ্য মনে হইত। অবশ্য ঐ বয়সে হুরের আবশ্যকতা, তাদের চাঁদের মত সুরতের প্রয়োজনীয়তা অথবা শরাবন তহুরার স্বাদের ভাল-মন্দ কিছুই আমি জানিতাম না। তবু এইটুকু বুঝিয়া ছিলাম যে ঐগুলি লোভনীয় বস্তু। তা যদি না হইবে, তবে হুরের সুরতের কথা শুনিয়া রোমাঞ্চ হয় কেন?

কিন্তু জেহাদের খাহেশ আমার মিটিল না। মুরুব্বিরা অত অল্প বয়সে বেহেশতে গিয়া হুরের কবলে পড়িতে আমাকে দিলেন না। তাঁরা বুঝাইলেন শাহাদতের পুরা ফযিলত ও হুরের সুরত উপভোগ করিতে হইলে আরও বয়স হওয়া এবং লেখা-পড়া করা দরকার।

অতএব মন দিয়া পড়াশোনা করিতে ও চড়া গলায় সুর করিয়া জেহাদী কেতাব পড়িতে লাগিলাম। কেতাবের সব কথা বুঝিতাম না। তাই উস্তাদ চাচাজীকে জিগ্‌গাস করিতাম ঃ চাচাজী, লাহোর কই? শিখ কি? চাচাজী বুঝাইতেন ঃ লাহোর হিন্দুস্থানেরও অনেক পশ্চিমে একটা মুল্লুক। আর শিখ? শিখেরা আল্লার দুশমন। হিন্দুদের মত দুশমন? না, হিন্দু-সে বদ্‌তর। চাচাজীর কাছে আগে শুনিয়াছিলাম, ফিরিংগীরাই আমাদের বড় দুশমন। কাজেই জিগাইতাম ঃ ফিরিংগীর চেয়েও? চাচাজী জবাব দিতেন ঃ ফিরিংগীরা তবু খোদা

মানে, ঈসা পয়গাম্বরের উম্মত তারা। শিখেরা তাও না। ধরিয়া নিলাম, শিখেরা নিশ্চয়ই হিন্দু। সে যুগে হানাফী-মোহাম্মদীতে খুব বাহাস মারামারি ও মাইল-মোকদ্দমা হইত। চাচাজী মোহাম্মদী পক্ষের বড় পাণ্ডা। তাঁর মতে হানাফীরা হিন্দু-সে বদ্‌তর। সেই হিন্দুরা আবার নাসারা-সে বদ্‌তর। তার প্রমাণ পাইতে বেশী দেরি হইল না।

২. আত্ম-মর্যাদা-বোধ

আমাদের পাঠশালাটা ছিল জমিদারের কাছারিরই একটি ঘর। কাছারিঘরের সামন দিয়াই যাতায়াতের রাস্তা। পাঠশালায় ঘড়ি থাকিবার কথা নয় কাছারিঘরের দেওয়াল-ঘড়িটাই পাঠশালার জন্য যথেষ্ট। কতটা বাজিল, জানিবার জন্য মাস্টার মশায় সময়-সময় আমাদেরে পাঠাইতেন। ঘড়ির কাঁটা চিনা সহজ কাজ নয় যে দুই-তিন জন ছাত্র এটা পারিত, তার মধ্যে আমি একজন।

কিছু দিনের মধ্যে একটা ব্যাপারে আমি মনে বিষম আঘাত পাইলাম। অপমান বোধ করিলাম। দেখিলাম, আমাদের বাড়ির ও গাঁয়ের মুরুব্বিরা নায়েব-আমলাদের সাথে দরবার করিবার সময় দাঁড়াইয়া থাকেন। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝি নাই। আরও কিছু দিন পরে জানিলাম, আমাদের মুরুব্বিদেরে নায়েব-আমলারা 'তুমি' বলেন। নায়েব-আমলারা আমাদেরেও 'তুই তুমি' বলিতেন। আমরা কিছু মনে করিতাম না। ভাবিতাম, আমাদের মুরুব্বিদের মতই ওরাও আদর করিয়াই এমন সম্বোধন করেন। পরে যখন দেখিলাম, আমাদের বুড়া মুরুব্বিদেরেও তাঁরা 'তুমি' বলেন, তখন খবর না লইয়া পারিলাম না। জানিলাম, আমাদের মুরুব্বিদেরে 'তুমি' বলা ও কাছারিতে বসিতে না দেওয়ার কারণ একটাই। নায়েব-আমলারা মুসলমানদেরে ঘৃণা-হেকারত করেন। ভদ্রলোক মনে করেন না। তবে ত সব হিন্দুরাই মুসলমানদেরে ঘৃণা করে! হাতে -নাতে এর প্রমাণও পাইলাম। পাশের গাঁয়ের এক গণক ঠাকুর প্রতি সপ্তাহেই আমাদের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে আসিত। কিছু বেশী চাউল দিলে সে আমাদের হাত গণনা করিত। আমাদেরে রাজা-বাদশা বানাইয়া দিত। এই গণক ঠাকুরকে দেখিলাম একদিন নায়েব মশায়ের সামনে চেয়ারে বসিয়া আলাপ করিতেছে। নায়েব মশাই তাকে 'আপনি' বলিতেছেন। এই খালি-পা খালি-গা ময়লা ধুতি-পরা গণক ঠাকুরকে নায়েব বাবু এত সম্মান করিতেছেন কেন? আমাদের বাড়িতে তাকে ত কোন দিন চেয়ারে বসিতে দেখি নাই। উত্তর পাইলাম, গণক ঠাকুর হিন্দু ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমাদের মোল্লা-মৌলবীদেরেও ত নায়েব-আমলারা 'আপনে' বলেন না, চেয়ারে

বসান না। আর কোনও সন্দেহ থাকিল না আমার মনে। রাগে মন গিরগির করিতে থাকিল।

কাছারির নায়েব-আমলাদের বড়শি বাওয়ায় সখ ছিল খুব। সারা গাঁয়েব মাতব্বর প্রজাদের বড় বড় পুকুরে মাছ ধরিয়া বেড়ান ছিল তাঁদের অভ্যাস। অধিকারও ছিল। গাঁয়ের মাতব্বরদেরও এই অভ্যাস ছিল। নিজেদের পুকুর ছাড়াও দল বাঁধিয়া অপরের পুকুরে বড়শি বাইতেন তাঁরাও। কিন্তু পুকুরওয়ালাকে আগে খবর দিয়াই তাঁরা তা করিতেন। কিন্তু নায়েব-আমলাদের জন্য পূর্ব-অনুমতি দরকার ছিল না। বিনা-খবরে তাঁরা যেদিন-যার-পুকুরে-ইচ্ছা যত-জন-খুশি বড়শি ফেলিতে পারিতেন।

একদিন আমাদের পুকুরেও এমনিভাবে তাঁরা বড়শি ফেলিয়াছেন। তাঁদের নির্বাচিত সুবিধা-জনক জায়গা বাদে আমি নিজেও পুকুরের এক কোণে বড়শি ফেলিয়াছি। নায়েব বাবুরা ঘটা করিয়া সুগন্ধি 'চারা' ফেলিয়ো হরেক রকমের আধার দিয়া বড়শি বাহিতেছেন। আর আমি বরাবরের মত চিড়ার আধার দিয়া বাহিতেছি। কিন্তু মাছে খাইতেছে আমার বড়শিতেই বেশী। নায়েব বাবুদের চারায় মাছ জমে খুব। কিন্তু মোটেই খায় না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নায়েব বাবু উচ্চসুরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন ঃ তোর আধার কিরে?

'তুই' শুনিয়াই আমার মাথায় আগুন লাগিল। অতিকষ্টে রাগ দমন করিয়া উত্তর দিলাম ঃ চিড়া।

নায়েব বাবু হাকিলেন ঃ আমারে একটু দিয়া যা ত।

সমান জোরে আমি হাকিলাম ঃ আমার সময় নাই, তোর দরকার থাকে নিয়া যা আইসা।

নায়েব বাবু বোধ হয় আমার কথা শুনিতে পান নাই। শুনিলেও বিশ্বাস করেন নাই। আবার হাকিলেন ঃ কি কইলে?

আমি তেমনি জোরেই আবার বলিলাম ঃ তুই যা কইলে আমিও তাই কইলাম।

নায়েব বাবু হাতের ছিপটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া পানির ধার হইতে পুকুরের পাড়ে উঠিয়া আসিলেন। ওঁদের বসিবার জন্য পুকুর পাড়ের লিচু গাছ তলায় চেয়ার-টেয়ার পাতাই ছিল সেদিকে যাইতে-যাইতে গলার জোরে 'ফরাযী! ও ফরাযী! বাড়ি আছ?' বলিয়া দাদাজীকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম, নায়েব বাবু ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। সংগী আমলারাও নিশ্চয়ই বুঝিলেন।

তাঁরাও যাঁর-তাঁর ছিপ তুলিয়া নায়েব বাবুর কাছে আসিলেন। আমি নিজের জায়গায় বসিয়া রহিলাম। কিন্তু নযর থাকিল ঐদিকে। দাদাজীর ডাক পড়িয়াছে কিনা! তামেশগির পাড়ার লোকেরাও নায়েব বাবুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। নায়েব বাবু আবার গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিলেন ঃ "ফরাজী, তোমারে কইয়া যাই, তোমার নাতি ছোকরা আমারে অপমান করছে। আমরা আর তোমার পুকুরে বড়শি বাইমু না। মুক্তাগাছায় আমি সব রিপোর্ট করুম।"

চিৎকার শুনিয়া আমার বাপ চাচা দাদা কেউ মসজিদ হইতে কেউ বাড়ির মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সকলেই প্রায় সমস্বরে বলিলেন ঃ কেটা আপনেরে অপমান করছে? কার এমন বুকের পাটা?

নায়েব বাবু সবিস্তারে বলিলেন, আমি তাঁকে 'তুই' বলিয়াছি। আমার মুরুব্বিদের এবং সমবেত প্রতিবেশীদের সকলেই যেন ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। দাদাজী হুংকার দিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন ঃ এদিকি আয়। পাজি, জলদি আয়।

আমি গিয়া দাদাজীর গা ঘেষিযা দাঁড়াইতে চাহিলাম। দাদাজী খাতির না করিয়া ধমক দিয়া বলিলেন ঃ ওরে শয়তান, তুই নায়েব বাবুরে 'তুই' কইছস?

আমি মুখে জবাব না দিয়া মাথা ঝুকাইয়া জানাইলাম ঃ সত্যই তা করিয়াছি।

দাদাজী গলা চড়াইয়া আমার গালে চড় মারিবার জন্য হাত উঠাইয়া, কিন্তু না মারিয়া, গর্জন করিলেন ঃ বেআদব বেত্তমিয, তুই নায়েব বাবুরে 'তুই' কইলি কোন্ আক্কেলে?

এবার আমি মুখ খুলিলাম। বলিলাম ঃ নায়েব বাবু আমারে তুই কইল কেন?

দাদাজী কিছুমাত্র ঠাণ্ডা না হইয়া বলিলেন ঃ বয়সে বড়, তোর মুরুব্বি। তানি তোরে 'তুই কইব বইলা তুইও তানরে তুই কইবি? এই বেত্তমিযি তুই শিখছস কই? আমরা তোরে তুই কই না? নায়েব বাবু তানার ছাওয়ালরে তুই কয় না?

আমি দাদাজীর দিকে মুখ তুলিয়া নায়েব বাবুকে এক নযর দেখিয়া লইয়া বলিলামঃ আপনে বাপজী কেউই ত বয়সে ছোট না, তবে আপনেগরে নায়েব বাবু 'তুমি' কয় কেন?

দাদাজী নিরুত্তর। কারও মুখে কথা নাই। নায়েব-আমলাদের মুখেও না। আমার বুকে সাহস আসিল। বিজয়ীর চিত্ত-চাঞ্চল্য অনুভব করিলাম। আড়-চোখে

লোকজনের মুখের ভাব দেখিবার চেষ্টা করিলাম। কারও কারও মুখে মুচকি হাসির আঁচ পাইলাম।

দাদাজী হাতজোড় করিয়া নায়েব বাবুর কাছে মাফ চাহিলেন। বড়শি বাইতে অনুরোধ করিলেন। আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন ঃ যা বেত্তমিয শয়তান, নায়েব বাবুর কাছে মাফ চা। বাপের বয়েসী মুরুব্বিরে তুই কইয়া গোনা করছ্স।

আমি বিন্দুমাত্র না ঘাবড়াইয়া বলিলাম ঃ আগে নায়েব বাবু মাফ চাউক, পরে আমি মাফ চামু।

মিটানো ব্যাপারটা আমি আবার তাজা করিতেছি দেখিয়াই বোধ হয় দাদাজী কুঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন ঃ নায়েব বাবু মাফ চাইব? কেন কার কাছে?

আমি নির্ভয়ে বলিলাম ঃ আপনে নায়েব বাবুর বাপের বয়েসী না? আপনেরে তুমি কইয়া তানি গোনা করছে না? তারই লাগি মাফ চাইব নায়েব বাবু আপনের কাছে।

দাদাজী আরও খানিক হৈ চৈ রাগারাগি করিলেন। আমারে ফসিহত করিলেন। উপস্থিত মুরুব্বিদেরও অনেকে আমাকে ধমক-সালাবত দেখাইলেন। আমাকে অটল নিরুত্তর দেখিয়া পাড়ার লোকসহ আমার মুরুব্বিরা নিজেরাই নায়েব বাবুও তাঁর সংগীদেরে জনে-জনে কাকুতি মিনতি জানাইলেন। কিন্তু নায়েব বাবু শুনিলেন না। সংগীদেরে লইয়া মুখে গজগজ ও পায়ে দম্ দম্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমাদের পরিবারের সকলের ও পাড়ার অনেকের দুশ্চিন্তায় কাল কাটিতে লাগিল। আমার মত পাগলকে লইয়া ফরাযী বাড়ির বিপদই হইয়াছে। এই মর্মে সকলের রায় হইয়া গেল। বেশ কিছুদিন আমিও দুশ্চিন্তায় কাটাইলাম। প্রায়ই শুনিতাম, আমাকে ধরিয়া কাছারিতে এমন কি মুক্তাগাছায়, নিয়া তক্তা-পিষা করা হইবে। দাদী ও মা কিছুদিন আমাকে ত পাঠশালায় যাইতেই দিলেন না। পাঠশালাটা ত কাছারিতেই।

৩. মনের নয়া খোরাক

ইতিমধ্যে দুইটি ঘটনা ঘটিল। এর একটিতে আমার শিশু মনে কল্পনার দিগন্ত প্রসারিত হইল। অপরটিতে আমার সাহস বাড়িল। যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল ১৯০৭ সাল। একদিন চাচাজী মুন্শী ছমিরদ্দিন ফরাযী সাহেব শহর হইতে

কিছুসংখ্যক চটি বই ও ইশতাহার আনিলেন। বাড়ির ও পাড়ার লোকদেরে তার কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইলেন। তাতে আমি বুঝিলাম শহরে বড় রকমের একটা দরবার হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় বড় লোক আসিয়া ঐ দরবারে ওয়ায করিয়াছেন। ঐ সব পুস্তিকায় তা ছাপার হরফে লেখা আছে। আমি সযত্নে ঐ সব পুস্তিকা জমা করিয়া রাখিয়া দিলাম। পাঠশালার পাঠ্য বই পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে ঐ সব পুস্তিকা পড়িবার চেষ্টা করিতাম। বুঝিতাম খুব কমই। কিন্তু যা বুঝিতাম কল্পনা করিতাম তার চেয়ে অনেক বেশী। বেশ কিছুদিন পরে বুঝিয়াছিলাম ওটা ছিল মুসলমান শিক্ষা সম্মিলনী। ওতে যাঁরা বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর বা এমনি কোনও বড় অফিসার মিঃ শার্প এবং হাইকোর্টের বিচারপতি জাস্টিস শরফুদ্দিনও ছিলেন। ওঁরা আসলে কারা, তাঁদের পদবিগুলির অর্থ কি, তা তখন বুঝি নাই। ফলে আমি ধরিয়া নিলাম মুসলমান নবাব বাদশাদের একটা দরবার হইয়া গেল। এই বিশ্বাসের উপর কল্পনার ঘোড়া দৌড়াইতে লাগিলাম।

এর কয়েক দিন পরেই দ্বিতীয় ঘটনা। বৈলর বাজারের পাট হাটায় একটা বিরাট সভা। আমাদের পাঠশালার শিক্ষক জনাব আলিমদ্দিন মাস্টার সাহেবের উৎসাহ ও নেতৃত্বে আমরা 'ভলান্টিয়ার' হইলাম। সভায় কয়েকদিন আগে হইতেই আমাদের ট্রেনিং ও সভামঞ্চ সাজানোর কাজ চলিল। 'ভলান্টিয়ার', ও 'খোশ্ আমদেদ' কথা দুইটি এই প্রথম শুনিলাম। মুখস্থ করিলাম। নিজের মনের মত অর্থও করিলাম। এইভাবে সভার আগে ও পরে কয়েকদিন ধরিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিলাম। সভার উচা মঞ্চে দাঁড়াইয়া যাঁরা বক্তৃতা করিলেন এবং যাঁরা কাতার করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁরা সকলে মিলিয়া আমার কল্পনার চোখের সামনে আলেফ-লায়লার হারুন রশিদ বাদশার দরবারের ছবি তুলিয়া ধরিলেন। ঠিক ঐ সময়েই আলেফ-লায়লা পড়িতেছিলাম কিনা। আর দেখিবই না বা কেন? কাল আলপাকার শেরওয়ানী ও খয়েরী রং-এর উচা রুমী টুপি ত দেখিলাম এই প্রথম। চৌগা-চাপকান-পাগড়ি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু এ জিনিস দেখিলাম এই পয়লা। বড় ভাল লাগিল। গর্বে বুক ফুলিয়া উঠিল। মুসলমানদের মধ্যেও তবে বড় লোক আছে।

ভলান্টিয়ারের ব্যস্ততার মধ্যে বক্তৃতা শুনিলাম কম। বুঝিলাম আরও কম। তবে করতালি ও মারহাবা-মারহাবা শুনিয়া বুঝিলাম বক্তৃতা খুব ভাল হইয়াছে। কিন্তু আমার মন ছিল সভায় যে সব বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা বিতরণ ও বিক্রয় হইয়াছিল তার দিকেই বেশী। বিলি-করা সবগুলি এবং খরিদ-করা কয়েক খানা

আমি জমা করিয়াছিলাম। তার মধ্যে মুনশী মেহেরুল্লা সিরাজগঞ্জীর 'হিতোপদেশ মালা' ও মওলানা খোন্দকার আহমদ আলী আকালুবীর 'শুভ জাগরণ' আমাকে খুবই উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। ফলে কয়েক দিন পরে আমি নিজেই এক সভা ডাকিলাম।

খুব চিন্তা-ভাবনা করিয়াই সভার জায়গা ঠিক করিলাম। কারো বাড়িতে ত দূরের কথা, বাড়ির আশে-পাশে হইলেও তার গর্দান যাইবে। কাজেই জায়গা হইল 'বাংগালিয়ার ভিটায়' নদীর ধারে। তার আশে-পাশে এক-আধ মাইলের মধ্যে কারও বাড়ি-ঘর নাই। হাটে-বাজারে ঢোল-শহরত করিলে জমিদারের কানে যাইবে। অতএব এক্সারসাইয বুকের পাতা ছিঁড়িয়া আশে-পাশের চার-পাঁচ মসজিদের 'মুছল্লী সাহেবানের খেদমতে' 'ধানীখোলার প্রজা সাধারণের পক্ষে' দাওয়াত-নামা পাঠাইলাম। কারও ঘড়ি নাই। তবু সভার সময় দিলাম বিকাল চারটা। পাঠশালা চারটায় ছুটি হয়। কাজেই সময়ের আন্দায আছে।

৪. প্রজা আন্দোলনের বীজ

উদ্যোক্তারা আগেই সভাস্থলে গেলাম। লোক কেউ আসে নাই। আমরা ব্যাটবল-তিরিকাট (ক্রিকেট) লইয়া রোজ মাঠে যাইতাম। রাখালদেরে লইয়া খেলিতাম। কাজেই আমাদের চার-পাঁচ জনকে একত্রে দেখিয়া রাখালরা জমা হইল। কিন্তু ব্যাটবল না দেখিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমরা বলিলাম সভা হইবে। সভার তামাশা দেখিতে তারা থাকিয়া গেল। এক দুই তিন চার করিয়া প্রায় শ খানেক লাক সমবেত হইল। কিন্তু মাতব্বররা একজনও আসেন নাই। কাকে সভাপতি করিয়া সভার কাজ শুরু করিব তাই ভাবিতেছিলাম। এমন সময় পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক পিছনে লইয়া সভায় আসিলেন আমাদের গ্রামের শ্রেষ্ঠ মাতব্বর যহিরুদ্দিন তরফদার সাহেব। ইনি আবুল কালাম শামসুদ্দিনের চাচা। পাঁচ গ্রামের মাতব্বর। জ্ঞানী পণ্ডিত ও সুবক্তা। তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করিয়া আমি প্রস্তাব করিলাম। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। সভায় বসার কোনও চেয়ার-টেবিল ছিল না। কাজেই আসন গ্রহণ করিলেন মানে এক জায়গা হইতে উঠিয়া আরেক জায়গায় বসিলেন। পতিত জমি। দূর্বা ঘাস। কাপড় ময়লা হওয়ার কোনও ভয় ছিল না। কাজেই সবাই বসা। জীবনের প্রথম জন-সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিলাম। বয়স আমার তখন ন বছর। পাঠশালার বার্ষিক সভায় মুখস্থ কবিতা আবৃতি ও লিখিত রচনা পাঠ ছাড়া অন্য অভিজ্ঞতা নাই। কি বলিয়াছিলাম মনে নাই। তবে বক্তৃতা শেষ করিলে স্বয়ং সভাপতি সাহেব 'মারহাবা মারহাবা' বলিয়া করতালি দিয়াছিলেন। তাঁর দেখাদেখি সভার সকলেই করতালি দিয়াছিল। আমার পরেই সভাপতি

সাহেব দাঁড়াইলেন। কারণ 'আর কেউ কিছু বলতে চান?' সভাপতি সাহেবের এই আহ্বানে কেউ সাড়া দিলেন না। সভাপতি সাহেব লম্বা বক্তৃতা করিলেন। মগরেবের ওয়াক্ত পর্যন্ত সভা চলিল। পেন্সিল ও একসারসাইয বুক পকেটে নিয়াছিলাম। সভাপতি সাহেবের ডিক্টেশন মত কয়েকটি প্রস্তাব লিখিলাম। তাতে কাছারিতে প্রজাদের শ্রেণীমত বসিবার আসন দাবি এবং শরার বরখেলাফ কালী পূজার মাথট আদায় মওকুফ রাখিবার অনুরোধও করা হইল। সর্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাস হইল। কাগযটি সভাপতি সাহেব নিজের পকেটে নিলেন। বলিলেন আরও কয়েকজন মাতবর লইয়া তিনি জমিদারের সাথে দরবার করিবেন। সভাপতি সাহেবের বক্তৃতায় জমিদারদের অত্যাচার-জুলুমের অনেক কাহিনী শুনিলাম। অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। সে সব কথা ভাবিতে ভাবিতে বাপজী চাচাজী ও অন্যান্য মাতব্বরের সাথে বাড়ি ফিরিলাম।

অল্পদিন পরেই আমাদের অন্যতম জমিদার মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নারায়ণ আচার্য চৌধুরী বার্ষিক সফরে আসিলেন। তাঁর কাছে আমার বিরুদ্ধে এবং ঐ সভা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত রিপোর্ট দাখিল করা হইল। যতীন বাবু আমাকে কাছারিতে তলব করিলেন। পিয়াদা আমাকে নিতে আসিলে আমি তাকে বলিলাম ঃ কর্তার কাছে আমার কোনও কাজ নাই। আমার কাছে কর্তার কাজ থাকিলে তিনিই আসিতে পারেন। তৎকালে জমিদারদেরে কর্তা বলা হইত। সম্বোধনেও বিবরণেও। পিয়াদা আমাদের গাঁয়ের লোক। আমার হিতৈষী। আমার গর্দান যাইবে ভয়ে একথা খোদ কর্তাকে না বলিয়া নায়েব আমলাকে রিপোর্ট করিল। আমার বিরুদ্ধে ওদের আখেয ছিল। প্রায় বছর খানেক আগে নায়েব বাবুকে তাঁদের সামনে আমি তুই এর বদলে তুই বলিয়াছিলাম। নায়েব-আমলারা সে কথা ভুলেন নাই। কর্তাকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইবার আশায় পিয়াদার রিপোর্টটায় রং চড়াইয়া তুই এর পুরান ঘটনাকে সেদিনকার ঘটনারূপে তাঁর কাছে পেশ করেন।

কর্তা ছিলেন আদত রসিক সুজন। তিনি আমার বয়সের, কালচেহারার ও পাঠশালায় পড়ার কথা শুনিলেন। সব শুনিয়া প্রকাশ্য দরবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন ঃ "ছোকরা গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের কংশ বংশ ধ্বংস করতেই ওর জন্ম। আমার ডাকে সে ত আসবই না। হয়ত আমারই ওর কাছে যাইতে হৈব।"

সমবেত প্রজারা ও আমার মুরুব্বিরা এটাকে কর্তার রসিকতা বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। কর্তার চাপা রাগ মনে করিলেন। আমার নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তাযুক্ত

হইলেন। সভার সভাপতি তরফদার সাহেব কিন্তু আদত কথা ভুলিলেন না। আমার প্রতি কর্তার মনোভাব নরম করিবার উদ্দেশ্যে মোলায়েম কথায় আমাদের দাবি-দাওয়া পেশ করিলেন। তাঁর কুশলী মিষ্টি কথায় কর্তার মন সত্যই নরম হইল। তিনি সভায় গৃহীত প্রস্তাবের কয়েকটি মনযুর করিলেন। বাকীগুলি অন্যান্য জমিদারদের সাথে সলাপরামর্শ করিয়া পরে বিবেচনা করিবেন বলিলেন! যে কয়টি দাবি তখনই মনযুর হয় তার মধ্যে কাছারিতে প্রজাদের বসিবার ব্যবস্থাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ প্রজাদের বসিবার জন্য চট ও মাতব্বর প্রজাদের জন্য লম্বা বেঞ্চির ব্যবস্থা হয়। তবে বেঞ্চি উচ্চতায় সাধারণ বেঞ্চের অর্ধেক হয়। সাধারণ বেঞ্চ উচ্চতায় চৌকির সমান। চৌকির সমান উচা বেঞ্চিতে প্রজারা বসিলে আমলা-প্রজায় কোনও ফারাক থাকে না বলিয়া এই ব্যবস্থা হয়। আমাদের মুরুব্বিরা এই ব্যবস্থাই মানিয়া লন। তবে সাধারণ প্রজাদের জন্য চটের বদলে পার্টির ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হয়। তখনই এ দাবি মানিয়া নেওয়া হইল না বটে কিন্তু কয়েক বছর পরে হইয়াছিল। এইভাবে ধানীখোলায় প্রথম প্রজা আন্দোলন সফল হয়।

৫. প্রজা আন্দোলনের চারা

দুই বছর পরের কথা। তখন আমি পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া দরিরামপুর মাইনর স্কুলে গিয়াছি। গ্রাম্য সম্পর্কে আমার চাচা মোহাম্মদ সাঈদ আলী সাহেব (পরে উকিল) এই সময় শহরের স্কুলে উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন। তাঁর উৎসাহে আমি আবার একটা প্রজা সভা ডাকি। এই সভার বিবরণী তৎকালে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' ও 'মিহির ও সুধাকরে' ছাপা হয়। ঐ সভায় সাঈদ আলী সাহেবের রচিত একটি প্রস্তাব খুবই জনপ্রিয় হয়। তাতে দাবি করা হয় যে কাছারির নায়েব-আমলা সবই স্থানীয় লোক হইতে নিয়োগ করিতে হইবে। যুক্তি দেওয়া হয়, এতে স্থানীয় শিক্ষিত লোকের চাকরির সংস্থান হইবে। জমিদারের খাজনা সহজে বেশী পরিমাণ আদায় হইবে। কাছারিতে বসার সমস্যাও সহজেই সমাধান হইবে। এটাকে ক্ষুদ্র আকারে 'ইণ্ডিয়ানিয়েশন-অব-সার্ভিসেস' দাবির প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। চাকুরির ব্যাপারে উচ্চস্তরে সরকারী পর্যায়ে যা হইয়া থাকে এখানেও তাই হইল। ইংরাজ সাম্রাজ্য দিল তবু চাকুরি দিল না। জমিদারও তেমনি জমিদারি দিল তবু চাকুরি দিল না। চাকুরি-জীবীরা বরাবর এ-ই করিয়াছে। ভবিষ্যতেও করিবে। 'শির দিব তবু নাহি দিব আমামা' সবারই জেহাদী যিকির চিরকালের।

আরও তিন বছর পরে। ১৯১৪ সাল। ময়মনসিংহ শহরে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। এই সময় জামালপুর মহকুমার কামারিয়ার চরে একটা বড় রকমের প্রজাসম্মিলনী হয়। সম্মিলনীর আগের বিজ্ঞাপনাদি ও পরে 'মোহাম্মদ' ও 'মোসলেম হিতৈষী' নামক সাপ্তাহিক দুইটিতে সম্মিলনীর বিবরণী পড়িয়া আমি আনন্দে উৎফুল্ল হই। এই বিবরণী হইতেই আমি প্রথম মৌঃ এ. কে. ফযলুল হক, মৌলবী আবুল কাসেম, খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বগুড়ার মৌঃ রজিবুদ্দিন তরফদার, ময়মনসিংহের মওলানা খোন্দকার আহমদ আলী আকালুবী (পরে আমার শ্বশুর), মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রভৃতি নেতা ও আলেমের নাম জানিতে পারি। এঁরা নিশ্চয়ই বড়-বড় পণ্ডিত ও বড় লোক। সকলেই গরিব প্রজার পক্ষে আছেন জানিয়া আমার অন্তরে উৎসাহ ও সাহসের বিজলি চমকিয়া যায়। এই সব বিজ্ঞাপন ও কার্যবিবরণী আমি সযত্নে বাক্সে কাপড়-চোপড়ের নিচে লুকাইয়া রাখি। এতে বিভিন্ন প্রস্তাব ছাড়াও বক্তাদের বক্তৃতার সারমর্ম দেওয়া ছিল। মাঝে মাঝে এইসব কাগয বাহির করিয়া মনোযোগ দিয়া পড়িতাম। তাতে প্রজাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে ও জমিদারী জুলুম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বাড়ে। খাজনা মাথট আবওয়াব গাছ কাটা পুকুর খুদা জমি বিকি-কিনি ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেই ঐ সম্মিলনীতে প্রস্তাব পাস হইয়াছিল। তার সব কথা আমি তখন বুঝি নাই সত্য, কিন্তু এটা বুঝিয়াছিলাম যে আমি নিজ গ্রামে প্রজাদের বসিবার আসন ও আমলাগিরি চাকুরির যে দাবি ও তুই-তুংকারের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, প্রজাদের দাবি তার চেয়ে অনেক বেশী হওয়া উচিৎ।

নিয়মতান্ত্রিক প্রজা-আন্দোলনের ইতিহাসে কামারিয়ার চর প্রজা সম্মিলনী এবং তার উদ্যোক্তা জনাব খোশ মোহাম্মদ সরকার (পরে চৌধুরী) সাহেবের নাম সোনার হরফে লেখা থাকার বস্তু। এই সম্মিলন চোখে না দেখিয়া শুধু রিপোর্ট পড়িয়া প্রজা-আন্দোলনের এলাকা সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। এর পর আমি বঙ্কিম চন্দ্রের 'বাংলার কৃষক' রমেশ দত্তের 'বাংলার প্রজা' প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথা' ইত্যাদি প্রবন্ধগ্রন্থ এবং লালবিহারীদের ইংরাজি নভেল 'বেংগল পেযেন্ট লাইফ' পড়ি। শেষোক্ত বইটি আমাদের স্কুলের পাঠ্য ছিল।

স্কুলের ছুটি-ছাটা উপলক্ষে অতঃপর গ্রামের বাড়িতে গিয়া এই সব নূতন-নূতন কথা বলিতে শুরু করি। আমাদের নেতা জহিরুদ্দিন তরফদার সাহেব ছাড়াও বৈলর গ্রামের পণ্ডিত ইমান উল্লাহ সাহিত্য-রত্ন সাহেব আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন।

৬. সাম্প্রদায়িক চেতনা

আরেকটা ব্যাপার আমাকে খুবই পীড়া দিত। জমিদাররা হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে সব প্রজার কাছ থনেই কালীপূজার মাথট আদায় করিতেন। এটা খাজনার সাথে আদায় হইত। খাজনার মতই বাধ্যতামূলক ছিল। না দিলে খাজনা নেওয়া হইত না। ফরাযী পরিবারের ছেলে হিসাবে আমি গোঁড়া মুসলমান ছিলাম। মূর্তি পূজার চাঁদা দেওয়া শেরেকী গোনা। এটা মুরুব্বিদের কাছেই-শেখা মসলা। কিন্তু মুরুব্বিরা নিজেরাই সেই শেরেকী গোনা করেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে দাদাজী, বাপজী ও চাচাজী তাঁরা বলিতেন ঃ না দিয়া উপায় নাই। এটা রাজার জুলুম। রাজার জুলুম নীরবে সহ্য করা এবং গোপনে আল্লার কাছে মাফ চাওয়া ছাড়া চারা নাই। এ ব্যাপারে মুরুব্বিরা হাদিস-কোরআনের বরাত দিতেন।

কিন্তু আমার মন মানিত না। শিশু-সুলভ বেপরোয়া সাহস দেখাইয়া হাম্বি-তাম্বি করিতাম। মুরুব্বিরা 'চুপচুপ' করিয়া ডাইনে-বাঁয়ে নযর ফিরাইতেন। জমিদারের লোকেরা শুনিয়া ফেলিল না ত!

কালীপূজা উপলক্ষ্যে জমিদার কাছারিতে বিপুল ধূমধাম হইত। দেশ-বিখ্যাত যাত্রাপার্টিরা সাতদিন ধরিয়া যাত্রাগান শুনাইয়া দেশ মাথায় করিয়া রাখিত। হাজার হাজার ছেলে-বুড়া সারা রাত জাগিয়া সে গান-বাজনা-অভিনয় দেখিত। সারাদিন মাঠে-ময়দানে খেতে-খামারে এই সব নাটকের ভীম-অর্জনের বাখানি হইত। দর্শক শ্রোতারা প্রায় সবাই মুসলমান। কারণ এ অঞ্চলটাই মুসলমান প্রধান। আমাদের পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন সবাই সে তামাশায় শামিল হইতেন। শুধু আমাদের বাড়ির কেউ আসিতেন না। আমার শিশুমন ঐ সব তামাশা দেখিতে উস্‌খুস্‌ করিত নিশ্চয়। পাঠশালার বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া চলিয়াও যাইতাম তার কোন-কোনটায়। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতাম না। বয়স্ক কারও সংগে দেখা হইলেই তাঁরা বলিয়া উঠিতেন ঃ 'আরে, তুমি এখানে? তুমি যে ফরাযী বাড়ির লোক! তোমার এসব দেখতে নাই।' শেষ পর্যন্ত আমি ঐ সব তামাশায় যাওয়া বন্ধ করিলাম। কিন্তু বোধহয় কারো নিষেধে ততটা নয় যতটা শিশু-মনের অপমান-বোধে। কারণ সে সব যাত্রা-থিয়েটারের মজলিসেও সেই কাছারির ব্যবস্থা। 'ভদ্রলোকদের' বসিবার ব্যবস্থা। মুসলমানদের ব্যবস্থা দাঁড়াইয়া দেখার।

দুসরা অধ্যায়

খিলাফত ও অসহযোগ

১. রাজনীতির পট-ভূমি

আমাদের বাদশাহি ফিরিংগিরা কাড়িয়া নিয়াছে, এই খবরে আমার মনে ফিরিংগি বিদ্বেষ জন্মে বোধহয় আমার জ্ঞানোদয়ের দিন হইতেই। কিন্তু চাচাজী ও দু-চার জন জেহাদী মৌলবীর প্রভাবে কৈশোরে ফিরিংগি বিদ্বেষের জায়গা দখল করে শিখ-বিদ্বেষ। এই শিখ-বিদ্বেষ ইংরাজের প্রতি আমার মন বেশ খানিকটা নরম করিয়া ফেলে।

এই নরম ভাব কয়েকদিন পরেই আবার গরম হইয়া ইংরাজ-বিদ্বেষ দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আমি তখন দরিরামপুর মাইনর স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। এই সময় ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ স্টেপ্‌ল্‌টন আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন। কয়েকদিন আগে হইতেই আমরা স্কুল ঘর ও আংগিনা সাজানোর ব্যাপারে পরম উৎসাহে খাটিতেছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে সাধ্যমত পরিষ্কার জামা কাপড় পরিয়া পরম আগ্রহে এই ইংরাজ রাজপুরুষকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একজন শিক্ষকের সেনাপতিত্বে কুইক মার্চ করিয়া খানিকদূর আগবাড়িয়া গেলাম সাহেবকে ইস্তেক্‌বাল করিতে। জীবনের প্রথম এই 'সাহেব দেখিতেছি। নূতন দেখার সম্ভাবনার পুলকে গরম রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

শেষ পর্যন্ত সাহেব আসিলেন। হাঁ সাহেব বটে। উঁচায় ছয় ফুটের বেশী। লাল টকটকা মুখের চেহারা। আমার খুব পছন্দ হইল। মাস্টার সেনাপতির নির্দেশে সোৎসাহে সেলিউট করিলাম। সাহেবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া মমতায় পরিণত হইল সাহেবের সংগীটিকে দেখিয়া। সাহেবের সংগীটি একজন আলেম। তাঁর মাথায় পাগড়ি, মুখে চাপ দাড়ি, পরনে সাদা আচকান ও সাদা চুড়িদার পায়জামা। সাহেব যখন সাথে আলেম নিয়া চলেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি মনে-মনে মুসলমান। আমি ভক্তিতে গদগদ হইলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ভুল ভাংগিল। আমাদের স্কুলের সেকেন্ড পন্ডিত জনাব খিদিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের নিকট শুনিলাম, লোকটা কোনও আলেম-টালেম নয়, সাহেবের চাপরাশী। শিক্ষক না হইয়া অন্য কেউ একথা বলিলে বিশ্বাস করিতাম না। তাছাড়া পন্ডিত সাহেব আমাকে বুঝাইবার জন্য লোকটার কোমরের পেটি ও বুকের তক্‌মা দেখাইলেন।

আমার মাথায় আগুন চড়িল। স্টেপল্টন সাহেবের উপর ব্যক্তিগতভাবে এবং ইংরাজদের উপর জাতিগতভাবে আমি চটিয়া গেলাম। অদেখা শিখ-বিদ্বেষের যে ছাই-এ আমার ফিরিংগি-বিদ্বেষের আগুন চাপা ছিল, চোখের-দেখা অভিজ্ঞতার তুফানে সে ছাই উড়িয়া গেল। আমার ইংরেজী-বিদ্বেষ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শালা ইংরাজরা আমাদের বাদশাহি নিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। আমাদের আরও অপমান করিবার মতলবে আমাদের পোশাককে তাদের চাপরাশীর পোশাক বানাইয়াছে! এর প্রতিশোধ নিতেই হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক করিয়া ফেলিলাম, বড় বিদ্বান হইয়া ইনস্পেক্টর অফিসার হইব। নিজে আচকান-পায়জামা-পাগড়ি পরিব এবং নিজের চাপশারীকে কোট-প্যান্ট-হ্যাট্ পরাইব।

এর পর-পরই আরেকটা ঘটনা আমার ইংরাজ-বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাইল। আমাদের স্কুলের খুব কাছেই ত্রিশাল বাজারে এক সভা। শহর হইতে আসেন বড় বড় বক্তা। আমাদের শিক্ষক খিদিরুদ্দিন খাঁ পন্ডিত সাহেবের নেতৃত্বে আমরা ভলান্টিয়ার। বক্তাদের মুখে শুনিলাম, ইটালি নামক এক দেশের রাজা আমাদের খলিফা তুরস্কের সুলতানের ত্রিপলি নামক এক রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। কথাটা বিশ্বাস হইল না। কারণ ইটালির রাজার রাজধানী শুনিলাম রোম। রোমের বাদশাহ্ তুরস্কের সোলতানের রাজ্য দখল করিতে চান? এটা কেমন করিয়া সম্ভব? দুই জন ত একই ব্যক্তি! মাথায় বিষম গন্ডগোল বাধিল। সেটা না থামিতেই আরেকটা। সভায় যখন রুমী টুটি পোড়াইবার আয়োজন হইল, তখন টুপির বদলে আমার মাথার আগুন ধরিয়া গেল। প্রথম কারণ বহুদিন ধরিয়া আমি একটি লাল রুমী টুপি ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এটি আমার টুপি না, কলিজার টুকরা। দ্বিতীয় কারণ আমার বিশ্বাস, এই টুপি খলিফার দেশেই তৈয়ার হয়। বক্তাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত ও উন্মত্ত ছাত্র-বন্ধুরা যখন রুমী টুপি পোড়ইতে লাগিল এবং তাদের চাপে শেষ পর্যন্ত আমি যখন আমার বহুদিনের সাথী সেই রুমী টুপিটাকে আগুনে নিক্ষেপ করিলাম, তখন আমার মনে হইল নমরুদ বাদশাহ যেন ইব্রাহিম নবিকে আগুনের কুন্ডে ফেলিয়া দিলেন। ইব্রাহিম নবির কথা মনে পড়িতেই আমার অবস্থাও তাঁর মত হইল। ইব্রাহিম নবি যেমন নিজের জানের টুকরা পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করিয়াছিলেন, আমিও যেন আজ আমার কলিজার টুকরা লাল রুমী টুপিটাকে তেমনি নিজ হাতে কোরবানি করিলাম। বেশ-কম শুধু এইঃ জিবরাইল ফেরেশতরা বেহেশতী দুম্বা বদলা দিয়া ইসমাইলকে বাঁচাইলেন, কিন্তু

আমার রুমী টুপিটার বদলা দিয়া কেউ এটা বাঁচাইল না। দুঃখে ক্ষোভে আমার চোখে পানি আসিল। আমার কলিজার টুক্‌রা লাল রুমী টুপিটা পোড়াইবার জন্য দায়ী কে? এই ইটালি। ইটালি কে? খৃষ্টানত? নিশ্চয়ই ইংরাজ। ইংরাজের প্রতি, বিশেষ করিয়া তাদের পোশাকের প্রতি, আমার রাগ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

২. পরস্পর–বিরোধী চিন্তা

আমার ইংরাজ–বিদ্বেষটায় কোন স্পষ্টতা ছিল না। সে জন্য এটা বড় ঘন–ঘন উঠা–নামা করিত। অনেক সময় আমি ইংরাজের সমর্থক হইয়া উঠিতাম। উদাহরণ 'স্বদেশী' ব্যাপারটা। পাঠশালায় ঢুকিয়াই (১৯০৬) 'স্বদেশী' কথাটা শুনি। মানে বুঝিয়াছিলাম কাঁচা রং পাড়ের কাপড় পরা। পাঠশালার মাস্টার মশায় ছিলেন হিন্দু। তিনি আমাদের 'স্বদেশী' কাপড় পরিতে বলিতেন, কাপড়ের কাঁচা রং উঠিয়া যায় বলিয়া দুই–একবারের বেশি তা পরি নাই। 'স্বদেশী' অর্থ আর কিছু, তিনি তা বলেন নাই। আগের বছর ১৯০৫ সালে বড় লাট লর্ড কার্যন ময়মনসিংহে আসেন। মুরুব্বিদের সাথে লাট–দর্শনে যাই। রাস্তার গাছে–গাছে বাড়ি–ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ইংরাজীতে লেখা দেখি : 'ডিভাইড আস্ নট'। মুরুব্বিদেরে জিগ্‌গাসা করিয়া জানিতে পারি ওসব 'স্বদেশী' হিন্দুদের কান্ড। মুসলমানদের খেলাফে দুশমনি। এই দুশমনিটা কি, ঘরে ফিরিয়া পরে চাচাজীর কাছে পুছ করিয়াছিলাম। তিনি ব্যাপারটা আমাদের বুঝাইবার জন্য যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তার কিছুই তৎকালে বুঝি নাই। তবে সে সব কথার মধ্যে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ঢাকা রাজধানী, বাংলা ও আসাম এই কয়টা শব্দই শুধু আমার মনে ছিল। 'স্বদেশীরা' তবে মুসলমানদের দুশমন? ভাবনায় পড়িলাম। দরিরামপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হওয়ার (১৯০৯) অল্পদিন পরেই দেখিলাম, একজন ভাল মাস্টার হঠাৎ বিদায় হইলেন। খোঁজ লইয়া জানিলাম, লোকটা তলে–তলে স্বদেশী বলিয়া তাঁকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর সন্দেহ রইল না যে 'স্বদেশী' হওয়াটা দোষের।

এর পর–পরই ঘটে স্টেপলটন সাহেবের ঘটনাটা। ইংরাজের উপর ঐ রাগের সময়েই আমি জানিতে পারি 'স্বদেশীরা' ইংরাজের দুশমন। 'স্বদেশীর' প্রতি আমার টান হইল। তারপর যখন ইটালি, মানে ইংরাজ, আমাদের খালিফার দেশ ত্রিপলি হামলা করিল, তখন ইংরাজ–বিদ্বেষ বাড়ার সাথে আমার স্বদেশী–প্রীতিও বাড়িল। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লী দরবার উপলক্ষে স্কুলের সবচেয়ে ভাল ছাত্র হিসাবে আমাকে অনেকগুলি ইংরাজী ও খানকতক বাংলা বই প্রাইয দেওয়া

হয়। সে কালের তুলনায় এক স্তূপ বই। বইগুলি দুই বগলে লইয়া যখন বাড়ি ফিরিতেছিলাম তখন আতিকুল্লা নামে আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ মাদ্রাসার ছাত্রবন্ধু আমার প্রতি চোখ রাংগাইয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'আজ মুসলমানের মাতমেরদিন। ফিরিংগিরা আমাদের গলা কাটিয়াছে। তুমি কি না সেই ফিরিংগির–দেওয়া প্রাইয লইয়া হাসি–মুখে বাড়ি ফিরিতেছ?'

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, আমার অতগুলি বই দেখিয়া বন্ধুর ঈর্ষা হইয়াছে। পরে যখন তিনি বুঝাইয়া দিলেন, ইংরাজ 'স্বদেশী'দের কোথায় বংগ–ভংগ বাতিল করিয়াছে এবং তাতে মুসলমানদের সর্বনাশ হইয়াছে, তখন আমার ভুল ভাংগিল। বন্ধুবর আতিকুল্লা ছিলেন আমাদের সকলের বিবেচনায় একটি খবরের গেযেট, জ্ঞানের খনি। তিনি আমাকে পূর্ব–বাংলা ও আসাম প্রদেশ, রাজধানী ঢাকা ও মুসলমানদের কর্তৃত্বের কথা সবিস্তারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। স্বদেশীরা কি কারণে এই নয়া প্রদেশ বাতিল করিবার আন্দোলন করিয়াছে, সে আন্দোলন সফল হওয়ায় আজ মুসলমানদের কি সর্বনাশ হইল, চোখে আংগুল দিয়া তা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। তিন বছর আগে চাচাজী যা–যা বলিয়াছিলেন, সে সব কথাও এখন আমার মনে পড়িল। তাঁরও কোনও–কোনও কথা আজ বুঝিতে পারিলাম। আতিক ভাই এইভাবে সব বুঝাইয়া দেওয়ায় ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ ত বাড়িলই, 'স্বদেশী'র প্রতি আরও বেশি বাড়িল। আচকান পাগড়ির প্রতি স্টেপল্‌টন সাহেবের অপমান, ইটালি কর্তৃক আমার লাল রুমী টুপির সর্বনাশ, সব কথা এক সংগে মনে পড়িয়া গেল। ইংরাজী পোশাকের উপর আমার রাগ দশগুণ বাড়িয়া গেল। ইংরাজের দেওয়া পুস্তকগুলি কিন্তু ফেলিয়া দিলাম না।

ইংরাজী পোশাকের প্রতি এই বিদ্বেষ কালে ইংরাজী ভাষার উপর ছড়াইয়া পড়িল। মাইনর পাস করিয়া শহরের হাইস্কুলে ভর্তি হইয়া দেখিলাম, অবাক কান্ড! কি শরমের কথা! মাষ্টার মশায়রা ক্লাসে ইংরাজীতে কথা কন। উকিল–মোখতার–হাকিমরা কোর্টে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। শিক্ষিত লোক রাস্তা–ঘাটে পর্যন্ত ইংরাজীতে আলাপ করেন। যাঁরা বাংলাতে কথা বলেন তাঁরাও তাঁদের কথা–বার্তায় প্রচুর ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এটাকে আমি মাতৃভাষা বাংলার অপমান মনে করিলাম। ইহার প্রতিবাদে শামসুদ্দিনসহ আমরা কতিপয় বন্ধু ও সহপাঠী মিলিয়া ইংরাজী শব্দের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইলাম। ফুটবলকে 'পদ–গোলক' হুইসেলকে 'বাঁশি' কম্পিটিশনকে 'প্রতিযোগিতা' ফিক্সচারকে 'নির্ঘন্টপত্র' রেফারিকে 'মধ্যস্থ বা শালিস' স্পোর্টসকে 'খেলা বা ক্রীড়া' লেসিং অলকে 'ফিতা সুই' লাইনসম্যানকে

'সীমা নির্দেশক' পুশকে 'ধাক্কা' অফসাইডকে 'উল্টা দিক' ইত্যাদি পরিভাষা প্রবর্তন করিয়া ফুটবল খেলার মাঠে সংস্কার আনিবার জোর চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কাগয-পত্র ছাড়া আর কোথায়ওওসব পরিভাষার প্রচলন চেষ্টা সফল হইল না। তাছাড়া শুধু ফুটবলের ব্যাপারে সংস্কার প্রবর্তন হওয়ার দরুন আমাদের এই উদ্যম বিফল হইল।

৩. ধর্ম-চেতনা বনাম রাজনীতি-চেতনা

যা হোক, এই সংস্কার প্রচেষ্টায় মাতৃভাষার প্রতি টান ও ইংরাজীর প্রতি বিদ্বেষ যতটা ছিল রাজনৈতিক মতলব ততটা ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আমার মুরুব্বি ও চিনা-জানা মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা তখনও দানা বাঁধে নাই। ইতিমধ্যে আমরা অবশ্য ত্রিপলি লইয়া তুর্কী-ইতালির যুদ্ধে ইটালির বিপক্ষে আন্দোলন করিয়াছি। কিন্তু সে ব্যাপারেও আমার ধর্ম-প্রীতি যতটা ছিল রাজনৈতিক চেতনা ততটা ছিল না। তারপর শহরের হাইস্কুলে আসিয়া আমার ধর্ম-চেতনাটা যেন এগ্রেসিভ হইয়া উঠিল। এর কারণ ছিল। বংকিম চন্দ্রের লেখার সাথে পরিচিত হই এই সময়। প্রতিকূল অবস্থায় আমার রগ তেড়া হওয়াটা ছিল আমার একটা জন্মগত রোগ। অত প্রতাপশালী নায়েব মশায়কে তুই এর বদলা তুই বলা এই রোগেরই লক্ষণ। শহরে আসিয়া ঘটনাচক্রে ভর্তি হইলাম মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে। স্কুলটির পরিচালক হিন্দু। পঁয়ত্রিশ জন টিচারের মধ্যে পার্সিয়ান টিচারটি মাত্র মুসলমান। দেড় হাজার ছাত্রের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা তিন শর ও কম। স্কুলে ভর্তি হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে দুইটা টার্মিনাল পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হইয়া শিক্ষকদের স্নেহ পাইলাম বটে, কিন্তু বদনামও কামাই করিলাম। একজন শিক্ষক ক্লাসে আমাকে 'মিয়া সাব' বলায় জবাবে আমি তাঁকে 'বাবুজী' বলিয়াছিলাম। স্কুলে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। হেড মাস্টার শ্রীযুক্ত চিন্তা হরণ মজুমদারের কাছে বিচার যায়। বিচারে আমার জয় হয়। অতঃপর শিক্ষকরা ত নয়ই ছাত্ররাও মুসলমানদেরে 'মিয়া সাব' বলিয়া মুখ ভেংচাইতেন না। একদিন ছোট বাজার পোস্টাফিসে গেলাম পোস্ট কার্ড খরিদ করিতে। জানালায় কোন খোপ না থাকায় গরাদের ফাঁকে হাত ঢুকাইয়া পয়সা দিতে ও জিনিস নিতে হইত। আমি সেভাবে পয়সা দিলাম। পোস্ট মাস্টার হাতে পয়সা নিলেন ও কার্ড দিলেন। আমি অতিকষ্টে ডান হাত টানিয়া বাহির করিয়া তেমনি কষ্টে বাম হাত ঢুকাইয়া কার্ড নিলাম। পোস্ট মাস্টার বিস্ময়ে আমার এই পগালামি দেখিলেন। এ কথাও স্কুলে রাষ্ট্র হইল।

এমনি দিনে একবার কথা উঠিল হিন্দু ছাত্রদের দুর্গা–সরস্বতী পূজার মত আমরা স্কুলে মিলাদ উৎসব করিব। শুনিলাম বহুদিন ধরিয়া মুসলিম ছাত্রদের এই দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষ নামনযুর করিয়া আসিতেছেন। আমি ক্ষেপিয়া গেলাম। আগামী বকরিদে স্কুল আংগিনায় গরু কোরবানি করিব বলিয়া আন্দোলন শুরু করিলাম। এবার মিলাদের অনুমতি অতি সহজেই পাওয়া গেল। পরম ধুমধামের সাথে ঐ বারই প্রথম 'হিন্দু স্কুলে' মিলাদ হইল। শহরের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভাংগিয়া পড়িলেন। যথারীতি মিলাদের পরে আমি এক বাংলা প্রবন্ধ পড়িলাম। তাতে আরবী–উর্দুর বদলে বাংলায় মিলাদ পড়িবার প্রস্তাব দিলাম। মুসলমানদের মুখের অত তারিফ এক মুহূর্তে নিন্দায় পরিণত হইল। হিন্দুরা কিন্তু আমার তারিফ করিতে লাগিলেন। এই বিপদে আমাকে বাঁচাইলেন আনন্দ মোহন কলেজের আরবী–ফারসীর অধ্যাপক মওলানা ফয়যুর রহমান। পরের দিন অপর এক স্কুলের মিলাদ সভায় তিনি আমার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করিয়া বাংলায় মিলাদ পড়াইবার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তারপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে আমি মনে মনে ইংরাজের পক্ষ ইহলাম। ঐ সময় মিঃ এন. এন. ঘোষের 'ইংল্যান্ডস ওয়ার্কস ইন ইন্ডিয়া' নামক ইংরাজী বই আমাদের পাঠ্য ছিল। ইংরাজরা আমাদের দেশের কত উপকার ও উন্নতি বিধান করিয়াছে, ঐ বই পড়িয়া আমি তা বুঝিলাম। তাতে ইংরাজের প্রতি সদয় হইলাম।

কিন্তু বেশিদিন এভাব টিকে নাই। শিক্ষকদের প্রভাব ছাত্রদের উপর অবশ্যই পড়িয়া থাকে। এক আরবী–ফারসী শিক্ষক ছাড়া আমাদের স্কুলের পঁয়ত্রিশ জন শিক্ষকের সবাই হিন্দু। এঁরা প্রকাশ্য রাজনীতি না করিলেও কথা–বার্তায় ও চালে–চলনে স্বদেশী ছিলেন। এঁদের দুই–তিন জনকে আমি খুবই ভক্তি করিতাম। এঁদের প্রভাব আমার মনের উপর ছিল অসামান্য। হঠাৎ একদিন একদল পুলিশ স্কুলে আসিয়া কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করিয়া নিল। এদের মধ্যে দুই–চারজন আমার সুপরিচিত। তাদের জন্য খুবই চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম। গ্রেফতারের কারণ খুঁজিলাম। 'রাজবন্দী', "অন্তরীণ' ইত্যাদি শব্দ এই প্রথম শুনিলাম। কানে রাজনীতির বাতাস গেল। কিছু–কিছু আন্দায করিতে পারিলাম। ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ বাড়িল। যুদ্ধে জার্মানির জয় কামনা করিলাম। জার্মানির পক্ষে যাইবার একটা অতিরিক্ত কারণও ছিল। জার্মানির সম্রাটের উপাধি কাইযার। হাকিমভাই নামে এক 'সবজান্তা' বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন এটা আরবী–ফারসী কায়সার শব্দের অপভ্রংশ। শাহনামার কায়সার নিশ্চয়ই মুসলমান ছিলেন। সুতরাং জার্মান সম্রাটও আসলে মুসলমান এমন ধারণাও

আমার হইয়া গেল। মুসলমান কায়সারকে খৃষ্টানী কাইসার বানাইবার মূলে নিশ্চয়ই ইংরাজের দুষ্ট মতলব আছে। আমরা মুসলমানরা যাতে জার্মানির পক্ষে না যাই সে জন্যই এই বদমায়েশি করিয়াছে। এই অবস্থায় যেদিন শুনিলাম তুর্কির সুলতান মুসলমানদের মহামান্য খলিফা জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে নামিয়াছেন, সেদিন এ ব্যাপারে আমার আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। মুসলমানদের খলিফা মুসলিম বাদশা-কে সমর্থন করিবেন না? তবে কে করিবে? এর পরে সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি দিয়া জার্মানির জয় অর্থাৎ ইংরাজের পরাজয়ের জন্য মোনাজাত করিতে লাগিলাম।

৪. খিলাফত ও অসহযোগ

কিন্তু আমার মোনাজাত কবুল হইল না। অবশেষে ইংরাজই জয়ী হইল। তবে তাতে এটাও প্রমাণিত হইল যে ইংরাজের মত অতবড় দুশমন আর মুসলমানের নাই। এই সময়ে আমি ঢাকা কলেজে বি. এ. পড়ি। এস. এম. (সেক্রেটারিয়েট মুসলিম) হোস্টেলে (বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) থাকি। খবরের কাগজ পড়ি। কমন-রুমে তর্ক-বিতর্ক করি। ল'কলেজের ছাত্র ইব্রাহিম সাহেব (পরে জজ, জাস্টিস, ভাইস চ্যান্সেলার ও মন্ত্রী) আমাদের নেতা।

১৯২০ সালে আহসান মনযিলে খেলাফত কনফারেন্স। তরুণ নবাব খাজা হবিবুল্লাহ অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান। আলী ভাই, মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা আযাদ সোবহানী, মওলানা মানিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরম খাঁ, মৌঃ মুজিবুর রহমান প্রভৃতি দেশ-বিখ্যাত নেতা ও আলেম এই কনফারেন্সে যোগ দেন। ইব্রাহিম সাহেবের নেতৃত্বে আমরা ভলান্টিয়ার হই। তাঁরই বিশেষ দয়ায় আমি প্যান্ডেলের ভিতরে মোতায়েন হই। রোস্ট্রামের কাছে দাঁড়াইয়া নেতাদের পানি ও চা দেওয়ার ফুট-ফরমায়েশ করাই আমার ডিউটি। তাতে সমাগত নেতাদের চেহারা দেখিবার এবং তাঁদের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হয়। মওলানা মোঃ আকরম খাঁ ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছাড়া আর সব নেতাই উর্দুতে বক্তৃতা করেন। মওলানা আযাদ ছাড়া আর সকলের বক্তৃতা সহজ উর্দুতে হইয়াছিল বলিয়া আমি মোটামুটি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু মওলানা আযাদের ভাষা কঠিন হওয়ায় তাঁর অনেক কথাই বুঝি নাই। কিন্তু তাতে কোনই অসুবিধা হয় নাই। কারণ কথায় যা বুঝি নাই তাঁর জ্যোতির্ময় চোখ-মুখের ভংগিতে ও হস্ত সঞ্চালনের অপূর্ব কায়দায় তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝিয়া ফেলি। ফলে কথা না বুঝিয়াও আমি মওলানা আযাদের একজন পরম ভক্ত হইয়া উঠি।

এ ঘটনার পর মাস খানেকের মধ্যে ঢাকায় দেশ-বিখ্যাত বহু নেতার শুভাগমন হয়। তন্মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা শওকত আলী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাবু বিপিন চন্দ্র পাল, মৌঃ ফযলুল হক, মিঃ আবুল কাসেম, মৌঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেকালে আরমানিটোলা ময়দান ছাড়া করোনেশন পার্ক ও কুমারটুলির ময়দানেই মাত্র বড়-বড় জন-সভা করিবার জায়গা ছিল। আমরা ছাত্ররা দলে-দলে এই সব সভায় যোগদান করিলাম। এই সব সভার কথা যা আবছা-আবছা মনে আছে তাতে বলা যায় যে, একদিকে মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা শওকত আলী অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে, অপরদিকে বাবু বিপিন চন্দ্র পাল ও মৌঃ ফযলুল হক অসহযোগের বিপক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে খিলাফত ও জালিয়ান ওয়ালাবাগের জন্য জন-মত অসহযোগের পক্ষে এমন ক্ষিপ্ত ছিল যে বিরোধী বক্তারা কথায়-কথায় শ্রোতাদের দ্বারা বাধা পাইতেন। এই জন-মতের জন্যই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসহযোগের বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে আসা সত্ত্বেও আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা দিয়া গিয়াছিলেন। যা হোক ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেস খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করার পর নেতাদের মতভেদ একরূপ দূর হইয়া যায়। যাঁরা অসহযোগের সমর্থন করেন নাই তাঁরা রাজনীতির আকাশে সাময়িকভাবে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। এঁদের মধ্যে জিন্না সাহেব, হক সাহেব ও বিপিন পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৫. আন্দোলনে যোগদান

মৌঃ ইব্রাহিম সাহেব আমাদের সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রদের ছোট-খাট একাধিক মিটিং-এ বক্তৃতা দেন। হোস্টেলের আঙিনায় বক্তৃতা নিষিদ্ধ হইলে তিনি হোস্টেলের বাহিরে বক্তৃতা শুরু করেন। বর্তমানে যেখানে টি. বি. ক্লিনিক, এইখানে একটা মাটির টিপিতে দাঁড়াইয়া ইব্রাহিম সাহেব পর-পর কয়েকদিন বক্তৃতা করেন। ইব্রাহিম সাহেব ছাড়া আমার আরেকজন সহপাঠী আমার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর নাম ছিল মিঃ আবুল কাসেম। তাঁর বাড়ি ছিল বরিশাল জিলায়। পরবর্তীকালে তিনি মোখতারি পাস করিয়া আইন ব্যবসায় করিতেন। এখন তিনি কি অবস্থায় কোথায় আছেন জানি না। কিন্তু ১৯২০ সালে প্রধানতঃ তিনিই আমাকে অসহযোগ আন্দোলনে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এছাড়া আবুল কালাম শামসুদ্দিন তখন কলিকাতা কারমাইকেল হোস্টেল হইতে প্রতি সপ্তাহে দুই একখানা করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। এইসব পত্রে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রচুর যুক্তি থাকিত এবং তিনি অতি শীঘ্রই আন্দোলনে যোগ দিতেছেন এই খবর থাকিত। ইতিমধ্যে আমি

মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র গ্রাহক হইয়াছিলাম। গভীর মনোযোগে ও পরম শ্রদ্ধার সংগে ইহা পড়িতাম। তাঁর লেখা আমার চিন্তা-ধারায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পরবর্তী জীবনেও এই প্রভাব আমি কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

ইব্রাহিম সাহেবের নেতৃত্বে আমরা অনেক ছাত্র কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলাম। বি. এ. পরীক্ষার তখন মাত্র কয়েকমাস বাকী। টেস্ট পরীক্ষা আগেই হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ল্যাংলির আমি খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম। তাঁর সবিশেষ পীড়াপীড়িতে আমি ও আরও কতিপয় বন্ধু শেষ পর্যন্ত নামমাত্র পরীক্ষা দিয়া ফলাফলের প্রতি উদাসীনতা দেখাইয়া গ্রামে চলিয়া গেলাম। কংগ্রেস-খেলাফত কমিটির নীতি ছিল 'ব্যাক টু ভিলেজ'। অতএব তাদের নির্দেশিত পল্লী সংগঠনে মন দিলাম। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে শামসুদ্দিনও ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আমার চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি আগাইয়াছেন। বি. এ. পরীক্ষাই দেন নাই। তার বদলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের' 'উপাধি' পরীক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং স্থানীয় কর্মীদের কাছে চরমপন্থী বলিয়া তাঁর মর্যাদা আমার উপরে। পল্লী গঠনের কাজে তাঁরই নেতৃত্বে আমরা কাজ শুরু করিলাম। একটি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় ও একটা তাঁতের স্কুল স্থাপন করিলাম। বৈলরধানীখোলা দুই গ্রামের একই যুক্ত পল্লী সমিতি হইল। শামসুদ্দিন তার সেক্রেটারী হইলেন। বৈলর বাজারেঅফিস প্রতিষ্ঠিত হইল। হাইস্কুলে হইল বৈলর বাজারে ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারের বিশাল আটচালা ঘরে। আমি হইলাম স্কুলের হেড মাষ্টার। শামসুদ্দিন হইলেন এসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার। শিক্ষক-ছাত্রে অল্পদিনেই স্কুলটি গম-গম করিতে লাগিল। শামসুদ্দিনের চাচা জনাব যহিরুদ্দিন তরফদার সাহেব আমার ছোটবেলা হইতেই প্রজা আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কংগ্রেসে খেলাফত আন্দোলনেও আমাদের মুরুব্বি হইলেন। পল্লীসমিতির প্রেসিডেন্ট ও হাইস্কুলের সেক্রেটারী হইলেন তিনিই।

৬. পল্লী সংগঠন

হাইস্কুল হইল বিনা-বেতনের বিদ্যালয়। নিতান্ত অভাবী শিক্ষকরা ছাড়া আমরা সবাই বিনা-বেতনের শিক্ষক হইলাম। স্কুলের লাইব্রেরি মানচিত্র টেবিল চেয়ার বেঞ্চি ব্ল্যাক বোর্ড ইত্যাদির ব্যয় ও পল্লী সমিতির খরচের জন্য আমরা বাজারে তোলা ও গ্রামের মুষ্টি চাউল তুলিতে লাগিলাম। সারা গ্রামের ঘরে-ঘরে মুষ্টির ঘট বসাইলাম। সপ্তাহে-সপ্তাহে নিয়মিতভাবে ঘটের চাউল ভলান্টিয়ারসহ আমরা নিজেরা কাঁধে ও মাথায় করিয়া সংগ্রহ করিতাম।

ফলে হাইস্কুল, তাঁতের স্কুল, চরখা স্কুল ও পল্লী সমিতির কাজে বৈলর বাজার জিলা-নের্তৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিলা-নেতৃবৃন্দের মধ্যে মৌঃ তৈয়বুদ্দিন আহমদ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই আমাদের কাজ দেখিতে আসিতেন। এ অঞ্চলে পল্লী গ্রামে ইহাই একমাত্র জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় হওয়ায় আশে-পাশের দশ মাইলের মধ্যেকার সর্ব হাইস্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা এই স্কুলে যোগদান করিল। তাঁতের স্কুলে চার-পাঁচ জন তাঁতীর পরিচালনায় ৪৫ টা তাঁতে কাপড় বুনার কাজ চলিল। নানা রং-এর সূতার টানায় মাঠ ছাইয়া গেল। ঐসব তাঁতে রাতদিন ঘর্ঘর আওয়াজ চলিল। পল্লী সমিতি হইতে বিনা মূল্যে গ্রামে চরখা বিতরণ ও তুলার বীজ বিলান হইল। আমাদের পল্লী সমিতি এইভাবে থাকিত দিনরাত কর্মচঞ্চল। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে সভা করিতাম। আমরা সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন। এই সব সভায় শহর হইতে দু-চার জন নেতা আসিতেন। সন্ধ্যার অনেক পরেও এই সব সভার কাজ চলিত। সভার স্থানীয় উদ্যোক্তাদের একজনের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আগে হইতেই ঠিক থাকিত। সভা শেষে নির্ধারিত বাড়িতে উদরপূর্তি খানা খাইতাম। খাওয়া-দাওয়া সারিতে-সারিতে বেশ রাত হইয়া যাইত। তবু আমরা রাত্রিবাস করিতাম না। কত কাজ আমাদের! আমরা কি এক জায়গায় সময় নষ্ট করিতে পারি? এই ধরনের কথা বলিয়া নিজেদের বুযুর্গি বাড়াইতাম। পাড়াচালের চার-পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া এই বুযুর্গির দাম শোধ করিতাম। শহরের নেতাদের জন্য যথাসম্ভব কাছের কোন সড়কে ঘোড়াগাড়ি এন্তেযার করিত। তাঁদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমরা বাড়ি-মুখী হইতাম। পথের কষ্ট ভুলিবার জন্য আমরা গলা ফাটাইয়া 'স্বদেশী গান' ও 'খেলাফতী গযল' গাইতাম। পাঠকদের, বিশেষতঃ তরুণ পাঠকদের কাছে বিস্ময়কর শোনা গেলেও এটা সত্য কথা যে, আবুল কালাম শামসুদ্দিন আর আমিও গান গাইতাম। ইয়ার্কি না। সত্যই আমরা গান গাইতে পরিতাম। তার উপর আমি বাঁশিও বাজাইতে পারিতাম। বস্তুতঃ কলেজ হোস্টেলে জনাব ইব্রাহিম, কাযী মোতাহার হোসেন সাহেব প্রভৃতি উপরের শ্রেণীর ছাত্রদেরও আমি 'ওস্তাদজী' ছিলাম। এঁরা সকলেই গান গাইতেন। আসল কথা এই যে শৈশবে সব লেখকই যেমন কবি থাকেন, তেমনি প্রায় সকলেই গায়কও থাকেন।

৭. আন্দোলনের জনপ্রিয়তা

যা হউক, এইরূপ কর্মোদ্যমের মধ্যে আমরা শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলিয়াই থাকিতাম। গোসল-খাওয়ার কোন সময় অসময় ছিল না। জনগণের ও

কর্মীদের উৎসাহ–উদ্দীপনা আমাদের চব্বিশ ঘন্টা মাতাইয়া রাখিত। ধনী–গরিব–নির্বিশেষে জনগণ এই আন্দোলনকে নিতান্ত নিজের করিয়া লইয়াছিল। একটি মাত্র নযিরের উল্লেখ করি। এই সময় নিখিল–ভারত খিলাফত কমিটি আংগোরা (বর্তমান আংকোরা) তহবিল নামে একটি তহবিল খুলেন যুদ্ধরত কামাল পাশাকে সাহায্য করিবার জন্য। ফেৎরার মত শিশু–বৃদ্ধ–নর–নারী নির্বিশেষে মাথা–পিছে দুই পয়সা চাঁদা উপর হইতেই নির্ধারিত হইয়াছিল। আমাদের এলাকার লোকেরা ফেৎরা দেওয়ার মতই নিষ্ঠার সাথে স্বেচ্ছায় এই চাঁদা দিল। ত্রিশ হাজার অধিবাসীর দুই গ্রাম মিলাইয়া আমরা বিনা–আয়াসে প্রায় এক হাজার টাকা তুলিলাম। তেমনি নিষ্ঠার সংগে শামসুদ্দিন ও আমি ঐ টাকার বোঝা মাথায় করিয়া জিলা খিলাফত কমিটিতে জমা দিয়া আসিলাম। একটি পয়সাও স্থানীয় সমিতির খরচ বাবত কাটিলাম না।

গঠনমূলক কাজের মধ্যে আমরা চরখা ও তুলার বীজ বিতরণ এবং শালিসের মাধ্যমে মামলা–মোকদ্দমা আপোসকরণের দিকেই বেশি মনোযোগ দেই। দুই গ্রাম মিলাইয়া আমরা একটি মাত্র শালিসী পঞ্চায়েত গঠন করি। আমাদের স্থানীয় নেতা যহিরুদ্দিন তরফদার সাহেব এই পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান হন। ইউনিয়ন বোর্ড আইন তখনও হয় নাই। কাজেই প্রেসিডেন্ট নামটা তখনও জানা হয় নাই। ডিসট্রিক্ট বোর্ড লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানই তখন সবচেয়ে বড় সম্মানের পদ। আমরা আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধানকেও সেই সম্মান দিলাম। পঞ্চায়েতের বৈঠক পক্ষগণের সুবিধামত এক একদিন এক এক পাড়ায় হইত। তরফদার সাহেব বরাবরের দক্ষ বিচারক মাতব্বর। তাঁর প্রখর বুদ্ধি সুচতুর মধুর ব্যবহার ও নিরপেক্ষ বিচার সকলকে মুগ্ধ করিত। অল্পদিনেই স্থানীয় মামলা–মোকদ্দমা লইয়া কোর্ট–কাছারি যাওয়া বন্ধ হইল।

তুলার চাষ জনপ্রিয় করার ব্যাপারে আমরা সরকারী সাহায্য পাইলাম। গভর্ণমেন্টকে আমরা এই সময়ে সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করিতাম। কাজেই সরকারী সাহায্য নেওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু এই সময় সদর মহকুমার এস. ডি. ও. ছিলেন নবাবযাদা আবদুল আলী। তিনি গায়ে চাপকান মাথায় গুম্বযী টুপি পরিতেন বলিয়া অন্যান্য সরকারী কর্মচারী হইতে তাঁর একটা আলাদা মান–মর্যাদা ছিল জনগণের কাছে। বিশেষতঃ মুসলমানদের নিকট তিনি ছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয়। আমরা সব কংগ্রেস খিলাফত কর্মীদের ডাকিয়া চা খাওয়াইয়া আশাতীত সম্মান দেখাইয়া তিনি বুঝাইলেন, তিনিই অসহযোগ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সমর্থক। কাজেই তিনি তুলার চাষ বাড়াইয়া দেশকে সূতায় ও কাপড়ে আত্মনির্ভরশীল করিতে চান। আমরা তাঁর কথা মানিয়া লইলাম। সরকারী তহবিলের বহু তুলার বীজ আমরা বিতরণ করিলাম।

৮. উৎসাহে ভাটা

কিন্তু আমাদের উৎসাহ এক বছরের বেশি স্থায়ী হইল না। গান্ধীজীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি-মত এক বছরে স্বরাজ আসিল না। চৌরিচুরার হাংগামার ফলে তিনি সার্বজনীন আইন অমান্য প্রত্যাহার করিলেন। কংগ্রেস নেতারা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিলেন স্কুল-কলেজ ও অফিস-আদালত বয়কট ব্যর্থ হইয়াছে। এরপর ছাত্ররা জাতীয় বিদ্যালয় ছাড়িয়া দলে-দলে সরকারী 'গোলাম-খানায়' ঢুকিতে লাগিল। আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের ও তাঁতের স্কুলের ছাত্র কমিয়া গেল। খদ্দরের কাপড় মোটা ও রং কাঁচা বলিয়া আমাদের তৈরি কাপড় বিক্রিতে মন্দা পড়িল। কারিগর শিক্ষক ও গরিব মাস্টারদের বেতন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাঁতের স্কুলের কারিগর শিক্ষকরা ছিলেন সবাই গরিব লোক। তাঁদের মাসে মাসে নিয়মিতভাবে বেতন না দিলে চলিত না। এঁদের বেতন বাকী পড়িতে লাগিল। তাঁতের তৈরি কাপড়গুলি নিয়মিত বিক্রি হইত না। বিক্রি হইলেও কম দাম হইত। তাতে বেতন বাকী পড়িত। বাজারের তোলা গ্রামের মুষ্টি চাউল সব ব্যাপারেই লোকের উৎসাহ কমিতে লাগিল। মাস্টার, কারিগর ও কর্মীদের মধ্যে শৈথিল্য ও নিরুৎসাহ দেখা দিল।

আমাদের মন ও শরীরের উপর এর চাপ পড়িল। শামসুদ্দিন ছিলেন বরাবরের আমাশয় রোগী। এক বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অনিয়মে তাঁর শরীর আরও খারাপ হইল। শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হিসাবেই তিনি 'মোসলেম জগৎ' নামক সাপ্তাহিক কাগজের দায়িত্ব লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। আমি একা চরম নিরুৎসাহ ও অভাবের মধ্যে হাইস্কুল, তাঁতের স্কুল, চরখা স্কুল, পল্লীসমিতি ও শালিসী পঞ্চায়েতের কাজ চালাইতে লাগিলাম। এই দুর্দিনে 'বড় চাচা' যহিরুদ্দিন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ এবং ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার ও ডাঃ আব্বাস আলী প্রভৃতি উৎসাহী কর্মীদের কর্মোন্মাদনার উত্তাপই আমার কর্মপ্রেরণার সলিতা কোনও মতে জ্বালাইয়া রাখিল।

কিন্তু বেশিদিন এভাবে চলিল না। শেষ পর্যন্ত আমিও রণে ভংগ দিলাম। আস্তে-আস্তে সব প্রতিষ্ঠান গুটাইয়া নিজে ময়মনসিংহ শহরে চলিয়া আসিলাম। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি জিলার জনপ্রিয় নেতা মৌঃ তৈয়বদ্দিন আহমদ পুনরায় ওকালতি শুরু করায় জিলা খিলাফত কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব আমারই উপর পড়িল। আন্দোলনে যোগ দিয়াই তৈয়বুদ্দিন সাহেব ফ্যামিলি বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁর বাসাই খিলাফত নেতাদের বাসস্থান ছিল। আমারও হইল। তৈয়বুদ্দিন সাহেব তাঁর বড় ভাই মৌঃ শাহাবুদ্দিন উকিল সাহেবের বাসায় খাওয়া-দাওয়া করিতেন। আমরা কতিপয় 'নেতা' তৈয়বুদ্দিন সাহেবের বাসায় মেস করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতাম। নেতাদের মধ্যে যাঁদের শহরে বাড়ি-ঘর নাই তাঁরা কংগ্রেস খেলাফতের টাকাতেই খাওয়া খরচ

চালাইতেন। আমারও তাই হইল। কিন্তু এটা আমার ভাল লাগিত না। বিশেষতঃ টাকার অভাবে এই সময় খিলাফত কমিটির স্বতন্ত্র অফিস উঠাইয়া কংগ্রেস অফিসেরই এক কামরায় খিলাফত অফিস করিলাম। এমত অবস্থায় নেতাদের খাওয়ার তহবিলের টাকা খরচ করিলে খেলাফত অফিসের খরচায় টান পড়িত।

৯. জাতীয় বিদ্যালয়ে মাস্টারি

অতএব আমি স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলাম। এই স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন আমার শিক্ষক ও মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের ভূতপূর্ব সহকারী হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত ভূপতি নাথ দত্ত। তিনি ছিলেন ঋষি-তুল্য মহাপ্রাণ ব্যক্তি। ছাত্র-জীবনেই তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আমাকে পাইয়া তিনি লুফিয়া নিলেন সহকারীরূপে। তাঁর স্নেহ-শীতল ছায়ায় ও তাঁর অভিজ্ঞ পরিচালনায় আমি শিক্ষকতা শুরু করিলাম। শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং শিক্ষকতার টেকনিক্যাল খুঁটি-নাটি ব্যাপারে এই সময় তাঁর কাছে অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। স্কুলের সময় তিনি ছাত্রদের যেমন বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, স্কুল আওয়ারের পরে তেমনি তিনি আমাদিগকে শিক্ষকতা শিক্ষা দিতেন। বেতন হিসাবে আমি চল্লিশটি টাকা পাইতাম। এই টাকাতেই আমি খেলাফত নেতাদের মধ্যে রীতিমত ধনী লোক হইয়া গেলাম। নিজের পরা ছাড়া দু'একজন গরিব সহকর্মীকেও পোষিতে পরিতাম। শিক্ষকদের মধ্যে আরবী-ফারসী শিক্ষক ছাড়া আরও দু'জন মুসলমান ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল মৌঃ সাইদুর রহমান ও মৌঃ আলী হোসেন। উভয়ে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। সাইদুর রহমান সাহেব বেতন পাইতেন ত্রিশ টাকা ও আলী হোসেন পাইতেন পঁচিশ টাকা। উভয়েই আমাদের সাথে এক মেসে থাকিতেন। খেলাফত নেতা-কর্মীদের ভার তাঁদের উপরও গড়াইত।

এই সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। কাজেই করিবার মত কাজ আমাদের বিশেষ কিছু ছিল না। দিনের বেলা মাস্টারি করি এবং বিকাল ও রাত্রি বেলা নেতাদের বাড়ি-বাড়ি চা খাই। অগত্যা অফিসে বসিয়া আড্ডা মারি। এই সুযোগে শহরের বড় বড় নেতা যথা শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার সোম, ডাঃ বিপিন বিহারী সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মৈত্রেয়, মিঃ সুধীর চন্দ্র বসু বারিস্টার (সূর্য্যবাবুর মেয়ের জামাই), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মতিলাল পুরকায়স্থ প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। সুরেনবাবু 'মধু ঘোষ' নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় আমার সমবয়স্ক। সেজন্য তাঁর সাথে বন্ধুত্ব হয়। তিনি বিপ্লবীদের 'মধুদা' ছিলেন। ডাঃ বিপিন সেন ও সূর্য্য সোম আমার পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁদের স্নেহও পাইয়াছিলাম অফুরন্ত। তাঁরা উভয়ে অসাম্প্রদায়িক উদার মহান ব্যক্তি ছিলেন।

এঁদের সাহচর্যে ময়মনসিংহ শহরের প্রায় বছর খানেক বড়ই আনন্দে কাটিয়াছে, সুরেন বাবু, মওলানা আযিযুর রহমান (ইনি নোয়াখালির লোক ছিলেন), মৌলবী আবদুল হামিদ দেওপুরী, অধ্যাপক মোয়াযযম হোসেন, মৌঃ সাইদুর রহমান প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেস খেলাফত নেতারা বিকালে দল বাঁধিয়া রাস্তায় বাহির হইতাম। পথচারীরা সম্ভ্রমে আমাদের পথ ছাড়িয়া দিত এবং সালাম-আদাব দিত। এমন পথ ভ্রমণে আমিই ছিলাম অন্যতম প্রধান বক্তা অবশ্য রাস্তাঘাটে। পথ চলিতে চলিতে আমার মত বকিতে কেউ পারিতেন না। আমি কোনও কোনও সময় অতি উৎসাহে বন্ধুদের সামনে করিয়া পিছন দিকে চলিতে-চলিতে বক্তৃতা করিতাম। এমন করিতে গিয়া একদিন একজন পথাচারিনী মহিলার পায়ে পাড়া মারিয়া ঝট্‌পট্‌ ঘুরিয়া হিন্দু ভংগিতে দুই হাত জোড় করিয়া মহিলাকে নমস্কার করিলাম। রাস্তায় যখন বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি মুসলমান নন। আমাকে ওভাবে নমস্কার করিতে দেখিয়ে মহিলা হতভম্ব হইয়া গেলেন। বন্ধুরা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কেউ কেউ বলিলেন ঃ 'ওটা যে বেশ্যা। একটা বেশ্যাকে তুমি সেলাম করিলে?' আমার মুখ হইতে চট করিয়া বাহির হইল ঃ 'যারা বেশ্যাগামী তাদের কাছেই ইনি বেশ্যা, আমার কাছে তিনি ভদ্রমহিলা মাত্র।' সকলে নীরব হইলেন। মেয়েটি সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু বেশিদিন এভাবে চলিল না। সক্রিয় আন্দোলনের অভাবে চিন্তার প্রচুর সুযোগও পাইলাম। অবস্থাগতিকে চিন্তায় বাধ্যও হইলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিলাম, দেশের স্বাধীনতা ও খিলাফতের জন্য সর্বস্ব ও প্রাণ বিসর্জন দিবার যে দুর্বার তাকিদে কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সে সব ত্যাগের আজ কোন দরকার নাই। কারণ স্বাধীনতা ও খেলাফত কোনটাই উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা এখন নাই। মহাত্মাজী স্বরাজের মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছাইয়া দিয়াছেন। মোস্তফা কামাল খেলাফত ভাংগিয়া দিয়া মহামান্য সুলতানকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। কাজেই আমার আপাততঃ জাতীয় বিদ্যালয়ের মাস্টারিই সার হইল। বেতন চল্লিশ টাকা এতদিন মোটেই অপ্রতুল মনে হয় নাই। কারণ তৎকালে খরচও কম ছিল। তখন এক পয়সায় এক কাপ চা, চার পয়সায় পঁচিশটা মুখপোড়া বিড়ি ও পয়সায় দুইটা দিয়াশলাই পাওয়া যাইত। তাতে সারা দিনে চার আনার বেশি খরচ করিতে পারিতাম না। তৈয়বুদ্দিন সাহেবের বাসায় বিনা-ভাড়ায় থাকিতাম। তিন-চার বন্ধুতে একত্রে মেস করিয়া খাইতাম। পাঁচ টাকার বেশি খোরাকি লাগিত না। পোশাকে বাবুগিরি ছিল না। সস্তা মোটা খদ্দরের তহবন্দ ও পাঞ্জাবী পরিতাম। একটা ধুতিতেই একটা পাঞ্জাবী ও একটা তহবন্দ হইয়া যাইত। দুই টাকা চার আনা দিয়া বছরে দুই খানা ধুতি (প্রতিটি আঠার আনা) কিনিতাম,তাতেই দুইখানা পাঞ্জাবী ও দুইখানা তহবন্দ হইয়া যাইত। দুইটা পাঞ্জাবী সিলাই করিতে দর্জি

নিত বার আনা। তহবন্দ সিলাইর চার্জ ছিল দুইটা দুই আনা। পাঞ্জাবীর বাদবাকী টুকরা কাপড় হইতে সচ্ছন্দে দুইটা গান্ধী টুপি হইয়া যাইত। দুইটা টুপিতে ও দুইটা তহবন্দে কখনও চার আনা কখনও বা দুই আনা দর্জিকে দিয়াই মাফ লইতাম। সুতরাং দেখা গেল, মোট সোওয়া তিন টাকা খরচ করিয়া আমার দুইটা পাঞ্জাবী দুইটা তহবন্দ ও দুইটা টুপি হইয়া যাইত। খদ্দরটা মোটা বলিয়া মজবুতও হইত। ধুইতামও নিজেই। একনম্বর ঢাকাই বাংলা সাবান ছিল পাঁচ আনা সের। দশ পয়সায় আধা সেরের একটা দলা পাওয়া যাইত। প্রতি সপ্তাহে ঐ এক দলা সাবানে সব কাপড় ধোলাই হইয়া যাইত। কখনও কখনও এক পয়সার নীল কিনিয়া নীলের ছোপ দিতাম। কেউ 'বাবু' বলিলে তাও দিতাম না। তবু মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতাম।

সুতরাং টাকা-পয়সার অল্পতার কথা অনেকদিন মনে করি নাই। প্রথমে মনে পড়ে আদর্শহীনতার কথা। কিসের জন্য অত প্রশংসার ছাত্র-জীবন ত্যাগ করিলাম? নিশ্চয়ই চল্লিশ টাকার স্কুল মাস্টারি করিবার জন্য নয়। ন্যাশনাল স্কুলে মাস্টারি? তারই মানে কি? চরখায় সূতা কাটা ছাড়া 'গোলামখানা' হাই স্কুলের পঠিতব্য ও ন্যাশনাল হাই স্কুলের পঠিতব্যে পার্থক্য কি? সব বেসরকারী স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক এবং অনেক ছাত্র আমারই মত খদ্দর পরেন। তবে পার্থক্যটা কোথায়? বিশেষতঃ ন্যাশনাল স্কুলই হোক আর 'গোলামখানা'ই হোক মাস্টারগণকে ত ঘড়ির কাঁটা ধরিয়াই স্কুলে আসিতে হয়। বিকালে ক্লান্ত দেহে শুক্‌না মুখে ঘরে ফিরিতে হয়।

দেশোদ্ধারের চিত্ত-চাঞ্চল্যকর দেহমন-শিহরণকারী কাজ এতে কোথায়? মনটা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত রোমাঞ্চকর রোমান্টিক কিছু করিবার জন্য মন উতলা হইয়া গেল। কিন্তু দুইটি কারণে হঠাৎ কিছু করিতে পারিলাম না। তার একটি ছাত্রের মায়া, অপরটি টাকার মায়া। ছাত্রের মায়া এইজন্য যে তাদেরে আমি ভালবাসিতাম। তারাও আমাকে ভালবাসিত। সহকর্মীরাও বলিতেন, আমি ছাত্রদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। আমি তখন দাড়ি রাখিয়াছি। দাড়ি-লুংগি টুপিতে আমি দস্তরমত একজন মুনশী সাহেব। এমন একজন মুসলমানের পক্ষে ঐ স্কুলে জনপ্রিয় শিক্ষক হওয়া আশ্চর্যের বিষয় ছিল। কারণ ছেলেদের বেশির ভাগই ছিল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য সমাজের হিন্দু ছেলে। অধিকাংশই শহরের উকিল-মোক্তার-ডাক্তার প্রভৃতি ভদ্রলোকের ছেলে। এরা আমাকে এত ভক্তিশ্রদ্ধা করিত যে এদের অনেকে রাস্তাঘাটে পর্যন্ত আমাকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিত। অথচ হিন্দু মাস্টাররা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এইসব ছেলের মধ্যে চার জনের কথা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। দুই জন ব্রাহ্মণ, একজন কায়স্থ ও একজন বৈদ্য। এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে উচ্চ-উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারী নেতৃস্থানীয় লোক হইয়াছেন। হিন্দু ছেলেদের মধ্যে মুসলমানদের মত গুরু-ভক্তি নাই বলিয়া স্বয়ং হিন্দু

শিক্ষকদেরই একটা সাধারণ অভিযোগ আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই অভিযোগ সমর্থন করে না। এই ধরনের ভক্তিমান ছেলেরা আমার হৃদয়-মন এমন জয় করিয়াছিল যে এদের মনের দিকে চাহিয়া আমি কোনমতেই এই স্কুলের মায়া কাটাইতে পারিতাম না।

দ্বিতীয় কারণ অবশ্য এর চেয়ে কাটখোট্টা বাস্তব কারণ। মাসে মাসে যে চল্লিশটি টাকা পাই শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিলে তা-ইবা পাইব কোথায়? খিলাফত ফন্ডে যে সামান্য পয়সা ছিল, সেক্রেটারি হিসাবে আমি অবশ্যই কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে তা চাহিয়া নিতে পারিতাম। কিন্তু নিজের খাওয়ার জন্য কোষাধ্যক্ষের কাছে টাকা চাওয়া আমি লজ্জার বিষয় মনে করিতাম। কাজেই স্কুলের মাষ্টারি ছাড়িলে আমাকে খালি পকেটে এবং শেষ পর্যন্ত খালি পেটে থাকিতে হইবে। এটা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইভাবে এতদিনে বুজিলাম, দেশের স্বাধীনতাই বল, আর ধর্মের খিলাফতই বল, পেটে আগে কিছু না দিয়া দুইটার কোনওটাই উদ্ধার করা চলে না।

কলেজ ছাড়িবার সময় ল্যাংলি সাহেব ও বাপ-মা মুরুব্বিরাও এই কথাই বলিয়াছিলেন। তখন জবাব দিয়াছিলামঃ টাকা-পয়সা ও ভোগবিলাসিতা ত তুচ্ছ কথা, দেশ ও ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি। এখন বুঝিতেছি, দরকার হইলে প্রাণ হয়ত সত্য-সত্যই দিতে পারি। কিন্তু তার দরকার ত মোটেই হইতেছে না। কেউত আমার প্রাণ চাইতেছে না। প্রাণ দিবার কোনও রাস্তাই তা নিজের চোখেও দেখিতেছি না। মাষ্টারি ছাড়া কাজের মধ্যে ত আড্ডা মারা। উকিলরা সব কোর্টে ফিরিয়া যাওয়াতে তাঁদের বাসায়ও আগের মত আড্ডা দেওয়া চলে না। মওক্কেলের ভিড়। একমাত্র চাঞ্চল্যকর কাজ কংগ্রেস-খিলাফতের সভা উপলক্ষে কলিকাতা গয়া দিল্লী বোম্বাই যাওয়া। সেটাও আমার ভাগ্যে জুটে না। কলিকাতার পশ্চিমে আর আমার যাওয়াই হয় না। কারণ ঐ সব সভায় যাওয়ার ভাড়া ও খরচ-পত্র বহন করার মত টাকা কংগ্রেস-খিলাফত ফণ্ডে নাই। কাজেই অন্য সব কর্মী বন্ধুরা, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে টাকা যোগাড় করিয়া লয়। কিন্তু আমার তেমন কোনও বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন না থাকায় আমি কলিকাতা যাওয়ার আনন্দ হইতেও প্রায়শঃ বঞ্চিত থাকিতাম।

কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমি যে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইলাম, তার সোজা অর্থ এই যে, আমি খিলাফত ও স্বরাজের দোহাই দিয়া কলেজ ছাড়িয়া আসিয়া চল্লিশ টাকা বেতনের চাকরি করিতেছি। কলেজ ত্যাগের এই কি পরিণাম? এই কাজে কি স্বরাজ খিলাফত উদ্ধার হইবে? বাপ-মা মুরুব্বিদের এমন কি নিজেরে ফাঁকি দেই নাই কি? অতিশয় অস্থির-চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। অনেক বিনিদ্র রজনী কাটাইলাম।

তেসরা অধ্যায়

বেংগল প্যাক্ট

১. খিলাফতের অবসান

১৯২২ সালের মাঝামাঝি প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক উপলক্ষে কলিকাতা গেলাম তদানিন্তন প্রাদেশিক সেক্রেটারি সৈয়দ মাজেদ বখ্শ্ সাহেবের বিশেষ অনুরোধে। কলিকাতায়ও আমার এই প্রথম পদার্পণ। খিলাফত কমিটির মিটিংএও আমার এই প্রথম উপস্থিতি। আমি অনেক আগে হইতেই প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার থাকা সত্ত্বেও এর আগে কখনও তার মিটিং-এ যোগ দেই নাই। অল-ইন্ডিয়া-খিলাফত নেতা মওলানা শওকত আলী সাহেব ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যের সাথে বিশেষতঃ জিলা-নেতৃবৃন্দের সাথে খিলাফতের বিশেষ পরিস্থিতি আলোচনা করিতে চান। সেক্রেটারি মাজেদ বখশ সাহেবের এই মর্মের পত্র পাইয়াই আমি এই সভায় অংশ গ্রহণ করিতে আসি। কলিকাতা খিলাফত কমিটির আর্থিক অবস্থা তখনও স্বচ্ছল। মফস্বলের নেতাদের হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তখনও করা হয়। সেক্রেটারি সৈয়দ মাজেদ বখ্শ সাহেব আমারও বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু আমি হোটেলের বদলে শামসুদ্দিনের সাথে থাকাই মনস্থ করিলাম। তাই ৯নং আন্তনী বাগানস্থ 'মোসলেম জগত' আফিসে উঠিলাম। খিলাফত কমিটির সভায় যোগ দেওয়া ছাড়াও আমার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। খিলাফত উদ্ধারের বদলে নিজেকে উদ্ধার করা আমার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। শামসুদ্দিনের মধ্যস্থতায় কোনও খবরের কাগজে একটা চাকরি যোগাড়ের সম্ভাবনা বিচারও আমার সে যাত্রায় উদ্দেশ্য ছিল। খিলাফত কমিটির কাজ সারিতে আমার দুইদিন লাগিল। মওলানা শওকত আলী সাহেবকে এতদিন শুধু দূর হইতে দেখিয়াছি, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা শুনিয়াছি। এবারই প্রথম সামনা-সামনি কথা বলিবার গৌরব অর্জন করিলাম। মওলানা সাহেবের আশাবাদ দেখিলাম। বিস্মিত হইলাম। তখন মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে নয়াতুর্কী বাহিনী গ্রীক বাহিনীর কবল হইতে স্মার্না উদ্ধার করিয়াছে ; গ্রীক বাহিনীকে তাড়া করিয়া নিতেছে। এই ঘটনায় সব মুসলমানেরই আনন্দ করিবার কথা। আমরাও

করিয়াছি। কিন্তু মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুর্কীরা রাজনৈতিক সেকিউলারিযম গ্রহণ করিতেছে ; পোশাক-পাতিতে ইউরোপীয় সাজিবার চেষ্টা করিতেছে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠান উঠাইয়া দিতে পারে বলিয়া গুজব রটিতেছে। স্বয়ং তুর্কীরা খিলাফত উঠাইয়া দিলে আমরা ভারতীয়রা কিরূপে আন্দোলন চালাইব, প্রধানতঃ এই কথাটার আলোচনার জন্যই মওলানা সাহেব কলিকাতা আসিয়াছেন। তাঁর মতে কামাল খিলাফত উচ্ছেদ করিতে পারেন না। আইনতঃ সে অধিকারও তাঁর নাই। খিলাফত কোন দেশ-রাষ্ট্রের অনুষ্ঠান নয় ; এটা বিশ্ব-মুসলিমের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। অতএব কামাল পাশা ওটা উঠাইয়া দিলেও আমরা তা মানিব না । মওলানা সাহেবের এই বিস্ময়কর আশাবাদে পুরাপুরি শরিক হইতে না পারিলেও আমরা খিলাফত-কর্মীরা নৈরাশ্যের মধ্যে আলোর ছটা দেখিতে পাইলাম। পরম উৎসাহের মধ্যেই খিলাফত কমিটির কাজ শেষ হইল।

খিলাফতের কাজ শেষ হওয়ায় আমার কাজ শুরু হইল। শামসুদ্দিনের কাছে মনের কথা বলিলাম। তিনি আমাকে কিছু 'কোদাল কাম' করিবার পরামর্শ দিলেন। আমি 'কোদাল কাম' শুরু করিলাম। শামসুদ্দিনের কাগযে কিছু কিছু লেখা দিতে লাগিলাম। বংগীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কলেজ স্ট্রিটস্থ আফিসে যাতায়াত করিলাম। সমিতির সভাপতি ডাঃ শহীদুল্লাহ, সেক্রেটারি ভোলার কবি মোযাম্মেল হক, সমিতির সহকারী সম্পাদক মোযাফফর আহমদ (পরে কমরেড) ও কাজী নজরুল ইসলামের সাথে পরিচিত হইলাম। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মওলানা মনিরুজ্জামানের সাথে খিলাফত কমিটিতেই পরিচিত হইয়াছিলাম। মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব এই সময় কলিকাতায় থাকিয়া 'ছোলতান' নামক সাপ্তাহিক কাগজ চালাইতেন। আমি শামসুদ্দিনের পরামর্শে 'মোহাম্মদী'? ও 'ছোলতান' অফিসে যাতায়াত করিয়া আমার 'কোদাল কামের' পরিধি বাড়াইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে 'সভ্যতায় দ্বৈতশাসন' নামক আমার এক অতিদীর্ঘ দার্শনিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধ শামসুদ্দিনের কাগযে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রাথমিক 'কোদাল কাম', যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া সেবারের মত ময়মনসিংহ ফিরিয়া আসিলাম। পরে আরও কয়েকবার যাতায়াত করিলাম।

একবার ময়মনসিংহে ফিরিবার অন্য কারণ ঘটিয়াছিল। শুধু আমার নন সারা জিলার নেতা মৌঃ তৈয়বুদ্দিন আহমদ সাহেব সেবার আইন সভায় প্রার্থী হইয়াছিলেন।

তাঁর পক্ষে ক্যানভাস করা আমার কর্তব্য ছিল। ব্যক্তিগত বাধ্য-বাধকতা ছাড়াও রাজনৈতিক প্রশ্নও এতে জড়িত ছিল। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 'কাউন্সিল এন্ট্রি' প্রোগ্রাম পেশ করেন। কংগ্রেস তাঁর মত গ্রহণ না করায় ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতেই তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন। ডাঃ আনসারী হাকিম, আজমল খাঁ, বিঠলভাই প্যাটেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুযযামান ইসলামাবাদী, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেক নেতা দেশবন্ধুকে সমর্থন করেন। আমি নিজে দেশবন্ধুর এই মত পরিবর্তনকে মডারেট নীতি মনে করিয়া গোঁড়ার দিকে এই নীতির বিরোধী ছিলাম। কিন্তু দেশবন্ধুর সাম্প্রদায়িক উদার নীতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাহেতু এবং আমার জিলার নেতা তৈয়বুদ্দিন সাহেব দেশবন্ধুর সমর্থক হওয়ায় আমিও মোটামুটি এই নীতির সমর্থক হইলাম। তারপর মার্চ মাসেই আইন সভার নির্বাচনে তৈয়বুদ্দিন সাহেব স্বরাজ্য দলের টিকিটে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ায় আমার পক্ষে চিন্তা-ভাবনার আর কোনও পথ রইল না। নির্বাচনে তাঁকে সাহায্য করিবার জন্য আমি কলিকাতা ত্যাগ করিলাম।

দেশে ফিরিয়াই নির্বাচন যুদ্ধে আমি মাতিয়া উঠিলাম। কারণ তৈয়বুদ্দিন সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নন, স্বয়ং ধনবাড়িয়ার বিখ্যাত জমিদার নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী সাহেব। জমিদারের প্রতি আমার চিরকালের বিদ্বেষ,তার উপর ধনবাড়ির নবাব সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিশেষ কারণ ছিল। তাঁর প্রজা-পীড়নের নিত্য নতুন কাহিনী আমাদের কানে আসিত। উহাদের সত্যাসত্য বিচারের আমাদের সময় ছিল না। জমিদারের যুলুমের কাহিনী বিশ্বাস করিবার জন্য আমরা উন্মুখ হইয়াই থাকিতাম। এইবার তাঁকে নির্বাচনে হারাইয়া শোধ নিবার জন্য কাজে লাগিয়া গেলাম। আমার নিজের জন্মস্থান এই নির্বাচনী এলাকায় পড়ায় আমার কাজ বাড়িয়াও গেল, সহজও হইল। 'নবাব বাহাদুরের বাহাদুরি' এই শিরোনামায় জীবনের সর্বপ্রথম নির্বাচনী ইশ্‌তাহার লিখিলাম। সকলেই এক বাক্যে তারিফ করিলেন। নবাব বাহাদুরের আর রক্ষা নাই।

নির্বাচনে সত্য-সত্যই নবাব বাহাদুর হারিয়া গেলেন। বিপুল বিত্তশালী সরকার-সমর্থিত বড় লোকের গরিব জন-নেতার কাছে পরাজয় এতদঞ্চলে এই প্রথম। অতএব

আমার কলমের ঐ এক খোঁচাতেই এত বড় নবাব ভূলুণ্ঠিত হইলেন, একথা আমার বন্ধু-বান্ধব সবাই বলিলেন। আমিও বিশ্বাস করিলাম।

নির্বাচনে জিতিয়াই শামসুদ্দিনের নির্দেশমত কলিকাতায় ফিরিয়া গেলাম। আইন সভার বাজেট অধিবেশন উপলক্ষে তৈয়বুদ্দিন সাহেবও গেলেন। বলা আবশ্যক আমার ভাড়াটাও তিনিই দিলেন। শামসুদ্দিন আগেই আলাপ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবার যাওয়া মাত্রই 'ছোলতানে' ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরি হইয়া গেল। পরে এই বেতন চল্লিশ টাকায় বর্ধিত হইয়াছিল। 'ছোলতানে' যোগ দেওয়ায় আমি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের আরও সক্রিয় সমর্থক হইতে বাধ্য হইলাম। কারণ 'ছোলতানে'র মালিক মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব দেশবন্ধুর অনুরক্ত ও স্বরাজ্য দলের সমর্থক ছিলেন। আমাকেও কাজেই ঐ দলের সমর্থনে লিখিতে হইত।

২. দেশবন্ধুর বেংগল প্যাক্ট

এই সময় স্বরাজ্যদলের মোট বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ জন সদস্য ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম মেম্বর প্রায় সমান-সমান। নির্বাচিত মেম্বরদের মধ্যে এঁরাই ছিলেন মেজরিটি। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় সরকারী দফতরসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলির বেশির ভাগই ছিল 'রিযার্ভ'। তারা আইন সভার বিচার্য বিষয় ছিল না। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল ট্রান্সফার্ড। অর্থাৎ ওদের উপর ভোটাভুটি করা যাইত। দেশবন্ধুর দক্ষ নেতৃত্বে পার্লামেন্টারি স্ট্রাটেজি ও টেকটিক্সের দ্বারা এবং অসাধারণ বাগ্মীতার বলে স্বরাজ্য দল এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়া সরকারী দলকে অনেক নাকানি-চুবানি খাওয়াইলেন।

সার আব্দুর রহিম, মৌলভী আব্দুল করিম, মৌলভী মুজিবুর রহমান, মওলানা আকরম খাঁ ও মওলানা মনিরুযযামান ইসলামাবাদী প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত, মিঃ শরৎ চন্দ্র বসু, মিঃ জে. এম. দাশ গুপ্ত ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রভৃতি হিন্দু নেতার সহযোগিতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সময় (১৯২৩ এপ্রিল) ঐতিহাসিক 'বেংগল প্যাক্ট' নামক হিন্দু-মুসলিম চুক্তিনামা রচনা করেন। তিনি স্বরাজ্য পার্টি ও বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে দিয়া ঐ প্যাক্ট মনযুর করাইলেন। এই প্যাক্টে ব্যবস্থা করা হয় যে, সরকারী চাকুরিতে মুসলমানরা জন-সংখ্যানুপাতে চাকুরি পাইবে এবং যতদিন ঐ সংখ্যানুপাতে (তৎকালে শতকরা ৫৪)

না পৌছিবে ততদিন নূতন নিয়োগের শতকরা ৮০টি মুসলমানদেরে দেওয়া হইবে। সরকারী চাকুরি ছাড়াও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে, যথা কলিকাতা কর্পোরেশন সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডসমূহে, মুসলমানরা ঐ হারে চাকুরি পাইবে। প্যাক্টের বিরোধী হিন্দু নেতারা বলিতে লাগিলেন যে, দেশবন্ধু স্বরাজ্য দলে এবং কংগ্রেস কমিটিতে প্যাক্ট পাস করাইতে পারিলেও কংগ্রেসের প্রকাশ্য সম্মিলনীতে পারিবেন না। তাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রকাশ্য সম্মিলনীতে এই প্যাক্ট গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে এই সম্মিলনীর অধিবেশন আহবান করিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব এই প্রকাশ্য অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। এইসব কারণে দেশবন্ধু মুসলমানদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। আমি নীতিগতভাবে কংগ্রেসের 'নোচেঞ্জার' দলের সমর্থক হইয়াও শুধু এই কারণে দেশবন্ধুর একজন ভক্ত অনুরক্ত।

মওলানা ইসলামাবাদী সাহেবের 'ছোলতানে' সাব-এডিটরি নেওয়ার পর জানিতে পারি যে, মৌঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবও 'ছোলতানের' অংশীদার। মওলানা সাহেবই কলিকাতায় থাকিয়া 'ছোলতান' সম্পাদনা করিতেন। সিরাজী সাহেব সময়-সময় কলিকাতা আসিয়া ইসলামাবাদী সাহেবের মেহমান হইতেন। উভয়েই পুরামাত্রায় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষপাতী হইলেও সিরাজী সাহেব সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীর ব্যাপারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিতেছেন বলিয়া কলিকাতায় খবর আসে। সাম্প্রদায়িক হিন্দু কংগ্রেস-নেতারা ঐ প্যাক্টের দরুন দেশবন্ধুর বিরোধী। সিরাজগঞ্জের আঞ্জুমনী মুসলিম-নেতারা ঐতিহ্যগতভাবেই কংগ্রেস-বিরোধী। এই দুই দল মিলিয়া সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস সম্মিলনী ভন্ডুল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সিরাজী সাহেব এঁদের দলে যোগ দিয়াছেন। অথচ মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব দেশবন্ধুর ও সম্মিলনীর পুরা সমর্থক। তাঁরই নির্দেশ ও উৎসাহে আমি দেশবন্ধুর বেংগল প্যাকটের সমর্থক এবং দেশবন্ধু-বিরোধী কংগ্রেস নেতাদের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার নিন্দায় অনেকগুলি সম্পাদকীয় লিখিয়াছি। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মত ত্যাগী আজীবন-নির্যাতিত বাগ্মী নেতার তীব্র রসনা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শক্তিশালী লেখকের চাঁছাল কলম, 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মত বিপুল প্রচারিত দৈনিকের পৃষ্ঠা দিনরাত দেশবন্ধুর বিরুদ্ধ প্রচারণায় নিয়োজিত। তাঁদের মূলকথা এই যে, দেশবন্ধু বাংলাদেশ মুসলমানদের কাছে বেচিয়া দিয়াছেন। এঁদের সংঘবদ্ধ বিরুদ্ধতা ঠেলিয়া দেশবন্ধু কর্পোরেশনের সাধারণ

নির্বাচনে (১৯২৪ এপ্রিল) জয়ী হইয়াছেন। নিজে মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। জনপ্রিয় তরুণ মুসলিম নেতা শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে ডিপুটি মেয়র করিয়াছেন। সুভাষ বাবুকে চীফ একযিকিউটিভ অফিসার ও হাজী আবদুর রশিদ সাহেবকে ডিপুটি একযিকিউটিভ অফিসার করিয়াছেন এবং অনেক মুসলমান গ্র্যাজুয়েট এম. এ.-কে রাতারাতি কর্পোরেশনের মোটা বেতনের দায়িত্বপূর্ণ চাকুরি দিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের মত হিন্দু-প্রধান প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের পক্ষে রাতারাতি অত ভাল চাকুরি পাওয়া কল্পনারও অগোচর ছিল। কাজেই সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা দেশবন্ধু আয়োজিত সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স পন্ড করিবার চেষ্টা করিবে এটা স্বাভাবিক। আঞ্জুমনওয়ালারাও যা কিছু কংগ্রেসী সবটার অন্ধ বিরুদ্ধতা করিবে এটাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু সিরাজী সাহেবের মত স্বাধীনতাকামী কংগ্রেস সমর্থক সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা একাজ করিতেছেন কেন ইহা কলিকাতাস্থ নেতৃবৃন্দের কাছে একরূপ দুর্বোধ্য ছিল।

৩. সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স

তাই দেশবন্ধু ও মওলানা আকরম খাঁর কথামত মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব আমাকে সিরাজী সাহেবের নিকট পাঠান। কংগ্রেস সম্মিলনীর এক সপ্তাহ আগে এঁদের-দেওয়া রাহা খরচ লইয়া আমি সিরাজগঞ্জ গেলাম। বেংগল প্যাকটের মুদ্রিত শর্তাবলী, দেশবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতার অসংখ্য কপি, প্যাকটের সমর্থনে আমি 'ছোলতানে' যে সব সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম সেই সব সংখ্যার যত কপি পাওয়া গেল তার সব এবং 'ছোলতানের' সর্বশেষ সংখ্যার হাজার খানি কপির এক বিরাট বস্তা সংগে নিলাম। গিয়া উঠিলাম সিরাজী সাহেবের বাড়ি বাণীকুঞ্জে। সিরাজী সাহেব গরিব হইলেও মেহমানদারিতে তাঁর মেযাজ-মর্যি ছিল একদম বাদশাহী। তাছাড়া আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। আমাকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু চা-নাশতা খাওয়ার সময়েই বুঝিয়া ফেলিলাম, 'ছোলতানের' সাম্প্রতিক লেখাসমূহের জন্য তিনি আমার উপর বেশ খাপ্পা হইয়াছেন। গত দুই-তিন মাস তিনি কলিকাতা যান নাই। কাজেই তাঁর সর্বশেষ রাজনৈতিক মতামত আমার জানা ছিল না। কথাবার্তায় বুঝিলাম, তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক দূর আগাই গিয়াছেন। স্থানীয় 'নোচেঞ্জার' কংগ্রেসী ও আঞ্জুমনী নেতাদের সহায়তায় তিনি প্রকাশ্যভাবে অনেক কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন।

স্বভাবতঃই আমি খুব সাবধানে কথা বলিতে শুরু করিলাম। মেহমানদারিতে সিরাজী সাহেব পয়গম্বর সাহেবের অনুসরণ করিতেন। আমাকে ছাড়া তিনি খানা-পিনা ও নাশতা-পানি কিছুই খাইতেন না। তিনি অনেক সকালে উঠিলেও নাশতা খাইতে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেন। সকালে নাশতা খাইয়া আমি শহরে বাহির হইতাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিতাম, তিনি আমার জন্য ক্ষুধার্ত মুখে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি হাসি-মুখে বলিতেন ঃ আমারে উপাস রাইখা আমি খাঁটি সৈয়দ কিনা তাই পরীক্ষা করতেছ বুঝি?

বড় বেশি অন্যায় হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁর কাছে মাফ চাহিলাম। আমার মাফ চাওয়া অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বলিলেন ঃ আমি সৈয়দ কিনা শুধুমাত্র আমারে উপাস রাইখা তার পরীক্ষা হবে না। সৈয়দের হাত আগুনে পুড়ে না। পরীক্ষা করতে চাও আমি চুলা থনে জ্বলন্ত আংগার আইনা দিতেছি। তাই তুমি আমার হাতের তালুতে রাখ। যদি আমার হাতের তালুতে একটা ফোসকাও পড়ে তবে বুঝবা আমি সৈয়দের বাচ্চা নই। আমার দাবি ঝুটা।

এই কথাটা সিরাজী সাহেব আমাকে কতদিন বলিয়াছেন তার হিসাব নাই। আমাকে ছাড়া আরও অনেকের নিকট বলিয়াছেন শুনিয়াছি। তাঁরা কেউ এই ভাবে সিরাজী সাহেবের সৈয়দি পরীক্ষা করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু আমি করি নাই। আমি অন্যান্য বার হাসিয়া চুপ করিতাম। কিন্তু এবার যে কঠোর দায়িত্বের মিশন লইয়া আসিয়াছি তাতে চুপ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বলিলাম ঃ পরীক্ষায় আমার দরকার নাই। আপনার চেহারাই সাক্ষী দেয় আপনি খাঁটি সৈয়দ।

সিরাজী সাহেব তোষামোদকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করিতেন। তোষামোদীদিগকে দস্তুরমত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু খোদাকে ধন্যবাদ! আমার এই কথাটাকে তিনি তোষামোদ মনে করিলেন না।

এই ভাবে সিরাজী সাহেবের মন জয় করিয়া অবশেষে এক সময়ে কায়দা বুঝিয়া আমার কথাটা পাড়িলাম। কংগ্রেস সমর্থন-অসমর্থনের উর্ধ্বে বেংগল প্যাক্টটাকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আক্রমণ হইতে বাঁচানো যে সকল দল ও সকল মতের মুসলমানের কর্তব্য এই দিক হইতে আমি কথা চালাইলাম। মনে করিলাম সিরাজী সাহেবের কাছে এইটাই হইবে নির্ঘাত অমোঘ অব্যর্থ যুক্তি। কিন্তু আল্লাহ! সিরাজী

সাহেব যা বলিলেন তার অর্থ এই যে, দুইদিন বাদে যখন ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যই কায়েম হইয়া যাইতেছে, তখন ঐ ধরনের প্যাকটে মুসলমানদের কোনও লাভ ত নাই-ই বরঞ্চ লোকসান আছে। তিনি খুব আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে বলিলেন ঃ তিনি খাবে দেখিয়াছেন আগামী ছয় মাসের মধ্যে কাবুলের আমির ভারতবর্ষ দখল করিতেছেন। তিনি আবার স্মরণ করাইয়া দিলেন সৈয়দের স্বপ্ন মিথ্যা হইতে পারে না।

এই দিককার চেষ্টা আপাততঃ ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত কথা তুলিলাম। হিন্দু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যেভাবে চারদিকে হইতে দেশবন্ধুকে আক্রমণ করিতেছে তাতে তাঁকে রক্ষা করা মুসলমানদেরই কর্তব্য। কারণ মুসলমানদের জন্যই তিনি এই ভাবে অভিমন্যু সাজিয়াছেন। এই কথায় সিরাজী সাহেবকে খানিকটা নরম মনে হইল। কিন্তু যা বলিলেন তাতে নিরাশ হইলাম। তিনি বলিলেন ঃ দাশ সাহেব (তিনি কিছুতেই দেশবন্ধু বলিলেন না) তাঁর সাথে ওয়াদা খেলাফ করিয়াছেন। তাঁরই পরামর্শ মতে কাবুলে কংগ্রেসের শাখা খুলিতে দাশ সাহেব রাযী হইয়াছিলেন। কিন্তু লালা লাজপত রায়ের ধমকে সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া দাশ সাহেব সিরাজী সাহেবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এর পর দাশ সাহেবের উপর সিরাজী সাহেবের কোনও আস্থা থাকিতে পারে না।

আমার মনে পড়িল কিছুদিন আগে লালা লাজপত রায় কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া খবরের কাগযে এক বিবৃতি দিয়াছিলেন। তাতে লালাজী বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস কাবুলের আমিরের দ্বারা ভারতবর্ষ দখল করাইয়া ভারতে মুসিলম রাজত্ব কায়েম করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে । সিরাজী সাহেবের এই অভিযোগের মধ্যে আমি অকূলে কূল পাইলাম । আমি সিরাজী সাহেবকে বুঝাইলাম যে কাবুলে কংগ্রেস স্থাপন করায় বিলম্ব হইয়াছে বটে কিন্তু সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় নাই। যদি হইত তবে লালা লাজপত রায় কংগ্রেস বর্জন করিতেন না। বরঞ্চ লালাজীর কংগ্রেস ত্যাগে এটাই প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেস স্বমতে দৃঢ় আছে, দেশবন্ধুর প্রভাবেই এটা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং তিনি সিরাজী সাহেবের কাছে-দেওয়া ওয়াদা খেলাফ করেন নাই। তবু যদি সিরাজী সাহেবের সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে কলিকাতা গিয়া অথবা অন্ততঃ দেশবন্ধুর সিরাজগঞ্জ আগমনের সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করিয়া ব্যাপারটা পরিষ্কার করা উচিৎ। তার আগে সম্মিলনীতে বাধা দেওয়া সিরাজী সাহেবের ভাল দেখায় না। যে সিরাজী সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করিতে গিয়া দেশবন্ধু সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু নেতাদের

চক্ষুশূল হইয়াছেন তাঁকে এ ভাবে পরাজিত হইতে দিতে সিরাজী সাহেব পারেন না। আমার এই যুক্তি সিরাজী সাহেবের অন্তরে দাগ কাটিল।

সিরাজগঞ্জ সম্মিলনে দেশবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করিতে তিনি সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে সম্মিলনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিতেও রাযী হইলেন। উহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। কারণ আমি জানিতে পারিয়াছিলাম সিরাজী সাহেবের প্রকাশ্য ও সক্রিয় সহযোগিতা না পাইলে সাম্প্রদায়িক হিন্দুরাও আঞ্জুমনী মুসলমানরা কিছুই করিতে পারিবেন না। আমি এই মর্মে মওলানা ইসলামাবাদী সাহেবকে পত্র দিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া জবাব দিলেন এবং চার দিকে নযর রাখিবার জন্য আমাকে সম্মিলনী পর্যন্ত সিরাজগঞ্জে থাকিতে উপদেশ দিলেন।

শুধু আমার কথাতেই সিরাজী সাহেব মত পরিবর্তন করিয়াছেন এমন দাবি আমি করি না। কারণ ইতিমধ্যে বহু বড় বড় কংগ্রেস নেতা সিরাজী সাহেবের সহিত দেখা করেন। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান পাবনার জমিদার বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী ও করটিয়ার জমিদার জনাব ওয়াজেদ আলী খানপন্নী (চান মিয়া সাহেব) সিরাজী সাহেবের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন।

একদিন আগে হইতে দলে দলে ডেলিগেটরা আসিতে শুরু করিলেন। চান মিয়া সাহেব একদিন আগে হইতেই সিরাজগঞ্জে আসিয়া অভ্যর্থনা কমিটির আয়োজনের তদারক শুরু করিলেন। সিরাজী সাহেব নিরপেক্ষ হইয়া যাওয়ায় সম্মিলন-বিরোধী চক্রান্ত হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে বিপুল-উৎসাহ উদ্যমের মধ্যে বিরাট সাফল্যের সংগে সম্মিলনের অধিবেশন হইল। ডেলিগেটের সংখ্যাই ছিল পনর হাজারের মত। দর্শকের সংখ্যা ছিল তার অনেক গুণ। এত বড় জন-সমাবেশে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের ভাষণ, দেশবন্ধুর প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা, মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের সুলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ ও অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী এমন সজীবতা লাভ করিয়াছিল যে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে দেশবন্ধুর বেংগল প্যাক্ট গৃহীত হইয়া গেল।

দেশবন্ধুর অত সাধের বেংগল প্যাক্ট আজ ভাংগিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি হইয়াছে। দেশ আজ ভাগ হইয়াছে। দুই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশবন্ধুর প্রাণ-প্রিয় পরাধীন দেশবাসী আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক

হইয়াছে। সিরাজগঞ্জের বগল বাহিয়া যমুনা নদীর অনেক পানি গড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশবন্ধুর সেদিনকার মর্মস্পর্শী উদাত্ত আবাহন আমার কানে, এবং বোধ হয় আমার মত অনেক বাংগালীর কানে, আজো রনিয়া-রনিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে ঃ "হিন্দুরা যদি উদারতার দ্বারা মুসলমানের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য আসিবে না। হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য ব্যতীত আমাদের স্বরাজের দাবি চিরকাল কল্পনার বস্তুই থাকিয়া যাইবে।" দেশবন্ধুর কল্পিত হিন্দু-মুসলিম-ঐক্যের বাস্তব রূপ সম্পর্কে তিনি তাঁর সিরাজগঞ্জ-বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ঃ 'হিন্দু ও মুসলমান তাদের সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র সত্তা বিলোপ করিয়া একই সম্প্রদায়ে পরিণত হউক, আমার হিন্দু-মুসলিম-ঐক্যের রূপ তা নয়। ওরূপ সত্তা বিসর্জন কল্পনাতীত।" এই বাস্তব বুদ্ধির অভাবেই আজ দেশ ভাগ হইয়াছে। ইহারই অভাবে দেশভাগ হইয়াও শান্তি আসে নাই।

চৌথা অধ্যায়

প্রজা–সমিতি প্রতিষ্ঠা

১. সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নিতান্ত আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। বাংলার কপালে দুর্ভাগ্যের দিন শুরু হয়। ঐ সালের শেষ দিকে মুসলিম লীগের আলীগড় বৈঠকের সভাপতিরূপে সার আবদুর রহিম হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিন্দা করিয়া ভাষণ দেন। তাতে হিন্দু নেতাদের অনেকে এবং হিন্দু সংবাদ–পত্রসমূহ সাধারণভাবে সার আবদুর রহিমের উপর খুব চটিয়া যান। হিন্দুদের এই আবদুর রহিম–বিদ্বেষ এতদূর তীব্র হইয়া উঠে যে ১৯২৬ সালের গোঁড়ার দিকে লাট সাহেব যখন সার আবদুর রহিমকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন, তখন কোন হিন্দু নেতাই সার আবদুর রহিমের সহিত মন্ত্রিত্ব করিতে রাজী হন না। ফলে সার আবদুর রহিম পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সার আবদুর রহিমের স্থলে সার আবদুল করিম গযনবীর সাথে মন্ত্রিত্ব করিতে হিন্দু–নেতারা রাজী হন। তাতে সার আবদুল করিম গযনবী ও ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই ঘটনায় সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বাড়িয়া যায়। মুসলমানরা এই মন্ত্রিদ্বয়কে 'গজচক্র' মন্ত্রিত্ব বলিয়া অভিহিত করে। আমি এই সময় জনাব মৌলবী মুজিবুর রহমান সাহেবের সম্পাদিত 'দি মুসলমানের' সহকারী সম্পাদকতার কাজ করি। আমাদের কাগয–সহ সব কয়টি মুসলমান সাপ্তাহিক (মুসলমান–পরিচালিত কোনও দৈনিক তখন ছিল না) এক-যোগে 'গজচক্র'-মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে কলম চালাই। মুসলমান ছাত্ররা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। অল্প দিনেই গজচক্র মন্ত্রিদ্বয় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সার আবদুল করিম গযনবী মন্ত্রিত্ব হারাইয়া মসজিদের সামনে বাজনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এই সময় রাজরাজেশ্বরী মিছিলের বাজনা লইয়া কলিকাতায় তৎকালের বৃহত্তম সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়। উভয় পক্ষে এগার শত লোক হতাহত হয়। মসজিদের সামনে বাজনার দাবিতে বরিশালের জনপ্রিয় হিন্দু নেতা শ্রীযুক্ত সতীন সেন প্রসেশন করিতে যান। কুলকাঠি থানার পোনাবালিয়া গ্রামে পুলিশ–মুসলমানে সংঘর্ষ হয়। জিলা

ম্যাজিস্ট্রেট ব্র্যাণ্ডির নির্দেশে মুসলমানের উপর গুলি করা হয়। অনেক লোক হতাহত হয়। এতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে।

এই তিক্ত আবহাওয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছিল একমাত্র জিন্না-নেতৃত্বের মুসলিম লীগই। এটা কংগ্রেসেরও অন্যতম প্রধান কাজ হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কার্যতঃ কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলিম সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল অথচ শুধু হিন্দুদের পক্ষে কথা বলায়ও তাঁদের আপত্তি ছিল। ফলে তাঁদের হিন্দু-মুসলিম-ঐক্যর কথা কার্যতঃ অর্থহীন দার্শনিক আপ্তবাক্যে পর্যবসিত হইয়াছিল। সে অবস্থায় জিন্না-নেতৃত্বে মুসলিম লীগই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে বাস্তববাদী ছিল। রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ায় বৃটিশ সরকারের মোকাবেলায়ও মুসলিম লীগই ছিল কংগ্রেসের নিকটতম সহপথিক। ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন-দাবির কার্যকারিতা পরখের জন্য 'অল্ হোয়াইট' সাইমন কমিশন পাঠাইবার কথাও বিলাতি পার্লামেন্টে এই সময় উঠিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক তিক্ততার সুযোগে ইংরাজের খায়েরখাহ নাইট-নবাবরা জিন্না সাহেবকে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব হইতে অপসারণ করার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। পাঞ্জাবের সার মিয়া মোহাম্মদ শফী এই জিন্না-বিরোধী ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বাংলার সার আবদুর রহিম বাদে আর সব নাইট-নবাবরা তাতে যোগ দেন। এই পরিবেশে ১৯২৭ সালে কলিকাতা টাউন হলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন হয়। বরাবর কংগ্রেস ও লীগের বৈঠক একই সময়ে একই শহরে প্রায় একই প্যাণ্ডেলের নিচে হইত। ১৯১৬ সালের লাখনৌ প্যাকটের সময় হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। তবু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ও নাইট-নবাবদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় সাবধানতা হিসাবেই ১৯২৭ সালের মুসলিম লীগের বৈঠক ঐ সালের কংগ্রেস বৈঠকের সাথে মাদ্রাজে না করিয়া কলিকাতায় করা হয়। জিন্না সাহেবের অন্তরংগ বন্ধু ডাঃ আনসারী মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি। তবু মিঃ জিন্না মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিলেন। জিন্না-বিরোধী নাইট-নবাবরা লাহোরে এক প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ সম্মিলনীর আয়োজন করিলেন। সার মোহাম্মদ শফী তাতে সভাপতিত্ব করিলেন। বাংলার দু-চার জন নবাব-নাইট জনমত অগ্রাহ্য করিয়া একরূপ গোপনে লাহোর সম্মিলনীতে অংশ গ্রহণ করিলেন।

কলিকাতা টাউন হলে মুসলিম লীগ সম্মিলনী খুব ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠিত হইল। আমার নেতা ও মনিব মৌলবী মুজিবুর রহমান অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান।

ডাঃ আর. আহমদ সেক্রেটারি। চেয়ারম্যানের ইচ্ছা অনুসারে আমাকে অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি করা হইল। আমি জীবনের প্রথম এই নিখিল ভারতীয় কনফারেন্সের কাজ ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইলাম। মৌঃ মোহাম্মদ ইয়াকুব (পরে সার) এই সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন। সস্ত্রীক জিন্না সাহেব এই সম্মিলনীতে যোগ দেন। আমি মিসেস রতন বাই জিন্নাকে অত কাছে হইতে এই প্রথম ও শেষবারের মত দেখিতে পাই।

মিঃ জিন্না ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর ব্যক্তিগত বিরোধের সুযোগ লইয়া নাইট-নবাবরা অতঃপর মুসলিম লীগ কাউন্সিলে জিন্না সাহেবের উপর অনাস্থা দিবার চেষ্টা করেন। দিল্লীতে লীগ কাউন্সিলের সভা। মৌলবী মুজিবুর রহমান ও মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে বাংলার কাউন্সিলারগণ দলবদ্ধভাবে দিল্লী গেলাম জিন্না-নেতৃত্বকে নাইট-নাববদের হামলা হইতে বাঁচাইতে। বাংলার প্রতিনিধিরা আমরা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডাঃ আনসারীর মেহমান হই। ডাঃ আনসারীর যমুনা পারস্থ দরিয়াগঞ্জের সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য বাড়ি গোটাটাই আমাদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও ডাঃ সাহেবই করেন।

জিন্না-বিরোধী উপদলও খুব তোড়জোড় করে। দিল্লীর বিল্লিমারন রোডে এক বিশাল ভবনে কাউন্সিলের সভা শুরু হয়। কিন্তু ডাঃ আনসারীর উদ্যোগে নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় কাউন্সিল বৈঠকের আগেই জিন্না সাহেব ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর মধ্যকার বিরোধ মিটিয়া যায়। কাউন্সিল বৈঠকের শুরুতে উভয় নেতার মধ্যে কোলাকুলি হয়। আমরা হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়া তাঁদেরে অভিনন্দন জানাই। জিন্না-বিরোধীরা একদম চুপ মারিয়া যান। শান্তিপূর্ণভাবে কাউন্সিলের কাজ শেষ হয়। কাউন্সিল জিন্না-নেতৃত্বে আস্থা পুনরাবৃত্তি করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ মুসলিম দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে এবং 'অলহোয়াইট কমিশন' সম্পর্কে জিন্না সাহেবকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়া প্রস্তাব পাস করতঃ সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

তিনদিন সম্মিলনীর কাজ করিবার জন্য এবং জিন্না-বিরোধীদের একহাত দেখাইবার জন্য আমরা যারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম, একদিনে সভার কাজ শেষ হওয়ায় তারা বেকার হইলাম। আর কি করা যায়? জনাব মুজিবুর রহমানের খরচে ও নেতৃত্বে দিল্লী-আগ্রার দর্শনীয় জায়গা ও বস্তুসমূহ দেখিয়া জীবনের সাধ মিটাইলাম। অতঃপর আগ্রার বিশ্ববিখ্যাত সুরাহি প্রত্যেকে আধ ডজন করিয়া কিনিয়া কলিকাতা

ফিরিলাম। পথে আসিতে আসিতে সুরাহির সংখ্যা অর্ধেক হইয়া গেল। তাতেও দামের দিক দিয়া আমাদের যথেষ্ট মুনাফা থাকিল।

২. কংগ্রেসের ব্যর্থতা

পরের বছর (১৯২৮) ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন। ১৯২৭ সালের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডাঃ আনসারীর উদ্যোগে স্বায়ত্ত-শাসিত ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে নেহরু কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছিল তাতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানের জন্য নয়া ফরমূলা দেওয়া হইয়াছিল। এ রিপোর্টের রচয়িতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বয়ং কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। পক্ষান্তরে জিন্না সাহেবের পরম ভক্ত উদার মতাবলম্বী মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব (বর্তমান রাজা সাহেবের পিতা) মুসলিম লীগ সেশনের সভাপতি। কাজেই সকলেই আশা করিতেছিল এবার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমঝোতায় হিন্দু-মুসলিম-সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। সাইমন কমিশনের গঠন সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবও উভয় প্রতিষ্ঠানের সমঝোতার রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল।

বাংলায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হইতেছে। সুতরাং বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের এদিককার দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি। অতএব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনের তারিখের বেশ কিছুদিন আগে 'দি মুসলমান' অফিসে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক আলোচনা সভা হয়। হিন্দু পক্ষ হইতে মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, মিঃ জে. এম. দাশগুপ্ত, মিঃ জে. সি. গুপ্ত, ডাঃ ললিত চন্দ্র দাস, মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার ও আরও দু-একজন উপস্থিত হন। মুসলিম পক্ষে সার আবদুর রহিম, মৌঃ ফযলুল হক, মওলানা আযাদ, মৌঃ আবদুল করিম, মৌঃ আবুল কাসেম, মৌলবী মুজিবুর রহমান, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা ইসলামাবাদী এবং আরও কয়েকজন এই আলোচনায় শরিক হন। নেতাদের ফুট-ফরমায়েশ করিবার জন্য মৌঃ মুজিবুর রহমানের কথা-মত আমিও এই সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাই। দেশবন্ধুর বেংগল প্যাক্ট তখনও কাগমে-কলমে বাঁচিয়া আছে। কাজেই আলোচনা প্রধানতঃ এই প্যাকটের উপরেই চলিল। হিন্দু-মুসলিম-বিরোধ মীমাংসার সব আলোচনার ভাগ্যে যা হইয়াছে, এই আলোচনা বৈঠকের বরাতেরও অবিকল তাই হইল। কিন্তু এ বৈঠকে আমি সার

আবদুর রহিমের মুখে যে মূল্যবান একটি কথা শুনিয়াছিলাম প্রধানতঃ সেইটি লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই এই ঘটনার অবতারণা করিয়াছি। মুসলমানদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে নেতাদের বিভিন্ন যুক্তির উত্তরে ডাঃ বিধান রায় তাঁর স্বাভাবিক কাট-খোট্টা ভাষায় বলিলেন ঃ তা হলে মুসলমানদের কথা এই ঃ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে যাব না, কিন্তু চাকরিতে অংশ দাও।' পাল্টা জবাবে উস্তাদ সার আবদুর রহিম সংগে-সংগে উত্তর দিলেন ঃ তা হলে হিন্দুদের কথা এই ঃ 'চাকরিতে অংশ দিব না, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে আস।' সবাই হাসিয়া উঠিলেন। অতঃপর সার আবদুর রহিম সিরিয়াস হইয়া বলিলেন ঃ 'লুক হিয়ার ডাঃ রায়। ইউ ফরগেট দ্যাট ইউ হিন্দুয হ্যাভ গট অনলি ওয়ান এনিমি দি বৃটিশার্স টু ফাইট, হোয়ারআয উই মুসলিমস হ্যাভ গট টু ফাইট থ্রি এনিমিয ঃ দি বৃটিশার্স অনদি ফ্রন্ট, দি হিন্দুয অনদি রাইট এন্ড দি মোল্লায অনদি লেফট।' কথাটা আমি জীবনে ভুলিতে পারি নাই।

বরাবরের মতই এবারও হিন্দু-মুসলিম-সমস্যার সমাধান-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিরোধ আরও বাড়িয়া যায়। ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে দল নির্বিশেষে সব হিন্দু মেম্বররা জমিদার পক্ষে এবং দল-নির্বিশেষে সব মুসলিম মেম্বররা প্রজার পক্ষে ভোট দেন। আইনসভা স্পষ্টতঃ সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত হয়। পর বৎসর সুভাষ বাবুর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর বেংগল প্যাকেট বাতিল করা হয়। কি মুসলমানের স্বার্থের দিক দিয়া, কি প্রজার স্বার্থের দিক দিয়া, কোন দিক দিয়াই কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিয়া চলা আর সম্ভব থাকিল না।

৩. প্রজা-সমিতির জন্ম

আমরা মুসলমান কংগ্রেসীরা মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস বর্জন করিয়া নিখিল-বংগ প্রজা সমিতি গঠন করি (১৯২৯)। সার আবদুর রহিম এই সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ ইহার সেক্রেটারি হন। মৌঃ মুজিবুর রহমান, মৌঃ আবদুল করিম, মৌঃ ফযলুল হক, ডাঃ আবদুল্লা সুহরাওয়ার্দী, খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সি. আই. ই. ইহার ভাইস প্রেসিডেন্ট, মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ ও মৌঃ তমিযুদ্দিন খাঁ জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এইভাবে রাজনৈতিক মত-ও দল-নির্বিশেষ বাংলার সমস্ত হিন্দু নেতা জমিদারের পক্ষে কংগ্রেসে এবং সমস্ত মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা-সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইলেন। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া দেশপ্রিয় জে. এম. সেনগুপ্ত একদিন আফসোস করিয়াছিলেন ঃ "আজ

হইতে কংগ্রেস শুধু মুসলিম–বাংলার আস্থাই হারাইল না, প্রজাসাধারণের আস্থাও হারাইল।" মিঃ সেনগুপ্তের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে–অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল।

এই সময় আমি ওকালতি পাস করিয়া 'দি মুসলমানের' কাজ ছাড়িয়া ময়মনসিংহ জিলা কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করি। সংগে–সংগে নিখিল বংগ প্রজা–সমিতির ময়মনসিংহ শাখা গঠন করিবার কাজে হাত দেই। অল্পদিন মধ্যেই এ কাজে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করি। এ কাজে ময়মনসিংহ বারের মোখতার মৌঃ আবদুল হাকিম ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চন্দ্র বসু, কতোয়ালী থানার মওলানা আলতাফ হোসেন, কাতলাসেনের মৌলবী আবদুল করিম খাঁ, উকিল মৌঃ মোহাম্মদ কলম আলী, ত্রিশাল থানার মৌঃ ওয়ায়েযুদ্দিন, ঈশ্বরগঞ্জের মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ বোকাই নগরী, ফুলপুরের মৌঃ মুজিবুর রহমান খাঁ ফুলপুরী ও মওলানা আবদুর রহমান, নান্দাইল থানার মওলানা বোরহান উদ্দীন কামালপুরী ও মৌঃ আবদুর রশিদ খাঁ, জামালপুরের মৌঃ তৈয়ব আলী উকিল ও মৌঃ গিয়াসুদ্দিন আহমদ, টাংগাইলের উকিল মৌঃ খোন্দকার আবদুস সামাদ, মোখতার মৌঃ খোদা বখশ ও মৌঃ নিযামুদ্দিন আহমদ, নেত্রকোনার উকিল মৌঃ আবদুর রহিম ও মৌঃ আবদুস সামাদ তালুকদার, কিশোরগঞ্জের মৌঃ আফতাবুদ্দিন আহমদ, মৌঃ মোহাম্মদ ইসরাইল উকিল ও মৌঃ আবু আহমদের সহায়তার কথা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁদের নিঃস্বার্থ কঠোর পরিশ্রমে অল্পকাল মধ্যেই ময়মনসিংহ প্রজা–সমিতি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রজা আন্দোলন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের আকারে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। পরবর্তীকালে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌঃ আবদুল মজিদ ও ধনবাড়ির জমিদার নবাবযাদা সৈয়দ হাসান আলী প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন। তাতে ময়মনসিংহ প্রজা সমিতির শক্তি ও মর্যাদা বাড়িয়া যায়। এই দুই জনের অর্থ সাহায্যে প্রজা–সমিতির নিজস্ব ছাপাখানা কিনিয়া 'চাষী' নামে প্রজা আন্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্র বাহির করি।

সাহিত্যিক হিসাবে জিলার সরকারী–বেসরকারী উভয় মহলে আমার একটা বিশেষ স্নেহ–প্রীতির স্থান ছিল । কাজেই আমি ময়মনসিংহে ওকালতি শুরু করার সাথে–সাথেই সকল দলের মুসলমান নেতারা আমাকে আপন করিয়া লইলেন। শহরের যাঁরা মুরুব্বি তাঁদের সকলের কাছেই আমি পরিচিত। বছর পনর আগে স্কুলের ছাত্র হিসাবে সভা–সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া এবং প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুনাম অর্জন ও

মুরুব্বিদের স্নেহ-ভালবাসা লাভ করিয়াছিলাম। এঁরাই সকলে মিলিয়া আমাকে এমন এক সম্মানের স্থানে বসাইলেন যেখানে বসিবার আমার কোন যোগ্যতা ছিল না, অভিজ্ঞতা ও বয়সের দিকে হইতেও না, মতবাদের দিক হইতেও না। এই পদটি ছিল আঞ্জুমনে-ইসলামিয়ার সহকারী সভাপতির পদ। করটিয়ার স্বনামধন্য জমিদার ওয়াজেদ আলী খানপন্নী (চান মিয়া সাহেব) আঞ্জুমনের সভাপতি। কিন্তু তিনি থাকেন কলিকাতা। কোনদিন আঞ্জুমনের সভায় আসেন না। দুইজন সহসভাপতি ঃ একজন সার এ. কে. গযনবী ; আরেক জন জিলার সর্বজনমান্য প্রবীণ নেতা খান বাহাদুর ইসমাইল। আমি যখন ময়মনসিংহ বারে যোগ দেই সেই বছরই সার এ. কে. গযনবী বাংলার লাটের একযিকিউটিভ কাউন্সিলার নিযুক্ত হন। নিয়মানুসারে তিনি আঞ্জুমনের সহ সভাপতিত্বে ইস্তাফা দেন। তাঁরই স্থলে আমাকে সর্বসম্মতিক্রমে সহসভাপতি নির্বাচন করা হয়—আমার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা-তুল্য শ্রদ্ধেয় মৌঃ শাহাবুদ্দিন আহমদ আঞ্জুমনের সেক্রেটারি। আঞ্জুমনের অপর ভাইস প্রেসিডেন্ট খান বাহাদুর ইসমাইল সাহেব পাবলিক প্রসিকিউটর ও জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান আঞ্জুমনের সভায় উপস্থিত হওয়ারও আলোচনায় যোগ দেওয়ার সময় তাঁর খুবই কম। কাজেই আমাকেই কার্যতঃ আঞ্জুমনের প্রেসিডেন্টের কাজ করিতে হইত। আমার বয়সে অনেক বড় ও ওকালতিতে অনেক সিনিয়র মৌঃ তৈয়বুদ্দিন খান সাহেব (পরে খান বাহাদুর), শরফুদ্দিন খান সাহেব (পরে খান বাহাদুর) নূরুল আমিন, আবদুল মোনেম খাঁ, গিয়াসুদ্দিন পাঠান, মৌঃ মোঃ ছমেদ আলী প্রভৃতি অনেক যোগ্যতার ও মান্যগণ্য ব্যক্তি থাকিতেও আমাকে যে এই সম্মান দেওয়া হইয়াছিল তার একমাত্র কারণ ছিল আমার প্রতি মুরুব্বিদের স্নেহ।

৪. মুসলিম-সংহতি ও প্রজা-সংহতির বিরোধ

কিন্তু এই স্নেহ বেশিদিন আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। আঞ্জুমনের কাজ ছাড়া আরও দুইটা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করিতাম। আমি ছিলাম জিলা প্রজা-সমিতির সেক্রেটারি এবং জিলা কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আঞ্জুমনের মধ্যে অনেক মুসলিম জমিদার থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মেম্বরই প্রজা এবং সেই হিসাবে প্রজা আন্দোলনের মোটামুটি সমর্থক। কিন্তু সকলেই একবাক্যে কংগ্রেসের বিরোধী। প্রজা আন্দোলনের জনপ্রিয়তা দেখিয়া বেশ কিছু-সংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী প্রজা সমিতির সমর্থক হইলেন। প্রজা সমিতির সংগঠন উপলক্ষে আমি একটি কর্মী সম্মিলনী ডাকিলাম। আঞ্জুমনের

সদস্যগণ আমাকে মুসলিম কর্মী সম্মিলনী ডাকিতে পরামর্শ দিলেন। আমি তাঁদেরে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, আমার ডাকে কার্যতঃ শুধু মুসলমান কর্মীরাই আসিবেন। প্রজা সমিতি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহাতে প্রধানতঃ মুসলমানরাই আছে। শুধু-শুধি সাম্প্রদায়িক সম্মিলনী ডাকার দরকার নাই। তাতে নাহক প্রজা সমিতিকে এবং প্রজা আন্দোলনকেও সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হইবে। আঞ্জুমনীরা আমার এই যুক্তি মানিলেন না। বরঞ্চ তাঁরা বলিলেন, প্রজাদের অধিকাংশই যখন মুসলমান, হিন্দুরা যখন প্রজা আন্দোলনে আসেই না, তখন নামে আর অসাম্প্রদায়িক প্রজা সমিতির দরকার কি? সোজাসুজি মুসলিম সম্মিলনী ডাকিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

দৃশ্যতঃ তাঁদের কথাও সত্য। আমার ডাকা কর্মী সম্মিলনীতে মুসলমানরাই আসিবেন, হিন্দু কর্মীরা দূর হইতে মৌখিক সহানুভূতি দেখাইবেন। এ সমস্তই সত্য কথা। কিন্তু প্রজা সমিতির ও প্রজা আন্দোলনের আদর্শ-গত অসাম্প্রদায়িক রূপ আমরা নষ্ট করিতে পারি না। নিখিল-বংগ প্রজা-সমিতির অফিস-বিয়ারার সব মুসলমান হইলেও ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক জে. এল. বানার্জী, মিঃ অতুল গুপ্ত প্রভৃতি বড়-বড় হিন্দু মনীষী প্রজাদের দাবি-দাওয়া সমর্থন করিতেছিলেন। অবশ্য এ জিলার কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে শুধু মুসলমানরাই প্রজা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়াছেন। হিন্দু কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁরা জমিদারি-বিরোধী তাঁরা প্রজা-সমিতিতে যোগ না দিয়া কৃষক-সমিতি, কিষাণ সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। বাংলার প্রজা আন্দোলনকে এঁদের অনেকেই জোতদার আন্দোলন বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। নিছক কথা হিসাবে ওঁদের অভিযোগে অনেকখানি সত্য ছিল। কিন্তু আমার মতে ওঁদের ও-মত ছিল তৎকালের জন্য আল্ট্রা লেফটিযম। তৎকালীন কমিউনিস্ট ভাষায় শিশু-সুলভ বাম পন্থা (ইনফেনটাইল লেফটিযম)। ঐ আল্ট্রা-লেফটিযম প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে জমিদারি-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করিত পারিত। আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল যে জমিদার-সমর্থক কোনও কোনও কংগ্রেস-নেতা ঐ উদ্দেশ্যেই ঐ আল্ট্রা-লেফটিযমে উস্কানি দিতেন। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে তৎকালীন প্রজা-আন্দোলনই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে যুগোপযোগী গণআন্দোলন। এ বিষয়ে তৎকালীন দক্ষিণ ভারতীয় কৃষক আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক রংগও আমাদের সহিত একমত ছিলেন। বাংলার কৃষক সমিতি ও কিষাণ সভার সাথে আমাদের প্রজা-সমিতির পার্থক্যের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তিনি আমাদের পথকেই

ঠিক পথ বলিয়াছিলেন। এই জন্যই আমি বামপন্থীদের চাপ এড়াইয়া প্রজা–আন্দোলনই চালাইতেছিলাম। ফলে আমার জিলার প্রজা–সমিতি চেহারা–ছবিতে একমত মুসলিম প্রতিষ্ঠান হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল। এই দিক হইতে আমার আঞ্জুমনী বন্ধুদের কথাই ঠিক।

কিন্তু এর অন্য একটা দিকও ছিল। দেশের অর্থনৈতিক গণ–আন্দোলন হিসাবে ইহার অসাম্প্রদায়িক শ্রেণীরূপ বজায় রাখাও ছিল আবশ্যক। যতই অল্প–সংখ্যক হোক এ জিলার দু'চারজন অকংগ্রেসী হিন্দু ভদ্রলোক প্রজা–আন্দোলনের গোড়া সমর্থক ও বিশ্বস্ত অনুগত সক্রিয় মেম্বর ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রবীণ মোখতার শ্রীযুক্ত প্রমথ চন্দ্র বসু এবং উকিল শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দেবনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া দেশবিখ্যাত কতিপয় হিন্দু চিন্তাবিদ প্রজা–আন্দোলনের প্রকাশ্য সমর্থক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, মিঃ অতুল চন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক জে. এল. বানার্জী ও অধ্যাপক বিনয় সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাই আমি আঞ্জুমনী বন্ধুদের চাপে টলিলাম না। কাজেই তাঁরাও আমার সম্মিলনীর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে হয় সম্মিলনী পরিত্যাগ করিতে হয় অথবা আঞ্জুমনের সহ–সভাপতিত্ব ছাড়িতে হয়। আঞ্জুমনের প্রতি আদর্শগত কোনও আকর্ষণ আমার ছিল না। শহরের মুরুব্বি ও বন্ধু–বান্ধবরা আদর করিয়া একটা সম্মান দিয়াছিলেন। তাই নিয়াছিলাম। আজ তাঁরা সেটা ফেরত চাইলেন। আমি ফেরত দিলাম।

আঞ্জুমনীরা আমার কর্মী–সম্মিলনীর একই দিনে টাউন হলে এক মুসলিম সম্মিলনী আহ্বান করিলেন। আমি মনে করিলাম, ভাল কথা। ওঁদের সম্মিলনীতে যদি মফস্বল হইতে লোক আসে তবে সেখানেও প্রজাদের দাবিতে প্রস্তাব পাস হইবে। ফলে দুই সম্মিলনীই কার্যতঃ প্রজা–সম্মিলনী হইবে। কিন্তু আঞ্জুমানীরা তাঁদের সম্মিলনীকে সফল করার চেয়ে আমার সম্মিলনী ভাংগার দিকে অধিক মনোযোগ দিলেন। প্রথমে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়া ১৪৪ ধারা জারির চেষ্টা করিলেন। আমার সম্মিলনীর তারিখ বহুদিন আগে ঘোষিত হইয়াছে, আমি এই আপত্তি করায় জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন না। কিন্তু আঞ্জুমনীরা আমাকে কয়েদ করিয়া গুণ্ডামির দ্বারা আমাদের সম্মিলনী ভাংগিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সব

করিতে গিয়া তাঁরা সম্মিলনীকে কার্যতঃ অনেকখানি কংগ্রেসী কর্মী–সম্মিলন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলে কোনও সম্মিলনী না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে খবরের কাগযে বাহির হইল ঃ সাফল্যের সাথে সম্মিলনীর কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সম্মিলনী পণ্ড করিবার যে সব চেষ্টা করিয়াছিল সে সবই ব্যর্থ হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ময়মনসিংহ জিলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ঘটিয়াছে ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে কোন–কোন মুসলিম কাগযে খবর ছাপা হইল ঃ কংগ্রেসীদের সম্মিলনী ব্যর্থ হইয়াছে। মুসলিম জনতা সম্মিলনীর প্যাণ্ডাল দখল করিয়াছে। সেই প্যাণ্ডালেই কংগ্রেস–বিরোধী প্রস্তাব পাস হইয়াছে এবং মুসলমানদের দাবি–দাওয়ার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

আমি মনে–মনে হাসিলাম। বুঝিলাম এ ধরনের কাগযী আন্দোলন করিয়া কোনও লাভ হইবে না। প্রজা–সমিতিকে সত্য–সত্যই প্রজাদের প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলার কাজে মন দিলাম।

পাঁচই অধ্যায়

ময়মনসিংহে সংগঠন

১. বিচিত্র সাম্প্রদায়িকতা

অতঃপর আমি শহর ফেলিয়া মফস্বলের দিকে মনোযোগ দিলাম। বস্তুতঃ বাধ্য হইয়াই আমি তা করিয়াছিলাম। মুসলিম শিক্ষিত সমাজ সাধারণভাবেই এই সময়ে কংগ্রেস-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী, এমনকি দেশের স্বাধীনতা-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিশ-বত্রিশ জন মুসলমান উকিলের মধ্যে জনাতিনেক, পঞ্চাশ জন মোখতারের মধ্যে জন চারেক, শতাধিক মুসলিম ব্যবসায়ীর মধ্যে দু-এক জন ছাড়া আর সবাই কংগ্রেস ও হিন্দুদের নামে চটা। অসাম্প্রদায়িক কথা তাঁরা শুনিতেই রাযী না।

অথচ এঁদের অধিকাংশের সম্প্রদায়-প্রীতি ছিল নিতান্তই অদ্ভুত। এঁরা মুখে-মুখে এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে হিন্দু ও কংগ্রেসের নাম শুনিতে পারিতেন না। কিন্তু ওকালতি ও মোখতারি ব্যবসায়ের বেলা হিন্দু সিনিয়র উকিল-মোখতারদেরেই কেস দিতেন এবং তাঁদের চেম্বারেই দেন-দরবারে কাল কাটাইতেন। কাপড়-চোপড় কিনিবার সময় এঁরা একমাত্র মুসলিম দোকান 'মৌলবীর দোকান' বাদ দিয়া 'বংগলক্ষ্মী' 'আর্য ভাণ্ডার' প্রভৃতি হিন্দুর দোকান হইতে খরিদ করিতেন। হেতু জিগগাসা করিলে বলিতেন, ' মৌলবীর দোকানে' দাম অন্ততঃ টাকায় দু'পয়সা বেশি নেয়। পক্ষান্তরে আমরা তথাকথিত 'হিন্দুর দালাল' কংগ্রেসী মুসলমানরা খদ্দর কিনিবার সময়ও মুসলমানের কোনও খদ্দরের দোকান আছে কিনা খোঁজ লইতাম এবং 'মৌলবীর দোকান' ও অন্যান্য মুসলমান ব্যবসায়ীদেরে দোকানে খদ্দর রাখিবার পরামর্শ দিতাম।

এই সময় বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি সার আঃ রহিম সেক্রেটারি মৌঃ মুজিবুর রহমান। কাজেই মুসলমানদের বিশেষ আকর্ষণ স্বরূপ আমি ঐ মুসলিম লীগের জিলা শাখা প্রতিষ্ঠা করিলাম। আমি নিজে নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট হইয়া প্রবীণ উকিল মৌঃ আবদুস সোবহানকে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মৌঃ মুজিবুর রহমান খাঁ ফুলপুরীকে উহার সেক্রেটারি করিলাম। কিন্তু ঐ মুসলিম-স্বার্থবাদী সাম্প্রদায়িক

মুসলমান উকিল-মোখতারেরা মুসলিম লীগেও যোগ দিলেন না। কারণ তাঁদের মতে স্বয়ং জিন্না সাহেবও ছদ্ম-কংগ্রেসী। সুতরাং মুসলিম লীগ আসলে কংগ্রেসেরই শাখা মাত্র। তাঁদের মতে আঞ্জুমনে-ইসলামিয়াই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সরকারের সমর্থনই মুসলমানদের একমাত্র পলিসি। ইংরাজরা না থাকিলে মুসলমানদের রক্ষা নাই।

মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মনোভাবের মধ্যে কোনও যুক্তি ছিল না সত্য, কিন্তু ভণ্ডামিও ছিল না। আন্তরিকভাবেই তাঁরা বিশ্বাস করিতেন, ইংরাজের অবর্তমানে হিন্দু মেজরিটি শাসনে মুসলমানদের দুর্দশার চরম হইবে। জনৈক প্রবীণ খান সাহেব আমাকে বলিতেন ঃ হিন্দুদের কাছে মুসলমান-প্রতিভারও কদর নাই। এই ধরুন না আমরা আপনাকে আঞ্জুমনের শীর্ষস্থানে বসাইয়াছিলাম। আর কংগ্রেস আপনাকে তিন নম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট করিয়া রাখিয়াছে। কোনও দিন আপনেরে ওরা প্রেসিডেন্ট করিবে না' কথাটা নিতান্ত চাছা-ছোলা ক্রুড এবং মাপকাঠিটা নিতান্ত স্থূল হইলেও কথাটার তলদেশে অনেক সত্য লুক্কায়িত ছিল। উহাই বাস্তব সত্য। কারণ বাস্তব জীবনে ঐ মাপিকাঠি দিয়াই সব জিনিসের বিচার হয়। অবস্থাগতিকে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তৎকালীন বিচারের মাপকাঠি ছিল উহাই। সম্ভবতঃ মধ্যবিত্তের বিচারের মাপকাঠি চিরকালই তাই।

২. কংগ্রেসের জমিদার-প্রীতি

পক্ষান্তরে কংগ্রেস কার্যতঃ ও নীতিতঃ প্রজা আন্দোলনের বিরোধী ছিল। ১৯২৮ সালের প্রজা-স্বত্ব আইনের বেলা কংগ্রেসী মেম্বররা যে একযোগে প্রজার স্বার্থের বিরুদ্ধে জমিদার-স্বার্থের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, ওটা কোন এক্সিডেন্ট বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। কংগ্রেস নেতারা প্রজা আন্দোলনকে শ্রেণী-সংগ্রাম বলিতেন। শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে আত্মকলহ ও বিভেদ সৃষ্টি করিলে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাহত হইবে। এটাই ছিল তাঁদের যুক্তি। কিন্তু এ জিলার ব্যাপারে দেখা গেল, এটা তাঁদের মৌখিক যুক্তিমাত্র। ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস-নেতৃত্বের উপর জমিদারদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বোম্বাই মাদ্রাজ যুক্ত প্রদেশ ও বিহার কংগ্রেস ঐ ঐ ঐ প্রদেশের কৃষকদের স্বার্থ লইয়া সংগ্রাম করিতেছে, এই সব যুক্তি দিয়াও আমি এ জিলার কংগ্রেস-নেতাদেরে টলাইতে পারিলাম না। লাভের মধ্যে আমি কংগ্রেসীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও সমর্থন হারাইলাম। তাঁদের যুক্তির মধ্যে প্রজা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁদের আসল মনোভাবটা ধরা পড়িত। তাঁরা প্রজা-আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিতেন এবং যুক্তিতে বোম্বাই-বিহারের কৃষক আন্দোলন হইতে

ময়মনসিংহ তথা বাংলার প্রজা-আন্দোলনের পার্থক্য দেখাইতেন। বাংলার জমিদাররা প্রধানতঃ হিন্দু এবং প্রজারা প্রধানতঃ মুসলমান। জমিদারিতে যা মহাজনি ব্যাপারেও তাই। মহাজনরা প্রধানতঃ হিন্দু এবং খাতকরা প্রধানতঃ মুসলমান। সুতরাং এঁদের হিসাবে, এবং কার্যতঃ সত্যই, প্রজা আন্দোলন ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আন্দোলন।

কংগ্রেসীরা শুধু প্রজা-আন্দোলনে সমর্থন দিলেন না, তা নয়। তাঁরা কৌশলে ইহার বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন। কিছু-সংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী দিয়া তাঁরা একটা কৃষক সমিতি খাড়া করিলেন। সেই সমিতির পক্ষ হইতে প্রচার চলিল যে প্রজা-আন্দোলন আসলে জোতদারদের আন্দোলন। ঐ আন্দোলনে কৃষকদের কোন লাভ ত হইবেই না, বরঞ্চ কৃষকদের দুর্দশা আরও বাড়িবে। জোতদারদের শক্তি ও অত্যাচার দ্বিগুণ হইবে। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা বর্গাদারদের দখলী স্বত্বের কথাও তুলিলেন। কংগ্রেসের সাথে প্রজা সমিতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়া গেল।

এ অবস্থায় কংগ্রেসের সাথে আমার সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের কথা। সে সংকল্পও একবার করিলাম। কিন্তু পারিলাম না। আমার প্রাদেশিক নেতা ও কেন্দ্রীয় প্রজা সমিতির সেক্রেটারি মওলানা আকরম খাঁ সাহেব সেই মুহূর্তে ছাড়িবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সহকারী সেক্রেটারি মোঃ নযির আহমদ চৌধুরী সাহেবের দ্বারা সমস্ত জিলা সমিতির সেক্রেটারিদের নামে কনফিডেনশিয়াল সারকুলার জারি করাইলেন ঃ পূর্ব বাংলার মুসলিম মেজরিটি জিলাসমূহের কংগ্রেস কমিটিগুলি মুসলমানদের দ্বারা ক্যাপচার করার চেষ্টা হওয়া উচিৎ। আমার নিজেরও মত ছিল তাই।

৩. সাংগঠনিক অসাধুতা

আমি তদনুসারে কাজে লাগিয়া গেলাম। এ ব্যাপারে এ জিলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় সর্বজনমান্য ঋষিতুল্য কংগ্রেস নেতা ডাঃ বিপিন বিহারী সেন আমাদেরে পূর্ণ সমর্থন দিলেন। তিনি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিলেন ঃ যে-জিলার শতকরা আশি জন অধিবাসী মুসলমান, সে জিলার কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতেই থাকা উচিৎ। মুসলমান ছাড়া এ জিলার কংগ্রেসকে তিনি 'রামহীন রামায়ণ' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। তাঁর ও তাঁর সমর্থকদের সহায়তায় আমরা পর-পর দুই বছর কংগ্রেস ক্যাপচার করিবার চেষ্টা করিলাম। দুইবারই ব্যর্থ হইলাম। ইতিহাসটি এইঃ যে বছরে আমরা এই প্রয়াস শুরু করি, সে বছর পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর এই জিলার কংগ্রেসের

প্রাইমারি মেম্বর-সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত হাজার। আমাদের দলের পক্ষে ভোট হইয়াছিল মাত্র আড়াই হাজার। আমরা মনে করিলাম, আগামী বছর আমরা প্রাইমারি মেম্বর করিব সাত দ্বিগুণে চৌদ্দ হাজার। দেখি, বেটারা আমাদেরে কেমনে হারায়! দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করিয়া পরের বছর মেম্বর করিলাম পনর হাজার। কিন্তু ফাইনাল ভোটার তালিকার সময় দেখিলাম, আমাদের পনরর মোকাবেলা অপর পক্ষ করিয়াছেন সাড়ে সতর হাজার। কাজেই সেবারও হারিয়া গেলাম। পরের বছর আমরা করিলাম বাইশ হাজার। কিন্তু ফাইনাল ভোটার তালিকায় তাঁদের হইল পঁচিশ।

কারণ এটা সাধু প্রতিযোগিতা ছিল না। কৌশলটা ছিল এই ঃ আমরা অপযিশন দলের পক্ষ হইতে প্রাইমারি মেম্বর তালিকা দাখিলের পরে 'পযিশন' দল তাঁদের মেম্বর তালিকা দাখিল করিতেন। নিজেরা পযিশনে থাকায় অর্থাৎ আফিস তাঁদের হাতে থাকায় রাতারাতি জাল মেম্বর তালিকাভুক্ত করিয়া নিজেদের পক্ষের তালিকা ভারি করা অতি সহজ ছিল। যে কোনও গণ-প্রতিষ্ঠানের অফিস-কর্তারা এটা করিতে পারেন। স্বাধীনতা লাভের পর লীগ কর্তারা আলাদা পার্টি না করিয়া মুসলিম লীগ দখল করার যে দাওয়াত দিতেন, সেটাও ছিল এইরূপ দাওয়াত। আমরা এ কৌশলের কথা জানিতাম বলিয়াই 'একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান' দখল করিয়া 'মসজিদ ত্যাগ না করিয়া ইমাম বদলাইবার' চেষ্টা করি নাই। কংগ্রেসের নির্বাচন এই ভাবে 'রিগ' করিবার অভিজ্ঞতা হইতেই তৎকালে সব দলের রাজনৈতিক নেতারা একমত হইয়া সকল প্রকার নির্বাচনে 'ইলেকশন ট্রাইবুন্যালের' ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। আমাদের বেলায় কিন্তু ইলেকশন ট্রাইবুন্যালেও কুলায় নাই। ময়মনসিংহ জিলায় ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আমরা প্রাদেশিক কংগ্রেসের কাছে নিরপেক্ষ ইলেকশন ট্রাইবুন্যালের তদন্ত দাবি করি। প্রাদেশিক কংগ্রেস সুদূর মাদ্রাজ হইতে নিরপেক্ষ মিঃ এ্যানিকে ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত করিয়া পাঠান। আমরা মিঃ এ্যানির কাছে জাল ভোটের অনেক সাক্ষ্য-সাবুদ দেই। কিন্তু আফিস-কর্তারা এমন নিখুঁতভাবে কাগয-পত্র 'মিছিল' করিয়া ফেলেন যে বিচারকের বিশেষ কিছু করিবার থাকে নাই।

এইভাবে কংগ্রেস ক্যাপচারের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রজাসংগঠনে লাগিয়া গেলাম। উপরোক্ত অবস্থাধীনেই আমি সংগঠনের মোড় শহর হইতে মফস্বলের দিকে ফিরাইলাম। উপরে যে সব নেতা আলেম ও বন্ধু-বান্ধবের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁদের সকলের ও প্রত্যেকের চেষ্টায় এ জিলার প্রজা-আন্দোলন দুর্বার ও প্রজা-সমিতি অসাধারণ শক্তিশালী হইয়া উঠে।

৪. খান বাহাদুর ইসমাইল

আরেকটা ব্যাপারে অবস্থা আমাদের অনুকূলে আসিল। আমাদের সাংগঠনিক মর্যাদাও বাড়িয়া গেল। এই সময় জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্র্যাহাম এ জিলার সর্বজনমান্য প্রবীণ নেতা খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবকে পাবলিক প্রসিকিউটরি ও জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানি হইতে সরাইয়া খান বাহাদুর সাহেবেরই অন্যতম শিষ্য শরফুদ্দিন আহমদ সাহেবকে পাবলিক প্রসিকিউটরি, চেয়ারম্যানি ও খান বাহাদুরির 'ট্রিপল ক্রাউন' পরাইয়া দেন। বিনা কারণে বহুকালের পদ-মর্যাদা হারাইবার ফলে খান বাহাদুর সাহেবের চিরজীবনের স্বপ্ন ভংগ হয়। এক কালের দোর্দণ্ড-প্রতাপ খান বাহাদুর সারা জিলার 'মুকুটহীন রাজা' হঠাৎ একদিন নিজেকে অসহায় সর্বহারা দেখিলেন। এত কালের শিষ্য-শাগরেদরা তাঁকে দুর্গা-প্রতিমার মতই বিসর্জন দিলেন। পারিষদবর্গের ভগ্নাবশেষ অতি অল্পসংখ্যক লোকই বিপদে আহাজারি এবং ইংরাজ জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে গালাগালি করিয়া শান্ত হইলেন। সান্ত্বনার কথা শুনিলেন তিনি আমার মুখে। আমি তাঁর গুণ, শক্তি ও জনপ্রিয়তার কথা বলিতাম। তিনি এ জিলার মুসলমানদের জন্য কি কি কাজ করিয়াছেন, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতাম। জনগণের প্রিয় নেতা সরকারী দরবার হইতে জনগণের মধ্যে নামিয়া আসায় তাঁকে আমি মোবারকবাদ দিতাম। তিনি যে অন্তরে বল ও সান্ত্বনা পাইতেন চোখে-মুখেই তা প্রকটিত হইত।

এইভাবে তিনি প্রথমে আমার এবং পরে প্রজা-সমিতির গোঁড়া সমর্থক হইয়া উঠেন। দুইদিন আগে যিনি আমাকে মুসলিম সমাজের দুশমন ও যে প্রজা-সমিতিকে ছদ্মবেশী কংগ্রেস মনে করিতেন সেই আমাদের তারিফে তিনি পঞ্চমুখ হইলেন। ইতিপূর্বে বাংলা সরকার মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্ট করিবার জন্য খান বাহাদুর আবদুল মোমিনের নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে এই কমিটি এ জিলায় তদন্তে আসিয়াছিলেন। তিনজন শিক্ষাবিদের মধ্যে বোধহয় কারো ভুলের দরুন আমাকেও সাক্ষী হিসাবে ডাকা হইয়াছিল। আমার যবানবন্দিতে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার দাবি করি ; কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করি, এবং সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-শিক্ষা প্রচলনের বিরোধিতা করি। ইহাতে মোমিন সাহেব আমার উপর চটিয়া যান। সেই দিন সন্ধ্যায় মুসলিম ইনিস্টিটিউটে খান বাহাদুর ইসমাইল সাহেবের সভাপতিত্বে এক অভ্যর্থনা সভায় মোমিন সাহেব কঠোর ভাষায় আমার নিন্দা করেন। আমাকে ঐ শহর হইতে বেত মারিয়া বাহির করিয়া দেওয়ার কথা হয়। জনৈক এডিশনাল এস. পি. ও ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি ঐ কাজের ভার নেন।

আমাকে বেত মারিয়া বাহির করা না হইলেও 'সমাজ আটক' করা হইয়াছিল। এই সময় এক মুসলমান জমিদার ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ায় আমারে দাওয়াত করিলে শহরের মুসলিম নেতারা ঐ ভদ্রলোককে আলটিমেটাম দিয়া আমার নামের দাওয়াতনামা প্রত্যাহার করাইয়াছিলেন।

খান বাহাদুর ইসমাইল সাহেব ছিলেন আদত মহৎ ও ভদ্রলোক। তিনি নিজেই এসব কথা তুলিতেন, আমার আপত্তি সত্ত্বেও বলিয়া যাইতেন। আমি তখন বলিতাম ঃ 'আজ আর ও-সব কথা তুলিবার দরকার নাই। অবস্থা-গতিকেই ওসব ঘটিয়াছিল।' জবাবে তিনি গম্ভীরভাবে বলিতেন ঃ 'তোমার জন্য দরকার নাই, আমার জন্যই দরকার। আমার একটা বিবেক আছে ত? তাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে না?' আমি বুঝিতাম ভদ্রলোকের ব্যথা কোথায়। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন ঃ 'তোমারে বেত মাইরা বাইর করবার আগে হতভাগা নিমকহারামেরা আমারেই লাথি মাইরা বাইর কৈরা দিছে।' পিতৃতুল্য এককালের শক্তিধরের বর্তমান মনোভাবকে অতি কৌশলে নাযুক হাতে হ্যাণ্ডল করিতে হইত। পারিতামও। করিয়াও ছিলাম। সরকারী পদ-মর্যাদার ভক্ত ছাড়াও খান বাহাদুর সাহেবের অনেক ব্যক্তিগত ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। খানবাহদুর সাহেব প্রজা-সমিতিতে যোগ দেওয়ায় এই সব লোক চোখ বুজিয়া প্রজা-সমিতির সমর্থক হইয়া উঠিলেন। অনেকে সক্রিয়ভাবে সমিতিতে যোগ দিলেন। এতদিন মফস্বলে প্রজা-সমিতির শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল। এইবার শহরে তা প্রসারিত হইল।

৫ পুলিশ সুপার টেইলার

ইতিমধ্যে (ডিসেম্বর, ১৯৩১) গোল-টেবিল-বৈঠক হইতে নিরাশ হইয়া মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিয়া আসামাত্র গ্রেফতার হইলেন। কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হইল (জানুয়ারি, ১৯৩২)। আমি তখনও কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ডাঃ সেন ও আমি আরও অল্প কয়েকজন ছাড়া এ জিলার কংগ্রেসের বড়-বড় নেতারা প্রায় সকলেই গ্রেফতার হইলেন। আমরা নিজেদের দলাদলি ভুলিয়া ডাঃ সেনের বাড়িতে সকল উপদলের কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা পরামর্শ-সভা করিলাম। ডাঃ সেন ও আমি শান্তি রক্ষার আবেদন করিলাম। প্রায় সকলেই একমত হইলাম। কেবলমাত্র দুইজন হিন্দু নেতা সক্রিয় আন্দোলনের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু অধিকাংশে বিরুদ্ধতায় তাঁদের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। পরদিন কোর্টে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এমন সময় একজন ডি. এস. পি. ও একজন ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া জানাইলেন, আমাকে তখনি এস· পি. সাহেব ডাকিয়াছেন। তাঁরা গাড়ি নিয়াই আসিয়াছিলেন।

আমি তাঁদের সাথে যাইতে বাধ্য হইলাম। বাড়িতে শোকের ছায়া পড়িল। বৈঠকখানায় অপেক্ষমান মওক্কেলদের মুখ কাল হইয়া গেল। সকলকে আশ্বাস দিয়া আমি কোর্টে যাওয়ার পোশাকেই এস. পি. সাহেবের কাছে রওয়ানা হইলাম। কি করিয়া জানি না কথাটা প্রচার হইয়া গিয়াছিল। বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম রাস্তার দুপাশে ভিড়। সকলে ধরিয়া লইয়াছিলেন, আমি গ্রেফতার হইয়াছি। অনেকেই রুমাল উড়াইয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

এস. পি. মিঃ টেইলার। বড় কড়া লোক বলিয়া মশহুর। আমাকে দেখিয়াই তিনি গর্জিয়া উঠিলেন। বুঝিলাম আগের দিনের সভার বিকৃত রিপোর্ট তাঁর কানে গিয়াছে। গর্জনের উত্তরে গর্জন করা আমার চিরকালের অভ্যাস। আমি তাই করিলাম। দু'চার মিনিটেই আশ্চর্য ফল হইল। টেইলার সাহেব নরম হইলেন। কাজেই আমিও হইলাম। টেবিলের উপর সিগারেটের একটা টিন একরূপ ভরাট ছিল। তিনি আমাকে সিগারেট অফার করিলেন। সিগারেট খাইতে-খাইতে কথা-বার্তা চলিল ঝাড়া পৌনে দুই ঘন্টা। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, দাবি-দাওয়া কার্য্যক্রম হইতে শুরু কলিয়া বিলাতের কনযার্ভেটিভ লিবারেল লেবার পার্টির পলিটিক্স্ সবই আলোচনা হইল। প্রজা সমিতি ও প্রজা-আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হইল। ফলে টেইলার সাহেব শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিলেন ভারতবাসীর স্বাধীনতা দাবি ও প্রজাদের আন্দোলন করার অধিকার আছে। তবে কংগ্রেসের বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ তিনি কঠোর হস্তে দমন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আমি তাঁকে বুঝাইলাম আমি এবং আমার মত অনেকেই এক দল কংগ্রেসীর হিংসাত্মক কর্ম-পন্থার ঘোরতর বিরোধী। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করারই আমরা পক্ষপাতী। তাছাড়া আমি মূলতঃ প্রজা-কর্মী। স্বাধীনতার দাবিতে আমি কংগ্রেসের সমর্থক এইমাত্র। কাজেই শেষ পর্যন্ত প্রজা-সমিতির ও প্রজা-আন্দোলনের খুঁটিনাটি ও শান্তি ভংগের কথাও উঠিল। বিভিন্ন স্থানে জমিদার-মহাজনের বাড়িতে অগ্নি-সংযোগ ও লুট-তরাযের তিনি দুই-একটা দৃষ্টান্তও দিলেন। আমি দেখাইলাম, ও ধরনের কার্যে প্রজা সমিতির কোনও সম্পর্ক নাই। বরঞ্চ আমি জমিদার ও মহাজনদের বে-আইনী যুলুমের বহু দৃষ্টান্ত দিলাম। ঐসব ক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য চাহিয়া যে বিপরীত ফল হইয়াছে, তারও প্রমান দিলাম। পৌনে দুই ঘন্টা আলাপে ভরা-টিনটার সবগুলি সিগারেট শেষ হইল। তিনি খালি টিনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন : 'আরেক টিন আনাইব কি?' আমিও তেমনি হাসিয়া জবাব দিলামঃ 'তা ত আনিতেই হইবে। বিড়ি-খোর কংগ্রেস-কর্মীকে বাড়িতে বন্দী করিয়া রাখিবার ইহাই শাস্তি।'

এই মোলাকাতের ফল আশাতিরিক্ত ভাল হইল। তিনি সরলভাবে স্বীকার করিলেন, আমার মত লোকের নেতৃত্বে প্রজা-সমিতি শক্তিশালী সংগঠন হইলে সন্ত্রাসবাদী কংগ্রেসীদের প্রভাব কমিয়া যাইবে। আমি বলিলাম, প্রজা-সমিতির কর্মী-নেতারা সভা-সমিতি করিতে গেলে পুলিশ তাঁদের পিছনে লাগে। তাতে জনসাধারণ ঘাবড়াইয়া যায়। প্রজাকর্মীদের কাজের খুব অসুবিধা হয়। এই অভিযোগের আশু প্রতিকারের তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং আমার নিকট হইতে বিশিষ্ট প্রজা-কর্মীদের নাম নিজ হাতে লিখিয়া নিলেন।'

অল্পদিন মধ্যেই ইহার সুফল পাওয়া গেল। প্রতি থানায় প্রজা-নেতাদের নামের তালিকা চলিয়া গেল। এস. পি. তাতে নির্দেশ জারি করিলেন ঃ তালিকায় লিখিত নেতাদের কেউ ঐ এলাকায় সভা-সমিতি করিতে গেলে তাঁদের কাজে কোনও ব্যাঘাত না হয়, থানা-অফিসারদের সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের দেশের পুলিশ অফিসারদের 'ডাকিয়া' আনিতে বলিলে 'ধরিয়া' আনেন, 'ধরিয়া' আনিতে বলিলে 'কান ধরিয়া' আনেন। তেমনি অপরদিকে বাধা না দিতে বলিলে একদম সহায়তা ও সমর্থন শুরু করেন। প্রজা-কর্মীদের বেলাও তাই হইল। আগে যেখানে পুলিশ তাঁদের কাজে বাধা দিতেন, ধমক দিতেন, এখন সেখানে তাঁরা সভার আয়োজনে সহযোগিতা করিতে ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ফলে কংগ্রেস-কর্মী ও নেতারা স্বভাবতঃই আমাকে ভুল বুঝিলেন এবং ঘরে বসিয়া কেউ কেউ ন্যায়তঃই আমার নিন্দাও করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিন্দায় বিচলিত হইলাম না। আমি ত আর ব্যক্তিগত স্বার্থে এটা করি নাই। সাধারণভাবে জিলার সর্বত্র পুলিশ যুলুম কমিয়া যাওয়ায় কংগ্রেস-কর্মীরাও পরে আমার উপর সন্তুষ্ট হইলেন। প্রজা-কর্মীরা পরম উৎসাহে কাজ করিতে লাগিলেন। প্রজা-সমিতির সুনাম ও প্রভাব দ্রুত বাড়িতে লাগিল। কিন্তু বেশিদিন আমরা এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিলাম না। ময়মনসিংহ হইতে টেইলার সাহেব ট্রান্সফার হওয়ার দরুনই হউক, আর সরকারী নীতি পরিবর্তনের দরুনই হউক, আবার কর্মীদের উপর যুলুম হইতে লাগিল। সভা-সমিতি ও সংগঠনের কাজ কঠিন হইল।

আমি অগত্যা অন্য পথ ধরিলাম। প্রজা-সমিতি নিয়মতান্ত্রিক প্রজা সংগঠন বলিয়া সরকার হইতে স্বীকৃতি পাইবার একদম সনাতনী চেষ্টা শুরু করিলাম। জমিদার ও প্রজা দেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার দুইটা পক্ষ। জমিদার সমিতিকে সরকার স্বীকৃতি দিয়াছেন ; প্রজা-সমিতিকে দিবেন না কেন? এই সব যুক্তিতর্ক দিয়া আমি সরকারের সহিত লেখালেখি শুরু করিলাম। কালে ভদ্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইতাম। তাতে শুধু বলা হইত ঃ বিষয়টা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। গবর্নর বা মন্ত্রীরা দেশ সফরে বাহির হইলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে অভিনন্দনপত্র দেওয়ার রেওয়াজ তৎকালেও

ছিল। ঐ সময় এ জিলার আঞ্জুমনে ইসলামিয়া, ল্যান্ড হোলডার্স এসোসিয়েশন, গৌড়ীয় মঠ, হরি সভা, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ঐ সব উপলক্ষে দাওয়াতনামা পাইত। অভিনন্দন-অভ্যর্থনা তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও প্রজা-সমিতি এইসব অনুষ্ঠানে দাওযাত পাইত না। কারণ সরকার এই সবকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিতেন। আঞ্জুমনে ইসলামিয়াও এই হিসাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। কারণ চাকুরিতে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিয়া আঞ্জুমনে প্রস্তাব গৃহীত হইত। তবু সরকার সমস্ত সরকারী অনুষ্ঠানেই আঞ্জুমনকে দাওয়াত দিতেন বোধ হয় এই জন্য যে, আঞ্জুমন কখনও সরকারী কাজের প্রতিবাদ করিত না।

৬. মন্ত্রি-অভিনন্দন

এই সময় সার আবদুল করিম গযনবী একযিকিউটিভ কাউন্সিলার হিসাবে এ জিলায় তশ্‌রিফ আনেন। জমিদার সভা ও আঞ্জুমন তাঁকে অভিনন্দন দেওয়ার আয়োজন করে। পাঁচ বছর আগে 'গজ চক্র' মন্ত্রী হিসাবে তাঁর নিন্দা করিয়াছিলাম, সে কথা ভুলিয়া আমি প্রজা-সমিতির তরফ হইতে তাঁকে অভিনন্দন-পত্র দিবার দাবি করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিনা-অনুমতিতে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া যায় না বলিয়া জিলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার পত্রখানা কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন। গযনবী সাহেব আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমার পত্রের জবাব আসিল না।

বছর খানেক পরে আমার চেষ্টা ফলবতী হইল। এই সময় নবাব কে. জি. এম. ফারুকী কৃষি ও সমবায় মন্ত্রী হন। আমি যখন 'দি মুসলমানের' সহ-সম্পাদক তখন হইতেই আমি ফারুকী সাহেবের সহিত পরিচিত। তাঁরই ময়মনসিংহ সফর উপলক্ষে আমি প্রজা-সমিতির তরফ হইতে তাঁকে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব করিয়া জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও নবাব ফারুকী উভয়ের কাছে পত্র দিলাম। আমার প্রার্থনা মনযুর হইল। আমি অভিনন্দন-পত্রের মুসাবিদায় বসিলাম।

তৎকালে অভিনন্দন-পত্রের এ্যাডভান্স কপি জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করার নিয়ম ছিল। তিনি সেজন্য আমাকে তাগিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি দিলাম না। কারণ তা দেখিলে আমাকে উহা পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইত না। আমি জানিতাম জিলা ম্যাজিস্ট্রেট যাই করুন অনারেবল মিনিস্টার আমার অভিনন্দন গ্রহণ করিবেনই।

যথাসময়ে শশী লজের বিশাল আংগিনায় সুরম্য সুসজ্জিত প্যাণ্ডালে মন্ত্রি-অভিনন্দনের কাজ শুরু হইল। আমি বিশিষ্ট প্রজা-নেতাদের সংগে লইয়া সভায় উপস্থিত হইলাম। বুনিয়াদী অভিনন্দন-দাতা হিসাবে আঞ্জুমনের দাবি অগ্রগণ্য।

আঞ্জুমনের অভিনন্দন পড়া শেষ হইলেই আমি দাঁড়াইলাম। আঞ্জুমন ও অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন-পত্র বরাবর ইংরাজীতে হইত। সেবারও তাই হইল। কিন্তু আমি বাংলায় অভিনন্দন-পত্র লিখিয়াছিলাম। সব অভিনন্দন পত্রেই মন্ত্রী মহোদয়ের এবং সরকারের দেদার প্রশংসা থাকিত। প্রজা-সমিতির অভিনন্দনে মন্ত্রী বা সরকারের তারিফের একটি কথাও থাকিল না। তার বদলে থাকিল জমিদার-মহাজনের অত্যাচার ও প্রজা-খাতকের দুরবস্থার করুণ কাহিনী। লিখিয়াছিলাম মনোযোগ দিয়া মর্ম-স্পর্শী ভাষায়। পড়িলামও প্রাণ ডালিয়া। পড়া শেষ হইলে এক মিনিট স্থায়ী করতালি-ধ্বনি এবং মারহাবা-মারহাবা আওয়াজ হইল। অভিনন্দনের বাঁধাই কপিটা মন্ত্রী মহোদয়ের হাতে দেওয়ার সময় তিনি আমার হাত ধরিয়া বেশ খানিকক্ষণ এমন জোরে ঝাঁকি দিতে লাগিলেন যে তাতেও আবার নূতন করিয়া করতালি-ধ্বনি হইল। আমি মঞ্চ হইতে নামা-মাত্র সুট-পরা একজন অফিসার আগ বাড়িয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেনঃ 'কি শুনাইলেন আজ! কান্না রুখতে পরি না।' দেখিলাম সত্যই ভদ্রলোকের দুই গাল বাইয়া পানি পড়িতেছে। এঁর হাত হইতে একরূপ ছিনাইয়া আরেক জন অফিসার আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপরে আরেকজন-আরেকজন এইভাবে চলিল। পরে জানিয়াছিলাম, প্রথমে যে ভদ্রলোক আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং যাঁর চোখে আমি আঁসু দেখিয়াছিলাম তিনি ছিলেন ইন্সপেক্টর অব রেজিস্ট্রেশন খান বাহাদুর ফযলুল কাদির এবং দ্বিতীয় জন ছিলেন কো-অপারেটিভ সহ-রেজিস্ট্রার (পরে রেজিস্ট্রার) খান বাহাদুর আরশাদ আলী। সভাশেষে আমি যখন শশী লজ হইতে বাহির হইয়া আসি, তখন বহুলোক আমাকে ঘেরিয়া মিছিল করিয়া বাহির হন। আমি যেন কোনও যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর সরকারী মহলে এবং আঞ্জুমন নেতাদের কাছে আমার কদর বাড়িয়া গেল। আজকালকার পাঠকরা হয়ত আস্তিনের আড়ালে হাসিতেছেন। কিন্তু মনে রাখিবেন ওটা ইংরাজের আমল। তৎকালে দেশে বিশেষতঃ মুসলিম সমাজে মানুষের মর্যাদা সরকারী স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির অনুপাতে উঠা-নামা করিত। অনারেবল মিনিস্টার আমার খাতির করায় পরদিন হইতে জিলা অফিসাররা আমাকে খাতির করিতে লাগিলেন। তাতে কোর্ট-আদালতেও আমার দাম বাড়িল। রাস্তা-ঘাটেও আদাব-সালাম বেশ পাইতে লাগিলাম। ফলে প্রজা-সমিতির শক্তি বাড়িল।

ছয়ই অধ্যায়

প্রজা-আন্দোলন দানা বাঁধিল

১. সিরাজগঞ্জ প্রজা-সম্মিলনী

ময়মনসিংহ জিলার সর্বত্র যখন প্রজা আন্দোলনের বিস্তৃতি সুনাম ও শক্তি ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, এমন সময় আরেকটি ঘটনায় প্রজা-সমিতির আরও শক্তি বৃদ্ধি পাইল। মওলানা আবুদল হামিদ খাঁ ভাসানী সাহেব এই সময় (১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে) সিরাজগঞ্জে এক প্রজা সম্মিলনী ডাকিলেন। মিঃ শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী সম্মিলনী উদ্বোধন করিলেন। খান বাহাদুর আবুদল মোমিন সভাপতি। এই সম্মিলনী নিখিল-বংগ প্রজা সমিতির উদ্যোগে হয় নাই। মওলানা ভাসানী নিজের দায়িত্বেই ডাকিয়াছিলেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ইহা একটি জিলা প্রজা সম্মিলনীতেই পর্যবসিত হইত। কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনায় এই সম্মিলনী সারা দেশীয় গুরুত্ব লাভ করিল। সিরাজগঞ্জের এস. ডি. ও. মওলানা ভাসানী ও সম্মিলিনীর অভ্যর্থনা সমিতির মেম্বরদের উপর ১৪৪ ধারা জারি করিলেন। শহীদ সাহেব ও মোমিন সাহেব এই লইয়া গবর্নরের সহিত দরবার করেন। শেষ পর্যন্ত গবর্নর এস.ডি.ও.র আদেশ বাতিল করান। এই ঘটনা খবরের কাগযে প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার প্রায় সকল জিলা হইতে প্রজা কর্মীরা বিনা-নিমন্ত্রণে এই সম্মিলনীতে ভাংগিয়া পড়েন। ময়মনসিংহ জিলার বহু কর্মী লইয়া আমিও এই সম্মিলনীতে যোগদান করি। গিয়া দেখি এলাহি কারখানা। সম্মিলনী ত নয়, একেবারে কুম্ভ মেলা। জনতাকে জনতা। লোকের মাথা লোকে খায়। হয়তবা লক্ষ লোকই হইবে। সদ্য-ধান-কাটা ধান ক্ষেতসমূহের সীমাহীন ব্যাপ্তি। যতদূর নযর যায় কেবল লোকের অরণ্য। এই বিশাল মাঠের মাঝখানে প্যাণ্ডেল করা হইয়াছে। প্যাণ্ডাল মানে একটা চারদিক খোলা মঞ্চ। উপরে একখানা শামিয়ানা। সেই বিশাল জনতার মাথায় সে শামিয়ানাটা যেন একটি টুপিও নয় টিকি মাত্র।

সম্মিলনীর কাজ শুরু হইবার অনেক দেরি ছিল। মনে হইল একবার ডেলিগেট ক্যাম্পটা ঘুরিয়া আসি। আমার জিলার সহকর্মী ডেলিগেটরা সেখানে ছিলেন। আমি নিজে আমার এক বন্ধুর অনুরোধে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে মেহমান হইয়াছিলাম। কাজেই

সহকর্মীদের তত্ত্ব-তালাশ লওয়া কর্তব্য। ডেলিগেট ক্যাম্পে গিয়া দেখিলাম, স্বয়ং মওলানা সাহেবই ডেলিগেটদের খোঁজ-খবর করিতেছেন। মওলানা ভাসানী সাহেবের সহিত এই আমার প্রথম পরিচয়। মওলানাকে ভাবিয়াছিলাম ইয়া বড় বুড়া পীর। দেখা পাইলাম একটি উৎসাহী যুবকের। আমার সময়বয়স্কই হইবেন নিশ্চয়। দাড়ি-মোচে একটু বেশি বয়সের দেখায় আর কি? আলাপ করিয়া খুশী হইলাম। হাসিখুশী মেযাজ। কর্ম চঞ্চল অস্থিরতার মধ্যেও একটা বুদ্ধির দীপ্তি ও ব্যক্তিত্ব দেখিতে পাইলাম।

যথা সময়ে সম্মিলনী শুরু হইল। সমবেত জনতার এক-চতুর্থাংশ লোক প্যান্ডালের চারিপাশ ঘেরিয়া বসিল । মঞ্চোপরি বসিয়া চারিদিক চাহিয়া অবাক হইলাম। জনতার তিন-চতুর্থাংশ লোক কচুরিপানার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাকী মাত্র এক-চতুর্থাংশ লোক সভায় বসিয়াছে। তবু সভার আকার এত বিশাল যে উহাদের সকলকে শুনাইয়া বক্তৃতা করিবার মত গলা অনেক নেতারই নাই। তখনও মাইকের প্রচলন হয় নাই। কাজেই তৎকালে সভার মাঝখানে প্যাণ্ডাল করিয়া যাত্রাগানের আসরের মত বক্তারা মঞ্চের উপরে চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তৎকালে মাইক ছাড়াই নেতারা বড়-বড় সভায় বক্তৃতা করিতেন এবং শ্রোতারা নীরবে কান পাতিয়া শুনিত। সুরেন্দ্র নাথ বানার্জী, বিপিন পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, অধ্যাপক জে. এল. বানার্জী, মৌলবী ফযলুল হক, মওলানা আযাদ, মওলানা আকরম খাঁ, মৌঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও কাফী, আমার শ্বশুর মওলানা আহমদ আলী আকালুবী, আমার চাচা শ্বশুর মওলানা বিলায়েত হোসেন প্রভৃতি নেতাদের গলা সানাইর মত স্পষ্ট ও বুলডগের গলার মত বুলন্দ ছিল। তরুণ নেতাদের মধ্যে শহীদ সাহেবের গলাও উপরোক্ত নেতাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল। কিন্তু টাইপ রাইটার আবিষ্কারের ফলে যেমন লোকের হাতে লেখা খারাপ হইয়াছে, মাইক আবিষ্কৃত হওয়ায় বক্তাদের গলাও তেমনি ছোট হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যা হোক সম্মিলনীর কাজ সাফল্যের সহিত সমাধা হইল। খান বাহাদুর মোমেনের ডিক্টেশনে আমার হাতের লেখা অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্মিলনীতে গৃহীত হইয়াছিল। ঐ সব প্রস্তাবের মধ্যে জমিদারি উচ্ছেদ, খাযনার নিরিখ হ্রাস, নযর সেলামি বাতিল, জমিদারের প্রিয়েমশনাধিকার রদ, মহাজনের সুদের হার নির্ধারণ, চক্র বৃদ্ধি সুদ বে-আইনী ঘোষণা, ইত্যাদি কৃষক-খাতকদের স্বার্থের মামুলি দাবিসমূহ ত

ছিলই। তার উপরে ছিল দুইটি নয়া প্রস্তাব। কয়েক মাস আগেই ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ড নামে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাহির হইয়াছিল । সকল দলের হিন্দুরা উহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কাজেই মুসলিম নেতারা মনে করিলেন, আমাদের এটা সমর্থন করা দরকার। অতএব রোয়েদাদের সমর্থনে প্রস্তাব পাস হইল। অপরটি ছিল কৃষি-খাতকদের ঋণ আদায়ের উপর মরেটরিয়ম প্রয়োগের দাবি। এটা ছিল মোমিন সাহেবের নিজস্ব কীর্তি। তাঁরই কাছে 'মরেটরিয়াম' শব্দটা প্রথম শিখি। তাঁরই উপদেশমত এই প্রস্তাবটিতে কৃষি-খাতক ঋণের উপর দস্তুরমত একটি থিসিস লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল বাংলার কৃষি-খাতকদের ঋণের বোঝার প্রায় সবটুকুই চক্রবৃদ্ধি, সুতরাং অন্যায়। উহা শোধ করার সাধ্য কৃষকদের নাই। মূলতঃ ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালে বংগীয় কৃষি-খাতক আইন পাস হইয়াছিল এবং ১৯৩৭ সালে সালিশী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল। এই দিকে সিরাজগঞ্জের এই কনফারেন্সের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে। এই সম্মিলনীর ফলে মওলানা ভাসানী, মোমেন সাহেব ও শহীদ সাহেবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা খুবই বাড়িয়া যায়।

২. সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ

ইতিমধ্যে ১৯৩২ আগস্ট মাসে ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাহির হয়। দলের মুসলিম নেতারা এর অভিনন্দন করেন। পক্ষান্তরে সকল দলের হিন্দু নেতারা ইহার তীব্র নিন্দা করেন। কংগ্রেস তখন বে-আইনী। কাজেই প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস কোনও মতামত দিতে না পারিলেও জেলের বাহিরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের নিন্দায় বিবৃতি দিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীও তখন জেলে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে তফসিলী হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী জেলের মধ্য হইতেই ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর মধ্যস্থতায় সকল শ্রেণীর হিন্দু নেতারা তফসিলী হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনে আপোস-রফা করেন। বৃটিশ সরকারও তৎক্ষণাৎ এই আপোস-রফা গ্রহণ করিয়া রোয়েদাদ সংশোধন করেন। এই ঘটনা হইতে আমরা ইহা আশা করিলাম যে মহাত্মাজী রোয়েদাদের মুসলিম অংশের তেমন তীব্র বিরোধিতা করিবেন না। এ আশায় আরও জোর বাঁধিল কয়েক দিনের মধ্যেই। পণ্ডিত নেহরুর অন্তরংগ বন্ধু কংগ্রেসের তরুণ নেতাদের অন্যতম মিঃ জয় প্রকাশ নারায়ণ কলিকাতার আলবার্ট

হলের এক সভায় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সমর্থন করিলেন এবং কংগ্রেসকে রোয়েদাদ মানিয়া লইবার অনুরোধ করিলেন। ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি কথা উঠিল ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচন হইবে। কংগ্রেসীরাও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন কানা ঘুষা শোনা গেল। কয়েক মাস আগে মহাত্মাজী হরিজন আন্দোলন শুরু করিলে তাঁকে গ্রেফতার করা হইল। তিনি আবার অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন। সরকার এবারও মহাত্মাজীকে মুক্তি দিলেন।

৩. রাঁচি কংগ্রেস সম্মিলনী

মুক্তি পাইলেও মহাত্মাজী আইন অমান্য আন্দোলন বা কংগ্রেসের কার্য্যকলাপে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিলেন না। কারণ কংগ্রেস তখনও বে-আইনী। এ অবস্থায় জেলের বাইরের কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে পরামর্শের সুবিধার জন্য মহাত্মাজীর সমর্থনে ডাঃ আনসারী, মিঃ রাজাগোপালাচারিয়া ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি রাঁচিতে একটি ইনফর্মাল এ. আই. সি. সি.-র সভা হয়, ময়মনসিংহের অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের সাথে আমিও এই সভায় যোগদান করি। কারণ আমরা জানিতে পারিলাম, এই সভার উদ্যোক্তারা চান যে কংগ্রেসের মুসলিম মেম্বররা যেন দলে দলে এই সভায় যোগদান করেন। আমি এই ইশারার অর্থ বুঝিলাম। কাজেই শত কাজ ফেলিয়া এই সভায় যোগ দিলাম।

রাঁচিতে গিয়া বুঝিলাম প্রধানতঃ ডাঃ আনসারীর উৎসাহেই এই সম্মিলনী সম্ভব হইয়াছে। ডাঃ আনসারী এই সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিবেন ইহা আগেই ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁর মত খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা রাঁচিতে মেহমান হইয়াছেন বিহারের শিক্ষামন্ত্রী সার সৈয়দ আবদুল আযিযের। মন্ত্রী মহোদয়ের উৎসাহ শুধু ডাঃ আনসারীর মেহমানদারিতেই সীমাবদ্ধ থাকিল না। সভায় সমবেত সমস্ত মুসলিম ডেলিগেটদের খাওয়ার ব্যবস্থার ভারও তিনিই নিয়াছেন। ফলে আমরা থাকিতাম যদিও করটিয়ার জমিদার জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চান মিয়া) সাহেবের রাঁচিস্থ প্রাসাদে, কিন্তু আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইল মন্ত্রী সাহেবের বাড়িতে। ইহার দুইটা মাত্র ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল। প্রথম, মন্ত্রী আবদুল আযিয সাহেব বাহিরে খামাখরা খেতাবধারী 'সার' হইলেও ভিতরে ভিতরে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক। দ্বিতীয়, ভারত সরকারের সম্মতিক্রমেই তিনি কংগ্রেস নেতাদের মেহমানদারি করিতেছেন। প্রথম ব্যাখ্যা সম্ভব মনে হইল না। কাজেই আমরা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই করিলাম। কংগ্রেস

আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া আইন সভায়, বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় আইন সভায়, আসিলে আইন অমান্য আন্দোলন কমজোর, এমনকি একেবারে পরিত্যক্ত, হইবে। কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে ফিরিয়া আসিবে। এই আশাতেই ভারত সরকার রাঁচি সম্মিলনীর সাফল্য চাইতেছেন। আমরা এই ব্যাখ্যাই করিলাম।

বাংলার ডেলিগেট হিন্দু মুসলিম সবাই আমরা চান মিয়া সাহেবের প্রাসাদে এক সংগে থাকিতাম। কাজেই সম্মিলনীর সময়টুকু ছাড়া অন্য সব সময়েই আমরা সাম্প্রদায়িক রোয়দাদের উপর বাহাস করিতাম। এই আলোচনার ফলে আমরা বুঝিলাম যে বাংলার হিন্দু নেতারাই রোয়েদাদের বিরুদ্ধে বেশি খাপ্পা ছিলেন। বোম্বাইর মিঃ কে. এফ. নরিম্যান মাদ্রাজের মিঃ এম. আর. মাসানী, মিঃ সত্যমূর্তি ও অধ্যাপক রংগ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই একটু আপোস মনোভাব দেখিতে পাইলাম। কিন্তু বাংগালী হিন্দুবন্ধুদের প্রায় সকলেই ছিলেন অনড়। আমাদের সাথে তর্ক করিতে করিতে অনেকে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। একাধিক দিন এতে অপ্রিয় ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর সাথে একবার ত আমার হাতাহাতির উপক্রম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমার মত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের লোকের কংগ্রেস ছাড়িয়া মুসলিম লীগে যাওয়া উচিৎ। জবাবে আমি বলিয়াছিলাম, তাঁর মত সাম্প্রদায়িক হিন্দুর কংগ্রেস ছাড়িয়া হিন্দু সভায় যোগ দেওয়া উচিৎ।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সম্মিলনী আরম্ভ হইলে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দৃঢ়তায় বাংলার হিন্দু প্রতিনিধিরা বেশ নরম হইয়া গেলেন। মহাত্মাজী সশরীরে সম্মিলনে যোগ দিলেন না বটে, তবে সকল কাজ ও প্রস্তাবাদি রচনা তাঁর সাথে পরামর্শ করিয়াই করা হইল। রাজাজী সভায় উপস্থিত থাকিয়া এবং প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া মহাত্মাজীর প্রতিনিধিত্ব করিলেন। শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই সম্মিলনীর কাজ শেষ হইল। আমাদের দিক হইতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব যা গৃহীত হইল, তা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে। দুইদিন তুমুল বাদ-বিতণ্ডার পরে কংগ্রেসের বিখ্যাত 'না গ্রহণ না বর্জন' প্রস্তাবটি এই সম্মিলনীতে গৃহীত হইল। এই সভার কার্য্য পরিচালনায় ডাঃ আনসারীর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধি দেখিয়া আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলাম। কংগ্রেস এই মধ্যপন্থী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া দেশকে একটা আসন্ন বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিল, এই সান্ত্বনা লইয়া আমি বাড়ি ফিরিলাম।

৪. নির্বাচনে প্রথম প্রয়াস

১৯৩৪ সালের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে প্রজাসমিতির সভাপতি সার আবদুর রহিম কলিকাতা হইতে এবং সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি মৌঃ এ. কে. ফযলুল হক বরিশাল-ফরিদপুর নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থী হইলেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী হইলেন সার আবদুল হালিম গযনবী। আমাদের জিলার সর্বসাধারণ এবং বিশেষতঃ প্রজা-কর্মীরা সার গযনবীর রাজনীতি পছন্দ করিতাম না—প্রজার স্বার্থের দিক হইতেও না, দেশের স্বার্থের দিক হইতেও না। কাজেই আমরা তাঁর বিপক্ষে দাঁড় করাইবার যোগ্য লোক তালাশ করিতেছিলাম। এমন সময় আমি হক সাহেবের একটি পত্র পাইলাম। তাতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, আমি যেন জিলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করিয়া গযনবীর বিরুদ্ধে একটি শক্ত ক্যানডিডেট দাঁড় করাই। ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিবার জন্য চিঠির উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন ঃ 'গযনবীকে কিছুতেই নির্বাচিত হইতে দেওয়া উচিৎ হইবে না। কারণ তিনি আসলে আহসান মনযিলের একটি শিখণ্ডীমাত্র। কখনও ভুলিও না যে আহসান মনযিলের সাথে আমার সংগ্রাম কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রাম নয়। এটা আসলে আহসান মনযিলের বিরুদ্ধে মুসলিম-বাংলার লড়াই। আহসান মনযিলের কবল হইতে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত মুসলিম বাংলার রক্ষা নাই।'

হক সাহেবের এই পত্র পাওয়ার পর আমাদের কর্তব্য বাড়িয়া গেল। আমরা আরও জোরে উপযুক্ত প্রার্থীর তালাশ করিতে লাগিলাম। দুই জিলা লইয়া নির্বাচনী এলাকা। যাকে-তাকে ত খাড়া করা যায় না। জিলার সর্বজনমান্য নেতা খান বাহাদুর মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব প্রায় বছর খানেক ধরিয়া প্রজাসমিতির সমর্থক। কাজেই তাঁকেই ধরিলাম। হক সাহেবের পত্র লইয়া তাঁর সাথে দেখা করিলাম এবং দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলাম। দুই জিলার বিশাল এলাকার দোহাই দিয়া তিনি অসম্মতি জানাইলেন। কিন্তু হক সাহেবের পত্র তিনিও পাইয়াছেন বলিয়া এ ব্যাপারে তিনি চেষ্টা করিবেন আশ্বাস দিলেন।

এমনি সময়ে খান বাহাদুর সাহেবের বাড়িতে একদিন নবাবযাদা সৈয়দ হাসান আলীর সাথে আমার দেখা। খান বাহাদুর সাহেব হাসি মুখে বলিলেন ঃ 'এই নেও তোমার ক্যানডিডেট।' তিনি নবাবযাদার সাথে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

নবাবযাদার চেহারা তাঁর বিনয়-নম্রতা ও ভদ্রতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। জমিদারদেরে সাধারণভাবে আমি ঘৃণা করিতাম। ধনবাড়ির নবাব সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে আমি শ্রদ্ধা করিতাম বটে কিন্তু জমিদার হিসাবে অপর সব জমিদারদের মতই তাঁর প্রতিও আমার বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। জন-শ্রুতিমতে ধনবাড়ির জমিদার ছিলেন অত্যাচারী জমিদারদের অন্যতম। নবাবযাদার সহিত আলাপ করিয়া এবং একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া বুঝিলাম জমিদারের ঘরেও জমিদারি-প্রথার বিরোধী প্রজা-হিতৈষী ভাল-মানুষ হওয়া সম্ভব। প্রজাসমিতির ও কংগ্রেসের সহকর্মীদের সাথে নবাবযাদার পরিচয় করাইয়া দিলাম।

নবাবযাদা হাসান আলীকে আমার খুব ভাল লাগিল। প্রজা-সমিতিতেও তাঁকে গ্রহণ করাইতেই হইবে। সেই উদ্দেশ্যে প্রজা-সমিতির ও কংগ্রেসের বন্ধুদের সাথে তাঁর পরিচয় করাইতে এবং প্রজা-কর্মীদের কাছে তাঁকে গ্রহণযোগ্য করিয়া চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। চেষ্টা আমার খুব বেশি করিতে হইল না। নবাবযাদা তাঁর স্বাভাবিক অমায়িক মিষ্টব্যবহারের দ্বারা ও জ্ঞান-বুদ্ধির গুণে নিজেই অধিকাংশের হৃদয় জয় ও প্রশংসা অর্জন করিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কড়া ও নিষ্ঠাবান নেতা-কর্মীদের কাছে আমার কিছু কিছু চেষ্টার দরকার হইল। তার কারণ নবাবযাদার মরহুম পিতা নবাব বাহাদুরের ঐতিহ্য ও স্মৃতি। কাজেই ঐ সব সহকর্মীর কাছে শুধু নবাবযাদার তারিফ করিলেই চলিত না। তাঁর মরহুম বাবার পক্ষে চূড়ান্ত কথা বলারও দরকার হইত। অত্যাচারী জমিদার হইয়াও ত মানুষ অন্যান্য গুণের অধিকারী হইতে পারেন। আমি নিজেই ব্যক্তিগত গুণের জন্য দু'চারজন জমিদারকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতাম এবং প্রজা-সহকর্মী বন্ধুদের সামনে অসংকোচে সে মনোভাব প্রকাশও করিতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগৎ কিশোরকে তাঁর অসামান্য দানশীলতার জন্য, পাবনার জমিদার প্রমথ চৌধুরীকে তাঁর সাহিত্যিক নয়া-নীতির জন্য, সন্তোষের জমিদার প্রমথ নাথ রায় চৌধুরীকে তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িক নাট্য-সাহিত্যের জন্য আমি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করিতাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের কথা তুলিলাম না। কারণ জমিদারিটা তাঁর আসল পরিচয় নয়।

ধনবাড়ির জমিদার নবাব বাহাদুরকেও তেমনি দুইটি ঘটনায় আমি অনেক নেতা সাহিত্যিকের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রশংসা করিতাম। অনেক সময় তাঁকে

লইয়া গর্বও করিতাম। কিন্তু প্রজা-আন্দোলন শুরু করিয়া এই দুইটি ঘটনাই বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। নবাবযাদার সাথে পরিচয় হওয়া এবং তার আনুসংগিক প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তা ভুলিয়াই ছিলাম। আজ দুইটা ঘটনাই মনে পড়িয়া গেল। বন্ধুরা তাজ্জব হইলেন। আমিও কম হইলাম না।

এই দুইটি ঘটনার প্রথমটি বাংলা ভাষা সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি খিলাফত আন্দোলন সম্পর্কে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে মুসলিম-বাংলার সকল নাইট নবাব ও খেতাব-ধারীরা এবং উচ্চ স্তরের সরকারী কর্মচারীরা, এমনকি মফস্বলের অনেক খান বাহাদুর খান সাহেবরা পর্যন্ত, সরকারী ইংগিতে সমস্বরে রায় দিয়াছিলেনঃ 'মুসলিম-বাংলার মাতৃভাষা বাংলা নয় উর্দু। তখন গরিব আলেম-ওলামা ও সাহিত্যিকদের সাথে গলা মিলাইয়া যে একজন মাত্র নবাব বলিয়াছিলেন ঃ ''আমাদের মাতৃ-ভাষা উর্দু নয় বাংলা।" তিনি ছিলেন ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সহকর্মীদের মত ঠেলিয়াই তিনি এই বিবৃতি দিয়াছিলেন। এটা তাঁর মত সরকার-পন্থী মডারেট রাজনীতিকের জন্য কত বড় দুঃসাহসিকতার কাজ ছিল, পঞ্চাশ বছর পরে আজ তা অনুমান করা সহজ নয়। কিন্তু মুসলিম-বাংলার জীবন-মরণ প্রশ্নে এই সাহস দেখান তিনি তাঁর কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও তেমিন দুঃসাহসিক ও মনোবলের পরিচায়ক। খিলাফত আন্দোলনে তখন দেশ ছাইয়া গিয়াছে। বৃটিশ ও ভারত সরকার মুসলমানদের এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। সারা ভারতবর্ষে একজন মাত্র সরকারী লোক খিলাফত সম্পর্কে যুক্তি-পূর্ণ সুলিখিত পুস্তিকা প্রচার করিয়া খিলাফত আন্দোলনের ন্যায্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ ও ভারত সরকারকে দমন-নীতি হইতে বিরত থাকিয়া মুসলিম ভারতের দাবি-মত খিলাফত প্রশ্ন মীমাংসার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ধনবাড়ির নবাব সাহেব।

যদিও দুইটাই অবিস্মরণীয় ঘটনা, তবু তা আমার মনে পড়িল এতদিনে। আমি বলিতেও লাগিলাম বন্ধুদেরে বিস্তারিতভাবেই। তাঁরা বিশ্বাস করিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এটাও তাঁরা বুঝিলেন, তথ্য যতই সত্য হোক, প্রয়োজন না হইলে তা কারও মনে পড়ে না আমারও না।

সকলে এক বাক্যে গযনবীর বিরুদ্ধে নবাবযাদাকে সমর্থন করিতে রাযী হইলেন। তিনি নমিনেশন পেপার ফাইল করিয়াছেন এবং খান বাহাদুর ইসমাইলসহ প্রজা-

সমিতির সকলে নবাবযাদাকে সমর্থন দিতেছেন শুনিয়া গযনবী সাহেব ঢাকার নবাব বাহাদুরসহ জমিদারদের এক বিরাট বাহিনী লইয়া ময়মনসিংহে আসিলেন। নবাবযাদাকে নমিনেশন প্রত্যাহার করিতে চাপ দিলেন। নবাবযাদা অল্পদিনেই আমার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি 'মনসুর সাব যা করেন, তাতেই আমি রাযী' বলিয়া সমস্ত চাপ আমার ঘাড়ে ফেলিলেন।

মাত্র দুইদিনের পরিচয়ে অভিজাত বংশের একটি তরুণ যুবক তাঁর রাজনৈতিক ভাগ্য আমার উপর ছাড়িয়া দেওয়ায় আমি যেমন মুগ্ধ ও গর্বিত হইলাম, তেমনি আমার দায়িত্বের গুরুত্বে চিন্তাযুক্তও হইলাম। সাধ্যমত আমার দায়িত্ব পালনও করিলাম। সমবেত নেতা ও মুরুব্বিদের-দেওয়া সনাতন সব যুক্তি যথা ঃ ইসলামের বিপদ, মুসলিম সংগতির আশু আবশ্যকতা, গযনবী সাহেবের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা, নবাবযাদার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ শুধু এইবার বাদে, ইত্যাদি সব যুক্তির চাপ কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম। কিন্তু একটা বিষয় আমাকে খুব চিন্তিত করিল। স্বয়ং নবাবযাদাও চিন্তামুক্ত ছিলেন না। সেটি এই যে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট অনুসারে নবাবযাদার বয়স তখন পঁচিশ হয় নাই। পঁচিশ না হইলে আইন পরিষদের নির্বাচন-প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা হয় না। গযনবী সাহেবের সমর্থকরা আমাদের পক্ষের এই গুপ্ত কথা জানিয়া ফেলিয়াছেন এটা কথা-বার্তায় স্পষ্ট বোঝা গেল। এই প্রশ্ন রিটার্নিং অফিসার ঢাকা বিভাগের কমিশনারের নিকট উঠিলে নবাবযাদার নমিনেশন পেপার স্ক্রুটিনিতেই বাতিল হইয়া যাইতে পারে। আমাদের নেতা হক সাহেব স্বয়ং এই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে পাশের কামরায় ডাকিয়া নিয়া নবাবযাদার উপস্থিতিতে এ বিষয়ে তাঁর লিগ্যাল অপিনিয়ন চাহিলাম। তিনিও সেই কথাই বলিলেন। নবাবযাদার নমিনেশন প্রত্যাহার করিয়া অত-অত মুরুব্বির অনুরোধ-উপরোধ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচিত হইল। একটা পুরা দিন ঘোরতর বাক-যুদ্ধ করিয়া তাই অবশেষে আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম। নবাবযাদাকে নমিনেশন প্রত্যাহারের উপদেশ দিলাম। যে হক সাহেবের বিশেষ নির্দেশে আমরা এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাঁরই উপস্থিতিতে এবং সম্মতিক্রমে এটা হইল বলিয়া আমাদের বিবেকও পরিষ্কার থাকিয়া গেল।

এইভাবে এ জিলায় প্রজা–সমিতির নির্বাচন–যুদ্ধে নামিবার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হইল। কিন্তু এতে দুইটা নেট লাভ হইল। এক, নবাবযাদার দৃঢ় চিত্ততা ও আমার উপর তাঁর নির্ভরশীলতা আমাকে মুগ্ধ করিল। অপরদিকে আমার সততা অধ্যবসায় নবাবযাদাকেও আমার প্রতি আরও আকৃষ্ট করিল। দুই, এই গযনবী–বিরোধিতায় এ জিলার সকল মতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে সংহতি স্থাপিত হইল পরবর্তী কয়েক বছর এই সংহতি প্রজা আন্দোলনকে এ জিলায় খুব জোরদার করিয়া তুলিল।

সাতই অধ্যায়

প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি

১. সমিতিতে অন্তর্বিরোধ

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের এই নির্বাচনে প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট সার আবদুর রহিম কলিকাতা হইতে নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে জিন্না সাহেবের ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টির সমর্থনে তিনি কংগ্রেসী প্রার্থী মিঃ শেরওয়ানীকে পরাজিত করিয়া আইন পরিষদের প্রেসিডেন্ট (স্পিকার) নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পরে তিনি কলিকাতা ফিরিয়া প্রজা সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকিয়া বলেন যে আইন পরিষদের স্পিকার হওয়ায় প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তিনি আর প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট থাকিতে পারেন না। তাঁর জায়গায় অন্য লোককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য তিনি আমাদেরে নির্দেশ দেন।

সার আবদুর রহিমের স্থলবর্তী নির্বাচন করা খুব কঠিন ছিল। তিনি ছিলেন সকল দলের আস্থাভাজন। তৎকালে প্রজা সমিতি বাংলার মুসলমানদের একরূপ সর্বদলীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী, সরকার-ঘেষা, সরকার-বিরোধী, সকল দলের মুসলমান রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর সমাবেশ ছিল এই প্রজা সমিতিতেই। এ অবস্থায় সার আবদুর রহিমের স্থলবর্তী নির্বাচনে ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে অতি সহজেই দুই দল হইয়া গেল। প্রজা সমিতির সেক্রেটারি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বে প্রবীণ প্রজা নেতাদের একদল খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সি. আই. ই.-কে সমিতির প্রেসিডেন্ট করিতে চাহিলেন। অপরদিকে আমরা তরুণরা জনাব মৌঃ এ. কে. ফযলুল হক সাহেবকে সভাপতি করিতে চাহিলাম। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়া গেল। কিন্তু প্রার্থীদ্বয়ের মধ্যে নয়—তাঁদের সমর্থকদের মধ্যে। ধুম ক্যানভাসিং শুরু হইল। সাধারণভাবে তরুণ দল, তথাকথিত প্রগতিবাদী দল, কংগ্রেসী ও কংগ্রেস সমর্থক দল হক সাহেবের পক্ষে। তেমনি সাধারণভাবে বুড়ার দল, খান সাহেব-খান বাহাদুর সাহেবরা সবাই মোমিন সাহেবের পক্ষে। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। উভয় পক্ষই বুঝিলাম শত্রুপক্ষ দুর্বল নয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষই বিদায়ী সভাপতি সার আবদুর রহিমকে সালিশ মানিলাম। সার আবদুর রহিম এই শর্তে সালিশ করিতে রাযী হইলেন : তিনি সিলমোহর করা ইনভেলাপে তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নাম লিখিয়া রাখিয়া দিল্লী চলিয়া যাইবেন। সেখান হইতে তাঁর টেলি পাইলে পর আমরা ইনভেলাপ

খুলিব এবং তাঁর রায় মানিয়া লইব। উভয় পক্ষই এই শর্তে রাযী হইলাম। কিন্তু সার আবদুর রহিম এর পর যে কয়দিন কলিকাতা থাকিবেন, ততদিন উভয় পক্ষই গোপনে এ–ওর অজ্ঞাতে যার–তার ক্যানডিডেটের পক্ষে সার আবদুর রহিমকে জোর ক্যানভাস করিলাম। সার আবদুর রহিম ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বড় একটা হাসিতেন না। তবু আমাদের কার্যকলাপে তিনি মনে–মনে নিশ্চিয়ই হাসিতে ছিলেন। সেটা বুঝিয়াছিলাম পরে।

যথাসময়ে সমিতির সিনিয়র ভাইস–প্রেসিডেন্ট মৌলবী আবদুল করিম সাহেবের ওয়েলেস লি স্কোয়ারস্থ বাড়িতে প্রজা সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিল। মৌঃ আবদুল করিম সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রকাশ্য সভায় কন্টাকদারের টেণ্ডার খুলিবার মত সমস্ত ফর্মালিটি সহকারে সার আবদুর রহিমের রোয়েদাদনামার সিলমোহর–করা ইনভেলাপ খোলা হইল। আমাদের সমস্ত আশা–ভরসা ও ধারণা–বিশ্বাস ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সার আবদুর রহিম খান বাহাদুর মোমিন সাহেবকেই সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন। মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের দল বিজয়োল্লাস হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমরা নিরাশ স্তম্ভিত ও অবশেষে ক্রুদ্ধ হইলাম। সভাপতি মৌলবী আবদুল করিম তাঁর স্বভাব–সুলভ শান্ত ও ধীরভাবে আমাদের রোয়েদাদ মানিয়া লইবার উপদেশ দিলেন, যদিও আমরা জানিতাম তিনি ব্যক্তিগতভাবে হক সাহেবের সমর্থক ছিলেন।

কিন্তু আমরা বিশ্বাস ভংগ করিলাম। উভয় পক্ষের মানিত সালিশের রোয়েদাদ মানিলাম না। আমরা সরল আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করিতাম প্রজা আন্দোলনের শক্তি প্রগতি ও সংগ্রামী ভূমিকার খাতিরেই হক সাহেবকে সভাপতি করা দরকার। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যাই থাক না কেন, সালিশ যখন মানিয়াছি তখন সালিশের রোয়েদাদও আমাদের মানা উচিৎ ছিল। রাজনৈতিক সাধুতার খাতিরে তাই ছিল আমাদের অবশ্য বর্তব্য। কিন্তু আমরা তা করিলাম না। বলিতে গেলে এই বিশ্বাসঘাতকতার নেতৃত্ব আমিই করিয়াছিলাম। আমি নূতন করিয়া যুক্তি খাড়া করিলাম ঃ কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতির পদ এমনভাবে সালিশির দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। এটা গণতন্ত্রের খেলাফ। সমিতির মেম্বরদিগকে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করার অধিকার কারও নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আমরা নির্বাচন দাবি করিলাম।

২. প্রজা সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশন

ইতিপূর্বেই স্থির হইয়াছিল প্রজা সম্মিলনীর আগামী বার্ষিক অধিবেশন ময়মনসিংহে হইবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনুকরণে এটা আগের বছরের

সম্মিলনীতেই ঠিক হইয়া থাকিত। আগের বছরের সম্মিলনী হইয়াছিল কুষ্টিয়ায়। আমরা সমিতির সভাপতি নির্বাচন লইয়া যখন ঐরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলাম তখন আগামী বার্ষিক সম্মিলনী আমাদের সামনে ছিল। কাজেই সে ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের মতে আগামী সম্মিলনীর সভাপতি হওয়া উচিৎ মোমিন সাহেবের। আমাদের মতে হওয়া উচিৎ হক সাহেবের। এ ব্যাপারেও মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের দলের দাবি অধিকতর ন্যায়-সংগত ছিল। গত সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন হক সাহেব। একজনকেই পর-পর দুই বছর সম্মিলনীর সভাপতির করা ঠিক হইবে না। আমরা মনে মনে স্বীকার করলাম মওলানা সাহেবের এই যুক্তি সারবান। রাযীও হয়ত হইতাম আমরা। কিন্তু সমিতির প্রেসিডেন্টগিরি লইয়া মতভেদ হওয়ায় আমরা সম্মিলনীর সভাপতিত্ব বিনা-শর্তে ছাড়িয়া দিতে সাহস করিলাম না। এ ব্যাপারে মওলানা সাহেবের সহিত কোনও আপোষ-রফা না হওয়ায় আমি অভ্যর্থনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ অধিবেশনে হক সাহেবকে সম্মিলনীর সভাপতি নির্বাচন করিলাম এবং সংবাদপত্রে ও হ্যাণ্ডবিলে তা প্রচার করিলাম। মওলানা সাহেব ন্যায়তঃই ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তৎকালে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সম্মিলনীর সভাপতি নির্বাচনের প্রথা চালু ছিল বটে কিন্তু কেন্দ্রীয় কোনও প্রতিষ্ঠান না থাকিলেই সেটা করা হইত নিখিল-বংগ প্রজা সমিতির মত প্রতিষ্ঠান থাকায় অভ্যর্থনা সমিতির সে অধিকার ছিল না। তবু জোর করিয়াই আমি তা করিয়া ফেলিলাম।

মওলানা আকরম খাঁ সাহেব স্বভাবতঃই এবং ন্যায়তঃই আমার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। নিখিল-বংগ প্রজা সমিতির সেক্রেটারি হিসাবে তিনি অন্যায়ভাবে সম্মিলনী অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা ঘোষণা করিলেন। এই মর্মে সমস্ত জিলা ও মহকুমা শাখায় টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। আমি অভ্যর্থনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে এই বে-আইনী স্থগিত অগ্রাহ্য করিলাম। দলে দলে প্রতিনিধিদের সম্মিলনীতে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়া প্রতি জিলায় ও মহকুমায় টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলাম।

মওলানা সাহেবের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বিরাট সাফল্যের সঙ্গে তিন দিনব্যাপী সম্মিলনী এবং এক মাসব্যাপী কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী হইল। প্রদর্শনীটা এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে নির্দিষ্ট এক মাস মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও আরও পনর দিন মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৩. সম্মিলনীর সাফল্যের হেতু

কেন্দ্রীয় কর্ম-কর্তাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ময়মনসিংহ প্রজা-সম্মিলনী সফল হইবার কারণ ছিল। তার প্রথম কারণ এই যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধতা যখন শুরু হয় তখন সম্মিলনীর আয়োজনের কাজ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণভাবে সারা বাংলায় এবং বিশেষভাবে ময়মনসিংহ জিলায় তৎকালে প্রজা-আন্দোলন জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। প্রজা-আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ছাড়া সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতিরও একটা নিজস্ব ক্ষমতা ও মর্যাদা ছিল। সম্মিলনীর সভাপতি হক সাহেব ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ও সমাগত নেতৃবৃন্দের সকলেরই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ছিল। বস্তুতঃ নিখিল বংগ প্রজা সম্মিলনীর ১৯৩৫ সালের ময়মনসিংহ অধিবেশনের মত সাফল্যমণ্ডিত প্রাদেশিক কোনও সম্মিলনী বাংলায় আর হয় নাই, একথা অনেকেই বলিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতিতে যেমন করিয়া সকল দলের ও সকল শ্রেণীর নেতৃ-সমাবেশ হইয়াছিল ময়মনসিংহ জিলায় তেমন আর হয় নাই। এই অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও আইনবিদ ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। এর তিনজন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন খান বাহাদুর মৌঃ ইসমাইল, ডাঃ বিপিন বিহারী সেন ও মিঃ সূর্য কুমার সোম এবং জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম আমি। কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন মিঃ নূরুল আমিন, প্যাণ্ডাল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন মৌঃ আবদুল মোনেম খাঁ, ফাইনান্স কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন মৌঃ মোহাম্মদ ছমেদ আলী, একোমোডেশন কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন মৌঃ তৈয়বুদ্দিন আহমদ, ভলান্টিয়ার কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন মৌঃ গিয়াসুদ্দিন পাঠান, ভলান্টিয়ার কোরের জি. ও. সি. ছিলেন মৌঃ মোয়াযযম হুসেন খাঁ। এতদ্ব্যতীত প্রজা সমিতি, কংগ্রেস ও আঞ্জুমন সকল প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্মীদের অনেকেই এই অভ্যর্থনা সমিতির বিভিন্ন দফতরে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়াছিলেন। ফলতঃ একমাত্র জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর শরফুদ্দিন আহমদ সাহেব ছাড়া এ শহরের সকল সম্প্রদায় ও দলের উল্লেখযোগ্য সকল নেতাই এই প্রজা সম্মিলনীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একযিবিশন কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে জনাব নূরুল আমিন এমন অসাধারণ কর্ম-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে তাঁর আয়োজিত প্রদর্শনী দেড় মাস কাল এই শহরকে এমনকি গোটা জিলাকে কর্ম-চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল। সরকারী-বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগতভাবে বহু শিল্পী কৃষক ও ব্যবসায়ী তাঁদের প্রদর্শনযোগ্য জিনিসপত্র লইয়া এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়াছিলেন। দৈনিক জনপ্রতি এক আনা করিয়া প্রবেশ ফি থাকা সত্ত্বেও দেড় মাস ধরিয়া এই প্রদর্শনীতে প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের ভিড় হইত। প্যান্ডাল কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে

মৌঃ আবদুল মোনেম খাঁ এমন মৌলিক পরিকল্পনা প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন যে তাঁর নির্মিত ও সজ্জিত প্যাণ্ডালের মত সুদৃশ্য সুউচ্চ বিশাল ও মনোরম প্যাণ্ডাল কংগ্রেসেরও কোন প্রাদেশিক সম্মিলনীতেও হয় নাই। সুউচ্চ জোড়া মিনারযুক্ত তিনটি বিশাল তোরণ দিয়া বিরাট প্যাণ্ডালে প্রবেশ করিতে হইত। প্যাণ্ডালের উপরে ঠিক মধ্যস্থলে ছিল শতাধিক ফুট উচ্চ এক সুডৌল বিশালকায় গুম্বয। সোনালী কাগযে-মোড়া এই গুম্বয বহুদূর হইতে দেখা যাইত। মনে হইত সত্যই কোনও সুউচ্চ মসজিদের সোনালী গুম্বয। এই গুম্বয এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে সম্মিলনী শেষ হইবার বহুদিন পর পর্যন্ত জনসাধারণের বিরুদ্ধতার দরুন প্যাণ্ডাল ভাংগা যায় নাই। যতদিন প্রদর্শনীর কাজ শেষ না হইয়াছিল, ততদিন প্রদর্শনী গ্রাউণ্ড ও প্যাণ্ডালের সবটুকু যায়গা সারা রাত আলোক-সজ্জিত থাকিত এবং রাত-দিন লোকের ভিড় থাকিত। বস্তুতঃ ময়মনসিংহ শহরের বড় বাজার ও ছোট বাজারের মধ্যবর্তী বর্তমান বিশাল ময়দানটি প্রজা সম্মিলনীর দৌলতেই আবাদ হইয়াছিল।

৪. মহারাজার বদান্যতা

এর আগে এই জায়গা নালা-ডুবা, বন-জংগল ও ময়লা-আবর্জনার স্তূপ ছিল। দিনের বেলায়ও এই জায়গায় কেউ প্রবেশ করিত না। এখানে প্রবেশ করিবার দৃশ্যতঃ কোন রাস্তাও ছিল না। সেজন্য এই শহরে কুড়ি বছর বাস করিয়াও এবং এই ময়দানের চার পাশের দোকান-পাটে কুড়ি বছর সওদা করিয়াও অনেকে জানিত না যে এই সব দোকানের পিছনেই একটা বিশাল এলাকা বন-জংগল ও ডুবা-নালায় ভরিয়া আছে। যদিও এখান হইতেই এ শহরের সমস্ত মশার উৎপত্তি হইত বলিয়া মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ জানিতেন, তবু এটা ভরাট ও পরিষ্কার করিবার অর্থনৈতিক দুঃসাহস কখনও করেন নাই। মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান কংগ্রেস-নেতা, আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজন এবং প্রজা-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সহ-সভাপতি ডাঃ বিপিন বিহারী সেনের সঙ্গে সম্মিলনীর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের কথা আলোচনা করি। সার্কিট হাউস ময়দান এ শহরের একমাত্র বড় খোলা স্থান। কিন্তু এটা সরকারী জমি। এখানে কোনও সভা-সম্মিলনী করিতে দেওয়া হয় না। কাজেই পাটগুদাম এলাকাই ছিল বড়-বড় সভা-সম্মিলনী করিবার একমাত্র স্থান। উহাদের মধ্যে একটা সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান নির্বাচনেই ডাঃ সেনের সহায়তা নিতে ছিলাম। তিনিই এই পরিত্যক্ত বন-বাদাড়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই উদ্দেশ্যে মহারাজা শশিকান্তের সঙ্গে দেখা করিলাম। মহারাজা শশিকান্ত উদারমনা রসিক পুরুষ ছিলেন। কিন্তু দুইটা ঘটনায় আমার উপর তাঁর রাগ থাকিবার কথা। একটা বেশ পুরান। প্রায় বছর খানেক আগের ঘটনা। একদিন মহারাজার জমিদারিতে

ফুলবাড়িয়া থানার জোরবাড়ি গ্রামে একটা প্রজা-সভা হইবার কথা। আমরা কয়েকজন সভাস্থলে গিয়াছি যোহরের নামাযের শেষ ওয়াকতে বেলা সাড়ে তিনটায়। একটি পতিত জমিতে সভার উদ্যোক্তারা ছোট একখানা শামিয়ানা খাটাইবার খুটি-খাটা গাড়িতে ছিলেন। অতি অল্প লোকই তখন সভায় আসিয়াছে। এমন সময় অদূরবর্তী জমিদার কাচারি হইতে একজন কর্মচারী দুইজন পুলিশসহ সভাস্থলে আসিয়া আমাদের জানাইলেন, স্থানটি মহারাজার খাস জমির অন্তর্ভুক্ত। ওখানে সভা হইতে দেওয়া হইবে না, এটাই মহারাজার হুকুম। সংগী পুলিশ দুইজন জমিদার কর্মচারির সমর্থন করিল। উদ্যোক্তারা আমার মত চাহিলেন। আমি শামিয়ানার খুটা-খাটি ও টেবিল-চেয়ার লইয়া তাঁদের নিজস্ব কোনও জমিতে যাইবার নির্দেশ দিলাম। সদ্য-ধান-কাটা একটি নিচু জমিতে সভার স্থান করা হইল। পুলিশ ও জমিদারের বাধাদানের খবরটা বিদ্যুৎবেগে গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে তৎকালে এই সভায় হাজার-বার শ'র বেশি লোক হইত না, সন্ধ্যার আগেই সেখানে পাঁচ ছয় হাজার লোকের সমাগম হইল। জনতার দাবিতে অনেক রাত-তক সভা চালাইতে হইল। ঐ সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া সেইদিনকার ঐ ঘটনা বর্ণনা করিয়া আমি বলিয়াছিলাম ঃ 'পল্লী গ্রামের পতিত জমিও মহারাজার নিজের এই দাবিতে তিনি আজ একটি মাঠে আপনারা তাঁরই প্রজা-সাধারণকে শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক একটা সভা করিতে দিলেন না। আমি মহারাজাকে হুঁশিয়ার করিয়া দিতে চাই, এই পন্থায় প্রজা-আন্দোলন রোধ করা যাইবে না। বরঞ্চ এতে প্রজা-আন্দোলন একদিন শক্তিশালী গণ-আন্দোলনে পরিণত হইবে। আমরা জমিদারি উচ্ছেদ করিয়া এ যুলুম একদিন বন্ধ করিবই। মহারাজার লোক কেউ এই সভায় থাকিয়া থাকিলে তিনি তাঁর কাছে এই কথা পৌঁছাইবেন যে আজ আমরা নিজেদের গ্রামে জমিদারের কাচারির নিকটে একটা সভা করিতে পারিলাম না, কিন্তু একদিন আসিবে, যেদিন আমরা মহারাজার রং মহল 'শশী লজ'কে আমাদের সন্তানদের পাঠশালা বানাইব। কথাটা মহারাজার কানে যথাসময়ে উঠিয়াছিল। তিনি আমার উপর খুব চটিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি সাম্প্রতিক। অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চাঁদা আদায়ে শহরে বাহির হইয়াছি। ডাঃ সেন ও সূর্যবাবুর পরামর্শে আমরা হিন্দু বড় লোকদের কাছে চাঁদার জন্য ত যাইতামই, জমিদারদের কাছেও যাইতাম। এ জিলার অন্যতম বড় জমিদার নবাবযাদা হাসান আলী তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজা-সমিতিতে যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের আন্দোলনে তাঁর সমর্থন আছে একথা তখন জানাজানি হইয়া গিয়াছে। কাজেই কখনও ডাঃ সেনকে সঙ্গে লইয়া কোনদিন নিজেরাই জমিদারদের কাছে চাঁদা চাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমনি একদিন আমরা অভ্যর্থনা সমিতির লোকজন দল বাঁধিয়া এক জমিদারের কাচারি ঘরে

ঢুকিলাম। জমিদার বাবু এক পাশে ইযি চেয়ারে হেলান দিয়া হুক্কা টানিতেছেন। অন্যদিকে চার-পাঁচটা চৌকিতে ঢালা ফরাসে কর্মচারিরা কাজ করিতেছেন। জমিদার বাবুর নিকট আমি সুপরিচিত। তাঁর এক পুত্র আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড ছিলেন। আরেক পুত্র আমাদের সংগী উকিল। আমাকে দেখিয়াই তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং দল বাঁধিয়া আসার কারণ জিগগাসা করিলেন। আমি বেশ একটু বিস্তারিতভাবেই আমাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলাম এবং প্রসংগক্রমে এই সম্মিলনীর সাথে ডাঃ সেন ও সূর্যবাবুর সম্পর্কের কথা হয়ত একটু অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিলাম। তিনি সব কথা শুনিয়া অসংকোচে বলিলেন ঃ হাঁ, চাঁদার জন্য খুব উপযুক্ত পাত্রের কাছেই আসিয়াছ। তোমরা জমিদারের মার্গে বাঁশ দিবে, আর আমরা জমিদাররা সে কাজে চাঁদা দিব ?

আমিও এই পিতৃতুল্য ব্যক্তির কথার পৃষ্ঠে অসংকোচে নির্ভয়ে সমান জোরে বলিলাম ঃ জি হাঁ, আলবত দিবেন।

আমার কথার জোর দেখিয়া ভদ্রলোক বিস্ময়ে বলিলেন ঃ কেন দিব ? আমি বলিলাম ঃ তেলের দাম দিবেন।

সদা-হাস্যময় ভদ্রলোক ভেবাচেকা খাইয়া গেলেন। 'তেলের দাম?' শব্দটা তিনি দুই-তিনবার স্বগত উচ্চারণ করিলেন। অবশেষে খাযাঞ্চি বাবুর দিকে চাহিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন ঃ 'মনসুরকে দশটা টাকা এক্ষণি দিয়া দাও ত। খরচের ঘরে লেখ ঃ তেলের দাম বাবদ প্রজা সমিতিকে।' উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত নীরব। আমার সহকর্মীরাও। শুধু জমিদার বাবু স্বয়ং তাঁর প্রশস্ত গোঁফের নিচে মুচকি হাসিতেছিলেন। আমার গোঁফ-টোফ না থাকায় আমার দন্তবিকাশ সকলের চোখে পড়িতেছিল। কিন্তু আমার সে হাসির অর্থ বোঝা গেল অসাধারণ সাফল্যে। এই ভদ্রলোক জীবনে এক সংগে দশ টাকা চাঁদা আর কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে দেন নাই।

যথারীতি রশিদ দিয়া অতিরিক্ত নুইয়া ভদ্রলোককে আদাব দিয়া আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। রাস্তায় নামিয়াই সহকর্মীরা আমাকে ধরিলেন ঃ 'ব্যাপারটা কি ? তেলের দাম নিয়া কি ম্যাজিকী কথা বলিলেন, আর অমন কৃপণ ভদ্রলোক দিয়া দিলেন দশটা টাকা ?' জবাবে আমি বন্ধুদের দৃষ্টি ভদ্রলোকের কথিত বাঁশের দিকে আকর্ষণ করিলাম এবং ওকাজে তেল ব্যবহারের উপকারিতা বর্ণনা করিলাম। এতক্ষণে বন্ধুরা রসিকতাটার মর্ম বুঝিতে পারিলেন। হো হো করিয়া রাস্তার মধ্যেই এ-ওর ঘাড়ে পড়িতে লাগিলেন।

রসিকতাটা কড়ুয়া বলিয়াই বোধ হয় শহরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মহারাজার সংগে দেখা করিয়াই বুঝিলাম তাঁর কানেও পৌছিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই মহারাজা বলিয়া উঠিলেন ঃ 'কি আমারও কাছে তেলের দাম আদায় করতে আসছ

নাকি ?' ডাঃ সেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমরা দুজনেও উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। কাজেই আমার জবাব দেওয়ার দরকার হইল না। পরে বুঝিয়াছিলাম কথাটা চাপা দেওয়ার জন্যই ডাঃ সেন অতজোরে হাসিয়াছিলেন। যাহোক, ডাঃ সেনের যুক্তিতে মহারাজা মাতিলেন। পরদিন হইতে অসংখ্য লোক লাগিয়া গেল। বন-বাদাড় নালা-ডুবা ভরাট হইয়া গেল। পাঁচ-ছয় মাস পরে সেখানে অসংখ্য আলোক-মালা-সজ্জিত প্যাণ্ডালে-স্টলে হাজার-হাজার লোকের দিনরাত ব্যাপী সমাবেশ হইল।

৫. নবাব ফারুকী ও নলিনী বাবুর সহায়তা

অন্য একটি ঘটনায় ময়মনসিংহ প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশনে চাঞ্চল্য এবং দর্শকের সমাবেশে বিস্ময়কর প্রাচুর্য ঘটিয়াছিল। সম্মিলনীর নির্ধারিত তারিখের মাত্র পাঁচ-ছয় দিন আগে বিশ্বস্ত লোকের মারফত খবর পাইলাম, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডাউ প্রজা সম্মিলনীর উপর ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দিয়াছেন। নেতৃস্থানীয় আমাদের কয়েকজনের নামে নোটিশ লেখা হইতেছে। দুই-একদিনের মধ্যেই জারি হইবে। সংবাদদাতাদের অবিশ্বাস করিবার বা তাঁদের খবরে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ ছিল না। কাজেই বুঝিলাম বিপদ অনিবার্য। কিন্তু নিশ্চিত আসন্ন বিপদে মুষড়াইয়া পড়িলাম না। নিছক উৎপ্রেরণাবশে কাউকে কিছু না বলিয়া আমি কলিকাতা চলিয়া গেলাম। কৃষিমন্ত্রী অনারেবল নবাব কে. জি. এম. ফারুকীকে প্রজা সম্মিলনী উদ্বোধন করিতে ও শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারকে প্রদর্শনী উদ্বোধন করিতে রাযী করিলাম। এসব করিবার পর হক সাহেব, ডাঃ সেনগুপ্ত, মৌঃ মুজিবুর রহমান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করিলাম এবং সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিলাম। একমাত্র মৌঃ মুজিবুর রহমান সাহেব নলিনী বাবু সম্পর্কে কিছুটা আপত্তি করিলেন। সমস্ত অবস্থা শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত তিনিও মন্দের ভাল হিসাবে আমার কাজ অনুমোদন করিলেন।

আমি উদ্বোধনী ভাষণ লিখিয়া দিব এই শর্তে নবাব ফারুকী সম্মিলন উদ্বোধন করিতে রাযী হইয়াছিলেন। অমন বিপদে আমি যে কোনও পরিশ্রমের শর্তে রাযী হইতাম। প্রতিদানে শুধু সেই দিনই জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করিয়া তাঁর প্রজা সম্মিলনী উদ্বোধন করার সংবাদটা জানাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ তা করিলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারির মুসাবিদা করা টেলিগ্রামের শেষে তিনি নিজে হইতে যোগ করিলেন : 'সম্মিলনী যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সে দিকে নযর রাখুন।' আমিও নিশ্চিত হইয়া ফারুকী সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতা মুসাবিদায় বসিয়া গেলাম। সে রাত্র আমি ফারুকী সাহেবের মেহমান থাকিলাম। অনেক রাত-তক খাটিয়া অভিভাষণ লেখা শেষ করিলাম। পরদিন সকালে তাঁকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি খুশী

হইয়া ওটা সেইদিনই ছাপা শেষ করিবার হুকুম দিলেন এবং আমাকে আরেকদিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমিও তাঁর অনুরোধ ফেলিতে পারিলাম না। রাত্রে খাওয়ার পর তিনি খানা-কামরা হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিলেন। দরজা বন্ধ করিলেন। তারপর পকেট হইতে ছাপা ভাষণটি বাহির করিয়া বলিলেন ঃ 'এটা কিভাবে পড়িতে হইবে আমাকে শিখাইয়া দেন।'

আমি তাই করিলাম। অনেক রাত ধরিয়া একাজ চলিল। আমি উচ্চস্বরে নাটকীয় ভংগিতে দুই-একবার পড়িয়া নবাব সাহেবকে ঠিক ঐভাবে পড়িতে বলিলাম। কোথায় হাত নাড়িতে হইবে, কোথায় শুধু ডান হাতের শাহাদত আংগুল তুলিতে হইবে, কোথায় সুর উদারা মুদারা তারায় উঠানামা করিবে, সব শিখাইলাম। নবাব সাহেব বাংলা পড়ায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এডাপ্ট করিবার অসামান্য ক্ষমতা ও কাণ্ড-জ্ঞান ছিল তাঁর প্রচুর। গলার আওয়াযটিও মিঠা ও বুলন্দ। সুতরাং দুই-তিন ঘন্টার চেষ্টায় তিনি এমন সুন্দর আবৃত্তিও করিলেন যে আমি বিস্মিত হইলাম। ডিনার টেবিলে দাঁড় করাইয়া রিহার্সাল দেওয়াইলাম। শেষে বলিলামঃ পরীক্ষায় পাশ।

পরদিনই আমি ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিলাম। প্যাণ্ডালে অভ্যর্থনা সমিতির কর্ম-কর্তাদের সাথে দেখা। সকলের মুখে হাসি। কর্ম-তৎপরতা দ্বিগুণিত। তাঁরা জানাইলেন, আমার আকস্মিক আত্ম-গোপনে সকলেই ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। ১৪৪ ধারার খবরে আকাশ-বাতাস ছাইয়া গিয়াছিল। প্যাণ্ডালে লোকজনের যাতায়াত কমিয়া গিয়াছিল। একদিন সকল কাজ বন্ধ ছিল। কিন্তু পরদিনই জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাঁরা জানিতে পারেন নবাব ফারুকী সম্মিলনী উদ্বোধন করিতে আসিতেছেন। ডি. এম. আরও জানান যে, তিনি সকল প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তখন তাঁরা বুঝিতে পারেন আমি আত্ম-গোপন করিয়া কোথায় গিয়াছি।

৬. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে সাফল্য

এইভাবে শত্রুদের মুখে ছাই দিয়া বিপুল সাফল্যের সঙ্গে প্রজা সম্মিলনীর কাজ সমাধা হইল। হক সাহেবের অভিভাষণ, নবাব ফারুকীর উদ্বোধনী ভাষণ, ডাঃ সেনগুপ্তের সারগর্ভ অভ্যর্থনা ভাষণ, শহীদ সুহরাওয়ার্দী ও মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদের বক্তৃতা এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে নলিনী বাবুর ভাষণ সকল দিক দিয়া তথ্যপূর্ণ ও জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই সম্মিলনীর ফলে সারা বাংলায় প্রজা-আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হইল। বিশেষ করিয়া এ জিলার প্রজা-সমিতি একটা বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌঃ আবদুল মজিদ ও নবাবযাদা সৈয়দ

হাসান আলীর অর্থ-সাহায্যে জিলা কৃষক-প্রজা সমিতির 'মিলন প্রেস' নামক ছাপাখানা ও 'চাষী' নামক সাপ্তাহিক কাগয বাহির হইল।

এই সময় জিলার সর্বত্র লোক্যাল বোর্ড ও জিলাবোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পার্টি হিসাবে প্রজা-সমিতি সমস্ত লোক্যাল বোর্ডে প্রার্থী খাড়া করে। গোটা জিলার ৭২টি আসনের মধ্যে প্রজা-সমিতি ৬৪টি আসন দখল করে। তৎকালে লোক্যাল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে জিলা বোর্ডের মেম্বর নির্বাচিত হইতেন। এই নির্বাচনেও প্রজা-সমিতি জয়লাভ করে। জিলা বোর্ড প্রজা-সমিতির হাতে আসে। কিন্তু আমার একটা ভুলে সব ভণ্ডুল হইয়া যায়। জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কে হইবেন, সেটা ঠিক করিতে বোর্ডের নবনির্বাচিত মেম্বরদের মত নেওয়া আমার উচিৎ ছিল। কিন্তু আমি তা করিলাম না। পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে তখন আমার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি কংগ্রেসে প্রাপ্ত ডিসিপ্লিন-বোধ হইতে সরলভাবে মনে করিলাম, প্রজা-সমিতির টিকিটে যখন মেম্বররা নির্বাচিত হইয়াছেন, তখন প্রজা-সমিতির নির্দেশই তাঁরা বিনা-আপত্তিতে মানিয়া লইবেন। এটা ছিল আমার নির্বুদ্ধিতা। প্রজা-সমিতি তখন নব-জাতশিশু। প্রাচীন শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও অতটা অন্ধ আনুগত্য আশা করা যাইতে পারে না। তাছাড়া যাঁরা নির্বাচিত হইলেন, তাঁরা নাবালক শিশু নন। জিলা বোর্ড শাসনে কার কি অভিজ্ঞতা আছে ও থাকা দরকার, এটা তাঁরা যেমন জানেন আমি বা প্রজা-সমিতির অনেকেই তা জানেন না। কাজেই চেয়ারম্যানের জন্য লোক বাছাই-এ তাঁদের মতামতের মূল্য খুব বেশি। কিন্তু অনভিজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাহেতু আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা না করিয়া ওয়াকিং কমিটি দ্বারা এই বাছাই করাইলাম। অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌঃ আবদুল মজিদ সাহেবকে ওয়ার্কিং কমিটি চেয়ারম্যানির নমিনেশন দিল। মেম্বররা স্বভাবতঃই অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রজা-সমিতির নির্দেশ অমান্য করিয়া নূরুল আমিন সাহেব নিজে প্রার্থী হইলেন ও অধিকাংশের ভোটে নির্বাচিত হইলেন। নির্বাচিত হইবার পর অবশ্য নূরুল আমিন সাহেব ঘোষণা করিলেন যে তিনি এখনও প্রজা-সমিতির প্রতিনিধি আছেন ও থাকিবেন এবং জিলা বোর্ডে প্রজা-সমিতির নীতি কার্যকরী করিবেন। অনেক দিন-তক তিনি করিলেনও তাই। কিন্তু জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচনে জিলা প্রজা-সমিতির নেতৃত্বে যে ভাংগন ধরিয়াছিল, সেটা আর জোড়া লাগে নাই। তবু প্রজা-আন্দোলন তার নিজের জোরেই অগ্রসর হইতেছিল। জিলা বোর্ড লইয়া নেতৃত্বের মধ্যে ঝগড়া হইলেও সাধারণ কর্মীদের মধ্যে তার ছোঁয়াচ লাগে নাই। অর্থনৈতিক কর্ম-পন্থার দরুন ছাত্র সমাজে প্রজা-সমিতির সমর্থক যে দল দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছিল, তাদের মধ্যেও বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ দেখা দেয় নাই।

৭. প্রজা—জমিদারে আপোসের অভিনব চেষ্টা

প্রজা আন্দোলনের দুর্নিবার গতি ও অদূর ভবিষ্যতে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই সময় ময়মনসিংহের, তথা সারা বাঙলার জমিদারদের মনে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ তিনটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব ঃ প্রথমতঃ, জমিদার সভার পক্ষ হইতে প্রজা-সমিতির সহিত আপোস-রফা করিবার প্রস্তাব আসে এই সময়। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, এবং জিন্না সাহেবের ইনডিপেণ্ডেট পার্টির ডিপুটি লিডার কালীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী এই ব্যাপারে উদ্যোগী হন। মহারাজা শশিকান্তের শশীলজে জিলা প্রজা-সমিতি ও জিলা জমিদার সভার নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয়। খাযনার হার, বকেয়া খাযনা মাফ, নযরসেলামী ও মাথট-আওয়াব লইয়াও বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসের ভুলিয়া-যাওয়া বুদ্বুদ হিসাবে যার মূল্য আছে, সেটা হইতেছে আমাদের পক্ষ হইতে একটা অভিনব প্রস্তাব। প্রস্তাবটি ছিল এই ঃ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ আয়ের সমস্ত জমিদারিকে এক-একটি স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটে পরিণত করিতে হইবে। প্রজা-সাধারণের ভোটে একটি কাউন্সিল নির্বাচিত হইবে। সেই কাউন্সিল নিজেদের ভোটে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিবে। একটি মন্ত্রিসভাই জমিদারি চালাইবে। জমিদার মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইংল্যাণ্ডের রাজার মত তিনি নিয়মতান্ত্রিক হেড্-অব্-দি-স্টেট থাকিবেন। জমিদারের ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রিভি পার্স রূপে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কনস্টিটিউশনে বরাদ্দ থাকিবে। উহা ননভোটেবল থাকিবে ; অর্থাৎ কাউন্সিল উহা কমাইতে পারিবে না। এক লক্ষ টাকার মত আয়ের জমিদারিগুলি নিজেরা একত্র হইয়া লক্ষ টাকার উপরে উঠিবে ; অথবা পার্শ্ববর্তী বড় জমিদারির শামিল হইবে। প্রস্তাবটি অদ্ভুত ও অভিনব হইলেও জমিদার পক্ষ এক কথায় উহা উড়াইয়া দেন নাই। বরঞ্চ তাঁদের একজন উৎসাহের সংগে উহা বিবেচনা করিতে এবং জমিদার সভার সাধারণ সভায় পেশ করিতে রাযী হইলেন।

কিন্তু একটি কথাতেই শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা ভাংগিয়া গেল। সে কথাটি এই যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আপোস-রফার শর্তগুলো ময়মনসিংহ জিলাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। যদি এখানে সফল হয় তবে দ্বিতীয় স্তরে বাংলার অন্যান্য জিলায় তা প্রয়োগ করা হইবে। এটা প্রজা-আন্দোলনে বিভেদ ও ভাংগন আনিবার দূরভিসন্ধি বলিয়া আমরা সন্দেহ করিলাম। তাই এদিকে আর অগ্রসর হইলাম না।

৮. দানবীর রাজা জগৎকিশোর

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে রাজা জগৎকিশোরের সঙ্গে। রাজা জগৎকিশোর এ জিলার জমিদারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি নির্বিলাস, দানশীল ঋষি-তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দানে বহু স্কুল-মাদ্রাসা, হাসপাতাল, এমনকি মসজিদ নির্মিত ও পরিচালিত হইয়াছে। প্রজা-আন্দোলনের চরম জনপ্রিয়তার দিনে তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজা জগৎকিশোরকে আমি অন্তর দিয়া ভক্তি করিতাম। 'বেনিভোলেন্ট মনার্কি'কে যাঁরা প্রজাতন্ত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মনে করেন, রাজা জগৎকিশোর তাঁদের জন্য লুফিয়া নিবার মত দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি নির্বিলাস সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিতেন। দয়ালু বলিয়া তিনি প্রজাদের কাছে সুপরিচিত। ধর্ম ও দাতব্য কাজে তাঁর দান মোটা। সুতরাং নিজেকে ধার্মিক পরোপকারী বলিয়া অহংকার করিবার তাঁর অধিকার ছিল। কিন্তু সব সত্যিকার ধার্মিকের মতই তিনি নিরহংকার ছিলেন। তাই বলিয়া কেউ তাঁকে অত্যাচারী যালেম বলিবে এটাও তিনি আশা করিতে পারেন নাই। জীবনে বোধ হয় আমার কাছেই তিনি একথা শুনেন এবং মর্মাহত হন। আমি তাঁর সাথে দেখা করিতে গেলে আগে তিনি আমাকে তাঁর মর্যাদা-মাফিক জলযোগ করাইলেন। কোন প্রকার আত্ম-প্রশংসা না করিয়াও যা বলিলেন তার সারমর্ম এই ঃ সব জমিদার যেমন ভাল নয়, তেমনি সব জমিদারই খারাপ নয়। দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই সব ধনী মানুষের কর্তব্য এবং জমিদারদের মধ্যেও এ সম্পর্কে সচেতন সকলে না হইলেও কিছু লোক আছেন, অতএব প্রজা-সমিতি সব জমিদারকে এক কাতারে দাঁড় করাইয়া জমিদারের প্রতি অন্যায় এবং দেশের অনিষ্ট করিতেছে। তাঁর সুরে সুস্পষ্ট আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল। আমি জবাবে রাজা বাহাদুরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা করিয়া যা বলিলাম তার সারমর্ম এই ঃ দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা পুণ্য কাজ। এই পুণ্য-কাজ করিয়াই ধার্মিক জমিদাররা স্বর্গে যাইতে পারেন। দরিদ্র-নারায়ণ না থাকিলে সেবা করিবেন কার ? কাজেই দেশে দরিদ্র-নারায়ণ থাকা দরকার। যথেষ্ট দরিদ্র না থাকিলে দেদার আর্থিক শোষণের দ্বারা তা সৃষ্ট করা অত্যাবশ্যক। আপনারা তাই করিতেছেন। যেমন ধরুন, রোগীর সুশ্রূষা পুণ্য কাজ। অথচ চোখের সামনে কোন রোগী না থাকায় আর্তের সেবা-সুশ্রূষার মত পুণ্য কাজ হইতে আমি বঞ্চিত। আমি পরম ধার্মিক লোক। কাজেই একটা সুস্থ লোকের পিঠে দায়ের আঘাতে একটা ঘা করিলাম। সে ঘায়ে ক্ষার-নুন দিয়া ঘাটা পচাইলাম। নালি হইল। লোকটা শয্যাশায়ী হইল। সে মরে আর কি ? আমি তখন তার সেবা-সুশ্রূষা করিতে বসিলাম। দিন-রাত আহার-নিদ্রা ভুলিয়া তার সেবা করিলাম। বলেন কর্তা, আমি স্বর্গ পাইব না ?

রাজা বাহাদুর স্তম্ভিত হইলেন। আমি তথ্য-বৃত্তান্ত দিয়া এই দৃষ্টান্তের সংগে জমিদারি প্রথার হুবহু মিল দেখাইলাম। আশি বৎসরের এই মহানহৃদয় বৃদ্ধের চোখ-কপালে উঠিল। তিনি ধরা গলায় মৃদু সুরে বলিতে লাগিলেন ঃ কি বলিলে ? আমরা সেবার জন্য দরিদ্র-নারায়ণ সৃষ্টি করিতেছি ? সুশ্রূষা করিয়া পুণ্য লাভের আশায় সুস্থ লোককে আঘাত করিয়া রোগী বানাইতেছি ?

এ কথাগুলি আমার নিকট রাজা বাহাদুরের প্রশ্ন ছিল না। এগুলো ছিল তাঁর আত্ম-জিজ্ঞাসা, স্বগত উক্তি। চোখও তাঁর আমার দিকে ছিল না। তবু আমি এ সুযোগ হেলায় হারাইলাম না। আমি বলিলাম ঃ জি-হাঁ কর্তা, অবস্থা ঠিক তাই।

তিনি আমার কথা শুনিলেন না বোধ হয়। কারণ এ বিষয়ে আর কোন কথা বলিলেন না। স্বগত উক্তি বন্ধ করিয়া তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ মনসুর, আমার মনটা খুবই খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু এ জন্য তোমাদের দোষ দেই না। বরঞ্চ তুমি আমার চোখের সামনে চিন্তার একটা নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছ। আজ তুমি যাও, আরেক দিন তোমার সংগে আলোচনা করিব।

আর তিনি আমাকে ডাকেন নাই।

৯. গোলকপুরের জমিদার

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এরও অনেক পরে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর কি ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে। ঈশ্বরগঞ্জ থানার জারিয়া হাই স্কুলের খেলার মাঠে নির্বাচনী সভা। তখন আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ করিয়া দেশ তাতিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরীর মত গরিব প্রজা-কর্মী ও খান বাহাদুর নূরুল আমিনের মত প্রভাবশালী লোকের মধ্যে। কাজেই বিরাট জনতা হইয়াছে। হঠাৎ জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। গোলকপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী সভায় আসিয়াছেন। আমি সভাপতি। মঞ্চের উপর জমিদার বাবুর বসিবার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি সভায় দু'চার কথা বলিতে চাহিলেন। আমি সভায় সে কথা ঘোষণা করিয়া জমিদার বাবুকে আহ্বান করিলাম। তিনি অল্প কথায় বক্তৃতা শেষ করিলেন। দেখা গেল, তিনি মহাত্মা গান্ধীর একজন ভক্ত এবং নিজে সাধু প্রকৃতির অতিশয় বিনয়ী ভদ্রলোক।

তিনি বলিলেন ঃ 'এ জিলার প্রজা-আন্দোলনের নেতা মনসুর সাহেব প্রাতঃ স্মরণীয় নমস্য ব্যক্তি' বলিয়া জোড়-হাত নত মস্তকে ঠেকাইলেন। আমার প্রাতঃস্মরণীয় হওয়ার কারণও তিনি সংগে সংগেই দেখাইলেন। বলিলেন ঃ 'কারণ তিনি মহাত্মা গান্ধীর একজন অনুরক্ত অনুসারী লোক।' অপাত্রে এমন উচ্চ প্রশংসার কারণও সংগে সংগেই সুস্পষ্ট হইয়া গেল। তিনি বলিলেন ঃ 'অথচ এটা খুবই দুঃখের

বিষয় যে মনসুর সাহেব অহিংসায় বিশ্বাসী হইয়াও তিনি জমিদারদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন।' এখানে তিনি রাজা জগৎকিশোরের মতই বলিলেন ঃ সব জমিদারকে ঘৃণা করা উচিৎ নয়। কারণ সব জমিদারই খারাপ নয়।'

জমিদার বাবু মহাত্মা গান্ধীর নাম করায় তাঁর কথার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে খুবই সহজ হইল। আমি তাঁর ভদ্রতার প্রতিদানে ভদ্রতা করিয়া আমার বক্তৃতার শুরুতেই বলিলাম ঃ মহাত্মাজীকে ইংরাজরা যেমন ভুল বুঝিয়াছিল, আমাকেও জমিদার বাবু তেমনি ভুল বুঝিয়াছেন। মহাত্মাজী ইংরাজের অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ 'আমি ইংরাজ জাতিকে ঘৃণা করি না। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করি। ইংরাজ জাতির মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বহু ব্যক্তি আছেন।' আমিও মহাত্মাজীর ভাষা নকল করিয়া বলিতেছি ঃ আমি জমিদারদেরে ঘৃণা করি না। জমিদারি প্রথাকেই ঘৃণা করি। বস্তুতঃ জমিদাদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বহু ব্যক্তি আছেন, দাতব্য কাজে যাঁদের দান অতুলনীয়। আমরা শুধু জমিদারি প্রথাটারই ধ্বংস চাই। ব্যক্তিগতভাবে জমিদারদের ধ্বংস চাই না। এই প্রথার বিরুদ্ধেই যে আমাদের সংগ্রাম, এই কুপ্রথা যে ধনীকে দরিদ্র এবং ভাল মানুষকে খারাপ করিতেছে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তা বর্ণনা করিলাম। যে আমি জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে আশৈশব সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি সেই আমিই যে জমিদারি-প্রথার চাপে খারাপ হইয়া গিয়াছিলাম, সে অপরাধ সরলভাবে স্বীকার করিলাম। এক জমিদারের দুই শরিকের মামলায় আমি কোর্টের দ্বারা সেই জমিদারির রিসিভার নিযুক্ত হইয়াছিলাম। জমিদারদের পক্ষ হইতে তাদের জমিদারি পরিচালন করিতে গিয়া ছয় মাসের মধ্যে আমি বুনিয়াদী জমিদারদের চেয়েও অত্যাচারী জমিদার হইয়া গিয়াছিলাম। এক মহালের খাযনা আদায়ের জন্য শেষ পর্যন্ত আমি পুলিশের সহায়তা চাহিয়াছিলাম। জিলা প্রজা-সমিতির সেক্রেটারি প্রজাদের বকেয়া খাযনা আদায়ের জন্য পুলিশের সাহায্য চাওয়ায় জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস. পি. তা হাসিয়াই খুন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আমাকে ও-কাজে বিরত করিয়াছিলেন। নইলে কি যে কাণ্ডটা হইয়া যাইত, সে দুশ্চিন্তা ঐ সভার মধ্যেই প্রকাশ করিলাম। উপসংহারে বলিলাম ঃ যে প্রথা আমার মতবিরোধী লোককে অত্যাচারী বানাইয়াছিল ছয় মাসে, দেড় শ' বৎসরে ঐ প্রথা আপনাদের কতখানি অত্যাচারী বানাইয়াছে তা আপনিই বিচার করুন। সভায় হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল। জমিদার বাবুও হাসিলেন। আমার কথা তার মনে এমন দাগ কাটিয়াছিল যে তিনি বীরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ও শৈলেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী নামক তাঁর দুই গ্র্যাজুয়েট ছেলেকে প্রজা-কর্মী হিসাবে গ্রহণ করিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। জমিদার পুত্রকে প্রজা-সমিতিতে গ্রহণ করার সম্ভাব্য আপত্তির বিরুদ্ধে তিনি নবাবযাদা হাসান আলীর নযির দিলেন। আমি নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়া উভয়ের পার্থক্য দেখাইলাম এবং শর্তাদি আরোপ করিলাম। শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রজা সমিতিতে যোগ দেন নাই।

আটই অধ্যায়

আইন পরিষদে প্রজা পার্টি

১. প্রজা–সমিতির নাম পরিবর্তন

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রজা সম্মিলনীর সময় হইতেই নিখিল–বংগ প্রজা সমিতির সেক্রেটারি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রজা–সমিতির কাজে নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। কিন্তু সমিতির সহকারী সেক্রেটারি সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদীর' সহকারী সম্পাদক মৌঃ নযির আহম্মদ চৌধুরী পূর্বের মতই উৎসাহের সাথে সমিতির কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সার আবদুর রহিমের স্থলে সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচনের জন্য ময়মনসিংহ সম্মিলনীর কিছুদিন পরেই 'মোহম্মদী' অফিসে কাউন্সিলের অধিবেশন দওয়া হইল। মওলানা সাহেবের সকল প্রকার বিরুদ্ধতা ঠেলিয়া আমরা হক সাহেবকে সভাপতি নির্বাচন করিতে সমর্থ হইলাম। মওলানা সাহেব অধিকতর নিরুৎসাহ এমনকি অসহযোগী হইয়া পড়িলেন।

নিখিল–বংগ প্রজা সম্মিলনীর পরবর্তী অধিবেশন ঢাকায় হইবে, মনমনসিংহ বৈঠকেই তা স্থির হইয়াছিল। ১৩৩৬ সালে এপ্রিল মাসে এই সম্মিলনীর অধিবেশন বসিল। বিখ্যাত দন্ত–চিকিৎসক ডাঃ আর. আহমদ অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান, ঢাকা বারের বিখ্যাত উকিল মৌঃ নঈমুদ্দিন আহমদ অভ্যর্থনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি, চৌধুরী গোলাম কাবির, মৌঃ রেযায়ে করিম, মির্যা আব্দুল কাদির (কাদির সরকার), 'আমান'–সম্পাদক মৌঃ তফাযযল হোসেন, খ্যাতনামা মোখতার সৈয়দ আবদুর রহিম অভ্যর্থনা সমিতির বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেন। খান বাহাদুর আবদুল মোমিন ও মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের দল প্রতিযোগিতা না করায় এবারও জনাব ফযলুলকেই বিনা–প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্মিলনীর সভাপতি নির্বাচিত হন।

এই সম্মিলনী ছিল মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক আইনপরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল আসন্ন। কার্যকরী সমিতির নির্দেশে আমি সম্মিলনীর বিবেচনার জন্য একটি ইলেকশন মেনিফেস্টো আগেই রচনা করিয়াছিলাম। জিন্না সাহেবের চৌদ্দ দফার

নামানুকরণে আমি প্রজা পার্টির দাবিগুলোকে টানিয়া-খেচিয়া চৌদ্দতে স্ফীত-সীমিত করিয়া উহার নাম দিয়াছিলাম 'প্রজা সমিতির চৌদ্দ দফা।' সেই মেনিফেস্টোতে বিনা-ক্ষতি পূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, খাযনার নিরিখ হ্রাস, নযর-সেলামি রহিতকরণ, খাযনা-ঋণ মওকুফ, মহাজনী আইন প্রণয়ন, সালিশী বোর্ড গঠন, হাজা-মজা নদী সংস্কার, প্রতি থানায় হাসপাতাল স্থাপন, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করণ, বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, শাসন ব্যয় হ্রাসকরণ, মন্ত্রি-বেতন এক হাজার টাকা নির্ধারণ ও রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দাবি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এই সম্মিলনীতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। কুমিল্লা ও নোয়াখালী জিলার প্রজা-আন্দোলন কৃষক-আন্দোলন নামেই পরিচত ছিল। বাংলার আর সব জিলাতেই উহার নাম ছিল প্রজা-আন্দোলন। নির্বাচনের মুখে প্রজা-সমিতিকে ঐক্যবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় সকল মতের কর্মীদের সমন্বয় বিধান করা হয় সমিতির নাম কৃষক-প্রজা সমিতি করিয়া। মেনিফেস্টোও 'কৃষক-প্রজার চৌদ্দ দফা' নামে পরিচিত হয়। অসুস্থতা সত্ত্বেও সম্মিলনীর প্রধান প্রস্তাব মেইন রেযলিউশন আমাকেই মুভ করিতে হয়। সকল জিলার নেতৃবৃন্দ ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সম্মিলনীর কাজ শেষ হয়।

২. মুসলিম ঐক্যের চেষ্টা

সমিতির নাম কৃষক-প্রজা হওয়ার সুযোগ লইয়া খান বাহাদুর মোমিন ও মওলানা আকরম খাঁর দলের কতিপয় নেতা। পূর্ব নামে সমিতি চালাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। অল্পদিন পরেই নবাব হবিবুল্লার নেতৃত্বে কলিকাতায় 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' গঠন করা হয়। জনাব শহীদ সুহরাওয়ার্দী ঐ পার্টিতে যোগদান করেন। খান বাহাদুর আবদুল মোমিন ও মৌঃ তমিযুদ্দিন খাঁ আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ পার্টিতে যোগ না দিলেও এবং কাগজে-কলমে কৃষক-প্রজা সমিতিতে কৃষক-প্রজা সমিতির সহিত সক্রিয় সম্পর্ক রাখিলেন না। মওলানা আকরম খাঁর স্থলে মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ সমিতির সেক্রেটারি নির্বাচিত হইলেন।

'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' নামক এই নয়া সংস্থায় মুসলিম বাংলার সব নাইট-নবাব ও জমিদার সওদাগররা সংঘবদ্ধ হইলেন এবং পার্টি ফণ্ডে পাঁচ-সাত জন বড় লোকের প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছেন বলিয়া খবরের কাগযে

ঘোষণা করিলেন। ইহাতে আমরা কৃষক-প্রজা কর্মীরা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। এই সময় ডাঃ আর. আহমদ, মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও মিঃ হাসান ইসপাহানির নেতৃত্বে 'নিউ মুসলিম মজলিস' নামে কলিকাতায় প্রগতিবাদী মুসলিম তরুণদের একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। মুসলমান নাইট-নবাব খান বাহাদুরদেরে সংঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া এঁরাও একটু চিন্তাযুক্ত হইলেন। প্রতিকার কি করা যায়, এই লইয়া ইঁহাদের সাথে আমাদের কথাবার্তা চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে নবাব হবিবুল্লা বাহাদুরের হাংগারফোর্ড স্ট্রিটের বাড়িতে 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির' নেতারা কৃষক-প্রজা সমিতির সহিত একটি আপোস-রফার বৈঠক আহবান করেন। প্রজা-সমিতির বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা (যথা মৌঃ ফযলুল হক, মৌঃ আব্দুল করিম, মৌঃ সৈয়দ নওশের আলী) উক্ত সভায় গেলেন না। তাঁদের বদলে মৌঃ তমিযুদ্দিন খাঁ, মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ, মৌঃ আশরাফুদ্দিন চৌধুরী ও আমাকে পাঠাইলেন। সেখানে কর্মপন্থা নিয়া বিশেষ বিরোধ হইল না। কিন্তু পার্টি লিডার লইয়া আপোস-আলোচনা ভাংগিয়া গেল। আমরা চাইলাম হক সাহেবকে লিডার করিতে, তাঁরা চাইলেন নবাব হবিবুল্লাকে। মুসলমানদের নেতা মানেই এবার বাংলার প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং কোনও দলই নরম হইলাম না। আলোচনা ভাংগিয়া গেল। নেতৃত্বের ইশুতে আলোচনা ভাংগিয়া দেওয়ার ব্যাপারে মৌঃ তমিযুদ্দিন সাহেব আমাদের সংগে চলিয়া আসিলেন না। মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ যদিও মৌঃ তমিযুদ্দিনের মতের সমর্থক ছিলেন, অর্থাৎ নেতৃত্বের ইশুতে আলোচনা ভাংগিবার বিরোধী ছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে বাহির হইয়া আসেন।

কিন্তু যাঁর নেতৃত্বের জন্য আমরা এত গলদঘর্ম হইলাম তাঁর কাছে পুরস্কার পাইলাম তিরস্কার। বন্ধুবর আশরাফুদ্দিনই একাজে আমাদের নেতা ছিলেন। সুতরাং হাংগারফোর্ড স্ট্রিট হইতে বাহির হইয়া তিনি সোজা আমাদেরে ঝাউতলা রোড নিয়া গেলেন এবং হক সাহেবের নেতৃত্বের জন্য কি মরণপণ সংগ্রামটা করিলাম সবিস্তারে তার বর্ণনা করিলেন। জবাবে হক সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন : দেখতেছি তোমরা আমার সর্বনাশ করবা। আমারে নেতা করবার কথা তোমাদেরে কে কইছিল? যেখানে মরহুম নবাব সলিমুল্লা বাহাদুরের সাহেবযাদা আছেন, সেখানে আমি লিডার হৈবার পারি ? এমন অন্যায় দাবি কৈরা তোমরা আমার শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার চান্সটাও নষ্ট কৈরা দিলা ? না, এসব ছেলেমি আমি মানবো না।

আমরা চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করিলাম। আমি রসিকতা করিয়া বলিলাম ঃ সার, আপনের একদিকে মুসলিম বেংগল ও অপরদিকে আহসান মনযিলের সংগ্রামটা আমরা ভুলতে পারি না।' আশরাফুদ্দিন বলিলেন ঃ 'আপনে নিজে প্রধানমন্ত্রী হৈতে চান না, আমরা জানি। কিন্তু বাংলার কৃষক-প্রজারা চায় আপনেরেই তারার প্রধানমন্ত্রী রূপে। নবাব-সুবা প্রধানমন্ত্রী তারা চায় না। আপনেরে প্রধানমন্ত্রী করতে পারি কি না, তা আমরা দেখব। আপনে কথা কইতে পারবেন না। কাগজে বিবৃতিও দিতে পারবেন না। চুপ কৈরা থাকবেন।' হক সাহেব তাঁর অতি পরিচিত দুষ্টামিপূর্ণ হাসিটি হাসিলেন। আর কিছু বলিলেন না। অর্থাৎ তিনি রাযী হইলেন। 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির' নেতারা আমাদের অসম্মতিকেই হক সাহেবের অসম্মতি ধরিয়া নিলেন। কৃষক-প্রজা পার্টি ও ইউনাইটেড পার্টির রেষারেষি চলিতে থাকিল।

৩. মিঃ জিন্নার সমর্থন লাভের চেষ্টা

১৯৩৪ সালের শেষ দিকে জিন্না সাহেব তাঁর লণ্ডনের স্বয়ং-নির্বাসন ত্যাগ করিয়া বোম্বাই আসেন। সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। তাঁরই সমর্থনে সার আবদুর রহিম স্পিকার নির্বাচিত হন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। ১৯৩৫ সালে তিনি মুসলিম লীগ পুনর্গঠনে মন দেন। পাঁচ বৎসর তিনি দেশে না থাকায় মুসলিম লীগ ইতিমধ্যে মৃত প্রায় হইয়া গিয়াছিল। এই সময় বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আমাদের দলের দখলে। মৌলবী মুজিবুর রহমান ইহার প্রেসিডেন্ট, ডাঃ আর. আহমদ সেক্রেটারি। আমার নিজের জিলার আমি উহার প্রেসিডেন্ট, উকিল মৌঃ আবদুস সোবহান এই সময় উহার সেক্রেটারি। এইভাবে মুসলিম লীগ তখনও আমাদের মত 'কংগ্রেসী মুসলমানদেরই' দখলে। কিন্তু আমরা সকলে প্রজা-আন্দোলন লইয়া এত ব্যস্ত যে মুসলিম লীগ সংগঠনের দিকে মন দিবার আমাদের সময়ই ছিল না। তবু আমরাই ছিলাম বাংলায় জিন্না নেতৃত্বের প্রতিনিধি।

আমাদের দলের ডাঃ আর. আহমদের সংগে কলিকাতার প্রভাবশালী তরুণ মুসলিম নেতা মিঃ হাসান ইস্পাহানি, তাঁর সহকর্মী আব্দুর রহমান সিদ্দিকী প্রভৃতির অন্তরংগতা ছিল অন্য দিক হইতে। তাঁরা এই সময় 'নিউ মুসলিম মজলিস' নামে একটি প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠান চালাইতেন। মিঃ হাসান ইস্পাহানি জিন্না সাহেবের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাংলার পয়সাওয়ালা নাইট-নবাবদের সাথে টক্কর দিতে গেলে

জিন্না সাহেবের সমর্থন কাজে লাগিবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া মিঃ ইস্পাহানির মারফতে আমরা জিন্না সাহেবকে দাওয়াত করিলাম। তিনি আসিলেন। ইস্পাহানিদের ৫নং ক্যামাক স্ট্রিটের বাড়িতে উঠিলেন। রাতে ডিনারের পরে আলোচনা শুরু হইল। মৌঃ ফযলুল হক, আবদুল করিম, মৌঃ সৈয়দ নওশের প্রভৃতি আমরা আট-দশজন ডিনারেও আলোচনায় শরিক হইলাম।

আলোচনায় নীতিগতভাবে সকলে অতি সহজেই একমত হইলাম। মুসলমানদের একতাবদ্ধ হওয়া, নাইট-নবাবদের ধামাধরা রাজনীতি হইতে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করা, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মধ্য দিয়া মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনও মতভেদ দেখা দিল না। কিন্তু খুটিনাটি ব্যাপারে আস্তে আস্তে বিরোধ দেখা দিতে লাগিল। জিন্না সাহেব ইতিমধ্যে মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে নূতন গঠনতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাতে মুসলিম ভারতের রাজনীতিক আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রগতিবাদী দাবি-দাওয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেই আদর্শ-উদ্দেশ্যকে বুনিয়াদ করিয়া মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্বাচন-সংগ্রাম পরিচালনা করিবে, জিন্না সাহেবের উদ্দেশ্য তাই। কাজেই আমরা বুঝিলাম, আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হইতে বাধ্য। অতএব জিন্না সাহেবের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তৃত আলোচনা চালাইবার জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হইল। মৌঃ শামসুদ্দিন, মৌঃ আশরাফুদ্দিন, মৌঃ রেযায়ে করিম, নবাবযাদা হাসান আলী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও আমি প্রতিনিধি দলের মেম্বর হইলাম। সৈয়দ নওশের আলী এই দলের লিডার হইলেন। সৈয়দ সাহেব দুই-একবার গিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা যা করিব, তাতেই তাঁর মত আছে বলিয়া তিনি খসিয়া পড়িলেন। অতঃপর নেতাহীন অবস্থাতেই আমরা দিনের পর দিন আলোচনা চালাইয়া যাইতে থাকিলাম। ইতিমধ্যে আমরা আলবার্ট হলে এক জনসভার আয়োজন করিলাম। বক্তা এক জিন্না সাহেব। তিনি যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। তাতে তিনি ইংরাজের ধামাধরা তল্পিবাহক নাইট-নবাবদের কষিয়া গাল দিলেন এবং নেতৃত্ব হইতে তাহাদিগকে ঝাটাইয়া তাড়াইবার জন্য জনসাধারণকে উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। উপসংহারে তিনি প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলিলেন : 'লেট দি ক্রিম অব হিন্দু সোসাইটি বি অর্গেনাইযড্ আন্ডার দি বেনার অব দি কংগ্রেস এণ্ড দি ক্রিম অব মুসলিম সোসাইটি আন্ডার দি বেনার অব দি মুসলিম লীগ। দেন লেট আস পুট আপ এ ইউনাইটেড ডিমান্ড ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স অব আওয়ার ডিয়ার মাদারল্যান্ড। আওয়ার

ডিমান্ড উইল বি ইররেযিস্টিবল।' কানফাটা করতালি ধ্বনি ও বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভা ভংগ হইল।

৪. লীগ–প্রজা আপোস চেষ্টা

কিন্তু আলোচনা যতই দীর্ঘ হইতে লাগিল আমাদের উৎসাহ ও আশা ততই কমিতে লাগিল। জিন্না সাহেবের দাবি ছিল এই ঃ (১) কৃষক–প্রজা সমিতিকে মুসলিম লীগের টিকিটে প্রার্থী খাড়া করিতে হইবে ; (২) কৃষক–প্রজা পার্টির মেনিফেস্টো হইতে জমিদারি উচ্ছেদ দাবি বাদ দিতে হইবে ; (৩) পার্লামেন্টারী বোর্ডে কৃষক–প্রজা পার্টির শতকরা ৪০ জন এবং মুসিলম লীগের শতকরা ৬০ জন প্রতিনিধি থাকিবেন ; (৪) মুসলিম লীগের প্রতিনিধি জিন্না সাহেব নিজে মনোনীত করিবেন। তাঁর দাবির পক্ষে জিন্না সাহেব বলিবেন ঃ গোটা ভারতের সর্বত্র একমাত্র মুসলিম লীগের টিকিটেই নির্বাচন চালাইতে হইবে। মুসলিমসংহতি প্রদর্শনের জন্য এটা দরকার। জমিদারি উচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই যে ঐ দাবি বস্তুতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাযেয়াফত করার দাবি। উহা মুসলিম লীগের মূলনীতি–বিরোধী। তিনি মুসলিম লীগের নয়া ছাপা গঠনতন্ত্রের ৭নং ধারা আমাদিগকে দেখাইলেন।

পক্ষান্তরে কৃষক–প্রজা সমিতির তরফ হইতে আমাদের দাবি ছিল ঃ (১) কৃষক–প্রজা সমিতির টিকিটেই বাংলার নির্বাচন হইবে ; তবে কেন্দ্রীয় পরিষদে কৃষকপ্রজা প্রতিনিধিরা মুসলিম লীগ পার্টির সদস্য হইবেন এবং নিখিল–ভারতীয় সমস্ত ব্যাপারে কৃষক–প্রজা সমিতি মুসলিম লীগের নীতি মানিয়া লইবে ; (২) পার্লামেন্টারী বোর্ডে কৃষক–প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধি আধা–আধি হইবে; (৩) মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরাও কৃষক–প্রজা প্রতিনিধিদের মতই প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। আমাদের দাবির পক্ষে যুক্তি ছিল এই ঃ বাংলার তফসিলী হিন্দুরা কৃষক–প্রজা পার্টির সমর্থক। মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচন চালাইলে আমরা তাদের সমর্থন হারাইব। জিন্না সাহেবের মনোনয়নের বিরুদ্ধে আমরা যুক্তি দিলাম যে পার্লামেন্টারি বোর্ডের মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরা প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হইলে আমরা দেশের মুসলিম লীগ কর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাইব। পক্ষান্তরে নমিনেশনের পিছন দুয়ার দিয়া যদি কোনও অবাঞ্ছিত লোক পার্লামেন্টারি বোর্ডে স্থান পায় তবে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ও প্রার্থী নির্বাচনে গন্ডগোল দেখা দিবে।

জিন্না সাহেব আমাদের যুক্তি মানিলেন না। তিনি বলিলেন ঃ কেন্দ্রীয় পরিষদে কৃষক-প্রজা প্রতিনিধির মুসলিম লীগ পার্টির যোগ দেওয়ার কথাটা বর্তমানে অর্থহীন, কারণ কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন এখন হইতেছে না। তফসিলী হিন্দুদের সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে যখন নির্বাচন হইতেছে, তখন মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচিত হইবার পরও তফসিলী হিন্দুদের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। আর পার্লামেন্টারি বোর্ডে প্রাদেশিক লীগের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, প্রাদেশিক লীগ কৃষক-প্রজা সমিতির লোকেরই করতলগত। নির্বাচনেও তাঁদের লোকই আসিবেন। তাতে পার্লামেন্টারি বোর্ড এক দলের হইয়া পড়িবে, সর্বদলীয় মুসলমানদের হইবে না।

উভয় পক্ষ স্ব স্ব মতে অটল থাকা সত্ত্বেও আলোচনা কোন পক্ষই ভাংগিয়া দিলাম না। শেষ পর্যন্ত আপোস-চেষ্টা সফল হইবে, উভয় পক্ষই যেন এই আশায় থাকিলাম। ইতিমধ্যে আমরা জানিতে পারিলাম জিন্না সাহেব আমাদের সাথে আলোচনা চালাইবার কালে সমান্তরালভাবে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির নাইট-নবাবদের সাথেও আলোচনা চালাইতেছেন। আমাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি তা স্বীকার করিলেন। বলিলেনঃ 'সকল দলের মুসলমানকে এক পার্টিতে আনাই আমার উদ্দেশ্য।'

৫. উভয়-সংকট

এক দিনের বৈঠকে হঠাৎ জিন্না সাহেব আমাদিগকে জানাইলেন ঃ পার্লামেন্টারি বোর্ড সম্পর্কে জিন্না সাহেবের দাবি কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতি হক সাহেব ও সেক্রেটারি শামসুদ্দিন সাহেব মানিয়া লইয়াছেন, আমাদের এ বিষয়ে নূতন কথা বলিবার কোনও অধিকার নাই। আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। শামসুদ্দিন সাহেব সে দিনের আলোচনায় ছিলেন না। আমাদের বিস্ময় দূর করিবার জন্য জিন্না সাহেব মুচকি হাসিয়া এক টুকরা কাগজ দেখাইলেন। দেখিলাম, তাঁর কথা সত্য।

আমরা ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া সেদিনের আলোচনা অসমাপ্ত রাখিয়াই চলিয়া আসিলাম। হক সাহেব ও শামসুদ্দিন সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করিলাম। তাঁদের কথাবার্তা আমাদের পছন্দ হইল না। কলিকাতায় উপস্থিত কৃষক-প্রজা নেতাদের লইয়া একটি জরুরী পরামর্শ সভা ডাকিলাম। ঢাকায় বলিয়াদির জমিদার খান বাহাদুর কাযিমুদ্দিন

সিদ্দিকী সাহেব আমাদের সমর্থক ছিলেন। লোয়ার সার্কুলার (নোনাতলা) রোডস্থ তাঁর বাড়িতে এই পরামর্শ বৈঠক বসিল। হক সাহেব ও শামসুদ্দিন সাহেব এই সভায় তাঁদের কাজের সমর্থনে বক্তৃতা করিলেন। তাঁরা জানাইলেন যে জিন্না সাহেব জমিদারি উচ্ছেদের দাবি মানিয়া লইয়াছেন। এ অবস্থায় পার্লামেন্টারী বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব লইয়া ঝগড়া করিয়া আপোস-আলোচনা ভাংগিয়া দেওয়ার তাঁরা পক্ষপাতী নন। আমরা ইতিমধ্যেই খবর পাইয়াছিলাম যে সার নাযিমুদ্দিনের পরামর্শে জিন্না সাহেব জমিদারি উচ্ছেদের বিরোধিতা অনেকটা শিথিল করিয়াছেন। হক সাহেব ও শামসুদ্দিন সাহেবের কথায় এখন আমরা খুব বেকায়দায় পড়িলাম। আমরা নিজেদের সমর্থনে খুব জোর বক্তৃতা করিলাম। মুসলিম লীগের লিখিত গঠনতন্ত্রের বিরোধী জিন্না সাহেবের ঐ মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য কি, সে সব কথাও বলিলাম। তারপর শুধু জমিদারি উচ্ছেদের কথাটাও যথেষ্ট নয় ; বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদটাই বড় কথা। আমাদের মেনিফেস্টোর কথাও তাই। এ সম্পর্কে জিন্না সাহেব হক সাহেবকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তা সভা সমক্ষে স্পষ্ট করিয়া বলিতে আমরা হক সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করিলাম। হক সাহেব বা শামসুদ্দিন এ ব্যাপারে সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। বুঝা গেল, আসলে ক্ষতিপূরণের কথাটা তাঁরা জিন্না সাহেবের কাছে তুলেনই নাই। এই পয়েন্টে আমরা জিতিয়া গেলাম। কিন্তু এটা আমরা বুঝিলাম যে বিনা-ক্ষতিপূরণের শর্ত জিন্না সাহেব মানিয়া লইয়া থাকিলে পার্লামেন্টারী বোর্ডে মাইনরিটি হইয়াও আপোস করা উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশেরই মত। যাহোক জিন্না সাহেবের কাছে একমাত্র বিনা-ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটা পরিষ্কার করিবার ভার প্রতিনিধিদলের উপর দেওয়া হইল।

৬. আপোসের বিরোধিতা

আমরা প্রতিনিধিদলের মেম্বররা সেখান হইতে সার্কাস রোডস্থিত ডাঃ আর. আহমদের বাড়ি গেলাম। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিলাম। আমরা একমত হইলাম যে হক সাহেব ও শামসুদ্দিন সাহেব সহ অধিকাংশ সদস্য এই আপোসের পক্ষপাতী এটা যেমন সত্য, এই আপোস করিলে কৃষক-প্রজা সমিতির অস্তিত্ব এই খানেই খতম এটাও তেমনি সত্য। আমরা সংকটের দুই শিংগার ফাঁকে পড়িলাম। একমাত্র ভরসা জিন্না সাহেব। তিনি যদি মেহেরবানি করিয়া বিনা-ক্ষতিপূরণের দাবিটা অগ্রাহ্য করেন, তবেই আমরা বাঁচিয়া যাই। সকলে মিলিয়া আল্লার দরগায় মোনাজাত করিতে

লাগিলাম : জিন্না সাহেব যেন আমাদের দাবি না মানেন। নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে জীবনে আরেকবারমাত্র আল্লার দরগায় মোনাজাত করিয়াছিলাম। এক টাকা দিয়া ত্রিপুরা স্টেট লটারির টিকিট করিয়াছিলাম। প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ। তৎকালে সারা ভারতবর্ষে বিশ্বাসী এবং মোটা টাকার লটারি ছিল মাত্র এই একটি। কয়েক বছর ধরিয়া এই লটারির টিকিট কিনিতেছিলাম। টিকিট কিনার পরদিন হইতে খেলার ফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস কাল খোদার দরগায় দিনরাত মোনাজাত করিতাম জিতার জন্য। কিন্তু একবার হারিবার জন্য তেমনি মোনাজাত করিয়াছিলাম। কারণ পকেটে টিকিটসহ পাঞ্জাবিটা ধুপার বাড়ি দিয়া ফেলিয়াছিলাম। ধুপার ভাটিতে পড়িয়া তার চিহ্ন ছিল না। তেমনি এবার পাঁচ–ছয় বন্ধুতে দোওয়া করিতে থাকিলাম : 'হে খোদা, জিন্না সাহেবের মন কঠোর করিয়া দাও।'

পরদিন নির্ধারিত সময়ে জিন্না সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। দু'এক কথায় বুঝিলাম, বিনা–ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদে তিনি কিছুতেই রাযী হইবে না ; কারণ ওটাকে তিনি ফান্ডামেন্টাল মনে করেন। তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বিনা–ক্ষতিপূরণের উপর জোর দিলাম। এমনকি, আমরা এতদূর বলিলাম যে পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠনে কৃষক–প্রজা পার্টিকে শতকরা ৪০–এর স্থলে আরও কমাইয়া দিলেও আমরা মানিয়া নিতে পারি, কিন্তু বিনা–ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের মত ফাণ্ডামেন্টালে আমরা কোনও আপোস করিতে পারি না। জিন্না সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাযেয়াফতের যুক্তির খণ্ডনে আমরা কর্নওয়ালিস, পাঁচসালা, দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলাম যে জমিদাররা আসলে জমির মালিক নয়, ইজারাদার মাত্র। তাছাড়া, কৃষক–প্রজা সমিতি বাংলার সাড়ে চারি কোটি কৃষক–প্রজার কাছে এ ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ। আমরা সে ওয়াদা কিছুতেই খেলাফ করিতে পারি না। জিন্না সাহেব আমাদেরে মাফ করিবেন।

জিন্না সাহেব তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বুঝিয়া ফেলিলেন, আমরা ভাংগিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছি। গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরিয়া তিনি আমাদিগকে ধমকাইয়াছেন, কোনঠাসা করিয়াছেন, তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তিনি ভাংগাভাংগি চাহেন নাই। সেটা যদি চাইতেন, তবে এক দিনেই আমাদেরে বিদায় করিয়া দিতে পারিতেন। তিনি এক কথার মানুষ। দর–কষাকষি তাঁর ধাতের মধ্যেই নাই। এমন লোক যে এক সপ্তাহের বেশি দিন ধরিয়া দিনের পর দিন আমাদের সাথে

আলোচনা চালাইয়া গিয়াছেন, তাতে কেবলমাত্র এটাই প্রমাণিত হয় যে আমাদের সাথে তাঁর মূলগত পার্থক্য যতই থাকুক, তিনি আমাদের মধ্যে ভাংগাভাংগি চান নাই। এই দিন আমাদের মধ্যে ভাংগাভাংগির মনোভাব দেখিয়া তিনি বেশ একটু চঞ্চল এবং তাঁর ধাতবিরোধী রকম নরম হইয়া গেলেন। অতিরিক্ত রকম মিষ্টি ভাষায় তিনি আমাদের দাবির অযৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি আমাদেরে দেখাইলেন, বিনা-ক্ষতিপূরণের কথাটা আমরা নূতন তুলিতেছি। আমরা বলিলাম যে, উচ্ছেদ কথাটার মধ্যেই বিনা-ক্ষতিপূরণ নিহিত রহিয়াছে। উচ্ছেদ কথার সংগে খরিদ বা পার্চেয, হুকুম -দখল বা একুইযিশন-রিকুইযিশনের পার্থক্য আমরা জিন্না সাহেবের মত বিশ্ব-বিখ্যাত উকিলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। জিন্না সাহেব আর কি করিবেন? আমাদের এই অপচেষ্টাকে তিনি শুধু চাইল্ডিশ বা শিশু-সুলভ বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন এবং আমাদিগকে এই ছেলেমি না করিয়া 'সেনসিবল' হইতে উপদেশ দিলেন।

৭. আলোচনা ব্যর্থ

কিন্তু আমরা সেনসিবল হইলাম না। কারণ আমরা মন ঠিক করিয়াই আসিয়াছিলাম। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নেই জিন্না সাহেবের সহিত আমাদের ভাংগাভাংগি হইল, বিনা-ক্ষতিপূরণের দাবি মানিয়া নিলে আমরা পার্লামেন্টারি বোর্ডে আরও কম সীট নিতে রাযী ছিলাম, এই মর্মে পরদিনই খবরের কাগযে বিবৃতি দিবার জন্য আমরা তৈয়ার হইতেছিলাম। আমাদের পার্টির মুসাবিদা-বিশারদ ইংরাজীতে সুপণ্ডিত অধ্যাপক হুমায়ুন কবির সাহেব এই মর্মে একটি মুসাবিদা খাড়া করিয়াই আজিকার বৈঠকে আসিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা আর বিলম্ব করিলাম না। উঠিয়া পড়িলাম। আপোস না হওয়ার জন্য আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি, সেই মর্মবেদনা জানাইয়া অতিরিক্ত নুইয়া 'আদাব আরয' বলিয়া আমরা বিদায় হইলাম। জিন্না সাহেব আসন হইতে উঠিয়া আমাদের দিকে আসিলেন বিদায়ের শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য। দরজার পর্দা পার হইবার আগেই জিন্না সাহেব আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। বন্ধুরা স্বভাবতঃই ফিরিলেন না। জিন্না সাহেব আমার কাছে আসিয়া আমার কাঁধে হাত দিলেন। বলিলেন ঃ 'ডোন্ট বি মিসগাইডেড বাই আশরাফুদ্দিন। হি ইয এ হোলহগার। ইউআরএ সেনিসিবল ম্যান। আই কোয়াইট

রিএলাইয ইওর এংযাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব দি পেযেন্টস। বাট টেক ইট ফ্রম মি উইদাউট মুসলিম সলিডারিটি ইউ উইল নেভার বি এব্ ল্ টু ডু এনি গুড টু দেম।'

আমি এ কথার বিরুদ্ধে যুক্তি দিবার জন্য মুখ খুলিতেছিলাম। ধমক দিয়া আমাকে থামাইয়া দিলেন এবং আমার কাঁধ হইতে ডান হাতটা আমার মাথায় রাখিয়া বলিলেনঃ 'ডোন্ট আর্গু উইথ মি। আই নো মোর দ্যান ইউ ডু। প্লিয গো টু এভরি হোম, এন্ড ক্যারি দি ম্যাসেজ অব মুসলিম ইউনিটি টু ইচ এন্ড এভরি মুসলিম। দ্যাট উইল সার্ব দি পেযেন্টস মোর দ্যান ইওর প্রজা পার্টি।'

আমি বুঝিলাম এটা তর্ক নয় আদেশ। এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি চলে না। কাজেই কোন কথা বলিলাম না । আসলে বলিবার সময়ই তিনি দিলেন না। কথা শেষ করিয়াই আমার মাথা হইতে হাতটা নামাইয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিলেন। আমি ভক্তি - ভরে ঈষৎ নুইয়া তাঁর হাত ধরিলাম। তিনি দুইটা ঝাকি দিয়া বলিলেন ঃ গুড বাই এণ্ড গুডলাক।

বন্ধুরা বিশেষ কৌতূহলের সংগে আমার অপেক্ষায় বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। দু-এক মিনিটের মধ্যে আমি বাহির হইয়া আসায় তাঁদের কৌতূহলের স্থান দখল করিল বিস্ময়। শুধু বন্ধুবর আশরাফুদ্দিন তাঁর স্বাভাবিক ঘাড়-দোলানো হাসিমুখে বলিলেন ঃ তোমারে নরম পাইয়া একটু আলাদা রকমে ক্যানভাস করলেন বুঝি ? গলাইতে পারলেন ?

সকলেই হাসিলেন। আমিও হাসিলাম। ওতেই কাজ হইল। কোনও জবাবের দরকার হইল না। তার সময়ও পাওয়া গেল না। নূতন বিস্ময় আমাদের সকলের মন কবযা করিল। ইসপাহানি সাহেবদের বাড়িতে জিন্না সাহেবের জন্য যে কামরা নির্দিষ্ট ছিল, সেটা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে একটা প্রশস্ত বারান্দায় পড়িতে হয়। সে বারান্দা পার হইয়া বিশাল ড্রয়িং রুমে ঢুকিতে হয়। আমরা ড্রয়িং রুমে ঢুকিয়াই দেখিলাম, হক সাহেব ও মোমিন সাহেব একই সোফায় পাশাপাশি বসিয়া আছেন। আমরা উভয়কেই আদাব দিলাম। হক সাহেব জিগ্গাসা করিলেন ঃ কি হৈল? অধ্যাপক কবির জানাইলেনঃ ফাঁসিয়া গিয়াছে। মোমিন সাহেব আমাদের দিকে না চাহিয়া শুধু নবাবযাদা হাসান আলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ তোমরা মাথা গরম

রাজনৈতিক নাবালকেরা নিজেরা ত কিছু করতে পারবেই না, আমরা প্রবীণদেরেও কিছু করতে দিবে না।

আমরা মোমিন সাহেবের সহিত তর্ক না করিয়া দু'চার কথায় হক সাহেবকে আমাদের মোলাকাতের রিপোর্ট দিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিনই খবরের কাগযে বাহির হইল জিন্না সাহেব কৃষক-প্রজা সমিতি বাদ দিয়া ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির সহিত আপোস করিয়াছেন। ঐ পার্টি নিজেদের নাম বদলাইয়া মুসলিম লীগ নাম ধারণ করিয়াছেন। আমাদের পক্ষ হইতে অবশ্য বিবৃতি বাহির হইল যে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নেই জিন্না সাহেবের সহিত আমাদের আপোস হইতে পারিলনা।

ইহার পর প্রকাশ্য মাঠের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। যদিও আগের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আমাদেরই দখলে ছিল, কিন্তু জিন্না সাহেবের মোকাবেলায় আমাদের সে দাবি টিকিল না। তাছাড়া কৃষক-প্রজা সমিতির মত অসাম্প্রদায়িক শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান আর মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এক সংগে চালাইবার চেষ্টার মধ্যে যে অসংগতি এমন কি রাজনৈতিক অসাধুতা ছিল, অল্পদিনেই তা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমরা অবস্থা গতিকেই মুসলিম লীগের দখল ছাড়িয়া দিয়া কৃষক-প্রজা সমিতিতে মনোনিবেশ করিলাম। ফলে এই নির্বাচন যুদ্ধ কৃষক-প্রজা সমিতি ও মুসলিম লীগের সম্মুখ-যুদ্ধে পরিণত হইল।

নয়ই অধ্যায়

নির্বাচন–যুদ্ধ

১. সুদূর–প্রসারী সংগ্রাম

১৯৩৭ সালের এই নির্বাচন মুসলিম বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। যুদ্ধটা দৃশ্যতঃ কৃষক–প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ এই দুইটি দলের পার্লামেন্টারি সংগ্রাম হইলেও ইহার পরিণাম ছিল সুদূর প্রসারী। আমরা কর্মীরা এই নির্বাচনের রাজনৈতিক গুরুত্ব পুরাপুরি তখনও উপলব্ধি করিতে পারি নাই সত্য কিন্তু সাধারণভাবে কৃষক–প্রজাগণের এবং বিশেষভাবে মুসলিম জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণ–অকল্যাণের দিক হইতে এ নির্বাচন ছিল জীবন–মরণ প্রশ্ন, এটা আমরা তীব্রভাবেই অনুভব করিতাম। ঐক্যবদ্ধভাবে কঠোর পরিশ্রমও করিয়াছিলাম সকলে। মুসলিম ছাত্র–তরুণরাও সমর্থন দিয়াছিল আশাতিরিক্তরূপে।

পার্টি হিসাবে দুই দলের সুবিধা–অসুবিধা বিচার করিলে দেখা যাইবে উভয়পক্ষেরই কতকগুলি সুবিধা–অসুবিধা দুইই ছিল। মুসলিম লীগের পক্ষে সুবিধা ছিল এই কয়টি ঃ

(১) মুসলিম জনসাধারণ মনের দিক দিয়া মোটামুটি মুসলিম সংহতির প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করিত।

(২) প্রজা–সমিতির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও তাঁর সাথে মৌঃ তমিযুদ্দিন খাঁ খানবাহাদুর আবদুল মোমিন সহ অনেক প্রজা–নেতা মুসলিম লীগে যোগ দিয়াছিলেন। প্রবীণ প্রজা–নেতাদের অনেকে স্বতন্ত্র প্রজা–পার্টি গঠন করিয়াছিলেন।

(৩) মওলানা আকরম খাঁ এই সময় মুসলিম বাংলার একমাত্র দৈনিক 'আজাদ' বাহির করেন, কৃষক–প্রজা পার্টির কোনও সংবাদপত্র ছিল না।

(৪) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে একটা নির্বাচনী মৈত্রী হয় তাতে বোম্বাই যুক্ত প্রদেশ মাদ্রাজ ও বিহারে ঐ দুই প্রতিষ্ঠান যুক্তভাবে নির্বাচন–সংগ্রাম চালান। বাংলার নির্বাচনেও তার ঢেউ লাগে। কংগ্রেসের সমর্থক জমিয়তে–ওলামায়–হিন্দ্ মুসলিম লীগ প্রার্থীদেরে ভোট দিবার জন্য ফতোয়া জারি করেন।

(৫) মুসলিম লীগের তরফ হইতে প্রচার চালাইবার জন্য প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা ছিল। পক্ষান্তরে কৃষক–প্রজা পার্টির কোনও তহবিল ছিল না। প্রার্থীরাও প্রায় সবাই গরিব।

পক্ষান্তরে কৃষক-প্রজা পার্টির অনুকূল অবস্থা ছিল এই কয়টি ঃ

(১) কৃষক-প্রজা আন্দোলনের ও ব্যক্তিগতভাবে হক সাহেবের খুবই জনপ্রিয়তা ছিল। জমিদারি উচ্ছেদ, মহাজনি শোষণ অবসান, কৃষি খাতকের দুরবস্থা দূরকরণ প্রভৃতি গণ-দাবির মোকাবেলায় মুসলিম লীগের কোনও গণ-কল্যাণের কর্ম-সূচী ছিল না।

(২) কৃষক-প্রজা পার্টির কর্মীরা নির্বিলাস সমাজ সেবক দেশ-কর্মী। তাঁদের জনসেবার দৃষ্টান্ত জনগণের চোখের দেখা অভিজ্ঞতা। বিনা পয়সায় পায়ে হাঁটিয়া এঁরা প্রচার করিতেন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের বড় লোক প্রার্থীদের কর্মীরা চটকদার বেশে প্রচারে বাহির হইতেন।

(৩) মুসলিম ছাত্র-তরুণরা সকলেই প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কৃষক-প্রজা পার্টির সমর্থক ছিল।

(৪) নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ মৈত্রী হওয়ায় বাংলার নাইট-নবাবরা প্রজা-কর্মীদেরে কংগ্রেসের ভাড়াটিয়া বলিয়া গাল দিতে অসুবিধায় পড়িলেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেস-লীগ মৈত্রী বাংলার কংগ্রেস মানিয়া না হওয়ায় তাঁদের অনেকে এবং অনেক খবরের কাগয কৃষক-প্রজা পার্টির প্রচার প্রপেগেণ্ডায় সমর্থন করেন।

(৫) পর পর কতকগুলি নাটকীয় ঘটনায় জনমত প্রজা-পার্টির দিকে উদ্দীপ্ত হয়ঃ (ক) হক সাহেবের পক্ষ হইতে (আসলে তাঁর অনুমতি না লইয়াই) ডাঃ আর. আহমদ বাংলার যে কোন নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য সার নাযিমুদ্দিনকে চ্যালেঞ্জ করেন। (খ) বাংলার লাট সার নাযিমুদ্দিনের পক্ষে ওকালতি করায় হক সাহেব লাট সাহেবের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধংদেহি বিবৃতি দিয়া দেশময় বাহ্ বাহ্ পান। (গ) সার নাযিমুদ্দিনের আপন জমিদারি পটুয়াখালি নির্বাচনী এলাকাই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ময়দান নির্বাচিত হওয়ায় ঘটনার নাটকত্ব শতগুণ বাড়িয়া যায়। সারা বাংলার, সারা ভারতের এবং শেষ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার দৃষ্টি পটুয়াখালির দিকে নিবদ্ধ হয়।

২. পটুয়াখালি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ

একদিকে ইংরাজ লাটের প্রিয়পাত্র সার নাযিমুদ্দিনের পক্ষে সরকারী প্রভাব ও ক্ষমতা এবং নাইট-নবাবদের দেদার টাকা, অপরদিকে খেতাববিত্তহীন বৃদ্ধ প্রজা-নেতা হক সাহেবের পক্ষে তাঁর মুখের বুলি 'ডাল-ভাত' ও সমান বিত্তহীন প্রজা-কর্মীরা। রোমান্টিক আদর্শবাদী ছাত্ররা স্কুল-কলেজের পড়া ফেলিয়া বাপ-মায়ের দেওয়া পকেটের টাকা খরচ করিয়া চারিদিক হইতে পটুয়াখালিতে ভাংগিয়া পড়িল। এর ঢেউ শুধু পটুয়াখালিতে সীমিত থাকিল না। সারা বাংলার বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রেও

ছড়াইয়া পড়িল। হক সাহেব খাজা সাহেবের প্রায় ডবল ভোট পাইয়া নির্বাচিত হইলেন। তাঁর বরাবরের নিজের নির্বাচন কেন্দ্র পিরোজপুর হইতেও তিনি নির্বাচিত হইলেন।

আমার নিজের জিলা ময়মনসিংহে আমাদের বিপুল জয়লাভ হইল। আমি নিজে না দাঁড়াইয়া কৃষক-প্রজা প্রার্থীদেরে জিতাইবার জন্য দিনরাত সভা করিয়া বেড়াইলাম। কঠোর পরিশ্রম করিলাম আমারই মত গরিব সহকর্মীদেরে লইয়া। ফলে এ জিলার প্রধান প্রধান লীগ নেতা খান বাহাদুর শরফুদ্দিন, খান বাহাদুর নূরুল আমিন, খান বাহাদুর গিয়াসুদ্দিন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, মৌঃ আবদুল মোনেম খাঁ প্রভৃতি সকলকে ধরাশায়ী করিলাম। জিলার মোট ষোলটি মুসলিম সীটের মধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টি পাইয়াছিল এগারটি, মুসলিম লীগ পাইয়াছিল মাত্র পাঁচটি। উল্লেখযোগ্য যে, জিন্না সাহেব স্বয়ং ময়মনসিংহ জিলাতেই অনেকগুলি নির্বাচন কেন্দ্রে সভা-সমিতি করিয়াছিলেন। তাঁর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নির্বাচন বিশারদ ও ময়মনসিংহের মুসলিম ভোটারদের মনে দাগ কাটিতে পারেন নাই।

৩. নয়া টেকনিক

বরিশালের পরে ময়মনসিংহ জিলাতেই কৃষক-প্রজা পার্টি সবচেয়ে বেশিহারে আসন দখল করিয়াছিল। ময়মনসিংহ জিলার এই অসামান্য সাফল্যের কারণ ছিল তিনটি। এই তিনটি কারণই ছিল এই জিলার কৃষক-প্রজা কর্মীদের প্রচার-প্রপেগেণ্ডার টেকনিক। আত্ম-প্রশংসার মত শোনা গেলেও বলা দরকার যে তিনটি টেকনিকই আমার নিজের উদ্ভাবিত। সহকর্মীদেরে ঐ টেকনিকের ব্যাপারে আগেই তালিম দিয়া লইয়াছিলাম। একটি এই ঃ এ জিলার কৃষক-প্রজা বক্তারা মুসলিম লীগের 'মুসলিম সংহতির' শ্লোগানকে সামনাসামনি আক্রমণ, ফ্রন্টাল এটাক, করিতেন না। মুসলিম জমিদারের সংগে মুসলিম প্রজার, মুসলিম মহাজনের সাথে মুসলিম খাতকের সংহতির কথা বলা হাস্যকর, এ ধরনের মামুলি যুক্তিত ছিলই। এছাড়া অবস্থা ভেদে এবং স্থান ভেদে দরকার-মত আমাদের বক্তারা এই যুক্তি দিতেন ঃ 'আমরাও মুসলিম সংহতি চাই। তবে আমাদের দাবি এই যে সে মুসলিম-সংহতি হইবে কৃষক-প্রজাদের কুটিরের আংগিনায়, নবাব-সুবাদের আহসান-মনযিল বা রাজ-প্রসাদে নয়। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে জমিদার-মহাজন আর কয়জন? শতকরা পঁচানব্বই জন মুসলমানই আমরা কৃষক। কাজেই আমরা কৃষক-প্রজা কর্মীরা বলি ঃ হে মুষ্টিমেয় মুসলমান জমিদার-মহাজনেরা, আপনারা নিজেরা, পৃথক দল না করিয়া মুসলিম-সংহতির খাতিরে চলিয়া আসুন পঁচানব্বই জনের দল এই কৃষক-প্রজা-সমিতিতে।' এর পরে মুসলিম লীগের বক্তারা হাজার সংগতির কথা বলিয়াও সেখানে দাঁত ফুটাইতে পারিতেন না।

আমাদের দ্বিতীয় টেকনিক ছিল এইরূপ। আমাদের বক্তারা তাঁদের বক্তৃতায় বলিতেন ঃ 'আমাদের বক্তৃতা ও যুক্তি-তর্ক শুনিলেন। কোন দলকে আপনারা ভোট দিবেন, আজই এই মুহূর্তে তা স্থির করিয়া ফেলিবেন না। কয়েকদিন পরেই এখানে মুসলিম লীগের সভা হইবে। আপনারা দলে দলে সে সভায় যোগদান করিবেন। মন দিয়া তাঁদের বক্তৃতা শুনিবেন। আমাদের যুক্তি ও তাঁদের যুক্তি মিলাইয়া তুলনামূলক বিচার করিবেন। তারপর ঠিক করিবেন, কোন দলকে আপনারা ভোট দিবেন।' আমাদের বক্তাদের এই ধরনের বক্তৃতার মোকাবিলায় মুসলিম লীগ বক্তারা তাঁদের সভায় বলিতেন ঃ 'কৃষক-প্রজার লোকেরাও এখানে সভা করিতে আসিবে। তাদের কথা শুনিবেন না। তাদের সভায় যাইবেন না। ওরা মুসলিম-সংহতি-ধ্বংসকারী হিন্দু-কংগ্রেসের ভাড়াটিয়া লোক। ওদেরে ভোট দিলে মুসলমানদের সর্বনাশ হইবে।'

এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের বক্তৃতায় মুসলিম জনসাধারণ স্বভাবতঃই কৃষক-প্রজা পার্টির সমর্থক হইয়া পড়িত। যে দল অপর পক্ষের বক্তৃতা শুনিয়া পরে কর্তব্য ঠিক করিতে বলে, তারা নিশ্চয়ই অপর দলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞান মুসলিম জনসাধারণের আছে এটা যাঁরা বিশ্বাস করেন নাই তাঁরাই রাজনীতিতে হারিয়াছেন।

আমাদের তৃতীয় টেকনিক ছিল উভয় পক্ষের যুক্ত নির্বাচনী সভার আয়োজন করার দাবি। আমাদের বক্তারা কোন অঞ্চলে গিয়াই প্রস্তাব দিতেন ঃ 'কি দরকার অত টাকা-পয়সা খরচ ও অতশত পরিশ্রম করিয়া দুইটা মিটিং করিয়া জনসাধারণকে তকলিফ দিবার? দুই পক্ষ মিলিয়া একটা সভা করা হউক। খরচও কম হইবে। লোকও বেশি হইবে।' উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক বক্তা সম-পরিমাণ সময় বক্তৃতা করিবেন। আমাদের পক্ষের এই প্রস্তাবে মুসলিম লীগাররা স্বভাবতঃই আপত্তি করিতেন। যেখানেই আপত্তি করিয়াছেন, পরিণাম তাঁদের পক্ষে সেখানেই খারাপ হইয়াছে। আমাদের প্রস্তাবটা ছিল দুধারি তলওয়ার ঃ মানিলেও আমাদের জিত, না মানিলেও আমাদের জিত।

৪. উত্তর টাংগাইল

এই টেকনিকে সবচেয়ে বেশি ম্যাজিকের কাজ হইয়াছিল টাংগাইল মহকুমার মধুপুর-গোপালপুর নির্বাচন-কেন্দ্রে। এখানে নবাবযাদা সৈয়দ হাসান আলী আমাদের প্রার্থী। আর প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ সাহেব মুসলিম লীগ প্রার্থী। নবাবযাদা ব্যক্তিগতভাবে প্রগতিবাদী তরুণ হইলেও 'অত্যাচারী জমিদার' বলিয়া পরিচিত নবাব বাহাদুর নবাব আলীর পুত্র। পক্ষান্তরে ইব্রাহীম খাঁ সাহেব জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ, সুপরিচিতি সাহিত্যিক ও প্রবীণ সমাজ-সেবক। তাছাড়া স্বয়ং জিন্না সাহেব এই নির্বাচনী-কেন্দ্রে খুব ধূমধামের সাথে জন-সভা করিয়াছেন। এসবের ফল হইল এই

যে নির্বাচনের মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে একদিন নবাবযাদা সকালবেলা আমার বাসায় হাযির। তাঁর মোটর ধূলায় সাদা। নিজের চেহারা তাঁর উস্কুখুস্কু। কয়দিন ধরিয়া না জানি শেভও করেন নাই। গোসলও করেন নাই । অমন সুন্দর চেহারাখানা একদম মলিন। কত রাত ঘুমান নাই। চোখ লাল। চোখের চারধারে কালশিরা পড়িয়া গিয়াছে। এমন অসময়ে তাঁকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। উদ্বিগ্নও হইলাম। কারণ জিগ্‌গাসা করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ ইলেকশনে জিতার তাঁর কোনই চান্স নাই। তিনি বড়-জোর এক আনি ভোট পাইবেন ; পনর আনিই পাইবেন প্রিন্সিপাল সাহেব। এ অবস্থায় ইলেকশনে লড়িয়া কোনও লাভ নাই। তিনি হাজার দশেক টাকা খরচ করিবেন বাজেট করিয়াছিলেন। অর্ধেকের বেশি খরচ হইয়া গিয়াছে। বাকী টাকাটা তাঁর নিজের ইলেকশনে নিশ্চিত অপব্যয় না করিয়া অন্যান্য গরিব প্রার্থীর পিছনে খরচ করা উচিৎ। এই কথাটা বলিবার জন্যই এবং বাকী টাকাটা লইয়াই তিনি আমার কাছে আসিয়াছেন। তিনি আর ইলেকশন করিবেন না, কর্মীদেরে তা বলিয়া আসিয়াছেন।

আমি এক ধ্যানে তাঁর কথাগুলি শুনিলাম। এক দৃষ্টে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলাম। বড় লোকের আদরের দুলাল। কাঁচা সোনার মত চেহারা। জীবনে কোনও সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই বিলাসী বাবা। কোনও নির্বাচনে হারেনও নাই আজো। অল্পদিন আগে কৃষক-প্রজা টিকিটে বিপুল ভোটাধিক্যে লোক্যাল বোর্ড ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে নির্বাচিত হইয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হইয়াছেন। আর আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই তরুণ মনে এমন আঘাত পাইয়াছেন। সেটাও বড় কথা নয়। সে পরাজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনার সামনে কি অপরূপ বীরত্বের সাথে বুকটান করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। না, এ তরুণকে হারিতে দেওয়া হইবে না।

এক নাগাড়ে অনেক দূর ট্রেন ও সাইকেল ভ্রমণ করিয়া অনেকগুলি সভা করিয়া মাত্র গতরাতে বাসায় ফিরিয়াছি। ভালরূপ খাওয়া-ঘুমও হয় নাই। আবার এই দশটার গাড়িতেই আরেকটা সভা করিতে যাইবার কথা। এক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলাম। নবাবযাদার নির্বাচনী এলাকাতেই যাইব। নবাবযাদাকে বলিলাম শেভ-গোসল করিয়া চারটা ডাল-ভাত খাইয়া একটু বিশ্রাম করিতে। আমিও তাই করিলাম। সন্ধ্যার দিকে ধনবাড়ি পৌঁছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত পরবর্তী দিনসমূহের জন্য প্ল্যান-প্রোগ্রাম করিলাম। সকাল হইতে সভা করিয়া চলিলাম। তিনদিনে তিনটা বড় সভা করিলাম। আর পথের ধারের সভা-রোড সাইড মিটিং করিলাম উনিশটা। হাটের সভা করিলাম না। কর্মীরা ঢোল ও চোংগা লইয়া আগে-আগে চলিয়া যাইতেন। এক সভা শেষ করিতে-করিতে দুই-তিন মাইল দূরে আরেকটা সভার আয়োজন হইয়া যাইত।

সভা মানে দুই তিন পাঁচ সাতশ লোকের জমায়েত। বড় সভা যে কয়টা করিলাম তার দুইটা ছিল যুক্ত সভা।

যুক্ত সভার মধ্যে খোদ ভূয়াপুরের সভাটাই ছিল সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। এটা ইব্রাহিম খাঁ সাহেবের কর্ম-ক্ষেত্র। এই স্থানটাকে উন্নত করার কাজে প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁর কর্ম-জীবনের বেশির ভাগ ব্যয় করিয়াছেন। এই ভূয়াপুরেই নির্বাচনী যুক্ত সভা। অঞ্চলের সবচেয়ে মান্যগণ্য সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এক মুরুব্বিকে সভাপতি করা হইল প্রিন্সিপাল সাহেবের প্রস্তাব-মত। কথা হইল : তিনি আর আমি মাত্র এই দুই জন বক্তৃতা করিব। আমাদের বক্তৃতা শেষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নবাবযাদা দাঁড়াইয়া জনসাধারণকে শুধু একটা সেলামালেকুম দিবেন।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ রাজনীতি, সাহিত্য-সাধনা ও প্রজা-আন্দোলন সব ব্যাপারেই আমার নেতা ও মুরুব্বি। ছাত্র-জীবনেও তিনি ছিলেন আমাদের নেতা ও 'হিরো'। তাঁরই সংগে নির্বাচনী বক্তৃতার লড়াই করিতে হইতেছে। এর একটু ইতিহাস আছে। প্রিন্সিপাল সাহেব ময়মনসিংহ প্রজা-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি টাংগাইল মহকুমা প্রজা-সমিতির প্রেসিডেন্ট। কাজেই স্বভাবতঃই তিনি নির্বাচনে প্রজা-সমিতির মনোনয়ন চাহিয়া দরখাস্ত দিলেন। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে একটা চিঠিও দিলেন। প্রজা-সমিতি তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি ও প্রবীণ নেতাকে মনোনয়ন দিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু একটু অসুবিধা হইল এই যে নবাবযাদা হাসান আলী এবং প্রিন্সিপাল সাহেব একই এলাকার লোক। মনোনয়ন চাইলেন উভয়ে একই এলাকা হইতে। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। নবাবযাদাকে নিজ এলাকা হইতে নমিনেশন না দিলে আর দেওয়াই যায় না। তিনি তরুণ ও অপরিচিত। যা-কিছু পরিচয় তাঁর বাপের নামে। প্রজাদের পক্ষে সেটা সুপরিচয় নয়। পক্ষান্তরে প্রিন্সিপাল সাহেব সারা বাংলায় সুপরিচিত। যে কলেজের তিনি প্রিন্সিপাল সেই করটিয়া কলেজ মধ্য-টাংগাইল নির্বাচকমণ্ডলীতে অবস্থিত। তাঁর শক্তির উৎস যে ছাত্র-শক্তি, সেই ছাত্র-বাহিনী মধ্য টাংগাইলে অবস্থিত। কলেজের সেক্রেটারি করটিয়া স্টেটের মোতায়াল্লি নবাব মিয়া সাহেব (মসউদ আলী খান পন্নী) মধ্য-টাঙ্গাইলে দাঁড়াইলে প্রিন্সিপাল সাহেবের যে অসুবিধা ও বেকায়দা হইত তাও হয় নাই। কারণ নবাব মিয়া সাহেব দাঁড়াইয়াছেন দক্ষিণ টাংগাইল নির্বাচনী এলাকাতে। এসব কথাই আমি প্রিন্সিপাল সাহেবকে পত্রে ও মুখে বুঝাইলাম। এর উপরও আরও দুইটা কথা বলিলাম। এক, তাঁর মত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তিকে এ জিলার যেকোন নির্বাচনী এলাকা হইতে পাস করাইয়া আনিবার মত প্রভাব ও জনপ্রিয়তা প্রজা-সমিতির আছে এবং তা করিবার গ্যারান্টিও আমি দিলাম। দুই, নবাবযাদাকে তাঁর জমিদারির বাহিরে অন্য কোন নির্বাচনী এলাকাতে খাড়া করিলে লোকেরা বলিবে অত্যাচারী জমিদার হিসাবে

নিজের জমিদারিতে ভোট পাইবেন না বলিয়াই নবাবযাদা অন্যখানে দাঁড়াইয়াছেন। অতএব হয় নবাবযাদাকে মধুপুর-গোপালপুরে দাঁড় করাইতে হয়, নয়ত তাঁকে একদম বাদ দিতে হয় এই উভয়কূল রক্ষার জন্য নবাবযাদা ও প্রিন্সিপাল সাহেবের কেসটা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের কাছে দেওয়া হইল। তাঁরাও আমার সমর্থন করিলেন। নবাবযাদাকে উত্তর-টাঙ্গাইল ও প্রিন্সিপাল সাহেবকে মধ্য-টাংগাইলে মনোনয়ন দেওয়া হইল।

কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব আমাদের মনোনয়ন অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর-টাংগাইলে মনোনয়নপত্র দাখিল করিলেন এবং মুসলিম লীগের টিকিট চাইলেন। মুসলিম লীগ প্রিন্সিপাল সাহেবের মত দেশ-বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সেবককে লুফিয়া লইলেন। এইভাবে এক কালের প্রজা-নেতা আমার সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক গুরুর বিরুদ্ধে ক্যানভাস করিবার জন্য আমি ভূয়াপুর আসিয়াছি।

বক্তৃতাও করিলাম দরদ দিয়া প্রাণ ঢালিয়া। একটা অশ্রদ্ধাপূর্ণ শক্ত কথাও বলিলাম না। শুধু ঘটনা-পরম্পরা বর্ণনা করিয়া গেলাম। প্রিন্সিপাল সাহেবও সুবক্তা রসিক বাগ্মী। কিন্তু মামলা ছিল তাঁর খুবই জটিল। সব পার্টির মতই প্রজা-সমিতিরও মনোনয়ন চাওয়ার নিয়ম ছিল, দরখাস্তে স্পষ্ট করিয়াই লেখা থাকিত : 'প্রজা-পার্টির মনোনয়ন মানিয়া লইব। মনোনয়ন না পাইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইব। স্বাধীনভাবে বা অন্য কোনও পার্টির মনোনয়ন লইয়া নির্বাচন লড়িব না।' আমি এই প্রতিজ্ঞা-পত্র সভায় উপস্থিত করিলাম। প্রিন্সিপাল সাহেব স্বভাবতঃই স্বীকার করিলেন। তারপরে তাঁর বক্তৃতা আর ভাল জমিল না। নবাবযাদা ডবলের বেশি ভোট পাইয়া জয়লাভ করিলেন।

৫. অমানুষিক খাটুনি

এই নির্বাচন উপলক্ষে আমরা সকলেই অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলাম। স্বয়ং নবাবযাদা হাসান আলী ও মৌঃ আসাদুদদৌলা সিরাজীর মত সুখী লোকেরাও গভীর রাতে পায়ে হাঁটিয়া নদী-নালা পার হইয়াছেন। অনেক সহকর্মী লইয়া আমি অন্ধকার রাতে সাইকেল কাঁধে করিয়া মাইলের পর মাইল বালুচর পার হইয়াছি। এই সবের শারীরিক প্রতিক্রিয়া অন্ততঃ আমার উপর অদ্ভুত হইয়াছিল। যেদিন ভোটাভুটি শেষ হয়, সেদিন নিশ্চিত জয়ের রংগিন চিত্র আঁকিতে-আঁকিতে সন্ধ্যার কিছু আগে বাসায় ফিরিলাম। অনেক দিন পরে শেভ-গোসল করিয়া পরিতৃপ্তির সংগে খাইয়া সন্ধ্যার সময় দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। আন্দায ছয়টা-সাতটা হইবে। আমার ঘুম না ভাংগা পর্যন্ত আমাকে ডিস্টার্ব না করিতে নির্দেশ দিয়া শুইলাম। পরদিন রাত্রি নয়টার সময় আমার ঘুম ভাংগে। অর্থাৎ একঘুমে আমি ছাব্বিশ ঘন্টা কাটাইয়া ছিলাম। এই

সময়টার মধ্যে আমার বাড়িতে প্রথমে দুশ্চিন্তা ও পরে কান্নাকাটি পড়িয়াছিল। মহল্লায় জানাজানি হইয়া গিয়াছিল বন্ধু-বান্ধবের ভিড় হইয়াছিল। জানালা দিয়া আমার পেটের উঠানামা দেখিয়াই আমার জীবিত থাকা সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিত হইয়াছিলেন। এই ছাব্বিশ ঘন্টায় আমার ক্ষুধা পেশাব পায়খানা লাগে নাই। আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, তিনি জানালার ফাঁকে খুব লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, এই ছাব্বিশ ঘন্টায় আমি তিনবারের বেশি পাশ ফিরি নাই।

৬. জয়-পরাজয়ের খতিয়ান

এত সাধের ইলেকশন, এত শ্রমের জয়, সব গোলমাল হইয়া গেল নির্বাচনের পরে। দেখা গেল, একশ উনিশটা মুসলিম আসনের মধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টি মাত্র তেতাল্লিশটা পাইয়াছে। আমাদের হিসাব মতে মুসলিম লীগ পাইয়াছে মাত্র আটত্রিশটা। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ মুসলিম সমাজে, তখনও পার্টি-সিস্টেম ও পার্টি-আনুগত্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দানা বাঁধে নাই। কাজেই সুস্পষ্ট ইস্যুর উপর দুইদলের মুখামুখি নির্বাচন-যুদ্ধ হওয়ার পরও দেখা গেলে যে কোন দলের ঠিক কতজন নির্বাচিত হইয়াছেন, তা অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে। দেখা গেল, অনেক অদলীয় মেম্বরও নিজেদের সুবিধা-মত দুই দলের কোনও একদলে ভিড়িয়া পড়িতেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ করিয়া বুঝা গেল মুসলিম লীগ পার্টির মহিলা ও শ্রমিক সদস্য সহ ষাটজনের বেশি সদস্য হইয়া গিয়াছেন। টানিয়া-বুনিয়া আমরাও আমাদের আটান্ন জন মেম্বার আছেন দাবি করিতে লাগিলাম। এছাড়া পঁচিশজন ইউরোপীয়ান ও চারজন এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এই মোট উনত্রিশ জন সদস্য লাট সাহেবের ইশরায় মুসলিম লীগ দলকেই সমর্থন করিবেন। এটা একরূপ ধরা কথা। যাঁরাই মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন, তফসিলী হিন্দুদের অন্ততঃ কুড়িজন মেম্বর তাঁদেরই সমর্থন করিবেন, এটাও স্পষ্ট বোঝা গেল। এ সব হিসাব করিয়াও কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা ছিল না। তৎকালে আইন পরিষদে মোট মেম্বর-সংখ্যা ছিল আড়াইশ। তার মধ্যে বিশেষ নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রতিনিধিসহ মুসলমান ১২২, বর্ণহিন্দু ৬৪, তফসিলী হিন্দু ৩৫, ইউরোপীয়ান ২৫ ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ৪। বর্ণহিন্দু ও তফসিলীদেরে মিলাইয়া ষাটের উপর ছিলেন কংগ্রেসী। এঁরা মুসলিম লীগকে কিছুতেই সমর্থন করিবেন না। মাদ্রাজ-বোম্বাই ও যুক্ত-প্রদেশের লীগ-কংগ্রেস আপোস সত্ত্বেও বাংলায় এই পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। এ অবস্থায় সমস্ত শ্বেতাংগ সদস্য, এক ডজন হিন্দু রাজা-মহারাজ ও কুড়িজন তফসিলী হিন্দু মুসলিম লীগকে সমর্থন করিলেও তাঁরা মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে কৃষক-প্রজা সমিতি তা পারে। কারণ কৃষক-প্রজা পার্টি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। একমাত্র জামিদারি উচ্ছেদের চরমপন্থী দাবির জন্যই অধিকাংশ বর্ণহিন্দু এই পার্টির বিরোধী। এটাই ফয়সালা হইয়া যাইবে হিন্দু-সমাজে

হক সাহেবের ব্যক্তিগত জন-প্রিয়তার দ্বারা। গোড়াতে শ্বেতাংগরা হক সাহেব ও তাঁর দলকে সমর্থন করিবেন না বটে, কিন্তু একটা মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া গেলে তাঁরা সে মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিবেন ইহাই শ্বেতাংগদের নীতি।

৭. কংগ্রেস–প্রজা পার্টি আপোস চেষ্টা

এ অবস্থায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলই কৃষক-প্রজা পার্টির সংগে আপোস করিতে চাইলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবে না, এটা আগেই ঘোষণা করায় আমরা কংগ্রেসের সহিত কোয়েলিশন করাই অধিকতর সুবিধা-জনক মনে করিলাম। কারণ এতে হক সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্ব অবধারিত হয়। কৃষক-প্রজা দলের বেশি লোককে মন্ত্রী করাও যায়। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের প্রধান মন্ত্রিত্বের দাবি আছে। কাজেই মুসলিম লীগের প্রসারিত হাত অগ্রাহ্য করিয়া আমরা কংগ্রেসের সহিত কথা চালাইলাম। কংগ্রেসের সহিত মূলনীতিগত ঐক্যমত থাকায় আপোসের শর্ত নির্ধারণ অতি সহজ মনে হইল । কতিপয় বড়-বড় শর্ত ঠিক হওয়ার পরই বিশেষ যরুরী কাজে আমি ময়মনসিংহ চলিয়া আসিলাম । কথা থাকিল, সব চূড়ান্ত হওয়ার সময় আমি আবার আসিব। মৌঃ সৈয়দ নওশের আলী, মৌঃ শামসুদ্দিন, মৌঃ আশরাফুদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক হুমায়ুন করিব, নবাবযাদা হাসান আলী প্রভৃতি আমার চেয়ে যোগ্য বন্ধুরা আলোচনার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি নিশ্চিন্তে ময়মনসিংহে চলিয়া আসিলাম। দুই-তিন দিন যাইতে না-যাইতেই হক সাহেবের টেলিগ্রাম পাইয়া ছুটিয়া গেলাম। হক সাহেব বড় খুশী। তিনি খুশীতে তাঁর বেলচার মত হাত দিয়া আমার পিঠে থাপ্পড় মারিতে লাগিলেন। কংগ্রেস আমাদের সকল শর্ত মানিয়া লইয়াছে। আমিও উল্লসিত হইলাম।

সেদিনই রাত্রি আটটায় মিঃ জে. সি. গুপ্তের বাড়িতে ডিনার। সেখানে চূড়ান্ত শর্তাবলী উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে। উভয় পক্ষে আট অথবা দশ জন করিয়া যোল অথবা কুড়ি জনের ডিনার। আমাদের পক্ষে হক সাহেব, সৈয়দ নওশের আলী, শামসুদ্দিন, আশরাফুদ্দিন, নবাবযাদা খানবাহাদুর হাশেম আলী, অধ্যাপক কবির, ডাঃ আর. আহমদ ও আমি প্রভৃতি, কংগ্রেস পক্ষ হইতে মিঃ শরৎ বসু, নলিনী সরকার, ডাঃ বিধান রায়, জে. এম. দাশগুপ্ত, কিরণ শংকর রায়, সন্তোষ কুমার বসু, ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জী ও জে. সি. গুপ্ত প্রভৃতি। হৃদ্যতার আবহাওয়ার মধ্যেই আলাপ-আলোচনা চলিল । শর্তাবলী আগেই ঠিক হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপোস-রফার কোনও কথাই উঠিল না। শুধু ভবিষ্যৎ লইয়াই রংগিন চিত্র আঁকার প্রতিযোগিতা চলিল। ডিনার খাওয়া হইল। মিঃ গুপ্ত আমিরী-বাদশাহী খানার জন্য মশহুর ছিলেন। ডিনারে তাই হইল। খাওয়ার পরে শর্তাবলী দস্তখতের সময় আসিল। গুপ্ত সাহেব আগেই সব টাইপ করাইয়া রেডি রাখিয়াছিলেন। তিনি সে সব কাগয

হাযির করিলেন। নেতাদের ইশারায় তিনি শর্তনামাটি পড়িয়া শুনাইলেন। শর্তনামার ক্ষুদ্র ভূমিকায় দেশের এই সন্ধিক্ষণে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা পার্টির মত দুইটি প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিশনের আবশ্যকতা সংক্ষেপে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। তারপরেই ক্রমিক নম্বর দিয়া মন্ত্রি-সভার করণীয় কার্যাবলীর তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তাতে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা সমিতির ইলেকশন মেনিফেস্টোর প্রধান-প্রধান ধারা যথা জাতীয় দাবি, রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি, প্রজা স্বত্ব আইন, মহাজনী আইন, কৃষি ঋণ, সালিশী বোর্ড, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত প্রগতিমূলক কার্যক্রমই ছিল। মিঃ গুপ্তের পড়া শেষ হইলে করতালি-ধ্বনিতে কার্যক্রমটি অভিনন্দিত হইল।

করতালি-ধ্বনি থামিলে আমি দাঁড়াইলাম। আমি সেই দিনই মফস্বল হইতে আসিয়াছি বলিয়া এই প্রথম কার্যক্রমটি শুনিলাম। অতি চমৎকার হইয়াছে। এটাকে আইডিয়াল মেগ্‌নাকার্টা-অব-বেংগল বলা যায়। মুসাবিদাকারীকে ধন্যবাদ। কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা নেতাদেরে ধন্যবাদ। এ সব কথা বলিয়া শেষে বলিলাম ঃ 'আমার সামান্য একটু সংশোধনী প্রস্তাব আছে।' নেতাদের উজ্জ্বল মুখ হঠাৎ অন্ধকার হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি যোগ করিলাম ঃ 'এটাকে সংশোধন বলা অন্যায় হইবে শুধু ক্রমিক নম্বরের একটু ওলট-পালট মাত্র।'

৮. কংগ্রেস-নেতাদের অদূরদর্শিতা

মিঃ গুপ্তের পঠিত শর্তনামায় ক্রমিক নম্বর ছিল এইরূপ ঃ (১) স্বরাজ দাবির প্রস্তাব গ্রহণ, (২) রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি, (৩) প্রজা স্বত্ব আইন সংশোধন, (৪) মহাজনী আইন পাস ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি প্রস্তাব করিলাম যে শুধু ২নং দফাকে ৩নং ও ৪নং দফার নিচে আনিয়া ক্রমিক নম্বর সংশোধন করা হউক। আমার এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি যা বলিলাম তার সংক্ষিপ্ত সার-মর্ম এই ঃ রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির প্রশ্নে লাট সাহেব যদি ভেটো করেন তবে মন্ত্রি-সভাকে আত্ম-সম্মানের খাতিরে পদত্যাগ করিতে হইবে। (কংগ্রেস-নেতাদের কেউ কথায় কেউবা মাথা ঝুকাইয়া আমার কথায় সায় দিলেন)। সে অবস্থায় আইন-পরিষদের পুনর্নির্বাচন হইতে পারে। (এ কথায়ও কংগ্রেস নেতারা সায় দিলেন)। সে নির্বাচনে কৃষক-প্রজা সমিতি মুসলিম লীগের কাছে হারিয়া যাইবে। কারণ সকলেই জানেন, নির্বাচনের সময় তারা কৃষক-প্রজা-সমিতিকে কংগ্রেসের লেজুড় আখ্যা দিয়াছে এবং কৃষক-খাতকের কল্যাণের সমস্ত ওয়াদাকে ভাওতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এখন যদি কৃষক ও খাতকদের হিতের কোনও আইন পাস না করিয়াই আমরা রাজনৈতিক ইশুতে পদত্যাগ করি, তবে মুসলিম লীগের সেই মিথ্যা অভিযোগকে সত্য প্রমাণ করা হইবে। অতএব আমার নিবেদন এই যে, মন্ত্রিসভা আগে কৃষক-প্রজা সমিতির ওয়াদা-মাফিক

প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করিবেন, খাতকদেরে রক্ষার জন্য মহাজনি আইন পাস করিবেন, এবং কৃষি-খাতকদের জন্য সালিশী বোর্ড গঠন করিবেন। এসব কাজ করিবার পর রাজনৈতিক বন্দীদেরে মুক্তির ব্যবস্থা করিবেন, এবং বিনা বিচারে আটকের আইন বাতিল করিবেন। লাট সাহেব এতে বাধা দিলে আমরা মন্ত্রিসভা হইতে এবং আইন-পরিষদ হইতে সদলবলে পদত্যাগ করিব, পুনর্নির্বাচনের দাবি করিব। গোটা দেশবাসী আমাদেরে সমর্থন করিবে। সে নির্বাচনে কংগ্রেস সমস্ত হিন্দু সীট এবং কৃষক-প্রজা সমিতি সমস্ত মুসলিম সীট দখল করিবে।

সমবেত মুসলিম নেতাদের প্রায় সকলেই আমার কথার সমর্থন করিলেন। কিন্তু কংগ্রেস-নেতারা তা করিলেন না। তাঁরা আবেগময়ী ভাষায় বলিলেন ঃ রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তির প্রশ্নটা জাতীয় সম্মান-অসম্মানের প্রশ্ন। বিশেষতঃ আন্দামান দ্বীপে তখন শত শত বাংগালী রাজনৈতিক বন্দী অনশন করিয়া জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে উদ্বেগজনক সময় অতিবাহিত করিতেছেন। এই প্রশ্নের সাথে কৃষক-খাতকের অর্থনৈতিক প্রশ্নের তুলনা হইতে পারে না।

উভয় পক্ষ হইতেই যুক্তি-তর্ক দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু উভয় পক্ষ অটল রহিলেন। চার-পাঁচ ঘন্টা আলোচনায়ও এই অচল অবস্থার কোনও অবসান ঘটিল না। রাত প্রায় একটার সময় সভা ভাংগিয়া গেল। সকলেই বিমর্ষ হইয়া মিঃ গুপ্তের বাড়ি হইতে বাহির হইলাম।

এই ঘটনা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু-নেতাদের অদূরদর্শী অনুদারতায় কিভাবে ছোট-ছোট ব্যাপার হইতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দূরত্ব প্রসারিত হইয়াছে, এই ঘটনা তাঁর একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যদি ঐদিন কংগ্রেস কৃষক-প্রজা পার্টিতে আপোস হইয়া যাইত, তবে কি হইত একবার অনুমান করা যাক। হক সাহেবের মত সবল ও জনপ্রিয় নেতা কংগ্রেসের পক্ষে থাকিতেন, মুসলিম লীগে যাইতে বাধ্য হইতেন না। বাংলার কৃষক-প্রজারা কংগ্রেসের প্রতি আস্থাশীল হইত।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির নবাবযাদা হাসান আলী ও আমি নবাবযাদার বাড়িতে বসিয়া চরম অস্বস্তির মধ্যে ব্যাপারটার পর্যালোচনা করিলাম। কংগ্রেস-নেতাদের আবেগময়ী বক্তৃতার জবাবে শেষ পর্যন্ত আমরা রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির দফাটা দুই নম্বরে রাখিতেও রাযী হইয়াছিলাম, কেবল শর্ত করিয়াছিলাম যে লাট সাহেব ঐ প্রস্তাব ভেটো করিলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবেন না । পদত্যাগ যদি করিতেই হয়, তবে প্রজাস্বত্ব ও মহাজনি আইন পাস করার পরই তা করা হইবে । কংগ্রেস-পক্ষ তাতেও রাযী হন নাই। আমরা তিন বন্ধুতে পর্যালোচনা করিয়া একমত হইলাম যে শরৎ বাবু কংগ্রেস-নেতাদের এই মনোভাবে অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি এই ইশুতে আপোস-রফা ভাংগিয়া দিতে রাযী ছিলেন না। অতএব আমরা ঠিক করিলাম

শরৎ বাবুর সাথে একা দেখা করিতে হইবে। এই রাত্রেই করিতে হইবে। কারণ আমাদের চক্ষে ঘুম নাই। আর একরাত্রে কত কি হইয়া যাইতে পারে।

৯. কংগ্রেস–কৃষক প্রজা আপোস–চেষ্টা ব্যর্থ

যেমন কথা তেমনি কাজ। আমরা তিন বন্ধুতে গেলাম হক সাহেবের বাড়ি। তাঁকে অনেক বুঝাইয়া নিয়া গেলাম শরৎ বাবুর বাড়িতে। রাত্রি তখন আড়াইটা কি তিনটা। অনেক ডাকাডাকি করিয়া দারওয়ানকে জাগাইলাম। তার আপত্তি ঠেলিয়া ভিতরে গেলাম। হক সাহেবের নামের দোহাই–এ দারওয়ান অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরে গেল । প্রায় পনর বিশ মিনিট পরে মিসেস বোস নিচে নামিয়া আসিয়া জানাইলেন ঃ তিনি খুবই দুঃখিত, শরৎ বাবুর মাথা ধরিয়াছে। বেদনায় ছটফট করিয়া এইমাত্র তিনি একটু ঘুমাইয়াছেন। তিনি কিছুতেই তাঁর ঘুম ভাংগাইবেন না।

আমরা অগত্যা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। হক সাহেব শরৎ বাবুর উপর যা রাগিয়াছিলেন, তার সবটুকু ঢালিলেন আমাদের উপর। বিনা বাক্যব্যয়ে হক সাহেবের গালাগালি মাথায় লইয়া তাঁকে তাঁর বাসায় পৌছাইয়া দিলাম । আমরা সকলে একমত হইলাম যে কংগ্রেস নেতৃত্বের দোষে আজ বাংলার কপাল পুড়িল। পরবর্তী ঘটনাবলী আমাদের এই আশংকার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

ও–দিকে গুপ্ত সাহেবের বাড়িতে আমাদের আলোচনা–সভা চলিতে থাকা কালে মুসলিম লীগের এজেন্টরা কাছে–নযদিকেই ওৎ পাতিয়া সময় কাটাইতেছিলেন। আমাদের আপোস–রফা ভাংগিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই তাঁরা আমাদের সেক্রেটারি মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদকে একরূপ কিডন্যাপ করিয়া ঢাকার নবাব বাহাদুরের বাড়িতে নিয়া যান। মুসলিম লীগ নেতাদের অনেকেই সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শামসুদ্দিন সাহেবের সহিত তাঁরা আলোচনা করেন। শরৎ বাবুর বাড়ি হইতে সবে মাত্র আমরা হক সাহেবের বাড়িতে পৌছিয়াছি, অমনি শামসুদ্দিন সাহেব হাঁপাইতে–হাঁপাইতে খবর লইয়া আসিলেন, হক সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী মানাসহ কৃষক–প্রজা পার্টির সমস্ত কার্যক্রম মানিয়া লইয়া মুসলিম লীগ আমাদের সাথে কোয়ালিশন করিতে রাযী হইয়াছেন। তখনকার মানসিক অবস্থায় হক সাহেব স্বভাবতঃই সোল্লাসে ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইলেন। আমরাও অগত্যা সম্মতি জানাইলাম।

দশই অধ্যায়

হক মন্ত্রিসভা গঠন

১. কৃষক–প্রজা–মুসলিম লীগ কোয়েলিশন

কংগ্রেস–নেতাদের সাথে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হওয়ায় লীগ–নেতাদের সাথে আলাপ–আলোচনায় কোনও অসুবিধা হইল না। ফলে এক দিনেই সব ঠিক হইয়া গেল। এগার জনের মন্ত্রিসভা হইবে। মুসলমান ছয়, হিন্দু পাঁচ। মুসলিম ছয় জনের মধ্যে কৃষক–প্রজা তিন, মুসলিম লীগ তিন। হিন্দু পাঁচ জনের মধ্য বর্ণহিন্দু তিন জন ও তফসিলী হিন্দু দুইজন থাকিবেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের নাম আগেই ঠিক হইয়া গিয়াছিল। কৃষক–প্রজা–পার্টির তরফে হক সাহেব ছাড়া আর থাকিবেন মৌঃ সৈয়দ নওশের আলী ও মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ। লীগ পক্ষে থাকিবেন নবাব বাহাদুর হবিবুল্লাহ, সার নাযিমুদ্দিন, মিঃ শহীদ সুহরাওয়ার্দী। দুই–এক দিনের মধ্যে হিন্দু মন্ত্রীদেরও নাম ঠিক হইয়া গেল। বর্ণ হিন্দুদের পক্ষে থাকিবেন মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার, মিঃ বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ও কাসিম বাজারের মহারাজা শ্রীশ নন্দী। তফসিলী হিন্দুদের পক্ষে থাকিবেন মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক ও মিঃ প্রসন্নদেব রায়কত।

২. গভীর রাত্রের নাটক

অতঃপর আমার কোনই কাজ ছিল না। তবু বন্ধুদের অনুরোধে সুয়ারিং–ইন্–সিরিমনিটা দেখিবার জন্য কলিকাতায় আরেক দিন থাকিয়া গেলাম। পরদিন সুয়ারিং হইবে। সার্বিক শান্তি ও আনন্দ–উল্লাসের মধ্যে হঠাৎ বিকালের দিকে গুজব রটিল বন্ধুবর শামসুদ্দিন বাদ পড়িয়া যাইতেছেন। শামসুদ্দিন সাহেব স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আমরাও কম চঞ্চল হইলাম না। সন্ধ্যার শো সিনেমা দেখার প্ল্যান স্যাক্রিফাইস করিয়া বন্ধু–বান্ধব সহ হক সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি গুজবের সত্যতা অস্বীকার করিলেন। আমরা খুশী হইয়া বিদায় হইলাম। কিন্তু হক সাহেব সকলকে বিদায় দিয়া শুধু আমাকে থাকিতে বলিলেন। রাত্রি নয়টার সময় তিনি একা আমাকে লইয়া বাহির হইলেন। ড্রাইভারকে কিছুই বলিলেন না। অথচ ড্রাইভার মাত্র পাঁচ–সাত মাইল বেগে যেন নিজের ইচ্ছামত গাড়ি চালাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ চালাইল। মনে হইল সারা কলিকাতা শহর ঘুরিল। ঘোড়ার গাড়ি এমনকি রিক্শা সামনে পড়িলেও তা পাশ কাটাইয়া গেল না। পিছন–পিছন যাইতে লাগিলাম। আমি প্রথমে এ সব কিছুই লক্ষ্য করিলাম না। কারণ হক সাহেব খুব উঁচু স্তরের কথাবার্তা

বলিতে থাকিলেন। বাংলার সাত কোটি গরিব কৃষক-প্রজার ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করিবার যে মহান দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য আল্লাহ আজ তাঁর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন, সেটা তিনি কেমন করিয়া যে পালন করিবেন, সে চিন্তায় তাঁর বুক কাঁপিতেছে। শুধু মুখে বলিলেন না, আমার একটা হাত টানিয়া নিয়া তাঁর বুকে লাগাইলেন। সত্যই তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল। পরম ভক্তিতে আমার বুক ভরিয়া গেল। এই সব কথার মধ্যে হক সাহেবের গাড়ি মাত্র দুইবার থামিল। একবার বেনিয়াপুকুর রোডের এক দর্যির দোকানে ; আরেকবার মেছুয়া বাজার স্ট্রিটের এক হাকিম সাহেবের ডিস্পেনসারিতে। দুই জায়গায় তিনি বড় জোর আধ ঘন্টা খরচ করিলেন। বাকী সব সময় গাড়ি চলিতেই থাকিল। ঐ সব উঁচুস্তরের কথার উপসংহারে হক সাহেব বলিলেন যে তাঁর ঐ মহান দায়িত্ব পালনে গরিবের দুশমনরা অনেক রকমে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। এসব বিঘ্ন অতিক্রম করিতে আল্লাহ তাঁহাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন। তবে তিনি সে কাজে আমার সহযোগিতার উপর অনেকখানি নির্ভর করেন,কারণ আমি মন্ত্রী-মেম্বর না হওয়ায় আমার মূল্য সকলের কাছে অনেক বেশি। আমি গর্ব ও আনন্দে উৎসাহের সংগে সে আশ্বাস দিতে দিতেই গাড়ি আসিয়া একটা প্রাসাদের গাড়ি-বারান্দায় থামিল। একটা লোক দৌড়িয়া আসিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া হক সাহেবকে কুর্নিশ করিল। হক সাহেব বাহির হইলেন। অপর দিককার দরজা দিয়া আমি বাহির হইলাম। বাহির হইয়াই বুঝিলাম এটা মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকারের লোয়ার সারকুলার রোডস্থ প্রাসাদতুল্য বাড়ি 'রঞ্জনী'। বারান্দার বিশাল ঘড়িতে দেখিলাম বারটা বাজিবার মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

দারওয়ান আমাদেরে লইয়া দূতালায় ড্রয়িংরুমে পৌছাইল। বিশাল অপরূপ সজ্জিত ড্রয়িংরুম। সমস্ত ফার্নিচার শান্তি নিকেতনের তৈরি। রাবীন্দ্রিক প্যাটার্নের। এক নলিনী বাবু আমাদেরে অভ্যর্থনা করিলেন। বুঝিলাম এই এনগেজমেন্ট আগেরই ঠিক করা। বিশাল কামারার এক কোণে তিন জন ঘেষাঘেষি করিয়া বসিলাম। সংগে-সংগেই কফি আসিল। বেয়ারাকে বিদায় দিয়া নলিনী বাবু নিজে কফি তৈয়ার করিতে এবং কথা বলিতে লাগিলেন। হক সাহেব ও নলিনী বাবু উভয়েই বলিলেন যে আজিকার আলোচ্য বিষয়টা ভয়ানক গোপনীয় ; সুতরাং আমি এটা কারও কাছে ঘুণাক্ষরেও বলিতে পারিব না সে মর্মে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। আমি যথারীতি সে প্রতিশ্রুতি দিলাম। এরপর অনেক ভূমিকা করিয়া, একজন অপর জনের সমর্থন করিয়া, একজন অপর জনের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া, যা বলিলেন তার সারমর্ম এই যে শামসুদ্দিন সাহেবকে মন্ত্রী করিতে লাট সাহেব অসম্মত হইয়াছেন। তাঁর জন্য যিদ করিলে, তাঁকে বাদ দিয়া মন্ত্রি-সভা গঠন না করিলে, পরের দিন শপথ নেওয়া হয় না। মন্ত্রিসভা গঠনে বিলম্ব হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত হক সাহেবের মন্ত্রি-সভা নাও

হইতে পারে। ইউরোপীয় দল সার নাযিমুদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রী করিবার চেষ্টা আজও ত্যাগ করে নাই। লাট সাহেব শামসুদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে গিয়াছেন এই জন্য যে শামসুদ্দিন সাহেব অতীতে জেল খাটিয়াছেন এবং বর্তমানেও তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-দ্রোহিতার আই. বি. রিপোর্ট আছে। আমি তর্ক করিলাম : জেল-খাটা কংগ্রেস-নেতাদেরে মন্ত্রী করিতে লাট-বড়লাটের খোশামোদ করিতেছেন, মন্ত্রী নির্বাচনের একক অধিকার প্রধান মন্ত্রীর,লাট সাহেবের তাতে হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার নাই। মন্ত্রি-সভা গঠনের শুরুতেই যদি প্রধান মন্ত্রী লাট সাহেবের ধমকে কাৎ হইয়া পড়েন তবে লাট সাহেব সুবিধা পাইবেন, কৃষক-খাতকদের স্বার্থের প্রতি কাজেই লাট সাহেব বাধা দিবেন ইত্যাদি। আমার চেয়ে অনেক বয়স্ক ও অভিজ্ঞ এই দুই নেতা আমাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। আমি বুঝিলাম না। বরঞ্চ তাঁদের কথায় আমার সন্দেহ হইল যে লাট সাহেবের কথাটা ভাওতা মাত্র। এই দুই নেতাই শামসুদ্দিন সাহেবকে বাদ দিবার সংকল্প করিয়াছেন। কাজেই আমার যিদ্ বাড়িয়া গেল। তাছাড়া যুক্তিতেও তাঁরা আমার সহিত পারিয়া উঠিতেছিলেন না। তাঁদের একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে শামসুদ্দিন সাহেবকে লাট সাহেব কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। তাঁরে নিয়া যিদ্ করিলে সার নাযিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হইয়া যাইতে পারেন। আমাদের কাছে তৎকালে এই এক যুক্তিই লাখ যুক্তির সমান। কাজেই আমি বোধ হয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। একদিকে প্রিয় বন্ধু ও কৃষক-প্রজা সমিতির সেক্রেটারি নির্যাতিত ও ত্যাগী দেশ-কর্মী শামসুদ্দিনের মন্ত্রিত্ব, অপর দিকে কোটি-কোটি কৃষক-খাতকের স্বার্থ। বোধ হয় একটু বাহ্যজ্ঞানও হারাইয়া ছিলাম। খুব সম্ভব কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। দু'জনের কে ঠিক মনে নাই, একজন বলিলেন, শামসুদ্দিনের সীটটা খালি রাখিয়া পরের দিন দশজন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া যাক, পরে লাট সাহেবকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া রাযী করিয়া শামসুদ্দিনকে নিলেই চলিবে। আমি বোধ হয় মন্দের ভাল হিসাবে এতেই রাযী হইয়াছিলাম। কারণ এক সময় যখন নলিনী বাবু আমার জবাবের জন্য যিদ করিতেছিলেন, তখন আমার পক্ষ হইতে হক সাহেবই জবাব দিয়াছিলেন : 'সে ত জবাব দিয়াই দিছে। আগামীকাল দশজনের মন্ত্রিসভা করতে তার ত আপত্তি নাই। আবুল মনসুর, চল এইবার উঠি।'

হক সাহেব সত্যসত্যই উঠিয়া পড়িলেন। আমি শেষ চেষ্টা স্বরূপ বলিলাম : 'শামসুদ্দিনকে তবে কবে নেওয়া হৈব?' হক সাহেব আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন : 'লিভ্ ইট টু মি। আমি কি সমিতির সেক্রেটারি ছাড়া বেশি দিন মন্ত্রিত্ব করতে পারব? যত শীঘগির পারি তারে নিয়া নিবই। এইটা আমার ওয়াদা, তারে আমি একদিন মন্ত্রী করবই। তুমি কোনও চিন্তা কৈর না।'

ফিরিবার পথে গাড়িতে হক সাহেব আমাকে বলিলেন ঃ দেখ্‌ছ মনসুর, বেটার শয়তানিটা? কি কৌশলেই না সে হিন্দু-মুসলিম মন্ত্রীদের সংখ্যা সমান করবার ব্যবস্থা কৈরা ফেলছে। নিশ্চয়ই বেটা লাটের বুদ্ধি এটা।

আমি চমকিয়া উঠিলাম । এই দিক হইতে ব্যাপারটা আমি মোটেই চিন্তা করি নাই ত । হক সাহেব আরও দেখাইলেন যে লোকটা যে শুধু হিন্দু-মুসলিম কোটাই ফিফটি ফিফটি করিতেছে তা নয়। মুসলিম কোটায় মুসলিম লীগের মোকাবিলায় হক সাহেবের পার্টির দুইজন করিতেছে। মন্ত্রিসভায় তাঁকে মাইনরিটি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী হইয়াও তিনি কিছু করিতে পারিবেন না । প্রজা-পার্টির কোটায় আর নেওয়াই বা যায় কাকে? আমি একগুয়েমি করিয়া দাঁড়াই নাই। রেযায়ে করিম ও হুমায়ুন কবিরটা ইলেকশনে ফেল করিয়াছে। হাসান আলীটা একেবারে নাবালক ইত্যাদি।

একদমে এক-তরফাভাবে এই সব কথা বলিতে-বলিতে গাড়ি আমার বাসার সামনে আসিয়া পড়িল। আমি কোনও জবাব দিতে পারিলাম না, আমার পায়ের একযিমাটা খুবই টাটাইতেছিল । এতক্ষণে শরীরে বেশ তাপ উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল। আদাব দিয়া বিদায় হইলাম। পরদিন সকাল দশটার আগেই তাঁর বাসায় যাইতে আমাকে নির্দেশ দিয়া হক সাহেব চলিয়া গেলেন।

রাত্রে আমার একযিমাটা আরও বেশি টেকিয়া গেল। শরীরের তাপ বাড়িল । সকালে উঠিয়াই বুঝিলাম হাঁটিতে পারি না। কুচকি ফুলিয়া গিয়াছে। কাজেই চেষ্টা-চরিত করিয়া হক সাহেবের বাড়িতে পৌছাইতে আমার প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। তখন বোধ হয় আমার গায় এক শ' তিন ডিগ্রি জ্বর। কিন্তু হক সাহেবের বাড়ি গিয়া যা শুনিলাম ও দেখিলাম, তাতে আমার জ্বর ছাড়িয়া শরীর-মন ঠাণ্ডা বরফ হইয়া গেল। নবাবযাদা হাসান আলী অধ্যাপক হুমায়ুন কবির প্রভৃতি বন্ধুরা বিষণ্ন মুখে কানাকানি করিতেছেন। আমার বিলম্ব দেখিয়া তাঁরা আমার উপর রাগ করিয়া আছেন। শামসুদ্দিন সাহেব ও আশরাফুদ্দিন সাহেব গোস্বা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ সবের কারণ হক সাহেব শামসুদ্দিন সাহেবকে সংগে না লইয়াই শপথ নিতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সবাই আপ-সেট্ হইয়া গিয়াছেন। গত রাত্রের ঘটনা বেচারারা কিছুই জানিতেন না। হক সাহেবের বাড়িতে যে লোকের ভিড় ছিল, তাঁদের অধিকাংশই স্বভাবতঃই আনন্দ-উল্লাসে মাতোয়ারা। বেচারা শামসুদ্দিনের কথাটা তাঁদের আনন্দের মাত্রা খুব বেশি কমাইতে পারে নাই। এই পরিবেশ আমাদের ভাল লাগিল না, অথবা আমাদের বিষণ্ন মুখ তাঁদেরই ভাল লাগিল না। নিকটেই নবাবযাদা হাসান আলীর বাড়ি। আমরা সেখানে চলিয়া আসিলাম। ক্রমে সেখানেও ভিড় বাড়িল। অনেক গরম কথাবার্তা হইল। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত করা গেল না। আমার শরীরের তাপ ও একযিমার টাটানি অসহ্য

হইল। নবাবযাদা তাঁর গাড়িতে আমাকে বাসায় পৌছাইয়া দিলেন। আমার বাসা মানে বন্ধুবর আয়নুল হক খাঁ সাহেবের বাসা। তিনি তখন ৪৯ নং আপার সারকুলার রোডে থাকিতেন। আমি তাঁর মেহমান ছিলাম। নবাবযাদার বাড়ির বৈঠকে সাব্যস্ত হইল যথাসম্ভব সত্বর কলিকাতায় উপস্থিত সমস্ত কৃষক-প্রজা নেতাদের একটি সভা ডাকিয়া আমাদের কর্তব্য ঠিক করা হইবে।

৩. হক-মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ

বিকালের দিকে খবর পাইলাম হক মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। শামসুদ্দিন সাহেবের জায়গা খালি রাখা হয় নাই। তাঁর স্থলে নবাব মোশাররফ হোসেন সাহেবকে দিয়া কৃষক-প্রজা-কোটা পূর্ণ করা হইয়াছে। আমি আসমান হইতে পড়িলাম। ভয়ানক রাগ হইল। এমন সময় হক সাহেবের একখানা পত্র পাইলাম। নবাবযাদা নিজেই এই পত্র লইয়া আসিয়াছেন। চিঠিখানা খুবই লম্বা। তাতে তিনি তাঁর স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। অপর পক্ষ তাঁকে মন্ত্রিসভায় মাইনরিটি করিবার যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তা রুখিবার জন্যই তিনি শামসুদ্দিনের সীটটা খালি না রাখিয়া নবাব মোশাররফ হোসেনকে দিয়া তা পূর্ণ করিয়াছেন। নবাব সাহেব কৃষক-প্রজা পার্টির কার্যক্রম পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন । হক সাহেব আমাকে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন যে কেবল মাত্র কৃষক-প্রজা-পার্টির স্বার্থেই তিনি এ কাজ করিয়াছেন। আমি কারও কথায় যেন তাঁকে ভুল না বুঝি। যে মুহূর্তে তিনি বুঝিবেন যে তাঁর পক্ষে প্রজার স্বার্থ-রক্ষা অসম্ভব হইয়াছে সেই মুহূর্তে তিনি পদত্যাগ করিবেন। আমি যেন তাঁর উপর আস্থা রাখিয়া তাঁর কাজে সহযোগিতা করি। আমি যেন তাঁর পক্ষ হইতে শামসুদ্দিনকে বলি ঃ হক সাহেব শামসুদ্দিনের কথা ভুলেন নাই, ভুলিবেন না ; তাঁকে তিনি একদিন-না-একদিন মন্ত্রী করিবেনই। উপসংহারে তিনি আমার অসুখের জন্য দুঃখ করিয়াছেন এবং আল্লার কাছে আমার রোগমুক্তির জন্য সর্বদাই দোওয়া করিতেছেন, তা লিখিয়াছেন। প্রথম সুযোগেই তিনি আমাকে দেখিতে আসিবেন সে আশ্বাসও দিয়াছেন।

হক সাহেবের এই পত্র লইয়া বিশেষ চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম না। একা দু'-দশ মিনিট শুইয়াও থাকিতে পারিলাম না। সারা বিকাল কৃষক-প্রজা-নেতা ও এম· এল· এ·-দের যাতায়াত চলিল। সন্ধ্যার দিকে শুনিলাম, ঐদিন প্রজা-নেতাদের জরুরী বৈঠক দেওয়া হইয়াছে। আমার সুবিধার জন্য আমারই বাসায় স্থান করা হইয়াছে। দুতালার বিশাল ছাদে সভার আয়োজন হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর সিঁড়িতে অবিরাম জুতার খটাখট আওয়াযে বুঝিলাম সভার সময় হইয়াছে। ইযিচেয়ারে শোওয়াইয়া ধরাধরি করিয়া আমাকে ছাদে তুলা হইল। দেখিলাম

অল্প কালের মধ্যেই আলো ও আসনের সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। আশাতীত রকম নেতৃ-সমাগম হইয়াছে। গম্ভীর পরিবেশে আলোচনা শুরু হইল। অল্পক্ষণেই সভা গরম হইয়া উঠিল। বক্তাদের কথায় বুঝা গেল হক সাহেব ইতিমধ্যেই প্রচার করিয়াছেন, আমার সম্মতি লইয়াই ঐ ভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। আমার নিকট হক সাহেব পত্র লিখিয়াছেন, একথা দেখিলাম অনেক বক্তাই জানেন। অনেকেই আমার নিন্দা করিলেন। দু'-দশ জন আমার নিকট লেখা হক সাহেবের পত্র দেখিতে চাহিলেন। আমার সৌভাগ্য বশতঃ নিন্দার ভাগী আমি একা ছিলাম না। বন্ধুবর আশরাফুদ্দিনকে আমার চেয়ে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হইল। অনেক বক্তাই বলিলেন, চৌধুরী আশরাফুদ্দিনের চেষ্টাতেই শামসুদ্দিন সাহেবকে বাদ দিয়া নবাব সাহেবকে নেওয়া হইয়াছে। আশরাফুদ্দিন সাহেব নবাব সাহেবকে লইয়া একাধিক বার হক সাহেবের সাথে দেখা করিয়াছেন তারও চাক্ষুষ সাক্ষী পর্যন্ত পাওয়া গেল। চৌধুরী সাহেব ও আমি উভয়েই আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলাম। চৌধুরী সাহেবের বক্তব্য আমার ঠিক মনে নাই। তবে যতদূর মনে পড়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে শামসুদ্দিন সাহেবকে বাদ দেওয়া যখন একদম অবধারিত হইয়া গিয়াছিল, তখনই তিনি নিতান্ত মন্দের ভাল হিসাবে ঐ ব্যবস্থায় রাযী হইয়াছিলেন। আমি অসুখের দরুন বেশি কথা বলিতে পারিলাম না। তবে হক সাহেবের পত্রখানা আমার খুব উপকারে লাগিল। তাতে ইহা স্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল যে হক সাহেবের কাজে আমার পূর্ব-সম্মতি ছিল না।

৪. উপদেষ্টা বোর্ড

যা হোক, বক্তাদের উত্তাপ শেষ পর্যন্ত কমিয়া গেল। ধীর-স্থিরভাবে আলোচনা শুরু হইল। মন্ত্রিসভা বয়কট করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। তাতে হক সাহেবকে জমিদারদের হাতে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এ বিষয়ে আমরা একমত হইলাম। অতএব মন্ত্রিসভার উপর কড়া নযর রাখিয়া ইহার সহিত সহযোগিতা করিয়া যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। সুষ্ঠুভাবে এই কাজ করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভার একটা উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের দাবি করা হইল। এই উপদেষ্টা বোর্ড গঠনে এবং তাতে প্রজা সমিতির মেজরিটির ব্যবস্থা করায় হক সাহেবকে রাযী করার ভার আমার উপর দেওয়া হইল। এইভাবে ভালয়-ভালয় সেদিনকার উত্তেজনাপূর্ণ সভার কাজ শেষ হইল।

হক সাহেবের ধারণা হইয়াছিল যে তাঁর পত্রের মর্ম অনুযায়ী আমিই সেদিনকার সভাটা সামলাইয়াছিলাম। কাজেই তিনি অতি সহজেই আমার প্রস্তাবে রাযী হইয়াছিলেন এবং মন্ত্রিসভাকে রাযী করিয়াছিলেন। সকল দলের ইলেকশনী ওয়াদার ভিত্তিতে একটি সাধারণ কর্ম-পন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হইল। ইহাতে ছয়জন সদস্য থাকিলেন। এতে মুসলিম লীগের পক্ষে থাকিলেন

নবাব বাহাদুর হবিবুল্লাহ, সার নাযিমুদ্দিন ও মিঃ শহীদ সুহরাওয়ার্দী। কৃষক-প্রজা পার্টির তরফে থাকিলেন হক সাহেব, সৈয়দ নওশের আলী এবং আমি। প্রস্তাব হইল মন্ত্রিসভা এই উপদেষ্টা বোর্ডের প্রস্তাব কার্যকরী করিতে বাধ্য থাকিবেন। ফলে মন্ত্রী ও এম.এল.এরা এই বোর্ডকে 'সুপার ক্যাবিনেট' আখ্যা দিলেন।

ইতিমধ্যে বন্ধুদের চেষ্টায় এবং হক সাহেবের সহায়তায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। অটো-ভ্যাক্সিন চিকিৎসায় আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলাম। মন্ত্রিসভার কাজ পুরাপুরি শুরু হইবার আগেই উপদেষ্টা বোর্ডের সভা হওয়া দরকার। সে মতেই ইহার বৈঠক দেওয়া হইল এবং আমি মফস্বলের লোক বলিয়া আমার সুবিধার খাতিরে দিনের-পর-দিন ইহার বৈঠক চালাইবার ব্যবস্থা হইল। প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন, মহাজনি আইন প্রণয়ন, কৃষিখাতক আইন অনুসারে সালিশী বোর্ড গঠন, প্রাথমিক শিক্ষা আইন কার্যকরী-করণ প্রভৃতি যরুরী প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সর্বসম্মত কর্মসূচী গৃহীত হইয়া গেল। কিন্তু দুইটি বিষয়ে একমত হইতে না পারায় দিনের পর দিন উহার আলোচনা পিছাইয়া যাইতে লাগিল এর একটি জমিদারি উচ্ছেদ, অপরটি মন্ত্রি-বেতন। জমিদারি উচ্ছেদে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরাও রাযী ছিলেন বটে, কিন্তু বিনা-ক্ষতিপূরণে তাঁরা কিছুতেই রাযী হইতেছিলেন না। আর মন্ত্রি-বেতন প্রশ্নে তাঁরা প্রজা-সমিতির নির্বাচনী ওয়াদা কিছুতেই গ্রহণ করিতেছিলেন না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে কৃষক-প্রজা সমিতির নির্বাচনী ওয়াদায় ছিল মন্ত্রীরা এক হাজার টাকার বেশি বেতন নিতে পারিবেন না। জমিদারি উচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা লম্বা করা সম্ভব। কিন্তু মন্ত্রি-বেতনের আলোচনায় বিলম্ব করা যায় না। কারণ মাস গেলেই মন্ত্রীদের বেতন লইতে হইবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত একদিন মন্ত্রি-বেতনের আলোচনা শুরু হইল। আমি প্রস্তাব দিলাম এবং সৈয়দ নওশের আলী সমর্থন করিলেন, মন্ত্রীরা এক এক হাজার টাকা বেতন পাইবেন। এই আলোচনায় একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং এই অপ্রিয় ঘটনা হইতেই পরবর্তীকালে জনাব শহীদ সাহেবের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেজন্য ঘটনাটি ছোট হইলেও এখানে তার উল্লেখ করিতেছি। এক হাজার টাকা মন্ত্রি-বেতনের নৈতিক ও অর্থনৈতিক যুক্তির বিরুদ্ধে লীগ-নেতাদেরও কিছু বলিবার ছিল না। তাঁদের একমাত্র যুক্তি ছিল, মাত্র এক হাজার টাকায় মন্ত্রীদের চলা অসম্ভব। সুতরাং প্রস্তাবটি অবাস্তব। লীগ-নেতাদের এই যুক্তির জবাবে আমি বলিয়াছিলাম যে মন্ত্রীরা বিনা-ভাড়ায় বাড়ি পাইবেন, বিনা-খরচে গাড়ি পাইবেন, ভ্রমণে টি.এ.-ডি.এ. পাইবেন, বিনা খরচে চাপরাশী আরদালী পাইবেন। সুতরাং হাজার টাকা বলিতে গেলে মন্ত্রীদের নিট্ আয় থাকিবে। অতএব টাকার অপ্রতুলতার যুক্তি ঠিক নয়। প্রস্তাবটা কাজেই অবাস্তব নয়।

আমার প্রস্তাবের সমর্থনে কংগ্রেসের পাঁচশ টাকা মন্ত্রি–বেতনের এবং অন্যান্য দেশের মন্ত্রি–বেতনের দু'একটা নযির দিলাম। এই তর্ক স্বভাবতঃ খুবই গরম হইয়াছিল। উভয় পক্ষ হইতে তীব্র ও রুঢ় কথাও আদান–প্রদান হইতেছিল । হঠাৎ শহীদ সাহেব উত্তেজিত সুরে আমাকে বলিলেন ঃ 'তুমি দেড় শ টাকা আয়ের মফস্বলের উকিল। তুমি কলিকাতাবাসী ভদ্রলোকের বাসা–খরচের জান কি?

আমি এই আক্রমণে আরও রাগিয়া গেলাম। পকেট হইতে এক টুকরা হিসাবের কাগয সশব্দে টেবিলের উপর রাখিয়া ক্রোধ–কম্পিত গলায় বলিলাম ঃ 'এই হিসাবে কলিকাতাবাসী একটি ভদ্র–পরিবারের সমস্ত আবশ্যক খরচ ধরা হইছে। এতে শুধু মদ ও মাগির হিসাব ধরা হয় নাই। ও দুইটা ছাড়া আর কি এই হিসাবে বাদ পড়ছে, দেখাইয়া দেন।'

শহীদ সাহেব রাগে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। আমিও উঠিলাম। হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম আর কি? সভা ভাংগিয়া যায়। নবাব বাহাদুর হবিবুল্লাহ্ ছিলেন হাড়ে–মজ্জায় আদৎ শরিফ লোক। তিনি মধ্যে পড়িলেন। আমরা উভয়ে সমান দোষী হইলেও নিজের দলের শহীদ সাহেবকেই তিনি দোষী করিলেন এবং আমার কাছে মাফ চাইতে তিনি শহীদ সাহেবকে কড়া হুকুম দিলেন, অন্যথায় তিনি পদত্যাগ করিবেন বলিয়া হুমকি দিলেন। কিন্তু এর দরকার ছিল না। শহীদ সাহেব দিল–দরিয়া লোক। তিনি হাত বাড়াইয়া শুধু আমার হাত ধরিলেন না, টানিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন ঃ মাফ কর এবং ভুলিয়া যাও। আমিও ঐ কথা বলিলাম। উভয়েই উভয়কে মাফ করিলাম বটে, কিন্তু ভুলিলাম না। সেই হইতে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। পরবর্তীকালে তিনি অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়া আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন এবং আমি সাধ্যমত সে বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি।

৫. নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভংগ

যাহোক শেষ পর্যন্ত স্থির হইল মন্ত্রি–বেতনের প্রশ্নটা কোয়ালিশন পার্টি মিটিং–এ দেওয়া হইবে। আমি এম. এল. এ. না হওয়া সত্ত্বেও এ্যাডভাইযারি বোর্ডের মেম্বর হিসাবে আমাকে পার্টি মিটিং ডাকা হইবে। আমি সানন্দে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলাম। কারণ আমি জানিতাম সকল দলের মেম্বরদের বিপুল সংখ্যাধিক্য লোক মন্ত্রি–বেতন হাজার টাকার পক্ষপাতী। কিন্তু পার্টি মিটিং–এর দিন আমি নিরাশ হইলাম। কারণ কৌশলী মন্ত্রীরা মেম্বরদের জন্য আড়াইশ টাকা বেতনের প্রস্তাব করিলেন এবং মেম্বরও মন্ত্রি–বেতনটা একই প্রস্তাবের অন্তর্ভূক্ত করিলেন। তাতে মন্ত্রীদের বেতন আড়াই হাজার এবং প্রধান মন্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত পাঁচশ টাকার ব্যবস্থা হইল। এরকম সর্বসম্মতিক্রমে অর্থাৎ নেমকন্ (বিনা প্রতিবাদে) প্রস্তাবটি পাস হইয়া গেল।

কৃষক-প্রজা কর্মীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। চারিদিকেই নৈরাশ্য দেখা দিল। মন্ত্রিসভা গঠনে কৃষক-প্রজা সমিতির সুস্পষ্ট পরাজয় ঘটিয়াছে, এ ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইল। ইতিমধ্যে পরোক্ষ নির্বাচনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির সাহেবকে ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চ পরিষদ) মেম্বর করিতে পারায় আমাদের একটু সুবিধা হইল। কৃষক-প্রজা কর্মীরা আমরা সবাই একমত ছিলাম যে আমাদের পক্ষ হইতে হক সাহেবের উপর নযর রাখা কর্তব্য। প্রথমতঃ ইউরোপীয় দল মুসিলম লীগ নেতারা এবং হিন্দু জমিদাররা হক সাহেবকে বাধ্য হইয়া প্রধানমন্ত্রী মানিয়া লইলেও তলেতলে তাঁকে ডিসক্রেডিট করিবার চেষ্টা তাঁরা চালাইয়া যাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, হক সাহেব কখন কি করিয়া বসেন, তার ঠিক নাই। এ অবস্থায় হক সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠ ও তাঁর বিশ্বস্ত দু-এক জন কৃষক-প্রজা-নেতার সর্বদাই হক সাহেবের সংগে-সংগে থাকা দরকার। শামসুদ্দিন সাহেব স্বভাবতঃই কাজ করিতে রাযী না হওয়ায় অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও নবাবযাদা হাসান আলীর উপর এই দায়িত্ব পড়িল।

সমিতির সেক্রেটারী শামসুদ্দিন সাহেবকে মন্ত্রী না করা হইতে কৃষক-প্রজা-কর্মীদের মধ্যে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছিল, মন্ত্রী-বেতন আড়াই হাজার ও মেম্বর-বেতন আড়াই শ' করায় কর্মীদের মধ্যে সে অসন্তোষ আরও বাড়িয়া গেল। শেষ পর্যন্ত জমিদারি উচ্ছেদের প্রশ্নটাকে শিকায় তুলিয়া যখন ফ্লাউড কমিশন নিয়োগ করা হইল, তখন কর্মীদের অসন্তোষ প্রকাশ্য ক্রোধে পরিণত হইল। আমি স্বস্তির সংগে ময়মনসিংহ বসিয়া ওকালতি করিতে পরিলাম না। হক সাহেব আমাদের কথা রাখেন না দেখিয়া 'দুত্তোর যা-ইচ্ছা তাই হোক' বলিয়া রাজনীতি হইতে হাত ধুইয়াও ফেলিতে পরিলাম না। কেবলি মনে হইত, হক সাহেবের নেতৃত্বকে সফল করা এবং তাঁকে দিয়া কৃষক-প্রজা সমিতির নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করার দায়িত্ব আমার কম নয়। এই সব চিন্তা করিয়া অবসর পাইলেই, এমনকি অনেক সময় ওকালতি ব্যাঘাত করিয়াও, কলিকাতা ছুটিয়া যাইতাম। এতে মওক্কেলেরা অসন্তুষ্ট হইতেন। আমার ব্যবসার অনিষ্ট হইত। কিন্তু আমি এটা উপক্ষো করিতাম। কারণ পাঁচ-সাত বছরের আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে স্বয়ং মওক্কেলরাই এ সম্পর্কে দুই অবস্থায় দুই রকম কথা বলেন। একজন আসিয়া শুনিলেন আমি সেই রাত্রের ট্রেনেই অন্যত্র মিটিং করিতে যাইতেছি। পরদিনই তাঁর কেসের শুনানি। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন ঃ 'আপনে যাইতেছেন সভা করতে ; আমার কেসের তবে কি হৈব?' আমি বলিতাম, 'আমি হাকিমেরে কৈয়া রাখছি। দরখাস্ত দিলেই টাইম দিবেন।' তাতেও মওক্কেল সন্তুষ্ট হইতেন না। নিজের স্বার্থের কথা বাদ দিয়া আমার হিতের চিন্তা করিতেন। বলিতেন ঃ 'এভাবে কেবল সভা কৈরা বেড়াইলে আপনের ওকালতি চলব কেমনে ?' আমি হাসিয়া বলিতাম ঃ 'এর পর আর সভা-সমিতি না কৈরা শুধু ওকালতিই করব। কথা

দিয়া ফেলছি বৈলাই আজ যাইতেছি।' কয়েকদিন পরে ঐ ভদ্রলোকই এক সভার আয়োজন করিয়া বিজ্ঞাপনে আমার নাম ঘোষণা করিয়া আমাকে নিতে আসিয়াছেন। আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম ঃ 'অসম্ভব, আমি যাইতে পারব না। কাল আমার খুব বড় মামলা আছে।' ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া বলিলেন ঃ 'ওঃ আপনেও শেষ পর্যন্ত টাকা চিনছেন ? আপনেও যদি আর দশ জনের মতই টাকা রোযগারে ধাওয়া করেন, তবে প্রজা-আন্দোলন চাংগে তুইলাই যান। মামলার কপালে যাই থাকুক, আমাদের সভায় আপনের যাইতেই হৈব। আপনে না গেলে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ আমারে মাইরা ফেলব, আপনেরেও ছাড়ব না।' সুতরাং আমি মামলা মুলতবির ব্যবস্থা করিয়া সভা করিতেযাইতাম।

এইভাবে আমি কৃষক-প্রজা পার্টির পার্লামেন্টারি রাজনীতির সাথেও সম্পর্ক রাখিতে বাধ্য হইতাম। কলিকাতা যাতায়াত করিতাম। এতে আমার ওকালতির ব্যাঘাত, আর্থিক ক্ষতি ও পরিবারের কষ্ট হইত, বুঝতাম। কিন্তু উপায়ন্তর ছিল না। নিজের 'নেতৃত্ব' বজায় রাখিবার গরযেই তা করিতে হইত। প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব আমার কথা রাখেন না, এ কথা এ জিলার কেউ বিশ্বাস করিত না। তাদের ধারণা আমি হক সাহেবের উপদেষ্টা। আমার বুদ্ধি ছাড়া তিনি কখনও কোনও কাজ করেন না। হক সাহেবের এমন আস্থা আমি হারাইয়াছি, রাজনৈতিক চালে মুসলিম লীগের কাছে হারিয়া গিয়াছি, ময়মনসিংহের ভোটাররা কৃষক-প্রজা পার্টিকে ভোট দিয়া ভুল করিয়াছে, এসব কথা স্বীকার করিতেও আত্ম-সম্মানে কেমন বাধিত। পক্ষান্তরে বড়-বড় কথা বলিয়া ধাপ্পা দিয়া কৃষক-প্রজার ভোট নিয়াছি, এ কথাও বলা যায় না, কারণ কথাটা সত্য নয়। কাজেই বলিতে হয় হক সাহেব ঠিকই আছেন। মুসলিম লীগের জমিদার মন্ত্রীরা হিন্দু-জমিদার মহাজন মন্ত্রীদের সাথে জোট পাকাইয়া হক সাহেবকে কোন্ঠাসা করিয়াছেন। কথাটা যে একদম মিথ্যা নয়, তার প্রমাণও হাতে-কলমে পাইলাম। আমার 'নয়া পড়া' নামে একটি শিশুপাঠ্য বই পাঁচ বছর ধরিয়া পাঠ্য থাকার পর 'আরবী-ফারসী শব্দের আধিশয্য-দোষে' বাদ গেল হক সাহেবের প্রধান মন্ত্রী-শিক্ষা মন্ত্রিত্বের আমলে। তিনি চিৎকার হৈ চৈ করিয়া ছাত ফাটাইয়াও প্রতিকার করিতে পারিলেন না। আমি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। দুঃখিত হইলাম। কিন্তু সহ্য করিলাম। রিযনেবল হইলাম।

চিন্তিত হইলাম তার চেয়ে বেশি। কৃষক-প্রজা-পার্টি ও কৃষক-প্রজা-আন্দোলনের সাথে মন্ত্রিসভার একটা সংঘাত ক্রমেই আসন্ন হইয়া আসিতেছে, তা স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম।

এগারই অধ্যায়

কালতামামি

১. রাজনীতির দুই দিক

আমার নিজের দেখা রাজনীতির একটা যুগ এইখানে শেষ হইল। এক সালের হিসাব-নিকাশকে আমরা বলি সাল তামামি। একটা কালের হিসাব-নিকাশকে তাই কাল তামামি বলিতে চাই। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় রিট্রোসপেক্ট। কাল মানে এখানে একটা যুগ। যুগ এখানে বার বছরের যুগ বা দশ বছরের ডিকেড নয়। এটা একটা এরা, একটা যমানা, একটা আমল। জাতির ইতিহাসে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ এক বিশেষ ধরনের ঘটনাবলীর একটা মুদ্দত। একটা পিরিয়ড। এই ঘটনাপুঞ্জ প্রধানতঃ রাজনীতিক।

এই রাজনীতির দুইটা দিক ঃ একটা ভারতীয়, অপরটা বাংগালী। ভারতীয় রূপে এই রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ মাইল খুঁটি এই কয়টি ঃ খিলাফত ও স্বরাজ আন্দোলন। গান্ধীজী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে সারা ভারতে একটা অপূর্ণ গণ-বিপ্লব। অভাবনীয় হিন্দু-মুসলিম মিলন। জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগ। আন্দোলনের ব্যর্থতা। আকস্মিক অবসান। সাম্প্রদায়িক দাংগা। জিন্নার হিন্দু-মুসলিম-আপোস চেষ্টা। কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব। গোল টেবিল বৈঠক। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক উহার প্রাদেশিক অংশগ্রহণ ও কেন্দ্রীয় অংশ বর্জন। কংগ্রেস কর্তৃক ছয়টি, মুসলিম লীগ কর্তৃক পাঁচটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব। ১৯১৬ সালের লাখনৌ প্যাক্ট নামে পরিচিত কংগ্রেস মুসলিম লীগ চুক্তি আমার দেখা রাজনীতির মধ্যে পড়ে না। কারণ ওটার সংগে আমার যে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, শুধু তাই নয়। ঐ সময়ে আমার কোনও রাজনৈতিক চেতনাই ছিল না। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র মাত্র। ওটা যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বিশ্ব-যুদ্ধের খবরের ভিড়ের মধ্যে তাও আমার মনে হয় নাই। কিন্তু, আমার দেখা রাজনীতির মধ্যেও উপরে তার যে একটা ইমপ্যাক্ট, একটা প্রভাব ছিল তা আমি পরে বুঝিয়াছিলাম।

রাজনীতির বাংগালী রূপে প্রজা-আন্দোলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টা, তাঁর বেংগল প্যাক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশনে তার প্রয়োগ শুরু, দেশবন্ধুর

আকস্মিক মৃত্যু, কংগ্রেসের প্রজা-স্বার্থ-বিরোধী পদক্ষেপ, বেংগল প্যাক্ট বাতিল, মুসলমানদের কংগ্রেস ত্যাগ ও প্রজা-সমিতি গঠন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাইল খুঁটি। ১৯০৫ সালে পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের সৃষ্টি ও ১৯১১ সালে তা বাতিল আমার দেখা রাজনীতিতে পড়ে না। কিন্তু আমার দেখা রাজনীতির উপর তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইমপ্যাক্ট হইয়াছিল, তৎকালীন মুসলিম সমাজের মনোভাব হইতে তা স্পষ্ট বুঝা যাইত। তাদের চিন্তার প্রভাব আমার নিজের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক চিন্তায়ও কম পড়ে নাই। সেটা অবশ্য বুঝিয়াছিলাম অনেক দিন পরে।

এতকাল পরে পিছন দিকে তাকাইয়া একজন রাজনৈতিক কর্মী লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে আমার যা মনে পড়ে, তার সারমর্ম এই যে ভারতের মুসলমানরা আগা-গোড়াই একটা রাজনৈতিক স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবেই চিন্তা ও কাজ করিয়াছে। এটা তারা খিলাফত যুগের 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' বলার সময়েও যেমন করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক দাংগার সময় 'মারি অরি পারি যে প্রকারে' বলার সময়ও তেমনি করিয়াছে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের পত্তন, ১৯১৫ সালের লাখনৌ প্যাক্ট, ১৯২৩ সালের বেংগল প্যাকট, ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস হইতে ওয়াক-আউট, ১৯২৯ সালে সর্বদলীয় মুসলিম কনফারেন্স, জিন্নার চৌদ্দ-দফা রচনা, ১৯৩০-৩৩ সালে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদানও ইত্যাদি সব-তাতেই মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার এই দিকটা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে। কি কংগ্রেসের সাথে দেন-দরবারে কি বৃটিশ সরকারের নিকট দাবি দাওয়ায়, এই কথাই বলা হইয়াছে। কি কংগ্রেসী মুসলিম নেতা আলী ভাই-আনসারী-আজমল খাঁ, কংগ্রেস বিরোধী নাইট-নবাব সবাই এ ব্যাপারে মূলতঃ একই সুরে কথা বলিয়াছেন। কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁরও আগে গোপাল কৃষ্ণ গোখেল-দাদাভাই নওরোযীর মত বাস্তববাদী উদার নেতা অনেক ছিলেন। তা না থাকিলে লাখনৌ প্যাক্ট হইত না। পরবর্তীকালে মিঃ সিঃ রাজা গোপালাচারির মত বাস্তববাদী দূরদর্শী হিন্দু নেতা না থাকিলে রাঁচি কনফারেন্সে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে 'না গ্রহণ না বর্জন' প্রস্তাবও গৃহীত হইত না। মুসলমানদের সাথে আপোস ও সহযোগিতা করিতে এঁরা অনেকদূর অগ্রসর হইতে রাযী ছিলেন। তাই তুর্কী সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া ইংরাজ-ফরাসী-গ্রীসের মধ্যে বন্টন করিয়া নেওয়ার প্রতিবাদে মুসলিম ওলামারা যখন শেখুল-হিন্দ মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে তর্কেমোওয়ালাত (অসহযোগিতা) আন্দোলন ও আলী ভাই-র নেতৃত্বে ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন, তখন এই আন্দোলনের মধ্যে 'প্যানইসলামিযমের' বীজ আছে জানিয়াও গান্ধীজীর

নেতৃত্বে হিন্দুরা খিলাফত আন্দোলনকে নিজের করিয়া লন। খিলাফত আন্দোলনকে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তির ধর্মীয় আন্দোলন বলিয়া মিঃ জিন্নার মত মুসলিম নেতা যেখানে ঐ আন্দোলনে যোগ দেন নাই, সেখানে হিন্দু নেতৃবৃন্দ অতি সহজেই এই আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নাই। কারণ এঁরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে সত্যই বিশ্বাসী ছিলেন এবং খিলাফতকে মুসলমানের ধর্মীয় দাবি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকে লেখেন ঃ 'হিন্দু-মুসলিম একতা ছাড়া ভারতের কোনও মুক্তি নাই।' গান্ধীজীর আগেও গোখেল-দাদাভাই হিন্দু-মুসলিম একতার উপর খুবই জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে গান্ধীজীই সর্ব প্রথম হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে ভারতের মুক্তির অপরিহার্য শর্ত 'সাইন-কোয়া-নন্' রূপে পেশ করেন। অবশ্য তাঁরও আগে জিন্না সাহেব বলিয়াছিলেনঃ 'হিন্দু-মুসলিম একতা ছাড়া ভারতের মুক্তি নাই।' কিন্তু মাইনরিটি মুসলমানের মুখেও মেজরিটি হিন্দুর মুখে কথাটার তাৎপর্য অনেক বেশ-কম। হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই কথাটাকে কাজে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধতায় দেশবন্ধুর অল্পকাল স্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে তা সফল হয় নাই। তাঁর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর পর দেশবন্ধুর অনুসারী বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ নিজেরাই দেশবন্ধুর বেংগল প্যাকট বাতিল করিয়া ভারতীয় হিন্দু-নেতৃত্বের সাথে এক কাতারে দাঁড়ান।

২. সাম্প্রদায়িক মিলনের দুই রূপ

এইসব ঘটনা হইতে দুইটা সত্য প্রকট হইয়া উঠে। এক, ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্ব স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিয়া হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের চেষ্টা করিয়াছেন। এক শ্রেণীর উদারপন্থী হিন্দু নেতা মুসলিম দাবি-দাওয়া মানিয়া লইয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু মতের চাপে তাঁরা পিছাইয়া গিয়াছেন। দুই, এই ঐক্যচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ এই যে ঐক্যবাদী মুসলিম নেতৃত্ব ও ঐক্যবাদী হিন্দু-নেতৃত্বের মধ্যে একটা মৌলিক বিরোধ ছিল। মুসলিম নেতৃত্ব চাহিয়াছিলেন দুই স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে রাজনৈতিক মিলন বা ফেডারেশন। পক্ষান্তরে হিন্দু-নেতৃত্ব চাহিয়াছিলেন সার্বিক মিশ্রণ বা ফিউশন। একমাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই তাঁর উদার দূরদৃষ্টি বলে হিন্দু-মুসলিম-ঐক্যের বাস্তব রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম-ঐক্যের পক্ষে দরদী ভাষায় প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতায় বলিয়াছিলেন ঃ 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অর্থ সংমিশ্রণ নয়, মিলন। ফিউশন নয় ফেডারেশন। দুইটি স্বতন্ত্র

সত্তাবিশিষ্ট সম্প্রদায় রাজনৈতিক কারণে ও উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবে মাত্র ; মিশিয়া এক সম্প্রদায় হইয়া যাইবেন না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অর্থ যদি দুই সম্প্রদায়ের মিশ্রণে এক সম্প্রদায় হওয়ার কথা হইত, তবে আমি সে ঐক্যের কথা বলিতাম না।' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হিন্দু। নিজের ধর্মমতে তাঁর অটুট প্রাণ-ভরা আস্থা ছিল। সে আস্থায় কোনও দ্বেষ ছিল না। ছিল শুধু ভালবাসা। তাই স্বদেশবাসী মুসলমানের ধর্মের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। নিজের বাপকে যে সন্তান শ্রদ্ধা করে, পরের বাপের প্রতি সে কদাচ অশ্রদ্ধা দেখাইতে পারে না। ইহাই ছিল দেশবন্ধুর জীবন-দর্শন। নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে কেমন করিয়া আন্তরিক বিশ্বাস করা যায়, দেশবন্ধু ছিলেন তার আদর্শ নিদর্শন। দেশবন্ধুর পরে আমি আর একজন মাত্র বাংগালী হিন্দু নেতার মধ্যে এই গুণ দেখিয়াছি। ইনি ছিলেন সুভাষ বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর মিঃ শরৎচন্দ্র বসু। তিনি দেশবন্ধুর মতই নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। পূজা-অর্চনায় বিশ্বাস করিতেন। নিজের ধর্ম-মতের জন্য যে কোনও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। এমন ধর্ম-নিষ্ঠ হিন্দু শরৎবাবু মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় প্রাপ্যাধিকার মানিয়া লইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করিতেন না।

কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু নেতা চাহিতেন হিন্দু-মুসলমানে মিশ্রণ। তাই বলিয়া এঁরা সকলে দেশবন্ধু ও শরৎবাবুর মত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন না। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের কোনও আস্থা ছিল না, তা নয়। হিন্দু-মুসলিম দুই সামাজিক পৃথক সত্তার স্থলে মিশ্রিত এক সম্প্রদায় হওয়ার অর্থে তাঁরাও না-হিন্দু-না মুসলমান কোনও নয়া সম্প্রদায় বুঝিতেন না। তাঁরা বুঝিতেন মাইনরিটি মুসলমান সমাজ বিপুল বেগবান হিন্দু সম্প্রদায়ে 'হইবে লীন'। যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল মহাসমুদ্রে লীন হয়। এটাকে তাঁরা অন্যায় বা অসম্ভব মনে করিতেন না। ধর্মে পৃথক হইয়াও যখন ব্রাহ্ম-খৃষ্টান বৌদ্ধ-জৈন-পার্শি-গুর্গা-শিখেরা মহান হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে বাধে নাই, তখন মুসলমানের বাধিবে কেন ?

মুসলিম নেতৃবৃন্দ স্পষ্টতঃই এমন ঐক্যে বিশ্বাস করিতেন না। মুসলিম নেতারা এটাকে নিছক একটা রাজনৈতিক ঐক্য হিসাবে দেখিয়াছেন। সামাজিক ঐক্য হিসাবে দেখিবার উপায় ছিল না। হাজার বছর মুসলমানরা হিন্দুর সাথে একদেশে একত্রে বাস করিয়াছে। হিন্দুদের রাজা হিসাবেও, হিন্দুদের প্রজা হিসাবেও। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই হিন্দু-মুসলমানে সামাজিক ঐক্য হয় নাই। হয় নাই এইজন্য যে হিন্দুরা চাহিত 'আর্য্য-অনার্য্য শক-হুন' যে ভাবে 'মহাভারতের সাগরতীরে' 'লীন' হইয়াছিল,

মুসলমানরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে লীন হইয়া যাউক। তাদের শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না, 'হিন্দু-মুসলমান' হইতে হইবে। এটা শুধু কংগ্রেসী বা হিন্দু-সভার জনতার মত ছিল না, বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল।

৩. অবাস্তব দৃষ্টি-ভংগি

এই কারণে ১৯২০ হইতে ১৯৪০ সাল এই বিশ বছরে ভারতীয় রাজনীতির হিন্দু-মুসলিম আপোস চেষ্টা প্রধানতঃ যুক্ত বনাম পৃথক নির্বাচন প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই নির্বাচনের প্রশ্নটাকে হিন্দু রাজনীতিক নেতৃত্ব কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেন সেটা প্রমাণিত হয় তফসিলী হিন্দুদের পৃথক-নির্বাচনাধিকার স্বীকৃতির বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর আমরণ অনশন-ব্রতে। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে মুসলমানদের মত তফসিলী হিন্দুদেরও পৃথক নির্বাচন দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে যখন এই এওয়ার্ড ঘোষণা করা হয়, তখন মহাত্মাজী পুণা জেলে বন্দী। সেখান হইতেই তিনি সেপ্টেম্বর মাসে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে আমরণ অনশন-ব্রত গ্রহণ করেন। তফসিলী নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র মহাত্মাজীর জান বাঁচাইবার জন্য আসন সংরক্ষিত যুক্ত নির্বাচন প্রথা মানিয়া লন। বৃটিশ সরকারও ত্বরিতে এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়া এওয়ার্ড সংশোধন করেন। মহাত্মাজী অনশন ভংগ করেন। লক্ষণীয়, মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে মহাত্মাজী অনশন করেন নাই। কারণ সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন অধিকার আগে হইতে স্বীকৃত ছিল। দ্বিতীয়তঃ গান্ধীজী মুসলমানদের পৃথক সত্তা স্বীকার করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পৃথক নির্বাচনকে হিন্দু-নেতৃবৃন্দ বরাবরই এই নযরে দেখিয়া আসিয়াছেন। মুসলিম নেতৃত্বও কাজেই অন্য নযরে দেখেন নাই। এই কারণেই মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলী ভাই, ডাঃ আনসারী, মাওলানা আযাদ প্রভৃতি যাঁরা বরাবর যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করিয়াছেন, তাঁরা অবিমিশ্র যুক্ত নির্বাচন চান নাই। 'মোহাম্মদ আলী ফরমুলা' নামে মওলানা মোহাম্মদ আলীর প্রস্তাবিত যে নির্বাচন পদ্ধতি একবার আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছিল, তাতেও দুই স্তরে নির্বাচন হওয়ার প্রস্তাব ছিল। প্রথম স্তরে শুধু মুসলিম ভোটাররা আসন-সংখ্যার চেয়ে বেশি প্রার্থী নির্বাচন করিবে। ঐ নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্য হইতেই দ্বিতীয় স্তরে হিন্দু মুসলমান যুক্ত ভোটে মেম্বর নির্বাচিত হইবেন। পদ্ধতিগত-মত-বিরোধে শেষ পর্যন্ত এই স্কীমও পরিত্যক্ত হয়। নির্বাচন প্রথার প্রশ্নকে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এমন গুরুত্ব দিতেন বলিয়াই প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরির হারের বেলা তাঁরা নিতান্ত বানিয়া-নীতিতে দরকষাকষি করিয়াও

একটু-একটু করিয়া ডোর ছাড়িয়াছেন। কিন্তু কিছু বেশি আসনের বদলে নির্বাচনের বেলা এক ইঞ্চি টলেন নাই। লাখনৌ প্যাক্টে স্বতন্ত্র নির্বাচন মানিয়া লইয়া যে সব হিন্দু-নেতা ভুল করিয়াছিলেন, হিন্দুরা কোনদিন তাঁদের ক্ষমা করেন নাই। তেমন ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতেও তাঁরা রাযী ছিলেন না।

দৃষ্টি-কোণের এই মৌলিক পার্থক্য হেতু হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সবচেয়ে বাস্তবদর্শী মুসলিম প্রবক্তা জিন্না সাহেবকে হিন্দু নেতারা ভুল বুঝিয়াছিলেন। মুসলিম নেতাদের মধ্যে একমাত্র মিঃ জিন্নাই রাজনৈতিক সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিমকে ও কংগ্রেস-লীগকে খুব কাছাকাছি রাখিয়া চলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক আপোসে হিন্দু নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাবের মুখেও তিনি কংগ্রেসের সাথে একযোগে মুসলিম লীগকে দিয়া সাইমন কমিশন বয়কট করাইয়াছেন। রাউন্ডটেবল কনফারেন্সে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় দাবি-দাওয়া ও ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পক্ষে কঠোর ইংরাজ-বিরোধী বক্তৃতা করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস লীগে নির্বাচনী মৈত্রী করিয়াছেন। বাংলা পাঞ্জাব সিন্ধু সরহদ্দ প্রভৃতি মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ জিন্না সাহেবের এই লীগ-কংগ্রেস নির্বাচনী-মৈত্রী মানিয়া লয় নাই সত্য, কিন্তু যুক্তপ্রদেশ বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি মুসলিম মাইনরিটি প্রদেশে সে চুক্তি ফলপ্রসূ হইয়াছিল। তথাপি কংগ্রেস ঐসব প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সময় মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। নির্বাচনের আগে ও পরে কংগ্রেসের এই দুই রকম মতকে জিন্না সাহেব বিশ্বাস ভংগ মনে করেন। ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে তাঁর আজীবন আস্থা একরূপ ভাংগিয়া যায়। কিন্তু তাতেও জিন্না সাহেব তাঁর আসল ভূমিকা হইতে মুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হন নাই! সেকথাটা একটু পরে বলিতেছি।

৪. বাংগালী জাতীয়তা বনাম ভারতীয় জাতীয়তা

হিন্দু-নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রদর্শিত পথ হইতে তাঁদের অদূরদর্শী বিচ্যুতিতে কিভাবে রাজনীতির মোড় ফিরিয়াছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি বাংলার রাজনীতিতে। বাংলার রাজনীতি ভারতীয় রাজনীতি হইতে ছিল বেশকিছু পৃথক ও স্বতন্ত্র। নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দুরা যে নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক শাসন চাহিতেন, বাংলার বেলা তা চাহিতেন না। বাংগালী হিন্দুরা বাংলায় মেজরিটি শাসন ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন উভয়টারই বিরোধী ছিলেন। এটা ছিল অবশ্য হিন্দুদের সাম্প্রতিক মনোভাব। উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু কবি সাহিত্যিক ও রাষ্ট্র নেতারা 'বাংগালী জাতিত্ব'

'বাংলার বিশিষ্ট' 'বাংলার কৃষ্টি' 'বাংলার স্বাতন্ত্র্য' ইত্যাদি প্রচার করিতেন। অনেকে বিশ্বাসও করিতেন। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ভোটাধিকার প্রসারে বাংলার রাষ্ট্রীয় অধিকার মেজরিটি মুসলমানের হাতে চালিয়া যাইবে এটা যে দিন পরিষ্কার হইয়া গেল, সেই দিন হইতেই হিন্দুর মুখে বাংগালী জাতিত্বের কথা, বাংলার কৃষ্টির কথা আর শোনা গেল না। তার বদলে 'ভারতীয় জাতি' 'ভারতীয় কৃষ্টি' 'মহাভারতীয় মহাজাতি' ও 'আর্য্য সভ্যতার' কথা শোনা যাইতে লাগিল। এর কারণও ছিল সুস্পষ্ট। শেরে-বাংলা ফজলুল হক একদা বলিয়াছিলেন : 'পলিটিক্স অব বেংগল ইয ইন রিয়েলিটি ইকনমিক্স অব বেংগল। বাংলার অর্থনীতিই বাংলার আসল রাজনীতি।' খুব সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বাংলার গোটা মুসলমান সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয়। ধর্ম ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম দুইটা স্বতন্ত্র সমাজ আগে হইতেই ছিল। অর্থনীতিতে মুসলমানদের এই অধঃপতনে জীবনের সকল স্তরে হিন্দু ও মুসলমান সুস্পষ্ট দৃশ্যমান দুইটা পৃথক জাতি হইয়া গেল। পরিস্থিতিটা এমন হৃদয়বিদারক ছিল যে কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী হইয়াও আমি কংগ্রেস সহকর্মীদের সামনে জনসভায় কঠোর ভাষায় এই পার্থক্যের কথা বলিয়া হিন্দু বন্ধুদের বিরক্তি ভাজন হইতাম। আমি বলিতাম : বাংলার জমিদার হিন্দু প্রজা মুসলমান; বাংলার মহাজন হিন্দু খাতক মুসলমান ; উকিল হিন্দু মক্কেল মুসলমান ; ডাক্তার হিন্দু রোগী মুসলমান ; হাকিম হিন্দু আসামী মুসলমান ; খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান ; জেইলার হিন্দু কয়েদী মুসলমান ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে আমি তালিকা বাড়াইয়া যাইতাম। যতই বলিতাম ততই উত্তেজিত হইতাম। ততই তালিকা বাড়িত। হাজারবার কওয়া এই কথাগুলিই তীব্রতম কর্কশ ভাষায় বলিয়াছিলাম ১৯৩৩-৩৪ সালে ময়মনসিংহের এক রিলিফ কমিটির বৈঠকে। সেবার ব্রহ্মপুত্র নদীতে বন্যা হইয়া দুকূল ভাসিয়া গিয়াছিল। বন্যা-পীড়িত দুর্গতদের জন্য অন্যান্যদের মত বার এসোসিয়েশনের পক্ষেও একটা রিলিফ কমিটি করা হয়। বেশ টাকা উঠিয়াছিল। প্রায় সব টাকাই হিন্দুরাই দিয়াছিলেন। মুসলমানদের দান খুবই নগন্য। এই তহবিলের টাকা বন্টনে এক সভায় সমিতির প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুর শশধর ঘোষের সাথে আমার তর্ক বাধে। তিনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে চাঁদাদাতারা প্রায় সবাই হিন্দু। আর যায় কোথায় ? আমি গর্জিয়া উঠিলাম। আমার হাজার-বার-কওয়া ঐসব কথা মুখস্থ বলিয়া গেলাম এবং উপসংহার করিলাম : 'অতএব বাংলার দাতা হিন্দু ভিক্ষুক মুসলমান।' রায় বাহাদুর ও সমবেত মেম্বরদেরে আমি স্মরণ করাইয়া দিলাম বাংলার হিন্দুদের যার ঘরে যত টাকা আছে সব টাকা মুসলমানের। মুসলমান চাষী-মজুরের

মাথার-ঘাম-পায়ে ফেলিয়া-রোযগারকরা টাকায় হিন্দুরা সিন্দুক ভরিয়াছে, দালান-ইমরাত গড়িয়াছে ; গাড়ি-ঘোড়া দৌড়াইতেছে। রায় বাহাদুরের নিজের টাকা ব্যাংক ও বাড়ির কথাও উত্তেজনার মুখে বলিয়া ফেলিলাম। রায় বাহাদুরসহ উপস্থিত সকলে হতভম্ব হইয়া গেলেন। কিন্তু রায় বাহাদুর ছিলেন বিচক্ষণ সুচতুর জ্ঞানী লোক। তিনি রাগ গোপন করিলেন। বিতরণের পন্থা হিসাবে আমার প্রস্তাবটা মানিয়া লইলেন, আসন্ন ঝড় কাটিয়া গেল। ব্যাপারটার মধুর উপসংহার হইল।

৫. প্রজা আন্দোলনের স্বরূপ

এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। কারণ ব্যাপারটা অর্থনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজ-জীবনের সকল খুটিনাটিতেও এই পার্থক্য পল্লবিত, প্রকটিত ও প্রতিফলিত হইয়াছিল। বাংলার মুসলমানদের নিজস্ব আন্দোলন বলিতে ছিল একমাত্র প্রজা-আন্দোলন। তিতুমীর পীর দুদু মিয়া ও ফকির আন্দোলনের ঐতিহাসিক পুরাতন নযির টানিয়া না আনিয়াও বলা যায়, বাংলার প্রজা-আন্দোলন খিলাফত-স্বরাজ আন্দোলনেরই দশ বছর আগেকার আন্দোলন। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে পারি, এ আন্দোলন গোড়ায় ছিল মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদার দাবি। শুধু হিন্দু জমিদাররাই মুসলমান প্রজাদিগকে তুই-তুংকার করিয়া অবজ্ঞা করিতেন এবং তাঁদের কাচারিতে ও বৈঠকখানায় এদের বসিতে আসন দিতে অস্বীকার করিতেন, তা নয়। তাঁদের দেখাদেখি তাঁদের আমলা-ফয়লা তাঁদের আত্মীয়স্বজন, তাঁদের ঠাকুর-পুরোহিত, তাঁদের উকিল-ডাক্তাররাও মুসলমানদের নিজেদের প্রজা ও সামাজিক মর্যাদায় নিম্নস্তরের লোক মনে করিতেন। এটা জমিদারপ্রজার স্বাভাবিক সাধারণ সম্পর্ক ছিল না। ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। কারণ একদিকে বামন-কায়েত প্রজারা জমিদারের কাছারি বৈঠকখানায় বসিতে পাইত। অন্যদিকে বর্ণ হিন্দুর কাছে অমন নিগৃহিত হইয়াও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু তালুকদার বা ধনী মহানজরাও মুসলমানদের সাথে বর্ণহিন্দুদের মতই ব্যবহার করিত।

এইভাবে ব্যবহারিক জীবনে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানরা ছিল দুইটি পৃথক সমাজ, ভিন্ন জাত ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। এদের মিশ্রণে এক সম্প্রদায় ছিল কল্পনাতীত। বিরাট ধর্মীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। হিন্দুর দিক হইতেও না মুসলমানের দিক হইতেও না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে এই দুই সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া হিন্দু-মুসলিম ফেডারেশন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেটা মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর মনের দিকে কম চাহিয়া নয়। এটাই ছিল রাজনৈতিক

বাস্তববাদ। অধিকাংশ হিন্দুনেতা দেশবন্ধুর এই বাস্তব দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন না বলিয়াই তাঁর অবর্তমানে বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস ছাড়িয়া প্রজা-পার্টি গঠন করিয়াছিল। সকল দলের সকল মতের এমনকি পরস্পর বিরোধী মতের মুসলমানরা যে ১৯২৯ সালে সার আবদুর রহিমের নেতৃত্ব প্রজা-সমিতি গঠন করেন এবং কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী জেল-খাটা চরমপন্থী ও খেতাবধারী মডারেটরা এক পার্টিতে মিলিত হইতে পারেন, এটা বাহির হইতে বিস্ময়কর মনে হইলেও আসলে তা ছিল না। এক বছর আগে বাংলার আইন পরিষদে কংগ্রেসী হিন্দু মেম্বররাই প্রজাস্বত্ব বিলের ভোটাভুটিতে এই সাম্প্রদায়িক কাতারবন্দি এলাইনমেন্ট করিয়া সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে বিলে কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী প্রজা-জমিদার সব হিন্দু জমিদারের পক্ষে এবং কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী প্রজা-জমিদার সব মুসলমান প্রজার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। তাই প্রজা-সমিতি নামে ও রূপে অসাম্প্রদায়িক হইলেও উপরোক্ত কারণে উহা ছিল আসলে বাংলার মুসলিম প্রতিষ্ঠান। বস্তুতঃ প্রজা-সমিতি গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আমাদেরে বলিয়াই ছিলেন : "হিন্দুরা যেমন অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নামে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান চালায়, আমরাও তেমনি অসাম্প্রদায়িক প্রজা-সমিতি নামে মুসলিম প্রতিষ্ঠান চালাইব।" দশ বছর পরে তারই স্থান দখল করে মুসলিম লীগ খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক নামে ও দাবিতে। হিন্দুদের অনেকেই যে প্রজা-আন্দোলনকে আসলে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিতেন, সেটা নিতান্ত মিথ্যা অভিযোগ ছিল না। আগেই বলিয়াছি, এই মুদ্দতে বাংলার আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর আগাগোড়াই এমন দুই-জাতি-ভিত্তিক ছিল যে প্রজা-খাতক নামের চুলে ধরিয়া টান দিলে মুসলমান নামের মাথাটি আসিয়া পড়িত। অপর পক্ষে জমিদার-মহাজনের নামের টানে হিন্দুরাও কাতারবন্দি হইয়া যাইত। প্রজা-আন্দোলনের ডাকে যে কাতারবন্দিটা হইত, তা ছিল এই কারণেই মুসলমান জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির চেষ্টা, সামাজিক মর্যাদার দাবি। প্রজা-আন্দোলনকে যে অনেকে কৃষক-বিরোধী জোতদার আন্দোলন বলিয়া নিন্দা করিতেন, তাঁদের কথাও একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। প্রজা-আন্দোলন সত্যসত্যই কৃষক-আন্দোলন ছিল না। 'লাংগল যার মাটি তার' যিকিরটা তখনও উঠে নাই। ১৯৩৩ সালে বাংলা সরকারের প্রচারিত এক প্রশ্নাবলীর উত্তরে ময়মনসিংহ প্রজা-সমিতির কার্যকরী কমিটির সভায় উপস্থিত বত্রিশজন মেম্বরের মধ্যে মাত্র তিনজন বর্গাদারকে দখলী স্বত্ব দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। অন্যান্যেরা শুধু বিরুদ্ধে ভোটই দেন নাই, তীব্র ও ক্রুদ্ধ প্রতিবাদও করিয়াছিলেন।

৬. প্রজা বনাম কৃষক–প্রজা

আসলে ব্যাপার এই যে বাংলার অধিকাংশ জিলায় প্রজা মানেই কৃষক, কৃষক মানেই প্রজা। তাঁদের শতকরা আশিজন নিজের হাতে নিজের জমিতে হালচাষও করেন। কিছু জমি বর্গাও দেন। এঁদের বিপুলসংখ্যক মেজরিটির পরিবারপিছে দশ একরের বেশি জমি নাই। কাজেই তাঁদের জোতদার বলা যায় না। এঁদের প্রকৃত নাম কৃষক প্রজা। এই জন্যই ১৯৩৬ সালে নিখিল বংগ প্রজা সমিতির নাম বদলাইয়া যখন কৃষকপ্রজা রাখা হয়, তখন কোনও বিপ্লবী পরিবর্তনের কথা কারও মনে পড়ে নাই। কালক্রমে গণআন্দোলনের প্রসারে ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের রাষ্ট্রীয় প্রয়োগে এই কৃষক–প্রজা সমিতিই একদিন ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকসহ বাংলার জনগণের প্রকৃত গণপ্রতিষ্ঠান হইত যদি না নিখিল ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক অন্যদিকে মোড় ফিরাইত। এটা শুধু মুসলমান দিকের কথা নয়, হিন্দুর দিকেরও কথা। গণতন্ত্রের বিকাশের প্রসারের সংগে সংগে হিন্দুরা যখন বুঝিতে পারেন যে স্বায়ত্তশাসিত বা স্বাধীন বাংলার গণতান্ত্রিক রাষ্টপরিচালনায় হিন্দু রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূক্তিত অধিকার বিপন্ন হইবে, সেই দিন হইতেই তাঁরা বাংলার মুসলিম মেজরিটির আওতা হইতে নিখিল ভারতীয় হিন্দু মেজরিটির আশ্রয়ে চলিয়া গেলেন। বাংলাদেশ ভারতের প্রদেশ হইল। বাংগালী জাতি ভারতীয় জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশমাত্র হইয়া গেল। এদিকে না গিয়া বাংলার কংগ্রেস যদি বাস্তববাদী দৃষ্টিভংগি লইয়া প্রজাপার্টির সহিত সহযোগিতা করিত, তবে ভারতের না হউক বাংলার রাজনীতি অন্যরূপ ধারণ করিত। বাংলার কংগ্রেস তথা বংলার হিন্দু নিখিল ভারতীয় হইয়া পড়ায় বাংলার মুসলমানদের নিখিল ভারতীয় না হইয়া উপায়ান্তর ছিল না।

এই ঘটনাটিই ঘটে ১৯৩৭ সালে হক মন্ত্রিসভা গঠনের সময়। এই কারণেই আমি এ সম্পর্কিত খুটিনাটি বিবরণ দেওয়া দরকার মনে করিয়াছি। হক মন্ত্রিসভা গঠনের সময় বাংলার কংগ্রেসের নেতৃত্ব ঐ অবাস্তব ও অদূরদর্শী মনোভাব গ্রহণ করার ফলে হক সাহেব তথা প্রজাপার্টির মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এর পরে হক সাহেবের তথা গোটা মুসলিম বাংলার লীগে যোগদান করা এবং প্রজাপার্টির মৃত্যু ঘটা ঐতিহাসিক ঘটনা–স্রোতেই অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ বাংলার নিজস্ব রাজনীতির অবসান ঐদিনই ঘটিয়াছিল।

হিন্দু-মুসলিম-সম্পর্কের এই তিক্ততার জন্য শুধু হিন্দুদেরেই দায়ী করিলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হইবে। ১৯২৮ সালে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সভায় সার আবদুর রহিম ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হইয়াছিল সেদিক পাঠকদের দৃষ্টি আবার আকর্ষণ করিতেছি। ঐ সভায় ডাঃ রায় বলিয়াছেন : 'মুসলমানরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয় না ; শুধু প্রতিনিধিত্ব ও চাকুরি-বাকরিতে অংশ চায়। সার আবদুর রহিম অবশ্যই সে কথার জবাব দিয়াছিলেন। কিন্তু একটু ধীরভাবে বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে, ডাঃ রায়ের ঐ অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল না। বস্তুতঃ আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরিতে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে হিন্দু-নেতৃত্বের কৃপণতার ও দ্বিধার যথেষ্ট কারণ ছিল। ডাঃ রায়ের কথাটা তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল না। ওটা ছিল সাধারণভাবে হিন্দুদের এবং বিশেষভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্বের অভিযোগ। এমন যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তিনি পর্যন্ত বলিয়াছেন : দেশকে ভাল না বাসিয়া দেশের স্বার্থে কোনও কাজ না করিয়া মুসলমানরা শুধু ফললাভে সিংহের ভাগ বসাইতে চায়।' 'সিংহের ভাগ' কথাটা অতিশয়োক্তি কিন্তু মোটের উপর কথাটা সত্য। ঐতিহাসিক যত কারণ ও পারিপার্শ্বিক যত যুক্তিই থাকুক না কেন, এই যুগের বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে মুসলমানরা সাধারণভাবে ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষভাবে নিজেদের মাতৃভূমিকে আপন দেশ মনে করিত না। তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কামে-কাজে এটা মনে হওয়া মোটেই অযৌক্তিক ছিল না যে মুসলমানরা নিজের দেশের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিকেই বেশি আপন মনে করে। প্রথমতঃ মুসলমানদের কোনও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা-ধারা ছিল না। যদি কিছু থাকিয়া থাকে সেটা ছিল প্যানইসলামিযম। 'মুসলিম হায় হাম সারা জাহাঁ হামরা'ই যেন ছিল তাদের সত্যকার রাষ্ট্র-দর্শন। ১৯২০-২১ সালে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন যে ভারতীয় মুসলমানদের একটা অভূতপূর্ব। গণ-আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল, সেটা খিলাফত ও তুর্কী সাম্রাজ্যের জন্য যতটা ছিল, ভারতের স্বরাজ্যের জন্য ততটা ছিল না। এটা হাতে-নাতে প্রমাণিত হইল দুই বছরের মধ্যে। ১৯২৩ সালে কামাল পাশা যখন খলিফাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া খিলাফতের অবসান ঘোষণা করিলেন, তখনই ভারতের মুসলমানদের উৎসাহে ভাটা পড়িল। খিলাফত কমিটি মরিয়া গেল, মুসলমানরা কংগ্রেস ছাড়িয়া দিল। এতে তারা এটাই বুঝাইল যে খিলাফতই যখন শেষ হইয়া গেল, তখন দেশের স্বাধীনতায় তারা আর ইন্টারেস্টেড নয়।

৭. মুসলিম রাজনীতির বিদেশ–মুখিতা

এটার না হয় রাজনৈতিক কারণ ছিল। কিন্তু জন–সেবার মধ্যে ত কোনও রাজনীতি আসিবার কথা নয়। সেখানেও মুসলমানদের মনোভাব ছিল বিদেশ–মুখী। মুসলমানদের মধ্যে ধনী ও দানশীল লোকের খুব বেশি অভাব ছিল না। কিন্তু সারা ভারতে মুসলমানদের ব্যক্তিগত দানে একটা হাসপাতাল বা কলেজ স্থাপনের নযির নাই। সমস্ত দানশীলতা এদের মসজিদ নির্মাণে সীমাবদ্ধ। ওটাও নিশ্চয়ই মুসলিম জনতার সুবিধার জন্য ততটা ছিল না যতটা ছিল সওয়াব হাসিল করিয়া নিজে বেহেশতে যাইবার উদ্দেশ্যে। নৈসর্গিক বিপদ–আপদেও তাঁরা অর্থ–সাহায্য যে না করিতেন তা নয়। কিন্তু সেটাও দেশে নয় বিদেশে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি। এই বাংলাতেই মুসলিম প্রধান এলাকাতে যদি বন্য–মহামারী হইত, তবে তার রিলিফের কাজেও হিন্দুদাতাদের উপরই নির্ভর করিতে হইত ; মুসলমান দাতারা থলির মুখ খুলিতেন না। হাজারের মধ্যে একটা নযির দেই। উত্তর বাংলার এক বিশাল এলাকার বন্যা হইয়া প্রায় আশি লক্ষ লোক বিপন্ন হইল। ইহাদের বিপুল মেজরিটি ছিল মুসলমান। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের নেতৃত্বে "সংকট–ত্রাণ সমিতির' প্রায় কোটি টাকা চাঁদা তুলিয়া বহুদিন পর্যন্ত এই এলাকায় রিলিফ চালাইল। এই সমিতির স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করিয়া আমরা কলিকাতার ধনী মুসলমানদের নিকট উল্লেখযোগ্য কোনও চাঁদা পাই নাই। কিন্তু এর কিছুদিন পরে তুরস্কের আনাতোলিয়ার ভূমিকম্পের দুর্গতের রিলিফের জন্য মোহাম্মদ আলী পার্কের এক জন–সভাতেই তিন লাখ টাকা চাঁদা উঠাইয়াছিল। ফলে হিন্দু প্রতিবেশী ত দূরের কথা কোন নিরপেক্ষ বিদেশী পর্যটকেরও এই সময়ে মুসলমানদের ব্যবহারে মনে হইত এরা ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভালমন্দের চেয়ে মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম জাহানের ভাল–মন্দের কথাই বেশি চিন্তা করে। এই ভাব–গতিক দেখিয়া হিন্দু নেতৃ–বৃন্দের এমন সন্দেহ হওয়াও বিচিত্র বা অযৌক্তিক ছিল না যে মুসলমানদের দাবি–দাওয়া–মত চাকুরি–বাকরি দিলেও তারা ভারতের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য লড়িবার বদলে ইংরাজ সরকারকেই সমর্থন করিবে। এটা আরও বেশি সম্ভব মনে হইত এই জন্য যে এই মুদ্দতে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব মোটের উপর ছিল নাইট–নবাব ও খান বাহাদুরদের হাতে। এঁরা বিশ্বাস করিতেন এবং খোলাখুলি বক্তৃতা বিবৃতিতে বলিতেনও যে যতদিন এদেশে ইংরাজ আছে ততদিনই আমরা বাঁচিয়া আছি। ইংরাজ চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে হিন্দুরা আমাদেরে শেষ করিয়া ফেলিবে। হিন্দু নেতা সরকারী কর্মচারী ও উকিল মোখতারাদি ব্যবসায়ী এবং সর্বোপরি জমিদার–মহাজনদের অদূরদর্শী ব্যবহারে মুসলমানের এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইত। বাস্তবে প্রমাণিত হইত। মোট কথা ভারতের

মুসলমানরা এই যুগে ছিল কার্যতঃ একটা দেশহীন ধর্মসম্প্রদায় মাত্র। নিজের দেশকে অবস্থা-বৈগুণ্যে এরা হিন্দুর দেশ মনে করিত। কেউ কেউ এই 'দারুলহর্ব' ছাড়িয়া পশ্চিমে 'দারুল ইসলামে' হিজরত করিবার কথাও ভাবিতেন। কাজেই এই 'হিন্দুর দেশ' হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক উন্নতির কথা তাঁরা ভাবিতে যাইবেন কেন? এই দেশ যে তাঁদের, এই দেশ শাসন করিবার অধিকার ও এই দেশের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব যে তাঁদের, তাঁদেরই ভাইয়েরা যে কৃষক-মযদুর হিসাবে দেশের খোরাকি ও অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টি করিতেছে মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, একথা যেন তাঁদের মনেই পড়িত না। কাজেই দেশগতপ্রাণ, দেশের জন্য যেকোন ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত, পরাধীনতার জ্বালায় দগ্ধ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামেলিপ্ত হিন্দুরা যদি মুসলমান নেতাদের দেশ-প্রেমে সন্দেহ করিয়াও থাকে, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

৮. বাস্তববাদী জিন্নাহ্

এই সার্বিক বিভ্রান্তি-বিরোধের অন্ধকার যুগে যে একজন মাত্র লোক বাস্তববাদীর দৃষ্টি-কোণ হইতে সকল অবস্থায় হিন্দু-মুসলিম আপোসের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তাঁর মৈত্রী প্রচেষ্টার যে বিশেষ দিকটা তৎকালে আমরা বুঝিতে পারি নাই এবং পরবর্তীকালে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল, তা এই যে তিনি শুধু মুসলমানদের অধিকারের কথা বলেন নাই, তাদের দায়িত্বের কথাও বলিয়াছেন। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় তিনিই একমাত্র মুসলিম নেতা যিনি মুসলমানদের বিদেশ-মুখিতা হইতে স্বদেশমুখী করিয়াছেন। কংগ্রেসের বাইরে তিনিই একমাত্র মুসলিম নেতা যিনি মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধিতায় কংগ্রেসের পাশাপাশি রাখিয়াছিলেন। নিজেদের অধিকারের জন্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়িবার সংগে সংগে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য ইংরাজের সহিত সংগ্রামে তিনিই মুসলমানদের আগাইয়া নিয়াছেন। জিন্না সাহেবের এই রাষ্ট্রদর্শনের সবটুকু ব্যক্তিগতভাবে আমি তখনও বুঝি নাই, একথা সরলভাবে স্বীকার করিতেছি। এই কারণে আমি কখনও-কখনও তাঁর ভক্ত সমর্থকও যেমন ছিলাম, আবার কখনও কখনও তেমনি কঠোর সমালোচকও ছিলাম। যে সময় এবং যে কাজে তাঁর সমর্থন করিয়াছিলাম, তাও করিয়াছি তাঁর খাতিরে নয় কংগ্রেসের খাতিরে। অর্থাৎ যে-যে কাজে কংগ্রেসের সাথে তাঁর মিল ছিল, যখন-যখন তিনি কংগ্রেসের নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন, কংগ্রেসের সাথে সাথে সংগ্রাম করিয়াছেন, যখন-তখন তিনি মুসলিম নাইট-নবাব ইত্যাদি খেতাবধারীকে ইংরাজের পো-ধরা বলিয়া গাল দিয়াছেন, তখন-তখন আমি পরম উৎসাহে তাঁর সমর্থন করিয়াছি। পক্ষান্তরে যখন তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াছেন, তখন আমিও তাঁর বিরোধিতা করিয়াছি। লাখনৌ-প্যাক্ট গ্রহণ

হইতে শুরু করিয়া সাইমন কমিশন বয়কট ও ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস-লীগ নির্বাচনী মৈত্রী পর্যন্ত সব কাজই আমার আন্তরিক সমর্থন পাইয়াছে। পক্ষান্তরে ১৯২১ সালে যখন তিনি কংগ্রেসের খিলাফত ও অসহযোগ নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস ত্যাগ করেন তখন আমি তাঁর উপর মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি। খিলাফত আন্দোলনকে যখন তিনি অবস্ কিউরেন্টিস্ট ধর্মীয় গোড়ামি আখ্যা দেন, আর রাজনীতিতে ধর্ম আমদানির দোষারোপ করেন, তখন আমি তাঁর মুসলমানী ঈমানেই সন্দেহ করিয়া বসি এবং তিনি যে শিয়া সেকথাও স্মরণ করি। পক্ষান্তরে তিনি যখন গান্ধীজীর হরিজন অস্পৃশ্যতা ও গো-রক্ষা নীতিকে অবস্ কিওরেন্টিস্ট ধর্মীয় গোড়ামি বলিয়া নিন্দা করেন এবং রাজনীতিতে ধর্মের আমদানির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তখন আমার বিশ্বাস ও মতবাদে একটা প্রচন্ড ঝাঁকি লাগে। জিন্না সাহেবের অভিমতের একটা দাম আছে বলিয়াও আমার মনে হয়। কিন্তু এটাই যে সেকিউলারিযম বা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতি তখনও তা বুঝি নাই।

মোট কথা, এই যুগের রাজনীতির মধ্যে তেসরা দশকের আগেরও চৌথা দশকের শেষ দিকের কয়েক বছর ছাড়া জিন্না সাহেবের ব্যক্তিগত নেতৃত্ব দেখিতে কুয়াসাচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও আসলে কিন্তু তা ছিল না। গান্ধীজী ও আলী ভাইর চান-সুরুজের মত প্রখর চাকচিক্যপূর্ণ সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্ব ও দৈত্যের মত দুঃসাহসিক নেতৃত্ব দেশবাসীর হৃদয় এমনভাবে জয় করিয়াছিল যে জিন্না সাহেবকে এই মুদ্দতে কিছুদিনের জন্য দেশে ও বিদেশে রাজনৈতিক নির্বাসন যাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, এই যুগেও তিনি তাঁর চির জীবনের স্বপ্নসাধ হিন্দু-মুসলিম আপোসের ভিত্তিতে ভারতীয় রাজনীতিতে একটা সুস্থতা আনিবার চিন্তাতেই নিয়োজিত ছিলেন।

কিন্তু আমি তৎকালে অত গভীরে তলাইয়া দেখি নাই। তার কয়েকটি কারণ ছিল। আমি বাংলার রাজনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিতাম, ভারতীয় রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করিতাম না। ওটাকে বরং আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ মনে করিতাম। বাংলায় মুসলিম মেজরিটি ছিল বলিয়াই বোধ হয় আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধী ছিলাম। জমিদারি উচ্ছেদকে বাংলার গণ-মুক্তির বুনিয়াদ ও কৃষক-প্রজা সমিতিকে বাংলার ভবিষ্যৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান মনে করিতাম। জিন্না সাহেব এই দুইটা মৌলিক ব্যাপারেই ভিন্নমত পোষণ করিতেন। তাঁর রাজনীতিও ছিল স্বভাবতঃই নিখিল ভারতীয়।

বারই অধ্যায়

কৃষক-প্রজা পার্টির ভূমিকা

১. হক মন্ত্রিসভায় অনাস্থা

হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা-কর্মীদের অসন্তোষের ফলে ক্রমে সকল শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। মন্ত্রীদের অন্তর্বিরোধের বিভিন্ন খবর সংবাদপত্রে বাহির হইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত মৌঃ সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের সহিত মন্ত্রিসভার বিরোধ বাধিল। কিন্তু নওশের আলী সাহেব পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় হক সাহেব নিজেই পদত্যাগ করিয়া নওশের আলীকে বাদ দিয়া পুনরায় দশজন মন্ত্রীর মন্ত্রি-সভা গঠন করেন ১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে। ফলে হক সাহেব ছাড়া তাঁর মন্ত্রিসভায় কৃষক-প্রজা পার্টির কেউ রহিলেন না। এইভাবে বৎসরাধিক কাল চলিয়া গেল। কৃষক-প্রজার কোন কাজই হইল না। ফ্লাউড কমিশন গঠন করিয়া জমিদারি উচ্ছেদের প্রশ্নটা শিকায় তুলা হইল। এমনকি ১৯৩৫ সালে পাস-করা প্রাথমিক শিক্ষা আইন ও ১৯৩৬ সালের পাস-করা কৃষি-খাতক আইনটি পর্যন্ত প্রয়োগ করা হইল না।

কৃষক-প্রজা পার্টির কৃষক সমাজের পুঞ্জীভূত অভিযোগের সংগে কংগ্রেসের রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তির প্রশ্নটা যোগ দিল। শহরে-মফস্বলে, রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে হক মন্ত্রিসভার নিন্দায় আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল। কৃষক-প্রজা-নেতা হক সাহেবের মন্ত্রিসভাকে জমিদার-মন্ত্রিসভা আখ্যা দেওয়া হইল। কথাটা সত্যও বটে। কারণ দশজন মন্ত্রীর মধ্যে ছয় জনই জমিদার। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে বাজেট সেশনেই হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দেওয়া হইল। আশা করা গিয়াছিল হক মন্ত্রিসভার পতন অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এই অনাস্থা প্রস্তাবই হক মন্ত্রিসভার শাপে বর হইল। ইহাতে মন্ত্রিসভার অন্তর্বিরোধই যে শুধু দূর হইল তা নয়, অন্ততঃ মুসলিম জনমতের মোড় ঘুরিয়া গেল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মরহুম হাকিম মসিহুর রহমানের সাহেবের পুত্র হাকিম শামসুয্যামানের ধর্মতলাস্থ ডিসপেনসারি আমাদের আড্ডা ছিল। এই খানে বসিয়া আমরা হক মন্ত্রিসভার মুন্ডপাত করিতাম। হাকিম সাহেব স্বয়ং হক সাহেবের নিন্দায় সবচেয়ে বেশি গলাবায ছিলেন । অনাস্থা প্রস্তাব দেওয়ার পর তার সাফল্যের চেষ্টায় আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। বরাবরের অভ্যাস মত হাকিম সাহেবের ডিসপেনসারিতে

গেলাম। হাকিম সাহেব আমাকে দেখামাত্র বলিলেন ঃ হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়া কৃষক-প্রজা পার্টি ঘোরতর অন্যায় কাজ করিয়াছে। আমাকে অবিলম্বে এ কাজে পার্টিকে বিরত করিতে হইবে। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম ঃ 'আপনে এটা কি কইতেছেন ? হক মন্ত্রিসভার নিন্দায় আপনে ত আমার চেয়ে অনেক বেশি যান।' হাকিম সাহেব কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিলেন ঃ 'ঠিক। এখনও তা করি। হক মন্ত্রিসভাকে আমি চাবুক মারতে চাই। কিন্তু আপনারা যে চাবুক ফেলে বন্দুক ধরেছেন।'

এই একটি মাত্র কথার মধ্যে হক মন্ত্রিসভার প্রতি মুসলিম জনমত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ট্রেন-বাসের যাত্রীরা চা-খানার আলাপীরা এই কথাই বলিয়াছে। হক সাহেবের মন্ত্রিসভা আদর্শ মন্ত্রিসভা নয়, এ কথা সত্য' কিন্তু এটা ভাংগিলে এর চেয়ে ভাল মন্ত্রিসভা হইবে না। যা হইবে তা এর চেয়ে খারাপ হইবে। তা হইবে পুরাপুরি জমিদার মন্ত্রিসভা' এই ধারণা জনসাধারণের মধ্যে সার্বজনীন হইয়া পড়িয়াছিল। তর্ক করিলে বলা হইত ঃ 'হক মন্ত্রিসভা কৃষক-প্রজার কোন হিত করিতেছে না ঠিক, কিন্তু অহিতও কিছু করিতেছে না। এটাও কম কথা নয়' এটাই ছিল সাধারণভাবে মুসলিম জনমত।

২. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী

হিন্দু জনমতের এক অংশ যে হক মন্ত্রিসভার সমর্থক তার প্রমাণ পাইলাম আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের দরবারে। আমি আচার্য রায়ের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলাম। বিজ্ঞানের এক হরফ না জানিয়াও আমি আচার্য রায়ের একজন স্নেহের পাত্র ছিলাম। কলিকাতা ছাড়ার পরেও আমি সুযোগ পাইলাম আচার্য রায়ের বিজ্ঞান কলেজস্থ আস্তানায় হাযির হইতাম। ৯২ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ বিজ্ঞান-কলেজের বিশাল ইমারতের পিছন দিককার একটি কামরাই ছিল এই বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানীর বাসস্থান। একটি দড়ির খাটিয়াই ছিল তাঁর শয়ন-শয্যা। এতে তিনি অর্ধশায়িত থাকিয়া ভক্তগণকে উপদেশ দিতেন। খাটিয়ার সামনে মেঝেয় পাতা থাকিত একটা বিশাল শতরঞ্জি। সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ভক্তেরা এই শতরঞ্জিতে বসিয়াই তাঁর কথা শুনিতেন। আমিও তাঁদের মধ্যে বসিয়া গুরুদেবের উপদেশ শুনিতাম। আচার্য রায়ের কাজ ও চিন্তা-ধারার একটা দিক আমাকে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল। আচার্য রায় ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর মতই নির্বিলাস 'প্লেইন লিভিং হাই থিংকিং'-এর চিন্তা-নায়ক। তবু আচার্য রায়ের নৈকট্য ও সান্নিধ্য আমার কাছে যেমন অনির্বচনীয় আকর্ষণীয় ছিল, মহাত্মাজীর নৈকট্যও তেমনি ছিল না। মহাত্মাজীর কঠোর বৈরাগ্যের দরবারের আবহাওয়ার মধ্যেও যেন এটা কৃত্রিম রাজকীয়তা বোঝার মত আমার বুকে পীড়া দিত। আচার্য রায়ের দরবারে এই কৃত্রিমতা

আমি অনুভব করিতাম না। তার বদলে আমি যেন কল্পনায় প্রাচীনকালের মুনি-ঋষির তপোবনের শান্ত-শীতলতায় ডুবিয়া যাইতাম। তাঁর মত লোকের স্নেহ পাইবার কোনও যোগ্যতা বা অধিকার আমার ছিল না। তবু আমার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত স্নেহাদর তাঁর অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বস্ত ছাত্রকেও বিস্মিত করিয়া দিত। অন্য কেউ তাঁকে যে কাজে রাযী করাইতে পারেন নাই, আমি তাঁকে অনেকবার তেমন কাজে রাযী করাইয়াছি। অসুস্থতাহেতু তিনি যে সব সভায় যাওয়া বাতিল করিয়াছেন, তার অনেক গুলিতে আমি গিয়া তাঁকে ধরিয়া আনিয়াছি। ১৯৩০ সালে আলবার্ট হলে নযরুল-অভ্যর্থনার সভা ছিল এমনি একটি উপলক্ষ্য। উদ্যোক্তাদের সকলের এবং বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকদের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আমি গিয়া আচার্য রায়কে ধরিয়া আনি। তিনি আমার কাঁধে ভর করিয়া সভায় যোগ দেন।

১৯৩৮ সালে এপ্রিল মাসে আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশনে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা পার্টির পক্ষ হইতে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়। কংগ্রেস দল এক বাক্যে তা সমর্থন করে। দেশময় হৈ চৈ। কলিকাতা গরম। রেলে-ট্রামে হোটেল-চাখানায় তুমুল বাদবিতন্ডা। এই সময় আমি একদিন আচার্য রায়ের দরবারে হাযির। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন ঃ 'শোন মনসুর, আমি রাজনীতি বুঝি না। রাজনীতিক ব্যাপারে নাকও গলাই না কিন্তু আমার অনুরোধ হক মিনিস্ট্রির বিরুদ্ধে তোমরা যে অনাস্থা দিয়েছে, অবিলম্বে তা প্রত্যাহার কর।'

জবাবে আমি হক সাহেবের বিশ্বাস ভংগ ও হক মন্ত্রিসভার অকর্ম ও কুকর্মের লম্বা ফিরিস্তি দিলাম। আচার্য রায়ের মন জয় করিবার মতলবে হক সাহেবের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগও আনিলাম। আচার্য রায় ধৈর্যের সাথে সব কথা শুনিলেন। বিশাল মোচের নিচে তিনি মুচকি হাসিতে থাকিলেন। আমার কথা শেষ হইলে তিনি তাঁর শীর্ণ হাতটি উচা করিয়া বলিলেন ঃ "তুমি যা বললে সবই রাজনীতির কথা। আমি রাজনীতির কথা বলছি না। আমি বলছি বাংগালী জাতির ভবিষ্যতের কথা। সমস্ত রাজনীতিক সত্যের উপর আরেকটা বড় সত্য আছে। সেটা বাংগালী জাতির অস্তিত্ব। বাংগালী জাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ভর করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর। ফযলুল হক এই ঐক্যের প্রতীক। আমি কংগ্রেসীদের ভারতীয় জাতীয়তা বুঝি না। আমি বুঝি বাংগালীর জাতীয়তা। এ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র ফযলুল হক। ফযলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাংগালী। সেই সংগে ফযলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান। খাঁটি বাংগালীত্বের সাথে খাঁটি মুসলমানত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয় আমি আর দেখি নাই। ফযলুল হক আমার ছাত্র বলে এ কথা বলছি না। সত্য বলেই এ কথা বলছি। খাঁটি বাংগালীত্ব ও খাঁটি মুসলমানত্বের

সমন্বয়ই ভবিষ্যৎ বাংগালীর জাতীয়তা। ফযলুল হক ঐ সমন্বয়ের প্রতীক। এ প্রতীক তোমরা ভেংগো না। ফযলুল হকের অমর্যাদা তোমরা করো না। শোন মনসুর আমি বলছি, বাংগালী যদি ফযলুল হকের মর্যাদা না দেয়, তবে বাংগালীর বরাতে দুঃখ আছে।"

কথাগুলি আচার্য রায় আমার চেয়ে সমবেত অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন বেশি। তাঁর কথাগুলি কোনও ব্যক্তির মুখ হইতে আসিতেছিল না। আমার মনে হইতেছিল কথাগুলি ভবিষ্যৎ বাণীর মতই বাহির হইতেছিল কোন গায়েবী 'অরেকলের' মুখ হইতে। আমি ভিতরে-ভিতরে একেবারে মুষড়াইয়া গেলাম। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কাজ করিবার উৎসাহ উদ্যম একেবারে হিম হইয়া গেল। আচার্য দেবকে কি একটা কৈফিয়ৎ দিয়া আমি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম। সারা রাস্তায় আমার কানে ও মনে আচার্য রায়ের কথাগুলি ঝংকৃত হইতে থাকিল। আজও এই ত্রিশ বছর পরেও সেই সব কথা আমার মনে ঝংকৃত হইতেছে। এটা কি ছিল দার্শনিক মানব প্রেমীর ভাবাবেগ ? না, বিজ্ঞানীর বাস্তব-দর্শন ? যখনই দেশ ও জাতির কথা, জনগণের কথা, ভাবিতে চাই তখনই এই দুই মহাপুরুষের মুখ আমার চোখে ভাসিয়া উঠে। কি করিতে গিয়া কি করিয়াছিলাম! আচার্য রায়ের নির্দেশ পার্টি নেতাদের কাছে বলিয়াছিলাম বোধ হয়। কিন্তু কেউ বোধ হয় কানে তুলেন নাই।

৩. হক মন্ত্রিসভার কৃতিত্ব

আচার্য রায়ের মত শ্রদ্ধেয় ও প্রভাবশালী বিজ্ঞানীর এই অভিমত আমার মত অনেক হিন্দু নেতাকেও নিশ্চয়ই প্রভাবিত করিয়াছিল। যা হোক, কলিকাতার মুসলিম জনমত আমাদের বিরুদ্ধে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া ফাটিয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য একথাও ঠিক তারা যে যতটা ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ডিমনষ্ট্রেশন হইয়াছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। শহীদ সাহেবের মত সংগঠনী প্রতিভা মিছিল-প্রসেশন দিয়া একেবারে কলিকাতা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। এমনি এক উত্তেজিত সংঘবদ্ধ জনতা অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও আমাকে আক্রমণ করিয়া আহত করিয়াছিল। আহত অবস্থায় আমরা পার্শ্ববর্তী বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ক্ষিপ্ত জনতা সে বাড়ি ঘেরাও করিল। অল্পক্ষণ পরেই হক সাহেব, নবাব হবিবুল্লাহ ও সার নাযিমুদ্দিন আসিয়া আমাদিগকে জনতার হাত হইতে রক্ষা করেন। আমাদের মধ্যে অকৃতজ্ঞ কেউ কেউ বলিতে লাগিলেন : 'উঁহারাই আমাদের পিটাইবার জন্য আগে লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং পরে আমাদের রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।' কৃষক-প্রজা পার্টির মেম্বরদের পক্ষে কলিকাতার রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা বিপজ্জনক হইয়া পড়িল। অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য আইন পরিষদের বৈঠকের একদিন আগে হইতেই সমস্ত অপযিশন মেম্বরকে আইন পরিষদের দালানে

স্থান দেওয়া হইল। এত করিয়াও আমরা হারিয়া গেলাম। হক মন্ত্রিসভা টিকিয়া গেল।

অনাস্থা-প্রস্তাবের ফলে একটি লাভ ও দুইটি অনিষ্ট হইল। লাভ হইল এই যে দেশের কিছু কাজ হইল। যে মন্ত্রিসভা বিশেষ কিছু কাজ না করিয়া প্রায় বছর কাল সময় কাটাইয়াছিল, তারাই ঝট্ পট্ করিয়া কতগুলি ভাল কাজ করিয়া ফেলিল। ১৯৩৮ সালের মধ্যেই সালিশী বোর্ড স্থাপন শেষ হইল। ১৯৩৯ সালের মধ্যে কৃষক-প্রজার দাবি মত প্রজাস্বত্ব আইন পাস হইল ও মুসলিম লীগের দাবি মত কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন করিয়া কর্পোরেশনে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা হইল। ১৯৪০ সালের মধ্যে মহাজনি আইন পাস হইয়া গেল। সালিশী বোর্ড প্রজাস্বত্ব আইন ও মহাজনি আইনে বাংলার কৃষক-প্রজা ও কৃষি-খাতকদের জীবনে এক শুভ সূচনা হইল। তারা কার্যতঃ আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। ফলে হক মন্ত্রিসভার এই দুই-তিনটা বছরকে বাংলার মুসলমানদের জন্য সাধারণভাবে, কৃষক-প্রজা-খাতকদের জন্য বিশেষভাবে, একটা স্বর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে।

এই কৃতিত্বের বেশির ভাগ প্রাপ্য সাধারণভাবে অপযিশনের বিশেষভাবে কৃষক-প্রজা মেম্বর ও কর্মীদের। মেম্বররা ঐ অনাস্থা প্রস্তাব না দিলে এবং কর্মীরা বাইরে আন্দোলন না করিলে এই সব কাজ অত সহজে হইত না। মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের মধ্যে এক শহীদ সাহেব ছাড়া আর সবাই ছিলেন জমিদার। তাঁদের চেষ্টায় বা ষড়যন্ত্রে হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী হইয়াও অসহায়। সামসুদ্দিন সাহেব গোড়াতেই বাদ পড়ায় এবং নওশের আলী সাহেব অল্পদিনের মধ্যে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, এবং অবশেষে হক সাহেব মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ায় বাংলার এই মন্ত্রিসভা সত্য-সত্যই জমিদার সমর্থিত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা হইয়া গিয়াছিল। কৃষক-প্রজার জন্য সত্যিকার কোনও কাজ হওয়া এই মন্ত্রিসভার দ্বারা কার্যতঃ অসম্ভব ছিল। তেমন অবস্থায় এই অনাস্থা প্রস্তাবই মন্ত্রিসভার টনক নড়াইয়াছিল।

গণতন্ত্রে অপযিশনের কর্তব্য ও অবদান এটাই। অপযিশনের চাপ ও সমালোচনাই হক মন্ত্রিসভাকে এই সব ভাল কাজে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু সবটুকু কৃতিত্ব হক মন্ত্রিসভাই পাইল। অপযিশন এক বিন্দু ধন্যবাদ পাইল না। 'হক মন্ত্রিসভা যিন্দাবাদে' দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইল। পক্ষান্তরে অপযিশনের ভাগ্যে জুটিল নিন্দা। অমন ভাল মন্ত্রিসভার যারা বিরোধিতা করে, তারা দেশ-হিতৈষী হইতেই পারে না। অপযিশনের এই পরোক্ষ লোকসান ছাড়া আরও দুইটা প্রত্যক্ষ লোকসান হইল। এক কৃষক-প্রজা পার্টি দুই টুকরা হইয়া গেল। ৫৮ জন মেম্বরের মধ্যে ২৮ জন মাত্র মেম্বর লইয়া আইন পরিষদের মধ্যে কৃষক-প্রজা-পার্টি গঠিত হইল। বাকী ৩০ জন

হক সাহেবের সমর্থক রূপে কোয়ালিশন পার্টির মেম্বর রহিয়া গেলেন। দুই হক সাহেব কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতিত্বে ইস্তফা না দিয়াই প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব গ্রহণ করায় হক সাহেবের সমর্থক কৃষক-প্রজা মেম্বররা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বা নিজস্ব কৃষক-প্রজা-সমিতি চালাইবার কাজে হক সাহেবের পদ-মর্যাদার কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পাইলেন না। সংগঠনের বিশেষ চেষ্টাও হক সাহেব করিলেন না। অথচ কৃষক-প্রজা-সমিতির সভাপতিত্বও ছাড়িলেন না। এত দ্বন্দ্ব-কলহের মধ্যেও হক সাহেবের সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালই ছিল। পার্টির নেতাদের অনুরোধে একদিন আমি তাঁকে মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা-সমিতি উভয়টার সভাপতি থাকার মত স্ববিরোধী কাজ না করিয়া একটা হইতে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি সুস্পষ্ট আন্তরিকতার সাথে জবাব দিলেন যে, মুসলিম বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে মুসলিম লীগও করিতে হইবে, কৃষক-প্রজা-সমিতিও চালাইতে হইবে। তাঁর এই সুস্পষ্ট অসংগত কথার সমর্থনে তিনি শক্তিশালী যুক্তিও দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ বাংলার ক্ষেত্রে প্রজা-আন্দোলন ও মুসলিম-আন্দোলন একই কথা। মুসলিম লীগ করা যেমন ভারতীয় মুসলমানের জন্য দরকার কৃষক-প্রজা-সমিতি করা তেমনি বাংগালী মুসলমানের জন্য দরকার। তিনি কৃষক-প্রজা-সমিতির সভাপতিত্ব ছাড়িয়া দিয়া এটাকে কংগ্রেস-নেতাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারে না। তেমনি মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব ছাড়িয়া দিয়া ওটাকে খাজা-গজাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না।

৪. কৃষক-প্রজা আন্দোলনের ভূমিকা

সে সব যুক্তি অনুসারে যদি হক সাহেব কাজ করিতেন তবে হয়ত একদিন তাঁর মত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইত। কিন্তু তা হয় নাই। তাঁর সমর্থক কৃষক-প্রজা মেম্বরদের অস্তিত্ব আস্তে-আস্তে মুসলিম লীগের তলে চাপা পড়িয়া গেল। স্বয়ং হক সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ায় কৃষক-প্রজা সমিতির ঐ অংশ কার্যতঃ মুসলিম লীগের মধ্যে মার্জ হইয়া গেল। পক্ষান্তরে ঐ একই অবস্থা-গতিকে কৃষক-প্রজা সমিতির আমাদের অংশ আস্তে আস্তে কার্যতঃ কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া গেল।

পরবর্তী দুই-তিন বছরের মধ্যেই বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টির অস্তিত্ব লোপ পাইল। এই জন্যই অনেক রাষ্ট্র বিজ্ঞানী হক সাহেবকে বাংলার ম্যাকডোনাল্ড বলিয়া থাকেন। অনেকের মতে মিঃ রামযে ম্যাকডোনাল্ডই নিজ হাতে লেবার পার্টি গঠন

করিয়াছিলেন ; তিনি নিজ হাতেই তা ভাংগিয়া গিয়াছেন, হক সাহেবও বাংলার প্রজা-পার্টির যুগপৎভাবে সৃষ্টিকর্তা ও সংহার-কর্তা । বিলাতের লেবার পার্টি আবার পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে এবং অধিকতর শক্তিশালী হইয়াই জন্মিয়াছে। বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টি এবারের মত চূড়ান্তভাবে মরিয়াছে। লেবার পার্টির পুনর্জন্মের কারণ তার উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নাই ; ইংলন্ডে সমাজবাদ আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টির আদর্শ সমাজবাদের মত সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা ছিল না। এর আদর্শও খুব বিপ্লবাত্মক হইলেও সেটা ছিল সীমাবদ্ধ। 'লাংগল যার মাটি তার' এটা কৃষক-প্রজা পার্টির বামপন্থী দলেরই শ্লোগান ছিল। নেতারা এতে বিশ্বাস করিতেন না। নেতাদের দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। বাংলার প্রজা-আন্দোলন একটা মুসলিম-আন্দোলন বটে। আচার্য রায় ঠিকই বলিয়াছিলেন, কৃষক-প্রজা নেতা হক সাহেব মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত মুসলমান। তাঁর নেতৃত্ব কাজেই নিভাজ কৃষক-নেতৃত্ব ছিল না, ছিল মুসলিম নেতৃত্ব। প্রজা-পার্টির অভিযোগে শুধু অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি ছিল না, সামাজিক মর্যাদার দাবিও ছিল আমার নিজের বেলা যেমন জমিদারের কাচারিতে মুসলমান প্রজাদের বসিবার আসনের এবং সম্মানজনক সম্বোধনের দাবি হইতেই আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিকল তাই হইয়াছিল। কংগ্রেসের এবং কিষাণ সভার বন্ধুরা বাংলার প্রজা-আন্দোলনকে মুসলমান জোতদারদের আন্দোলন বলিতেন। তাঁদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল না। কৃষক-প্রজা আন্দোলন যে সময় খুবই জনপ্রিয় আন্দোলন কৃষক-প্রজা-সমিতি যখন খুবই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, সেদিনেও বর্গাদারদের দখলী স্বত্ব দেওয়ার প্রশ্নে অনেক প্রজা-নেতাই ছাঁৎ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন। সার আব্দুর রহিম, মৌলবী আবদুল করিম, খান বাহাদুর আবদুল মোমিন প্রভৃতি বড়-বড় মুসলিম নেতার প্রজা-সমিতির কর্মকর্তা থাকা হইতেই প্রজা-সমিতির মধ্যকার রূপ বোঝা যায়। সোজা কথায় প্রজা-আন্দোলন ছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন। সামন্ত-রাজদের বিপুল সংখ্যাধিক লোক হিন্দু হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যবিত্তেরা এই সামন্ততন্ত্রের কোনও সুবিধা না পাওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে প্রজা-আন্দোলনের এতটা জনপ্রিয় হইয়াছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রোধের কারণ এই হইতেই বোঝা যাইবে যে হিন্দু সামন্ত-রাজদের চাকুরি-বাকুরি ত দূরের কথা, যে কয়জন মুসলমান সামন্ত ছিলেন তাঁদের চাকুরিগুলিও মুসলমানরা পাইত না। চাকুরি-বাকুরি ছাড়াও সামন্ত-রাজেরা মামলা-মোকদ্দমা আমোদ-প্রমোদ বিলাস-বাসনে যে অজস্র টাকা ব্যয় করিতেন, তাও হিন্দুরা পাইত। কাজেই বাংলার প্রজা-আন্দোলন মূলতঃ এবং

প্রধানতঃ হিন্দু সামন্ত–তন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিম মধ্যবিত্তের আন্দোলন। এই আন্দোলনে সমাজবাদী ও সাম্যবাদী বামপন্থী এক দল কর্মী ছিলেন বটে, এবং তাঁদের চেষ্টায় প্রজা–আন্দোলন বাধ্য হইয়া কৃষক আন্দোলনের আকৃতি প্রকৃতিও কিছুটা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক কারণেই তাঁরা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব পান নাই। মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের মধ্যে হক সাহেবই ছিলেন একমাত্র গণ–নেতা ম্যান–অব–দি মাসেস। তিনি বিপুল কর্মী সুচতুর টেকনিশিয়ান রাজনৈতিক ম্যাজিশিয়ান ও কৌশলী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি জনগণের ভাষায় জনগণের যুক্তি দিয়া জনগণকে নিজের কথা বুঝাইতে পরিতেন। তাঁর কথায় ও কাজে ইমোশন ছিল। তাঁর বুকে দরদ ছিল। কাজেই এ দরদী ভাব প্রবণ নেতাকে ভাবালু জনসাধারণ অতি সহজেই বুঝিতে পারিত।

৫. হক–নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

এমন নেতা যেদিন এক পকেটের কৃষক–প্রজা পার্টি এবং আরেক পকেটে মুসলিম লীগ লইয়া মাঠে নামিলেন, এবং দুদিন আগে–কওয়া কথার বিপরীত কথা বলিতে লাগিলেন, জনসাধারণ সেদিনও তাঁর কথা মানিয়া লইল। ডাল ভাতের যুক্তি দিয়া দুদিন আগে তিনি মুসলিম লীগের 'মুসলমান ভাই ভাইর' যে কথাটাকে একটা হাস্যকর ভণ্ডামি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং জনসাধারণও উহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল, দুই দিন পরে সেই হাস্যকর কথাকেই তিনি জনপ্রিয় সত্যে পরিণত করিলেন। মুসলিম লীগ নেতাদের মুখে যেটা শুনাইত অবিশ্বাস্য হাস্যকর উক্তি, হক সাহেবের মুখে সেটাই শুনাইত ঘোরতর সত্য কথারূপে। তিনি যেদিন মাঠে নামিয়া বলিলেন ঃ প্রজা–সমিতিও দরকার, মুসলিম লীগও দরকার, তখন জনসাধারণও তাই বিশ্বাস করিল। আমরা কৃষক–প্রজা পার্টির ঝাণ্ডা খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া হক সাহেবের স্থলে মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীকে সভাপতি করিলাম। কৃষক–প্রজা সমিতির সংগঠনে মনও দিলাম। কিন্তু হক সাহেবের জনপ্রিয়তার সংগে সরকারী শক্তির যোগ হওয়ায় তার দুর্বার স্রোতের মুখে আমরা ভাসিয়া গেলাম।

আচার্য রায় ঠিকই বলিয়াছিলেন ঃ হক সাহেব খাঁটি মুসলমানও বটে, তিনি খাঁটি বাংগালীও বটে। অনাস্থা প্রস্তাবে জিতিয়াও তিনি অল্পদিনেই বুঝিলেন একদিকে মুসলিম সংহতি প্রচারের দ্বারা অপরদিকে কৃষকপ্রজা পার্টিকে ধ্বংস করিয়া দুইদিক হইতেই তিনি বাংলার নেতৃত্ব অবাংগালীর হাতে তুলিয়া দিতেছেন। তিনি নিজে যাইতেছেন মুসলিম লীগের দিকে ; আর তাঁর দুঃখের দিনের সহকর্মীদের ঠেলিয়া

দিতেছেন তিনি কংগ্রেসের দিকে। এ দুইটার নেতৃত্বই বাংলার বাইরে। নিজে প্রধানমন্ত্রী হইয়াও মন্ত্রিসভার মধ্যে তিনি মাইনরিটি হইয়া পড়িয়াছেন এটা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন।

এটা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বিশেষভাবে প্রজাস্বত্ব আইন পাস করার সময়। কোয়েলিশন পার্টিতে সচ্ছল মেজরিটি থাকায় আইন পরিষদে বিলটি পাস হইল বটে কিন্তু লাট সাহেব উক্ত আইনের দস্তখত দিতে গড়িমসি করিতে লাগিলেন। উক্ত আইনের বড় লাটের অনুমোদন লাগিবে বলিয়াও লাট-সাহেব মত প্রকাশ করিলেন। শোনা যায় স্বয়ং মন্ত্রীদের কারো-কারো কথায় লাট সাহেব ঐ রূপ করিয়াছিলেন। অবশেষে হক সাহেব পদত্যাগের হুমকি দিলে লাট সাহেব প্রজাস্বত্ব আইনে দস্তখত দেন। তাই হক সাহেব সাবধান হইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি প্রজা নেতাদের সংগে আপোস করিয়া মন্ত্রিসভার ভিতরে অধিকতর শক্তিশালী হওয়া দরকার বোধ করিলেন। এ দরকার যরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে মৌঃ তমিযুদ্দিনের নেতৃত্বে একদল সদস্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজা পার্টি নামে দল করিয়াই ইতিমধ্যে কোয়েলিশন পার্টি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই হক সাহেব মৌঃ শামসুদ্দিন ও মৌঃ তমিযুদ্দিন উভয়কে মন্ত্রী করিয়া কৃষক-প্রজা পার্টি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজা পার্টি উভয় দলের সহিত মিটমাট করার প্রস্তাব দেন। উক্ত দুই পার্টির যুক্ত বৈঠকে কতিপয় শর্ত পেশ করা হয়। প্রধান মন্ত্রী সব শর্ত মানিয়া নেন। ইতিমধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টির দৈনিক মুখপত্ররূপে 'কৃষক' বাহির হইল। আমি তাঁর সম্পাদকতার ভার নিলাম। ফলে আমি কলিকাতার স্থায়ী বাশেন্দা হইলাম। তাতে পার্লামেন্টারি পলিটিক্সে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া পড়িলাম। সকলের চেষ্টায় ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ ও মৌঃ তমিযুদ্দিন খাঁ হক মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিলেন। কৃষক-প্রজা সমিতির বিনা অনুমতিতে মৌঃ শামসুদ্দিন সাহেব মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই অভিযোগে সমিতির কাউন্সিলের এক রিকুইযিশন সভায় অধিবেশন দেওয়া হইল। ২৩শে ডিসেম্বর হইতে তিন দিন ধরিয়া এই সভার অধিবেশন চলিল। অবশেষে হক সাহেব এই সভায় যোগদান করিলেন। হক সাহেবের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত কৃষক-প্রজা সমিতি ১২টি শর্তে শামসুদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ অনুমোদন করিল। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ঐ সব শর্ত পূর্ণ করিতে না পারিলে হক সাহেব নিজেই পদত্যাগ করিবেন প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ কৃষক-প্রজা নেতৃবৃন্দ ও এম. এল. এ. গণ শান্ত হইলেন।

নির্ধারিত দিন আসিল, গেল। কিন্তু হক সাহেবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখা হইল না। ১২টি শর্তের একটিও পূর্ণ হইল না। ফলে কৃষক-প্রজা সমিতির ওয়ার্কিং কমিটি

ও কৃষক-প্রজা পার্টির যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল। শামসুদ্দিন সাহেবের বক্তব্য শুনিয়া ঐ ১২টি শর্তকে দুই ভাগে ভাগ করা হইল। তিনটিকে আশু পূরণের দাবি করা হইল। এই আশু শর্ত তিনটি পূরণের জন্য আরও পনর দিন সময় দেওয়া হইল। প্রস্তাবে বলা হইল এটাই শেষ কথা ঃ এর পর আর সময় দেওয়া হইবে না। এই প্রস্তাবকে চরমপত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিবার জন্য সমিতির প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল্লাহ হিল বাকী ও আমাকে লইয়া একটা ডিপুটেশন গঠিত হইল।

তদনুসারে মওলানা সাহেব ও আমি হক সাহেবের ঝাউতলায় বাড়িতে গেলাম। তিনি পরম সমাদরে আমাদেরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং শর্ত পূরণ করিতে না পারার অনেকগুলি যুক্তিপূর্ণ কারণ প্রদর্শন করিলেন। তার মধ্যে লাটের সাথে জমিদার মন্ত্রীদের গোপন ষড়যন্ত্রের কথাই বেশি। আমার ত বটেই স্বয়ং মওলানা সাহেবের দিলটাও নরম হইয়া গেল। হক সাহেব দুচার দিনের মধ্যে সবগুলি না হউক অন্ততঃ তিনটা আশু শর্ত পূরণ করিতে পারিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। আমরা আশ্বস্ত হইয়া বিদায় হইলাম।

৬. দুর্জ্ঞেয় হক সাহেব

কিন্তু হক সাহেব আমাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। আমি মওলানা সাহেবকে বিদায় দিয়া একা তাঁর ঘরে গেলাম। হক সাহেব আমাকে বসাইয়া রাখিয়া সেক্রেটারিয়েটে যাইবার সাজ-পোশাক পরিলেন। তারপর আমাকে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন। সোজা গেলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ। প্রধানমন্ত্রীর কামরায় ঢুকিয়াই দেখিলাম নবাব হবিবুল্লাহ সহ কয়েকজন মন্ত্রী বসিয়া আছেন। আমার সংগে যরুরী কথা আছে বলিয়া তিনি অল্প কথায় সব কয়জন মন্ত্রীকে বিদায় করিলেন। একে একে মন্ত্রীরা সব বাহির হইয়া গেলে হক সাহেব নিজে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রথমে সামনের বড় দরজাটা, তার পর অন্যান্য দরজা এবং শেষ পর্যন্ত সবগুলি জানালা নিজ হাতে বন্ধ করিলেন। ঠিক মত বন্ধ হইয়াছে কি না, ছিট্‌কানিগুলি লাগিয়াছে কিনা, টিপিয়া-টিপিয়া দেখিলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী বিশাল-বপু শেরে-বাংলা ফযলুল হক সাহেবের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। আমার মত পদ-মর্যাদাহীন নগণ্য একটা লোকের সাথে 'যরুরী আলাপ' করিবার জন্যই এত সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন, এটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না । তবে কেন, কি উদ্দেশ্যে তিনি এত পরিশ্রম করিতেছেন ? আমার কৌতূহল সীমা ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে তিনি ফিরিয়া টেবিলের দিকে আসিলেন। কিন্তু নিজের চেয়ারে না বসিয়া আমার পাশের একটা চেয়ার টানিয়া আরও কাছে আনিয়া তাতে বসিলেন। তার পরও

অতিরিক্ত সাবধানতা হিসাবে আরেক বার ডাইনে-বাঁয়ে তাকাইয়া ছোট গলায় বলিলেন ঃ দেখ আবুল মনসুর, 'আজ যে কথা কইবার লাগি তোমারে এখানে লৈয়া আসছি, সেটা এতই গোপনীয় যে উপরে আল্লা ও নিচে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। আল্লার ওয়াস্তে ওয়াদা কর তুমি একথা কেউরে কইতে পারবা না। মরুব্বির কথা। আমি আর কি করিতে পারি। ওয়াদা করিলাম। তিনি আরেক টানে চেয়ারটা আমার আরও কাছে আনিয়া তাঁর বেলচার মত বিশাল হাতে আমার ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন। তারপরই দুই হাতে আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন ঃ 'শর্ত-টর্তের কথা ভুইলা যাও। আমি ওর একটাও পূরণ করতে পারব না। পারব না মানে করব না।' ঐ সব শর্ত যদি আমি পূরণ করি, তবে কৃষক-প্রজা পার্টি ন্যায়তঃ কোয়ালিশন পার্টির অংগ হইয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি চাই কৃষক-প্রজা পার্টি অপযিশনেই থাকুক। মুসলিম লীগওয়ালাদের সাথে আমার সম্পর্ক খুবই খারাপ। কখন কি হয় কওয়া যায় না। হৈতে পারে শীগগির আমাকে রিযাইন করতে হৈব। সে সিচুয়েশনে আমার একটা জাম্পিংগ্রাউণ্ড থাকার দরকার। বুঝলা ত?'

আমি আর কি বুঝিব ? বিস্ময়ে আমার তালুজিভ লাগিয়া গিয়াছিল। গলা শুকাইয়া গিয়াছিল। পা অবশ হইয়া আসিয়াছিল। মাথা ভোঁ ভোঁ করিতেছিল। কাজেই জবাব দিতেছিলাম না। তিনি আমার হাতে একটা যবর চাপ দেওয়ায় আমি চমকিয়া উঠিলাম। অনেক কষ্টে বলিলাম ঃ তবে যে শামসুদ্দিনের পদত্যাগ করতেই হৈব।

আমার হাত হইতে নিজের ডান হাতটা আমার কাঁধে তুলিলেন। বলিলেন ঃ 'না সে পদত্যাগ করতে পারে না ; তারে কিছুতেই পদত্যাগ করায়ো না। আসল কথা কি জান, আমি কোয়েলিশন পার্টিতে মাইনরিটি নই। কিন্তু ক্যাবিনেটে আমি মাইনরিটি। শামসুদ্দিন মন্ত্রী থাকলে আমার জোর বাড়ে। তুমিযুদ্দিনকে আমি পুরাপুরি বিশ্বাস করি না । তবু শামসুদ্দিন ক্যাবিনেটে থাকলে তুমিযুদ্দিন আমার পক্ষে ভোট দিব। কিন্তু সে বার হৈয়া গেলে তুমিযুদ্দিন খাজাদের সাথে যোগ দিব।'

গোড়াতে হক সাহেবের এই অসাধু প্রস্তাবে আমি চাটয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমে তাঁর অসুবিধা উপলব্ধি করিলাম। তার যুক্তির সারবৃত্তান্ত আমি বুঝিলাম। তবু বন্ধুবর শামসুদ্দিনকে ওয়াদা খেলাফের অপরাধে অপরাধী করিতে এবং কৃষক-প্রজা পার্টির নির্দেশ অমান্য করায় উদ্বুদ্ধ করিতে মন মানিল না। বলিলাম ঃ 'সার, এটা হয় না। শামসুদ্দিন পার্টি ম্যাণ্ডেট অমান্য কৈরা যদি মন্ত্রিত্ব আঁকড়াইয়া থাকে, তবে তাঁর সুনাম নষ্ট হৈব, তার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটব।'

হক সাহেব ধাক্কা মারিয়া আবার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন ঃ 'ওসব বাজে কথা আমার কাছে কইও না। আমি যদি শামসুদ্দিনের পিছনে দাঁড়াই তবে

সে যাই করুক না কেন, তার রাজনৈতিক জীবন নষ্ট হবার পারে না। তুমি গিয়া তারে কও, আমি তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ভার নিলাম।'

আমি খুবই বিভ্রান্ত হইয়া হক সাহেবের নিকট হইতে বিদায় নিলাম।' কিন্তু আসল কথা। কার, কাছে বলিলাম না। সমিতির সভাপতি মওলানা বাকী সাহেবের নিকট হইতে মেম্বররা আগেই রিপোর্ট পাইয়াছিলেন, হক সাহেব শীঘ্রই শর্ত পূরণ করিতেছেন। কাজেই আমার আর নূতন কি কথা থাকিতে পারে ? ফলে আমাকে কেউ বিশেষ কিছু জিগ্‌গাস করিলেন না। মওলানা সাহেব পার্টি হাউসে থাকিতেন না, নিজের বাসায় থাকিতেন। কাজেই পরদিন সভার আগে তার সাথে আমার দেখা হইল না। পরদিন সভায় স্বয়ং সভাপতি সাহেবই হক-মোলাকাতের বর্ণনা দিলেন। তিনি বলিলেন : হক সাহেব শীঘ্রই শর্তগুলি অন্ততঃ তার বেশির ভাগ, পূর্ণ করিবেন ওয়াদা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট তারিখ দেন নাই। দীর্ঘ আলোচনার পর ঐদিন হইতে পনর দিন পরে পদত্যাগ করিতে শামসুদ্দিন সাহেবকে নির্দেশ দিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। আমি পনর দিনের জায়গায় একমাস সময় দেওয়ার প্রস্তাব দিলাম। ইতিমধ্যে তিনমাসের বেশি সময় অতিবাহিত হইয়াছে এই যুক্তিকে আমার এক মাসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। সভাশেষে মওলানা সাহেব একা আমার সাথে কথা বলিলেন। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজিকার সভায় আমার অল্পভাষিতা মওলানা সাহেবকে চিন্তাযুক্ত করিয়াছে সে কথা তিনি বলিলেন। প্রসংগ ক্রমে আগের দিন হক সাহেবের সাথে আমার আর কি আলাপ হইল তাও জিগ্‌গাস করিলেন। আমি অনেক দ্বিধা-সন্দেহ কাটাইয়া খুব সাবধানে অল্প কথায় হক সাহেবের প্রস্তাবের মূল কথাটা বলিলাম। ঐ সাথে তাঁর অসুবিধা ও যুক্তিটাও বলিলাম। মওলানা বাকী সাহেব ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। তিনি চট্ করিয়া কথাটা ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন : 'হক সাহেবের কথায় জোর আছে। এ কথা যদি সভায় আপনি বলিতেন তবে প্রস্তাব অন্য রকম হইত। যাক এখন আর সময় নাই। যা হইবার ভালই হইয়াছে। হক সাহেব যদি লীগের সহিত ভাংগিয়া আসেন, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মত এই যে, তাঁকে আমাদের গ্রহণ করা উচিৎ।'

হক সাহেবের সাথে মুসলিম লীগের বিরোধের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না পনর দিন চলিয়া গেল।

৭. শামসুদ্দিনের পদত্যাগ

হক সাহেব শেষ পর্যন্ত তাঁর কথা রাখিলেন, অর্থাৎ একটি শর্তও পূরণ করিলেন না। কিন্তু আমি হক সাহেবের কথামত কাজ করিতে পরিলাম না। শামসুদ্দিনের সাথে গোপন আলাপে আমি হয়ত তাঁকে আভাসে ইংগিতে হক সাহেবের মনের কথা বুঝিতে

দিয়াছিলাম। তাই শামসুদ্দিন পদত্যাগ করিতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রী থাকার সুবিধার কথাও অনেক আলোচনা হইল। কৃষক-প্রজা পার্টির শর্তসমূহ নিশ্চিতরূপেই কৃষক-প্রজার স্বার্থের অনুকূল। প্রতমতঃ শামসুদ্দিন সাহেব মন্ত্রী থাকিয়া গেলে ঐগুলি ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইবার আশা থাকে। পদত্যাগ করিয়া ফেলিলে সে আশা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ ইতিমধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টির মুখপত্ররূপে দৈনিক 'কৃষক' বাহির করিয়াছিলাম। আমিই ওটার সম্পাদক। শামসুদ্দিন মন্ত্রী থাকিলে কাগজটা চালান সহজ হইবে। মন্ত্রী না থাকিলে কাগজ চালান খুবই কঠিন, হয়ত অসম্ভব হইবে। তৃতীয়তঃ ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ জিলার টাংগাইল মহকুমার ভেংগুলা গ্রামে নিখিলবংগ কৃষক-প্রজা-সম্মিলনীর আয়োজন করা হইয়াছে। নবাবযাদা হাসান আলী অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারি ও আমি নিজে উহার চেয়ারম্যান। কৃষি-মন্ত্রী হিসাবে শামসুদ্দিন সাহেব ঐ সম্মিলনী উদ্বোধন করিবেন। এসব কথা ঘোষণা ও প্রচার করা ইয়াছে। এই সময় তিনি পদত্যাগ করিলে কর্মীদের উৎসাহ-উদ্যম দমিয়া যাইবে। সম্মিলনীর সাফল্য ব্যাহত হইবে। ঐ সংগে মন্ত্রিত্ব না ছাড়িবার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ও কুফলগুলির কথাও বিবেচনা করা হইল।

সমস্ত বিষয় ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া অবশেষে মৌঃ শামসুদ্দিন ১৯৩৯ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এক সুদীর্ঘ বিবৃতিতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। কোনও পার্লামেন্টারি দল স্বীয় মন্ত্রীকে 'কল ব্যাক' করা এবং কর্মসূচির ভিত্তিতে কোন মন্ত্রীর পদত্যাগ করা বাংলা ও ভারতের রাজনীতিতে ছিল উহাই প্রথম। সকলে মিলিয়া আমরা শামসুদ্দিন সাহেবের এই সাহসী পদত্যাগে ও স্বার্থত্যাগে তাঁকে ধন্যধন্য করিলাম।

৮. শেষ কৃষক-প্রজা সম্মিলনী

নির্ধারিত তারিখে (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯) ময়মনসিংহ জিলার টাংগাইল মহকুমার অন্তর্গত ভেংগুলা গ্রামে নিখিল বংগ কৃষক-প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশন বসিল। আশা ছিল কৃষিমন্ত্রী হিসাবে শামসুদ্দিন সাহেবকে লইয়া আমরা ভেংগুলা নিখিল বংগ কৃষক-প্রজা সম্মিলনী করিব। আমাদের বরাতে তা আর হইল না। তবু সম্মিলনীর সৌষ্ঠব ও সাফল্যের কোনও হানি হইল না। নবাবযাদা হাসান আলী অভ্যর্থনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে সম্মিলনীর সাফল্যের জন্য শারীরিক পরিশ্রম ও অসংকোচে অর্থ ব্যয় করিতে কোনও কৃপণতা করিলেন না। অজ পাড়াগাঁয়ে নিখিল বংগীয় সম্মিলনীর এমন সুন্দর প্যাণ্ডাল সুউচ্চ মঞ্চ দুই ডজন

লাউডস্পিকারসহ একাধিক মাইক্রোফোন, সমাগত নেতৃবৃন্দের থাকা-খাওয়া এমন সুবন্দোবস্ত ইতিপূর্বে, এবং দেখা গেল এর পরেও, আর কখনও হয় নাই। ডেলিগেট ও দর্শকসহ প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল বলিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিল। সভাপতি হিসাবে মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেব খুব সারগর্ভ সুচিন্তিত অভিভাষণ দিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব মন্ত্রী মৌঃ সৈয়দ নওশের আলী ও মৌঃ শামসুদ্দিন সম্মিলনীতে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন। হক সাহেবের বিরুদ্ধে যাওয়ায় এবং মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করায় উক্ত নেতৃদ্বয় ও কৃষক-প্রজা সমিতি কিছুমাত্র জনপ্রিয়তা হারাইয়াছেন মনে হইল না। বরঞ্চ দুইটি ঘটনা হইতে মনে হইয়াছিল যে গণ-মনে কৃষক-প্রজা সমিতির প্রতি যথেষ্ট টান তখনও অটুট রহিয়াছে। একটি ঘটনা এই যে কলিকাতা হইতে নেতৃবৃন্দ আসিবার কালে পিংনা স্টিমার স্টেশনের স্থানীয় ম্যারেজ রেজিস্টারের নেতৃত্বে কতিপয় খায়েরখাহ ইউ.বি. প্রেসিডেন্ট নেতৃবৃন্দকে কালা নিশান দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। দ্বিতীয় ঘটনা এই যে করটিয়ার জনাব মসউদ আলী খান পন্নি (নবাব মিয়া) এক দল লোক লইয়া আমাদের সম্মিলনীতে গন্ডগোল বাধাইতে আসিতেছিলেন। পথে জনসাধারণ তাঁদের বাধা দেওয়ায় তাঁরা মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া যান।

ইহাই ছিল নিখিল বংগ কৃষক-প্রজা সম্মিলনীর শেষ অধিবেশন। প্রকাশ্য অধিবেশন ত আর হয়ই নাই। সমিতির কাউন্সিলের বৈঠকও এর পর হয় নাই। কৃষক-প্রজা পার্টিই পার্লামেন্টারি ব্যাপারাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত। বড় জোর সমিতির ওয়ার্কিং কমিটি ডাকা হইত। প্রতিষ্ঠান হিসাবে কৃষক-প্রজা সমিতি নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবার প্রধান কারণ ছিল এই যে, খোদ কৃষক-প্রজা আন্দোলনই তার তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ঢিমা-তেতালা-ভাবে হইলেও হক মন্ত্রিসভা কৃষক-প্রজা ও মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট ভাল কাজ করিয়াছিলেন এবং করিতে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে সালিশী বোর্ড স্থাপন, ১৯৩৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪০ সালের মহাজনি আইন, প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে স্কুলবোর্ড গঠন, কলিকাতা কর্পোরেশন আইন সংশোধন করিয়া পৃথক নির্বাচন প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আনয়ন ইত্যাদি কাজ করিয়া ও করিতে চাহিয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে হক মন্ত্রিসভা দোষে-গুণে সবচেয়ে ভাল মন্ত্রিসভা বলিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়া হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ ও নেতৃবৃন্দ হক মন্ত্রিসভার যে সব সমালোচনা নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতেন, তার প্রায় কোনটাই জনগণের স্বার্থে করা হইত না। প্রায় সবগুলিই করা হইত হিন্দু বা কায়েমী স্বার্থের খাতিরে। এই পরিবেশে কৃষক-প্রজা পার্টির

প্রকৃত জনস্বার্থমূলক সরকার-বিরোধিতাও ভুল বুঝা হইত। কৃষক-প্রজা পার্টি কংগ্রেসীদের সাথে হাত মিলাইয়া এই মন্ত্রিসভারই পতন ঘটাইতে চায়। মুসলিম গণ-মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়ায় তাদের মুখে ভাল কথা শুনিতেও জনসাধারণ রাযী ছিল না। ইতিমধ্যে বিশ্ব-যুদ্ধ বাধায় এবং জাপান প্রায় ভারত দখল করে-করে অবস্থা আসিয়া পড়ায় সভা সমিতির ও প্রচারণা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

১৯৪০ সালের মার্চ মাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক গুরত্বপূর্ণ মাস। এই মাসে মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়। আর বিহারের অন্তর্গত রামগড় নামক স্থানে মাত্র আধ মাইলের ব্যবধানে মওলানা আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন এবং সুভাষ বাবুর সভাপতিত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কংগ্রেসের (ফরওয়ার্ড ব্লক) সম্মিলনী হয়। কংগ্রেস প্রস্তাবে বলা হয়, চলতি যুদ্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে পরিচালিত হইতেছে। ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার না করা পর্যন্ত কংগ্রেস এ যুদ্ধে সহযোগিতা করিতে পারে না। সুভাষ বাবুর সম্মিলনীতে সোজাসুজি সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ হক সাহেবের প্রস্তাবে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারাও নূতন দিগন্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। এটাই মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক পযিটিভ পদক্ষেপ। লাহোর প্রস্তাবই মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে গোটা ভারতের রাজনৈতিক দাবির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তুলে। মুসলিম লীগ তার ভারতের স্বাধীনতা বিরোধী থাকে না। হইয়া উঠে স্বাধীনতার দাবিদার। এদিকে হক মন্ত্রিসভার দ্বারা সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বাংলার কৃষক-খাতকের অর্থনৈতিক জীবনে একটা আর্থিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এইভাবে কৃষক-প্রজা সমিতির মূল দাবিগুলি আস্তে আস্তে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় স্বতন্ত্র শ্রেণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কৃষক-প্রজা সমিতির বাঁচিয়া থাকার একমাত্র রেইযনডেটর যুক্তি ছিল শ্লোগান হিসাবে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের দাবিটা। এ দাবির পিছনে জন-মতের যে বিপুলতা দুইদিন আগে বিদ্যমান ছিল, প্রজাস্বত্ব আইন ও মহাজনি আইন পাস হওয়ার এবং সালিশী বোর্ড স্থাপনের পর সে বিপুলতা অনেকখানি হ্রাস পাইল স্বাভাবিক কারণেই। হক মন্ত্রিসভা এই সময় কার্যতঃ মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা হইয়া যাওয়ায় এবং প্রজা-খাতকদের কল্যাণকর এই সব আইন-কানুন এই মন্ত্রিসভার

দ্বারাই সাধিত হওয়ায় মুসলিম জন-মত প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুসলিম লীগের পক্ষে চালিয়া গেল।

৯. শেষ চেষ্টা

এইভাবে এই মুদ্দতটা হইয়া গেল আমার জন্য চরম বিভ্রান্তির যুগ। বস্তুতঃ আমার চিন্তারাজ্য এমন গোলমাল আর কখনো ঘটে নাই। চিন্তার অস্পষ্টতাহেতু মতের দৃঢ়তা আর আমার থাকিল না। সব কথায় এবং সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আমি কিছু কিছু ভাল এবং কিছু কিছু মন্দ দেখিতে লাগিলাম। বলিতে লাগিলাম, কৃষক-প্রজা পার্টির এইটুকু কংগ্রেসের সেইটুকু আর মুসলিম লীগের ঐটুকু ভাল। ফলে আমার বন্ধুরা এই সময় আমার না দিলেন ঃ 'মিঃ এটাও সত্য ওটাও সত্য।' প্রকৃত অবস্থাও হইয়া উঠিয়াছিল তাই। তেজস্বী দৃঢ়তা ও স্পষ্টতার জন্য 'কৃষকের' সম্পাদকীয় গুলির যে সুনাম ছিল তা আর থাকিল না। অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য নাকি তাতে ফুটিতে লাগিল ন্যায়-শাস্ত্রের কচকচি। চিন্তায় দৃঢ়তা না থাকিলে লেখায় দৃঢ়তা আসিবে কোথা হইতে? অথচ কৃষক-প্রজা পার্টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের দাবিটাকে জোরদার করিতেই হইবে। এই উদ্দেশ্যে এই সময়ে আমরা তিন বন্ধু (থ্রি-মাস্কিটিয়ার্সই বলা যাইতে পারে) অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, নবাবযাদা হাসান আলী ও আমি, কংগ্রেসী বামপন্থী, কিষাণ সভা ও কমিউনিস্টদের সাথে যোগাযোগ করিতে লাগিলাম। এই উপলক্ষ্যে মিঃ নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কমরেড বংকিম মুখার্জী, কমরেড ভবানী সেন, কমরেড এম. এন. রায়, এমনকি স্বয়ং সুভাষ বাবুর সংগে দেন-দরবার চালাইলাম। কমিউনিস্ট বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র কমরেড রায় ছাড়া আর কারও সংগে অন্ততঃ আমার মতের মিল হইত না। বন্ধু হুমায়ুন কবির বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি উত্যক্ত হইয়াছিলেন। এ ব্যাপারে একটা বড় মজার ঘটনা না বলিয়া পারিতেছি না। আমরা উভয়ে কমিউনিস্ট বন্ধুদের সাথে এই সময় ঘনিষ্ঠভাবে মিলামিশা করিতেছি। কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি এই সময়ে আমরা উভয়ে আস্থা হারাইয়াছি। কমিউনিস্ট বন্ধুদের সাথে আলোচনা করিয়া আমরা উভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর কোন পার্টি দিয়া ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার হইবে না। আমাদের মনের গতিক যখন এই, এমনই একদিন আমরা ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা দেখিতে-দেখিতে এবং চীনা-বাদাম খাইতে খাইতে এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, ভারতের স্বাধীনতার খাতিরে আমরা অগত্যা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিব। কিন্তু কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরদিনই আমরা

ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। কারণ কমিউনিস্ট শাসনের রেজিমেন্টেড ইন্টেলেকচুয়াল জীবন আমরা সহ্য করিতে পারিব না। কমিউনিস্ট শাসন সম্পর্কে আমাদের তৎকালীন এই ধারণা ঠিক না হইতে পারে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার খাতিরে আমরা কতদূর ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলাম এতে সেটা বুঝা যাইবে। সংগে-সংগে এটাও বুঝা যাইবে যে, কমিউনিস্ট মানে স্টালিনী, শাসন সম্পর্কে তৎকালে আমাদের ধারণা খুব ভাল ছিল না।

১০. চিন্তার নূতন দিগন্ত

কংগ্রেস-লীগ আপোসের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান যতই পিছাইয়া যাইতে লাগিল আমি ততই মুসলিম লীগের দিকে হেলিয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার কংগ্রেসী নেতারা যতই 'হিন্দু' হইতে লাগিলেন, আমি ততই 'মুসলিম' হইতে লাগিলাম। আমার এই 'মুসলিম'ত্বে অবশ্য ধর্মীয় গোড়ামি ছিল না ; পর-ধর্ম-বিদ্বেষেও ছিল না। ছিল শুধু তীব্র স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদাবোধ। স্বাতন্ত্র্য-চেতনা। হিন্দু ও মুসলমানের মত-পার্থক্যটা এই সময় আমার কাছে বুনিয়াদী মানস পার্থক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অবস্থা এমন হইল যে, একদিন এক বন্ধু আমার ধর্ম-মত শুনিয়া বলিলেন ঃ তুমি তা হৈলে নাস্তিক।

জবাবে আমি বলিলাম ঃ নাস্তিক হৈলেও আমি মুসলমান নাস্তিক।

আরেকবার আমার আরেক বন্ধু আমার রাজ-নীতিক-অর্থ-নীতিক মত শুনিয়া বলিয়াছিলেন ঃ তুমি ত কমিউনিস্ট।

জবাবে আমি বলিয়াছিলাম ঃ তা কৈতে পার। তবে আমি মুসলমান কমিউনিস্ট।

এই 'হিন্দু-মুসলিম কমিউনিযম' সম্বন্ধে একটা মজার গল্প মনে পড়িতেছে। একবার বন্ধুবর কমরেড বংকিম মুখার্জী আফসোস করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন ঃ "অক্টার্লনি মনুমেন্টের নিচে শ্রমিক জন-সভায় চার ঘন্টা ধর্ম-বিরোধী বক্তৃতা করি। করতালিও পাই। কিন্তু সভাশেষে মুসলিম শ্রমিকরা টিপু সুলতানের মসজিদে এবং হিন্দু শ্রমিকরা কালী মন্দিরে ঢুকে পড়ে। এর কি করি বলুন ত ?'

আমি বলিলাম ঃ 'এটাই আসল সত্য। আমার মনে হয় চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সকলে এবং প্রত্যেকে যেদিন কমিউনিস্ট হৈয়া যাবে সেদিনও তারা হিন্দু কমিউনিস্ট ও মুসলিম কমিউনিস্ট এই দুই দলে বিভক্ত থাকবে।'

কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে এমন ধারণা লইয়া আমরা বেশিদিন রাজনৈতিক অস্পষ্ট পরিবেশের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজের অজ্ঞাতসারে মুসলিম লীগের মতবাদে দীক্ষিত হইয়া যাইতে লাগিলাম। হক সাহেবের মতবাদ এ বিষয়ে আমাকে অনেকখানি প্রভাবিত করিল। অথচ কিছুদিন আগেও আমি মনে করিতাম হক সাহেবের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক মতবাদ নাই। বাংলার মুসলিম সমাজের যাতে ভাল হয়, সেটাই তার মতবাদ, চাই সেটা যা-কিছুই হউক। আমাকেও যেন ধীরে ধীরে এই রোগে পাইয়া বসিল। তাই বন্ধুরা যখন আমাকে বিদ্রুপ করিয়া 'মিঃ এটাও সত্য ওটাও সত্য' বলিতেন, তখন অন্তর দিয়া দুঃখিত হইতাম না। জবাবে শুধু হাসিয়া বলিতাম ঃ 'ফ্যানাটিক বা ডগ্‌মেটিক না হৈয়া র‍্যাশন্যালিস্ট হওয়ার ওটাই শাস্তি।'

তেরই অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলন

১. সুভাষ বাবুর ঐক্যচেষ্টা

১৯৪০ সাল। এপ্রিল মাস। এক বিস্ময়কর ঘটনা। সাবেক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষ বাবু কলিকাতা কংগ্রেস ও কলিকাতা মুসলিম লীগের মধ্যে এক চুক্তি ঘটান। সেই চুক্তির ভিত্তিতে তাঁরা কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন করেন। প্রায় সবগুলি আসনই তাঁরা দখল করেন। কিছুদিন আগে হক মন্ত্রিসভা কলিকাতা মিউনিসপ্যাল আইন সংশোধন করিয়া কর্পোরেশনের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মোট ৯৩টি নির্বাচিত সীটের মধ্যে ২২টি মুসলমানের জন্য রিযার্ভ করা হইয়াছিল। মহাত্মাজীর সাথে বিরোধ করিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করাতেও সুভাষ বাবুর জনপ্রিয়তা মোটেই কমে নাই, বরঞ্চ বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ এই সময়ে সুভাষ বাবু বাংলার তরুণদের এক রকম চোখের পুতুলি। আর ওদিকে কলিকাতা মুসলিম লীগও মুসলিম ভোটারদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই দুই পক্ষের মৈত্রী ভোটারদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি করিল। নির্বাচনে জয়জয়কার। মুসলিম লীগ নেতা আবদুর রহমান সিদ্দিকী মেয়র হইলেন। স্বয়ং সুভাষ বাবু তাঁর নাম প্রস্তাব করিলেন। মেয়র ছাড়া পাঁচজন অল্ডারমেনের মধ্যে দুইজন হন মুসলিম লীগের। এ ছাড়া শর্ত হইল যে, পর্যায়ক্রমে প্রতি তিন বছরে মুসলিম মেয়র হইবেন। মুসলিম লীগের জন্য এটা সুস্পষ্ট বিজয়। কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে মুসলিম লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান রূপে মানিয়া নেওয়ার এটা প্রথম পদক্ষেপ। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এটা পরম পরাজয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার সাথে আপোস করিলে জাতীয়তার আশা থাকিল কই ? কাজেই আমরা জাতীয়তাবাদী মুসলিম লীগ-বিরোধী মুসলমানরা সুভাষবাবুর উপর খুব চটিলাম। ডাঃ আর. আহমদ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও আমি সুভাষ বাবুর এই কার্যের তীব্র নিন্দা করিলাম। খবরের কাগযে এক যুক্ত বিবৃতি দিলাম। সুভাষ বাবু এ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে আমাদেরে চায়ের দাওয়াত দিলেন। সুভাষ বাবুর বাড়িতে চায়ের দাওয়াত রাখা আমাদের জন্য নূতন নয়। অধ্যাপক কবির 'দৈনিক কৃষকে'র ম্যানেজিং ডিরেকটর, ডাঃ আর. আহমদ ডিরেক্টর ও আমি তার এডিটর। সুভাষ বাবু 'কৃষক'র একজন পৃষ্ঠপোষক। কংগ্রেসের মেম্বর না হইয়াও

আমরা তিনজনই কংগ্রেসী রাজনীতিতে সুভাষ বাবুর সমর্থক। এ অবস্থায় উক্ত বিবৃতির আলোচনার জন্য আমাদেরে চা খাইতে ডাকিয়া পাঠান সুভাষ বাবুর পক্ষে নূতন কিছু ছিল না। অন্যায় ছিল না। তবু আমার বন্ধুদ্বয় সুভাষ বাবুর দাওয়াত রাখিলেন না। এতই গোস্বা হইয়াছিলেন তাঁরা কাজেই আমাকে একাই যাইতে হইল। আমি যথসময়ে সুভাষ বাবুর এলগিন রোডস্থ বাস-ভবনে গেলাম। বন্ধুদ্বয়ের না আসার বানাওট কৈফিয়ৎ দিলাম। সুভাষ বাবু মুচ্‌কি হাসিলেন। তিনি আসল কারণ বুঝিলেন। আমরা দুইজনে আলাপে বসিলাম। সুভাষ বাবু পাক্কা মেহমানদার। আমরা কয়েক তশ্‌তরি মিঠাই ও বহু কাপ চা খাইলাম। আমার জন্য এক টিন সিগারেট আনাইলেন। নিজে তিনি সিগারেট খাইতেন না।

আলাপের গোড়াইতে তিনি দুঃখ করিলেন ঃ তাঁর সাথে আলাপ না করিয়া কাগযে বিবৃতি দিলাম কেন ? এটা কি বন্ধুর কাজ হইয়াছে ? জবাবে আমি বলিলাম ঃ আমাদেরে ঘুণাক্ষরে না জানাইয়া মুসলিম লীগের সংগে তিনি আপোস করিলেন কেন ? এটা কি বন্ধুর কাজ হইয়াছে ? ঝগড়ার সুরে আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই উভয়েই উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি। কারণ বিলম্ব এড়াইবার জন্যই উভয়ে পরস্পরকে না জানাইয়া যার তার কাজ করিয়াছিলাম। আচ্ছা বেশ। এখন কি করা যায় ?

সুভাষবাবু অন্তরের দরদ দিয়া যা বলিলেন, তার মর্ম এই ঃ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া ভারতের মুক্তি নাই। মুসলিম লীগ মুসলিম জনগণের মন জয় করিয়াছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দ্বারা কোনও আশা নাই। ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা চীনা দেওয়াল উঠিয়া পড়িয়াছে। সে দেওয়ালের জানালা নাই। একটা সুরাখও নাই যার মধ্যে দিয়া মুসলমানদের সাথে কথা বলা যায়। এখানে সুভাষ বাবু আবেগপূর্ণ ভাষায় বলিলেন ঃ 'আমি মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চাই ; তাদের সাথে মিশতে চাই ; তাদের একজন হতে চাই। বলুন মনসুর সাব, মুসলিম লীগ ছাড়া আর কার মারফত এটা করতে পারি ? আর কোনও রাস্তা আছে কি ?

আমি তাঁর সাথে একমত হইলাম। সত্যই আর কোনও রাস্তা নাই। বলিলাম ঃ 'কিন্তু আপনে যে সুরাখ বার করছেন ওটা বড়ই ছোট। বড় সুরাখ করেন। জানালা, এমনকি দরজা, বার করেন। সিদ্দিকী ইস্পাহানিরে না ধৈরা স্বয়ং জিন্না সাহেবরে ধরেন। মুসলিম লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান এটা মানলে জিন্না সাহেবের সাথে কথা বলাই আপনের উচিৎ।'

সুভাষ বাবু পরম আগ্রহে টেবিলের উপর দিয়া গলা বাড়াইয়া বলিলেন ঃ 'আমি কিছুদিন থেকে মনে-মনেই তাই ভাবছিলাম। কিন্তু সেদিন লাহোর ঐ যে ধর্মীয় রাষ্ট্রের কি একটা প্রস্তাব পাস করিয়ে ফেলেছেন তিনি। এরপর নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে আপোসের আশা আমি প্রায় ত্যাগ করেছি।'

২. লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা

আমি প্রতিবাদ করিলাম। বলিলাম ঃ 'জিন্না সায়েবের সাথে দেখা না করার আপনের একশ' একটা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব তার একটা, একথা বলবেন না। লাহোর প্রস্তাব আপনে পৈড়া দেখছেন ?'

সুভাষ বাবু স্বীকার করিলেন তিনি পড়েন নাই, শুধু হেডিং ও রাইটআপ দেখিয়াছেন। পড়িবার কি আছে ? পাকিস্তান চাহিয়াছে। পাকিস্তান মানেই থিওক্র্যাসি। আমি বলিলাম ঃ তাঁর ধারণা ভুল। পাকিস্তান শব্দটাও প্রস্তাবের কোথাও নাই। তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। আমি যথাসম্ভব প্রস্তাবের ভাষা 'কোট' করিয়া লাহোর প্রস্তাবের এইরূপ ব্যাখ্যা দিলাম ঃ প্রথমতঃ ভারতের বর্তমান এগারটি প্রদেশকে রেসিডুয়ারি পাওয়ারসহ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ মাত্র তিন-চারটি কেন্দ্রীয় বিষয় দিয়া একটি নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন কায়েম করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ এগারটির মধ্যে যে পাঁচটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ আছে, তাদের মেজরিটি অর্থাৎ তিনটি প্রদেশ যদি দাবি করে তবে মুসলিম প্রধান পাঁচটি প্রদেশকে নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন হইতে আলাদা হইয়া স্বতন্ত্র ফেডারেশন করিবার অধিকার দিতে হইবে।

আমার এই ব্যাখ্যা তিনি মানিলেন বলিয়া মনে হইল না। তিনি লাহোর প্রস্তাবের ফুল্ টেক্সট্ দেখিতে চাহিলেন। আমি তা দেখাইতে রাযী হইলাম। সোভিয়েট ইউনিয়নের কনস্টিটিউশনের এমন একটা বিধান আছে বলিয়া তিনি এক কপি রুশ শাসনতন্ত্র যোগাড় করিবার দায়িত্ব নিলেন। আলোচনা পরের দিনের জন্য মুলতুবি হইল। পরের দিন তিনি আমাকে তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে নিয়া গেলেন। বৌবাজারের ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলের ত্রিতলে তিনি একটি সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন অফিস ইতিমধ্যেই খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজে তিনি রীতিমত নিয়মিতভাবে এই অফিসে হাযিরা দিতেন। তাঁর সুসজ্জিত রুমে প্রবেশ করিয়া তিনি কয়েকখানি বই আনাইলেন। দেখিয়া পুলকিত হইলাম যে শুধু রুশ শাসনতন্ত্র নয়, সুইযারল্যান্ড, ইউ. এস. এ. কানডা ইত্যাদি কয়েকটি ফেডারেশনের কনস্টিটিউশনও যোগাড় করিয়াছেন।

আমি লাহোর প্রস্তাবের খবরের কাগযে প্রকাশিত ফুলটেক্সট্ লইয়া গিয়াছিলাম। সেটা উচ্চস্বরে পড়িয়া–পড়িয়া আমার আগের দিনের ব্যাখ্যার সাথে মিল ফেলাইলাম। তিনি সব শুনিয়া বলিলেনঃ 'আপনার ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয়, তবে তার সবটুকু আমি মেনে নিলাম। এমন কি আমি আরও বেশি যেতেও রাযী। যদি পাঁচটা মুসলিম প্রদেশের মেজরিটি আলাদা ইউনিয়ন করতে চায় তবে তাতে আমি ত রাযী আছিই এমনকি একটা প্রদেশও যদি সিসিড করতে চায়, আমি তাতেও রাযী।

এই কথা বলিয়া রুশ শাসনতন্ত্রের ঐ ধারাটা আমার সামনে মেলিয়া ধরিলেন যাতে প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিককে সিসিড করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

৩. জিন্না–সুভাষ মোলাকাত

আমরা উভয়ে একমত হওয়ায় স্থির হইল যে সুভাষ বাবু জিন্না সাহেব দেখা চাহিয়া শীঘ্রই তাঁর নিকট পত্র লিখিলেন। বিপুল আশা–উৎসাহের মধ্যে আমি সুভাষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় হইলাম। ভারতীয় রাজনৈতিক সংকটের অবসান ও হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের একটা গোলাবী স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতে–করিতে পরবর্তী কয়েকটা দিন কাটাইলাম। মাঝে মাঝে সুভাষ বাবুকে টেলিফোন করিতে লাগিলামঃ 'জিন্না সাহেবের নিকট চিঠি লেখছেন ?' সপ্তাহ খানেক বা তারও বেশি একই জবাব পাইলাম ঃ 'লিখিনি আজো, তবে শীগ্‌গিরই লিখব।'

আমি বিরক্ত ও নিরাশ হইয়া এ ব্যাপারে খোঁজ করা ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম সুভাষ বাবুর নিজেরই মনের পরিবর্তন হইয়াছে। এমন সময় তিনি নিজেই একদিন ফোন করিয়া বলিলেন, তিনি জিন্না সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়াছেন, এবং নিশ্চিত ডেলিভারির আশায় ডাকে না দিয়া মেয়র সিদ্দিকীর হাতে হাতে দিয়াছেন। আমি সেইদিনই সকালের কাগযে পড়িয়াছিলাম, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী বোম্বাই কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের সংগে কি বিষয়ে আলোচনার জন্য বোম্বাই রওয়ানা হইলেন।

আমি নিরুৎসাহ হইলাম সে কথা সুভাষ বাবুকে বলিলাম। ব্যাপারটা ভণ্ডুল হইয়া গেল। কারণ সিদ্দিকী জিন্না সাহেবের সুনযরে নাই। সুভাষ বাবুও একটু আতংকিত হইলেন। আগে জানিলে তিনি এটা করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে আর তার কোনও প্রতিকার নাই। দেখা যাক কি হয়। আমিও তাঁর সাথে একমত হইলাম।

কাগযে পড়িলাম, সিদ্দিকী সাহেবের জিন্না সাহেবের সহিত মোলাকাত করিলেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়াও আসিলেন। কিন্তু সুভাষ বাবু জিন্না সাহেবের কোনও পত্র পাইলেন না। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে সুভাষ বাবু জানাইলেন, মিঃ সিদ্দিকীর মতে তিনি যে-কোনও দিন মিঃ জিন্নার পত্র পাইবেন। কিন্তু পনর দিনের বেশি সময় চলিয়া গেল। সুভাষ বাবু জিন্না সাহেবের পত্র পাইলেন না। ইতিমধ্যে জিন্না সাহেব যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য-সহযোগিতা করা হইতে বিরত থাকার জন্য মুসলিম লীগারদের উপর নির্দেশ জারি করিলেন। সুভাষ বাবু এ কাজের জন্য জিন্না সাহেবকে কংগ্রেচুলেট করিয়া খবরের কাগযে বিবৃতি দিলেন। আমি সুভাষ বাবুকে ফোনে হাসিয়া বলিলাম ঃ 'এবার জিন্না সাহেবের পত্র না আইসা পারে না।' তিনিও হাসিলেন, বলিলেনঃ 'কিন্তু কোন মতলবে তাঁকে কংগ্রেচুলেট করিনি। তাঁর কাজটি সত্যই প্রশংসার যোগ্য।'

এরও বোধ হয় সপ্তাহখানেক পরে সুভাষ বাবু জিন্না সাহেবের পত্র পান। আমাকে ডাকিয়া পাঠান। লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় যা-যা আগে আলোচনা করিয়াছিলাম, তাই আবার দুহরাইলাম। তিনি এবার সম্পূর্ণ প্রস্তুত। নির্ধারিত দিনে সুভাষ বাবুকে সি-অফ করিবার জন্য শত-শত কর্মীর সাথে আমিও হাওড়া স্টেশনে গেলাম। সুভাষ বাবু বোম্বাই যাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্যের কথা আমি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ জানিত না। গাড়ি ছাড়িবার প্রাক্কালে আমি সুভাষ বাবুর কাছ ঘেষিয়া কানে কানে বলিলাম ঃ 'ওয়ার্ধায় নাইমা বুড়ার দোওয়া নিয়া যাবেন ।'

সুভাষ বাবু চমকিয়া উঠিলেন, মুখ বিষণ্ন করিলেন। বোধ হয় বিরক্ত হইলেন। বুড়া মানে মহাত্মাজী। তাঁর সাথে সুভাষ বাবুর সম্পর্ক ভাল নয়। মাত্র সম্প্রতি তাঁর সমর্থক বলিয়া কথিত লোকেরা মহাত্মাজীকে হাওড়া বণ্ডেল ও লিলুয়া স্টেশনে অপমান করিয়াছে। আমি সুভাষ বাবুর মনের কথা বুঝিলাম। আমার শক্ত হাতে সুভাষ বাবুর নরম হাতটি চাপিয়া ধরিলাম। 'আমার অনুরোধ রাখবেন।' শুধু এই কথাটি বলিলাম। তাঁর হাত ছাড়িলাম না। গাড়ি ছাড়িয়া দেয় দেখিয়া তিনি শুধু বলিলেন ঃ 'আচ্ছা ভেবে দেখব।'

তাই যথেষ্ট। আমি দৌড়িয়া লাফাইয়া ট্রেন হইতে নামিলাম। অন্যান্যের সাথে হাত নাড়িলাম। তিনিও জানালায় মুখ বাড়াইয়া হাত ও রুমাল নাড়িতে থাকিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল চাহিয়া থাকিলাম। তিনি দৃষ্টির বাহিরে গেলে আমার মন বলিল ঃ ভারতের ভবিষ্যৎ, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, এ সবেরই ক্ষীণ সূতাটি ঐ ট্রেনে ঝুলিতেছে।

পরদিন খবরের কাগযে পড়িলাম বোম্বাই যাওয়ার পথে সুভাষ বাবু ওয়ার্ধায় নামিয়া মহাত্মাজীর সাথে দেখা করিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে আধঘন্টা কথা হইয়াছে। তারপর পর-পর কয়েক দিনের কাগযে পড়িলাম ঃ তিনি বোম্বাই পৌঁছিয়া জিন্না সাহেবের সাথে দেখা করিয়াছেন। কয়েক দিন কয়েকবার দেখা হইয়াছে। প্রতিবার দুই-তিন ঘন্টা আলাপ হইয়াছে। এক রাত্রে সুভাষ বাবু জিন্না সাহেবের বাড়িতে ডিনার খাইয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েক বার সুভাষ বাবু সর্দার প্যাটেল ও মিঃ ভুলাভাই দেশাইর সাথে দেখা করিয়াছেন।

সাফল্যের সম্ভাবনায় পুলকে আমার রোমাঞ্চ হইল। শীঘ্রই একটা ঘোষণা শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া রহিলাম। এতদিনের হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আজ চূড়ান্তরূপে মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। ভারতের স্বাধীনতা ইংরাজ আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। দেশবাসী জানে না এত বড় একটা শুভ ঘটনার মূলে রহিয়াছে আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তি। আল্লাহ কত ছোট বস্তু দিয়া কত বড় কাজ করাইতে পারেন। সত্যই তিনি কাদেরে-কুদরত। অপূর্ব তাঁর মহিমা !

সোনায় আবার সুহাগা! খবরের উপর যবর খবর! গান্ধীজী ও জিন্না সাহেব উভয়কেই বড়লাট সিমলায় দাওয়াত করিয়াছেন। ব্যস, আর কি? কাম ফতে! সুভাষ বাবুর সাথে আলাপ হওয়ার পরই এ সব ঠিক হইয়াছে নিশ্চয়ই।

কয়দিন হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইলাম। একটা ঘোষণা প্রতিদিন আশা করিতে থাকিলাম। লটারির টিকিট কাটিয়া যেভাবে মানুষ পায়ের আঙ্গুলে দাঁড়াইয়া থাকে।

গান্ধীজী ও জিন্না সাহেব সিমলা গেলেন। কোন ঘোষণা বাহির হইল না। সুভাষ বাবুও ফিরিয়া আসিলেন না।

আমি পরম আগ্রহে সুভাষ বাবুর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকিলাম। তিনি এত দেরি করিতেছেন কেন? তবে তিনিও গান্ধী-জিন্নার সাথে সিমলায় গেলেন নাকি? শেষ খবরে পড়িয়াছিলাম জিন্না সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি দিল্লীর পথে বোম্বাই ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর সিমলা যাওয়ার খবর বাহির হইল না। তার বদলে খবরের কাগযে পড়িলাম, সুভাষ বাবু এলাহাবাদে জওয়াহের লালের মেহমান হইয়াছে। তারপর বেশ কয়েকদিন আর কোনও খবর নাই। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ও জিন্না সাহেব সিমলা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সে খবরও কাগযে পড়িলাম। হায়! ঘোষণাটা হইতে-হইতে হইল না বুঝি! আমি ব্যাকুলভাবে রোয সুভাষ বাবুর বাড়ি টেলিফোন করি। জবাব পাই, কোন খবর নাই। রোয টেলিফোন করায় তার বাড়ির

কোনও লোক বোধ হয় ত্যক্ত হইয়াই বলিলেন ঃ 'আপনি খবরের কাগযের এডিটর। তিনি কোলকাতা ফিরলে আপনি আমাদের আগেই জানতে পারবেন।' সত্যই ত। লজ্জায় আর ফোন না করিয়া খবরের কাগযেই পড়িতে লাগিলাম। বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল। বাঞ্ছিত খবর আর বাহির হইল না। ইতিমধ্যে সুভাষ বাবু সম্পাদিত 'ফরওয়ার্ড' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকের যামিন তলব হইল। এই দিন জানিতে পারিলাম বেশ কয়েক দিন আগেই তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার সাহস করিয়া টেলিফোন করিলাম। ফোন ধরিলেন সুভাষ বাবু নিজে। স্বীকার করিলেন দুই দিন আগেই ফিরিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াই খবরের কাগযে খবরটা যাইতে দেন নাই। অন্ততঃ আমাকে খবরটা না-দেওয়ায় অভিমান করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন ঃ 'খবর দেবার মত কিছু নেই বলেই দেইনি। আচ্ছা আসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।'

সুভাষ বাবু যতই বলুন দেওয়ার মত খবর নাই। আমি কিন্তু আমার আগ্রহ দমাইতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেলাম। মুখ-ভাবে কোন নৈরাশ্য ধরিতে পারিলাম না। আগের মতই হাসি মুখ। ও সুন্দর মুখে হাসি ছাড়া আর কিছু বড়-একটা দেখি নাই ত।

আমাকে চা-মিঠাই খাইতে দিয়া তিনি তাঁর জিন্না-মোলাকাতের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। জিন্না সাহেব তাঁর সাথে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। লাহোর প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা সুভাষ বাবু করিয়াছেন জিন্না সাহেবের ধারণার সাথে তা হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সুভাষ বাবু জিন্না সাহেবের ধারণা মত লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিতে পারায় জিন্না সাহেব বিস্মিত হইয়াছিলেন। এইখানে সুভাষ বাবু হাসিয়া বলিলেন ঃ 'জিন্না সাহেব পুনঃপুনঃ জিগ্গাস করা সত্ত্বেও আমি তাঁকে বলেছি এটা আমার নিজেরই ব্যাখ্যা ; অন্য কেউ আমাকে এ ব্যাখ্যা দেননি। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। নিজের বাহাদুরির জন্য একাজ করিনি। অপরের ধার-করা বুদ্ধি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি, এটা স্বীকার করলে জিন্না সাহেবের কাছে আমার দাম কমে যেত না? কি বলেন আপনি?'

আমি স্বীকার করিলাম। বলিলাম, তিনি ঠিক কাজই করিয়াছেন। তারপর সুভাষ বাবু বলিলেন, লাহোর প্রস্তাবের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান করিতে জিন্না সাহেব খুবই আগ্রহী। কিন্তু তাঁর দৃঢ় মত এই যে আপোস কোনও ব্যক্তির মধ্যে হইবে না। সে ব্যক্তিরা যতই প্রভাবশালী হউন। আপোস হইতে হইবে কংগ্রেস ও লীগ এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। জিন্না সাহেব সুভাষ বাবুকে স্পষ্টই

বলিয়াছেন, সুভাষ বাবু যতই জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী নেতা হউন, কংগ্রেসকে সাথে আনিতে না পারিলে জিন্না সাহেব তাঁর সাথে আপোস করিতে পারেন না। এমন কি তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লকের সাথেও না। তিনি সুভাষ বাবুকে খোলাখুলি উপদেশ দিলেন, সুভাষ বাবু কংগ্রেস ছাড়িয়া বুদ্ধির কাজ করেন নাই। তাঁর আবার কংগ্রেসে ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ। এই ব্যাপারে জিন্না সাহেবের মধ্যে এতটা ব্যাকুল আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে শেষ বিদায়ের দিন জিন্না সাহেব বাড়ির গেট পর্যন্ত সুভাষ বাবুকে আগাইয়া দিয়া এই শেষ কথাটা বলিয়াছিলেন ঃ 'কলিকাতা ফিরার আগে তুমি এলাহাবাদে জওয়াহের লালের কাছে যাও। তাঁকে তোমার মতে আন। তারপর তোমাদের যুক্ত শক্তিতে তোমার ব্যাখ্যা মত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগে যেদিন আপোস করিতে পারিবে সেটা হইবে ভারতের জন্য 'লাল হরফের দিন।' 'প্রিয় সুভাষ, আমায় বিশ্বাস কর, আমি পরম আগ্রহে সেদিনের অপেক্ষা করিতে থাকিলাম।'

জিন্না সাহেবের ইংরাজী কথাগুলি হুবহু উদ্ধৃত করিবার সময় সুভাষ বাবুর মুখে যে আন্তরিকতা ফাটিয়া পড়িতেছিল, তাঁর মধ্যে জিন্না সাহেবের আন্তরিকতাও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। উপসংহারে সুভাষ বাবু বলিলেন ঃ 'জওয়াহের লাল আমার মত গ্রহণ করবেন এ বিশ্বাস আমার আদৌ ছিল না। তবু শুধু জিন্না সাহেবের অনুরোধ রক্ষার্থে আমি তাঁর কাছে গেলাম। একদিন এক রাত উভয়ে মত বিনিময় করলাম। আমি দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম যে জওয়াহের লাল লাহোর প্রস্তাবের আমার ব্যাখ্যা মেনে নিলেন এবং তাতে কংগ্রেস-লীগে আপোস হতে পারে তাও স্বীকার করলেন। কিন্তু গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে তিনি রাজি নন। তাই নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম।'

প্রফুল্লতা ও মনোবল নিয়াই কথা শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পষ্ট দেখিলাম, শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্য গোপন করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন ঃ 'নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম মিলনবোধ হয় আর সম্ভব হল না। বাংলা-ভিত্তিতে এ আপোস করার চেষ্টা করা যায় নাকি?'

৪. সুভাষ বাবুর অন্তর্ধান

এরপর বাংলা ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে কাজ করিবার বড় রকমের একটা চেষ্টা তিনি সত্য-সত্যই করিয়াছিলেন। সেটা সিরাজুদ্দৌলাকে বাংগালী জাতীয়তার প্রতীকরূপে জীবন্ত করা এবং তার প্রথম পদক্ষেপরূপে হলওয়েল মনুমেন্ট ভাংগার অভিযান চালান। আমার বিবেচনায় এইবার সুভাষ বাবু দেশবন্ধু ও আচার্য রায়ের রাজনীতিক দর্শনে পুনরায় বিশ্বাসী হন।

সিরাজুদ্দৌলার প্রতি আমার মমত্ব-বোধ ছিল অনেক দিনের। ছেলেবেলা ছিল এটা বাংলার মুসলিম শাসনের শেষ প্রতীক হিসাবে। পরবর্তীকালে কংগ্রেস কর্মী-হিসাবে বাংগালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হওয়ার পর সিরাজুদ্দৌলাকে বাংগালী জাতীয়তার প্রতীকরূপে গ্রহণ করার জন্য অনেক কংগ্রেসী সহকর্মীকে ক্যানভাস করিয়াছি। বাংলার নাট্যগুরু গিরিশ ঘোষ ও খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের সিরাজুদ্দৌলাকে এই হিসাবেই বিচার করিয়াছেন বলিয়াও বহু মন-গড়া যুক্তি খাড়া করিয়াছি। কিন্তু হিন্দু কংগ্রেসকর্মীদের কেউ এদিকে মন দেন নাই। কাজেই সুভাষ বাবুর মত জনপ্রিয় তরুণ হিন্দু নেতা এই মতবাদের উদ্যোক্তা হওয়ায় আমার আনন্দ আর ধরে না। 'দৈনিক কৃষকে'র সম্পাদকীয়তে এই মতবাদের সমর্থনে প্রচুর যুক্তি দিতে লাগিলাম।

সুভাষ বাবু হলওয়েল মনুমেন্ট ভাংগার আন্দোলনে তাঁর পরিচালিত প্রাদেশিক কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মিগণসহ যোগ দিলেন। মুসলিম ছাত্র সমাজের তৎকালীন জনপ্রিয় নেতা মিঃ আবদুল ওয়াসেক, মিঃ নূরুল হুদা ও মিঃ আনওয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন আগেই শুরু হইয়াছিল। সুভাষ বাবু এতে যোগ দেওয়ায় সত্যাগ্রহের আকারে এই আন্দোলন খুব জোরদার হইল। জনপ্রিয় তরুণ মুসলিম নেতা চৌধুরী মোওয়ায্যম হোসেন (লাল মিয়া) অছাত্র মুসলিম তরুণদেরও এ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। প্রতি দিন দলে-দলে সত্যাগ্রহী গ্রেফতার হইতে লাগিল। আমার 'কৃষক'-আফিস ৫নং ম্যাংগো লেন ডালহৌসি স্কোয়ারের খুব কাছে। সময় পাইলেই সত্যাগ্রহ দেখার জন্য হাজার হাজার দর্শকের শামিল হইতাম। সম্পাদকতার দায়িত্ব না থাকিলে হয়ত আন্দোলনে জড়াইয়াই পড়িতাম।

আন্দোলনকে জাতীয় রূপ দিবার জন্য সুভাষ বাবু ৩রা জুলাইকে (১৯৪০) 'সিরাজ-স্মৃতি দিবস' রূপে দেশব্যাপী পালন করা স্থির করিলেন। ১লা জুলাই আলবার্ট হলে জন-সভা হইল। লাল মিয়া এতে সভাপতিত্ব করিলেন। ওয়াসেক ও নূরুল হুদা এতে তেজঃদৃপ্ত বক্তৃতা করিলেন। সুভাষ বাবু ঐ সভায় ৩রা জুলাই দেশব্যাপী 'সিরাজ-স্মৃতি দিবস' পালনের আবেদন করিলেন। আরও ঘোষণা করিলেন যে ঐ দিন তিনি স্বয়ং কুড়াল হাতে হলওয়েল মনুমেন্ট ভাংগার সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব করিবেন। সুভাষ বাবুর এই ঘোষণার জবাবে প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব ঐদিনের আইন পরিষদের সান্ধ্য অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে বাংলা সরকার শীঘ্রই হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করিবেন। অতএব সত্যাগ্রহ বন্ধ হওয়া উচিৎ। পরদিন ২রা জুলাই সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়া সুভাষ বাবু বলেন যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অস্পষ্ট। অতএব এ ঘোষণা সত্ত্বেও সত্যাগ্রহ অব্যাহত থাকিবে এবং তিনি পরদিন (৩রা জুলাই) কুড়াল হাতে

সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব করিবেন। কিন্তু ২রা জুলাই রাত্রিতেই সুভাষ বাবু ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হইয়া প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী হইলেন।

সুভাষ বাবুর গ্রেফতারেও আন্দোলন দমিল না। মেয়র আবদুর রহমান সিদ্দিকী সুভাষ বাবুর গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিবৃতি দিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশন মুলতবী হইয়া গেল। ইসলামিয়া কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা মিছিল করিতে লাগিল। সত্যাগ্রহ পূর্ণোদ্যমে চলিল। প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব ৮ই জুলাই আবার ঘোষণা করিলেন যে বাংলা সরকার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের সিদ্ধান্তে অটল আছেন। ইউরোপীয় মেম্বররা হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন না করিলেও সরকার তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবেন না। এর আগের দিন ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ পি. জে. গ্রিফিথ সত্যসত্যই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করিলে ইউরোপীয় দল মন্ত্রিসভার প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করিবে।

কিন্তু সপ্তাহ কাল চলিয়া গেল সরকার মনুমেন্ট অপসারণ করিলেন না। কাজেই সত্যাগ্রহ খুব জোরেই চলিতে থাকিল। ওদিকে সরকার ১৭ই জুলাই হইতে সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত সমস্ত খবরের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিলেন। প্রচারের অভাবে সত্যাগ্রহ স্তিমিত হইয়া পড়িল। মিঃ ওয়াসেক ও মিঃ নূরুল হুদা প্রভৃতি ছাত্র-নেতা তখন মিছিল বাহির করিলেন। এই মিছিল উপলক্ষে ইসলামিয়া কলেজে পুলিশ-মিলিটারি হামলা হইল। গুর্গা সৈন্যরা ছাত্রদের বেদম মারপিট করিয়াছে বলিয়া খবর রটিল। ছাত্র-নেতা মিঃ ওয়াসেক ও মিঃ আনওয়ার হোসেন আহত হইয়া হাসপাতালে গেলেন। মিঃ নূরুল হুদার নেতৃত্বে বহু ছাত্র প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের ঝাউতলার বাড়ি ঘেরাও করিল। হক সাহেব তাঁর স্বাভাবিক মিষ্টি কথায় ভরশা দিয়া ছাত্রদের ফিরাইয়া দিলেন।

সুভাষ বাবুর অবর্তমানে হলওয়েলে মনুমেন্ট সত্যাগ্রহ আস্তে-আস্তে থিমাইয়া পড়িল। ছাত্র-নেতৃবৃন্দ বুঝিলেন সুভাষ বাবুকে খালাস করাই সত্যাগ্রহ তাজা করিবার একমাত্র উপায়। তখন ছাত্র-তরুণরা ইসলামিয়া কলেজ পুলিশী যুলুমের তদন্তের এবং সুভাষ বাবুর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করিল। মুসলিম লীগ নেতারা ও কর্পোরেশনের মেয়র খবরের কাগযে বিবৃতি দিয়া সুভাষ বাবুর মুক্তি দাবি করিলেন। হক সাহেব ইসলামিয়া কলেজে পুলিশী হামলার তদন্তের জন্য হাই কোর্টের বিচারপতি মিঃ তরিক আমির আলির পরিচালনায় একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিয়া এবং সুভাষ বাবুর মুক্তির আশ্বাস দিয়া ছাত্রদেরে শান্ত করিলেন। কিন্তু সুভাষ বাবু ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হওয়ায় প্রাদেশিক সরকারের এতে কোন হাত ছিল না। তাই ভারত সরকারের সাথে দরবার করিয়া অবশেষে ডিসেম্বর মাসে সুভাষ বাবুকে মুক্তি দিলেন।

কিন্তু সুভাষ বাবু স্বগৃহে অন্তরীণ থাকিলেন। তাঁর উপর একটি ফৌজদারী মামলাও ঝুলাইয়া রাখা হইল।

অন্তরীণ থাকিলেও সুভাষ বাবুর সাথে দেখা–সাক্ষাতের খুব কড়াকড়ি ছিল না। মুক্তির দুই–তিন–দিন পরেই তাঁর সাথে দেখা করিলাম। দেখিয়া তাজ্জব হইলাম। মনে হইল সপ্তাহ কাল শেভ করেন নাই। সুভাষ বাবুর দাঁড়ি–গোঁফ ও তাঁর সুন্দর মুখ–শ্রীর উপযোগী চাপ দাড়ি শেভ না করার কারণ জিগ্‌গাসা করিলে তাঁর স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন : 'শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথেই পলিটিক্‌স্ করব যখন ঠিক করেছি, তখন তাদের একজন হতে দোষ কি?' ঐ একবারের বেশি তাঁর দেখা পাই নাই। শুনিলাম তিনি মৌন–ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

এটা ছিল বোধ হয় ১৯৪১ সালের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ। পরে জানা গিয়াছিল ১৬ই জানুয়ারি হইতে তিনি নিজেও ঘর হইতে বাহির হইতেন না। কাউকে তাঁর ঘরে ঢুকিতেও দেওয়া হইত না। নির্ধারিত সময়ে তাঁর খানা দরজার সামনে রাখিয়া কপাটে টুকা দিয়া ঠাকুর সরিয়া আসিত। সুভাষ বাবু তাঁর সুবিধা মত খাবার ভিতরে নিতেন এবং খাওয়া শেষে ঝুটা বাসনপত্র দরজার বাহিরে নির্ধারিত স্থানে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন। এইভাবে কিছুকাল চলার পর ২৫শে জানুয়ারি দেখা গেল ২৪শে তারিখের–দেওয়া খাবার অছোওয়া অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের মুখে এটা জানিয়া বাড়ির সবাই সুভাষ বাবুর ঘরের সামনে সমবেত হইলেন। দরজা খুলিয়া দেখিলেন ঘর শূন্য। মুহূর্তে সারা কলিকাতা ফাটিয়া পড়িল। যথাসময়ে দেশবাসী জানিতে পারিল তিনি ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন।

সুভাষ বাবুর অন্তর্ধানে আমি সত্যই খুব দুঃখিত হইয়াছিলাম। কারণ এর পরে হিন্দু নেতৃত্বের অখণ্ড ভারতীয় মনোবৃত্তির বন্যা রোধ করিবার মত শক্তিশালী নেতা হিন্দু–বাংলায় আর কেউ থাকিলেন না। একথা শরৎ বাবুর কাছেও আমি বলিয়াছি। তিনি আমার সাথে একমত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া আমার আশা হইয়াছিল সুভাষ বাবুর রাষ্ট্র–দর্শনের নিশান বহন করিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার বিশ্বাসও হইয়াছিল। নিষ্ঠাবান সাত্বিক হিন্দু হইয়াও যে রাজনীতিতে উদার অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রী হওয়া যায় শরৎ বাবু ছিলেন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা আমাকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে সুভাষ বাবুর অন্তর্ধানের পর শরৎ বাবুর উডবর্ণ পার্কের বাড়ি আমার প্রায় প্রাত্যহিক আড্ডায় পরিণত হইয়াছিল।

সুভাষ বাবুর উত্তরাধিকারী হিসাবে পরবর্তীকালে শরৎ বাবুই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস–নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বাঙালীর স্বাতন্ত্রের সংগ্রাম চালাইয়া যান জীবনের শেষ পর্যন্ত। ১৯৪৭ সালে শহীদ সাহেব ও আবুল হাশিম সাহেবের সাথে মিলিয়া তিনি যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও শরৎ বাবুর এই

বাংগালীর স্বাতন্ত্রের মনোভাব সুস্পষ্ট ছিল। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ কলিকাতা নির্বাচক মণ্ডলীতে কংগ্রেসের সকল শক্তির বিরুদ্ধে একা লড়াই করিয়া তিনি কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এসব ব্যাপারেই আমার প্রাণ ছিল শরৎ বাবুর সাথে। হিন্দু ভোটারদের উপর কোনও প্রভাব না থাকা সত্ত্বেও আমার সম্পাদিত 'ইত্তেহাদ' পুরাপুরি শরৎ বাবুর সমর্থক ছিল।

৫. কমরেড এম. এন. রায়ের প্রভাব

জিন্না–সুভাষ মোলাকাত ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তার একটা ছাপ আমার মনে স্থায়ী হইয়াছিল। আমি নয়া ধারায় চিন্তা করিতে শুরু করি। এই চিন্তায় কমরেড এম· এন· রায়ের সাহচর্য আমাকে অনেক দূর আগাইয়া নিয়া যায়। ১৯৩৮ সালে দিল্লী কংগ্রেস কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে কমরেড রায়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তার আগে কমরেড রায়ের প্রতি আমার ভক্তি–শ্রদ্ধা ছিল নিতান্ত রোমান্টিক। বিশ্ব কমিউনিযমের অন্যতম নেতা স্ট্যালিনের সহকর্মী হিসাবে তিনি ছিলেন আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে এক মনীষী। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর আমার ভক্তির রোমান্টিক দিকটার অবসান হইলেও শ্রদ্ধা–ভক্তি এতটুকু কমে নাই। বরঞ্চ বাড়িয়াছে। বাস্তব রাজনীতিতে অবশ্য তাঁর মতবাদ ও উপদেশ নির্ভরযোগ্য মনে করিতাম না। সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর মত ধৈর্য ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় প্রথম দিকে তিনি আমাকে কৃষক–প্রজা পার্টি ভাংগিয়া সমস্ত কর্মীদের লইয়া সদলবলে কংগ্রেসে যোগ দিবার পরামর্শ দেন। তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করার পর তিনি নিজেই কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং আমরা কৃষক–প্রজা কর্মীরা কংগ্রেসে না যাওয়ায় আমাদের প্রশংসা করেন। কলিকাতার মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে আহুত মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক সভায় তিনি কংগ্রেসকে 'নিমজ্জমান নৌকা' বলেন এবং উহা হইতে সাঁতরাইয়া পার হওয়ার জন্য দেশ–প্রেমিকদের অনুরোধ করেন। কিন্তু আদর্শগত দিক হইতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত আমাকে বিস্মিত ও মোহিত করিয়াছিল। কংগ্রেস–মুসলিম লীগ–কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক–প্রজা–পার্টির প্রভাবে ভারতের সকল গণ–প্রতিষ্ঠান যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিতেছিলেন, তখন কমরেড রায় একাই ফ্যাসি–নাযিবাদকে মানবতার শত্রু ও সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বড় দুশমন প্রমাণ করেন এবং এই যুদ্ধকে গণযুদ্ধ বা 'পিপলস ওয়ার' আখ্যা দেন। বিশ্বের একমাত্র সমাজবাদী রাষ্ট্র রাশিয়া হিটলারের সমর্থন করায় আমরা কমরেড রায়ের কথায় তখন বিশ্বাস করি নাই। তাঁর উপদেশ মানি নাই। পরে ১৯৪১ সালের জুন মাসে যখন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন এবং রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়, তখন কমরেড রায়ের কথার সত্যতায় এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় আমার শ্রদ্ধা আকাশচুম্বী হইয়া গেল।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষক-প্রজা সমিতির সেক্রেটারি ও আইন পরিষদে কৃষক-প্রজা পার্টির লীডার বন্ধুবর শামসুদ্দিন পদত্যাগ করার পর হক মন্ত্রিসভার সহিত কৃষক-প্রজা সমিতির সম্পর্ক আগের চেয়েও তিক্ত হইয়া পড়িল। ফলে আমার পক্ষে হক সাহেবের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যাতায়াত রক্ষা করাও আর সম্ভব রহিল না।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভারতবাসীর বিনা-অনুমতিতে ভারতবর্ষকে ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়ানোর প্রতিবাদে সাতটি কংগ্রেসী প্রদেশ হইতেই কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভারা ২২শে ডিসেম্বর পদত্যাগ করিলেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগ পীরপুর রিপোর্ট নামে একটি রিপোর্টে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সমূহের মুসলমানদের উপর যুলুমের ফিরিস্তি প্রচার করিয়াছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগকে মুসলিম লীগ কংগ্রেসী যুলুম হইতে মুসলমানদের নাজাত ঘোষণা করিয়া ২৩শে ডিসেম্বর সারা ভারতে 'নাজাত দিবস' পালন করে। এতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আরও তিক্ত হইয়া পড়ে। এমন সাম্প্রদায়িক তিক্ততার মধ্যে কৃষক-প্রজা সমিতির অসাম্প্রদায়িক অর্থনীতিক রাজনীতি পরিচালন মুসলমান জনসাধারণ্যে খুবই কঠিন হইয়া পড়িল। তার উপর ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ায় এবং স্বয়ং হক সাহেবই সেই প্রস্তাব উথাপন ও তার সমর্থনে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও পাকিস্তান দাবির ও মুসলিম লীগের শক্তি শতগুণে বাড়িয়া গেল। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সভা-সমিতি ও প্রচার-প্রচারণা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ায় কৃষক-প্রজা সমিতির মত গরিব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সভা-সম্মিলন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ফলে কৃষক-প্রজা সমিতির দাবিদাওয়া এবং হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা কেবল মাত্র সমিতির দৈনিক মুখপত্র' 'কৃষকে'র পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ হইল।

৬. দৈনিক 'কৃষক'

'কৃষকে'র সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছিলাম আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। সুতরাং 'কৃষকে'র কথাটাও আমার দেখা-রাজনীতির এলাকায় পড়ে। কাজেই এ সম্বন্ধে দুচার কথা বলা এখানে অবান্তর হইবে না।

সমিতির সেক্রেটারি শামসুদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিত্বের আমলেই দৈনিক 'কৃষক' বাহির করা স্থির হয়। আমারই উপর উহার সম্পাদকতার ভার চাপান হয়। কোম্পানি রেজিস্টারি করা হয়। মৌঃ শামসুদ্দিন সাহেব, মৌঃ সৈয়দ নওশের আলি, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, নবাবযাদা সৈয়দ হাসান আলী, খান বাহাদুর মোহাম্মদ জান ও ডাঃ

আর. আহমদ সাহেবান লইয়া বোর্ড–অব–ডিরেক্টর গঠিত হয়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির হন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক 'কৃষক' বাহির হয়। কিন্তু কাগযের বয়স দুইমাস পুরা হইবার আগেই মৌঃ শামসুদ্দিন মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। ফলে মন্ত্রিত্বের জোরে বিজ্ঞাপনাদি জোগাড় করিয়া কাগয চালাইবার আশা দূর হইল। অধ্যাপক কবির অতি কষ্টে বছর খানেক কাগয চালাইয়া খান বাহাদুর মোহাম্মদ জানের কাঁধে এ ভার চাপাইলেন। খান বাহাদুর দাতা–দয়ালু কংগ্রেস–সমর্থক ব্যবসায়ী পশ্চিমা লোক ছিলেন। বাংলার কৃষক–প্রজার সমস্যা তিনি বুঝিতেন না। কাজেই কংগ্রেসী মুসলমান হিসাবে যতটা পারেন 'কৃষক'কে সাহায্য করিতেন। তিনিও বেশিদিন 'কৃষকে'র বিপুল ঘাটতি সইতে পারিলেন না। ডিরেক্টরদের সমবেত চেষ্টায় বিশেষতঃ অধ্যাপক কবিরের মধ্যস্থতায় কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত ব্যাংকার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মিঃ হেমেন্দ্র নাথ দত্ত 'কৃষকে'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইতে রাজি হইলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী এবং অধ্যাপক কবিরের বিশেষ বন্ধু। কাজেই তিনি আমাদের দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন। তাঁর পরিচালনায় 'কৃষক' বেশ সচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে 'কৃষক' ছাড়িয়া দিতে আমি বাধ্য হইলাম। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝার সুবিধার জন্য সে কারণটাও এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

এই সময় হক মন্ত্রিসভা বেংগল সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিল আইন পরিষদে পেশ করেন। এই বিলের মর্ম এই যে মাধ্যমিক শিক্ষা (ম্যাট্রিক পরীক্ষা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে নিয়া সরকার গঠিত একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতে দেওয়া হইবে। উদ্দেশ্যটি মহৎ এবং তৎকালে সভ্য–জগতের সর্বত্র শিক্ষা–ব্যবস্থায় এই পন্থাই চালু ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে ও পাকিস্তানে এই ব্যবস্থাই চালু হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলাতেও তথাকার মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নাই। একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতেই আছে।

কিন্তু তৎকালে দল–মতনির্বিশেষে সমস্ত হিন্দু হক মন্ত্রিসভার এই বিলের প্রতিবাদ করেন। এমন কি, বিল আসিতেছে শুনিয়াই প্রায় বছর দিন ধরিয়া বিভিন্ন সংবাদ–পত্রে এই বিলের আগাম প্রতিবাদ চলিতেছে। কয়েক মাস আগে (২৫শে জানুয়ারি) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছে এবং সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার হুমকি দিয়াছে।

এমন সময়ে এই বিলের সমর্থনে 'কৃষকে' আমি পর–পর কয়েকটা সম্পাদকীয় লিখি। মিঃ দত্তের নযরে পড়ে তা। তিনি আমার সাথে দেখা করিয়া প্রতিবাদ করেন। বলেন ঃ 'আপনি একটা সাম্প্রদায়িক বিল সমর্থন করিয়া 'কৃষকে'র অসাম্প্রদায়িক

নীতির খেলাফ কাজ করিয়াছেন।' আমি জবাবে তাঁকে বুঝাইবার চেষ্টা করি : 'বিলটা সাম্প্রদায়িক নয়। হিন্দুদের প্রতিবাদটাই সাম্প্রদায়িক।' সম্পাদকীয় গুলিতে উল্লেখিত বিভিন্ন সভ্য দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার নযিরের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু তিনি মানেন না। ঐ বিলের সমর্থনে আর লেখা হইলে তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকিবেন না বলিয়া আমাকে হুঁশিয়ার করিয়া দিলেন। অন্যান্য ডিরেক্টরদেরও জানাইলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা সবাই আমার সমর্থক ছিলেন। তাঁরা আমাকে কিছু বলিলেন না। আমি এ বিষয়ে আরও দু'একটা সম্পাদকীয় লিখিলাম।'

ফলে এ দাঁড়াইল যে আমি নীতি না বদলাইলে অথবা 'কৃষক' ত্যাগ না করিলে মিঃ দত্ত আর 'কৃষক' চালাইবেন না বলিয়া দিলেন। মিঃ দত্ত সরিয়া পড়িলে 'কৃষক' বন্ধ হইবে এটা নিশ্চিত। অতএব 'কৃষক' বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আমিই কৃষক ত্যাগ করিলাম। অন্যান্য ডিরেক্টররাও সকলেই পদত্যাগ করিলেন। স্টাফেরই একজন মুসলমানের নাম সম্পাদকরূপে ছাপিয়া 'কৃষক' চলিতে লাগিল।

কিন্তু আমি আর্থিক বিপদে পড়িলাম। ময়মনসিংহে ওকালতি গুটাইয়া বাসা ছাড়িয়া টেবিল-চেয়ার বিলি করিয়া সপরিবারে ময়মনসিংহ ছাড়িয়া ছিলাম। যাকে বলে 'নদী পার হইয়া একেবারে নৌকা পোড়ানো' আর কি?

এমন অবস্থায় বিপদের বন্ধুরূপে দেখা দিলেন আমার সহোদর-তুল্য ছোট ভাই খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম। তিনি তখন বাংলা সরকারের সহকারী জুডিশিয়াল সেক্রেটারি। তাঁর পরামর্শে আলিপুর কোর্টে এবং কলিকাতা স্মলকয কোর্টে প্র্যাকটিস করা সাব্যস্ত করিলাম। তৎকালে উকিল (প্লিডার)-দের ওকালতি ছাড়া অন্য কাজ করিতে হাইকোর্টে দরখাস্ত দিয়া ওকালতি সসপেণ্ড করিতে হইত। আমি 'কৃষকের' সম্পাদকতা নিবার সময় তাই করিয়াছিলাম। এবার পুনরায় ওকালতি শুরু করিবার দরখাস্ত দিয়া তার জবাবের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

৭. হক সাহেবের 'নবযুগে'

এমন সময় হক সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি দৈনিক 'নবযুগ' বাহির করা স্থির করিয়াছেন। আমাকে তার সম্পাদনার ভার নিতে হইবে। দুইটা কারণে হক সাহেবের এই প্রস্তাবে আকৃষ্ট হইলাম। এক অর্থনৈতিক, দুই রাজনৈতিক। 'কৃষকে' দুইশত টাকা বেতন ও পঞ্চাশ টাকা এলাউন্স একুনে আড়াইশ' টাকা পাইতাম। কলিকাতায় ওকালতি শুরু করিয়াই এত টাকা পাওয়ার আশা ছিল না। হক সাহেব আমার আর্থিক অবস্থার সব খবর জানিতেন। তিনি পঞ্চাশ টাকা বেশি করিয়া তিনশত টাকা বেতন-ভাতার কথা বলিলেন। বন্ধুবর সৈয়দ বদরুদ্দুজা, সৈয়দ আযিযুল হক (নান্না মিয়া) ও ওয়াহিদুযযামান (ঠাণ্ডা মিয়া) সকলেই এই প্রস্তাবে আমাকে রাযি

করাইতে চেষ্টা করিলেন। আমার আর্থিক আসন্ন দুরবস্থার একটা প্রতিকার হয় এটা আমি স্পষ্টই বুঝিলাম। রাজনৈতিক কারণটা আরও সুদূর-প্রসারী। উক্ত তিন বন্ধু সেদিকে আরও বেশি জোর দিলেন। জিন্না-নেতৃত্ব মুসলিম বাংলার স্বার্থ-বিরোধী তা হক সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি সসম্মানে মুসলিম লীগ হইতে বাহির হইয়া আসার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। 'নবযুগ' বাহির করা তারই প্রথম পদক্ষেপ। হক সাহেবের কথা-বার্তায় তা বুঝিলাম। উক্ত তিন বন্ধু এ কাজকে অর্থাৎ হক সাহেবকে মুসলিম লীগের কবল হইতে উদ্ধার করাকে মুসলিম-বাংলার স্বার্থে একটা বড় কাজ বলিয়া আমার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিলেন। আকৃষ্ট হইবার জন্য আমি এক পায় খাড়াই ছিলাম। অতি সহজেই তাঁদের এই যুক্তি মানিয়া লইলাম। আমার সিদ্ধান্ত দ্রুততর করিলেন বন্ধুবর শামসুদ্দিন। হক সাহেবকে মুসলিম লীগের কবলমুক্ত করিবার চেষ্টা তিনি বেশ কিছুদিন আগে হইতেই করিতেছিলেন। তিনি আমাকে জোর দিয়াই বলিলেন, আমি 'নবযুগের' দায়িত্ব না নিলে তাঁর এতদিনের চেষ্টা সাফল্যের তীরে আসিয়া নৌকাডুবি হইবে।

কথাবার্তা অনেক দিন ধরিয়া চলিল। বন্ধুবর সিরাজুল ইসলামের কানে কথাটা গেল। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের এবং ব্যক্তিগতভাবে সার নাযিমুদ্দিনের সমর্থক। হক সাহেবের তিনি ছিলেন খুব বিরোধী। তিনি আমাকে হুঁশিয়ার করিলেন আমার ওকালতি আবার সসপেণ্ড করিলে তাঁর পক্ষে আমাকে সাহায্য করা সম্ভব হইবে না। আমি সে কথাটা হক সাহেবের সাথে পরিষ্কার করিয়া লইলাম। কাগযের সম্পাদক রূপে নাম থাকিবে হক সাহেবের নিজের। কাজেই আমার নামও দিতে হইবে না, ওকালতিও সসপেণ্ড করিতে হইবে না। আমি বুঝিলাম নূতন কাগয প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া আমি ওকালতির সময় পাইব খুব কমই। কিন্তু সেটা আমার চিন্তার কারণ ছিল না। দরখাস্ত করিয়া ফরম্যালি ওকালতি সসপেণ্ড না করিলেই হইল।

শামসুদ্দিন সাহেব নান্না মিয়া, ঠাণ্ডা মিয়া ও ছাত্র-নেতা নূরুল হুদা আমাকে সংগে লইয়া দিনরাত দৌড়াদৌড়ি করিয়া বাড়িভাড়া করা হইতে মেশিন ও টাইপ আদি ছাপাখানার সাজ-সরঞ্জাম কিনার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। কাগযের ডিক্লারেশন লওয়া হইয়া গেল। তৎকালে ডিক্লারেশন লইতে সম্পাদকের নাম দিতে হইত না। শুধু প্রিন্টার-পাবলিশারের নাম দিতে হইত।

কিন্তু সব ওলট-পালট করিয়া দিলেন একদিন হক সাহেব নিজে। তিনি আমাকে জানাইলেন, সম্পাদকের নাম আমারই দিতে হইবে। কারণ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি

কোনও কাগযের সম্পাদক হইতে পারেন না। লাট সাহেব স্বয়ং তাঁকে বারণ করিয়া দিয়াছেন। আমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায় দেখিয়া আমি চটিয়া গেলাম। সন্দেহ হইল, এটা হক সাহেবেরই চালাকি। আগে হইতে আমাকে ভাড়াইয়া আনিয়া 'একাদশ ঘটিকায়' লাট সাহেবের দোহাই দিয়া আমাকে নাম দিতে বাধ্য করিবেন, এটা তাঁর আগেরই ঠিক-করা ফন্দি ছিল। আমি তর্ক করিলাম। প্রধানমন্ত্রীর কাগযের সম্পাদক হওয়ায় কোন আইনগত বাধা থাকিতে পারে না। আজকাল গণতন্ত্রের যুগ। পার্টি গবর্নমেন্ট। পার্টি লিডাররাই প্রধানমন্ত্রী। কাজেই পার্টির মুখপত্রের সম্পাদক হওয়ায় লিডারের কোন বাধা থাকিতে পারে না। কথা-বার্তায় বেশ বুঝা গেল এটা হক সাহেবের চালাকি নয়। লাট সাহেব সত্য-সত্যই আপত্তি করিয়াছেন। তবে আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সার নাযিমুদ্দিনই সেক্রেটারিদেরে দিয়া লাট সাহেবের মুখ হইতে ঐ আদেশ বাহির করিয়াছেন। হক সাহেবের ভাব-গতিক হইতে স্বয়ং লীগ মন্ত্রীরা বুঝিয়াছিলেন, হক সাহেব কি উদ্দেশ্যে দৈনিক বাহির করিতেছেন। সম্পাদক হিসাবে হক সাহেবের নাম থাকিলে উহার ওজন ও জনপ্রিয়তা বাড়িবে, এটাও নিশ্চয়ই তাঁরা বুঝিয়াছেন। তাই লাট সাহেবকে দিয়া তাঁরা এই কাজ করাইয়াছেন। কিন্তু লাট সাহেবের আদেশে তিনি ভয় পাইয়াছেন এমন মর্যাদাহানিকর ব্যাখ্যা হক সাহেব দিলেন না। তিনি আমার 'পার্টি লিডার' 'পার্টি মুখপত্র' 'পার্টি গবর্নমেন্ট' ইত্যাদি কথার জবাবে মুচকি দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন ঃ 'ওসব কথা কেন কও? কি উদ্দেশ্যে কাগয বাইর হৈতেছে তা ত জানই।'

আমি পরাজিত হইলাম। কিন্তু নিজের নাম দিতে কিছুতেই রাজি হইলাম না। সিরাজুল ইসলামও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম, হক সাহেবের মতের স্থিরতা এবং কাগযের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনও ভরশা নাই। কাজেই এই কাজ করিতে গিয়া ওকালতি আবার সসপেণ্ড করিলে সেটা নিতান্তই রিস্কি হইবে। অতএব আমি রাজি হইলাম না। একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। কাগয বাহির না হইলে সকলের চেয়ে বেশি লোকসান আমারই। সুতরাং খুব-তেরেসে ভাবিতে লাগিলাম। একটা ব্রেন-ওয়েভ হইল। আমাদের সকলের প্রিয় কবি নজরুল ইসলাম এই সময়ে দারুণ অর্থ-কষ্টে ভুগিতেছিলেন। ডিক্রিদাররা তাঁকে কোর্টে টানাটানি করিতেছিল। অতএব তাঁকে ভাল টাকা বেতন দিয়া তাঁর নামটা সম্পাদক রূপে ছাপিলে আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হয় ; কবিরও অর্থ-কষ্টের লাঘব হয়। কথাটা বলা মাত্র বন্ধুবর নান্না-ঠাণ্ডা মিয়া ও নূরুল হুদা লুফিয়া লইলেন। আমরা দল বাঁধিয়া তাঁর বাড়ি গেলাম। তিনি সানন্দে রাজি হইলেন। তাঁকে লইয়া আমরা হক সাহেবের নিকট আসিলাম। এক দিনে সব ঠিক

হইয়া গেল। কবিকে বেতন দেওয়া হইবে তিনশ', এলাউন্স পঞ্চাশ, একুনে সাড়ে তিনশ'।

যথাসময়ের একটু আগে-পিছে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ধুম-ধামের সাথে 'নবযুগ' বাহির হইল। জোরদার সম্পাদকীয় লিখিলাম। সোজাসুজি মুসলিম লীগ বা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিছু বলিলাম না। মুসলিম বাংলার বাংলা দৈনিকের আধিক্যের প্রয়োজনের উপরেই জোর দিলাম। তোখড় সম্পাদকীয় হইল। অমনি জোরের সম্পাদকীয় চলিতে লাগিল। সবাই বাহ্‌-বাহ্‌ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আমাদের আসল আশা পূর্ণ হওয়ার আশু কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। আমাদের আসল আশা ছিল হক সাহেবকে মুসলিম লীগ হইতে বাহির করিয়া আনা। আমরা যখন 'নবযুগের' আয়োজন শুরু করি, তখনই হক-জিন্না বিরোধ চরমে উঠিয়াছে। দুই-একদিনের মধ্যেই শুভ কাজটা হইয়া যাইবে, এটাই ছিল আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। বিরোধটা ছিল ভারত সরকার-গঠিত জাতীয় সমর-পরিষদ (ন্যাশন্যাল ওয়ার কাউন্সিল) হইতে হক সাহেবের পদত্যাগ উপলক্ষ করিয়া। ব্যাপারটা অনেকেরই খবরের কাগযে পড়া আছে নিশ্চয়ই। তবু পাঠকদের স্মৃতি ঝালাইবার জন্য সংক্ষেপে ব্যাপারটার পুনরুল্লেখ করিতেছি। ১৯৪১ সালের জুন মাসে ইউরোপীয় যুদ্ধে হিটলারের জয়-জয়কার। অন্যতম প্রধান মিত্রশক্তি ফ্রান্স যুদ্ধে হারিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে হিটলারের 'স্বস্তিকা' পতাকা উড়িতেছে। হিটলারের খ্যাতনামা সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রোমেল মিসরের আল-আমিনের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া সুয়েজ খাল ধরে-ধরেন। সমগ্র ইউরোপ জয়ের উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া হিটলার এই জুন মাসেই তাঁর এত দিনের মিত্র এবং নিরপেক্ষ সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ জুলাই পার হইবার আগেই মস্কো দখল করিবেন বলিয়া সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছেন।

৮. হক সাহেব ও সমর-পরিষদ

আমরা ভারতবাসীরা ইংরেজের পরাজয় কামনাই করিতেছিলাম। হিটলারের পরিণম জয় সম্পর্কেও আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না আগে হইতেই। জুন মাসে দেখা গেল স্বয়ং ইংরাজরা ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। তার প্রমাণ স্বরূপ ভারতীয় নেতাদেরে, বিশেষতঃ কংগ্রেস ও লীগকে, খুশী করার জন্য বড়লাট তৎপর হইয়া উঠিলেন। বড় লাটের শাসন-পরিষদকে বড় করিয়া বেশির ভাগ ভারতীয় নিবার প্রস্তাব দিলেন। আর যুদ্ধ-পরিচালনা ব্যাপারেও ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের পন্থা হিসাবে

'জাতীয় সমর-পরিষদ' এই গাল-ভরা নামে এক কাউন্সিল গঠন করিলেন। ঘোষণায় বলা হইল প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীরা পদাধিকারের বলে স্বতঃই কাউন্সিলের মেম্বার হইলেন। সে পদ গ্রহণ করিবার জন্য বড় লাট তাঁদেরে পত্র দিলেন। সকলেই তা গ্রহণ করিলেন। সাতটি প্রদেশ হইতে কংগ্রেসীরা আগেই মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়াছিলেন। সে সব প্রদেশে লাটের শাসন চলিতেছিল। শুধু বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে মন্ত্রিসভা চলিতেছিল। কাজেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শুধু তাঁরাই সমর-পরিষদের মেম্বার হইলেন। এঁরা সবাই মুসলিম লীগের লোক। কাজেই লীগ সভাপতি জিন্না সাহেব এঁদেরে নির্দেশ দিলেন সমর-পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিতে। জিন্না সাহেবের যুক্তি এই যে বৃটিশ সরকার মুসলিম লীগের দাবির ভিত্তিতে আপোস না করা পর্যন্ত মুসলিম লীগ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনও সাহায্য করিবে না। মুসলিম লীগের এই সিদ্ধান্তটা ঠিক কংগ্রেসী সিদ্ধান্তের অনুরূপ। কংগ্রেসও ১৯৪০ সালের মার্চ হইতে বিভিন্ন অধিবেশনে এই দাবি করিয়া আসিতেছিল যে বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তিতে কংগ্রেসের সহিত একটা রফা না করা পর্যন্ত কংগ্রেস যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনও সহযোগিতা করিবে না।

৯. মিঃ জিন্নার যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা

মুসলিম লীগেরও এটা নূতন কথা নয়। মুসলিম লীগের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে জিন্না সাহেব ১৯৪০ সালের ১০ই জুন তারিখে এক বিবৃতিতে সমস্ত মুসলিম লীগারদেরে, বিশেষতঃ মুসলিম মন্ত্রীদেরে, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোন সহযোগিতা না করিবার নির্দেশ দেন। কেউ এ নির্দেশের কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। শুধু পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সার সেকান্দর হায়াত খাঁ ১৮ই জুন তারিখে এক বিবৃতি দিয়া বলেন যে মুসলিম লীগের এ অসহযোগের সিদ্ধান্ত বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর প্রযোজ্য নহে। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব তখন দিল্লি ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর সাথে পরামর্শ করিয়াই সেকান্দর হায়াত ঐ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি দিয়াছিলেন। যুদ্ধে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করিয়াই তিনি ঐ যুক্তিপূর্ণ বিবৃতিটি দিয়াছিলেন। তাতে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আপোস আলোচনা চালাইবার জন্য জিন্না সাহেবকে অনুরোধও করিয়াছিলেন। কাজেই আশা করা গিয়াছিল স্বয়ং জিন্না সাহেবের তাতে সম্মতি আছে। কিন্তু পরদিন ২৯শে জুন জিন্না সাহেব সেকান্দর সাহেবের বিবৃতিকে শিশু-সুলভ ও তার যুক্তিকে হাস্যকর বলিয়া উড়াইয়া দেন এবং সমস্ত মুসলিম লীগারকে যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে দূরে থাকিতে নির্দেশ দিয়া লীগ সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি করেন।

জিন্না সাহেবের এই কড়া বিবৃতির জবাবে হক সাহেব বা সেকান্দর হায়াত সাহেব কেউ কিছু বলিলেন না। কিন্তু জিন্না সাহেবের আদেশ অমান্য করিয়া তাঁরা

উভয়ে দিল্লীতে ৭ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আযাদসহ অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের সাথে সাম্প্রদায়িক মিটমাটের আলোচনা করিলেন।

কিন্তু এবার জিন্না সাহেব সোজাসুজি মুসলিম লীগ প্রধান মন্ত্রীদেরে ওয়ার কাউন্সিল হইতে পদত্যাগ করিবার নির্দেশ দিলেন। সে নির্দেশ পালনে গড়িমসি করিয়া সময় কাটাইলেন সকলেই। কিন্তু হক সাহেব ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদ করিলেন না। এক দুই করিয়া শেষ পর্যন্ত আর সকলেই পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু হক সাহেব করিলেন না। ফলে ১৯৪১ সালে ২৫শে আগস্ট তারিখে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি হক সাহেবের বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা-সূচক ভাষা প্রয়োগ করিয়া দশ দিনের মধ্যে 'ওয়ার কাউন্সিল' হইতে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন। ঠিক এই সময়ে আমরা 'নবযুগ' প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছি। সুতরাং আমরা ধরিয়া নিলাম 'নবযুগ' বাহির হইবার আগেই হক সাহেবকে মুসলিম লীগ ছাড়িতে হইবে।

কিন্তু নবযুগ বাহির হইয়া বেশ কয়েক দিনের পুরান হইয়া গেল। কিন্তু হক সাহেবের লীগ হইতে বাহির হওয়ার নামটি নাই। হক সাহেব লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নির্ধারিত মেয়াদ মধ্যে পদত্যাগ করিলেন না। কোন জবাবও দিলেন না। আমাদের সাথে আলাপে তিনি দৃঢ়তা দেখাইলেন। তাতে আমাদের আশা বাড়িতে লাগিল। ওদিকে কিন্তু লীগ মন্ত্রীরা ও নেতারা হক সাহেবকে খুব চাপ দিতে থাকিলেন 'ওয়ার কাউন্সিল' হইতে পদত্যাগ করিয়া জিন্না সাহেবের সাথে একটা আপোস করিয়া ফেলিতে। হক সাহেব শেষ পর্যন্ত কি করিবেন তা বোঝা আমাদের পক্ষে খুব মুশকিল হইল। আমি এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও উভয় কূল ঠিক রাখিয়া সম্পাদকীয় লিখিয়া চলিলাম।

১০. হক-জিন্না অস্থায়ী আপোস

বহু মুসলিম লীগ নেতার চেষ্টা ও মধ্যস্থতায় হক সাহেব শেষ পর্যন্ত ১৯৪১ সালের ১৮ই অক্টোবর 'ওয়ার কাউন্সিল' হইতে পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগে দ্বিধা ও বিলম্বের কারণ এবং পদত্যাগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি জিন্না সাহেবের নামে লিখিত একটা খোলা চিঠির আকারে সংবাদ পত্রে একটি বিবৃতি দেন। এই পত্রে তিনি জিন্না সাহেবের নেতৃত্বের এবং আন্দোলনের ধারা ও গতির কঠোর ভাষার নিন্দা করেন। প্রথমেই তিনি স্পষ্ট বলিয়া দেন যে জিন্না সাহেবের নির্দেশে বা মুসলিম লীগের ধমকে ভয় পাইয়া তিনি 'ওয়ার কাউন্সিল' ছাড়িতেছেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থের দিক হইতে 'ওয়ার কাউন্সিলের' মেম্বরগিরির কোনও গুরুত্ব ও আবশ্যকতা নাই বলিয়াই তিনি পদত্যাগ করিতেছেন।

জিন্না নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে গিয়া হক সাহেব মুসলিম বাংলার ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ গণকের মতই এমন সব কথা বলিয়াছিলেন, যার প্রায় সবই আজ সত্য হইয়াছে। এই দিক দিয়া এই পত্রখানার ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এর কোনও কপি পাওয়া যায় না। আমার বেশ মনে আছে, ঐ পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, জিন্না সাহেব ও মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির শুধু এই সিদ্ধান্তটাই ভ্রান্ত, তা নয়। তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা ও আন্দোলনের যে ধারা প্রচলন করিয়াছেন, তাও ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক। তাতে মুসলিম ভারতের, বিশেষতঃ মুসলিম বাংলার, ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। গোটা বাংলা ও আসাম পূর্ব পাকিস্তানে পড়িবে বলিয়া বাংলার মুসলমানদিগকে ধোকা দেওয়া হইতেছে। মুসলিম লীগে ব্যক্তি–বিশেষের ডিক্টেটরি চলিতে থাকিলে মুসলিম ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম বাংলার যে প্রভাব ও মর্যাদা আছে তাও আর থাকিবে না। পশ্চিমা রাজনীতিকদের ইচ্ছামত মুসলিম বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত ও পরিচালিত হইবে। সে অবস্থায় আসাম ত পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হইবেই না, বাংলাও বিভক্ত হইবে।

হক সাহেবের কথিত পত্রের ভাষা এখন এতদিন পরে আমার মনে নাই। পত্রটি যোগাড়ের চেষ্টা সাধ্য–মত করিয়াছি। পাই নাই। কিন্তু পত্রখানার মর্ম আমার মনে আছে। পত্রখানি আমাদের সকলের বিবেচনায় অতিশয় মূল্যবান ও দূরদর্শিতামূলক ছিল। সেজন্য 'নবযুগের' নিউয ডিপার্টমেন্টকে দিয়া উহার বাংলা তর্জমা করাইয়া আমি নিজে তা দেখিয়া দিয়া 'নবযুগে' ছাপাইয়াছিলাম। পত্রটি এত বড় ছিল যে উহা সম্পূর্ণ ছাপিতে কয়েক দিন লাগিয়াছিল।

ফলে 'ওয়ার কাউন্সিল' হইতে হক সাহেব পদত্যাগ করিলেই লীগের সাথে, মানে জিন্না সাহেবের সাথে, তাঁর আপোস হইয়া যাইবে বলিয়া আমরা যে আশংকা করিতেছিলাম সে আশংকা সত্যে পরিণত হইল না। আশা আমাদের অটুটই থাকিল। হক–জিন্না বিরোধের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক আদর্শটাই আমাদের সকলের বিবেচ্য ছিল না। ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্নও জড়িত ছিল। আমার স্বার্থটাই ধরা যাক। হক সাহেব লীগ না ছাড়িলে 'নবযুগের' দরকার থাকে না। কাজেই আমারও চাকুরি থাকে না। 'নবযুগ' বাহির হওয়ায় আমরা সাংবাদিকরা লাভবান হইয়াছি। কিন্তু লীগ মন্ত্রীরা না থাকিলে যাঁরা মন্ত্রী হইবেন, তাদের ত আজও কিছু হইল না। আসল কথা এই যে লীগ মন্ত্রীদেরে তাড়াইয়া যাঁদেরে লইয়া নয়া হক মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে, তাঁদের নাম ঠিক হইয়াই ছিল। কে কোন দফতর পাইবেন, তারও মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল। এই সব নিশ্চিত ভাবী মন্ত্রীরা আমাকে অস্থির করিয়া ফেলিলেন। যথেষ্ট জোরে সম্পাদকীয়

লেখা হইতেছে না। হক-লীগ-বিরোধের আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে না। তবে আর আগে হইতে 'নবযুগ' বাহির করিয়া কি ফল হইল? একমাত্র আমার ছাড়া আর কার কি লাভ হইল? অতএব জিন্না-হক বিরোধটা চরমে আনিবার সাধ্য-মত কলমের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু মুসলিম লীগাররাও হক সাহেবের মত জনপ্রিয় প্রভাবশালী নেতাকে হাতছাড়া করিতে রাজি ছিলেন না। তাঁরাও জিন্না-হক আপোসের জন্য তাঁদের সমস্ত শক্তি ও প্রতিপত্তি খাটাইতে লাগিলেন। আপাততঃ তাঁরাই জয়ী হইলেন। হক সাহেবকে দিয়া তাঁর বিবৃতির 'ব্যাখ্যা' করাইলেন। সেই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ১৬ই নবেম্বর (১৯৪১) মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকে হক সাহেবের সহিত লীগের বিরোধের অবসান ঘটিল। এতে বাংলার লীগ মহল খুব উল্লসিত হইল। কিন্তু আমাদের কলিজা ও মুখ শুকাইয়া গেল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন তখন চলিতে ছিল। কাজেই হক সাহেবের দলীয় মেম্বরদের মধ্যে এবং হক সাহেবের সাথে আমাদের দেন-দরবার চলিতে থাকিল। মুসলিম লীগের সাথে তাঁর মিটমাট হইয়া যাওয়ার কথা তুলিলেই তিনি জবাবে মিচকি হাসিয়া আমাদেরে বলিতেন : 'ওয়েট এণ্ড সী'।

১১. প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন

এর কয়দিন পরেই হক সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং 'নবযুগে' প্রচারের নূতন ধারা সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ দিতে গিয়াই তিনি সর্বপ্রথম আমাকে জানান যে শুধু কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেসের সাথেই তিনি আপোস করিতেছেন না। হিন্দু সভানেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সাথেও তাঁর আপোস হইতেছে। ডাঃ শ্যামা প্রসাদকেও তিনি তাঁর নয়া মন্ত্রিসভায় নিতেছেন। আমি শুধু আকাশ হইতে পড়িলাম না। আস্তা আসমানটাই আমার মাথায় পড়িল। আমি জানিতাম হক সাহেব সময়-সময় খুবই বেপরোয়া হইতে পারেন। কিন্তু এতটা হইতে পারেন, এতকাল তাঁর শাগরেদি করিয়াও আমি তা জানিতাম না। কথাটা শুনিয়া আমি এমন স্তম্ভিত হইলাম যে সে-ভাব কাটিতে বোধ হয় আমার পুরা মিনিট খানেকই লাগিয়াছিল। তিনি আমার মনোভাব বুঝিলেন। গম্ভীর মুখে বলিলেন : 'শোন আবুল মনসুর, তুমি শ্যামা-প্রসাদকে চিন না। আমি চিনি। সে সার আশুতোষের বেটা। করুক সে হিন্দু সভা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তার মত উদার ও মুসলমানদের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসেও একজনও পাবা না। আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি সবদিক ভাইবা-চিন্তাই তারে নিতেছি। আমারে যদি বিশ্বাস কর, তারেও বিশ্বাস করতে হবে।'

আমি খুবই চিন্তায় পড়িলাম। কিন্তু মনে-মনে হাসিলাম ভাবিলাম, শ্যামাপ্রসাদকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। কারণ স্বয়ং হক সাহেবকেই বিশ্বাস করা যায় না। শ্যামাপ্রসাদকে বিচার করিবার কি অমূল্য মাপকাঠিই না হক সাহেব আমাকে দিয়াছেন! সব অবস্থায়ই হক সাহেব রসিক লোক ছিলেন। হক সাহেবের কথায় বুঝিলাম, পরদিনই মিঃ জে সি· গুপ্তের বাড়িতে অপযিশন পার্টি সমূহের নেতাদের সংগে হক সাহেবের বৈঠক বসিতেছে। চাঁদ উঠিলে সবাই দেখিবে। আগামী কালই সবাই জানিয়া ফেলিবে। কাজেই এই অশুভ সংবাদটা আমি কারও কাছে বলিলাম না। কিন্তু বিকালেই দেখিলাম সবাই ব্যাপারটা জানেন। ভাবী মন্ত্রীরাই হাসিমুখে এই খবরটা আমাকে দিলেন।

পরদিন ২৮শে নবেম্বর সত্য-সত্যই মিঃ গুপ্তের বাড়িতে ঐ বৈঠক বসিল। দীর্ঘ আলোচনার পর প্রগেসিভ কোয়েলিশন পার্টি নামে নয়া কোয়েলিশন গঠিত হইল। হক সাহেব তার লিডার ও শরৎ বাবু ডিপুটি লিডার নির্বাচিত হইলেন। হাসি-খুশির মধ্যে অনেক রাতে সভা ভংগ হইল। রাত্রেই সারা কলিকাতা, বিশেষতঃ খবরের কাগয আফিসগুলি, গরম হইয়া উঠিল। পরদিন সকালে লীগ সমর্থক মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। বিকালেই আইন পরিষদের বৈঠকে (২৯শে নবেম্বর) লীগ মেম্বরদের মধ্য হইতে এ ব্যাপারে সোজাসুজি প্রশ্ন উথাপিত হইল। হক সাহেব খুব জোরের সাথে সোজাসুজি ও-কথা অস্বীকার করিলেন।

লীগ মন্ত্রী ও মেম্বররা স্বভাবতঃই হক সাহেবের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁরা হক সাহেবের সহিত দেন-দরবার চালাইলেন। শোনা গেল, ইউরোপীয় দলের সঙ্গেও তাঁরা যোগাযোগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পর্দার আড়ালে কি হইল, আমরা পথের মানুষেরা তার খবর রাখিলাম না। দেখা গেল, ১লা ডিসেম্বর তারিখে মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা সকলে এক সাথে হক মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিলেন। মুসলিম লীগ পার্টিও আর হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে না বলিয়া ঘোষণা করিল। অগত্যা হক সাহেবও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পরদিন ৩রা ডিসেম্বর হক সাহেব খবরের কাগযে বিবৃতি দিয়া নব-গঠিত প্রগেসিভ কোয়েলিশন পার্টির নেতৃত্ব 'কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত' গ্রহণ করিলেন।

লীগ মন্ত্রীরা যে সাত তাড়াতাড়িতে হক মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তার আসল কারণ এতদিনে বোঝা গেল। তা এই যে ইউরোপীয় দল ও কোন কোন শ্বেতাংগ আই. সি. এস্. সেক্রেটারির পরামর্শে লাট সাহেব সার নাযিমুদ্দিনকে ভরসা দিয়াছিলেন, হক মন্ত্রিসভার অবসানে লীগ দলকেই মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া

হইবে। লাট সাহেবের কাজ-কর্মেও তা বোঝা গেল। হক সাহেব প্রগেসিভ কোয়েলিশন পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বিবৃতি ও লাট সাহেবকে তা জানাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও এবং এই দলের সুস্পষ্ট মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও লাট সাহেব হক সাহেবকে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দিতে গড়িমসি করিতে থাকিলেন। মুসলিম মেম্বরদের অধিকাংশের রাজনৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সকলের তখন এই ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, যে-দল মন্ত্রিসভা গঠন করিবে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের বেশির ভাগ সেই দলেই যোগ দিবেন। অতএব আপাতঃদৃষ্টিতে মুসলিম লীগ পার্টিতে মুসলমান মেম্বরদের মেজরিটি না থাকা সত্ত্বেও এই পার্টিকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহবান করা হইবে, এমন গুজবে কলিকাতা শহর, বিশেষতঃ সংবাদপত্র আফিস, প্রতিমুহূর্তে মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের বুকও আশংকায় দূর-দূর করিতে থাকিল।

কিন্তু এই অবস্থায় বেশিদিন গেল না। ৭ই ডিসেম্বর জাপান জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করিল এবং ঝটিকা আক্রমণে পার্ল হার্বার নামে বিখ্যাত মার্কিন বন্দর বোমা-বিধ্বস্ত করিল। পরদিন ৮ই ডিসেম্বর বৃটিশ ও মার্কিন সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইউরোপীয় যুদ্ধ এতদিনে সত্য-সত্যই বিশ্ব-যুদ্ধে রূপান্তরিত হইল। বোধহয় বড় লাটের নির্দেশে বাংলার লাটের নীতির পরিবর্তন হইল। তিনি ১০ই ডিসেম্বর হক সাহেবকে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনে কমিশন করিলেন। আমাদের মধ্যে বিপুল উল্লাস দেখা দিল। লীগ মহলে বিষাদ! কিন্তু হরিষে-বিষাদ হইল আমাদের। লাট সাহেব ইচ্ছার বিরুদ্ধে হক সাহেবকে মন্ত্রিত্ব দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ডান হাতটি ভাংগিয়া দিলেন। প্রগেসিভ কোয়েলিশনকে সত্য-সত্যই প্রগতিবাদী জাতীয় পার্টি হিসাবে রূপ দিতে পারিতেন যিনি তিনি ছিলেন মিঃ শরৎ চন্দ্র বসু। হক সাহেবের পরেই তাঁর দ্বিতীয় স্থান। নয়া মন্ত্রিসভার তালিকাও সেই ভাবেই করা হইয়াছিল। শরৎ বাবুকে দেওয়া হইয়াছিল স্বরাষ্ট্র দফতর। কিন্তু ১১ই ডিসেম্বর বেলা ১০টায় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ করিবার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে শরৎ বাবুকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার করিয়া প্রেসিডেন্সী জেলে নেওয়া হইল। আমরা যারা মন্ত্রী হইতেছিলাম না, তারা সবাই রাগে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম এবং হক সাহেবকে এই গ্রেফতারির প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অস্বীকার করিতে উপদেশ দিতে লাগিলাম। কিন্তু যারা মন্ত্রী হইতে যাইতেছিলেন তাঁরা সকলেই আমাদের চেয়ে অনেক বিদ্বান জ্ঞানী অভিজ্ঞ দূরদর্শী ধীর চিত্তের লোক ছিলেন। তাঁরা উপদেশ দিলেন যে শরৎ বাবুর পোর্টফলিও খালি রাখিয়া অবশিষ্ট মন্ত্রীদের শপথ নেওয়া হইয়া যাক। শপথ নেওয়ার পর-পরই প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব লাট সাহেবের সহিত দরবার করিয়া শরৎ

বাবুর মুক্তির বন্দোবস্ত করুন। হক সাহেব মন্ত্রিসভা গঠনে অস্বীকার করিলে লীগকেই মন্ত্রিত্ব দেওয়া হইবে, এ বিষয়ে সকলেই একমত হইলেন। তাই হইল। নয়া হক মন্ত্রিসভার শপথ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইল। শপথ শেষে প্রধানমন্ত্রী লাট সাহেবের সহিত দেখাও করিলেন। লাট সাহেব বলিয়া দিলেন, ভারত রক্ষা আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমেই শরৎ বাবুকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। প্রাদেশিক লাটের বা সরকারের এ ব্যাপারে কিছুই করণীয় নাই। সত্যই তাঁদের কিছু করণীয় থাকিল না। অতএব শরৎ বাবুকে জেলে রাখিয়াই মন্ত্রিসভার কাজ চলিতে থাকিল। শেষ পর্যন্ত শরৎ বাবুকে বাদ দিয়াই এগার জনের পূর্ণ মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। হক সাহেব ছাড়া মুসলিম মন্ত্রী থাকিলেন পাঁচ জন। যথা ঃ (১) নবাব হবিবুল্লা (২) মৌঃ শামসুদ্দিন (৩) খান বাহাদুর আবদুল করিম (৪) খান বাহাদুর হাশেম আলী (৫) খান বাহাদুর জালালুদ্দিন। হিন্দু মন্ত্রী থাকিলেন পাঁচ জন। যথা ঃ (১) সন্তোষ কুমার বসু (২) ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (৩) প্রমথ নাথ ব্যানার্জী (৪) হেম চন্দ্র লস্কর ও (৫) উপেন্দ্র চন্দ্র বর্মণ।

১২. মন্ত্রীদের প্রতি অযাচিত উপদেশ

মন্ত্রিসভার সাফল্য-নিষ্ফলতা সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকিবার যে সিদ্ধান্ত গোড়াতে করিয়াছিলাম, শরৎ বাবুর গ্রেফতারে সে সংকল্প আর ঠিক রাখিতে পারিলাম না। মেম্বর-মন্ত্রী না হওয়ায় স্বভাবতঃই আমার পার্লামেন্টারি কোনও দাম ছিল না। কিন্তু হক সাহেবের কাগয 'নবযুগের' সম্পাদকের দায়িত্বের জোরে এবং হক সাহেবের দেওয়া গুরুত্বের বলে মন্ত্রীদিগকে চাওয়া-না-চাওয়া, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত উপদেশ দিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল প্রগেসিভ কোয়েলিশনকে সফল করার উপর শুধু হক সাহেবের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ভবিষ্যত নয়, সারা বাংলার, বিশেষতঃ মুসলিম বাংলার, ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এটাকে সফল করার দায়িত্ব শরৎ বাবুর অভাবে যেন আমারই একার ঘাড়ে পড়িয়াছে। একদিকে দিনের পর দিন সম্পাদকীয় লিখিয়া প্রগেসিভ কোয়েলিশনের গুরুত্ব বুঝাইতে লাগিলাম। অপর দিকে তাকে সফল করিবার ফন্দি-ফিকির মন্ত্রীদের সমঝাইতে লাগিলাম। সম্পাদকীয়গুলি যে খুবই যুক্তিপূর্ণ প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী হইতেছিল তার প্রমাণ পাইলাম শ্রদ্ধেয় সৈয়দ নওশের আলী ও বন্ধুবর সৈয়দ বদরুদ্দুজার মুখে। এঁরা দুইজনেই প্রগেসিভ কোয়েলিশন গঠনে এবং 'নবযুগ' প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ খাটিয়েছেন। কিন্তু এঁরা কেউই মন্ত্রী হন নাই। নওশের আলী সাহেবকে পরে আইন পরিষদের স্পিকার করা হইয়াছিল এবং সৈয়দ বদরুদ্দুজাকে কর্পোরেশনের মেয়র করা হইয়াছিল। এই দুই বন্ধুই আমার সম্পাদকীয়গুলি পড়িয়া-পড়িয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুক্তিতে যাঁর-তাঁর ভাষায় প্রায় একই কথা বলিয়াছিলেনঃ

'প্রগেসিভ কোয়েলিশনটা যে দেশের জন্য এমন প্রয়োজনীয় ছিল, এটার প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা সে সত্যই একটা মহৎ কাজ করিয়াছি, আপনার সম্পাদকীয় পড়িবার আগে আমরা নিজেরাই তা জানিতাম না।' আমি এই প্রশংসার জন্য তাঁদেরে ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। কিন্তু মনে মনে হাসিয়া বলিয়াছিলাম ঃ 'লিখিবার আগে আমিই কি জানিতাম?'

কিন্তু মন্ত্রীদের প্রতি আমার উপদেশ কার্যকরী হইল না। হক সাহেব হইতেই শুরু করা যাক। তিনি একটি বিবৃতিতে বলিলেন ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম বাংলার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নিয়াছেন। আর আমি নিয়াছি হিন্দু-বাংলার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব। রাজনৈতিক স্ট্যান্টের রাজা হক সাহেব। তাঁর জন্যও ছিল এটা একটি অসাধারণ স্ট্যান্ট। সত্য সত্যই এটা ঘটাইতে পারিলে বাংলার সার্বিক মুক্তি ছিল অবধারিত। তাতে শুধু বাংলার নয় ভারতের হিন্দু-মুসলিম সমস্যাও সম্পূর্ণ মিটিয়া যাইত। কাজেই ভাব-প্রবণতা হেতু আমি হক সাহেবের এই স্ট্যান্টে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। হক সাহেব ও শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে মুখে বলিলাম এবং বহু যুক্তি দিয়া 'নবযুগে' লম্বা সম্পাদকীয় লিখিলাম ঃ হক সাহেবের পশ্চিম বাংলা ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পূর্ব বাংলা সফরে বাহির হওয়া উচিৎ এবং কাল-বিলম্ব না করিয়াই এ সফর শুরু করা আবশ্যক। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে আমি আমার নিজের জিলা ময়মনসিংহ হইতেই সফর শুরু করিবার প্রস্তাব দিলাম। আমি বলিলাম ঃ 'আমি আগেই সেখানে চলিয়া যাইব এবং সমস্ত জনসভা ও নেতৃ-সম্মিলনীর ব্যবস্থা আমিই করিব। জন-সভায় কোনও গণ্ডগোল না হওয়ার দায়িত্ব আমার। কিন্তু মুসলিম-জনতার মনে আস্থা সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ইচ্ছা করিলে তা পারেন সে বিশ্বাস আমার হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি অসাধারণ সুবক্তা ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আমি তাঁর সাথে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তাঁর সম্বন্ধে হক সাহেব যা বলিয়াছেন, তা ঠিক। সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে সত্য-সত্যই তিনি অনেক কংগ্রেসী নেতার চেয়েও উদার। হিন্দু সভার নেতা হইয়াও কোনও হিন্দু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষণ করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল প্রথমে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখিয়া। অবশ্য পরবর্তী কালে তেমন মনোভাবের লোক আরও দেখিয়াছিলাম। আমার নিজের জিলাতেই এমন কয়জন হিন্দু-সভা নেতা দেখিয়াছি, যাঁরা পাকিস্তান হওয়া মাত্র অনেক কংগ্রেস নেতার মত দৌড় মারিয়া সীমান্ত পার হন নাই। বরঞ্চ পাকিস্তানের অনুগত উৎসাহী নাগরিক হিসাবে সকল কাজে মুসলমানদের সহিত সহযোগিতায় ও বন্ধুভাবে

সপরিবারে বসবাস করিতেছেন। তবে এটা ঠিক যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বেলা কিছুদিন পরেই বুঝিয়াছিলাম তাঁর উদারতা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মহত্ব, রাজনৈতিক সমস্যা ঘটিত দূরদৃষ্টি নয়।

যা হোক, আমার প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত রহিত হইল না। যতদূর বোঝা গেল, তাতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের চেয়ে হক সাহেবের দোষই এতে বেশি ছিল। এক দিকে হক সাহেব আমাকে বলিলেন ঃ 'তোমার প্রস্তাব শুনিতে ভাল ; কিন্তু ওটা কাজে কতদূর সফল করিতে পারিবা তা চিন্তা করিয়া দেখ।' অপর দিকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিতে থাকিলেনঃ 'আপনার প্রস্তাবে আমি এখনি রাযী। প্রধান মন্ত্রীকে রাযী করান।'

শেষ পর্যন্ত হক সাহেব চলিলেন নোয়াখালি। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সফরে বাহির হইয়া গেলেন মেদিনীপুর। আমার উৎসাহের জোয়ারে ভাটা পড়িল। শেষ পর্যন্ত প্রবোধ মানিলাম, বোধ হয় হক সাহেবের কথাই ঠিক। কিন্তু হিন্দু সভার সাথে হক সাহেবের মিলনের মত একটা অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ব্যাপারের 'ফলো-আপ' বা সম্পূরক হিসাবে তেমন কোনও অভিনব চমকপ্রদ কর্ম-পন্থা অথবা সফর-সূচি গৃহীত না হওয়ায় মুসলিম জনগণের মধ্যে কোথাও কোনও অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। পক্ষান্তরে শহীদ সাহেবের মত মস্তিষ্কবান সংগঠক ও অক্লান্ত পরিশ্রমী নেতা সারা পূর্ব বাংলার দীঘলি-পাথালি সকল শহর-নগরে সভা-সমিতি করিয়া বেড়ানোতে এবং অধিকাংশ মুসলিম ছাত্র মিঃ ওয়াসেকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে সক্রিয় সমর্থন দেওয়ায় নয়া হক মন্ত্রিসভা এবং ব্যক্তিগতভাবে হক সাহেব পূর্ব বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলিলেন। নাটোর ও বালুর ঘাটে পর-পর দুইটা উপ-নির্বাচনে হক সাহেবের মনোনীত প্রার্থীদ্বয়কে পরাজিত করিয়া মুসলিম লীগ প্রার্থী জয়যুক্ত হইলেন।

১৩. নয়া হক মন্ত্রিসভার স্বরূপ

মুসলিম বাংলার রাজনীতিতে এই পরিবর্তন আসিল এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে। হক সাহেব যখন মুসলিম লীগকে বাদ দিয়া কৃষক-প্রজা পার্টি সুভাষ-পন্থী কংগ্রেস ও হিন্দু-সভার সহিত প্রগেসিভ কোয়েলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। (১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর) তখন আইন পরিষদের মোট ২৫০ জন ও মুসলিম ১২৩ জন মেম্বরের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন ও আইন সভার (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) মুসলিম সদস্য ৩৭ জনের মধ্যে মাত্র ৮ জন মুসলিম লীগ দলে থাকেন। বাকী সকলেই হক সাহেবের পক্ষে থাকেন। অথচ বছর না ঘুরিতেই অনেক মেম্বর ছাত্র-জনতার চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হক সাহেবের পক্ষ ছাড়িয়া মুসলিম লীগ পক্ষে চলিয়া যান। অবশ্য

তাতে হক মন্ত্রিসভার মুসলিম সমর্থকরা কোনদিনই আইন পরিষদে বা উচ্চ পরিষদে কোথাও মাইনরিটি হন নাই।

এই নব পর্যায়ের হক মন্ত্রিসভা ১৯৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ পর্যন্ত এক বছর চার মাসের অধিক কাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই মুদ্দতে হক সাহেব মুসলিম বাংলার জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে না পারিলেও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও অনিষ্টও করেন নাই। তথাপি মুসলিম লীগ তরফের প্রচার ফলে এবং অবস্থাগতিকে মুসলিম গণ-মনে এবং তার চেয়ে বেশি মুখে-মুখে এই মন্ত্রিসভার মুদ্দতটা মুসলিম বাংলার অন্ধকার যুগ ও হক সাহেবের জীবনের কলংকময় অধ্যায়স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছে। প্রথমে নামটার কথাই ধরা যাক। মুসলিম লীগাররা এটাকে 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের দিক দিয়া এই বিশেষণ যেমন অসৌজন্যমূলক ছিল ; বাস্তব ব্যাপারেও এটা তেমনই ভিত্তিহীন ছিল। হক সাহেব শ্যামাপ্রসাদ বা হিন্দু সভার সাথে কথায় কি কাজে প্রধান মন্ত্রিত্ব বাটোয়ারা করেন নাই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া ঐ মন্ত্রিসভায় হিন্দু সভার আর কোনও মন্ত্রী ছিলেন না। তিনি যদিও অর্থ দফতরের মন্ত্রী ছিলেন, তবু অন্যান্য মন্ত্রীদের চেয়ে তাঁর কোন বিশেষ অধিকারও ছিল না। হক সাহেবের উপর তাঁর প্রভাবও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের চেয়ে বেশি ছিল না। তথাপি হক সাহেবের রাজনৈতিক দুশমনেরা বিশেষতঃ লীগ নেতারা এই মন্ত্রিসভাকে 'শ্যামা-হক-মন্ত্রিসভা' নাম দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জন-সাধারণের চোখে প্রথম দৃষ্টিতেই মন্ত্রিসভাকে অপ্রিয় করা। কিন্তু এ কাজ অমন সোজা হইত না যদি নয়া মন্ত্রিসভা পর-পর কতকগুলি ভুল না করিতেন। এই সব ভুল করিবার মূলে রহিয়াছে অবশ্য বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শী সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গি। হক সাহেব জিন্না সাহেবের সাথে ব্যক্তিগতভাবে ও মুসলিম লীগের সাথে প্রতিষ্ঠান হিসাবে যুদ্ধে নামিয়া দুর্জ্জয় সাহসের কাজ করিয়াছিলেন সারা বাংলার বিশেষতঃ মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। তাঁর গুরু সার প্রফুল্ল চন্দ্রের মত হক সাহেবও মনে করিতেন, পশ্চিমা নেতৃত্ব শুধু বাংলার রাজনীতিতেই অনধিকার-চর্চা ও অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে নাই, হিন্দু-মুসলিম মাড়ওয়ারীরা বাংলার অর্থনৈতিক জীবনেও চাপিয়া বসিয়াছে। এই উভয় রাহুর কবল হইতে বাংলাকে মুক্ত করাই ছিল হক সাহেবের প্রগেসিভ কোয়েলিশন গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। অবশ্য এ কথা সহজেই বলা যায় যে এত মহৎ উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া হক সাহেব ও-কাজ করেন নাই। অমন গঠনমূলক চিন্তা-ধারা হক সাহেবের স্বভাবের মধ্যেই ছিল না। তিনি প্রায় সব কাজই করিতেন ভাব-প্রবণতা বশে এবং সাময়িক প্রয়োজনের তাকিদে। কিন্তু এটা হক-মনীষার বিরাটত্বের

নিদর্শন যে তিনি ভাব-প্রবণতা-বশে যা করিতেন বা বলিতেন তার প্রায় সবগুলিই গুরুতর জাতীয় তাৎপর্য বহন করিত। আপাতঃদৃষ্টিতে অনেকগুলি খারাপ লাগিত, আপাতঃশ্রবণে অনেকগুলি অশালীন ও শ্রুতি-কটু শুনাইত বটে, কিন্তু পরিণাম বিচারে সেগুলি বাস্তব সত্য বলিয়া বুঝা যাইত। মুসলিম লীগের পাটনা অধিবেশনে তিনি 'সেতানা'র অর্থাৎ হিন্দু-প্রধান প্রদেশে মুসলিম-পীড়ন হইলে প্রতিশোধ স্বরূপ বাংলায় তিনি হিন্দু-পীড়ন করিবেন বলিয়া যে উক্তি করেন, যতই শ্রুতিকটু হউক, এটা ছিল এই ধরনের উক্তি। এর মধ্যে তাঁর সাধু উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। ছিল না বলিয়াই এমন বেয়াড়া অশোভন উক্তি তিনি করিয়াছিলেন এমন এক সময়ে যখন তাঁর মন্ত্রিসভার অর্ধেকই হিন্দু এবং তাঁর সমর্থক কোয়েলিশন পার্টির এক-তৃতীয়াংশ মেম্বরও হিন্দু। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে।

১৪. বাংলা-ভিত্তিক সমাধানের শেষ চেষ্টা

প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন গঠনও ছিল এমনি একটা ব্যাপার। আশু কারণ হয়ত ছিল তাঁর সাময়িক প্রয়োজন। কিন্তু ভাব-প্রবণতা-বশে তিনি এমন এক কাজ করিয়াছিলেন, বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিক হইতে যার সম্ভাবনা ছিল বিপুল। কিন্তু বরাবর যেমন, এবারও তেমনি, হিন্দু-নেতৃত্বের অদূরদর্শী সংকীর্ণতা সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করিয়া দিল। জিন্না-হক দ্বন্দ্বকে তাঁরা নিজেদের অপূর্ব সুযোগ মনে করিলেন। খাদে-পড়া বাংলার সিংহকে দিয়া তাঁরা গাধার বোঝা বওয়াইতে চাহিলেন। হক সাহেবকে দিয়া তাঁরা এমন সব কাজ করাইতে চেষ্টা করিলেন, একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইত, সেগুলি পরিণামে মুসলিম স্বার্থ বিরোধী, সুতরাং সে কাজ মুসলিম সমাজে হক সাহেবের অপ্রিয় হওয়ার কারণ হইতে পারে। এই ধরনের কাজের মধ্যে নিম্নে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ

(১) আইন পরিষদের বিবেচনাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটির আলোচনা স্থায়ীভাবে স্থগিত হইল। ঘটনাচক্রে এই সময়েই আযিযুল হকের ভাইস চ্যান্সেলারির অবসান হয়। প্রথম হক মন্ত্রিসভার আমলে ১৯৪০ সালে তিনি ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। লীগ নেতারা এই ঘটনার সদ্ব্যবহার করিলেন।

(২) ১৯৪২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করিবার জন্য জিন্না সাহেব ১১ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা পৌছিলে তাঁর উপর ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার

মুসলমানদের ফাটিয়া-পড়া রোষের মুখে তা পরিত্যক্ত হয়। ফলে জিন্না সাহেব আশাতীত ও কল্পনাতীত অভ্যর্থনা পান এবং নয়া হক মন্ত্রিসভা অনাবশ্যকভাবে একটা অপ্রিয়তা অর্জন করেন।

(৩) জাপানী বোমার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে এ. আর. পি. প্রতিষ্ঠান আগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১৯৪২ সালে ইহাকে সম্প্রসারিত করিয়া সিভিল ডিফেন্স নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত করা হইল। কলিকাতার অধিবাসীরা শতকরা আশি জনই হিন্দু, এই যুক্তিতে এক-ধারসে বহু হিন্দুকে এই প্রতিষ্ঠানে নূতনভাবে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল। মুসলিম লীগ-নেতারা এবং তাঁদের মুখপত্র 'আজাদ' এর বিরাট সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তাঁরা এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে দস্তুরমত একটি প্রাদেশিক সম্মিলনী করিয়া বসিলেন। হক সাহেবের নয়া মন্ত্রিসভা মুসলিম সমাজে আরও অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন।

(৪) ১৯৪২ সালের ২৪শে অক্টোবর ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ শহরের জামে মসজিদে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও তার ফলে কয়েক জনের মৃত্যু। মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাজনার অধিকার লইয়া ষোল বছর আগে ১৯২৬ সালে বরিশালের কুলকাঠি থানার পোনাবালিয়ার পর গুলি বর্ষণের মত ঘোরতর এটাই দ্বিতীয় ঘটনা। কিন্তু সেটা ছিল মসজিদের সামনে ; আর এটা হইল মসজিদের ভিতরে। সেটা ছিল দ্বৈত শাসনে ইংরাজ হোম মিনিস্টারের রাজত্বে শ্বেতাঙ্গ জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্ল্যান্ডির আমলে, আর এটা হইল স্বায়ত্তশাসনে হক সাহেবের হোম মিনিস্টারির রাজত্বে হিন্দু জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বানার্জির আমলে। মুসলমানরা স্বভাবতঃই খুবই উত্তেজিত হইল। বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করিল তারা। কিন্তু সরকার হুকুম দিলেন জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়া বিভাগীয় তদন্ত করিবার। জিলা মেজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ বানার্জী। তাঁর উপর নানা কারণে জিলার মুসলমানরা অসন্তুষ্ট ছিল। তার উপর তাদের সন্দেহ ছিল মিঃ বানার্জীর জানামতেই ঐগুলি চলিয়াছিল। সুতরাং প্রতিবাদে সারা জিলার এবং ক্রমে সারা বাংলার মুসলমানরা ক্ষেপিয়া গেল। কিশোরগঞ্জের মুসলমানরা সংগে সংগে মসজিদের নামকরণ করিল শহিদী মসজিদ। ঘটনাচক্রে এর কিছুদিন আগেই 'নবযুগ' হইতে আমার চাকুরি গিয়াছিল। সে ব্যাপারেও আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে মুসলিম মন্ত্রীরা, এমন কি স্বয়ং হক সাহেবও, ক্রমে অসহায় হইয়া পড়িতেছেন। নয়া কোয়েলিশনের সাফল্যের সম্ভাবনা ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে।

এইভাবে হক সাহেবের প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন মুসলিম সমাজে চরম অপ্রিয়তার পাত্র হইয়া উঠিল। ওদিকে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন জোরদার হওয়ার

সাথে-সাথে ভারত সরকারের দমন-নীতিও কঠোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে 'আযাদ হিন্দ্ ফৌজ' বর্মা ছাড়াইয়া মনিপুরের কোহিমা শহর ধরে-ধরে। কাজেই বাংলার জনগণ সাধারণভাবে, এবং হিন্দুরা বিশেষভাবে, ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবে উদ্দীপ্ত। প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের হুকুম-বরদার মাত্র। শাসনতন্ত্রে যা কিছু স্বায়ত্তশাসনাধিকারের বিধান ছিল, যুদ্ধের বিশেষ অবস্থায় তার সবই আপাততঃ বাতিল। সুতরাং হক মন্ত্রিসভা কেন, কোনও মন্ত্রিসভার পক্ষেই তখন জনপ্রিয়তা রক্ষা সম্ভব ছিল না। এই সময় মেদিনীপুরে কংগ্রেস আন্দোলনকারীদের উপর অমানুষিক পুলিশী যুলুম হইল। প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব গভর্ণর জন হার্বার্টকে দুঃসাহসী কড়া চিঠি লিখিলেন। কিন্তু কিছু হইল না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এই ফাঁকে পদত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বা আর কেউ পদত্যাগ করিলেন না।

এর পর আরও মাস ছয়েক হক সাহেবের মন্ত্রিত্ব টিকিয়া থাকিল। কিন্তু ওটা শুধু গদিতে টিকিয়া থাকা মাত্র। যুদ্ধাবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা খাটাইবার বিশেষ সুযোগ ছিল না ধরিয়া নিলেও প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশনের আসল যে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিয়া বাংলার হিন্দু-মুসলিমে একটা স্থায়ী ঐক্য-বন্ধন সৃষ্টি করা, সে দিকেও নেতারা কিছু করিলেন না। মন্ত্রিত্ব রক্ষার কাজে সবাই এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে দেশের বৃহত্তর সমস্যার কথা ভাবিবার বোধ হয় তাঁদের সময়ই ছিল না।

১৫. নাযিম-মন্ত্রিসভা

এমনি অবস্থায় ১৯৪৩ সালের ২১শে মার্চ তারিখে দ্বিতীয় হক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। তিন-চার দিন মধ্যেই ৩রা এপ্রিল নাযিমুদ্দিন সাহেব মন্ত্রিসভা গঠন করেন। হক সাহেবের মত জনপ্রিয় নেতার নেতৃত্বের ও আইন পরিষদে নিশ্চিত মেজরিটির অভাব পূরণের আশায় মুসলিম লীগ নেতারা হক সাহেবের আমলের মন্ত্রি-সংখ্যা ১১ হইতে বাড়াইয়া ১২ করিলেন এবং হিন্দু মন্ত্রীর সংখ্যা ৫ হইতে ৬ করিলেন। ইউরোপীয় মেম্বররা বরাবরের মতই মন্ত্রিসভা সমর্থন করিয়া গেলেন। তবু নাযিম মন্ত্রিসভা আইন পরিষদে কোন কাজ করিতে পারিলেন না। কারণ নাযিম মন্ত্রিসভার আমলেই ১৯৪৩ সালের আগস্ট-সেপ্টম্বরে (বাংলা ১৩৫০ সালের ভাদ্র-আশ্বিনে) বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ধ্বংসকারী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। অনেকের মতে এই

দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তুরের মন্বন্তরের' (১২৭৬ বাংলা সাল) চেয়েও ব্যাপক ও দুর্বিষহ হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতার ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতার সময় আমরা প্রধানতঃ যান-বাহনের অভাবে কলিকাতার বাহিরে যাইতে পারি নাই। কাজেই মফস্বলের দুর্ভিক্ষের দুর্বিষহ চিত্র আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। শুধু মফস্বলে যাইতে পারি নাই, তাও নয়। শহরের ভিতরেও আমরা পায় হাঁটিয়াই কাজ-কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তা করিতে গিয়া কলিকাতা শহরের রাস্তা-ঘাটে সেদিন যা দেখিয়াছিলাম তাই এতদিন পরেও বিষম যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নের মতই স্মৃতি-পথে উদিত হয় এবং গা শিহরিয়া উঠে। অভুক্ত নিরন্ন রুগ্ন অস্থি-চর্মসার উলংগ নর-নারীর মিছিল আমরা শুধু এই সময়েই দেখিয়াছি। ডাস্টবিনে খাদ্যের তালাশে মানুষে-কুত্তায় কাড়াকাড়ি করিতে তখনই আমরা প্রথম দেখিয়াছি। অভুক্ত উলংগ কংকালসমূহের এই মিছিলের যেন আর শেষ নাই। কোথা হইতে এত লোক আসিতেছে ? খবরের কাগযে পড়িলাম, শস্য-ভাণ্ডার পূর্ব বাংলার পল্লী-গ্রাম হইতেই এই মিছিল আসিতেছে বেশি।

১৬. আকাল

বিশ্ব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা হৃদয়-বিদারী এই দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব ও অপরাধ বর্তে গিয়া নাযিম মন্ত্রিসভার ঘাড়ে। পড়িবেই ত। তাঁদের আমলেই ত এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। বদনাম তাঁদের সইতেই হইবে।

কিন্তু সত্য কথা এই যে দুর্ভিক্ষের কারণ ঘটিয়াছিল এই মন্ত্রিসভার গদিতে বসার আগেই। এই যুক্তিতে পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা মানে দ্বিতীয় পর্যায়ের হক-মন্ত্রিসভাকেই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে এই দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব বন্টনের আপ্রাণ চেষ্টা হয় উভয় পক্ষ হইতে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার-সম্পাদক হিসাবে আমি নিজে 'আকাল আনিল কারা ?' নামে পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম। তাতে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া হক-মন্ত্রিসভাকেই অপরাধী প্রমাণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সত্য কথা এই যে এসব ছিল নির্বাচনের প্রাক্কালে পার্টি-প্রপ্যাগেণ্ডা। প্রকৃতপক্ষে ঐ আকালের জন্য এককভাবে দুই মন্ত্রিসভার কেউই দায়ী ছিলেন না। উভয় মন্ত্রিসভাই অংশতঃ দায়ী ছিলেন। আসলে আকালের কারণ ঘটাইয়াছিলেন ভারত-সরকার। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অন্যতম পন্থা হিসাবে তাঁরা বাংলার চাউল যতটা পারিলেন 'সংগ্রহ' করিয়া বাংলার বাইরে সুদূর জব্বলপুরে গুদাম-জাত

করিলেন। জাপানীদের হাত হইতে দেশী যানবাহন সরাইবার মতলবে 'ডিনায়েল পলিসি' হিসাবে নদী-মাতৃক পূর্ব-বাংলার সমস্ত নৌকা ধ্বংস করিয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য অচল করিয়া দিলেন। চরম প্রয়োজনের দিনেও ভারত সরকার বাংলা-হইতে-নেওয়া চাউলগুলিও ফেরত দিলেন না। বাংলা সরকার (নাযিম-মন্ত্রিসভা) যখন বিহার হইতে উদ্বৃত্ত চাউল খরিদ করিতে চাইলেন, তখন বাংলাসহ অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু-নেতারা চাউল সরবরাহের প্রতিবাদ করিলেন। কেউ-কেউ স্পষ্টই বলিলেন, খাদ্য-ঘাটতির বাংলাদেশ কেমন করিয়া পাকিস্তান দাবি করে, তা শিখাইতে হইবে। এগুলি আকালের বাইরের কারণ। এগুলির জন্য হক-সরকার বা নাযিম-সরকার কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

১৭. আকালের দায়িত্ব

কিন্তু যে জন্য তাঁদেরে দোষ দেওয়া যায়, সেটা ছিল তাঁদের দায়িত্ব-চ্যুতি ও কর্তব্য-ত্রুটি। নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকার হিসাবে যা তাঁদের কর্তব্য ছিল তা তাঁরা করেন নাই। তাঁরা সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক সরকারের মত কাজ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁরা অবস্থা জানিয়াও নিজেরা সাবধান হন নাই। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণকে সাবধান করেন নাই। বরঞ্চ প্রকৃত অবস্থা জনসাধারণ হইতে গোপন করিয়াছেন। খাদ্যাভাব অনিবার্য ও আসন্ন, তবু বলিয়াছেন কোনও অভাব নাই। অনাহারে লোক মরিতে শুরু করিয়াছে, তবু বলিয়াছেন কেউ মরে নাই। যারা মরিয়াছে তারা খাদ্যের অভাবে মরে নাই। অতি ভোজনের দরুন পেটের পীড়ায় মরিয়াছে ইত্যাদি।

দায়িত্বহীন আমলাতান্ত্রিক সরকারের এটা চিরন্তন অভ্যাস। দেশবাসী এই সরকারী অভ্যাসের সাথে সুপরিচিত। পাকিস্তানেও আজো চলিতেছে। গণতন্ত্রের অভাবই এর কারণ। এ অবস্থায় জনসাধারণের প্রতি যেমন সরকারের দায়িত্ব-বোধ নাই; সরকারের প্রতিও তেমনি জনসাধারণের কোনও দায়িত্ব-বোধ নাই। পাঠকগণ সাম্প্রতিক এমন ঘটনার কথা জানেন। বন্যা বা ঘূর্ণি-ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ ঘোষণা করিতে গিয়া প্রথমে সরকার পক্ষ যেখানে বলিয়াছেন মাত্র চার জন মারা গিয়াছে, সেখানে জনসাধারণের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে চল্লিশ হাজার মারা গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অনেক হিসাব-কিতাব করিয়া সরকার স্বীকার করিয়াছেন চার হাজার মারা গিয়াছে। জনসাধারণও যেন সেই সংখ্যা মানিয়া লইয়াছে। এ যেন আগের দিনের চকবাজারে জিনিস খরিদ করা। দোকানদার হাকিলেন পাঁচ টাকা। খরিদ্দার বলিলেন চার আনা। দামাদামিতে শেষ পর্যন্ত দশ আনায় খরিদ-বিক্রি হইল। গণতন্ত্রহীন আমাদের দেশের জনগণ ও

সরকারের সম্বন্ধ আজও তাই। জনগণ যত বেশি ক্ষতি দেখাইয়া যত বেশি চাহিয়া যত বেশি আদায় করিতে পারে তাই লাভ। আর সরকারও ক্ষতি যত কমাইয়া সাহায্য যত কম দিয়া পারেন ততই লাভ। যুদ্ধাবস্থার দরুন তৎকালীন সরকার দুইটি নির্বাচিত মন্ত্রিসভা হইয়াও কার্যতঃ ছিলেন আমলাতান্ত্রিক। মন্ত্রীদের অপরাধ ছিল এই যে জনগণের কোন কাজে লাগেন নাই তবু তাঁরা গদি আঁকড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।

কথায় আছে চরম দুর্দিনে মানুষের অজ্ঞাত প্রতিভার সন্ধান হয়। পঞ্চাশ সালের ঐ নযিরহীন আকালে মুসলিম বাংলা নিজের মধ্যে কিছু-কিছু মানব-সেবীর সন্ধান পাইয়াছিল। এঁদের মধ্যে শহীদ সুহরাওয়ার্দীর নাম সকলের আগে নিতে হয়। অত অভাবের মধ্যেও ধৈর্য ও সাহসে বুকে বাঁধিয়া গ্রুয়েল কিচেন ও লংগরখানা খুলিয়া তিনি কিভাবে আর্ত ও ক্ষুধার্তের সেবা করিয়াছিলেন, সেগুলি পরিদর্শনের জন্য আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দিনরাত চড়কির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সেটা ছিল দেখিবার মত দৃশ্য।

১৮. পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রূপায়ণ

আলীপুরে ওকালতি শুরু করিয়াছি। নূতন জায়গায় ব্যবসা শুরু করিয়াছি। সুতরাং মওক্কেল কম, অবসর প্রচুর। বিকালটা একদম ফ্রি। বাসার কাছেই 'আজাদ' আফিস। 'আজাদের' সম্পাদকীয় ও ম্যানেজারীয় বিভাগের প্রায় সকলেই আমার বন্ধু-বান্ধব। কাজেই প্রায় সেখানেই আড্ডা। দুনিয়ার সমস্ত সমস্যার আলোচনা এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাধানও হয় সংবাদপত্র-আফিসে। 'আজাদ' আফিসেও তাই হইত। আমি ছাড়া আরও লোক জুটিতেন। এইসব বৈঠকে আমি যেমন পারিলাম বন্ধুদেরে ফ্যাসি-বিরোধী করিতে। বন্ধুরাও তেমনি পারিলেন আমাকে পাকিস্তানবাদী করিতে। বন্ধুদের যুক্তি-তর্ক ছাড়া ডাঃ আম্বেদকারের ইংরাজী 'পাকিস্তান' ও বন্ধুবর মুজিবর রহমানের বাংলা 'পাকিস্তান' এই দুইখানা বই আমার মনে বিপুল ভাবান্তর আনয়ন করিল। আমি পাকিস্তান-বাদী হইয়া গেলাম। কিন্তু এ সম্পর্কে দুইটা বিচার্য বিষয় থাকিল। এক, পাকিস্তান দাবিকে দেশ-বিদেশের সকল চিন্তুকের কাছে গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে উহাকে একটা ইনটেলেকচুয়াল রূপ দিতে হইবে। ইতিহাস, ভুগোল ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিচারে উহাকে যুক্তিসহ ও প্র্যাকটিক্যাল করিতে হইবে। দুই, শুধু ধর্মের ডাকে পাকিস্তান আসিলে মোল্লাদের প্রাধান্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মোল্লাদের প্রভাবে মুসলমানরা কেবল পিছন ফিরিয়া রাস্তা চলে। তাই জীবন-পথে মুসলমানরা এত বেশি

হোচট খাইতেছে। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের নামে রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাকে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে। এই দুই টা সম্ভাবনাকে ঠেকাইতে হইবে। এই আলোচনার ফলে প্রথম উদ্দেশ্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠন করা সাব্যস্ত হইল। দ্বিতীয়টা সম্বন্ধে বন্ধুরা আমাকে আশ্বাস দিলেন যে জিন্না সাহেবের মত বাস্তব-জ্ঞানী মডার্ন নেতার নেতৃত্বে যে রাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাতে মোল্লাদের প্রাধান্য থাকিতে পারে না। এই প্রসংগে বন্ধুরা খবরের কাগয খুঁজিয়া সাম্প্রতিক একটা ঘটনার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মাহমুদাবাদের তরুণ রাজা সাহেব এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে পাকিস্তানে কোরআনের আইন অনুসারে শাসন-কার্য চলিবে। জিন্না সাহেব পরদিনই তার প্রতিবাদে খবরের কাগযে বিবৃতি দিয়া রাজা সাহেবকে ধমকাইয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, পাকিস্তান একটি প্রগতিবাদী মডার্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে। আর জমিদার-ধনিকদের প্রাধান্য সম্বন্ধে বন্ধুরা বলিলেন যে পাকিস্তান সংগ্রামেই যদি জনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে সে সম্ভাবনা একেবারেই অংকুরে বিনষ্ট হইতে পারে। এ অবস্থায় বাংলার কৃষক-প্রজা নেতা-কর্মীরা যদি সদল-বলে মুসলিম লীগে, সুতরাং পাকিস্তান-সংগ্রামে, শামিল হইয়া যান, তবে এদিককার বিপদ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যাইবে।

১৯. সহকর্মীদের সাথে শেষ আলোচনা

কথাটা আমার খুব পছন্দ হইল। কৃষক-প্রজা নেতাদের মধ্যে যাঁদেরে আমি কলিতাকায় উপস্থিত পাইলাম, তাঁদের সকলকে আমি আমার বাসায় দাওয়াত করিলাম। মৌঃ আশরাফুদ্দিন চৌধুরী, মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ, মিঃ আবু হোসেন সরকার, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, নবাবযাদা হাসান আলী, মৌঃ গিয়াসুদ্দিন আহমদ ও চৌধুরী নূরুল ইসলাম প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ আমার বাসায় সমবেত হইলেন। অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। কিন্তু আমার মতবাদ ও বিশ্লেষণ তাঁরা গ্রহণ করিলেন না। তবে আলোচনা ভাংগিয়াও দিলেন না। পর-পর কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা চলিল। তৎকালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন খুবই জোরদার হইয়াছে। ইউরোপে হিটলারের জয়-জয়কার। মিত্র পক্ষসহ ইংরাজরা প্রায় ফতুর। এশিয়ায় জাপান ইংগ-মার্কিন শক্তিকে মারের পর মার দিতেছে। সুভাষ বাবুর নেতৃত্বে 'আযাদ-হিন্দ্-ফৌজ' কোহিমায় পৌছিয়াছে। এমন পরিবেশে মুসলিম লীগের সহিত মার্জ করার প্রয়োজনীয়তা সকলের কাছেই খুব ক্ষীণ মনে হইল। আমাদের আলোচনা সভা

ভাগিয়া গেল। আমার এদিককার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আমি খবরের কাগযে বিবৃতি দিয়া কৃষক-প্রজা-কর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিলাম। আমার এই সব বিবৃতি মুসলিম লীগের মুখপত্র 'আজাদ' ছাড়া আর কেউ ছাপিলেন না। ফলে বন্ধুরা প্রায় সকলেই ধরিয়া নিলেন আমি মুসলিম লীগে যোগদান করিয়া ফেলিয়াছি। অতঃপর কৃষক-প্রজা-কর্মীদের কাছে আমার উপদেশের স্বভাবতঃই কোন মূল্য থাকিল না।

২০. রেনেসাঁ সোসাইটিতে যোগদান

ইতিমধ্যে আজাদ-সম্পাদক মৌঃ আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রভৃতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রেনেসাঁ সোসাইটির মতবাদে আমি আকৃষ্ট হইলাম। শামসুদ্দিন ও আমি একই ম্যানসনের পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকিতাম। রাতদিন আমাদের মধ্যে রাজনীতিক বিবর্তনের ও যুদ্ধ-পরিস্থিতির আলোচনা হইত। আমাকে বুঝাইবার জন্য শামসুদ্দিন প্রায়ই তাঁর সহকর্মী মুজিবুর রহমান খাঁ ও হবিবুল্লাহ বাহারকে সংগে নিয়া আসিতেন। দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া গরম আলোচনা হইত। ফলে আমি রেনেসাঁ সোসাইটিতে যোগদান করিলাম। এঁরা আমার প্রাপ্যাধিক মর্যাদা দিলেন। আমাকে মূল সভাপতি নির্বাচন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর আয়োজন করিলেন।

১৯৪৪ সালের ৫ই মে তারিখে ইসলামিয়া কলেজের মিলনায়তনে বিপুল উৎসাহ-উদ্যমের মধ্যে এই সম্মিলনী হইল। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্মিলনী উদ্বোধন করিলেন। আমি হইলাম মূল সভাপতি। শামসুদ্দিন হইলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। অধ্যাপক ডাঃ সুশোভন সরকার, ডাঃ সাদেক, ডাঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক আদমুদ্দিন, মৌঃ আবদুল মওদুদ, মৌঃ হবিবুল্লাহ বাহার, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতি বহু মনীষী বিভিন্ন শাখার সভাপতি হইলেন। কলিকাতার বহু লেখক সাহিত্যিক ছাড়াও মুসলিম বাংলার রাজনীতিক নেতাদের প্রায় সকলেই এই সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন। নেতাদের মধ্যে জনাব এ কে ফযলুল হক, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিন, শহীদ সুহরাওয়ার্দী, ডাঃ মেজর সার হাসান সুহরাওয়ার্দী, মৌঃ আবুল হাশিম, মৌঃ তমিযুদ্দিন খাঁ এবং নাযিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র-তরুণরা বিশালাকার হলটি একেবারে জম-জমাট করিয়াছিল।

আমার অভিভাষণটা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল। উহার কয়েক হাজার কপি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল সম্মিলনীতেই। আমার অভিভাষণে দুইটা মূল কথা বলিয়াছিলাম যা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মতের সংগে বেমিল হইয়াছিল। বোধ হয় সেই জন্যই নূতনও লাগিয়াছিল। প্রথমতঃ আমি বলিয়াছিলাম, পাকিস্তান দাবিটা প্রধানতঃ কালচারেল অটনমির দাবি। বলিয়াছিলাম, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়েও কালচারেল অটনমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক হইতে পাকিস্তান দাবি শুধু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবি নয় এটা গোটা ভারতের কালচারেল মাইনরিটির জাতীয় দাবি। দ্বিতীয় কথা আমি বলিয়াছিলাম যে ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দু হইতে আলাদা জাত ত বটেই বাংলার মুসলমানরাও পশ্চিমা মুসলমানদের হইতে পৃথক জাত। বলিয়াছিলাম, শুধুমাত্র ধর্ম জাতীয়তার বুনিয়াদ হইতে পারে না। আমি আরব পারস্য তুরস্কের মুসলমানদের ও ইউরোপীয় খৃষ্টানদের দেশগত জাতীয়তার নযির দিয়াছিলাম। কথাটা মুসলিম লীগের তৎকালীন মতবাদের সংগে বেসুরা শুনাইলেও সমবেত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কেউ প্রতিবাদ করেন নাই। কারণ কথাটা ছিল মূলতঃ সত্য।

মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি ধর্ম-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে সব মুসলিম ও হিন্দু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধতা করিতেছিলেন আমার অভিভাষণ তাঁদের অনেকেরই দৃষ্টি ভংগিতে খানিকটা পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইল। আমার অনেক শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে যাঁরা নিখিল ভারতীয় জাতীয়তার মোকাবিলায় বাংগালী জাতীয়তার দাবি তোলার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরা এই মত প্রচারেও উদ্যোগী হইলেন। কমরেড রায় ব্যতীত কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড বংকিম মুখার্জী, কমরেড পি. সি. যোশী প্রভৃতি অনেকেই পাকিস্তান দাবিকে ন্যাশনাল মাইনরিটির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার বলিয়া মানিয়া নিলেন।

কৃষক-প্রজা নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনায় সুফল পাওয়া না গেলেও আজাদে প্রকাশিত আমার আবেদনের সুফল হইল। বিভিন্ন জিলার কৃষক-প্রজা কর্মীদের অনেকেই আমার মত সমর্থন করিয়া এবং কেহ কেহ আরো কতিপয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হইলাম সমিতির প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেবের পত্র পাইয়া। তিনি আমার সাথে সম্পূর্ণ একমত। এমন কি আমার লেখা পড়িবার আগে

হইতেই তিনি এই লাইনে চিন্তা করিতেছিলেন। আমাকে এ ব্যাপারে আরও অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহ দিলেন।

২১. শহীদ সাহেবের চেষ্টা

আমি কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ও কৃষক-প্রজা সমিতিকে সে প্লাটফর্মের অন্যতম শ্রেণী প্রতিষ্ঠান বলিতাম। এই কথার সূত্র ধরিয়া শহীদ সাহেব কৃষক-প্রজা সমিতিকে কংগ্রেসের বদলে মুসলিম লীগের শ্রেণী-শাখা হইতে উপদেশ প্রদান করেন। কিছুদিন আলোচনার পর তিনি লীগ-কৃষক-প্রজা যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব দেন । আমি আনন্দের সাথে এই প্রস্তাব মূলনীতি হিসাবে সমর্থন করি। কৃষক-প্রজা সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য মিঃ নির্মল কুমার ঘোষ শহীদ সাহেবের বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। তিনি আমার ও আমার সহকর্মীদেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে শহীদ সাহেবের সহিত কৃষক-প্রজা নেতাদের আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবের প্রস্তাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল ঃ প্রাদেশিক আইন পরিষদের ও আইনসভার মোট মুসলিম আসনের শতকরা ৪০টি আসনে কৃষক-প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী বলিয়া গণ্য করা হইবে। কৃষক-প্রজা পার্টির এম. এল. এ.-রা মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির ভিতরে স্বতন্ত্র গ্রুপ হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন ; কিন্তু মুসলিম লীগ পার্টির ডিসিপ্লিন মানিয়া চলিতে হইবে।

প্রস্তাবটি আমি গ্রহণ করিলাম এবং আমার পূর্বোক্ত সহকর্মীদের দিয়া ইহা গ্রহণ করাইবার জন্য আবার আলোচনা সভার আয়োজন করিলাম। নির্মল বাবু এ ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টাচরিত্র করিলেন। কৃষক-প্রজার স্বার্থ এতে যথেষ্ট রক্ষিত হইবে বলিয়া নিজেও বুঝিলাম, শহীদ সাহেবও আমাকে বুঝাইলেন। তিনি আমাকে দেখাইলেন, কৃষক-প্রজা পার্টির মনোনীত শতকরা ৪০টি সদস্য ছাড়াও মুসলিম লীগের মনোনীত শতকরা ৬০ জনের মধ্যেও অর্ধেকের বেশি কৃষক-প্রজা শ্রেণীর লোক থাকিবেন। কৃষক-প্রজার স্বার্থের ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চয়ই কৃষক-প্রজা সমিতির কর্ম-পন্থার সমর্থক হইবেন। ফলে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির মধ্যে কৃষক-প্রজা প্রতিনিধিদের স্বচ্ছন্দ মেজরিটি হইবে। এইভাবে বাংলার আইন পরিষদের এলাকার কার্য-কলাপে কৃষক-প্রজার স্বার্থ রক্ষিত ত হইবেই, গোটা পাকিস্তান-আন্দোলনেও

কৃষক-প্রজার দাবি প্রতিফলিত হইবে। শহীদ সাহেবের এই প্রতিশ্রুতিতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলিম লীগকে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করিবার পদক্ষেপ রূপে জমিদারি উচ্ছেদকে মুসলিম লীগের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলে এই প্রস্তাব পাস হইয়াছিল আমার উপদেশে এবং বন্ধুবর জনাব নূরুল আমিন ও জনাব গিয়াসুদ্দিন পাঠানের আন্তরিক ও অবিশ্রান্ত চেষ্টায়। প্রধানতঃ ময়মনসিংহ জেলার প্রতিনিধিদের দৃঢ় মনোভাবে ও সমবেত চেষ্টায় এটা সম্ভব হইয়াছিল। বিনা-ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের প্রস্তাবও কাউন্সিলে তুলা হইয়াছিল। এটাও ময়মনসিংহের প্রতিনিধিরাই করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়-বড় কতিপয় নেতার প্রবল বিরুদ্ধতার ফলে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

২২. মুসলিম লীগে যোগদান

যাহোক শেষ পর্যন্ত আমার সহকর্মী বন্ধুরা এই প্রস্তাবে রাযী হন নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতি মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী শহীদ সাহেবের প্রস্তাব মানিয়া লইতে ব্যক্তিগতভাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু একথাও লিখিয়াছিলেন যে তিনি নিজে আইন সভার মেম্বর না হওয়ায় এ বিষয়ে কোনও নির্দেশ দিবার যোগ্যতা রাখেন না ; এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মত দিবার তাঁরাই অধিকারী। কৃষক-প্রজা-পার্টির এম. এল. এ. গণ তাঁদের চূড়ান্ত মতে শহীদ সাহেবের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। অথচ কৃষক-প্রজা সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক দেওয়াও হইল না। অবশেষে অগত্যা আমি মুসলিম লীগে যোগদান করিয়া খবরের কাগযে বিবৃতি দিলাম। সমিতির সভাপতি মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেব এই সিদ্ধান্তের জন্য আমাকে মোবারকবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন। কয়েকদিন পরে তিনিও মুসলিম লীগে যোগদান করিলেন। কৃষক-প্রজা সমিতির নেতা ও কর্মীদের মধ্যে স্বভাবতঃই বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দিল। ব্যক্তিগতভাবে যাঁর যেমন ও যখন সুবিধা হইল, কৃষক-প্রজা নেতারা তেমন ও তখন মুসলিম লীগে যোগদান করিতে লাগিলেন। যাঁরা কংগ্রেসের দিকে হেলিয়াছিলেন, তাঁরা পুরাপুরি ও খোলাখুলি কংগ্রেসে ঢুকিয়া পড়িলেন। অবশেষে নবাবযাদা হাসান আলী এবং আরও পরে সমিতির সেক্রেটারি মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি মৌঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী এবং মৌঃ গিয়াসুদ্দিন আহমদ এম. এল. এ. ও মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। এক নবাবযাদা হাসান আলী

ছাড়া আর সকলে আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগের টিকিট চাহিয়া এই বদনামের ভাগী হইলেন যে তাঁরা টিকিটের জন্যই মুসলিম লীগে যোগ দিয়াছেন। এক শামসুদ্দিন সাহেব ছাড়া আর কেউ লীগের টিকিট পান নাই। এইরূপে বিচ্ছিন্নভাবে কৃষক-প্রজা নেতারা কেউ কংগ্রেসে এবং বেশিরভাগ মুসলিম লীগে যোগদান করায় কৃষক-প্রজা সমিতি কার্যতঃ লোপ পাইল। অথচ কোন প্রতিষ্ঠানেই তাঁরা নিজেদের অস্তিত্বের কোন স্ট্যাম্প বা ছাপ রাখিতে পারিলেন না।

এই কারণে আজও অনেক সময় আমার মনে হয়, যথাসময়ে সুহরাওয়ার্দী-ফরমূলা গ্রহণ করিলে কৃষক-প্রজা সমিতির ভাল ত হইতই, মুসলিম লীগ রাজনীতিতে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাজনীতিতেও অধিকতর সুস্থতা দেখা যাইত।

চৌদ্দই অধ্যায়

পাকিস্তান হাসিল

১. পার্লামেন্টারিয়ান হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

আমি কলেজ জীবন হইতেই সক্রিয় রাজনীতি করিতেছিলাম বটে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-প্রভাবে কতকটা এবং নিজের মেযাজ-মর্যির ফলে কতকটা, আমি কোনও নির্বাচনে প্রার্থী হই নাই। কিন্তু মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার পর তৎকালীন সেক্রেটারি বন্ধুবর আবুল হাশিমের প্রভাবে আমি ১৯৪৬ সালে একবার প্রাদেশিক আইন পরিষদের এবং দুইবার কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের (গণ-পরিষদ) মেম্বর হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তিনবারই আমি নিরাশ হইয়াছিলাম। (১) প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আমাকে প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দান করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড আমার নাম বাতিল করিয়া আজাদ-সম্পাদক মৌঃ আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে মনোনীত করেন। (২) আমি ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে গণ-পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হইলাম। গণ-পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লী যাওয়ার জন্য তৈয়ারও হইয়াছিলাম। এমন সময় জিন্না সাহেব গণ-পরিষদ বয়কট করার নির্দেশ দিলেন। আমার মেম্বরগিরি করা আর হইল না। (৩) এর পরে পাকিস্তানের জন্য স্বতন্ত্র গণ-পরিষদ গঠনের সময় মুসলিম লীগ আবার আমাকে মনোনীত করিলেন। বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম মেম্বরদের ভোটে গণ-পরিষদের মুসলিম মেম্বর নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল। সিংগল ট্র্যান্সফারেবল পদ্ধতিতে এই ভোট দিবার নিয়ম ছিল। যে তিনজন মুসলিম মেম্বর আমার ভাগে পড়িয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন মুসলিম লীগের 'হুইপ' অমান্য করিয়া আমার স্থলে অন্য লোককে ভোট দিয়াছিলেন। ফলে আমি নির্বাচিত হইতে পারি নাই। এইভাবে তিন-তিন বার চেষ্টা করিয়াও আমি মুসলিম লীগের সেবক হিসাবে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক আইন পরিষদের মেম্বর হইতে পারি নাই। বুঝিলাম মুসলিম লীগের লোক হিসাবে মেম্বর হওয়া আমার বরাতেই ছিল না।

২. লীগের প্রচার সম্পাদক

বংগীয় আইন পরিষদের আসনে প্রাদেশিক লীগের-দেওয়া আমার নমিনেশন কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড বাতিল করিলেও আমি তাতে মোটেই মনক্ষুণ্ন হইলাম না। বরঞ্চ মুসলিম-লীগের পাবলিসিটি সেক্রেটারি হিসাবে আমার সমস্ত শক্তি লীগ প্রার্থীদের জয়লাভের জন্য নিয়োজিত করিলাম। এ ছাড়া আমি প্রচারের ধারাই বদলাইয়া দিলাম। বন্ধুদের আশ্বাস সত্ত্বেও আমার মনের এই সন্দেহের ভাব দূর হয় নাই যে ধর্মীয় জাতিত্বের শ্লোগানে যে রাষ্ট্র দাবি করা হইতেছে, তাতে কৃষক-শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্বার্থ নিরাপদ নয়। তাই আমি ইলেকশনী শ্লোগান ও যিকিরকে বিবৃতি-ইশতাহারে যথাসম্ভব গণমুখী করিতে লাগিলাম। আমার এখতিয়ার এই পর্যন্তই ছিল। কারণ মুসলিম লীগের ইলেকশন মেনিফেস্টো লিখিবার ভার আমার উপর ছিল না ; তাতে হস্তক্ষেপ করিবারও আমার কোনও ক্ষমতা ছিল না। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তিন বছর আগে গৃহিত-জমিদারি-উচ্ছেদের প্রস্তাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না-দেওয়া সম্পর্কে কোনও কথা ছিল না। এই নীরবতার পূর্ণ সুযোগ আমি গ্রহণ করিলাম। 'লাংগল যার মাটি তার' 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ চাই' 'কায়েমী স্বার্থের ধ্বংস চাই' 'শ্রমিক যে মালিক সে', 'জনগণের পাকিস্তান' 'কৃষক-শ্রমিকের পাকিস্তান' প্রভৃতি শ্লোগান তৈরি করিয়া পোস্টার প্ল্যাকার্ড ছাপাইয়া বস্তায়-বস্তায় মফস্বলে পাঠাইতে লাগিলাম। বিশেষ করিয়া আমার নিজের জিলা ময়মনসিংহে এটা করা অতি সহজ ছিল। এ জিলায়-কৃষক-প্রজা আন্দোলন জোরদার ছিল। এখানকার ছাত্র-তরুণরা প্রায় সকলেই জমিদারি-ধনতন্ত্র-বিরোধী ছিল। এইসব ছাত্র-তরুণের দ্বারা গঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনীর শ্লোগান-যিকির ও পোস্টার প্ল্যাকার্ডে স্বভাবতই এইসব দাবি সহজেই স্থান পাইল।

৩. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ

এছাড়া আরেকটা বড় সুযোগ মিলিল ময়মনসিংহ জিলার গফরগাঁও নির্বাচনী এলাকায় আমাদের প্রার্থী ছিলেন খান বাহাদুর গিয়াসুদ্দিন পাঠান। পাঠান সাহেব জিলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি। তাঁর সাফল্যের উপর মুসলিম লীগের মান ইয্যত নির্ভর করিতেছিল। পাঠান সাহেব বিচক্ষণ প্রগতিবাদী রাজনীতিজ্ঞ ও ভাল অর্গ্যানাইযার হওয়া সত্ত্বেও নিজের এলাকায় তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মওলানা শামসুল হুদা খুবই জনপ্রিয় প্রজা-নেতা ছিলেন। কৃষক-প্রজা আন্দোলনে তাঁর দান ছিল অসামান্য। আগের সাধারণ নির্বাচনে তিনি কৃষক-প্রজা প্রার্থী হিসাবে

তৎকালীন মুসলিম লীগ প্রার্থীকে বিপুল ভোটে হারাইয়া নির্বাচিত হইয়াছিলেন। মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি ছিলেন আমার সম্মানিত সহকর্মী। অথচ মুসলিম লীগের অর্থাৎ পাকিস্তান দাবির সাফল্যের খাতিরে তাঁকেই পরাজিত করা দরকার হইয়া পড়িল। পাঠান সাহেবের সাফল্য নিশ্চিত করিবার জন্য আমি শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবের অনুমোদনক্রমে গফরগাঁয় একটি সম্মিলনীর আয়োজন করিলাম। জিলা মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ নূরুল আমিন সাহেবকে চেয়ারম্যান ও জিলার অন্যতম জনপ্রিয় সুবক্তা ও সংগঠক গফরগাঁর বাশেন্দা মিঃ আবদুর রহমান খাঁ সাহেবকে সেক্রেটারি করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইল। ১৯৪৬ সালের ১২ই জানুয়ারি এই সম্মিলনীর তারিখ নির্ধারিত হইল। জিলা মুসলিম লীগের সভাপতি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নূরুল আমিন সাহেব পাঠান সাহেবের সাফল্যে তেমন আগ্রহী নন, পাঠান সাহেব আমার কাছে এই অভিযোগ করায় আমি কনফারেন্সের পনর-বিশ দিন আগে হইতেই প্রাদেশিক লীগের প্রচার দফতর গফরগাঁয় স্থানান্তরিত করিয়া সেখানেই বাসা বাঁধিলাম। গঠনতন্ত্র অনুসারে এটা হইল বটে জিলা সম্মিলনী, কিন্তু এটাকে প্রাদেশিক রূপ দিবার সমস্ত আয়োজন করিলাম। বহু সংখ্যক ডেলিগেট ও বিপুল জনতা সম্মিলনীতে সমবেত হইলেন। এই সম্মিলনীতে জনাব লিয়াকত আলী খাঁ, সার নাযিমুদ্দিন, জনাব শহীদ সুহরাওয়ার্দী, মওলানা আযাদ সোবহানী, জনাব আবুল হাশিম, মৌলবী তমিযুদ্দিন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা নেতা যোগদান ও বক্তৃতা করিলেন। জনাব লিয়াকত আলি খাঁ এই সম্মিলনীর সভাপতি হইলেন। বিনা-ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের প্রস্তাবটি আমি স্বয়ং উপস্থিত করিলাম। এই জিলার জনৈক খ্যাতনামা এম. এল. এ. "বিনা-ক্ষতিপূরণে" কথাটা বাদ দিবার জন্য সংশোধনী প্রস্তাবে উপস্থিত করিলেন। ফলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটা সোজাসুজি সম্মিলনীর বিচার্য বিষয় হইয়া পড়িল। মঞ্চোপরি উপবিষ্ট দুই-এক জন নেতা বিনা-ক্ষতিপূরণের আমার প্রস্তাবে একটু অস্বস্তির ভাব দেখাইতেছিলেন। এবার সংশোধনী প্রস্তাব আসায় তাঁদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সংশোধনী প্রস্তাব কেউ সেকেণ্ড করিলেন না। সংশোধনী প্রস্তাব সেকেণ্ড করা লাগে না। এই যুক্তিতে উক্ত প্রস্তাবককে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইল। কিন্তু সমবেত লক্ষাধিক লোকের 'না' 'না'-ধ্বনিতে বক্তার গলার সুর তলাইয়া গেল। আর কোনও বক্তা নাই দেখিয়া সভাপতি নবাবযাদা লিয়াকত আলি খাঁ সাহেব মুচকি হাসিয়া প্রস্তাব ভোটে দিলেন। সংশোধনী প্রস্তাবের প্রস্তাবক ছাড়া আর কারো হাত উঠিল না। পক্ষান্তরে আমার মূল প্রস্তাবের পক্ষে সমস্ত প্যান্ডাল হাতের জংগল হইয়া গেল। নবাবযাদা সার নাযিমুদ্দিন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ঘোষণা করিলেন : প্রস্তাব গৃহীত হইল। সভায় দীর্ঘক্ষণস্থায়ী হর্ষধ্বনি ও করতালি চলিল। আমার উদ্দেশ্য সফল হইল। মুসলিম লীগের প্রগ্রেসিভ গ্রুপের জয় হইল। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদে কমিটেড হইলেন।

এই জিলা সম্মিলনীর নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তি কি, তাতে গৃহীত প্রস্তাবের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য কি, এসব কথা কেউ তুলিতে পারিলেন না। মুখে-মুখে ভলানটিয়ারদের মিছিলে, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের কুচকাওয়াজে, নির্বাচনী সভাসমূহের প্রস্তাবাদিতে বিনা ক্ষতিপূরণের দাবি অন্ততঃ জনগণের বিচারে মুসলিম লীগের সরকারী দাবিতে পরিগণিত হইল। কোনও দিক হইতে ইহার প্রতিবাদে টু শব্দটি হইল না। সকলে বুঝিয়া নিল, এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। পাকিস্তান হাসিলের পরে মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা এই ওয়াদা রক্ষা করেন নাই। সেটা ভিন্ন কথা। জমিদারি উচ্ছেদের বদলে ক্ষতিপূরণ দিয়া একোয়ার করার সময় লীগ নেতারা বলেন নাই যে তাঁরা বিনা-ক্ষতিপূরণের ওয়াদা করেন নাই। তাঁরা বলিয়াছিলেন যে একদম ক্ষতিপূরণ না দিলে জমিদারদের উপর অবিচার করা হয়। লীগ নেতারা যে শুধু জমিদারি উচ্ছেদের ব্যাপারেই সজ্ঞানে জন-সাধারণের সাথে বিশ্বাস ভংগ করিয়াছেন, তাও নয়। লাহোর প্রস্তাবের ব্যাপারেও মুসলিম ঐক্য ও 'কীটে-খাওয়া' পাকিস্তানের যুক্তিতে এইরূপ বিশ্বাসভংগ করা হইয়াছে। নির্বাচনের আগের কথা নির্বাচনের পরে ভুলিয়া যাওয়া এবং সে ভুলার সমর্থনে উচ্চ বুলির যুক্তি দেওয়ার ইতিহাস আমাদের দেশে এটাই নূতন নয়।

এই সময় হইতে পাকিস্তান হাসিলের দিন পর্যন্ত মুদ্দতের ঘটনাবলী সকলেরই জানা। ঐ সব ঘটনার সাথে 'আমার দেখা রাজনীতির' সোজাসুজি কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়া সে সবের উল্লেখ বাদ দিয়া গেলাম। কিন্তু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার-সম্পাদক হিসাবে ঐসব ঘটনার অনেকগুলির সাথে অন্ততঃ মনের দিক দিয়া এতটা জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম যে ঐসব ঘটনার সুফল-কুফলের স্মৃতি আমার নিজের মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া যাইতেছে না। এত-এতদিন পরেও ওগুলি কাঁটার মতই আমার অন্তরে বিঁধিতেছে।

৪. গ্রুপিং-সিস্টেম

এই ধরনের ঘটনার একটি কেবিনেট মিশন প্ল্যান বা গ্রুপিং সিস্টেম। ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে কেবিনেট মিশন এই প্ল্যান ঘোষণা করেন। খবরের কাগযে ঐ প্ল্যানটা পড়িয়াই আমার অন্তর নাচিয়া উঠে। মনে মনে ভাবি, এইটাই যেন আমি নিজে চিন্তা করিতেছিলাম। সুভাষ বাবুর কথা মনে পড়িল। তাঁর মধুর হাসি-মাখা মুখখানা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। হায়! তিনি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন!

আমরা নিচের তলার কর্মীরা প্রথম দৃষ্টিতেই প্ল্যানটাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেও আমাদের নেতারা অত ব্যস্ততা দেখাইলেন না। প্রায় এক মাস চিন্তা-ভাবনা করিয়া জুন মাসের শেষদিকে এক সপ্তাহ আগে-পরে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলই

কেবিনেট প্ল্যান গ্রহণ করিলেন। তখন আমার আনন্দ দেখে কে ? আমি দেখিয়া আরও খুশী হইলাম যে আমার চেয়ে গোঁড়া পাকিস্তান-বাদী ও সনাতনী মুসলিম লীগাররা পর্যন্ত উল্লসিত হইয়াছেন। যাক, এতদিনে একটা দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। চারদিকেই স্বস্তির নিশ্বাস।

কিন্তু দেশের আবহাওয়া ততদিনে এত বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে যে মুসলমানরা যাতে হয় খুশি, হিন্দুরা হয় তাতে বেজার। বিষয়টা ভাল কি মন্দ তার বিচার করে না। কেবিনেট প্ল্যান গ্রহণ নিয়া তাই ঘটিল। এমন যে বামপন্থী বন্ধুরা যাঁরা এতদিন দিনরাত গান্ধী-জিন্না মিলনের শ্লোগান দিয়া কলিকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছিলেন, তাঁদের মুখেও বিষাদের কাল ছায়া পড়িল। প্ল্যানটা নিশ্চয়ই মুসলমানের পক্ষে গিয়াছে। নইলে মুসলিম লীগ ওটা গ্রহণ করিল কেন ? কংগ্রেস এত দেরি করিল কেন? মুসলমানরা এত উল্লাস করে কেন ?

দশ-পনর দিন না যাইতেই কংগ্রেসের নয়া প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহরু ১০ই জুলাই এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করিলেন ঃ কংগ্রেস কেবিনেট প্ল্যান গ্রহণ করিয়াছে বটে কিন্তু সার্বভৌম গণ-পরিষদ কংগ্রেসের মত মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়।

কায়েদে-আযম ন্যায়তঃই এর প্রতিবাদে লীগের প্ল্যান গ্রহণ প্রত্যাহার করিলেন। সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

কংগ্রেসের লুকাচুরিতে কেবিনেট মিশন বড়লাট ও বৃটিশ সরকার চুপ করিয়া তামাশা দেখিলেন। কায়েদে-আযম ১৬ই আগস্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করিলেন ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে।

ইংরাজসহ আমাদের সমাজের নাইট-নবাবরাও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এঁদের অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের আহবানে ইংরাজের দেওয়া উপাধি ত্যাগ করিলেন ; বেশিরভাগ টিলামিছি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে সকলে ঘাবড়াইয়া গেলেন। এই দলের নেতা সার নাযিমুদ্দিন কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক সভায় ঘোষণা করিলেন ঃ 'আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরাজের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুর বিরুদ্ধে।' হিন্দুরা সন্ত্রস্ত এবং শেষ পর্যন্ত এগ্রেসিভ হইয়া উঠিল।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলিকাতায় কেয়ামত নামিয়া আসিল।

৫. কলিকাতা দাংগা

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ও পরবর্তী কয়েকদিন কলিকাতায় যে হৃদয়বিদারক অচিন্তনীয় ও কল্পনাতীত সাম্প্রদায়িক দাংগা হইয়াছিল যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া এমন নৃশংসতা আর কোথাও দেখা যায় না। কলিকাতায় দুইটা মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইটার সময়েই আমি কলিকাতায় উপস্থিত ছিলাম। একটা ১৯২৬ সালের এপ্রিলে। অপরটা ১৯৪৬ সালের আগস্টে। গভীরতা, ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা সকল দিক হইতেই ১৯৪৬ সালের দাংগা ১৯২৬ সালের দাংগার চেয়ে অনেক বড় ছিল। চল্লিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছাব্বিশ সালের দাংগার নৃশংসতার খুঁটিনাটি মনে নাই। কিন্তু মাত্র বিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছয়-চল্লিশ সালের চোখের-দেখা অমানুষিক নৃশংসতা আজও ঝলমলা মনে আছে। মনে হইলেই সজীব চিত্রের মতই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। গা কাঁটা দিয়া উঠে। স্বাভাবিক হৃদয়বান ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবার কথা। ঘটিয়াও ছিল অন্ততঃ একজনের। আমার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আলীপুর কোর্টের এক ব্রাহ্মণ তরুণ মুনসেফ সত্য-সত্যই কিছুকালের জন্য মনোবিকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রিটায়ার্ড জজ ও বয়স্ক উকিল-ব্যারিস্টারের মত উচ্চশিক্ষিত কৃষ্টিবান ভদ্রলোকদিগকে খড়গ রামদা দিয়া তাঁদের মহল্লার বস্তির মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করিতে দেখিয়াই ঐ তরুণ হাকিমের ভাবালু মনে অমন ধাক্কা লাগিয়াছিল। তিনি ছুটি লইয়া বেশ কিছু দিন মেন্টাল হাসপাতালে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন আমার অবস্থাও প্রায় ঐরূপই হইয়াছিল। আমার মহল্লায় হয়ত একজন মুচি ফুটপাথে বসিয়া মুসলমানদেরই জুতা মেরামত করিতেছে। হয়ত একজন হিন্দু নাপিত ফুটপাথে বসিয়া মুসলমানদের ক্ষৌরকাজ করিতেছে। হঠাৎ কয়েকজন মুসলমান আততায়ী ধারাল রড বা বল্লম তার মাথায় গলায় বা পেটে এপার-ওপার ঢুকাইয়া দিল। মুহূর্তের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া লোকটি সেখানেই মরিয়া পড়িয়া রহিল। বীরেরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিলেন অন্য শিকারের তালাশে। এমন নৃশংসতা দেখিলে কার না মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিবে ? অথচ, এটাই হইয়া উঠিয়াছিল স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। বিপরীতটাই ছিল যেন অস্বাভাবিক। হৃদয়বান মানব-প্রেমিক বলিয়া পরিচিত আমার জানা এক বন্ধু এই সময়ে একদিন আমাকে কৈফিয়ৎ তলবের ভাষায় বলিয়াছিলেন : 'কয়টা হিন্দু মারিয়াছেন আপনি ? শুধু মুখে-মুখেই মুসলিম প্রীতি ।'

সত্যই এই সময় কলিকাতার বেশিরভাগ মানুষ তাদের মনুষ্যত্ব-বোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একটা সংক্রামক ফ্রেনৃযিতে যেন সবাই সমবেতভাবে

উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সামগ্রিক উন্মত্ততার মধ্যেও দু-একটা সাহসিক মানবিকতার দৃষ্টান্ত মহত্ত্বের উজ্জ্বলতায় ঝলমল করিতেছে। হিন্দু এলাকায় উন্মত্ত জনতা-বেষ্টিত মুসলমান পরিবারকে রক্ষার জন্য হিন্দু নারী-পুরুষের বীরত্ব এবং মুসলিম এলাকায় ঐ অবস্থায়-পতিত হিন্দু পরিবার রক্ষায় মুসলিম নারী-পুরুষের বীরত্ব ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকার যোগ্য।

এই সাম্প্রদায়িক দাংগার প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। স্বাভাবিক কারণেই তার অধিকাংশই পক্ষপাত-দুষ্ট। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমার নিজের বিবেচনায় এর প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলিম লীগ-নেতৃত্বের। বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের পক্ষপাত-দুষ্ট কাজকে 'ডাবলক্রসিং' আখ্যাদিয়া যেদিন কায়েদে-আযম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন আমি সর্বাপেক্ষা বেশি আনন্দিত হইয়াছিলাম। বহুকাল কংগ্রেসের সেবা করিয়া আমি ও আমার মত অনেকেই নিয়মতান্ত্রিক দেন-দরবারের রাজনীতি অপেক্ষা সংগ্রামের পন্থার প্রতিই অধিকতর বিশ্বাসী হইয়াছিলাম। কংগ্রেস ছাড়িয়া মুসলিম লীগে যোগ দিবার সময়ও ঐ সংগ্রামী মনোভাব ফেলিয়া আসিতে পারি নাই। মুসলিম লীগ কোনদিন সংগ্রামের পথে যাইবে না, কংগ্রেসী বন্ধুদের এই ধরনের চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিতে না পারিয়া অনেক সময় লজ্জা পাইতাম। এইবার তাঁদেরে বলিতে পারিলাম ঃ 'কেমন, হইল ত ?' ধরিয়া দিলাম প্রত্যেক সংগ্রামে নবাগত মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কিছুকাল ট্রেনিং লইবেন। আমরা সাবেক কংগ্রেসীদের মর্যাদা একটু বাড়িবে। কিন্তু ও মা ! কায়েদে-আযম ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবস ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু কোনও কার্যক্রম ঘোষণা করিলেন না। তবে একথা তিনি বলিয়াছিলেন ঃ আজ হইতে মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ত্যাগ করিল। আমরা ধরিয়া নিলাম সভা-সমিতিতে হুমকি দিয়া উত্তেজনাপূর্ণ প্রস্তাবাদি পাস হইবে। আমার অনেক হিন্দু বন্ধুর সাথে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম হিন্দুরাও তাই ধরিয়া নিয়াছিল।

কিন্তু দুইটা ঘটনা হিন্দু-মনে স্বভাবতঃই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। এক, খাজা নাযিমুদ্দিন সাহেব ঘোষণা করিলেন ঃ 'আমাদের সংগ্রাম ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে।' দুই, প্রধানমন্ত্রী শহীদ সাহেবের নির্দেশে বাংলা সরকার ১৬ই আগস্ট সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করিলেন। প্রথমটি সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা। দ্বিতিয়টির ব্যাখ্যা আছে। প্রধানমন্ত্রী হয়ত অশুভ আশংকা করিয়াই সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য আফিস-আদালত ছুটি দিয়াছিলেন। পরবর্তী ঘটনায় বোঝাও গিয়াছিল যে ঐ দিন ছুটি না থাকিলে উভয় সম্প্রদায়ের অনেক সরকারী কর্মচারির জীবনহানি

ঘটিত। কিন্তু আগে এটা বুঝার উপায় ছিল না। সরকারী ঘোষণায় তা বলাও হয় নাই। হইলেও হিন্দুরা বিশ্বাস করিত না। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা হইলেই লীগের পার্টি-প্রোগ্রামকে সরকারী ছুটির দিন গণ্য করা হইবে, এটা কোনও যুক্তির কথা নয়। কংগ্রেস মন্ত্রিসভারা তা করেনও নাই। কাজেই হিন্দুরা খুব ন্যায়-ও যুক্তিসংগত ভাবেই এই আশংকা করিল যে মুসলিম লীগ-ঘোষিত হরতাল পালনে হিন্দুদিগকে বাধ্য করা হইবে। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুরা আগে হইতেই প্রস্তুত ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া গেল ঘটনার দিনে।

গড়ের মাঠের অক্টারলনি মনুমেন্টের উত্তরে ও কার্যন পার্কের দক্ষিণে বিরাট খেলার মাঠে সভার আয়োজন করা হইয়াছে। শহীদ সাহেব, হাশিম সাহেব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট। আমরা একদল শ্রোতা মঞ্চের নিচে চেয়ারে উপবিষ্ট। সভার কাজ শুরু হয়-হয়। এমনি সময় খবর আসিল বেহালা, কালিঘাট, মেটিয়াবুরুজ, মানিকতলা ও শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানে-স্থানে মুসলমানদিগের উপর হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া অনেক খুন-জখম করিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই লহু-মাখা পোশাক-পরা জনতা রক্ত-রঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া আহত ব্যক্তিদের কাঁধে করিয়া চার দিক হইতে মিছিল করিয়া আসিতে শুরু করিল। চারদিকেই মাতমের আহাজারি ও প্রতিশোধের যিকির। তাদের মুখে শোনা গেল হিন্দুরা শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর বিনা-কারণে হামলা করিয়াছিল। হিন্দুরা দোকানে ঘরে ও ছাদে ইট-পাটকেল ও লাঠি-সোটা আগেই যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। হিন্দুদের পক্ষ হইতে অবশ্যই বলা হইয়াছিল যে মিছিলের লোকেরা রাস্তার পাশের হিন্দু দোকানদারদেরে জোর করিয়া দোকান বন্ধ করাইতে গিয়াছিল। ফলে বিরোধ বাধে। এটা সম্ভব। মুসলিম জনতার জোর করিয়া হিন্দু দোকান বন্ধ করাইতে যাওয়ার দুই-একটা নযির আমার নিজেরই জানা আছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সংঘাত বাধে নাই। হিন্দু দোকানদাররা ডরে-ভয়ে দোকান বন্ধ করিয়াছিল। এসব ক্ষেত্রেও হিন্দুরা বাধা দিলে যে সংঘর্ষ হইত, তাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতায় স্বভাবতঃই হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের জান-মালের ক্ষতি হইয়াছিল অনেক বেশি। এই খবর অতিরঞ্জিত আকারে পূর্ব বাংলায় পৌছিলে নোয়াখালি জিলায় হিন্দুরা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিহারের হিন্দুরা তথাকার মুসলমানদিগকে অধিকতর নৃশংসতার সাথে পাইকারীভাবে হত্যা করে। ফলে সাম্প্রদায়িক দাংগার ব্যাপারে বাংলা-বিহার একই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই যুদ্ধ চলে প্রায় চার মাস ধরিয়া। উভয় পক্ষে কত লোক যে হতাহত ও কত কোটি টাকার

সম্পত্তি যে ধ্বংস হইয়াছিল তার লেখা-জোখা নাই। পরবর্তীকালে দেশ ভাগের সময়ে অবশ্য আরও বহু প্রদেশে দানবীয় নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটিয়াছিল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত বাংলা-বিহারের সাম্প্রদায়িক দাংগাই নৃশংস অমানুষিকতার সর্বাপেক্ষা লজ্জাস্কর নিদর্শন। অনেক অতি-সাম্প্রদায়িক মুসলমান আজও সগর্বে বলিয়া থাকে কলিকাতা দাংগাই পাকিস্তান আনিয়াছিল। এ কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। এই দাংগার পরে ইংরাজ-হিন্দু-মুসলিম তিনপক্ষই বুঝিতে পারেন, দেশ বিভাগ ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬. পার্টিশনে অবিচার

১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫০ সাল এই তিনটি বছর সক্রিয় রাজনীতির সংগে আমার সংস্রব বিশেষ ছিল না। 'ইত্তেহাদে'র সম্পাদক হিসাবে আমার সাথে রাজনীতিকরা মাঝে-মাঝে যতটুক পরামর্শ করিতেন এবং আমি সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীতে যতটুক অভিমত প্রকাশ করিতাম, সেই টুকুকেই আমার রাজনীতি বলা যাইতে পারে। তবে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে মশ্‌গুল না থাকার দরুন এই মুহূর্তে দর্শক ও বিচারক হিসাবে আমার যোগ্যতা অনেক বেশি করিয়া বাড়িয়া ছিল, নিতান্ত বিনয়ের সাথে এ দাবি আমি করিতে পারি।

পরবর্তীকালে বিদেশী ও নিরপেক্ষ লোকদের অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, পার্টিশনে পাকিস্তানের উপর অবিচার করা হইয়াছে। রেফারেন্ডামে বিপুল মেজরিটি পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও সিলেটের করিমগঞ্জ ভারতের ভাগে ফেলা, সমস্ত গৃহীত মূলনীতির বরখেলাফে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলা ভারতের ভাগে ফেলা, সুস্পষ্টতঃই ইচ্ছাকৃত পক্ষপাতমূলক অবিচার। কাশ্মীর ও ত্রিপুরার সাথে ভারতের কন্টিগিউটি রক্ষার অসাধু উদ্দেশ্যেই এ সব কাজ করা হইয়াছিল। কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলা হয় কায়েদে-আযম লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের প্রথম বড়লাট না করিয়া নিজেই বড়লাট হইয়া পড়ায় পাকিস্তানের উপর রাগ করিয়াই মাউন্টব্যাটেন রেডক্লিফকে দিয়া এসব অবিচার করাইয়াছেন। জিন্না সাহেব বড়লাট হইবার ব্যক্তিগত লোভটা সংবরণ করিতে পারিলে পাকিস্তানের উপর মাউন্টব্যাটেন অত অবিচার করিতেন না। চাই কি কিছু সুযোগ-সুবিধাও করিয়া দিতেন।

যে কারণেই হউক পাকিস্তানের উপর অবিচার যে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হইয়াছিল, এটা আজ সুস্পষ্ট এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান টিকিবে না, কাজেই এসব অবিচার কালের বিচারে মূল্যহীন হইয়া যাইবে, এই ধারণা হইতেই ঐসব পক্ষপাতমূলক অবিচার করা হইয়াছিল। সেসব অবিচারের ধরন ও পরিমাণ এমন

ছিল যে পাকিস্তানের পরিমাণ বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করাই স্বাভাবিক ছিল। এ অবস্থায় অত সব প্রতিকূলতা কাটাইয়া পাকিস্তান যে বাঁচিয়া আছে এটাই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আমাদের বরাত গুণ।

তবে পাকিস্তান হাসিলের বিজয়োল্লাসের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের মধ্যে উপরের তলার নেতারা কি নিচের তলার কর্মীরা আমরা এ সব কথায় তত গুরুত্ব দেই নাই আনন্দে বিঘ্ন হইবে ভয়ে। কিন্তু এত উল্লাসের মধ্যেও দুইটা ব্যাপারে আমি স্তম্ভিত না হইয়া পারি নাই। একটি রাজনৈতিক আদর্শের কথা। অপরটি পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের কথা। অবশ্য দুইটার জন্যই আমি মনে-মনে কায়েদে-আযমকেই দায়ী করিয়াছিলাম। কিন্তু আদর্শের ব্যাপারটা একককভাবে কায়েদে-আযমের নিজের কাজ। জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদে আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি কোনও অন্যায় অগণতান্ত্রিক বেকায়দা কথা বলিলে বা কাজ করিলে আমি মনে খুবই ব্যথা পাইতাম। পাকিস্তান হওয়ার পরে-পরেই এমন কথা তিনি দুইটি বলিয়াছিলেন। প্রথমটি এই ঃ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দিল্লী হইতে করাচি রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "আমি ভারতের নাগরিক হিসাবে পাকিস্তানে যাইতেছি। পাকিস্তানের জনগণ আমাকে তাদের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করায় আমি তাদের সেবা করিতে যাইতেছি। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বৃটিশ নাগরিক হইয়াও যেমন ভারতবাসীর সেবা করিতেছেন, আমিও ঠিক তেমনি করিতে যাইতেছি।"

কথাটা শোনা মাত্র আমার মনে ব্যথার যে কাঁটা ফুটিয়াছিল, সে টাটানি আজো সারে নাই। প্রথমতঃ এটা কোনও জরুরী শাসনতান্ত্রিক কথা ছিল না। একথা বলার কোনও দরকারই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী হিসাবে আমাদের গভর্নর-জেনারেল হইয়া আমাদের সেবা করিতে আসিতেছেন এটা কোনও গৌরবের কথা ছিল না, আমাদের দিক হইতে ত নয়ই, তাঁর নিজের দিক হইতেও না। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সংগে নিজের তুলনা করিয়া তিনি কি আনন্দ পাইলেন তা আমি আজও বুঝি নাই। তিনি ছিলেন নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের স্রস্টা ও পাকিস্তানী জাতির পিতা। পক্ষান্তরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ছিলেন মুমূর্ষু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ প্রতীক।

কায়েদে আযমের আর যে কথাটি আমাকে পীড়া দিয়াছিল, তা বাংলাভাষা সম্পর্কে তাঁর ঢাকার বক্তৃতা। পঁচিশ বছর ধরিয়া জিন্না সাহেবকে চিনিতাম। এই পঁচিশ বছরের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছর তাঁর বিরোধী ছিলাম। বাকী কুড়ি বছরই তাঁর সমর্থক ছিলাম। তাঁর মুখে এমন গুরুতর ব্যাপারে এমন অবিবেচকের কথা আশা করি নাই।

তিনি বাংলা বা উর্দু কোনও ভাষাই জানিতেন না। তবে এটা তিনি জানিতেন যে বাংলা অধিকাংশ পাকিস্তানীর মাতৃভাষা। আর জানিতেন তিনি গণতন্ত্রে মাতৃভাষার তাৎপর্য। কাজেই কায়েদে-আযমের মুখে মাত্র একবারের মত ঐ গণতন্ত্রবিরোধী কথার মানে আমি আজও উপলব্ধি করি নাই।

পর-পর তিনটি ঘটনা আমাকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। (১) ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগ যখন কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করে, তখন জিন্না সাহেব মুসলিম বাংলার কোনও প্রতিনিধিকে মন্ত্রী করেন নাই। জিন্না-নেতৃত্বে মুসলিম-বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখন হইতেই আমার দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। বন্ধুদের কাছে আমার দুশ্চিন্তার কথা বলিয়াছিলাম। ১৯১১ সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সম্পর্কে নিখিল ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের মনোভাব ও ১৯১৬ সালের লাখনৌ প্যাকটে বাংলার মুসলিম মেজরিটিকে চিরতরে কোরবানি করিবার ইতিহাসের নযিরও উল্লেখ করিয়াছিলাম কিন্তু অনেক বন্ধুই আমার ঐ সন্দেহকে নব-দীক্ষিতের ইমানের কমজোরি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

(২) ১৯৪৬ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইলেকশনে জয়লাভ করিবার পর লাহোর-প্রস্তাবকে বাঁকা পথে আমূল পরিবর্তন করিয়াছিলেন নির্বাচিত মেম্বাররা দিল্লীর লেজিসলেটার্স কনভেনশনে। এই পরিবর্তনের চেয়ে পরিবর্তনের পন্থাটাই আমার চিন্তার কারণ হইয়াছিল বেশি।

(৩) বাংলা বিভাগের সময় বাংলার মুসলমানের স্বার্থের চেয়ে 'গোটা পাকিস্তানের স্বার্থের' দিকে বেশি নযর রাখা হইয়াছিল। 'গোটা পাকিস্তান' অর্থ ছিল কার্যতঃ পশ্চিম পাকিস্তান।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে শেষ বিষয়টি সম্বন্ধেই আমার অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত। তাই আমি এখানে ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ভবিষ্যতের ইতিহাস-লেখকদের জন্য এইসব ছোট-খাট ঘটনাও প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

৭. কলিকাতার দাবি

দেশ বিভাগে রেডক্লিফ পাকিস্তানের প্রতি যতই অন্যায় করিয়া থাকুন কেন, কলিকাতার উপর পাকিস্তানের দাবি অগ্রাহ্য করা সহজ ছিল না। এটা সহজ করিয়া দিলেন স্বয়ং লীগ নেতৃত্ব ১৯৪৪ সালের ৩রা জুন ন্যাশন্যাল পার্টিশন বা আন্দাযী বিভাগ ঘোষণার সাত দিনের মধ্যেই স্বয়ং সুহরাওয়ার্দী গভর্ণমেন্টই ঢাকাকে পূর্ব-বাংলার রাজধানী ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঢাকা শহরের চার দিকের কুড়ি মাইল

এলাকা রিকুইযিশন করিয়া কলিকাতা গেযেটে নোটিফিকেশনও জারি করিয়াছিলেন। তথাপি সার নাযিমুদ্দিনের দলের সন্দেহ তাতে ঘুচে নাই। তাঁদের মনে তখনও সন্দেহ ছিল যে কলিকাতা পাকিস্তানের ভাগে পড়িলে পূর্ব-বাংলার রাজধানী কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইবে। এটা স্পষ্টতঃই তাঁদের ভিত্তিহীন সন্দেহ। কারণ কলিকাতা পূর্ব-বাংলার ভাগে পড়িলেও উহাকে রাজধানী রাখা উচিৎ হইত না। পূর্ব-বাংলার গণপ্রতিনিধিরা তা করিতেনও না। কিন্তু মুসলিম লীগের খাজা-নেতৃত্ব এ ব্যাপারে অতি মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। সে জন্য ৫ই আগস্ট সুহরাওয়ার্দী সাহেবকে হারাইয়া সার নাযিমুদ্দিন নেতা নির্বাচিত হইবার পরদিন হইতেই 'কলিকাতা রক্ষার' আন্দোলন একদম মন্দীভূত হইয়া গেল। বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগ যুক্তভাবে তখন 'কিপ্ ক্যালকাটা' আন্দোলন চালাইতেছিল। সবগুলি মুসলিম সংবাদপত্রই আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ম্যাপ চার্ট ও স্ট্যাটিসটিকস দিয়া কলিকাতা পূর্ব বাংলায় থাকার যুক্তি দিতেছিলাম। মুসলিম ছাত্রলীগ মিছিল ও জনসভা করিতেছিল। হক সাহেব পর্যন্ত এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী ও বেংগল পার্টিশন কাউন্সিলের মেম্বর সুহরাওয়ার্দী সাহেব দার্জিলিং-এ গভর্নর সার আর. জি. ক্যাসি সাহেবের সহিত আলোচনা করিয়া আমাদেরে এইরূপ আভাস দেন : চব্বিশ পরগণার বারাকপুর, বারাসত, ভাংগর-ও বশিরহাট পূর্ব-বাংলার ভাগে ফেলিয়া এবং কলিকাতা ও দার্জিলিং উভয় শহরকে উভয় বাংলার কমন শহর ঘোষণা করিয়া বাংলা বাটোয়ারা করিতে গবর্নর রাযী হইয়াছেন এবং সেই মতে উর্ধ্বতন মহলে প্রভাব বিস্তার করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্নর কলিকাতাকে পূর্ব-বাংলার অংশে ফেলিবার জোর আন্দোলন চালাইয়া যাইতেও সুহরাওয়ার্দী সাহেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুহরাওয়ার্দী সাহেবের নিকট হইতে এইরূপ আশ্বাস পাইয়া আমরা 'কলিকাতা রাখ' আন্দোলন আরও জোরদার করি। বৃদ্ধ হক সাহেব পর্যন্ত এই আন্দোলনে আমাদের সাথে নামিয়া আসেন। কিন্তু কিছুদিন যাইতে-না-যাইতেই আমরা লীগ-নেতাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। হক সাহেব ও শহীদ সাহেব প্রকাশ্যভাবে কলিকাতা রাখার আন্দোলন সমর্থন করিতেছিলেন। কিন্তু দেখা দেখা গেল কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ বাউণ্ডারি কমিশনের সামনে হক সাহেব ও শহীদ সাহেবকে সওয়াল-জওয়াব করিতে না দিয়া যুক্ত প্রদেশের মিঃ ওয়াসিমকে উকিল নিযুক্ত করিলেন এবং জনাব হামিদুল হককে তাঁর সহকারী করিলেন। মুসলিম লীগের অনেকে ও ছাত্রলীগের সকলেই এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন। হক সাহেব খবরের কাগযে বিবৃতি দিলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হইল না। এমন সময়ে খাজা নাযিমুদ্দিন সাহেব নেতা নিযুক্ত হইবার পরদিন হইতেই প্রকাশ্যভাবে উল্টা বাতাস বহিতে লাগিল। পূর্ব-বাংলার এবং খাজা-গ্রুপের অনেক নেতা একাধিক দিন 'ইত্তেহাদ' অফিসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতা রাখার আন্দোলন বন্ধ করিতে

অনুরোধ করিলেন। কলিকাতা ছাড়িয়া দেওয়ার অসংখ্য লাভ ও সুবিধা সম্পর্কে অনেক যুক্তি-তর্ক দিলেন। তাঁদের যুক্তিগুলির মধ্যে একটি বড় যুক্তি এই ছিল যে কলিকাতা ছাড়িয়া দিলে সমস্ত দায়শোধ করিয়াও পূর্ব বাংলা নগদ তেত্রিশ কোটি টাকা পাইবে। এই টাকা দিয়া আমরা পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা শহরকে নিউইয়র্ক শহর করিয়া ফেলিতে পারিব। বক্তারা খাজা নাযিমুদ্দিন ও চৌধুরী হামিদুল হক সাহেবের বরাত দিয়া এই হিসাবের অংক আমার সামনে পেশ করিলেন। আমি যদিও তাদের যুক্তি মানিলাম না, তথাপি তাঁদের-দেওয়া এই আর্থিক যুক্তিটা আমার 'কলিকাতা রাখা'র উৎসাহে কিছুটা পানি ঢালিতে সমর্থ হইল। তারপর 'আজাদ' 'স্টার-অব-ইণ্ডিয়া' 'মর্নিং নিউয' ইত্যাদি খাজা-সমর্থক কাগযগুলি আস্তে-আস্তে 'কলিকাতা রাখ' আন্দোলন হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। তাঁরা এইরূপ উদার নীতিকথা বলিতে লাগিলেন ঃ ''আমরা যাই বলি না কেন এটা স্বীকার করিতেই হইবে যে কলিকাতা হিন্দু-প্রধান স্থান। আমরা মুসলমানরা এখানে মাইনরিটি একথা ত আর অস্বীকার করা যায় না। মেজরিটিকে উৎখাত করিয়া মাইনরিটি আমরা কলিকাতা রাখিতে চাই না। এটা গণতন্ত্রবিরোধী হইবে। তাছাড়া হিংস্র উপায়ে আমরা কলিকাতা রাখার পক্ষপাতী নই।" গত দুইমাস ধরিয়া যাঁদের কলমের মুখে কলিকাতার দাবিতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত হইতেছিল, খাজা নাযিমুদ্দিন নেতা নির্বাচিত হওয়ার তিন দিনের মধ্যেই তাদের মুখেই অহিংসার বাণী ও মেজরিটি-মাইনরিটির যুক্তি শোনা যাইতে লাগিল। এক 'ইত্তেহাদে'ই আমরা কলিকাতার কথা বলিয়া যাইতে থাকিলাম। খাজা-গ্রুপের কলিকাতার হিন্দু মেজরিটির যুক্তি মানিয়া লইলে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি জিলা শহরের, বস্তুতঃ পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ জিলা নগরের হিন্দু-মেজরিটির যুক্তিও স্বতঃই আসিয়া পড়ে। এসব কথাও বলিতে লাগিলাম। কিন্তু কে শুনে কার কথা ?

৮. মার্কেট ভ্যালু বনাম বুক ভ্যালু

আমি বুঝিলাম, সকলেই বুঝিলেন, কলিকাতা আমরা হারাইয়াছি। কাজেই তখন বিজয়ী খাজা-গ্রুপের বন্ধুদেরে বলিলাম ঃ 'আপনাদের কথা-মতই কলিকাতা ছাড়িয়া দিলাম। এইবার তেত্রিশ কোটি টাকাটা আদায়ের ব্যবস্থা করুন।' নেতারা ও-বিষয়ে নিশ্চিত থাকিতে আমাকে আশ্বাস দিলেন। বুঝা গেল, অতঃপর বাটোয়ারা কাউন্সিলের উপর সব নির্ভর করিতেছে। প্রাদেশিক বাটোয়ারা কাউন্সিলে তখন গবর্নর চেয়ারম্যান, পশ্চিম বাংলার পক্ষে নলিনী সরকার ও ধীরেন মুখার্জী ; পূর্ব-বাংলার পক্ষে খাজা নাযিমুদ্দিন ও শহীদ সুহরাওয়ার্দী। কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন

স্বয়ং বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারতের পক্ষে সর্দার প্যাটেল ও মিঃ এইচ. এম. প্যাটেল এবং পাকিস্তানের পক্ষে লিয়াকত আলি খাঁ ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলি। চারটি ব্যাপারে প্রাদেশিক পার্টিশন কাউন্সিল একমত হইতে না পারায় নিয়ম অনুসারে ঐ চারটি বিষয় কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউন্সিলে পাঠান হয়। ঐ চারটি বিষয়ের মধ্যে সরকারী বাড়ি-ঘরের মূল্য-নির্ধারণের নীতিই ছিল প্রধান। পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিরা দাবি করেন যে বর্তমান বাজার মূল্যে (মার্কেট ভ্যালু) সরকারী বাড়ি-ঘরের দাম হিসাব করিতে হইবে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিরা দাবি করেন যে আদি মূল্যে (বুক ভ্যালু) ও-সবের দাম ধরিতে হইবে। প্রাদেশিক পার্টিশন কাউন্সিলে পূর্ব-বাংলার বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা ছিলেন রেভিনিউ সেক্রেটারি ও পার্টিশন কাউন্সিলের অন্যতম সেক্রেটারি খান বাহাদুর মহবুবুদ্দিন আহমদ ও তৎকালীন সুপার ইঞ্জিনিয়ার (পরে চীফ ইঞ্জিনিয়ার) আবদুল জব্বার সাহেব। 'ইত্তেহাদ' আফিসে আমার রুমে ইঁহাদের প্রায়ই বৈঠক হইত। ইঁহাদের উপদেশ মতই আমি এই ব্যাপারে সম্পাদকীয় লিখিতাম এবং সংবাদ প্রকাশ করিতাম। এঁদের সংগে আলোচনা করিয়াই আমি সরকারী সম্পত্তি বন্টনে মার্কেট ভ্যালু ও বুক ভ্যালুর তাৎপর্য বুঝিতে পারি। মার্কেট ভ্যালুটা সকলেই বুঝেন। শহরে-বন্দরে বিশেষতঃ কলিকাতায় জমি ও বাড়ি-ঘর ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির দাম আগের চেয়ে শত-সহস্রগুণ যে বাড়িয়া গিয়াছে এটা সুস্পষ্ট। কিন্তু বুক ভ্যালু বা আদি দাম যে খরিদ-দাম বা নির্মাণ-মূল্যও নয়, তারও কম, একথা সকলের বুঝিবার কথা নয়। উক্ত বিশেষজ্ঞদ্বয়ের নিকট হইতে আমি জানিতে পারি যে সরকারী হিসাব-মতে প্রথম শ্রেণীর ইমারতসমূহের দাম প্রতি বছর শতকরা একটাকা করিয়া কমিয়া যায় ; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ইমরাতসমূহ কমে প্রতিবছর শতকরা দুইটাকা। মেশিনাদি-সরঞ্জামের ডিপ্রিসিয়েশন ও উয়ার এণ্ড টিয়ার যে নীতিতে ধরা হয়, বাড়ি-ঘরের ডিপ্রিসিয়েশনও সেই নীতিতেই ধরা হয়। ফলে কলিকাতার সরকারী বাড়ি-ঘর ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির কোনটা একশ বছরে আর কোনটা পঞ্চাশ বছরে মূল্যহীন যিরোতে পরিণত হইয়াছে। এ কথার অর্থ এই যে কলিকাতার সরকারী বাড়ি-ঘর ভারত ও পশ্চিম বাংলা 'যিরো' মূল্যে পাইবে। এইজন্য পশ্চিম বাংলা ও ভারতের প্রতিনিধিরা 'বুক ভ্যালুর' উপর অত জোর দিতেছিলেন। পক্ষান্তরে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিরা মার্কেট ভ্যালু দাবি করিতেছিলেন।

৯. পার্টিশন কাউন্সিলের ভূমিকা

খাজা নাযিমুদ্দিন শহীদ সাহেবকে পরাজিত করিয়া মুসলিম লীগ পার্টির লীডার হন ৫ই আগস্ট তারিখে। তার মানে তিনিই পূর্ব-বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী হইয়াই অক্টোবর মাসের শেষ দিকে তিনি সুহরাওয়ার্দী সাহেবের স্থলে হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবকে পার্টিশন কাউন্সিলের মেম্বর করেন। কাজেই ঐ সময় হইতে এ ব্যাপারের দেন-দরবার ও পরামর্শ আমি শহীদ সাহেবের বদলে হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের সহিতই করিতাম। আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত পরামর্শও তাঁকেই দিতাম। আমি দেখিয়া খুশী ও নিশ্চিত হইলাম যে শহীদ সাহেবের মতই চৌধুরী সাহেবও বুক ভ্যালু ও মার্কেট ভ্যালুর তাৎপর্য বুঝেন এবং পূর্ব-বাংলার আর্থিক জীবনে এই প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ইতিপূর্বে তিনি তেত্রিশ কোটি টাকা পাওয়ার যে আশায় কলিকাতা ত্যাগে আমাদেরে রাযী করিয়াছিলেন, মার্কেট ভ্যালু ছাড়া সে টাকা যে পাওয়া যাইবে না, সেটাও তিনি বুঝিতেছিলেন। সুতরাং এদিক হইতে আমি আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউন্সিলে বাংলার কোন প্রতিনিধি না থাকায় এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকিবার পরামর্শ আমরা ও অফিসাররা সকলেই এক বাক্যে দিতে থাকিলাম। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতার দরকার এইজন্য যে শুধু পশ্চিম বাংলা ও ভারত যে কলিকাতার সম্পত্তির বুক ভ্যালু দেওয়ার পক্ষপাতী, তা নয়। কেন্দ্রীয় পশ্চিম পাকিস্তানীরাও বুক ভ্যালুর পক্ষপাতী। কারণ লাহোর করাচি পেশওয়ার কোয়েটা ইত্যাদি স্থানের সরকারী দালান-ইমারত ও স্থাবর সম্পত্তির বাজার মূল্য অনেক হইবে এবং সে মূল্য পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার ভারত সরকার ও পূর্ব পাঞ্জাব সরকারকে দিতে বাধ্য থাকিবেন। অথচ চুক্তি অনুসারে কলিকাতার সম্পত্তির দামটা পাইবে পূর্ব-বাংলা সরকার। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এর এক পয়সাও পাইবেন না। মুসলিম বাংলার স্বার্থ সম্পর্কে অতীতের নিখিল ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্ব যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাতে কলিকাতা ভারতকে বিনামূল্যে দিয়া তার বদলা লাহোরটা বিনামূল্যে পাইতে তাঁদের বিবেকে একটুকুও বাধিবে না। এ সব কথা উক্ত অফিসারদ্বয় ও আমরা অনেকেই নেতৃবৃন্দকে বিশেষতঃ চৌধুরী হামিদুল হক সাহেবকে বুঝাইলাম। তিনি আমাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু আমরা আশ্বাস পাইলাম না। অতঃপর পার্টিশন কাউন্সিলের পরবর্তী সভা ঢাকায় হইল। আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। সরকারী দলের মুখপত্র 'আজাদে' (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭)-এর খবরটা ছিল এইরূপ : "গতকাল (২৪-৯-৪৭) পার্টিশন কাউন্সিলের সভা ঢাকায় হইয়াছে। পূর্ব-বাংলার গভর্নর (সোর ফ্রেডারিক

বোর্ন) সভাপতিত্ব করিয়াছেন। সম্পত্তি দায় বিভাগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।" পরবর্তী সভা হয় কলিকাতায় ৮ই নবেম্বর।

এই 'গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত' যে কি, তা আমরা জানিতে পারি এক মাস পরে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে। ঐ তারিখে কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউন্সিলের ভারতীয় প্রতিনিধি সর্দার প্যাটেল ভারতীয় গণ-পরিষদে ঘোষণা করিলেন ঃ "সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের নীতি সম্পর্কে পাকিস্তানের সাথে আমাদের যে বিরোধ ছিল আপোসে তা মিটিয়া গিয়াছে। বুক ভ্যালুতে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ স্থির হইয়াছে।" ছাত্র-নেতা রাজনৈতিক নেতা ও আমরা সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের বেনিয়াপুকুর রোডের বাড়িতে তাঁদের ভিড় হইল। কেমন করিয়া এটা হইল? আমাদের পক্ষে বুক ভ্যালুতে কে রাজি হইলেন? এখন আমাদের তেত্রিশ কোটি টাকা পাওয়ার কি হইবে? তিনিও আমাদের মতই অজ্ঞতা প্রকাশ ও হায়-আফসোস করিলেন। তিনি শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিন, কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউন্সিলে আমাদের প্রতিনিধি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যা-হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন।

বেশ কিছুদিন পরে হামিদুল হক সাহেব এক বিবৃতিতে ঘোষণা করিলেন ঃ 'হিসাবের হেরফেরে আমরা তেত্রিশ কোটি পাইলাম না বটে তবে ওজেবাদ করিয়াই আমরা পশ্চিম বাংলা ও ভারত সরকারের নিকট হইতে নেট নয় কোটি পাইব।' সকলে ছাতি পিটিয়া হায়-হায় করিলাম। কোথায় তেত্রিশ কোটি? আর কোথায় নয় কোটি? কিন্তু আমাদের ছাতি পেটার বেদনার উপশম হইবার আগেই আবার মাথায় হাত মারিবার দরকার হইল। কারণ মিঃ হামিদুল হক চৌধুরীর কথাটা মাটিতে পড়িবার আগেই মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার এক বিবৃতি দিলেন। তিনি হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখাইলেন যে সব হিসাব করিয়া ভারত ও পশ্চিম বাংলার কাছে পূর্ব-বাংলার পাওনা হইয়াছে মোট তিন কোটি, আর পূর্ব-বাংলার কাছে ভারত ও পশ্চিম বাংলার পাওনা হইয়াছে নয় কোটি। পূর্ব-বাংলা আগে পশ্চিম বাংলা ও ভারতের নয় কোটি শোধ করিবে ; তারপর তার পাওনা তিন কোটি টাকা পাইবে। অর্থাৎ ওজেবাদ করিয়া শেষ পর্যন্ত পূর্ব-বাংলার, পাওনা নয়, দেনা থাকিল ছয় কোটি। হায় কপাল! তেত্রিশ কোটি যোগের বদলে ছয় কোটি বিয়োগ। নলিনীবাবুর এই ঘোষণায় মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী কেন মূর্চ্ছা গেলেন না, আমরাই বা বাঁচিয়া থাকিলাম কিরূপে, আমি আজিও তা বুঝি নাই। বোধ হয় এই সান্ত্বনায় যে শুধু রেডক্লিফ একা আমাদেরে ঠকাইতে পারেন নাই; আমরা সকলে মিলিয়াই আমাদেরে ঠকাইয়াছি। তার উপর সত্য যুগ কলি যুগ হইয়াছে। সত্য যুগে ছিল 'শুভংকরের ফাঁকি, তেত্রিশধনে ধনে তিনশ গেলে তিরিশ থাকে বাকী'; আর কলিযুগে ঃ 'শুভংকরের ফাঁকি, তেত্রিশধনে ধনে শূন্য গেলে দেনা থাকে বাকী'।

পনরই অধ্যায়
কলিকাতায় শেষ দিনগুলি

১. আলীপুরের বন্ধুরা

১৯৪৭ সালের শেষ দিক হইতে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌনে তিন বছর রাজনীতির সাথে আমার কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। 'ইত্তেহাদের' সম্পাদনা উপলক্ষে আমাকে কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল। শহীদ সাহেবের উপর নাযিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার বিরূপ ভাব ছিল। তাঁরা নানা অজুহাতে 'ইত্তেহাদ' ঢাকায় আনার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলেন। অধিকন্তু একাধিকবার 'ব্যান' করিয়া 'ইত্তেহাদ'কে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। পক্ষান্তরে শহীদ সাহেব বহু মুসলিম-লীগ কর্মী, ছাত্র-নেতা ও এম. এল. এ.-র পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও ঢাকায় আসিলেন না। ওদিকে কায়েদে-আযম ও লিয়াকত খাঁর পুনঃপুনঃ অনুরোধেও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাযী হইলেন না। কাজেই আমাদের নেতা শহীদ সাহেবের মতই এবং সাথেই আমরা কোনমতে কলিকাতায় দিন কাটাইতে লাগিলাম। কোনমতে বলিলে ঠিক বলা হইবে না। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করিয়া পাকিস্তান হাসিল করিয়া তার পরেও পাকিস্তানী হিসাবে হিন্দুস্থানে থাকাটাকে নিতান্ত বিবেচনার কাজ দাবি করা যাইতে পারে না। তবু এই সময়ে পশ্চিম বাংলা সরকার ও পশ্চিম বাংলার সুধী-সমাজ সাধারণভাবে এবং সাংবাদিকরা বিশেষভাবে আমাদের সাথে যে ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। মুসলিম লীগের প্রচার-সম্পাদক হিসাবে আমার লিখিত ও সম্পাদিত প্রচার-পুস্তিকায় অন্যান্য স্থানের মতই আলীপুর কোর্ট এলাকা ভরিয়া গিয়াছিল। এই কারণে ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি আলীপুরের উকিল-ব্যারিস্টাররা খুবই বিক্ষুব্ধ থাকার কথা। ঝগড়া-গোছের গরম তর্ক-বিতর্কও তাঁদের সাথে আমার অনেক হইয়াছে। এ অবস্থায় পাকিস্তান হাসিলের পর আমাকে আলীপুরে ওকালতি করিতে দেখিয়া তাঁরা অনেকেই নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়াছিলেন। কেউ-কেউ নিশ্চয়ই চটিয়াও গিয়াছিলেন। তা সত্ত্বেও বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় নাই। তাঁরা আগের মতই হাসিমুখে একদিন বলিলেন : 'এখনও এখানে আছ যে? পাকিস্তান চেয়েছিলে, পাকিস্তান পেয়েছ। তবে আর এখানে বসে আছ কেন?' আমিও বরাবরের মত হাসিমুখে বলিলাম : 'তোমরা হিন্দুরা বড় চালাক। আমিন বাধ্য কৈরা বাঁটোয়ারার ছাহামে আমাদেরে ঠকাইছ। বাংগালরে তোমরা হাইকোর্ট দেখাইছ। ফলে আমাদের

ভাগে জমি কম পড়ছে। কাজেই আরো কিছু জমি খসাবার মতলবে আমরা জনকতক এখানে কিছুদিন থাকব ঠিক করছি।' সকলে হো-হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। রসিকতা করিবার ও বুঝিবার সময় ওটা ছিল না। তবু আমি রসিকতা করিলাম। হিন্দু বন্ধুরা তার রস গ্রহণও করিলেন। এসব ব্যাপারে হিন্দু-মনের উদারতার তুলনা নাই।

২. 'আজাদে'র উপর হামলা

কিন্তু ওটা ব্যক্তিগত কথা। পাকিস্তানী প্রচারকদের মধ্যে 'আজাদ' পত্রিকা অগ্রগণ্য। হিন্দুরা স্বভাবতঃই 'আজাদের' উপর সবচেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। পনর দিন যাইতে-না যাইতেই ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রে 'আজাদ' আফিস গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হইল। ফলে ৩রা সেপ্টেম্বর 'আজাদ' বাহির হইতে পারিল না। হিন্দু সাংবাদিকরাই উদ্যোগী হইয়া সভা ডাকিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ সিটি আফিসে সম্পাদকদের এক বৈঠক হইল। প্রায় পঁচিশ জন সম্পাদক বৈঠকে যোগ দিলাম। সর্বসম্মতিক্রমে গুণ্ডাদের নিন্দা করা হইল। নির্বিবাদে 'আজাদ' প্রকাশের সর্ব প্রকার ব্যবস্থা করার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হইল। 'অমৃতবাজারের' মিঃ তুষারকান্তি ঘোষ, 'স্টেট্‌সম্যানে'র মিঃ আয়ান স্টিফেন, 'স্বরাজের' শ্রীযুক্ত সত্যেন মজুমদার, 'আনন্দবাজারের' শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও 'ইত্তেহাদে'র আমি সহ সকল সম্পাদকের স্বাক্ষরে এক আবেদন প্রচার করা হইল। ফলে 'আজাদ' নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকিল। ইতিমধ্যে মহাত্মাজী অনশন-ব্রত গ্রহণ করায় দাঙ্গা প্রশমিত হইল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সুহরাওয়ার্দী সাহেবের হাতে কমলার রস খাইয়া তিনি অনশন ভাঙ্গিলেন। মোটামুটি শান্তি স্থাপিত হইল। ঈদ ও দুর্গাপূজা আসন্ন বলিয়া উভয় পর্ব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হয়, তার জন্য লেখক-সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতে মিঃ তারা শংকর বানার্জি, মিঃ পংকজ কুমার মল্লিক ও আমি একটি যুক্ত আবেদন প্রচার করিলাম।

সুহরাওয়ার্দী সাহেবের পাকিস্তানে না যাওয়াটা আমার ভাল লাগিতেছিলনা। আমার বিশ্বাস ছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে সুহরাওয়ার্দী সাহেব করাচি গেলে 'ইত্তেহাদ' ঢাকায় নেওয়া শুধু সম্ভব হইত না ত্বরান্বিতও হইত। 'আজাদ' 'মর্নিং নিউয' ইত্যাদি সরকার-সমর্থক কাগযগুলি ঢাকায় নেওয়ার সব ব্যবস্থাই হইয়া গিয়াছে সরকারী সমর্থনে। অথচ 'ইত্তেহাদ' ঢাকায় জমি-বাড়ি যোগাড় করিয়াও শুধু

বিজলি সরবরাহ ও টেলিপ্রিন্টার স্থাপনাদি ব্যাপারে সরকারী কোনও সহায়তা পাইতেছিল না। বরঞ্চ 'ব্যান' করিয়া তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইতেছিল। আমার ও আমার সহকর্মী সকলের বিশ্বাস ছিল সুহরাওয়ার্দী সাহেব পাকিস্তানে গেলেই এর একটা সুরাহা হইত।

৩. সুহরাওয়ার্দীর সংগত অভিমান

কিন্তু তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব নিলেন না। কায়েদে-আযম ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত খাঁর অনুরোধের জবাবে তিনি জানাইলেন ঃ ভারতীয় মুসলমানদের একটা হিল্লা না করিয়া তিনি ভারত ছাড়িতে পারেন না। তিনি এ ব্যাপারে কায়েদে-আযমের কাছে যেসব তার ও চিঠি দিয়াছিলেন, আমি তা দেখিয়াছিলাম। তাতে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 'আপনার সুদক্ষ পরিচালনায় পাকিস্তানের হেফাযত করিবার যোগ্য লোকের অভাব নাই। কারণ মুসলিম লীগের প্রায় সব নেতাই পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পিছনে-ফেলিয়া-যাওয়া বেচারা ভারতীয় মুসলমানদের হেফাযত করিবার কেউ নাই। আমাকে এদের সেবা করিতে দিন।' কথাটা খুবই মহৎ। কিন্তু অনেকেই বলিতেন, এটা সুহরাওয়ার্দীর মনের কথা ছিল না। তিনি রাগ করিয়াই পাকিস্তানের মন্ত্রী হইতে অসম্মত হইয়াছিলেন। অপরের মত আমার নিজেরও এই সন্দেহই ছিল। কায়েদে-আযম ও লিয়াকত খাঁর উপর রাগ করিবার, অন্ততঃ অভিমান করিবার, অধিকার সুহরাওয়ার্দীর ছিল। সুহরাওয়ার্দীর প্রতি বিরুদ্ধভাব নবাবযাদা লিয়াকতের বরাবরই ছিল। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুহরাওয়ার্দীর বদলে বাধ্য-অনুগত ভাল মানুষ খাজা নাযিমুদ্দিনকেই তিনি বেশি সমর্থন করিতেন। এসব কথা সুহরাওয়ার্দীর অজানা ছিল না। কিন্তু কায়েদে-আযমও এসব ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করিবেন, এটা সুহরাওয়ার্দী কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু দেখা গেল, কায়েদে-আযম-সুহরাওয়ার্দীর হক প্রাপ্য সমর্থনটুকুও তাঁকে দেন না। পাঞ্জাব ও বাংলা দুইটা প্রদেশই ভাগ হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ হওয়ার ফলাফল দুই প্রদেশে এক হয় নাই। প্রদেশ ভাগের যুক্তিতে বাংলার মুসলিম লীগ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং বিভক্ত মুসলিম লীগ পার্টির দ্বারা নয়া লীডার তথা প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। পাঞ্জাবের মুসলিম লীগও অখণ্ড রহিল। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীও বজায় থাকিলেন। এই এক যাত্রায় ভিন্ন ফলের কারণ সোজাসুজি এই যে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগ লিয়াকত খাঁর 'বাধ্য-অনুগত' ছিলেন না। লিয়াকত আলী খাঁ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। সবাই তাঁর বাধ্য-অনুগত। এতে কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট থাকিলেন না। পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগকেও তাঁর 'জি

হুজুর তাবেদার' করিতে চাহিলেন, করিলেনও তিনি। সুহরাওয়ার্দীকে বাদ দিয়া প্রধানমন্ত্রী পূর্ব-বাংলায় যে 'তাবেদার জি হুজুর' প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগ পার্টি খাড়া করিলেন, তাঁদের 'তাবেদারি' পূর্ব বাংলাকে এবং পরিণামে পাকিস্তানকে কোথায় নিয়াছে, আজকার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিতেছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে।

তারপর সুহরাওয়ার্দীকে ডিংগাইয়া মিঃ ফযলুর রহমান, ডাঃ মালেক প্রভৃতি যাঁদেরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেওয়া হইতে লাগিল, তাতেই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ ও তাঁর সমর্থক কায়েদে-আযমের মনোভাব সুহরাওয়ার্দীর কাছে সুস্পষ্ট হইয়া গেল। এ অবস্থায় সুহরাওয়ার্দী যদি অভিমান করিয়াও থাকেন, তবুও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। বরঞ্চ তাঁকে উচ্চ প্রশংসা করিতে হয় এই জন্য যে তিনি কোনও অভিযোগ করিয়া তাঁর অসম্মতি জানান নাই। যুক্তি হিসাবে একটা মহৎ আদর্শের কথাই বলিয়াছিলেন। অভিযোগ করাটা তাঁর আত্মসম্মানে বাধিত বলিয়াই তা তিনি করেন নাই।

৪. সুহরাওয়ার্দীর মিশন

গোড়াতে 'ভারতীয় মুসলমানদের হেফাযত' করাটা তাঁর অজুহাত মাত্র ছিল এটা ধরিয়া নিলেও পরে এটাই হইয়া উঠে সুহরাওয়ার্দী সাহেবের নিশা। তিনি শুধু নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কলিকাতার হিন্দু দাঙ্গাকারীদের উদ্যত খড়গের সামনেই গলা বাড়াইয়া দেন নাই, তিনি উভয় রাষ্ট্রের মাইনরিটির রক্ষার জন্য 'মাইনরিটি চার্টারও' রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে উভয় রাষ্ট্রের নেতাদের দস্তখত লইবার জন্য দিল্লী-করাচি দৌড়াদৌড়িও করিয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সাহস ও অধিকারবোধ জিয়াইয়া তুলার জন্য ১৯৪৭ সালের ৯ই ও ১০ই নবেম্বর তিনি ৪০নং থিয়েটার রোডস্থ নিজের বাসভবনে নিখিল ভারতীয় মুসলিম কনভেনশন নামে এক প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করেন। ঐ সম্মিলনীতে মওলানা হসরত মোহানী প্রভৃতি মুসলিম লীগের সাবেক নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং সুহরাওয়ার্দী সাহেব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য হৃদয়স্পর্শী আবেদন করেন। মাইনরিটির অধিকার রক্ষার দাবি-দাওয়া করিয়া এবং সুহরাওয়ার্দী-রচিত মাইনরিটি-চার্টার মানিয়া লওয়ার জন্য উভয় রাষ্ট্রের সরকারকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সুহরাওয়ার্দী সাহেব শুধু সভা-সম্মিলনী করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি নিজে যেমন উভয় রাষ্ট্রের সমঝোতার ব্যাপার লইয়া দিল্লী-করাচি দৌড়াদৌড়ি করেন,

তেমনি পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও গবর্নর ডাঃ কৈলাস নাথ কাট্‌জুকে পূর্ব বাংলার সফরে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে পশ্চিম বাংলার উভয় নেতা ঢাকা আগমন করেন। উভয়েই বিরাট বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। কলিকাতা বসিয়া আমরা সংবাদ পাই এবং সে সব সংবাদ 'ইত্তেহাদে' প্রকাশ করি যে লক্ষ-লক্ষ পাকিস্তানী জনতা পশ্চিম বাংলার ঐ দুই নেতাকে অভিনন্দন দেন এবং সোল্লাসে তাঁদের বক্তৃতা শুনেন। ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ নিজে ঢাকার লোক। নিজের ঋষি তুল্য মহৎ জীবনের জন্য তিনি মুসলমানদের কাছেও সমভাবে সম্মানিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। আর ডাঃ কাট্‌জু যুক্ত প্রদেশের মুসলিম কালচারে পুষ্ট আরবী-ফারসী উর্দুতে পণ্ডিত উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক হিন্দু। উভয়ে পূর্ব বাংলার জনতার কাছে আন্তরিক অভিনন্দন পাইয়াছিলেন এতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

এই দুই উদার নেতার শাসনাধীনে পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা আশাতিরিক্ত শান্তি ও নিরাপত্তায় বাস করিতেছিল। এটা আমি নিজেকে দিয়াই বুঝিতেছিলাম। আমি কাল শিরওয়ানী পরিয়া বিক্ষুব্ধ হিন্দু জনতার সাথে ও মধ্যে ট্রামে চড়িয়া আলীপুর কোর্টে যাইতাম আসিতাম নিরাপদে ও নির্ভয়ে। পাশে বসা হিন্দু বন্ধুদের সাথে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ও হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সম্পর্কে আলোচনা করিতাম মুক্তকণ্ঠে।

প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ঘোষের অনুরোধে ও শহীদ সাহেবের উৎসাহে আমি নিজে কলিকাতা ও হাওড়ার মুসলিম 'পকেট'গুলিতে যাইতাম বক্তৃতা করিয়া তাদেরে সাহস দিতে এবং দেশ ছাড়িয়া না যাইতে। যতদিন ডাঃ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ততদিন কলিকাতার মুসলমানদের মধ্যে একটা স্বস্তির ভাব আমি সর্বত্র লক্ষ্য করিয়াছি। কালাবাজারী ও মুনাফাখোরদেরে শাস্তি দিতে গিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি কংগ্রেস পার্টির মেজরিটির সমর্থন হারান। ১৯৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দেন। মুসলমানদের মধ্যে আবার ত্রাসের সঞ্চার হয়। ইতিমধ্যে সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে পাকিস্তানকে নগদ টাকার অংশ প্রাথমিক ৫৫ কোটি টাকা দিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক অস্বীকার করে। ইহার এবং দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে মহাত্মাজী আমরণ অনশন গ্রহণ করেন। তাতে আমরা কলিকাতার মুসলমানরা ভয়ানক উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ি। এ সময়ে ডাঃ ঘোষের মত লোক প্রধানমন্ত্রিত্বে ইস্তাফা দেওয়া মুসলমানদের জন্য সকল দিকেই অশুভ ঘটনা বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু ২০শে জানুয়ারি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী হইয়াই কঠোর হস্তে সাম্প্রদায়িকতা দমন করেন এবং ডাঃ ঘোষের নীতি পুরাপুরি অনুসরণ করিয়া চলেন। তিনি আমাকে রাইটার্স বিল্ডিং-এ তাঁর চেম্বারে ডাকিয়া সকল প্রকার সাহায্য ও সহায়তার আশ্বাস দেন এবং সরকারের সাথে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন। ডাঃ ঘোষের সময় যেভাবে মুসলিম মহল্লায় সভা-সমিতি করিয়া বেড়াইতাম, পরিত্যক্ত মসজিদ মেরামত ও পুনর্বহাল করাইতাম, ডাঃ রায়ের আমলেও তাই করিতে লাগিলাম। বরঞ্চ ডাঃ রায়ের কাছে যেন আরও বেশি দরদ ও সহানুভূতি পাইলাম।

৫. বাস্তুত্যাগ—সমস্যা

এই সময়ে উভয় রাষ্ট্রের ভিতরকার সম্পর্কের মধ্যে বাস্তুত্যাগ সমস্যাটাই ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অংকশাস্ত্রের দিক দিয়া হিন্দুস্থানের চেয়ে পাকিস্তানের জন্যই ছিল এটা অধিকতর সমস্যা-সংকুল। আদম-এওয়াজের স্কিম বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু যে মনোভাব ও প্রচার-প্রচারণার মধ্যে দেশ ভাগ হইয়াছে, সে পরিবেশে বাস্তুত্যাগ দুর্নিবার হইয়া উঠিবে, এটা নেতাদের ভাল করিয়া ভাবা উচিৎ ছিল। এক দিকে জিন্না সাহেব অপরদিকে গান্ধী-নেহরুর মত উদার ও উঁচুস্তরের লোকদের পক্ষে অমন বলা বা চিন্তা করা সম্ভব নাও হইতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের কথাটাই বলিয়াছিলেন সর্দার প্যাটেল। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 'যারা পাকিস্তান চাহিয়াছিল পাকিস্তান পাওয়ার পর তাদের কারও হিন্দুস্থানে থাকার অধিকার নাই।' কথাটা অন্যায় নয়, অসঙ্গত নয়, অযৌক্তিক নয়। কিন্তু পার্টিশনের সময়েই সর্দারের এ কথা বলা উচিত ছিল। আর ভাবা উচিৎ ছিল পাকিস্তানের নেতাদেরও। তা যখন হয় নাই, তখন একমাত্র কর্তব্য হইল বলা ঃ 'যে যেখানে আছ, সেখানেই থাক'। গান্ধী-জিন্না তাই বলিয়াছিলেন। দুই সরকারও সেই নীতির কথাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ঐ সময়ে মনে হইয়াছিল, ঐ সুন্দর নীতিটাকে কাজে-কর্মে পালন করিতেছিলেন সরকার হিসাবে একমাত্র পশ্চিম বাংলা সরকার, আর ব্যক্তি হিসাবে একমাত্র শহীদ সুহরাওয়ার্দী।

এই ব্যাপারে এবং এই সময়ে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ দুইটা গুরুতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। দুইটা ব্যাপারেই শহীদ সাহেবের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল এবং তিনি তা সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফত প্রকাশও করিয়াছিলেন। এক, পাকিস্তান হাসিল হওয়ার পর পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম আর মুসলিম লীগ থাকা

উচিৎ নয়। দুই, পাকিস্তানের হিন্দুদের রাজনৈতিক আনুগত্য বিচারে উদার বাস্তব দৃষ্টি অবলম্বন করা উচিৎ।

৬. মুসলিম লীগ বনাম ন্যাশনাল লীগ

প্রথমতঃ নিখিল ভারত মুসলিম লীগই পাকিস্তান হাসিল করিয়াছে। সত্য, কিন্তু পাকিস্তান হাসিলের পর ইহা বিদ্যমান থাকা উচিৎ নয়। এখন ইহা ভাঙ্গিয়া দিয়া পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ স্থাপন করা দরকার। সে লীগে অমুসলমান পাকিস্তানীদের প্রবেশাধিকার থাকা আবশ্যক। ইহা কায়েদে-আযমের মত বলিয়া তৎকালে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের জানা ছিল। অনেকের মতও তাই ছিল বলিয়া শোনা যাইত। কিন্তু সুহরাওয়ার্দী সাহেবই প্রথম সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া এই মত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। কথাটা স্পষ্টতঃই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং তাঁর বিবৃতিতে সেই সুস্পষ্ট যুক্তিটারই উপর জোর দেন। পাকিস্তান হাসিল করিয়াছে মুসলিম লীগ ঠিকই ; মুসলমানদের দাবিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাও ঠিক। কিন্তু আদম-এওয়াজ না হওয়ায় এবং দাবিটাও সেরূপ না থাকায় পাকিস্তানে যেমন অনেক হিন্দু আছে, ভারতেও তেমনি অনেক মুসলমান রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে উভয় রাষ্ট্রেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করিতে গেলেই জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িক হইতেই হইবে। ভারতের যেমন ন্যাশনাল কংগ্রেস আছে, পাকিস্তানেরও তেমনি ন্যাশনাল লীগ করিতে হইবে, কথাটা যুক্তিসঙ্গত এবং কায়েদে-আযমের মতও তাই ; এই ধারণায় আরো অনেক মুসলিম নেতা শহীদ সাহেবের এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া আমি শহীদ সাহেবের এই মতের প্রতিবাদ করি শহীদ সাহেবের কাগয 'ইত্তেহাদেই'। 'ইত্তেহাদে'র সম্পাদক হিসাবেই। 'ইত্তেহাদ' শহীদ সাহেবের সমর্থন করিবে এটাত জানা কথা। কিন্তু এইবারই পাঠকরা প্রথম জানিতে পারিলেন যে 'ইত্তেহাদের' সম্পাদকের সত্যই স্বাধীনতা ছিল। এর আগে আমি কতবারই না কতজনকে বলিয়াছিলাম শহীদ সাহেবের কাগযের আমি মাইনা করা সম্পাদক হইলেও তিনি কোনও দিন আমার লেখায় হস্তক্ষেপ করেন নাই ; আমার মতামত প্রভাবিত করিবার চেষ্টাও কোনদিন করেন নাই। কিন্তু বন্ধুরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই। বন্ধুবর আবুল হাশিমের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোকও আমার 'স্বাধীনতায়' আস্থা স্থাপন করেন নাই। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে মওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগের সভাপতিত্বে ইস্তফা দেন। হক

সাহেব ও হাশিম সাহেবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। 'ইত্তেহাদে' আমি হক সাহেবকে সমর্থন করি। হাশিম সাহেব তখন শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক জুড়ী এবং দোর্দণ্ড-প্রতাপ লীগ নেতা। তাঁকে ফেলিয়া হক সাহেবকে সমর্থন করায় হাশিম সাহেব মনে করিলেন, শহীদ সাহেবই আমাকে দিয়া হক সাহেবকে সমর্থন করাইতেছেন। আমি এই যে বুঝাইলাম, শহীদ সাহেব কোনও দিন আমার সম্পাদকীয় কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করেন না, ইশারা-ইঙ্গিতেও আমার মতামত প্রভাবিত করেন না ; কোনও কথাই হাশিম সাহেব বিশ্বাস করিলেন না। হাশিম সাহেবের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য শহীদ সাহেব নিজে চেষ্টা করিলেন। তাও তিনি বিশ্বাস করিলেন না।

১৯৪৭ সালের শেষের দিকে যখন 'ইত্তেহাদে' শহীদ সাহেবের বিবৃতি ছাপিয়া সেই সংখ্যাতেই এবং পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় শহীদ সাহেবের প্রতিবাদে সম্পাদকীয় লেখা হয় মাত্র তখনই হাশিম সাহেব সহ বন্ধুরা স্বীকার করেন ঃ হাঁ, শহীদ সাহেবের 'ইত্তেহাদে' সম্পাদকের স্বাধীনতা আছে। শহীদ সাহেব নিজে তাতে দুঃখিত হন নাই। কিন্তু হাশিম সাহেব হইয়াছিলেন। বছরের গোড়ার দিকে তিনি আমার নিন্দা করিয়াছিলেন শহীদ সাহেবকে মানার অপরাধে ; এখন তিনি আমার নিন্দা করিলেন শহীদ সাহেবকে না মানার অপরাধে। কারণ পাকিস্তান মুসলিম লীগের বদলে ন্যাশনাল লীগ করার তিনিও পক্ষপাতি ছিলেন।

মুসলিম লীগ ভাঙ্গিয়া দিয়া ন্যাশনাল লীগ করার পক্ষে যত যুক্তি আছে, তার একটারও বিরুদ্ধতা আমি করি নাই। বরঞ্চ ঐ সব যুক্তির আমি পূর্ণ সমর্থক। আমার যুক্তিটা ছিল সময়ের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। আমার বক্তব্য ছিলঃ মুসলিম লীগ ভাঙ্গিবার সময় এখনও আসে নাই। পাকিস্তান হাসিল করাতেই মুসলিম লীগের কার্য শেষ হয় নাই। পাকিস্তানের কনস্টিটিউশন না হওয়া পর্যন্ত সে কর্তব্য শেষ হইবে না। আমার যুক্তি ছিল এই ঃ পাকিস্তান-সংগ্রামে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় রূপের কোন নির্দিষ্ট কাঠামো দেয় নাই। এটা না করিয়াই যদি মুসলিম লীগ আত্ম-বিলোপ করে তবে সেটা হইবে যুদ্ধ জয় করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার আগেই সৈন্যবাহিনী ডিমবিলাইজ করার মত। আমি ওটাকে 'পলিটিক্যাল এসকেপিযম' বলিয়াছিলাম। রাষ্ট্রীয় রূপ দেওয়ার আগে পাকিস্তান ছিল মাত্র একটি ভূখন্ড। এই ভূখন্ড পাইয়াই মুসলিম লীগ সরিয়া পড়িতে পারে না। জনগণকে পাকিস্তানের কত ভাবাবেগপূর্ণ রঙ্গিন চেহারা দেখাইয়া পাকিস্তানের পক্ষে ভোট লওয়া হইয়াছে। সে রাষ্ট্রের রূপ দিয়া জনগণের অধিকারকে শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ না করিয়া মুসলিম লীগ যদি সরিয়া পড়ে তবে সেটা হইবে বিট্রেয়াল। সেজন্য আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম ঃ পাকিস্তানের একটি গণতান্ত্রিক

শাসনতন্ত্র রচনার সঙ্গে-সঙ্গে গণ-পরিষদ এবং মুসলিম লীগ এক সাথে আত্ম-বিলোপ করিবে। তার আগে নয়। আমার সম্পাদকীয় শুনিয়া শহীদ সাহেব অসন্তুষ্ট ত হনই নাই, বরঞ্চ বলিয়াছিলেন ঃ তোমার কথায় জোর আছে।

৭. মাইনরিটির আনুগত্য

দুই, পাকিস্তানের অমুসলমানদের আনুগত্য সম্বন্ধে শহীদ সাহেব দূরদর্শী জাতীয় নেতার যোগ্য কথাই বলিয়াছিলেন। সকল এলাকা ও অঞ্চলের হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা করিয়াছিল নীতি হিসাবে। পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পর কাজেই হিন্দুরা সাধারণভাবে সন্দেহের পাত্র হইয়া পড়ে। ওরা কি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত থাকিবে? এমন সন্দেহ স্বাভাবিক। প্যাটেলপন্থীদের যুক্তি পাকিস্তানী হিন্দুদের প্রতিও প্রযোজ্য একথা মনে করাও অস্বাভাবিক নয়। যারা পাকিস্তান চাহিয়াছিল, তাদের যদি হিন্দুস্থানে থাকার অধিকার না থাকে, তবে যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা করিয়াছিল, তাদেরও পাকিস্তানে থাকা উচিত নয়। এটা সাধারণ লজিক। কিন্তু সুহরাওয়ার্দী বিবৃতি দিয়া বলিলেন ঃ পাকিস্তানের হিন্দুদের বেলা এ যুক্তি চলিবে না। তিনি বলিলেন, হিন্দুস্থানের মুসলমানও পাকিস্তানের হিন্দুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। যুক্ত প্রদেশ ও মাদ্রাজ ইত্যাদি হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের মুসলমানরা যখন পাকিস্তান দাবি করিয়াছিল, তখন তারা জানিয়া-বুঝিয়াই করিয়াছিল যে তাদের বাসস্থান পাকিস্তানে পড়িবে না। কাজেই তারা মনের দিক দিয়া প্রস্তুত ছিল ঃ হয় তারা বাস্তুত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া যাইবে, নয় ত হিন্দুস্থানের বাসিন্দা হিসাবে নিজ নিজ বাসস্থানে থাকিয়া যাইবে। কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দুদের বেলা তা বলা চলে না। পূর্ব বাংলার বা পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুরা মনের দিক দিয়া প্রস্তুতির সময় পায় নাই। শেষ পর্যন্ত তারা আশা করিয়াছিল, দেশ ভাগ হইবে না। কাজেই তাদের বাস্তুত্যাগ বা আনুগত্য পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই উঠে নাই। এখন যখন দেশ ভাগ হইয়া হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হইয়া গিয়াছে, তখন হিন্দুদিগকে মনের দিক দিয়া প্রস্তুত হইবার উপযুক্ত সময় দিতে হইবে। যে সব হিন্দু দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান ত্যাগ করে নাই, ধরিয়া নিতে হইবে তারা পাকিস্তানী হইতে চায় ; দেশ ভাগের মানসিক ধাক্কা সামলাইয়া মনের দিক দিয়া পাকিস্তানী হওয়ার জন্য তাদের সময় দিতে হইবে। এখনই এই মুহূর্তে তাদের আনুগত্য লইয়া খোঁচাখুঁচি ঝাকাঝাকি করা অন্যায় হইবে। হিন্দুরা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী হইবে কি না, এটা শুধু তাদের মনের উপর নির্ভর করে না ;

মুসলমানদের ব্যবহারের উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। পাকিস্তানকে মুসলমানরা শুধু মুসলমানের দেশ মনে করে কি না, হিন্দুরা পাকিস্তানে সমান অধিকার লইয়া সসম্মানে থাকিতে পারিবে কি না, এ সব বিচার করিতে সময়ের দরকার। হিন্দুদেরে সে সময় দিতে হইবে এবং ইতিমধ্যে মুসলমানদেরও নিজের কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

৮. বাস্তুত্যাগে পাকিস্তানের বিপদ

সুহরাওয়ার্দীর এই সব যুক্তি সাধারণ মানবতার দিক দিয়া অকাট্য ন্যায়-ও যুক্তি-সঙ্গত ত ছিলই, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা হিসাবেও অবশ্য পালনীয় ছিল। পাকিস্তানের জন্য আরও বেশি ছিল। উভয় রাষ্ট্রই থিওরেটিক্যালি নয়া রাষ্ট্র হইলেও পাকিস্তান ছিল বাস্তবিকই নয়া। শাসনতন্ত্র, অর্থনীতি, শান্তি রক্ষা ও দেশ রক্ষা সব দিক হইতেই পাকিস্তানকে গড়িতে হইতেছিল একদম অ আ ক খ হইতে ; ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'ফ্রম দি স্ক্র্যাচ'। এই সময় তার জটিল সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছিল লক্ষ লক্ষ লোকের বাস্তুত্যাগ। বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসন উভয় রাষ্ট্রের জন্যই ছিল একটা বিরাট ও বিপুল সমস্যা। কিন্তু পাকিস্তানের জন্য ছিল এটা অনেক বেশি জটিল। তার উপর যদি সব মুসলমান বা তাদের অধিকাংশ ভারত ছাড়িয়া পাকিস্তানে আসা শুরু করে, তবে তাদেরে সামলানো পাকিস্তানের পক্ষে কার্যতঃ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী একদল হিন্দু সর্দার প্যাটেলের আশকারা পাইয়া সব মুসলমানকে এক সঙ্গে তাড়া করিয়া পাকিস্তানে ঠেলিয়া দিয়া পাকিস্তান ডুবাইয়া দিবার কথাও তুলিয়াছিল। 'ট্র্যাংকেটেড' 'মথইটেন' ছাঁটাই-করা পোকায়-খাওয়া পাকিস্তানের ক্ষুদ্রায়তনের ভূখণ্ডকে এরা জলে-ভাসা যাত্রী ভর্তি ছোট নৌকার সাথে তুলনা করিতেছিল। তারা বিশ্বাস করিত এই যাত্রীভর্তি তল-তলায়মান নৌকায় জোর করিয়া আরও কিছু যাত্রী তুলিয়া দিলেই এ নৌকা ডুবিয়া যাইবে। কথাটা নিতান্তই বাজে কথা ছিল না। দশ কোটি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ছয় কোটি লইয়া পাকিস্তান হইয়াছিল। বাকী চার কোটিই হিন্দুস্থানে ছিল। কাজেই বাস্তুত্যাগীর চাপে পাকিস্তান খতম করার আশা একদল পাকিস্তান-বিরোধীর মাথায় আসিয়াছিল। গান্ধী-নেহরু আজাদের দূরদর্শিতায় এবং তাঁদের সত্যিকার অনুসারীদের সহায়তায় এ বিপর্যয় ঘটিতে পারে নাই। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে পরিপূরক নীতি অনুসৃত না হইলে এ বিপর্যয় ঠেকানো যাইত না। নেহরু-লিয়াকত চুক্তি এই সুষ্ঠু দূরদর্শী নীতির দলিল। কিন্তু সুহরাওয়ার্দীর দুঃখ ছিল, পাকিস্তান

সরকার অনেক দেরিতে এই নীতির মূল্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুহরাওয়ার্দীর ৪৭-৪৮ সালের শান্তি মিশন ও শান্তি-সেনা পরিকল্পনা ছিল মূলতঃ এবং প্রধানতঃ পাকিস্তানের কল্যাণের স্কিম। দুই বাংলার মধ্যে শান্তি রক্ষা করিয়া বাস্তুত্যাগ বন্ধ করা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জীবন-মরণের প্রশ্ন। নাযিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় অদূরদর্শী ক্ষুদ্রতা সুহরাওয়ার্দীর ঐ দূরদর্শী নীতি কার্যকরী করিতে দেয় নাই। তার জের আমরা আজও টানিতেছি।

মহাত্মাজীর হত্যায় ভারতীয় মুসলমানদের মনে আরেকটা আচমকা সাংঘাতিক ধাক্কা লাগে। পাকিস্তানী নেতাদের জন্য ছিল এটা একটা হুঁশিয়ারি। তবু তাঁরা হুঁশিয়ার হন নাই।

৯. মহাত্মাজীর নিধন

১৯৪৮ সালের ৩০শা জানুয়ারি বিকাল চারটায় চৌরঙ্গির মোড়ে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতেছিলাম মানে পুস্তকের দোকান হইতে দোকানান্তরে বই হাতাইয়া ফিরিতেছিলাম। বিভিন্ন বই-এ ভরা এই সব বুক স্টলে পুস্তক দেখিয়া বেড়ানো ছিল আমার চিরকালের অভ্যাস। বেশির ভাগ সময় অবশ্য আমি ফুটপাতের পুরান পুস্তকের দোকানে ঘুরিতাম। ফুটপাতের দোকানদাররা প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এদের দোকান আর তেমন বসে না। সেজন্য চৌরঙ্গির নয়া পুস্তকের দোকানগুলিই এখন আমার প্রধান হামলা স্থল। কিনার চেয়ে অবশ্য হাতাইতামই বেশি। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধা হইত না। দোকানদাররা আমাকে কিছু বলিত না। একটানা বার বছর ধরিয়া এই সব দোকানের লোকেরা কালা-শেরওয়ানী-পরা এই লোকটাকে তাদের দোকানে দেখিয়া আসিতেছে। কিছু কিছু লোক আমাকে 'উকিল ছাব' বা 'এডিটর ছাব' বলিয়া জানিত। নাম কেউ জানিত না। তবু তাদের নিজস্ব পন্থায় আমার সম্মান করিত অর্থাৎ দেখিতে চাহিলে যে-কোন বই দেখাইত যদিও জানিত শেষ পর্যন্ত আমি ঐ বইটা কিনিব না। একেবারে যে কিনিতাম না, তাও নয়। শ টাকার বই ঘাটিয়া শেষ পর্যন্ত আট-আনা-এক টাকার একখানা অবশ্যই কিনিতাম। তাও আবার সব দিন নয়। এ অভ্যাস আমার তাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমাকে দেখিলেই তারা মুচকি হাসিয়া এ-ওর দিকে চাহিত। আমাকে দেখিয়া তারা যে হাসিতেছে, তা আমিও বুঝিতাম। কিন্তু গায় মাখিতাম না। আমিও হাসিতাম। কারণ তারা বলিত ঃ 'আই এ ছাব'। মনে মনে বোধ হয় বলিত ঃ দু'চারঠো দেখ্‌কে চলে যাই এ ছাব।'

এমনি এক পুস্তকের দোকানে ঐদিনও পুস্তক ঘাটিতেছিলাম। পিছনের কুঠরি হইতে একজন বাহির হইয়া আমাকে দেখিয়া হাত তুলিয়া সালাম করিল এবং বলিল : ছোনা সাব, গান্ধীজীকো ত গুলি মারা।

আমি এইরূপ চিৎকার করিয়া বলিলাম : ক্যা কাহা?

দোকানদার তার কথা রিপিট করিল।

'কাহাঁ ছোনা, কৌন কাহা?' আমি জিজ্ঞাস করিলাম।

'আবহি রেডিও মে বোলা'। দোকানদার বলিল।

'যিন্দা হ্যায় ইয়া মারা গ্যায়ে? শেষ আশা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

দোকানদার বলিল : রেডিওতে তা বলে নাই।

আমি বেহুশের মত এসপ্ল্যানেডে ফিরিয়া আসিলাম।

ট্রামে উঠিলাম। পার্ক সার্কাস ট্রামে চড়িয়া বুঝিলাম, ট্রাম-যাত্রীরা কেউ কিছু জানে না। বলিলাম না কিছু। যদি উত্তেজনা দেখা দেয়। বলিয়া যদি ভুল বুঝাবুঝির ভাগী হই।

আফিসে ফিরিয়া আগে নিউযডিপার্টে গেলাম। টেলিপ্রিন্টারে নিউয তখনও আসে নাই। নিজেই খবরটা ঘোষণা করিলাম। কোনও আলোচনায় যোগ না দিয়া নিজের কামরায় আসিলাম। টেবিলের উপর মাথায় হাত রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ মধ্যেই টেলিফোন আসা শুরু হইল। কিছুক্ষণ পরেই লোকের ভিড় হইতে লাগিল। লোক মানে মুসলমান। পার্ক সার্কাস মুসলমান এরিয়া। এখানকার নেতৃস্থানীয় লোকেরা ত বটেই, দূর-দূরান্তের মুসলিম নেতারাও আসিয়া 'ইত্তেহাদ' আফিসে ভিড় জমাইলেন। আমার সহকর্মী বন্ধুরা যথাসম্ভব লোকজনকে নিচে হইতেই বিদায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কলুটোলা-যাকারিয়া স্ট্রিটের একদল বড় লোক নেতাকে আমার কামরায় আসিতে না দিয়া পারিলেন না। এঁরা সকলে মোটরে চড়িয়া আসিয়াছেন। কুড়ি-পঁচিশ জনের কম হইবে না। অত চেয়ার আমার কামরায় ছিল না। প্রায় আধাআধি লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আমি চেয়ার আনাইতে চাহিলে তাঁরা দৃঢ়ভাবে মানা করিলেন। কাজেই অর্ধেক বসা-অর্ধেক খাড়া অবস্থায় আলোচনা শুরু হইল।

এঁদের নেতা নাখোদা মসজিদের পেশ-ইমাম সাহেব। বড় আলেম। তেমনি বড় পাগড়ি। ইতিমধ্যে টেলিপ্রিন্টারে বিস্তারিত বিবরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। সব তাঁদেরে শুনাইলাম। সব শুনিয়া পেশ ইমাম সাহেব বলিলেন ঃ 'গান্ধীজী ত মারা গ্যায়ে, আব মুসলমানোঁকা ক্যা হোগা?'

প্রশ্নটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মুসলমানরা গান্ধীজীকে এতটা বিশ্বাস করিত। এমনি আশ্রয়স্থল মনে করিত তাঁকে। এই মাত্র পনর দিন আগে আমরণ অনশনব্রত করিয়া তিনি দিল্লী ও উপকণ্ঠের মুসলমানদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। হিন্দুদের-হাতে-ভাঙ্গা মসজিদগুলি তাদেরে দিয়াই মেরামত করাইয়াছেন। পাকিস্তানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেওয়াইয়াছেন। সেই মহাত্মাজীই আজ আততায়ীর গুলিতে নিহত হইলেন মুসলমানদের পক্ষ নেওয়ার অপরাধে। কাজেই স্বাভাবিক প্রশ্নঃ 'আব মুসলমানোঁকা ক্যা হোগা?'

আমার অজ্ঞাতে বিনা চিন্তায় আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল ঃ 'মহাত্মাজী মারা গ্যায়ে ছহি, লেকেন আল্লা ত নেহী মরা।'

সবাই স্তম্ভিত হইলেন। আমি নিজেও। অন্য সবার মত, তাঁদেরই সাথে, আমার মুখে আমিও ঐ কথাটা শুনিলাম। তার আগে আমিও জানিতাম না, ঐ কথাটাই আমি বলিতেছি। বাস্তবতার ক্ষেত্রে ও-কথার কোনও অর্থ হয় না। কাজেই পেশ-ইমামের প্রশ্নের জবাব ওটা নয়। তবু ওটা ছাড়া বলিবার ছিলইবা কি? চরম বিপদে মুসলমানের মুখে ও-কথা ছাড়া আর কি আসিতে পারে?

তবু পেশ-ইমাম সাহেবের মনেই কথাটা আছর করিল বেশি। অত বড় ভারত-বিখ্যাত আলেম। অত বড় পাগড়ি! অত লম্বা দাড়ি। তিনি ভাবিতেও বোধ হয় পারেন নাই, এই দাড়ি-মোচ-মুড়ানো নাংগা-ছের ইংরাজী-দাঁ খুব-সম্ভব-বেনামাযী একটা লোকের মুখে অমন কথা শুনিবেন। কিন্তু বিস্মিত হওয়ার চেয়ে তিনি লজ্জা পাইলেন বেশি। তাঁর চোখে-মুখে তা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তিনি নিজের সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ এডিটর সাহেব ছহি বাৎলাইয়াছেন ঃ মুসিবত দিয়াই আল্লা মোমিনের ঈমানের জোর পরখ করেন। এর পর যা কথাবার্তা হইল, তার প্রতিক্রিয়া খুবই ভাল হইল। চিন্তাকুল ভীতিগ্রস্ত বিষণ্ন মুখে যারা আসিয়াছিলেন, আশা-পূর্ণ আশ্বস্ত হাসিমুখে তাঁরা ফিরিয়া গেলেন।

১০. আমার নযরে গান্ধী

মহাত্মাজীকে আমি কতটা ভালবাসিতাম, ঐদিনের আগে আমি নিজেও তা বুঝিতে পারি নাই। মহাত্মাজীর জীবন-দর্শন এবং তাঁর রাজনৈতিক মতবাদও আমাকে অনেকখানি প্রভাবিত করিয়াছিল। এতটা করিয়াছিল যে ১৯৪২ সালে কোন এক সময়ে আমার কমিউনিস্ট বন্ধুদের সাথে তর্কে-তর্কে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম ; 'গান্ধীযম ইয এ্যান ইমপ্রুভমেন্ট আপ-অন মার্কসিযম।' অনেকখানি কনভিকশন লইয়াই ও-কথা বলিয়াছিলাম। আজও তাঁর মৃত্যুর বিশ বছর পরেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমার অটুট আছে। কিন্তু সেদিন তাঁর অমন মৃত্যুতে আমি যেন নেতৃবৃন্দসহ সমগ্র ভারতবাসীর উপর সাধারণভাবে এবং হিন্দুদের উপর বিশেষভাবে ক্ষেপিয়া গিয়াছিলাম। আমার এই ক্ষেপামি কতদূর গিয়াছিল, তা প্রকাশ করিয়াছিলাম এক প্রবন্ধে। সে প্রবন্ধ 'ইত্তেহাদের' সম্পাদকীয় নয়, পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রকাশিত এক পুস্তকে। মহাত্মাজীর হত্যার স্মারকস্বরূপ পশ্চিম বাংলা সরকার একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় এই পুস্তক লেখা হয়। চৌদ্দ-পনর জন সাহিত্যিকের সঙ্গে আমারও একটি লেখা নেওয়া হয়। আমার লেখাটিকেই তিনি প্রাপ্যাধিক সম্মানের স্থান দেন। ঐ প্রবন্ধে আমি গোটা হিন্দু জাতিকে কষিয়া গাল দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলামঃ হিন্দু জাতির নীচতাই মহাত্মাজীর উচ্চতার প্রমাণ। রোগ যত কঠিন হয়, তত বড় ডাক্তার দরকার হয়। মহাত্মা গান্ধী এমন মুনি-ঋষি-তুল্য মহৎ ব্যক্তি ছিলেন যে আফ্রিকার জঙ্গলে যদি তিনি খালি গায় খালি পায় খালি হাতে বেড়াইতেন, তবে সেখানকার বাঘ-ভাল্লুক ও সাপ-বিচ্ছুও তাঁকে আঘাত করিত না। তেমন মহাপুরুষের গায় হাত দিবার, তাঁকে খুন করিবার, লোক হিন্দু সমাজ ছাড়া আর কোন মানব-গোষ্ঠীতে পাওয়া যাইত না। এতে প্রমাণিত হইল যে হিন্দু জাতি মানব জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হইল যে মহাত্মাজী বর্তমান বিশ্বের মহত্তম ও উচ্চতম মহাপুরুষ। কারণ আল্লা নিকৃষ্টতম অধঃপতিত জাতির চিকিৎসার জন্য নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষই পাঠাইয়াছিলেন।

এই কঠোর গালাগালির জন্যই নাকি আমার প্রবন্ধকে সম্মানের স্থান দেওয়া হইয়াছিল। প্রফুল্ল বাবু নিজে ও আরও বহু হিন্দু নেতা ও লেখক-সাংবাদিক মুখে ও টেলিফোনে আমাকে মোবারকবাদ দিয়াছিলেন। রাগটা কিছু কমিলে আমি বুঝিয়াছিলাম, হিন্দুস্থানে বসিয়া হিন্দু জাতিকে এমন গাল দিয়া সম্মান ও তারিফ

পাইলাম। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন কথা বলিলে তা পাকিস্তানেই হোক, আর হিন্দুস্থানেই হোক, মহাত্মাজীর পিছে-পিছেই আমাকে দুনিয়া ত্যাগ করিতেই হইত। কাজেই শেষ পর্যন্ত বুঝিলাম ঃ হিন্দু সমাজ নীচ বটে কিন্তু সে নীচতা বুঝিবার মত উচ্চতাও তাদের আছে।

গান্ধী-ভক্তি দেখাইতে গিয়া কায়েদে-আযমকেও আমি ছাড়িয়া কথা কই নাই। মহাত্মাজীর মৃত্যু উপলক্ষে শোক-বাণীতে কায়েদে-আযম বলিয়াছিলেন ঃ 'ভারত একজন মহান হিন্দু হারাইল।' আমি 'ইত্তেহাদের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিলাম ঃ কায়েদে-আযমের বলা উচিৎ ছিল ঃ মহাত্মাজীর হত্যায় পাকিস্তান হারাইল একজন ফ্রেণ্ড, দুনিয়া হারাইল একজন ফিলোসফার, আঁর ভারত হারাইল একজন গাইড'। তিনি সত্য-সত্যই এদের একজন ফ্রেণ্ড, ফিলোসফার ও গাইড ছিলেন। ইতিহাস বরাবরই এ সাক্ষ্য বহন করিবে।

১১. আহত সিংহ

'ইত্তেহাদ' আফিসের খুবই কাছে একই পার্কস্ট্রিটের অপর পাশে হক সাহেবের বাসা। পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকাতে সমগ্র রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও রাষ্ট্র-নেতারাও চলিয়া আসিয়াছেন। হক সাহেব আমাদের মতই তখনও কলিকাতায় পড়িয়া আছেন। পাকিস্তান-প্রস্তাবের প্রস্তাবক হইয়াও তিনি শেষ পর্যায়ে জিন্না সাহেবের সাথে ঝগড়া করিয়া মুসলিম লীগ হইতে বাহির হইয়া যান। পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী আখ্যায়িত হন। জিন্না সাহেব বলেন ঃ 'ফযলুল হকের কপালে ওয়াটারলু (চরম পরাজয় ও রাজনৈতিক মৃত্যু) ঘটিয়াছে।' যারা ফযলুল হককে জানিত তারা এটাও জানিত যে শেরে-বাংলার মৃত্যু ঘটে নাই। বাংলার সিংহ আসলে সাংঘাতিক আহত হইয়া তখন নিজের ঘা চাটিতেছিলেন। ইংরাজীতে বলা হয় ঃ লায়ন লিকিং হিজ উণ্ডস্। সিংহ চাটিয়াই নিজের ঘা শুকায়। ১১৬নং পার্কস্ট্রিটে বসিয়া-বসিয়া বাংলার সিংহ তখন তাই করিতেছিলেন। অবসর কাটাইবার জন্য তিনি প্রায়ই বিকালে আমার রুমে আসিয়া গল্প-গোযারি করিতেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম ঃ 'আপনের মত জনপ্রিয় নেতা বাংলায় আর একজনও ছিলেন না। এমন একদিন ছিল যেদিন আপনে ইন্তেকাল করলে আপনের জানাযায় লক্ষ লোক হৈত। আজ খোদা-না-খাস্তা আপনে এন্তেকাল করলে পাঁচশ লোকও হৈব কি না সন্দেহ।'

হক সাহেব তাঁর স্বাভাবিক ছাত-ফাটা হাসি হাসিয়া বলিলেন ঃ 'তোমরা আমার রাজনৈতিক দুশমনরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমাদেরে খুশী করবার লাগি এখনই

আমি মরতেছি না। আমার সময় মতই আমি মরব। আমার জনপ্রিয়তা কমছে কি বাড়ছে, সেদিনই তোমরা তা বুঝতে পারবা।'

বাপের তুল্য বুড়া মুরুব্বির মরার কথা মুখের উপর বলিয়া বেআদবি করিয়াছি। মনে অনুতাপ হইল। শোধরাইবার আশায় দরদের সুরে তাঁর বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তির কথা তুলিলাম। ঐ সব ভুল না করিলে তিনি আন-পপুলার হইতেন না। তিনি স্বীকার করিলেন না। তাঁর কোনও ভুল হয় নাই। তাঁর দুশমনেরা পশ্চিমাদের খপ্পরে পড়িয়া তাঁর মিথ্যা বদনাম দিয়া সাময়িকভাবে তাঁকে বেকায়দায় ফেলিয়াছে। আমি প্রতিবাদে বলিলাম ঃ 'অন্যায় না করলে মিথ্যা বদনাম কেউ দিতে পারে না। কই আমার বদনাম ত কেউ করে না।'

তিনি আবার ছাত-ফাটা হাসি হাসিলেন। বলিলেনঃ 'তোমার বদনাম লোকে কেন করব? তুমি কোন্ ভাল কাজটা করছ? লোকের কোন্ উপকারটা করছ? আগে লোকের উপকার কর। দু'চারটা ভাল কাজ কর। তখন দেখবা লোকে তোমার বদনাম শুরু করছে। আম গাছেই লোকে ঢিল মারে। শেওড়া গাছে কেউ মারে না। ফজলী আমের গাছে আরও বেশী মারে।'

ফযলুল হকের এ কথার সত্যতা বুঝিতে আমার দশ-পনর বছর লাগিয়াছিল।

ষোলই অধ্যায়

কালতামামি

১. বাংলার ভুল

১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল তক এই দশটা বছর শুধু একটা যুগ নয়, একটা মহাযুগ। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী যুগ। বিপ্লবটা শুধু দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্যই নয়, আমার ও আমার মত হাজার হাজার কর্মীর চিন্তার কাঠামোর জন্যও। কোথা হইতে কেমন করিয়া কিসের জন্য কি হইয়া গেল, কিছুই বোঝা গেল না। এক কাজ ছাড়িয়া আরেক কাজ ধরিতে-না-ধরিতেই পরেরটাও বাতিল হইয়া গেল। এক চিন্তা ছাড়িয়া আরেক চিন্তা ধরিতে-না-ধরিতেই পরের চিন্তাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়া গেল। যেন সব ম্যাজিক!

কিন্তু এটা ম্যাজিক ছিল না মোটেই। এতদিন পরে পিছনের দিকে এক নজর তাকাইলে দেখা যাইবে সত্যই যেন কোনও অদৃশ্য হাতের বজ্র-মুষ্টিতে ধরা অসহায় প্রাণীর মতই আমরা অঙ্গ চালনা করিয়াছি। কিন্তু পুতুল নাচ নয়। সত্য-সত্যই ঘোরতর জীবন-নাট্যের অভিনেতা-অভিনেত্রীর সিরিয়াস ভূমিকা। এতদিন পরে মনে হইবে, কতই না ভুল হইয়াছে! আমরা বলিব ওরা করিয়াছে ; ওরা বলিবে আমরা করিয়াছি। কারও না কারও ভুল হইয়াছে নিশ্চয়ই। অথবা সত্য কথা এই যে এক ব্যাপারে তুমি ভুল করিয়া থাকিলে আরেক ব্যাপারে আমিও ভুল করিয়াছি নিশ্চয়ই। এটাই দেখা যাইবে আলোচ্য যুগের ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণে।

পলাশির যুদ্ধের মত এ যুগের ভুলটাও শুরু হয় বাংলার মাটি হইতেই। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে কংগ্রেস যুক্ত প্রদেশ বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশে মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে অসম্মত হইয়া যে মারাত্মক ভুল করিয়াছিল, তাও শুরু হইয়াছিল কার্যতঃ বাংলাতেই। এখানে হক সাহেবের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা-পার্টি কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের যে প্রস্তাব চূড়ান্ত করিয়াছিল তা ভাঙ্গিয়া যায় তুচ্ছ বিষয়ে কংগ্রেসের মারাত্মক ভুলের দরুন। তারপর হক মন্ত্রিসভার প্রতি গোটা বাংলার এটিচুড আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের উপদেশ-মত না হওয়াটা গোটা বাংলার জন্যই চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র একই প্যাটার্নের বাংগালী জাতির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই স্বপ্নের

সাফল্যের জন্য রাষ্ট্র-নায়কদের মনে যে অন্তর্মুখী দৃষ্টির (ইন্‌ওয়ার্ড লুকিং) প্রয়োজন ছিল, সেটা ছিল তৎকালে একমাত্র হক সাহেবের মধ্যেই। কিন্তু সিরাজদ্দৌলাকে কেন্দ্র করিয়া যে বাংগালী জাতিত্বের পরিকল্পনা করিয়াছিল বাংলার হিন্দুরাই, বিশ শতকের তৃতীয় দশকের নয়া চিন্তা ভারতীয় জাতিত্বের বন্যায় সেই বাংগালী হিন্দুই ভাসিয়া যায়। তারা পশ্চিমমুখী হইয়া পড়ে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে তারা একদিকে অখণ্ড ভারতের বিরোধী এবং অপর দিকে বাংলায় মুসলিম–রাজ মনে করিতে শুরু করে। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলার মুসলমানরা, এমন কি স্বয়ং হক সাহেবও, কাজে–কর্মে পশ্চিমমুখী হইয়া পড়েন। বাংলা 'অখণ্ড ভারতের' রাজনৈতিক দাবা–খেলার 'বড়িয়া'য় পরিণত হয়। হক মন্ত্রিসভা প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনী আইন ও সালিশী বোর্ডের মারফত ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে শোষিত জনগণের এত উপকার করিলেন, তবু হিন্দু রাষ্ট্র–নেতা ও কংগ্রেসের মুখে এই মন্ত্রিসভার তারিফে একটি কথাও উচ্চারিত হইল না। বরং হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাদের রাগ ও দুশমনি বাড়িতেই লাগিল। ফলে হক সাহেব ও হকপন্থী মুসলিম নেতারাও নিতান্ত আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ নিখিল–ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু হক সাহেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই জানিতেন, নিখিল–ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্ব বাংগালী মুসলিম স্বার্থ বলিয়া কোনও কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। বাংলার মুসলিম স্বার্থও তাঁরা বিচার করিতেন নিখিল–ভারতীয় মুসলিম স্বার্থের মাপকাঠি দিয়া। 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামক নব–সৃষ্ট মুসলিম–প্রদেশটিকে 'প্রতিষ্ঠিত সত্য' বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে বাতিল করা হইলে এই কারণেই নিখিল–ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্ব হইতে এই বিশ্বাস ভংগের কোনও সিরিয়াস প্রতিবাদ উঠে নাই। বিহার–যুক্ত–প্রদেশ–বোম্বাই–মাদ্রাজে কতিপয় মুসলিম আসন আদায় করিতে গিয়া মেজরিটি বাংগালী মুসলমানকে চিরস্থায়ী মাইনরিটি করিয়া লাখনৌ–প্যাকটে দস্তখত করিতে পারিয়াছিলেন তাঁরা এই কারণেই। এসব ঘটনা হক সাহেবের চোখের সামনেই ঘটিয়াছিল। 'ভারতীয় রাজনীতিতে আমি সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগার, বাংলার রাজনীতিতে আমি অসাম্প্রদায়িক প্রজা–নেতা' কথাটা হক সাহেব বলিতে পারিয়াছিলেন এই জন্যই। আমরা তখন তাঁকে বুঝি নাই। মানি ত নাইই। কিন্তু হক সাহেব নিজেই কি বুঝিয়াছিলেন তাঁর কথার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ?

পরে যখন তিনি বুঝিয়াছিলেন, তখন তাঁর বাহির হওয়ার পথ বন্ধ। তা সত্ত্বেও তিনি যখন বাহির হইয়াছিলেন, তখন তিনি একা। মুসলিম–বাংলা আর তাঁর পিছনে নাই। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও পাকিস্তান আন্দোলনের মোকাবিলায় হক নেতৃত্বের

কৃষক-প্রজা পার্টি ও হক মন্ত্রিসভার ভূমিকার অন্তর্নিহিত বাণী ও শিক্ষা এই। এই কারণেই এই সময়কার অজানা ঘটনাবলী আমি অতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৩৮ সালে হক সাহেবের মুসলিম লীগে যোগদান ও প্রাদেশিক লীগের সভাপতিত্ব গ্রহণ, আমাদের সকলের অত অনুরোধেও কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতিত্বে ইস্তফা না দেওয়া, বাংলার ক্ষেত্রে মুসলিম-আন্দোলন ও প্রজা আন্দোলনকে একই আন্দোলন বলা, স্বয়ং লাহোর প্রস্তাব পেশ করা এবং শেষ পর্যন্ত জিন্না সাহেবের সহিত মুসলিম বাংলার ভবিষ্যৎ লইয়া কলহ করা ও ১৯৪১ সালের ১০ই অক্টোবরের ঐতিহাসিক পত্র লেখা ও প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার যেন যুগ ও ভাগ্য-বিবর্তনের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই ঘটিয়া গিয়াছে। এতে বাধা দিবার বা এর গতি পরিবর্তনের ক্ষমতা যেন কারুরই ছিল না। হক সাহেবের মনে কি বিপুল চাঞ্চল্যের ঝড় বহিতেছিল, তা এই সময়কার ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।

২. কংগ্রেসের আত্মঘাতী-নীতি

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যে মারাত্মক ভুল করিয়াছিল ১৯৪৭ সালে সে ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করে তারা। কেবিনেট মিশন প্ল্যান সাবটাশ করাই এই দ্বিতীয় ভুল। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের সমবায়ে তিন বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকার সহ একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে স্বপ্ন আমরা বামপন্থী কর্মীরা দেখিতেছিলাম, কেবিনেট মিশনের গ্রুপিং সিস্টেম কৌশলে সাবটাশ করিয়া কংগ্রেস আমাদের সে স্বপ্ন চুরমার করিয়া দিয়াছিল।

কংগ্রেসের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহরু নিজ মুখে ও হাতে এই সাবটাশ কাজটি করিয়াছিলেন। সেজন্য মুসলিম লীগ-পন্থী মুসলমানরা ত বটেই এমন কি কংগ্রেস-নেতা স্বয়ং মওলানা আবুল কালাম আজাদ পর্যন্ত পণ্ডিত নেহরুর নিন্দা করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অনেক ছোট-বড় নেতা-কর্মীও করিয়াছেন। আমিও করিয়াছি। কারণ এটা সুস্পষ্ট সত্য যে পণ্ডিত নেহরু ঐ কথা না বলিলে মুসলিম লীগ গ্রুপিং সিস্টেম গ্রহণ প্রত্যাহার করিত না। ফলে একটা আপোস হইয়া যাইত। মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে ও কেন্দ্রীয় সরকারে প্রবেশ করিত।

কিন্তু এর আরো একটা দিক আছে। পণ্ডিত নেহরু যে কথাটা বলিয়াছিলেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের কথা ছিল না ; অধিকাংশ কংগ্রেসী হিন্দু নেতার মনের কথা ছিল। নেহরুজী সরলভাবে আগেই সে কথা বলিয়া দিয়া মুসলিম-লীগারদের হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। সার্বভৌম গণ-পরিষদ কারও কোনও চুক্তি মানিতে বাধ্য নয়, এই

কথাটাই তিনি গণ-পরিষদে বসিবার আগে গণ-পরিষদের বাইরে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। ধরুন, ঐ সময়ে ও-কথা না বলিয়া মুসলিম লীগ সহ গণ-পরিষদ বসিবার পরে শাসনতন্ত্র রচনাকালে পরিষদ-কক্ষে দাঁড়াইয়া তিনি যদি তা বলিতেন, তবে কেমন হইত? মুসলিম লীগকে নিশ্চয় বেকায়দায় ফেলা হইত। গণ-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মুসলিম লীগকে বাহির হইয়া আসিতে হইত। নূতন করিয়া আন্দোলন শুরু করিতে হইত। তাতে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক আরও তিক্ত হইত। 'কেবিনেট মিশন প্ল্যান সফল হইয়াছে, কংগ্রেস লীগ উভয়ে তা কার্যকরী করিতে শুরু করিয়াছে', এই কথা ঘোষণা করিয়া ততদিনে কেবিনেট মিশন নিশ্চিন্তে দেশে ফিরিয়া যাইতেন। কাজেই গণ-পরিষদের ভিতরকার ঐ গণ্ডগোলে নূতন করিয়া দেন-দরবার আলাপ-আলোচনা মিশন-কমিশন শুরু হইত। পণ্ডিত নেহরুর ১০ই জুলাইয়ের ঘোষণার ফলে এটা ঘটিতে পারে নাই। মুসলিম লীগ তৎক্ষণাৎ প্ল্যান অগ্রাহ্য করিয়াছিল। ফলে বৃটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন দেশ-বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। নেহরুর ঘোষণা ঐ সময় না হইয়া পরে হইলে ৩রা জুনের ঘোষণাও আরও পিছাইয়া যাইত। এতে আরও রক্তক্ষয় হইত। মুসলমানরা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইত। এটা না হইয়া যে তখনই একটা এস্পার-ওস্পার হইয়া গিয়াছিল, এর জন্য দায়ী পণ্ডিত নেহরু। আমার এখানকার বিবেচনায় ঐ বিবৃতি দিয়া পণ্ডিতজী মুসলমানদের উপকারই করিয়াছিলেন।

দেশ ভাগটা হাতে-কলমে হওয়ার সময় স্বভাবতঃই আমার মত নিচের তলার মুসলিম লীগ-কর্মীর কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। অন্যান্য লক্ষ-লক্ষ কর্মীর মতই আমারও ভূমিকা ছিল অজ্ঞ দর্শকের। উপরের তলায় ও ভিতরে-ভিতরে সব ঘটিয়া যাইত। ঘটনার পরে আমরা শুনিতাম। কোনটায় খুশী হইতাম ; কোনটায় চটিয়া যাইতাম। কিন্তু তাতে ঘটনার কোনও এদিক-ওদিক হইত না। তবু প্রধানমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দী সাহেবের দৈনিক কাগযের সম্পাদক হিসাবে আমার একটু সুবিধা ছিল। কোনও কোনও ঘটনা ঘটিবার আগে আঁচ ও আভাস পাইতাম। নেতাদের কেউ কেউ কিছু কিছু আভাসে ইংগিতে বলিতেনও। আবার সাংবাদিকের বিশেষ অধিকার যে 'ভৌতিক সোর্স' তারাও কিছু কিছু সংবাদ অর্থে গুজব সরবরাহ করিত।

৩. প্রবঞ্চিত মুসলিম-বাংলা

ঐ সব ঘটনা হইতে আমার তখনই সন্দেহ হইতেছিল যে বাঁটোয়ারার ব্যাপারে মুসলিম বাংলার উপর সুবিচার হইতেছে না। যতই দিন যাইতেছিল ততই আমার

সন্দেহ দৃঢ়তর হইতেছিল। পরে তা বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল। ব্যাপারটা আমাকে খুব পীড়া দিত। যে মুসলিম-বাংলার ভোটে পাকিস্তান আসিল, ভাগ-বাঁটোয়ারার সময়ে তাদেরই প্রতি এ বঞ্চনা কেন? কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু অবিচার চলিল নির্বিবাদে। নেতাদের অর্থাৎ জনগণের ভাগ্য-নিয়ন্তাদের চোখের সামনে, তাঁদের সম্মতিক্রমে, বাঁটোয়ারায় মুসলিম বাংলাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও ন্যায্য হক হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। অপরের স্বার্থের যুপকাষ্ঠে মুসলিম বাংলার মানে পূর্ব বাংলার স্বার্থ বলি দেওয়া হইয়াছে। 'কলিকাতা চাই' আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, বেংগল পার্টিশন কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউন্সিলের দুই নীতি, দায় ও সম্পত্তি হিসাব-নিকাশে শুভংকরের ফাঁকি ইত্যাদি ব্যাপারে এই জন্যই আমি অত বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ও-সব কথাই রেকর্ডের কথা বটে, তার অধিকাংশই খবরের কাগযে প্রকাশিত তথ্যও বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে তা ভুলিয়া যাওয়া শুরু করিয়াছেন। পাকিস্তান সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী নেতা-কর্মীদের অবর্তমানে আমাদের নয়া পুস্তের তরুণরা এ সব কথা জানিবে না। প্রাচীন কাগয-পত্র ঘাটিয়া এ সব কথা জানিবার কৌতূহলের কোনও অজুহাতও তাদের থাকিবে না। তাই এ সব কথা একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ তরুণদের চিন্তার খোরাক ও জ্ঞানের মাল-মশলা হিসাবে রাখিয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই এ সবের উল্লেখ করিলাম। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক ইতিহাস-কারদের কাজে লাগিবে।

এইসব বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই 'কাটা-ছেঁড়া পোকায় খাওয়া' অবস্থার জন্য রেডক্লিফের চেয়ে আমাদের নিজের প্রতিনিধি নেতাদের দায়িত্বও কম ছিল না। সুহরাওয়ার্দী সাহেব প্রধানমন্ত্রী ও বেংগল পার্টিশন কাউন্সিলের মেম্বর থাকাকালে এবং তার পরবর্তীকালের পার্থক্য হইতেই এটা বুঝা যাইবে। সুহরাওয়ার্দী সাহেব গভর্নর ক্যাসি সাহেবের মত ও সিদ্ধান্ত বলিয়া আমাদেরে যা জানাইয়াছিলেন, পাঠকগণের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিতেছি। সার নাযিমের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটাইয়াছিলেন কারা? সুহরাওয়ার্দী-হীন পার্টিশন কাউন্সিল শুধু কলিকাতা ছাড়িলেন না ; কলিকাতার দামে লাহোর কিনিয়া মূর্খের হাসি হাসিয়া বাড়ি ফিরিলেন। আর কোথায় বারাকপুর বারাসত ভাংগর বশিরহাট? কোথায় গেল দার্জিলিং? যেখানে যাইবার সেখানেই গিয়াছে। কারণ পূর্ব বাংলার স্বার্থ দেখার কেউ ছিল না। যাঁরা তৎকালে আমাদের নেতা ছিলেন তাঁরা পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের বিশেষতঃ স্বয়ং কায়েদে-আযমের মুখাপেক্ষী পদমর্যাদা-লোভী ভিখারী মাত্র। পূর্ব-বাংলার স্বার্থের কথা বলিয়া

পাকিস্তানী নেতৃত্বের বিরাগভাজন হইতে কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। হক সাহেব ও সুহরাওয়ার্দী সাহেবকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে নাস্তানাবুদ হইতে দেখিয়া এঁদের কেউ আর টু শব্দটি করিতে সাহস করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। এই সুযোগে পাকিস্তানের গোড়ার দিকে পূর্ব-বাংলার সীমা সরহদ্দ সম্বন্ধে বাউণ্ডারি কমিশনের সামনে সওয়াল-জবাব করিবার জন্য হক সাহেব ও সুহরাওয়ার্দী সাহেবের মত দেশবিখ্যাত প্রতিভাবান দেশী উকিল-ব্যারিস্টার বাদ দিয়া যুক্ত প্রদেশ হইতে অখ্যাতনামা মিঃ ওয়াসিমকে আমাদের উকিল নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এ ধরনের ব্যবস্থার ফল যে আমাদের স্বার্থের প্রতিকূল হইবে, এটা একরূপ জানাই ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এই ঔদাসীন্য শুধু জায়গা-জমি টাকা-পয়সার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনৈতিক মর্যাদাদানে কৃপণতাতেও তা প্রসারিত হইয়াছিল। তাই জাতির পিতা, স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি কায়েদে-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তান সৃষ্টির দিন হইতে আটমাস পরে দেশের বৃহত্তর অংশ পূর্ব-বাংলায় তশরিফ আনিবার সময় পাইয়াছিলেন। স্বয়ং জাতির পিতাই যখন এই ভাব পোষণ করিতেন, তখন আর নীচের স্তরের নেতা ও সরকারী কর্মচারিদের কথা বলিয়া লাভ কি ?

৪. কেন্দ্রের ঔদাসীন্য

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই নিদারুণ ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার মৌলিক কারণ ছিল এই যে, পূর্ব-বাংলাটা ছিল তাঁদের 'ফাউ'-এর প্রাপ্তি। বাংলা তাঁদের বিবেচনা ও প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। পাকিস্তান কথাটা সৃষ্টি হইয়াছিল বাংলাকে বাদ দিয়া। ওটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলের মুসলিম-প্রদেশসমূহের নামের হরফের-সমষ্টি, একথা আজ সবাই জানেন। সে নামের হরফে বাংলা তখনও ছিল না। এখনও নাই। এটা শুধু চৌধুরী রহমত আলীর মত ছাত্র-তরুণের দেওয়া নাম মাত্র নয়। পাকিস্তান আদর্শের 'স্বাপ্নিক ও রূপকার' বলিয়া প্রশংসিত মনীষী দার্শনিক ও কবি সার মোহাম্মদ ইকবালের স্কিম। তিনি ১৯৩০ সালের এলাহাবাদ মুসলিম লীগ অধিবেশনে তাঁর ইতিহাস-বিখ্যাত সভাপতির ভাষণে এই পাকিস্তানের ভৌগোলিক আকার, আকৃতি ও সীমারেখাও বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঐ আকার আকৃতির মধ্যে বাংলার নামগন্ধও ছিল না। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ লইয়াই তিনি ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র তৈয়ার করিয়াছিলেন। ঐ ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের দাবিকে তিনি ভারতীয় মুসলিমদের 'জাতীয় দাবি ও চূড়ান্ত আদর্শ' বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছিলেন। বাংলাকে, মুসলিম বাংলাকে, তিনি শুধু ঐ চূড়ান্ত কাঠামোর মধ্যে ধরেন নাই তা নয়, তাঁর ঐ মূল্যবান অভিভাষণে বাংলার বা বাংলার মুসলমানদের কোনও উল্লেখও নাই। অথচ সার ইকবাল কথা বলিতেছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে, সভাপতির অভিভাষণ দিতেছিলেন তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কন্‌ফারেন্সে এবং ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশ তখনও বাস করিতেছিল বাংলাতে। এই মনোভাবই ইকবাল সাহেবের বহু আগে ১৯০৬ সালে পূর্ব–বাংলা ও আসাম স্থাপনের এবং ১৯১১ সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম বাতিলের বেলা নিখিল-ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের অমার্জনীয় ঔদাসীন্য প্রকট হইয়াছিল। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্যোক্তা–প্রতিষ্ঠাতা নবাব সার সলিমুল্লার প্রস্তাব ও অনুরোধ সত্ত্বেও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালের প্রতিষ্ঠা অধিবেশনে পূর্ব–বাংলা ও আসাম প্রদেশ সমর্থন করেন নাই। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের বোমার ভয়ে বৃটিশ সরকার তাঁদের সে 'সেটেল্‌ড্ ফ্যাক্ট'–কে আন্–সেটেন্ড ও বাতিল করেন। এরপর মুসলিম লীগের ১৯১২ সালের কলিকাতা অধিবেশনে নবাব সলিমুল্লা হাজার চেষ্টা করিয়াও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানকে দিয়া মুসলিম বাংলার প্রতি এই বেঈমানির প্রতিবাদ করাইতে পারেন নাই। পূর্ব–পাকিস্তানের আজিকার কীট–দুষ্ট বিকলাঙ্গ চেহারা দেখিয়া আজ স্বভাবতঃই বাংগালী মুসলমান মাত্রেরই মনে পড়ে ১৯০৫ সালের পূর্ব–বাংলা ও আসাম প্রদেশের কথা। বর্তমান আকারের পূর্ব পাকিস্তানের ৫২ হাজার বর্গ মাইলের আয়তনের তুলনায় পূর্ব–বাংলা আসামের আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৬ হাজার মাইল। ৩ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ও হিন্দু আসামী ও পার্বত্য জাতিসমূহ মিলিয়া ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ। মুসলমানদের সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দরুন ঐ সব অমুসলমানের বিপুল সংখ্যাধিক লোক ছিল হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের ঘনিষ্ঠ। এক দিকে মুসলিম বাংলা আসামের খনিজ–বনজ সম্পদের অংশীদার হইত। অপর দিকে আসামী ও পার্বত্য জাতিরা বর্তমানের ল্যাণ্ডলক্‌ড্ ও বন্দরহীন দুরবস্থার বদলে চাটগাঁর মত বিশাল বন্দরের অংশীদার হইত। মুসলিম–বাংলার মত এত সুখ যেন নিখিল ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের কাম্য ছিল না। তারপর ১৯১৬ সালে লাখনৌ–প্যাক্টের ব্যাপারে এই মনোভাবই ফুটিয়াছিল। এ সবই ডাঃ ইকবালের এলাহাবাদী ঘোষণার আগের ঘটনা। তারপর ইকবাল সাহেবের পরে ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাব ও বাংলার দায়–জায়দাদ বন্টনের আগা–গোড়া ঐ একই মনোভাব কাজ করিয়াছিল। এই জন্যই পূর্ব বাংলা 'ফাউ'–এর ধান। 'ফাউ'–এর ধান টিয়ায় খাইলে গৃহস্থের আপত্তি হয় না। পাকিস্তান হাসিলের আগে এদের দরকার ছিল ভোটের। পাকিস্তান হাসিলের পর এদের দরকার পাটের।

একটা শেষ হইয়াছে। আরেকটা শেষ হইতে দেরি নাই। 'কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরা'লে পাজী।' পূর্ব পাকিস্তানের বরাতে তাই আছে।

পাকিস্তান হওয়ার পর পৌনে তিনটা বছর আমাকে কলিকাতা থাকিতে হইয়াছিল অবস্থা-গতিকে। কিন্তু ঐ সময়কার অভিজ্ঞতাটা আমার অনেক কাজে লাগিয়াছে। সে সব অভিজ্ঞতার অত খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়াছি আমি একটা কথা বুঝাইবার জন্য। সেটা এই যে পশ্চিম-বাংলা সরকার ও তথাকার ইন্টেলিজেনশিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ গোড়ার দিকে স্পিরিট-অব-পার্টিশন রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন অনেক দিন পর্যন্ত। একজন পাকিস্তানী মুসলিম লীগ-কর্মীর মুখ হইতেই এই সত্য কথাটা বাহির হওয়া উচিৎ বলিয়াই আমি তা বলিতেছি। না বলিলে সত্য গোপনের পাপ হইত।

৫. স্পিরিট—অব—পার্টিশন

তবেই এখানে বলিতে হয় স্পিরিট-অব পার্টিশন বলিতে আমি কি বুঝাইতেছি? কথাটা খোলাসা করিয়া বলা দরকার শুধু মুসলিম জনসাধারণ, মুসলিম লীগ কর্মী ও অনেক মুসলিম-লীগ নেতার জন্যই নয়, বড় বড় প্রবীণ হিন্দু-কংগ্রেস নেতার জন্যও। কারণ অত বড় বড় বুদ্ধিমান লোক হইয়াও পার্টিশনের স্পিরিটটা তাঁরাও ধরিতে পারেন নাই। এঁরা পারেন নাই বলিয়াই মহাত্মাজীকে বারে-বারে অনশন ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল। এই কারণেই সর্দার প্যাটেলের মত দায়িত্বশীল নেতা বলিতে পারিয়াছিলেন ঃ 'মুসলমানেরা পাকিস্তান চাহিয়াছিল, তা তারা পাইয়াছে। এখন তারা সব সেখানে চলিয়া যাক।' আলীপুরের হিন্দু উকিল বন্ধুরাও আমাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু দুইটি কথার মধ্যে পার্থক্য ছিল মৌলিক। আলীপুরের বন্ধুরা বলিয়াছিলেন রসিকতা করিয়া। সর্দার প্যাটেল বলিয়াছিলেন সিরিয়াসলি। আলীপুরের বন্ধুরা বলিয়াছিলেন প্রাইভেটলি। সর্দারজী বলিয়াছিলেন পাবলিকলি। আলীপুরের বন্ধুদের কথায় কোন রাজনৈতিক তাৎপর্যও ছিল না, ফলাফলও ছিল না। সর্দারজীর কথার রাজনৈতিক তাৎপর্যও ছিল গুরুতর, ফলাফলও ছিল ঘোরতর।

শুধু সর্দারজী নন। পণ্ডিত নেহরুর মত অসাম্প্রদায়িক নেতা পর্যন্ত পার্টিশনের প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় মানসিক ব্যালেন্স হারাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 'মাথার বিষ নামাইতে আমরা মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছি।' এটা তাঁর ভুল। রাগের কথা-আসলে তিনি মাথা কাটেন নাই। মস্তকটিকে দুই হেমিসফেয়ারে ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই।

এতেই দেখা যাইবে যে উপরের স্তরের নেতাদের মধ্যেও একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে-আযম জিন্না ছাড়া আর কেউ গোড়ার দিকে স্পিরিট-অব-পার্টিশন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ঐ দুই মহান নেতা ছাড়া আরেক জন এই স্পিরিটটা বুঝিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী।

এখন বিচার করা যাক স্পিরিট-অব-পার্টিশন কি? একদিকে যাঁরা বলেন, আদম-এওয়াজ ছাড়া দেশ বিভাগ মানিয়া লইয়া মুসলিম লীগ দ্বিজাতি-তত্ত্বই বর্জন করিয়াছিল, তাঁরাও স্পিরিট-অব-পার্টিশন বুঝেন নাই। অপরদিকে যাঁরা বলেন, শরিয়ত-শাসিত ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবেই পাকিস্তান হাসিল হইয়াছে, তাঁরাও স্পিরিট-অব-পার্টিশন বুঝেন নাই। এই না বুঝার দরুন কত রকমে কি কি অনিষ্ট হইয়াছে, সে সব কথা যথাস্থানে বলা যাইবে। মোট কথা, ইসলাম রক্ষার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দরকার ছিল না। ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষার জন্যই এর দরকার ছিল। এখানে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতির স্বার্থের পার্থক্য বুঝিতে হইবে।

ইসলাম ধর্মকে দুনিয়ায় টিকাইয়া রাখিতে রাষ্ট্র শক্তির দরকার, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে ছোট করিয়া দেখেন। ইসলাম ধর্ম হিসাবে নিজের জোরেই বিশ্ব-জগতে প্রচারিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। নিজের জোরেই চিরকাল বাঁচিয়াও থাকিবে। অতএব ইসলাম ধর্ম নয়, ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি। একাজ করিতে গিয়া আসলে মুসলিম লীগ দ্বিজাতি তত্ত্বও বিসর্জন দেয় নাই, পাকিস্তানও শরিয়তী শাসনের ইসলামী রাষ্ট্ররূপে সৃষ্ট হয় নাই। 'দুই জাতি'র ভিত্তিতে এই উপমহাদেশ দুইটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে মাত্র। তার একটি হিন্দু-প্রধান, অপরটি মুসলিম প্রধান। এই যা পার্থক্য।

স্পিরিট-অব পার্টিশন এই দুই রাষ্ট্র সৃষ্টির বুনিয়াদী মূলকথা। সেটা বুঝিতে হইলে আগে বুঝিতে হইবে ঃ এই দুই রাষ্ট্র সৃষ্টি হিন্দু-মুসলিমে আপোসের ব্যর্থতার পরিণাম নয়, তাদের আপোসের ফল। হিন্দু-মুসলিম একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই বলিয়া দেশ ভাগ হইয়াছে, এটা সত্য নয়। সত্য কথা এই যে, দুই জাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়াই আপোসে দুই রাষ্ট্র সৃষ্ট করিয়াছে। এও বুঝিতে হইবে যে হিন্দু-মুসলিমে যুদ্ধ করিয়া দেশ ভাগ করে নাই। বিজেতা কোনও বিদেশী শক্তিও দেশ দুই টুকরা করে নাই। জার্মানি, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি বহু দেশকে আমরা দুই টুকরা হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু ও-সবই করিয়াছে বিজয়ী বিদেশীরা। আমাদের দেশ ভাগ করিয়াছেন স্বয়ং আমাদের নেতারা, আলোচনার টেবিলে বসিয়া, একই রেডিওতে তা ঘোষণা করিয়া।

মহাত্মাগান্ধী ও কায়েদে-আযম জিন্না উভয়েই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় আযাদির অপরিহার্য শর্তরূপে, 'সাইন কোয়া নন' হিসাবে পেশ

করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঐক্যের বলেই তাঁরা সে আযাদি হাসিল করিয়াছেন। পার্থক্য শুধু এই যে গোড়াতে উভয়ে এক খাম্বার রাষ্ট্রীয় সৌধের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। নানা কারণে সেটা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুই খাম্বার সৌধ করিয়া গিয়াছেন।

এমনভাবে সমাধান করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কারণ সমস্যা যত বড় হয়, সমাধানও তত বড় হইতেই হয়। ভারতের হিন্দু-মুসলিম-সমস্যার সমাধানের অল্প-বিস্তর চেষ্টা সব নেতাই করিয়াছেন। ঐ সমস্যার মূলগত গভীরতা ও আকারের পরিব্যাপ্তি বুঝিয়াছিলেন মাত্র তিনজন নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কায়েদে-আযম জিন্না ও মাহাত্মা গান্ধী। এ তিন জনের প্রথম দুইজন সমস্যাটার প্রকৃতি বুঝিয়াছিলেন কতকটা উৎপ্রেরণা বা ইন্‌স্টিংক্ট বলে। তাঁদের কুশাগ্র বুদ্ধির কাছে সমস্যাটার প্রকৃতি সহজাত মনীষার জোরেই ধরা পড়ে। গভীরভাবে তলাইয়া এবং দীর্ঘদিন গবেষণা করিয়া বুঝিতে হয় নাই। তাই ১৯১৬ সালের লাখ্নৌ প্যাক্টের মাধ্যমে কায়েদে-আযম সমস্যাটা সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালের কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন হইতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও কায়েদে-আযম জিন্না সমবেতভাবে ও একই ধরনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পন্থায় সাম্প্রদায়িক সমস্যাটার সমাধান করিবার চেষ্টা চালাইয়া যান। কিন্তু ১৯২১ সালে মহাত্মাজী তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে কংগ্রেসী রাজনীতিতে আধ্যাত্মিকতার আমদানি করার প্রতিবাদে নিরেট যুক্তিবাদী সেকিউলারিস্ট জিন্না কংগ্রেসের রাজনীতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক বর্জন করেন। অতঃপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এককভাবে উভয়ের অনুসৃত নীতি চালাইয়া যাইতে থাকেন। নিখিল ভারতীয় কোন নেতার সহযোগিতা না পাইয়া দেশবন্ধু বাংলা-দেশ-ভিত্তিক সমাধানের সিদ্ধান্ত করেন। বেংগল প্যাক্ট তার ফল। নিখিল ভারত কংগ্রেস দেশ বন্ধুর মত গ্রহণ করেন নাই। মর্মাহত দেশবন্ধু অকালে ১৯২৫ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি মারা গেলেও তাঁর প্রদর্শিত মূলনীতি মরে নাই। দেশবন্ধুর বেংগল প্যাক্টের মূলনীতি ছিল হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান হিন্দু-মুসলিম সমাসে নয় সন্ধিতে, সংযোগে নয় সংসর্গে, ঐক্য নয় সখ্যে, মিশ্রণে নয় যোগে, মিলনে নয় মিলে, ফিউশনে নয় ফেডারেশনে। দেশবন্ধু তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতিতে একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে তৎকালে অনেক নেতাই তাতে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন ঃ 'হিন্দু-মুসলিম মিলন অর্থে যদি আমি বুঝিতাম দুই সমাজের মিশ্রণ, তবে আমি কোনও দিন মিলনের কথা বলিতাম না। কারণ দুই সমাজ এক করা আমার কল্পনাতীত। আমার মতে হিন্দু-মুসলিম মিলন অর্থ রাজনৈতিক ফেডারেশন।'

কথাটা শুধু রাজনৈতিক নয় আধ্যাত্মিকও বটে। এই জন্যই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেটা বুঝিয়াছিলেন বিশের দশকে, মহাত্মা গান্ধীও কায়েদে-আযম জিন্না তাই বুঝিয়াছিলেন চল্লিশের দশকে। মহাত্মাজী সাধক পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও এটা বুঝিতে তাঁর কুড়ি-পঁচিশ বছরের বেশি লাগিয়াছিল এই জন্য যে তাঁর সাধনা ছিল এক-রোখা হিন্দুর সাধনা। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝিয়াছিলেন এই কারণে যে তাঁর সাধনা ছিল অহিংসার সাধনা, প্রেমের সাধনা। কায়েদে-আযমের এত সময় লাগিয়াছিল এই জন্য যে কুশাগ্র-বুদ্ধি হইয়াও তিনি ছিলেন নির্ভেজাল সেকিউলারিস্ট। রাজনীতিতে ধর্ম কৃষ্টির আমদানির তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝিয়াছিলেন এই জন্য যে তাঁর সেকিউলারিযমের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ছিল। কারণ তিনি ছিলেন সত্যবাদী সত্যের পূজারী হক-পন্থী। পরের হক্কের প্রতি তিনি ছিলেন নিজের হক্কের মতই সচেতন। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতে হিন্দুর প্রাধান্য তার ন্যায় সঙ্গত অধিকার। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা বা অন্য কোন সংরক্ষণ-ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দুর সে গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংকুচিত করিবার অধিকার কারও নাই ; এই সত্যের স্বীকৃতির মধ্যেই জিন্নার সত্য-প্রিয়তার প্রমাণ বিদ্যমান।

এখন বিচার করুন, হিন্দু-মুসলিম সমস্যার বুনিয়াদী যে প্রশ্নটা দেশবন্ধু বিশের দশকে এবং মহাত্মাজী ও কায়েদে-আযম আরও বিশ বছর পরে চল্লিশের দশকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তা কি ছিল? কত গভীর ছিল? কেমন বিপুল ছিল? তার সমাধানের সর্বোত্তম পন্থাইবা কি ছিল? এইটা বুঝিতে পারিলেই স্পিরিট-অব-পার্টিশন বোঝা যাইবে। এই স্পিরিটটা ধরিতে পারিলেই হিন্দু-মুসলমানের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ চিরকাল মহাত্মাজী ও কায়েদে-আযমের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। দেশ ভাগ করার অপবাদে তাঁদেরে অভিশাপ দিবে না।

কারণ ভারতের হিন্দু ও মুসলিম দুইটাই মহান মানব গোষ্ঠী। উভয়ের ঐতিহ্য গরীয়ান। উভয়ের ইতিহাস কীর্তি ও কৃতিত্বে প্রোজ্জ্বল। উভয়ের অতীত গৌরবের বস্তু। একদিকে দেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী ত্রিশ কোটি হিন্দু। সুপ্রাচীন সভ্য আর্যজাতির অংশ তারা। মাত্র আটশ' বছর আগেও এরা দীর্ঘ দুইটি হাজার বছর ধরিয়া এই উপমহাদেশের বেশির ভাগের উপর সগৌরবে অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছে। এই মুদ্দতে তারা বেদ-বেদাংগ উপনিষদ-ষড়দর্শনের মত মননশীল সাহিত্য, রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্য, শকুন্তলার মত রম্যকাব্য, মনু-সংহিতার মত আইন শাস্ত্র, চরক-সুশ্রুতের মত চিকিৎসা-বিজ্ঞান রচনা ও গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতিষী-বিদ্যা আবিষ্কার করিয়া তৎকালীন বিশ্বের চিন্তা-নায়ক রূপে স্বীকৃত ছিল। গৌতম বুদ্ধের মত ধর্ম-প্রবর্তনের জন্ম তারাই দিয়াছিল। অশোক-চন্দ্রগুপ্ত-কনিষ্ক-বিক্রমাদিত্যের

মত সাম্রাজ্য-নির্মাতা সুশাসক সৃষ্টি তারাই করিয়াছিল। এদের সভ্যতা পশ্চিমে কাবুল-কান্দাহার ও পূর্বে মালয়-জাবা-সুমাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনি গৌরবমণ্ডিত এদের প্রাচীন ইতিহাস।

অপর দিকে, দেশের এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী দশ কোটি মুসলমান। সংখ্যায় তুলনায় কম হইলেও ধর্মীয় ও সামাজিক সাম্যে গ্রোথিত ঐক্যে শক্তিমান। মাত্র দেড়শ' বছর আগে দীর্ঘ সাড়ে ছয়শ বছর ধরিয়া এরা গোটা উপমহাদেশে সগৌরবে প্রবল প্রতাপে শাসন করিয়াছে বিদেশী দখলকারী শক্তি হিসাবে নয়, দেশবাসী হিসাবে। এটা করিয়াছে তারা বিপ্লবাত্মক সাম্য-ভিত্তিক মানবাধিকারে নয়া জীবন-বাণীর পতাকাবাহী এক নবজাগ্রত বিশ্ব-মুসলিমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে। নয়া-যিন্দেগির এই পতাকাবাহীরা পুরা এক হাজার বছর ধরিয়া গোটা এশিয়া-আফ্রিকা ও ইউরোপের উপর অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছে। 'বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যে শিল্পে-স্থাপত্যে এরা সারা বিশ্বে সভ্যতার শিক্ষকতা করিয়াছে। এই উপমহাদেশকে এরা কৃষ্টি-শিল্পে, আর্টে-স্থপতিতে কাব্যে-সংগীতে তৎকালীন সভ্য জগতের শীর্ষ স্থানে উন্নীত করিয়াছে। গিয়াসুদ্দিন বুলবন, আলাউদ্দিন খিলজী, শেরশাহ, আকবর, শাহজাহান, আওরংজেব, হুসেন শাহ, ইলিয়াস শাহের মত সুশাসকের ও আমির খসরু-তানসেনের মত কবি-শিল্পীর জন্ম দিয়াছে এরাই। ইতিহাসের পাতা এদের এমনি উজ্জ্বল।

এরা উভয়ে আজ ইংরেজের পদানত সত্য, কিন্তু পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নে পুনর্জাগরণের উদ্যমে উভয়েই তন্ময় ও উদ্দীপ্ত। এক দিকে হিন্দুরা উনিশা শতকের ইউরোপের নব-জাগরণের আলোকচ্ছটায় জাগ্রত, রাজা রাম মোহন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দের অনুপ্রেরণায় ধর্মীয় রিভাইভ্যালের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত, বংকিম-রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ইউরোপীয় আর্ট-সাহিত্যে নব-দীক্ষিত, নওরোজী-গোখেল-তিলক-সুরেন্দ্রনাথ-চিত্তরঞ্জন-গান্ধী-নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বাণীতে উদ্বুদ্ধ ; স্বাধীকার প্রতিষ্ঠায় প্রাণ বিসর্জন দিতে এদের হাজার হাজার তরুণ প্রস্তুত। যে-কোনও প্রতিবন্ধক নির্মূল করিতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মুসলমানরাও আজ জাগ্রত। শাহ উয়ালি উল্লা-সৈয়দ আহমদ শহীদ-সার সৈয়দের শিক্ষায় তারা অনুপ্রাণিত। ওহাবী বিপ্লব, সিপাহী যুদ্ধ ও খিলাফত-আন্দোলনের মধ্যে তাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প পরিস্ফুট।

এই নব জাগ্রত, নয়া জীবন-বাণীতে প্রবুদ্ধ, দুই মহাজাতি স্বভাবতঃই যার তার পূর্ব-গৌরবের স্বর্ণ-স্মৃতির দিকেই তাকাইয়া আছে। যার-তার সেই ঐতিহ্যের

রেনেসাঁতেই তাদের ভবিষ্যৎ মুক্তি ও উন্নতি নিহিত, এই সত্য স্বভাবতঃই তারা উপলব্ধি করিয়াছে। এ উপলব্ধি লজ্জার নয় গৌরবের। কাজেই তাতে প্রতিবন্ধকতা করা সম্ভবও ছিল না, উচিতও হইত না। বিজ্ঞানোন্নত বিশা শতকের বিশ্বব্যাপী নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ নব্য-হিন্দুত্ব স্বাধীন ভারতের মানস-সরোবরে একটি স্ফুটনোম্মুখ পদ্মফুল। ঐ একই চেতনায় প্রবুদ্ধ বিশ্ব-মুসলিমের অবিচ্ছেদ্য অংশ রেনেসাঁর আযানে উদ্দীপিত ভারতীয় ইসলামী জাগরণ মুসলিম-ভারতের গুলবাগিচায় একটি স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ। উভয়টাই গণতন্ত্রের শুভ বাণী। বিশ্ব সভ্যতার নবীন রূপে অবদান করিবার মত সম্ভাবনা উভয়ের মধ্যেই প্রচুর। অতএব একদিকে অখণ্ড ভারতের মাথা-গুনতির একঢালা গণতান্ত্রিক মেজরিটি শাসনের বিশ্ব-ভারতীর নামে ঐ স্ফুটনোম্মুখ গোলাপ ফুল, অপর দিকে প্যান-ইসলামিক বিশ্ব-মুসলিম হেগিমনির নামে ঐ স্ফুটনোম্মুখ পদ্মফুল, নিষ্পেষিত করার চেষ্টা সফলও হইত না ; বিশ্ব-মানবের জন্য সাধারণভাবে, ভারতবাসীর জন্য বিশেষভাবে, কল্যাণকরও হইত না।

তাই মানবকল্যাণের স্বর্গীয় ইংগিতে-অনুপ্রেরিত মহান নেতৃদ্বয় মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে-আযম জিন্না তাঁদের সুযোগ্য দূরদর্শী সহকর্মীদের সহযোগিতায় এই মহাভারতে দুইটি মহান আদর্শকেই স্বাধীনভাবে মানব-কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন। ইহাই দেশ-বিভাগের মূল কথা। এটাই নয়া দুনিয়ার 'পিসফুল কো-এক্‌যিস্টেন্‌সের' শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জীবন-বাণী। এটাই স্পিরিট-অব-পার্টিশন।

এইভাবে একটা হিন্দু-প্রধান ও একটা মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র কায়েম হইল বটে, কিন্তু উভয় পক্ষ হইতে একত্রে এবং পৃথকভাবে ঘোষণা করা হইল : 'হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেসী-মুসলিম লীগার যে-যেখানে আছ, সেইখানেই থাকিয়া যাও।' এ কথার সোজা অর্থ এই যে দুইটা রাষ্ট্র হইল বটে, কিন্তু উভয়টাতে হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার। আরও সোজা কথায়, দুইটার একটাও শুধু হিন্দুর দেশও নয়, শুধু মুসলমানের দেশও নয়। দুইটাই আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশ।

৬. সমাধান হিসাবে

এইভাবে নেতারা যে দুইটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্পষ্টতঃই তা ছিল হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মীমাংসা হিসাবেই। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানের একশ-একটা উপায় ছিল। সে সব পন্থায় সমাধানের চেষ্টাও বছরের পর বছর ধরিয়া চলিয়াছিল। অবশেষে 'দুই রাষ্ট্র' পন্থাটাই নেতাদের কাছে উভয় জাতির কাছে,

গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। তাই তাঁরা টেবিলে বসিয়া এই সমাধান গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাধানটা বাস্তবানুগ যেমন হইয়াছিল, অভিজ্ঞতার দ্বারা তেমনি ইহা সমর্থিতও হইয়াছিল। এটা যেন রাষ্ট্র–নেতাদের জন্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সম্প্রসারণ। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বাংলার মুসলমানরা ও বিহারের হিন্দুরা গবর্নমেন্ট চালাইয়াছে। তাই বলিয়া বাংলার হিন্দুরা ও বিহারের মুসলমানরা যার–তার অধিকার হারায় নাই। এই নযিরে স্বায়ত্তশাসন প্রসারিত করিয়া ভারতে একটা হিন্দুস্থান একটা পাকিস্তান নামে দুইটা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করিলে চলিবে নিশ্চয়ই।

কংগ্রেসের মতই মুসলিম লীগও দেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসন চাহিয়াছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতে স্বভাবতঃ এবং ন্যায়তঃ যে হিন্দু–মেজরিটি শাসন হইবে, এতে মুসলমানরা নিজেদেরে নিরাপদ মনে করিতে পারে নাই। তাই বলিয়া দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকামী মুসলমানরা হিন্দু–মেজরিটি শাসন এড়াইবার উদ্দেশ্যে ভারতের স্বাধীনতা ঠেকাইয়া রাখিতে ইংরাজকে সাহায্য করিতেও রাযী হয় নাই। এটাই জিন্না–নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। তিনিই প্রথম হিন্দু ভাইকে বলিলেন ঃ 'চল, পৃথকভাবে তুমিও শাসন কর, আমিও শাসন করি।' ইংরাজকে তিনি বলিলেন ঃ 'ডিভাইড এণ্ড কুইট।' হিন্দু–নেতৃত্ব এতে রাযী হইলেন। ইংরাজ–সরকার তা মানিতে বাধ্য হইলেন। এরই ফলে বিনা–আদম–এওয়াজে দেশ ভাগ ও দুই রাষ্ট্র হইয়াছে। এটাই স্পিরিট–অব–পার্টিশন। আপোসে দুই রাষ্ট্র সৃষ্টিতে আসলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় নেতৃত্বের জয়ই সূচিত হইয়াছে।

কিন্তু জনতার হৈ-চৈ–এর কানতালা–লাগা আবহাওয়ায় দুই পক্ষই পরে এটাকে যার–তার পরাজয় মনে করিলেন। হিন্দু–নেতৃত্ব তা করিলেন ভারত–মাতা দ্বিখণ্ডিত হওয়া মানিয়া নিতে হইল বলিয়া ; মুসলিম নেতৃত্ব তা করিলেন 'পোকায় খাওয়া কাটা–ছিঁড়া' পাকিস্তান নিতে হইল বলিয়া। দুইপক্ষের চোখেই সেই যে ছানি পড়িল সেটা ভাল হওয়ার বদলে দিন–দিন বাড়িয়াই চলিল। মহান দুই জাতির পিতৃদ্বয়ের অকাল–মৃত্যুতে সে স্পিরিটের কথা নেতারা ভুলিয়া গেলেন। ফলে এই স্পিরিট কোথায় কিভাবে লংঘিত হইয়াছে এবং তার কি কি কুফল হইয়াছে, সে সব কথা যথাস্থানে বলা হইবে।

৭. পশ্চিম–বাংলা সরকারের সুবুদ্ধি

এখানে স্পিরিট–অব–পার্টিশনের এত বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন হইয়াছে এই জন্য যে আলোচ্য মুদ্দতে আমার জ্ঞানের মধ্যে শুধু পশ্চিম–বাংলা সরকারই কাজে–

কর্মে এই স্পিরিট বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। এই স্পিরিটের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিক বাস্তু-ত্যাগ রোধ করা। অন্যান্য জায়গার মত দুই বাংলাতেও বাস্তু-ত্যাগের হিড়িক চলিয়াছিল। ছয়-সাত বছর ধরিয়া যে প্রচার-প্রচারণা চলিয়াছিল, যেরূপ বিষাক্ত আবহাওয়া তাতে সৃষ্ট হইয়াছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সে মনোভাবের যে বাস্তবরূপ দেখা দিয়াছিল, তার পরে শেষের ছয় মাসেই এই মহান স্পিরিট নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেন। কিন্তু গণ-মন এই স্পিরিট গ্রহণ করিতে পারে নাই স্বাভাবিক কারণেই। গণ-মনে এই উপলব্ধি ঘটাইবার জন্য প্রচুর ও ব্যাপক প্রচার-প্রপাগ্যাণ্ডার দরকার ছিল। পশ্চিম-বাংলা সরকার ও জনাব শহীদ সুহরাওয়ার্দী এই মহান কাজটিই শুরু করিয়াছিলেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও ডাঃ বিধান রায়ের প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে তাঁদের সহকর্মী মন্ত্রীদের সমবেত চেষ্টায় এই নীতিই চলিয়াছিল। আমাকে এবং অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে তাঁরা সরকারী সাহায্যে সরকারী জীপ গাড়িতে পুলিশের সহযোগিতায় মুসলিম এলাকাসমূহে সফর করাইয়াছেন। কোনও কোনও স্থানে হিন্দু মন্ত্রী ও নেতারা আমাদের সাথে গিয়াছেন। সর্বত্র একই কথা বলা হইয়াছেঃ 'এ দেশ আপনাদের। বাস্তু ত্যাগ করিবেন না। আপনাদের নিরাপত্তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।'

শহীদ সাহেবও ঠিক এই কাজটিই করিতেছিলেন। তিনি শুধু অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম কন্‌ভেনশন ডাকিয়া এই বাণীই প্রচার করেন নাই। তিনি শুধু মাইনরিটি চার্টার রচনা করিয়া উভয় সরকারের তাতে দস্তখত লইবার চেষ্টাই করেন নাই। তিনি শান্তি-সেনা গঠন করিয়া উভয় বাংলায় ব্যাপক সফরের আয়োজনও করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে পূর্ব-বাংলা সফরে আসেন। এর অপরিহার্য আশু কারণ ছিল। পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মধ্যেই বাস্তু-ত্যাগের হিড়িক পড়িয়াছিল বেশি। এটা ঠেকাইতে না পারিলে এই সব বাস্তুত্যাগীর চাপে পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। এই হিড়িক কমাইবার জন্যই পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের ত্রাসের ভাব দূর করার ও নিরাপত্তা-বোধ সৃষ্টি করার দরকার ছিল। অবস্থা-গতিকে পূর্ব-বাংলার হিন্দুরা কেবল হিন্দু নেতৃবৃন্দের মুখের কথাতেই তেমন সান্ত্বনা পাইতে পারিত। সেজন্য শহীদ সাহেব তাঁর শান্তি সেনায় দেবতোষ দাশগুপ্ত, দেব নাথ সেন, সুব্রত রায় প্রভৃতির মত জনপ্রিয় হিন্দু নেতাদেরে লইয়াই শান্তি-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। একটু ধীরভাবে তলাইয়া বিচার করিলেই দেখা যাইবে, এটা পশ্চিমবাংলা বা ভারতের চেয়ে পূর্ব-বাংলা বা পাকিস্তানের জন্যই বেশি আবশ্যক ও উপকারী ছিল। মোহাজের-সমস্যাটা শুধু আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রের জন্য একটা অর্থনৈতিক বোঝা এবং পুনর্বাসনের

বিপুল দায়িত্বই নয়। মোহাজের মোহাজের বাড়ায়। এক দেশ হইতে বাস্তু-ত্যাগী আসিয়া অপর দেশে বাস্তু-ত্যাগী বানায়। বাস্তু-ত্যাগীদের সত্য-সত্যই অনেক অভিযোগ থাকে বটে, কিন্তু নিজেদের বাস্তু-ত্যাগ জাস্টিফাই করিবার উদ্দেশ্যে তারা অনেক মিথ্যা গুজব ও গালগল্পও তৈয়ার করে। ফলে মোহাজের-অধ্যুষিত অঞ্চলেই সাম্প্রদায়িক তিক্ততা চরমে উঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব দাঙ্গা উস্কানীমূলক একতরফা হয়। মোহাজেররাই উভয় বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বেশির ভাগ ঘটাইয়াছিল, এটা আজ সাধারণ অভিজ্ঞতা।

মোহাজের-পুনর্বাসন-সমস্যা পশ্চিম বাংলা বা ভারতের চেয়ে পূর্ব-বাংলা বা পাকিস্তানের জন্য অধিকতর বিপজ্জনক গুরুত্ব সমস্যা, এটা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা। পাকিস্তান নয়া রাষ্ট্র। অর্থনীতি ও শাসনযন্ত্র সকল ব্যাপারেই তাকে একেবারে শুরু হইতে শুরু করিতে হইতেছিল। তার উপর পূর্ব-বাংলা ঘন-বসতিপূর্ণ ক্ষুদ্র ভৌগোলিক ইউনিট। পূর্ব-বাংলার এক কোটি হিন্দুর সব তাড়াইয়াও পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও বিহারের আড়াই কোটি মুসলমানের স্থান হইবে না। আর এদের পুনর্বাসনের ত কথাই উঠে না। সাত কোটি (তৎকালে) লোকের দেশ পাকিস্তান ভারতে-ফেলিয়া-আসা চারকোটি মুসলমানকে জায়গা দিতে পারিবে না। অথচ পাকিস্তানের দেড়কোটি হিন্দুর স্থান করা বিশাল ভারতের জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। বাস্তু-ত্যাগের আনুষংগিক অমানুষিক দুরবস্থা ছাড়াই এটা তার বাস্তব ভয়াবহ দিক। এইজন্য পাকিস্তানের পক্ষে বাস্তু-ত্যাগ এড়ানো ছিল বেশি প্রয়োজন। এ কাজটিতেই শহীদ সাহেব তাই আগে হাত দিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিম-বাংলার গবর্নর ডাঃ কাট্জু ও প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে এই কারণেই পূর্ব-বাংলা সফরে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে দিয়া পশ্চিম-বাংলা সফরের আয়োজনও তিনি করিতেছিলেন।

৮. পূর্ব-বাংলা সরকারের কুযুক্তি

কিন্তু পূর্ব-বাংলা সরকার শহীদ সাহেবকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। শহীদ সাহেবের মত জনপ্রিয় নেতা পূর্ব-বাংলা সফর করিলে তৎকালীন রাষ্ট্র নায়কদের অসুবিধা হইবে, এটা ছিল তাঁদের মনের ভিতরের কথা। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্যভাবে যে কথাটা বলিলেন, সেটাও ছিল ভুল। তাঁরা বলিলেন ঃ শান্তি-সেনা লইয়া শহীদ সাহেবের পূর্ব-বাংলা সফরের তাৎপর্য হইবে এই যে, পূর্ব-বাংলাতেই সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও দাঙ্গা চলিতেছে বেশি। এতে পূর্ব-বাংলা সরকারের তথা পাকিস্তান সরকারের বদনাম হইবে। কথাটা স্থূল দৃষ্টিতে এবং আপাতঃদৃষ্টিতেই সত্য। আসলে সত্য নয়। এটা ঐতিহাসিক

সত্য যে পূর্ব-বাংলায় অন্যান্য স্থানের তুলনায় সাম্প্রদায়িক দাংগা খুবই কম হইয়াছিল। একরূপ হয় নাই বলিলেও চলে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বাস্তু-ত্যাগের হিড়িক পড়িয়াছিল। সাম্প্রদায়িক দাংগার ভয়ে নয়। অন্য কারণে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়ক ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের অন্তঃসারশূন্য 'ইসলামী রাষ্ট্র' ও শরিয়তী শাসনের শ্লোগানে হিন্দুরা সত্যই ঘাবড়াইয়াছিল। জানের ভয়ে নয় মানের ভয়ে। ধর্ম ও কালচার হারাইবার ভয়ে। অর্ধশতাব্দী ধরিয়া যে হিন্দুরা দেশের আযাদির জন্য জান্-মাল কোরবানি করিয়াছে, স্বাধীন হওয়ার পর তারাই নিজের ধর্ম ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি লইয়া সসম্মানে দেশে বাস করিতে পারিবে না, এটা মনের দিক হইতে ছিল তাদের জন্য দুঃসহ। হিন্দু সভা ও জন-সংঘের 'হিন্দুরাজ' ও শুদ্ধির শ্লোগান ভারতীয় মুসলমানদের মনে যে স্বাভাবিক ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল পাকিস্তানের হিন্দুদের মনেও গোড়ার দিকে এমনি ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল। এটা দূর করিয়া তাদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করাই ছিল তৎকালীন আশু কর্তব্য। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়করা শুধুমাত্র দাংগা-হাংগামাহীন শান্তি স্থাপন করিয়াই মনে করিয়াছিলেন তাঁদের কর্তব্য শেষ হইল। হিন্দু-মনে নৈতিক শান্তি আনিবার কোনও চেষ্টাই তাঁরা করেন নাই। একদিকে তাঁদের এই কাজ, অপর দিকে ভারতে প্যাটেলী মনোভাব ও নীতি উভয় দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে জটিলতর করিয়া কিভাবে স্পিরিট-অব-পার্টিশনকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে এটা পরবর্তী কালের ইতিহাস। এইভাবে স্পিরিট-অব-পার্টিশনকে ব্যর্থ করিয়া প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িক সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া জিয়াইয়া না রাখিলে শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি-সেচ যোগাযোগ ও যাতায়াত-ব্যবস্থায় উভয় দেশকে অর্থনৈতিক দিকে কত উন্নত করা যাইত, এই বিশ বছরে সে কথা দুই দেশের বর্তমান নেতারা বুঝিতে না পারিলেও তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বুঝিতে পারিবে নিশ্চয়ই।

৯. আওয়ামী লীগের আবির্ভাব

এই মুদ্দতের অপর দুইটি বিশেষ ঘটনার একটি পূর্ব-বাংলায় 'জনগণের মুসলিম লীগ' অর্থাৎ আওয়ামী মুসলিম লীগের পত্তন। দ্বিতীয়টি বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষা করার দাবির উন্মেষ। দুইটাই রাষ্ট্র-নায়কদের ভ্রান্ত নীতির ফলে ত্বরান্বিত হইয়াছিল। বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল ভাংগিয়া দিয়া সরকার-সমর্থকদেরে দিয়া এড-হক কমিটি গঠন করা হয়। এইভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দরজা জনসাধারণের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়ায় মুসলিম লীগ-কর্মীদের সামনে আর কোনও পথ খোলা থাকে নাই। তাই তারা জনগণের মুসলিম লীগ গঠন করিয়াছিল। এটা অবশ্য পরিণামে

ভালই হইয়াছিল। ছাত্র–কর্মী ও জনগণের সাহায্যপুষ্ট মুসলিম লীগ দেশ শাসনের সুবিধা পাইলে পাকিস্তানের একদলীয় শাসন কায়েম হইয়া যাইত। সাত বছরের মধ্যে ১৯৫৪ সালে যেভাবে মুসলিম লীগের পতন ঘটিয়াছিল, সে অবস্থায় ওটা হইতে পারিতনা।

১০. রাষ্ট্র-ভাষা দাবি

দ্বিতীয় ঘটনা রাষ্ট্র ভাষার দাবি উত্থাপন। এটা লক্ষণীয় যে গোঁড়াতে বাংলার দাবি পাকিস্তানের রাষ্ট্র–ভাষা হওয়ার দাবি ছিল না। সে দাবি ছিল বাংলাকে পূর্ব–পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কায়েদে–আযম পাকিস্তানের গভর্নর–জেনারেল হিসাবে পূর্ব–বাংলার সর্বপ্রথম সফরেই বলিয়া বসেন ঃ 'কেবল একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে'। এতেই ব্যাপারটা জটিল আকার ধারণ করে। পূর্ব–বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিন একটা আপোস করেন। কিন্তু কায়েদে আযমের মৃত্যুর পর তিনিই গভর্নর–জেনারেল হইয়া উল্টা মারেন। এটা না ঘটিলে কি হইত? বাংলাকে পূর্ব–বাংলার সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করিলে এবং সম্ভব–মত উর্দুকেও পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ স্থান দেওয়ার চেষ্টা করিলে ইংরাজী যথাস্থানে বর্তমানের মতই আসল রাষ্ট্র ভাষা এবং দুই পাকিস্তানের যোগাযোগের ভাষা থাকিয়া যাইত। বাংলা ও উর্দু ভাষা দুই অঞ্চলের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রভূত উন্নতি করিয়া জাতীয় ভাষায় পরিণত হইত। 'রাষ্ট্র ভাষা' কথাটা চাপাই পড়িয়া থাকিত। রাষ্ট্র–নায়কদের ভুলে অকালে রাষ্ট্র–ভাষার কথাটা উঠিয়া না হক মারামারি খুনাখুনি হইয়াছে। এটাও অবশ্য একদিকে ভালই হইয়াছে। রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নটা চিরকালের জন্য ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। এখন অতি ধীরে ধীরে বাংলা ও উর্দুকে সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার যে শম্বুকগতির নীতি চলিতেছে, এটাও আর বেশি দিন চলিবে না বলিয়া আশা করা যায়।

সতরই অধ্যায়

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা

১. ময়মনসিংহে সংগঠন

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে আমি কলিকাতা ছাড়িয়া নিজ জিলা ময়মনসিংহে আসি। বেশ কিছুদিন ধরিয়া দূরন্ত আমাশয়ে ভূগিতেছিলাম। শরীরটা খুবই খারাপ যাইতেছিল। নিজের জন্মভূমি হইলেও মোহাজের। কাজেই রোজগারের জন্যই ওকালতিতে মনোযোগ দেওয়া দরকার। এ অবস্থায় স্থির করিয়াছিলাম সক্রিয় রাজনীতি হইতে কিছুদিন দূরে থাকিয়া অখণ্ড মনোযোগে ওকালতি করিব। শুরুও করিয়াছিলাম সেইভাবেই। কিন্তু কপাল-দোষে তা হইয়া উঠিল না। ঢেকি স্বর্গে গেলেও বাড়া বানে। আমারও হইল তাই। মওলানা ভাসানী ও শহীদ সাহেব কয়েক দিনের মধ্যেই ময়মনসিংহে আসিয়া আওয়ামী লীগ সংগঠন কমিটি করিলেন। আমাকে তার সভাপতিত্বের দায়িত্ব গছাইলেন। বগা ফাঁদে পড়িল।

আওয়ামী লীগ বা যে-কোন সরকার-বিরোধী (অপযিশন) দল গঠন করা তৎকালে সহজ ছিল না। তার কারণ গণ-মন অপযিশন দলের জন্য প্রস্তুত ছিল না তা নয়। বরঞ্চ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক পার্টি থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গণ-মন বিশেষতঃ পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ খুবই সচেতন ছিল। নয়া রাষ্ট্রে অহেতুক সরকার-বিরোধিতা করিয়া ফর্মেটিভ মুদ্দতে কেউ পাকিস্তানের অনিষ্ট করিয়া না বসে, সেদিকেও জনগণের সজাগ নজর ছিল। সেজন্য পাকিস্তান-আন্দোলনের যাঁরা বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁদের কেউ অপযিশন পার্টি করিলে জনগণ অবশ্যই সন্দেহের চোখে দেখিত এবং সরকার তাতে বাধা দিলে জনগণের সমর্থন পাইতেন। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন ছিল না। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের আবশ্যিক প্রয়োজনে শহীদ সুহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মত পাকিস্তান-সংগ্রামের প্রধান-প্রধান নেতারা যখন অপযিশন পার্টি গঠন করিতে চান, তখনও সরকার পক্ষ তাঁদের কাজে আইনী-বেআইনী বাধা দান করেন। হিন্দুদের দ্বারা গঠিত অপযিশন পার্টির বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ অতি সহজেই জনসাধারণের মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিতে পারিতেন। ফলতঃ

১৬—

অনেক হিন্দু নেতার নিতান্ত সদিচ্ছা-প্রণোদিত সমালোচনাকেও সরকার ও সরকারী দলের লোকেরা দূরভিসন্ধিমূলক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে সরকারী দলের কার্যকলাপ শুধু গণতন্ত্র-বিরোধীই ছিল না ; পরিণামে পাকিস্তানের স্বার্থ-বিরোধীও ছিল।

২. মুসলিম লীগের অদূরদর্শিতা

প্রথমতঃ, অদূরদর্শিতার ফলেই মুসলিম লীগের দরজা জনসাধারণের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমার নেতা ও তৎকালীন মনিব শহীদ সাহেবের মতের বিরুদ্ধে 'ইত্তেহাদে' আমি যে মুসলিম লীগ বজায় রাখিবার সুপারিশ করিয়াছিলাম, সেটা ছিল বিভাগ-পূর্ব কালের মতই প্রতিনিধিত্বমূলক মুসলিম লীগ। পাকিস্তানের আগে ও পরে একাধিক বার কায়েদে-আযম বলিয়াছিলেন ঃ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রূপ পাকিস্তানের জনগণই নিজ হাতে গঠন করিবে। মুসলিম লীগ সরকারই পাকিস্তানের কন্‌স্টিটিউশন রচনা করিবেন এ কথার মানেই জনগণ করিবে। সুতরাং পাকিস্তান হাসিলের সংগে সংগেই মুসলিম লীগের দরজা জনগণের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া শুধু রাজনৈতিক অপরাধ ছিল না, নৈতিক মর‍্যাল ও এথিক্যাল অপরাধও ছিল। নেতারা শুধুমাত্র কোটারি-স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম লীগকে পকেটস্থ করিলেন। এই কাজে তাঁরা প্রথম অসাধুতার আশ্রয় নিলেন বাংলা বাঁটোয়ারা হইয়াছে এই অজুহাতে বাংলার মুসলিম লীগ ভাংগিয়া দিয়া। কাজটা করিলেন তাঁরা এমন বেহায়া-বেশরমের মত যে পাঞ্জাব ভাগ হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ ভাংগিলেন না। ফলে পক্ষপাতিত্ব-দোষে বামাল গেরেফতার হইলেন। দ্বিতীয় অসাধুতা করিলেন তাঁরা নিজেদের বাধ্য-অনুগত লোক দিয়া এড-হক কমিটি গঠন করিয়া। তৃতীয় অসাধু কাজ করিলেন নয়া মুসলিম লীগ গঠনের জন্য প্রাইমারি মেম্বরশিপের রশিদ বই বগল-দাবা করিয়া। মুসলিম্ লীগ কর্মীদের পক্ষে জনাব আতাউর রহমান খাঁ ও বেগম আনোয়ারা খাতুন প্রথমে মওলানা আকরম খাঁ ও পরে চৌধুরী খালিকুযযামানের কাছে দরবার করিয়াও রশিদ বই পান নাই। তাঁরা নাকি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, এখন তাঁরা আর লীগের বেশি মেম্বর করিতে চান না। তাঁদের যুক্তি ছিল, এখন শুধু গঠনমূলক কাজ দরকার। হৈ হৈ করিলে তাতে কাজের বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। এসব কথা আমি কলিকাতা বসিয়া খবরের কাগযে পড়িয়াছিলাম। নিজের কাগয 'ইত্তেহাদে' এই অদূরদর্শিতার কঠোর নিন্দা করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, যে-

সব দেশে একদলীয় শাসন চালু আছে, সেখানেও রুলিং পার্টির দরজা এমন করিয়া বন্ধ করা হয় নাই। লীগ-নেতৃত্বের এই মনোভাব ছিল অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। কায়েদে-আযমের জীবমানেই শাসক-গোষ্ঠী ও তাঁদের সমর্থকরা এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমার মনে কম ধাক্কা লাগে নাই। তবে কি মুসলিম লীগ-নেতারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের পন্থা অনুসরণ করিতেছেন? কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট ইত্যাদি বিপ্লবী পার্টির সাংগঠনিক জোট ঐক্য ও শক্তির জন্য এবং নেতৃত্বের নিরাপত্তার খাতিরে অনেক সময় সাবধানতা অবলম্বনের দরকার হয়। পার্টি-আদর্শের বিরোধী লোকেরা নিতান্ত গণতান্ত্রিক উপায়ে পার্টিতে ঢুকিয়া বিভীষণ বা পঞ্চম বাহিনীর কাজ করিতে পারে। সেজন্য পার্টির এক্সেসিভ গ্রোথের 'অতিরিক্ত বৃদ্ধির' বিরুদ্ধে ঐ সব পার্টি হুশিয়ার থাকে। কিন্তু মুসলিম লীগ তেমন ফ্যাসিস্ট পার্টি ছিল না। কাজেই ঐ সাবধানতার কোনও দরকারও তার ছিল না। আগত্যা মুসলিম লীগ কর্মীরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রথমে নারায়ণগঞ্জে ও পরে টাঙ্গাইলে কর্মী-সম্মিলনী করিয়া নেতাদের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং মুসলিম লীগের দরজা খুলিয়া দিবার দাবি করেন। নেতারা কর্ণপাত না করায় ১৯৪৯ সালে কর্মীরা নিজেরাই মুসলিম লীগ গঠন করেন। সরকারী মুসলিম লীগ হইতে পার্থক্য দেখাইবার জন্য তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম রাখিলেন : জনগণের (আওয়ামী) মুসলিম লীগ। আমি কলিকাতা থাকিতেই এসব ঘটিয়াছিল এবং 'ইত্তেহাদের' পুরা সমর্থন পাইয়াছিল। কাজেই ময়মনসিংহে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কাজ হাতে নিলাম, তখন মতের ও মনের দিক দিয়া নয়া কোনও কাজ করিলাম না।

৩. মুসলিম লীগের ভ্রান্ত-নীতি

মুসলিম-লীগ নেতারা দ্বিতীয় ভুল করিলেন পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ করিবার উদ্যোগ না নিয়া। শুধু উদ্যোগ নিলেন না, তা নয়। পাকিস্তানী জাতীয়তা স্ফুরণে বাধাও দিলেন। ঐতিহাসিক কারণেই ভারতে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানে কংগ্রেস বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিৎ ছিল : রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যও, সাম্প্রদায়িক প্রীতির জন্যও। বোম্বাই ও মালাবার ছাড়া ভারতের সর্বত্র মুসলিম লীগ ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব-বাংলার কংগ্রেস নেতারাও কংগ্রেস ভাংগিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মুসলিম লীগ ভাংগিয়া ন্যাশনাল লীগ করা হইলে তাঁরা তাতেই যোগ দিতেন। মুসলিম লীগ বজায় রাখা স্থির হওয়ার আগে পূর্ব-বাংলার শাসক-গোষ্ঠীর

মনে সত্যই ভয় সান্ধাইয়াছি। কারণ কায়েদে-আযমও ঐ মতের বলিয়া তাঁরা জানিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুরা কংগ্রেস ভাংগিয়া দিলে কায়েদে-আযম ও শহীদ সুহরাওয়ার্দীর নীতি আরও জোরদার হইয়া পড়ে। তাই পূর্ব-বাংলার মন্ত্রীরা, বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিন, কংগ্রেস-নেতাদেরে একরূপ ধমকাইয়া কংগ্রেস ভাংগা হইতে বিরত রাখেন। খাজা নাযিমুদ্দিনের কথায় রাযী হওয়ায় মিঃ শ্রীশ চন্দ্র চাটার্জীর সাথে মিঃ কামিনী কুমার দত্ত ও মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের নেতৃত্বে অনেক কংগ্রেস-নেতার, বিশেষতঃ কুমিল্লা গ্রুপের, মনোমালিন্য হইয়া যায়। এসব কথাই তৎকালে খবরের কাগযে প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ এসব ঘটনা স্মরণ করাইবার কারণ এই যে আমি দেখাইতে চাই মুসলিম লীগ-নেতারা নিজেরা পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করিবেন বলিয়াই পাকিস্তানী হিন্দুদের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করিতে দেন নাই। অথচ মজা এই যে 'পাকিস্তান-বিরোধী ঐতিহ্য-ওয়ালা কংগ্রেস' চালাইবার 'অপরাধে' পরে হিন্দুদেরে নিন্দাও করিয়াছেন মুসলিম লীগ নেতারাই। যে মনোভাবের দরুন মুসলিম লীগ-নেতারা হিন্দু নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেস চালাইয়া যাওয়ার তাকিদ দেন, ঠিক সেই মনোভাবের দরুনই তাঁরা হিন্দু-নেতৃবৃন্দকে পৃথক নির্বাচন-প্রথা দাবি করায় উস্কানি দেন। দেশের বিপুল মেজরিটি হইয়াও নিজেরা পৃথক নির্বাচন-প্রথা দাবি করাটা ভাল দেখায় না ; অথচ মুসলিম লীগ-নেতারা পৃথক নির্বাচনের জন্য একেবারে উন্মাদ। কাজেই মাইনরিটি সম্প্রদায় হিন্দুদেরে দিয়া পৃথক নির্বাচন প্রথা দাবি করাইতে পারিলে কাজটা সহজ হয়। এই কারণেই মুসলিম লীগ-নেতাদের এই অপচেষ্টা। হিন্দু নেতৃবৃন্দ অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র এই জন্য যে নিজেরা ক্ষুদ্র মাইনরিটি হইয়াও এবং রুলিং পার্টির দ্বারা উৎসাহ প্ররোচনা এমন কি ওয়ার্নিং পাইয়াও তাঁরা পৃথক নির্বাচন-প্রথা দাবি করিতে রাযী হন নাই।

৪. কায়েদে-আযমের নীতি

এই ধরনের মনোভাব লইয়াই মুসলিম লীগ-নেতারা পাকিস্তান শাসন পরিচালন শুরু করেন। কাজেই যতই অযৌক্তিক হোক, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নাম গৌরব তার মর্যাদা ও তার জনপ্রিয়তাকে সম্বল করিয়া চলাই তাঁরা স্থির করেন। গণতন্ত্র-মনা কায়েদে-আযম স্পষ্টতঃই এই মতের পরিপোষক ছিলেন না। গণ-পরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি তাঁর আদর্শ মতবাদ ও কার্যক্রম স্পষ্ট করিয়াই ঘোষণা করিলেন। শাসক-গোষ্ঠীর তাগাদায় তিনি অবশেষে ছয় মাস পরে ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মুসলিম লীগের বৈঠক দেন। বৈঠকটা গোপনীয় হয়। খবরের

কাগযের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। বৈঠক শেষে ২৮শে ফেব্রুয়ারি গবর্নর-জেনারেল-ভবন হইতে প্রচারিত পাকিস্তান সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয় : '২১শে ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তী কয়েকদিন করাচিতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের যে গোপন বৈঠক হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ভুল সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই ছিল নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য। তখন মুসলিম লীগ ভারতের সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। দেশ ভাগ হওয়ার পর মুসলিম লীগ এখন একটি পার্টি হিসাবে কাজ করিবে, আগের মত গোটা মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবে না। তদনুসারে মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে।'

প্রেসনোটে যে 'ভুল সংবাদের' কথা বলা হইয়াছে, তা সত্য-সত্যই লীগ নেতৃবৃন্দ তেমন 'ভুল সংবাদ' প্রচার করিতেছিলেন। ঐ সময় ২৫শে ফেব্রুয়ারি হইতে পাকিস্তান গণ-পরিষদের বৈঠক চলিতেছিল। সেই সমাবেশের সুযোগ লইয়া মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দাবি করিতেছিলেন যে কায়েদে-আযম মুসলিম লীগ বজায় রাখিতে রাযী হইয়াছেন। কাজেই মুসলিম লীগ তখনও মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই দাবির রাজনৈতিক তাৎপর্য গুরুতর। পরিণামে এক দলীয় ফ্যাসিযম আসিতে পারে। তাই স্বয়ং কায়েদে-আযম, মুসলিম লীগ আফিস হইতে নয়, গবর্নর-জেনারেলের দফতর হইতে, সরকারীভাবে ঐ ইশ্‌তাহার জারি করেন।

৫. কায়েদের নীতি পরিত্যক্ত

কায়েদে-আযম কর্তৃক প্রচারিত এই সরকারী প্রেসনোটে সকল বিতর্কের অবসান হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু হয় নাই। শাসক-গোষ্ঠী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সরকার-সমর্থক সংবাদ-পত্র সমূহ সকলেই এর পরেও মুসলিম লীগকেই পাকিস্তানের মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবি করিতে থাকেন। কাজেই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধতা মানে পাকিস্তানেরই বিরুদ্ধতা, এ কথা বলিতে শুরু করেন। ক্রমে তাঁরা দাবি করিতে থাকেন, ইসলামের হেফাযতের জন্যই পাকিস্তানের আবির্ভাব। সুতরাং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধতা মানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা মানে ইসলামের বিরুদ্ধতা। ঐক্য, ঈমান ও শৃংখলাই ইসলাম। কায়েদে আযমেরও বাণী। কাজেই পাকিস্তানে অপযিশন পার্টি মানেই পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমনি। কথাটা এমন জমাইয়া তোলা হইল যে শহীদ সাহেব কনস্টিটিউশন্যাল অপযিশনের কথা তোলায় এক ছুতায় গণপরিষদ হইতে তাঁর নাম কাটিয়া দেওয়া হয়

এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ সাহেব সুহরাওয়ার্দী সাহেবকে 'হিন্দুস্থানের লেলাইয়া-দেওয়া পাগলা কুত্তা' বলিয়া গাল দেন। পাকিস্তানের তৎকালীন নেতৃত্বের মগজ কতটা খারাপ হইয়াছিল শহীদ সাহেবের মত পাকিস্তান-সংগ্রামের একজন সেনাপতিকে 'পাগলা কুত্তা' বলা হইতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গণতন্ত্রে বিশ্বাস, জনগণে আস্থা, রাজনৈতিক সাহস ও দূরদর্শিতা একই আত্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক। একটার প্রতি অনাস্থা ও সন্দেহ আসিলে বাকীগুলির প্রতিও সন্দেহ-অবিশ্বাস আসিবেই। এ সবের প্রতি সন্দেহ একটা সাংঘাতিক পিছলা ঢাল। সে ঢালে একবার বা পড়িলে সর্বনিম্নস্তরে যাইতেই হইবে। মুসলিম লীগ-নেতারা ক্রমে এবং দ্রুত এই ঢালের তলদেশে চলিয়া গেলেন। দেশবাসীকে ত বটেই খোদ মুসলিম লীগ কর্মীদেরেই অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ১৯৪৮ সালে টাংগাইল উপনির্বাচনে তরুণ মুসলিম লীগ-কর্মী শামসুল হকের হাতে পরাজিত হইয়া পূর্ব-বাংলার সরকার ও সরকারী মুসলিম লীগ ঘরের কোণে আশ্রয় লইলেন। একে-একে পঁয়ত্রিশটি বাই-ইলেকশন স্থগিত রাখিলেন।

৬. আওয়ামী লীগ গঠনে বাধা

কাজেই ১৯৫০ সালে মওলানা ভাসানী ও জনাব শহীদ সাহেব আওয়ামী লীগ সংগঠনে যখন ময়মনসিংহে আসিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের 'লাঠি' জনাব আবদুল মোনেম খাঁর নেতৃত্বে এ শহরের মুসলিম লীগ কর্মীরা একেবারে ক্ষিপ্ত। ময়মনসিংহে নেতৃদ্বয় আসিতেছেন শুনিয়া অবধি স্থানীয় মুসলিম লীগ কর্মীরা স্বয়ং মোনেম খাঁ সাহেবের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে মাইকে পোস্টারে এই দুই বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় নেতার বিরুদ্ধে অশ্লীল কটূ-কাটব্য শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত গুণ্ডামি করিয়া আমাদের সভা ভাংগিয়া দিলেন। গুণ্ডামিটা করিলেন অতিশয় ভদ্রভাবে। টাউন হল ময়দানে সভা। ময়দানের একপাশে টাউন হল। অপর পাশে জিলা স্কুল বোর্ডের বিল্ডিং। টাউন হল মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি। মুসলিম লীগ-নেতা জনাব গিয়াসুদ্দিন পাঠান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। 'জিলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি জনাব আবদুল মোনেম খাঁ স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। এই দুইটি বিলডিং-এ একাধিক মাইক হইতে একাধিক লাউডস্পিকার ফিট করা হইল। সবগুলি লাউডস্পিকারের মুখ সভামুখী করা হইল। মুসলিম লীগ-কর্মীরা দুই দালানের ভিতরে বসিলেন। ভিতর হইতে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। 'কর্ম' শুরু করিলেন। সভার কাজ শুরু হইতেই তাঁরা উভয় দালানের ভিতর হইতে শিয়াল-কুত্তা, গাধা-গরু ও হাঁস-মুরগীর ডাক

শুরু করিলেন। চারগুণ মাইক ও লাউডস্পিকার এবং দশগুণ 'বক্তার' মোকাবেলায় আমাদের বক্তৃতা কেউ শুনিতে পাইলেন না। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমি নিজে তাঁদেরে বারবার অনুরোধ করিলাম সভায় শান্তি স্থাপন করিতে। আমি ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত স্বয়ং শহীদ সাহেবও তাঁদেরে অনুরোধ করিলেন। তাঁরা 'নন-এলাইনমেন্ট' নীতি ঘোষণা করিলেন। সভাস্থ লোকের একদল দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিয়া দুষ্কৃতিকারীদের লাউডস্পিকার খুলিতে গেল। অপর দল দরজা-জানালা ভাংগিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দুষ্কৃতিকারীদেরে নিরস্ত করিতে চাহিল। এই সময় ডি. এম. ও এস. পি. তাঁদের নিরপেক্ষ-নীতি বিসর্জন দিয়া দুষ্কৃতি-নিরস্তকারীদেরে নিরস্ত করিলেন। আমরা সভার আশা ত্যাগ করিলাম। নেতাদ্বয় সারা শহর পায় হাঁটিয়া জিলা বোর্ডের ডাক-বাংলায় গেলেন। সভার বিরাট অংশ তাঁদের পিছনে-পিছনে হাঁটিয়া তথায় জমায়েত হইল। নেতাদ্বয় সংক্ষেপে বক্তৃতা করিলেন। জিলা আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠন কমিটি গঠিত হইল।

৭. একদলীয় শাসন

পূর্ব-বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক আচরণের দৃষ্টান্তের হাজারের মধ্যে এটি একটি। যে সব কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির দুই তিন বছরের মধ্যে মুসলিম লীগ ও সরকার জনগণের কাছে অপ্রিয় হইয়া উঠেন, এটি তার অন্যতম। আমি অতঃপর মুসলিম লীগের বন্ধুদেরে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করি। গণতন্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দেই। তাঁরা হাসেন। বোধহয় আমার সরলতায় ও নির্বুদ্ধিতায়। তাঁদের 'কর্মী'দের 'কর্ম'-তৎপরতা বাড়ে। আমার গণতন্ত্রের বুলিকে আমাদের দুর্বলতা মনে করেন জিলার নেতারা।

নেতা ও মন্ত্রীর সাথে আলাপ করিয়া আমি একটা ব্যাপারে বিস্মিত হইলাম। বুঝিলাম, ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি গভর্নর-জেনারেল কায়েদে-আযম জিন্না পাকিস্তানের মুসলিম লীগের স্ট্যাটাস ও মর্যাদা সম্পর্কে যে সরকারী প্রেস-নোট জারি করিয়া গিয়াছেন, এঁরা হয় তা জানেন না, নয় ত ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া যাইতেছেন।

এই প্রেস-নোটের দিকে বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। ইহার মধ্যে কায়েদে-আযমের দূরদৃষ্টি ও উইযডম নিহিত আছে, এটা অনুসরণ না করিলে মুসলিম-লীগ নেতাদের নিজেদের এবং পরিণামে পাকিস্তানের ক্ষতি হইবে, কত যুক্তি দিলাম।

ক্ষমতাসীনরা কখনও নিজেরা না ঠকিয়া শিখেন না। আমাদের নেতারাও শিখিলেন না। মুসলিম লীগকেই একমাত্র পার্টি দাবি করিয়া চলিলেন।

১৯৫০ সালের স্বাধীনতা দিবস-উৎসবে ইন্তেযাম কমিটিতে ডি. এম. মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সভাপতিদ্বয়কে দাওয়াত করিলেন যাঁর –তাঁর প্রতিষ্ঠানের সভাপতি রূপে। আমাকে করিলেন ব্যক্তিগত ভাবে। আমি প্রতিবাদ করিলাম। ডি. এম. মুসলিম লীগ–নেতাদের দোহাই দিলেন। নেতারা বলিলেন ঃ তাঁরা আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ফলে আমি ইন্তেযাম কমিটিতে যোগ দিলাম না।

পরবর্তী স্বাধীনতা দিবসের ইন্তেযাম কমিটিতে আমাকে আওয়ামী লীগের সভাপতিরূপেই ডাকা হইল। আমি গেলাম। অন্যান্য প্রস্তাবের পর আমি প্রস্তাব করিলামঃ আযাদি দিবসের জনসভায় জিলা ম্যাজিস্ট্রেট সভাপতিত্ব করিবেন। বরাবর জিলা মুসলিম লীগের সভাপতি জনসভার সভাপতি হন। আমার যুক্তি এই যে আযাদি-দিবসের উৎসব সরকারী অনুষ্ঠান, মুসলিম লীগ–অনুষ্ঠান নয়। সরকারী অনুষ্ঠানকে পার্টি–অনুষ্ঠানে পরিণত করিলে জাতীয় অনুষ্ঠানেরই অমর্যাদা করা হয়।

যুক্তিপূর্ণ হওয়ার দরুনই হোক, অথবা সরকারী কর্মচারিদের সুবিধার খাতিরেই হোক, অধিকাংশ সরকারী কর্মচারি আমার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। বলা আবশ্যক, সরকারী–অনুষ্ঠান বলিয়া ইন্তেযাম কমিটিতে সরকারী কর্মচারিরাই মেজরিটি থাকিতেন। পুলিশ সুপার মিঃ মহিউদ্দিন আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে আমার প্রস্তাব সেকেণ্ড করিলেন। উপস্থিত লীগ–নেতারা গর্জিয়া উঠিলেন। টেলিগ্রামে বদলি করাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। তাঁদের কেউ–কেউ ঘাবড়াইলেনও। অতঃপর ঢাকা ও করাচির অনুষ্ঠানে যথাক্রমে লাট ও বড়লাট সভাপতিত্ব করেন, এই নযির দিয়া ব্যাপারটা গবর্ণমেন্টের কাছে রেফার করিবার সুপারিশ করিলাম। সকলে এতে রাযী হইলেন। পরদিনই সরকারী নির্দেশ আসিল। আমার মতই ঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান এইভাবে মুসলিম লীগের কবলমুক্ত হইল। জিলা মুসলিম লীগ-সভাপতির বদলে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে স্বাধীনতা দিবসের জনসভা অনুষ্ঠিত হইল। আওয়ামী লীগ নেতারা বক্তৃতা করিবার সুযোগ পাইলেন। এটাকে স্থানীয় জনগণ আওয়ামী লীগের জয় বলিয়া মানিয়া নিল।

৮. রাষ্ট্র–ভাষা আন্দোলন

এই অবস্থায় আসিল রাষ্ট্র–ভাষা আন্দোলন। ক্ষমতাসীন দলের অন্যান্য মারাত্মক ভুলের মত এটাও ছিল একটা মারাত্মক ভুল । সম্ভবতঃ সব চাইতে মারাত্মক।

গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের মুখের ভাষা রাষ্ট্র-ভাষা হইবে, এটা বুঝিতে প্রতিভার দরকার হয় না। সবাই এটা বুঝিয়াছিলেন। আমাদের মত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কর্মীরা মুখ ফুটিয়া তা বহু আগেই বলিয়াছিলামও। কলিকাতাস্থ পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পাকিস্তান সৃষ্টির তিন বছর আগে বাংলার জনগণকে বলিয়াছিল পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে বাংলা। তখন অবশ্য লাহোর-প্রস্তাব-মত পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবেই ধরা হইয়াছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকার শিক্ষক-ছাত্র, যুবক-তরুণরা মিলিয়া তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে রাষ্ট্র-ভাষা সম্পর্কে যে পুস্তিকা বাহির করেন, তাতে অন্যান্যের সাথে আমারও একটা লেখা ছিল। তাতে বাংলাকে সরকারী ভাষা করার দাবি করা হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন পূর্ব-বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমের মারাত্মক ভুলে রাষ্ট্র-ভাষার ব্যাপারটা বিতর্কের বিষয় হইয়া পড়ে, তখনও আমার সভাপতিত্বে কলিকাতাস্থ বংগীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির এক অধিবেশনে বাংলাকে সরকারী ভাষা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিনের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে হরতাল হয়। ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এতেও নেতাদের চোখ খুলে না। পাকিস্তানের মেজরিটির ভাষা বাংলাকে অগ্রাহ্য করিয়া উর্দুর ডবল মার্চ চলিতে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের পূর্ব-বাংগালী মন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা এর প্রতিবাদে বা বাংলার সমর্থনে টু শব্দটি করেন না। এতেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। একমাত্র 'আজাদ'-সম্পাদক ও মুসলিম লীগ দলীয় এম. এল. এ. জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন সরকারী নীতির প্রতিবাদে মেম্বরগিরিতে ইস্তাফা দিয়া ছাত্র-তরুণদের প্রশংসা অর্জন করেন।

ময়মনসিংহ জিলায় আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ রাখা আমি কর্তব্য মনে করিলাম। আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব হাশিমুদ্দিন আহমদ, আনন্দ মোহন কলেজের তৎকালীন ভাইস-প্রিন্সিপাল সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসেন ও আমি এই তিন জনের একটি কমিটি অব-এ্যাকশন গঠন করিয়া সমস্ত ক্ষমতা এই কমিটির হাতে কেন্দ্রীভূত করিলাম। এই কমিটির নির্দেশ ও অনুমোদন ব্যতীত কেউ কিছু করিতে পারিবে না, নির্দেশ দেওয়া হইল। শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল মিছিল ও সভা-সমিতি চলিতে লাগিল। আমলাতন্ত্র উস্কানি দিয়া শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে অশান্ত করিয়া তোলায় উস্তাদ। আমার জিলা-কর্তৃপক্ষও সে উস্তাদি দেখাইলেন। আমি বাদে কমিটি-অব-এ্যাকশনের দুইজন মেম্বরকেই তাঁরা নিরাপত্তা আইনে বন্দী করিলেন। আমার দুই

ছেলে মহবুব আনাম ও মতলুব আনাম সহ ২৭ জন কলেজ-ছাত্রকেও ওঁদের সংগে জেলে নিয়া গেলেন। অতি কষ্টে আমি শহরের ছাত্র-জনতার ক্রোধ প্রশমিত করিতে লাগিলাম। কিন্তু মফস্সলে এই সংবাদ পৌছা মাত্র চারদিক হইতে হাজারে-হাজার লোক শহরে জমায়েত হইল। এই মারমুখী জনতা কোর্ট-আদালত ঘিরিয়া ফেলিল। কর্তৃপক্ষ ঘাবড়াইলেন। শান্তি রক্ষার জন্য এবং জনতাকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাকে ধরিলেন। আমি দালানের ছাদে দাঁড়াইয়া মেগাফোন মুখে জনতার উদ্দেশ্যে গলাফাটা বক্তৃতা করিলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। শান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও অশান্তির বিপদের কথা বলিলাম। ধৃত নেতা-ছাত্রদেরে খালাস করিবার ওয়াদা করিলাম। আল্লার মেহেরবানিতে জনতার সুমতি হইল। প্রায় তিন-চার ঘন্টা-স্থায়ী বিক্ষোভের পরে জনতা শহর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সরকার ও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গণ-মন বিক্ষুব্ধ হইল। আরও দুই বছরে গণ-মনের তিক্ততা চরমে নিয়া অবশেষে ১৯৫৪ সালে লীগ-নেতারা সাধারণ নির্বাচন দিলেন। গণ-মন তিক্ত হইলেও এতটা তিক্ত যে হইয়াছে, তা আমি বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় মুসলিম লীগ-নেতারাও পারেন নাই। কাজেই কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন দলের সাথে নির্বাচন যুদ্ধে জিতা কঠিন বিবেচিত হইল। সরকার-বিরোধী প্রগতিবাদী সমস্ত শক্তির সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হইল।

আঠারই অধ্যায়

যুক্তফ্রন্টের ভূমিকা

১. যুক্তফ্রন্ট গঠন

এই সময় জনাব ফযলুল হক সাহেব পূর্ব-বাংলা সরকারের এডভোকেট জেনারেলের চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করিলেন। মওলানা ভাসানী ও জনাব শহীদ সুহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এবং ছাত্র-তরুণদের সক্রিয় সমর্থনে ইতিমধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ খুবই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কাজেই সকলেই আশা করিল হক সাহেব আওয়ামী লীগেই যোগ দিবেন। দু-একটা জনসভায় বক্তৃতায় এবং বিবৃতিতে তিনি তেমন কথা বলিলেনও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কৃষক-শ্রমিক-পার্টি নামে একটি পার্টি গঠন করিলেন। সুতরাং হক সাহেবের সহযোগিতার খাতিরে একাধিক পার্টির সমন্বয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করা ছাড়া উপায় থাকিল না। যতই দিন যাইতে লাগিল, ছাত্র-তরুণ প্রভৃতি প্রগতিবাদী চিন্তাশীলদের মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ যুক্তফ্রন্ট গঠন করার দাবি সার্বজনীন হইয়া উঠিল।

আওয়ামী লীগ-কর্মী হিসাবে এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণের অন্য আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল। ১৯৫৩ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ শহরে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে আমি যুক্তফ্রন্ট গঠন করার পক্ষে যুক্তি দেই। আবেদন করি। শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার অনুমতি দেয়। অতঃপর হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব যুক্তবিবৃতিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশ্‌তাহার রচনার ভার আমার উপরই পড়ে। আমি ইতিপূর্বেই আওয়ামী লীগের ৪২ দফার একটি নির্বাচনী ইশ্‌তাহার রচনা করিয়াছিলাম। উহাকেই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশ্‌তাহার করিবার কথা মওলানা সাহেব বলিলেন। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতারা বলিলেন তাঁদের একমাত্র আপত্তি এই যে ঐ ইশতাহারে দফার সংখ্যা বড় বেশি। উহাকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে আনিতে হইবে। তাঁদের সংগে আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ৪২ দফাকে কমাইয়া ২৮ দফা করিলেই তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এর পর বিনা-বাধায় রচনা শেষ করার জন্য আমাকে একলা এক ঘরে বন্দী করা হইল।

২. ২১ দফা রচনা

আমি মুসাবিদায় হাত দিলাম। মুসাবিদা করিতে-করিতে হঠাৎ একটা ফন্দি আমার মাথায় ঢুকিল। এটাকে ইন্সপিরেশন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার সেবা-কেন্দ্র করার তিনটি দফা আওয়ামী লীগের ৪২ দফায়ও ছিল। এই তিনটি দফাকে যুক্তফ্রন্টের ইশ্‌তাহারের অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতারা রাযী হইয়াছেন। সুতরাং তা হইবে। তা হইলে যুক্তফ্রন্টের মতেও ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। কাজেই ২১ ফিগারটাকে চিরস্মরণীয় করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্তফ্রন্টের কর্ম-সূচিকে ২১ দফার কর্মসূচি করিলে কেমন হয়? ৪২ দফা কাটিয়া ২৮ দফা করা গেলে ২৮ দফাকে কাটিয়া ২১ দফা করা যাইবে না কেন? নিশ্চয় করা যাইবে। তাই করিলাম। অতঃপর আমার কাজ সহজ হইয়া গেল। ইতিহাস বিখ্যাত ২১ দফা রচনা হইয়া গেল। এই একুশ দফা মেনিফেস্টো পরবর্তীকালে পূর্ব-বাংলার ছাত্র-জনতার জীবন-বাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন দখল করিয়াছিল। শতকরা সাড়ে ৯৭টি ভোট পাইয়াছিল। এত বড় জয়ের প্রধান কারণ ছিল এই ২১ দফা। আমি নিজে ছাত্র-তরুণ ও জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া বুঝিয়াছি ২১ দফা সত্য-সত্যই তাদের মধ্যে নব জীবনের একটা স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া-ছিল। যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব-দোষে কিভাবে এই বিপ্লবাত্মক পার্লামেন্টারি জয়টা নস্যাৎ হইয়াছিল, সে কথা আমি একটু পরে বলিতেছি। যুক্তফ্রন্টের ঐ বিজয় নস্যাৎ হওয়ার পর জনগণের দুশমনরা কিভাবে ২১ দফাকেও নস্যাৎ করিতে চাহিয়াছে এবং অনেকখানি সফল হইয়াছে, সে কথাটাই প্রসঙ্গক্রমে ও সংক্ষেপে আমি এখানে বলিতেছি।

৩. ২১ দফার যৌক্তিকতা

২১ দফাকে জনগণের শত্রুরা প্রথমতঃ 'ইউটোপিয়া' ও মিথ্যা স্তোক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁদের মতে ২১ দফার বেশির ভাগ ওয়াদাই ইম্‌প্র্যাকটিকেবল। যুক্তফ্রন্টের নেতারা জানিয়া-শুনিয়াই এইসব মিথ্যা ওয়াদা করিয়াছেন। ভোটারগণকে মিথ্যা স্তোক দিয়া ভোট নেওয়া হইয়াছে। ঐসব ওয়াদা পূরণের ইচ্ছা যুক্তফ্রন্ট-নেতাদের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ অনেকে বলিয়াছেন যে কি যুক্তফ্রন্টের নেতারা, কি প্রার্থীরা, কি ভোটাররা কেউ ২১ দফার বিষয় সিরিয়াসলি চিন্তাও করেন নাই। ঐসব ওয়াদার মর্ম বুঝিয়া ভোটাররাও ভোট দেয় নাই। প্রার্থীরাও ভোট চাহেন নাই। শুধু মুসলিম লীগ-নেতাদেরে গাল দিয়া এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ডাহা-ডাহা মিথ্যা অভিযোগ

করিয়া ভোটারগণকে ভুল বুঝানো ও ক্ষেপানো হইয়াছে। মুসলিম লীগের উপর রাগ করিয়া ভোটাররা এই 'নিগেটিভ' ভোট দিয়াছে। এই দুই শ্রেণীর বিরোধী দল ছাড়া যুক্তফ্রন্টের ভিতরেও ২১ দফার বিরোধী অনেকে ছিলেন। এঁদের কেউ-কেউ ২১ দফার এক হাজার টাকা মন্ত্রি-বেতনের দফাটাকে অবাস্তব এবং সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাস আগে মন্ত্রি-সভার পদত্যাগের দফাটাকে 'অতিরিক্ত সাধুতা' বলিয়া অভিহিত করেন। ২১ দফার রচয়িতা বলিয়া আমাকেই এঁদের নিন্দা সহিতে হইত। বিশেষতঃ এক হাজার টাকা মন্ত্রি-বেতনে কি করিয়া চলিতে পারে? যেখানে সরকারী কর্মচারিরা তিন হাজার, হাইকোর্টের জজের চার হাজার টাকা বেতন পান, সেখানে সকল কর্মচারি ও বিচারকের কর্তা মন্ত্রীরা হাজার টাকা বেতনে মান-মর্যাদা ও শান-শওকত বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন না। আমার মাথার এই সিধা সহজ কথাটা না ঢুকায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে আমাকে হয় নির্বোধ নয় একরোখা (সোজা কথায় পাগল) বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিতেন না। তথাপি তাঁদের মতামত আমার কানে আসিত। আমি তাঁদের অভিমত মন দিয়া বিচার করিয়াছি। কিন্তু আমার মত পরিবর্তনের কোনও কারণ আজও খুঁজিয়া পাই নাই। পূর্ণ-আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন রাষ্ট্র-ভাষা বর্ধমান হাউস শহীদ মিনার ইত্যাদি সব বিষয়ের দাবি যে নিতান্ত বাস্তব ও যুক্তিসংগত ছিল, কাজের মধ্যে দিয়া ও জনগণের পূর্ণ সমর্থনে আজ তা প্রমাণিত হইয়াছে। শুধু বাকি আছে হাজার টাকা মন্ত্রি-বেতনের দফাটা। জন-গণের নির্বাচিত প্রতিনিধি মন্ত্রীদের বেতন কি হইবে, তা বিচার করিবার মাপকাঠি আমার মতে দুইটিঃ (১) জনগণের মাথা-পিছু আয়ের অনুপাত ; (২) দেশে জীবন-যাত্রার সাধারণ মানের অনুপাত। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে চালে-চলনে এবং খোরাকে-পোশাকে জাতীয় নেতারা জনগণ হইতে খুব বেশি দূরে থাকিবেন না। আমার এই অভিমত কোনও অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ও অবাস্তব আইডিয়েলিযম নয়। এর বুনিয়াদ গণিতিক ও স্ট্যাটিসটিক্যাল। ভারতের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এবং চীনের ও ভিয়েৎনামের জাতীয় নেতা মাও-সেতুং ও হোচিমিনের জীবন-মান ও বেতনই এ ব্যাপারের আদর্শ নযির। আমার দেশবাসীর গড়-পড়তা মাথা-পিছু আয় কত এবং তাদের সাধারণ জীবন মান কি, এ সম্পর্কে দুই মত হওয়ার উপায় নাই। সরকারী কর্মচারি ও নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রভৃতি দেশ-শাসকগণ জনগণের জীবন-মান হইতে কতদূরে যাইতে পারেন, তারও একটা সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রেওয়াজ আছে। এই তিনটি ফ্যাক্টর একত্র করিয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে ২১ দফার মন্ত্রি-বেতনের ধারাটা অবাস্তব পাগলামি নয়।

৪. জনগণ ও শাসক-শ্রেণী

অফিসারদের বেতনের সংগে তুলনায় যে মন্ত্রিবেতন দৃষ্টিকটু মর্যাদা-হানিকর রূপে কম হইয়া পড়ে, সেটাও আমার বিবেচনার মধ্যে ছিল। আইন ও শাসনতান্ত্রিক বাধা হেতু ২১ দফায় তার উল্লেখ করা হয় নাই। আমাদের দেশের শাসন-খরচা বেশি।

এ সম্বন্ধে দুইমত নাই। এটাকে বহু বিশেষজ্ঞ মাথা-ভারি শাসন-যন্ত্র বলিয়াছেন। রাষ্ট্রের রূপ অবাধ অর্থনীতি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজবাদ, এসব গুরুতর বিষয়ে তর্ক তুলার স্থানও এটা নয়। তার দরবারও নাই। জনগণের কল্যাণই সকল মতের চরম কথা। তা যদি হয় তবে শেষ পর্যন্ত জনগণের ইচ্ছা-অনুযায়ী সব ব্যবস্থা হইবে এটাও জানা কথা। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ খতম হইবেই। রাষ্ট্র-নায়করা যদি বিদেশী হন তবে এই মিলেনিয়াম বা সত্যযুগ লাভের প্রতিবন্ধকতা হয়। তাই স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এ যুগের বাণী। রাষ্ট্র-নায়করা দুই রকমে বিদেশী হইতে পারেন : (১) ভিন্ন দেশ হইতে আগত বিদেশী ; (২) দেশজাত বিদেশী। আমরা ১৯৪৭ সালে প্রথম শ্রেণীর বিদেশীদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা পাই নাই। পাওয়ার ভরসাও দেখিতেছি না। বেশি লম্বা না করিয়া এক কথায় আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি। পোশাক-পরিচ্ছদে এবং কথাবার্তায় আমাদের রাষ্ট্র-নায়করা আজও বিদেশী। আমাদের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা জজ ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যেকে, আফিস-আদালত সেক্রেটারিয়েট, স্কুল-কলেজ সমস্ত বিভাগের এবং ব্যবসায়ী মহলের প্রায় সকলে, এখনও ইংরেজী পোশাক সগৌরবে পরিতেছেন। দেখিলে কে বুঝিবেন এটা পূর্ব-বা পশ্চিম-পাকিস্তান? জাতীয় পোশাকই জাতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে লক্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। একথা সবাই যেন বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন। যেমন পোশাকে, তেমনি ভাষায়। আমরা কেউ পারত পক্ষে ইংরেজী ছাড়া কথা বলি না; চিঠি-পত্র লিখি না। ইংরেজীকেই আমরা ভদ্রলোকের ভাষা মনে করি। যারা বাংলায় কথা বলি, তারাও পূর্ব-বাংলার ভাষা বলি না। পশ্চিম বাংলার কথ্য ভাষাকেই আমরা ভদ্রলোকের বাংলা মনে করিয়া থাকি। এই অবস্থার দুইটা প্রধান কুফল : (১) আমরা দেশের জনসাধারণ হইতে এমন দূরে থাকিতেছি যে কার্যতঃ আমাদিগকে বিদেশী বলা চলে। (২) আমরা নিজেরা আত্মসম্মান-বোধ হারাইতেছি এবং জনগণের মধ্যে আত্ম-মর্যাদা-বোধ সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা করিতেছি। এসব কথা ২১ দফার মন্ত্রি-বেতনের ধারার আলোচনায় প্রাসংগিক এই জন্য যে যদি দেশের শাসকরা বিদেশীত্ব ত্যাগ করিয়া দেশী হন তবে ঐ বেতনই যথেষ্ট মনে হইবে। আমার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, যতই দিন যাইবে ততই এটা সত্য প্রমাণিত হইবে যে ২১ দফা পূর্ব-বাংলার জনগণের মুক্তির সনদ। যুক্তফ্রন্টের এম. এল. এ. অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবুল কাসেম (বর্তমানে বাংলা কলেজের প্রিন্সিপাল) 'একুশ দফার রূপায়ণ' নামক যে সুচিন্তিত যুক্তিপূর্ণ বই লিখিয়াছেন, তা পড়িলেই এ বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ও অস্পষ্ট ধারণা দূর হইবে।

৫. যুক্তফ্রন্টের প্রচারে বিলম্ব

যুক্তফ্রন্ট গঠনে গোড়ার দিকে দুই দলের কোনও কোনও উপনেতার মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে মন-কষাকষি হইল। সে মন-কষাকষি দুই প্রধান নেতা হক সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মধ্যে সংক্রমিত হইল। ফলে যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি পাকা

হইতে অযথা বিলম্ব হইল। যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া যায় যায় আর কি? হক সাহেবের সমর্থক ও ভাসানী সাহেবের সমর্থকদের মধ্যে ঢাকা শহরে বেশ-কিছুটা বিক্ষোভ-প্রতিবিক্ষোভও হইয়া গেল। খোদা-খোদা করিয়া শেষ রক্ষা পাইল। শহীদ সাহেবের দূরদর্শী আত্ম-ত্যাগের ফলেই এটা সম্ভব হইল। হক সাহেব, ভাসানী সাহেব ও শহীদ সাহেবের দ্বারা সুপ্রিম নমিনেটিং বোর্ড গঠিত হইবে এটা স্পষ্টই বোঝা গেল। এতে আওয়ামী-নেতৃত্ব ভারি হইয়া যাইবে, নমিনেশনে কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রতি অবিচার হইবে, প্রধানতঃ এই ধারণার বশেই এই ভুল বুঝাবুঝির শুরু। এই ভুল বুঝাবুঝি দূর করিলেন স্বয়ং শহীদ সাহেব। তিনি বলিলেন : সুপ্রিম পার্লামেন্টারি বোর্ড হইবেন মাত্র দুইজন : হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব। তিনি নিজে হইবেন মাত্র 'গ্লরিফাইড হেডক্লার্ক।' নমিনেশনের ব্যাপারে তিনি হক-ভাসানীর যুক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন। শহীদ সাহেবের এ ঘোষণায় সমস্ত ভুল বুঝাবুঝি দূর হইল।

এ সবের দরুন যুক্তফ্রন্টের প্রচারকার্য বিলম্বিত হইল। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের সহায় হইলেন আল্লা। মুসলিম লীগের সুবিধার জন্যই বোধ হয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচন এক মাস পিছাইয়া দিয়া ফেব্রুয়ারি হইতে ৮ই মার্চ নিয়া গেলেন। এই মুলতবিটা যুক্তফ্রন্টের বরাতে শাপে বর এবং মুসলিম লীগের বরাতে বরে শাপ হইল। যুক্তফ্রন্টের সেক্রেটারিদ্বয় : জনাব আতাউর রহমান খাঁ ও চৌধুরী কফিলুদ্দিন যাঁর-তাঁর নির্বাচনী এলাকায় মনোযোগ দিতে বাধ্য হইলেন। হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব প্রচার উপলক্ষে মফস্‌সলেই থাকিলেন। আফিস সেক্রেটারি জনাব কমরুদ্দিন আহমদের সাহায্যে শহীদ সাহেব একাই যুক্তফ্রন্টের 'গ্লরিফাইড হেড ক্লার্ক' রূপে যুক্তফ্রন্ট আফিস জীবন্ত রাখিলেন। প্রার্থীগণের ভিড় তাঁর কাছেই হইতে থাকিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি সত্য-সত্যই চব্বিশ ঘন্টা প্রার্থীদের দাবি-দাওয়া শুনিতে লাগিলেন। দুই শ সাইত্রিশটি মুসলিম আসনের জন্য এগার শর বেশি মনোনয়ন-প্রার্থী দরখাস্ত করিলেন। এঁদের প্রত্যেকের এবং তাঁদের সমর্থকদের সকলের সাথে দেখা করা ও তাঁদের কথা শোনা ছিল একটা অমানুষিক দানবীয় ব্যাপার। শহীদ সাহেব এই দানবীয় কাজটিই করিলেন হাসি মুখে। গোসল বাদ দিতে হইল। মোলাকাতীদের সামনেই তিনি গো-গ্রাসে মুরগীর আধার ঠোকরাইয়া খাইয়া-খাইয়া দিনের-পর-রাত ও রাতের-পর-দিন কাটাইতে লাগিলেন। তথাকথিত সুপ্রিম পার্লামেন্টারি বোর্ড মানে হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব প্রার্থী মনোনয়নের ধারে-কাছেও আসিলেন না। সব দায়িত্ব বর্তাইল শহীদ সাহেবের কাঁধে। তিনি আওয়ামী লীগ-কৃষক-শ্রমিক দলের প্রায় বিশ জন নেতা লইয়া একটি সিলেকশন বোর্ড করিলেন। বাছাইর কাজ এঁরাই করিলেন। প্রায় সব গুলি বাছাই উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে হওয়ায় নির্বিরোধে শহীদ সাহেব এ কাজ করিতে পারিলেন। এক স্তরে প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের ভিড় এড়াইবার জন্য শহীদ সাহেব

সিলেকশন বোর্ডের আমাদের সকলকে লইয়া পলাইয়া চৌধুরী হামিদুল হক সাহেবের আন্দর বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। সেখানে নন-স্টপ বৈঠকে নমিনেশনের কাজ শেষ করা হইল। সবাই তালয়-তালয় হইয়া গেল। যদিও হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব মফস্সলে বসিয়াই এখানে-ওখানে দুই একটা নমিনেশনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া কিছু-কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। দুই-এক জায়গায় যুক্তফ্রন্টের অফিশিয়াল নমিনি হারিয়া গেলেও তাতে খাঁটি জন-প্রতিনিধিরাই নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

৬. প্রচার-কার্য শুরু

যুক্তফ্রন্টের প্রচারে গোড়ার দিকে কোনও সিস্টেম ছিল না। হক সাহেব ও ভাসানী সাহেবের ব্যক্তিগত সফর-সূচিই ছিল যুক্তফ্রন্টের একমাত্র ভরসা। এই উভয় নেতার জনপ্রিয়তা ছিল এই সময় আকাশচুম্বী। ফলে তাতেই আমাদের কাজ একরূপ চলিয়া যাইত। কিন্তু নিশ্চিত হইবার উপায় ছিল না। তার কারণ ছিল দুইটি প্রথমতঃ জনমত তখনও তেমন সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ও প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন সাহেব মুসলিম লীগ কর্মী-বাহিনী ও 'গ্রীন শার্ট' নামক স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী লইয়া প্রচারে নামিয়াছেন। তার উপর আই. জি. ডি. আই . জি, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনাররাও তাঁদের কর্মী-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী স্পেশিয়াল ট্রেনে দেশ-ভ্রমণ ও প্রচার শুরু করিয়াছেন। কায়েদে-আযমের ভগিনী মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহ্, মওলানা এহতেশামুল হক থানবীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের বড়-বড় আলেম পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের নামে প্রচারে বাহির হইয়াছেন। এ অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না।

শহীদ সাহেব সিস্টেমেটিক প্রচারের কর্ম-পন্থা নির্ধারণ করিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গফফার খাঁ, নবাবযাদা নসরুল্লা, শেখ হিসামুদ্দিন, গোলাম মোহাম্মদ খাঁ, লুন্দখোর মাহমুদুল হক ওসমানী, মিয়া ইফতেখারুদ্দিন প্রভৃতি বহু নেতা আনিলেন। তাঁদের সকলের সুনির্দিষ্ট সফর-তালিকা করিলেন। সেই তালিকা ঠিক-ঠিক মত পালন করিয়া শহীদ সাহেব এই নেতাদেরে লইয়া প্রচারে বাহির হইলেন। আমার জিলা ময়মনসিংহ উভয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ টার্গেট ছিল বলিয়া শহীদ সাহেবও এ জিলার প্রতি বিশেষ মন দিলেন। সব নেতাদেরে লইয়া তিনি এ জিলায় আসিলেন। আমার গরীবখানায় মেহমান হইলেন। ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি দুইটি কারণে। প্রথমতঃ, সীমান্তগান্ধী গফ্ফার খাঁ ও আওয়ামী নেতা গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোরের প্রচারধারার তারিফ করিতে হয়। উভয় নেতা বিশেষতঃ গফ্ফার খাঁর পাঠানী 'অশুদ্ধ' উর্দু বাংগালী শ্রোতাদের খুবই সহজবোধ্য হইয়াছিল। তাঁর ভাংগা উর্দু আমাদের পাড়াগাঁয়ের মুসলিম জনতার

যবানের প্রায় কাছাকাছি ছিল। সে ভাষায় তিনি যে সব কথা বলিয়াছিলেন, পূর্ব-বাংলার শোষিত জনগণের প্রতি দরদে-ভরা ছিল সে সব উক্তি। এই কারণে তাঁর বক্তৃতায় জনগণের প্রতি অমন আবেদন ছিল। অন্যান্য উর্দু বক্তাদের সাথে সীমান্ত-গান্ধীর পার্থক্য ছিল এইখানে। দ্বিতীয়তঃ এই উপলক্ষে আওয়ামী লীগাররা বিশেষতঃ আমি নিজে সীমান্ত-গান্ধীর পাখ্তুনিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত ও খুটি-নাটি প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি স্পষ্টই বলেন যে তাঁর দাবি, সীমান্ত প্রদেশের জাতি-গোত্রহীন ও অপমানকর নাম বদলাইয়া তার একটা জাতিভাষাগত নাম দেওয়া। যথা : বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বাংলা। এই প্রদেশের লোক পুশ্‌ত বা পাখতুন ভাষা - ভাষী বলিয়া তার নাম হওয়া উচিৎ পাখ্তুনিস্তান। তাঁর দ্বিতীয় দাবি, ঐ প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত হইবে। পাকিস্তানের প্রদেশ হিসাবেই সে পাখতুনিস্তান থাকিবে। পাকিস্তানের বাইরে স্বাধীন রাষ্ট্র বা আফগানিস্তানের অংগ হিসাবে পাখতুনিস্তানের কল্পনা তিনি কোনও দিন করেন নাই। কথাটা আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ১৯৪৮ সালে করাচিতে পাকিস্তান গণ-পরিষদে দাঁড়াইয়া তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন। সে কথাও আমার মনে পড়িল। আমি কলিকাতায় বসিয়া 'ইত্তেহাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁর এই দাবি সমর্থন করিয়াছিলাম, সে কথাও আমার স্মৃতি-পটে উদিত হইল। পরবর্তীকালে শহীদ সাহেব গফ্ফার খাঁর এই দাবি সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৯৫৫ সালে মারিতে দ্বিতীয় গণ-পরিষদের প্রথম বৈঠক উপলক্ষে খান আবদুল গফ্ফার খাঁ তৎকালীন আইন মন্ত্রী আমাদের নেতা শহীদ সাহেবের সাথে আমাদের উপস্থিতিতে যে আলাপ করিয়াছিলেন, তাতেও এই দাবিরই তিনি পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। এই দাবির সমর্থনে ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র বিলে আমি সীমান্ত প্রদেশের নাম পাঠানিস্তান করিবার সংশোধনী দিয়াছিলাম। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ নেতারা গফ্ফার খাঁর বিরুদ্ধে কি বিভ্রান্তিকর প্রচারণাটাই না করিয়াছিলেন এবং আজও করিতেছেন।

এইভাবে সীমান্ত গান্ধীর রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের কর্মীদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছিল, তার ফলে তাঁর প্রচার-কার্য যুক্তফ্রন্টের খুবই কাজে লাগিয়াছিল।

৭. জনগণের সাড়া

যাহোক হক -ভাসানী -সুহরাওয়ার্দীর সমবায়ে দেশময় যে প্রাণ-চাঞ্চল্যের বন্যা আসিল, তাতে মুসলিম লীগের মত ক্ষমতাসীন দল ভাসিয়া গেল। ফল যে এমন হইবে, পনর দিন আগেও আমি তা বুঝিতে পারি নাই। জনগণের উৎসাহ পল্লীগ্রামের নারীজাতির মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। আমার নিজের এলাকায় দেখিয়াছি পর্দা রক্ষা করিয়াও দলে-দলে মেয়েরা ভোট-কেন্দ্রে আসিয়াছে। পর্দা রক্ষার জন্য তারা এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে : চারজন যুবক একটা মশারির চার কোণা

ধরিয়াছে। পনর বিশজন মেয়ে-ভোটার এই মশারির নিচে ঘিচি-ঘিচি করিয়া ঢুকিয়াছে। তারপর মশারি চলিয়াছে। মশারির মধ্যে মেয়েরা চলিয়াছে। প্রতি গ্রাম হইতে মিছিল করিয়া ভোটাররা ভোট-কেন্দ্রে আসিয়াছে। কাগয ও বাঁশের খাবাসি দিয়া যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন-প্রতীক বিশাল আকারের নৌকা বানাইয়া লইয়াছে জনসাধারণ নিজেরাই। সেই নৌকা কাঁধে করিয়া 'যুক্তফ্রন্ট যিন্দাবাদ' 'হক-ভাসানী যিন্দাবাদ' যিকির দিতে-দিতে তারা ভোট-কেন্দ্রে আসিয়াছে। এতে ভোটের ফলাফল আগেই বুঝা গিয়াছিল। ভোটাররা এই ভোট-যুদ্ধকে একটা পবিত্র জেহাদ মনে করিয়াছে। কাজেই সকলেই এটাকে নিজের কাজ মনে করিয়াছে। পয়সা দিয়া, ভয় বা লোভ দেখাইয়া করাইতে হয় নাই। শুধু যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেওয়াই তারা পবিত্র কর্তব্য মনে করে নাই। অপর পক্ষে ভোট দেওয়াকে তারা জনগণের দুশমনি মনে করিয়াছে। আমার নিজের-দেখা একটা সত্য ঘটনা বলি। আমার প্রতিদ্বন্দী মুসলিম লীগ-প্রার্থী ছিলেন আমার সোদর-প্রতিম বন্ধু ও আত্মীয় 'আজাদ'-সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন। ভোটার ও জনগণের এই মতি-গতি দেখিয়া আমরা উভয়েই বুঝিলাম, শামসুদ্দিন সাহেবের যামিন বাযেয়াফত হইয়া যাইতেছে। উভয়ে একত্রে তাঁর যামিনের টাকা বাঁচাইবার চেষ্টা করিলাম। উভয়ে এক গাড়িতে উঠিলাম। ভোটার ও ওয়ার্কারদেরে বুঝাইলাম। কিছু ভোট শামসুদ্দিন সাহেবকে দিয়া তাঁর যামিনের টাকা বাঁচানো দরকার। শামসুদ্দিন সাহেবের টাকা ত আমাদেরই টাকা। শামসুদ্দিন সাহেবের টাকা বাঁচাইতে কারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন হইল, মুসলিম লীগকে ভোট দিতে হয় যে। ও-কাজ করিতে ত কেউ রাযী না। কাজেই শামসুদ্দিন সাহেবের যামিন বাযেয়াফত হইল। মোট একত্রিশ হাজার রেকর্ডেড ভোটের মধ্যে তিনি পাইলেন মাত্র যোল শ। এটা শুধু আমার এলাকার কথা নয়। পূর্ব-বাংলার সর্বত্রই এই অবস্থা। যুক্তফ্রন্টের এই জয়কে দেশে-বিদেশে অনেকেই 'ব্যালট-বাক্সে -বিপ্লব' আখ্যায়িত করিয়াছেন। দেশের জনগণ স্বেচ্ছায়, নিজেদের টাকায়, বাজি পোড়াইয়া আনন্দ-উৎসব করিয়া মিছিল বাহির করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস করিয়াছে। নূরুল আমিন-বিজয়ী খালেক নেওয়াযকে লইয়া ঢাকা শহরবাসী যে অভাবনীয় অভূতপূর্ব মিছিল করিয়াছিল, তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। যুক্তফ্রন্টের তিন-নেতার এক নেতা শহীদ সাহেবকে করাচিতে যে রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হইয়াছিল, মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডনের' ভাষায় ইহা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিনে কায়েদে-আযমের সম্বর্ধনার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। করাচির নাগরিকদের এই সম্বর্ধনা শুধু পূর্ব-বাংলার স্বার্থে দেওয়া হয় নাই। করাচিবাসী পূর্ব-বাংলার জনগণের এই বিজয়কে নিশ্চয়ই গণতন্ত্রের জয় মনে করিয়াছিল। জনগণের এই জয়ের প্রতীক হিসাবেই শহীদ সাহেবকে করাচিবাসী এই সম্বর্ধনা দিয়াছিল। নইলে করাচির স্থায়ী বাশেন্দা শহীদ সাহেবকে নিজের ঘরে এই সম্বর্ধনা দেওয়ার কোনও যুক্তি ছিল না।

৮. দুর্বলতার বীজ

কিন্তু ভোটারদের এই আশা ও আস্থার মর্যাদা নেতারা দিতে পারিলেন না। লিডার নির্বাচনের দিন হইতেই, বরঞ্চ আগে হইতেই, আমাদের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। এই ফাটল রোধ করার চেষ্টা একমাত্র শহীদ সাহেব ছাড়া আর কেউ করেন নাই। সে কথাটাই এখানে বলিতেছি।

কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে, আরও নির্দিষ্ট করিয়া বলিলে হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের মধ্যে মনের অমিল আগে হইতেই ছিল। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী মনোনয়নে সে বিরোধ ক্রিয়া করিয়াছিল আরও প্রসারিত রূপে। কারণ এই দুই মহান নেতার নিচে উভয় দলের আরও অনেক নেতা ছিলেন। নিজ-নিজ দলীয় স্বার্থ-বোধ তাঁদের ব্যবহারে ও কাজে-কর্মে নিশ্চয় প্রতিফলিত হইয়াছিল। এটা দানা বাঁধে লিডার নির্বাচন উপলক্ষ করিয়া। যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছিলেন মোট ২২৮ জন। এঁরা সকলেই মুসলমান। যুক্তফ্রন্ট শুধু মুসলিম আসনই কনটেস্ট করিয়াছিল। ২৩৭টি মুসলিম সিটের মধ্যে ২২৮টিই দখল করিয়াছিল। এই ২২৮টির মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩, কৃষক-শ্রমিক ৪৮, নেযামে-ইসলাম ২২, গণতন্ত্রী ১৩ ও খিলাফতে রব্বানী ২ জন পাইয়াছিল। নিযামে-ইসলাম দল কার্যতঃ হক সাহেবের পৃষ্ঠপোষিত দল বলিয়া তাকেও কে. এস. পি. দল বলা যাইতে পারিত। কাজেই হক সাহেবের নিজস্ব মেম্বর ছিলেন ৭০ জন। গণতন্ত্রী ও রব্বানী পার্টির সদস্যরা প্রোগ্রামের ভিত্তিতে উভয় দলের মধ্যে ব্যালান্স রাখিবেন, এটা বুঝা যাইতেছিল।

১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল লিডার নির্বাচনের দিন নির্ধারিত হইল। আগের রাত্রে আওয়ামী লীগ দলীয় মেম্বরদের একটি ইনফর্মাল বৈঠক হইল সিমসন রোডস্থ যুক্তফ্রন্ট অফিসে। ঐ সভায় তরুণ মেম্বরদের অনেকেই প্রায় একবাক্যে শহীদ সাহেবকে এইরূপ পরামর্শ দেনঃ লিডার নির্বাচনের আগেই হক সাহেবকে মন্ত্রি-সভার তালিকা প্রস্তুত ও পোর্টফলিও ভাগ করিতে হইবে। গবর্নরের নিকট একটি চিঠির আকারে ঐরূপ তালিকা করিয়া তাতে হক সাহেবের দস্তখত দিতে হইবে। তার তিনটি কপি হইবে ঃ একটি হক সাহেবের ও অপরটি ভাসানী সাহেবের নিকট থাকিবে। তৃতীয়টি গবর্নরের নিকট দাখিল করিবার জন্য শহীদ সাহেবের হাতে থাকিতে হইবে। এই দলিলে দস্তখত না হওয়া পর্যন্ত হক সাহেবকে লিডার নির্বাচন করা হইবে না। কথাগুলি অবশ্য একসঙ্গে বলা হয় নাই, একজনও বলেন নাই। সকলে মিলিয়া বলিয়াছিলেন, কথায়-কথায় উঠিয়াছিল। কিন্তু শহীদ সাহেব এক কথায় ওঁদের সকলের সকল প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ জনগণ হক সাহেবকে আগেই লিডার নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছে। মেম্বররাও সেই ওয়াদা করিয়া ভোট

আনিয়াছেন। এখন আর তাঁর উপর কোনও শর্ত আরোপ করা চলে না। করিলে এটা হইবে হদ্দ বেইমানি। প্রস্তাবকরা অবশ্যই বলিলেন ঃ তাঁরা সত্যসত্যই হক সাহেবকে ছাড়া অন্য কাউকে লিডার নির্বাচন করিতে চান না। শুধু চাপ দিয়া একটা সর্বদলীয় উঁচুস্তরের মন্ত্রিসভা গঠন করিতে চান। তাঁরা বলিলেন ঃ বিনা-শর্তে হক সাহেবকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিলে লিডার নির্বাচিত হওয়ার সংগে-সংগে তিনি তাঁর পার্শ্ব-চরদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হইবেন। শহীদ সাহেব ভাসানী সাহেব একত্রে চেষ্টা করিয়াও হক সাহেবকে আর ওদের খপ্পর হইতে বাঁচাইতে পারিবেন না। হক সাহেবের রাজনীতিক জীবনের ইতিহাস হইতে তাঁরা একাধিক নযির দিলেন। তাঁদের যুক্তি শহীদ সাহেবের মনঃপুত হইল না। তিনি এসব যুক্তিকে সন্দেহ-পরায়ণ ক্ষুদ্র মনের পরিচায়ক বলিলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন, অতীতে যাই হইয়া থাকুক, জীবন-সন্ধ্যায় হক সাহেব আর ভুল করিবেন না। যাঁরা শহীদ সাহেবের আশ্বাস মানিলেন, তাঁরা চুপ করিলেন। যাঁরা করিলেন না, শহীদ সাহেব ধমকাইয়া তাঁদের চুপ করাইলেন। তিনি আরও বলিলেন, কোনও ক্রমেই মন্ত্রিসভা গঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিৎ নয়। কারণ সাত-আট দিন আগে (২৩শে মার্চ) চন্দ্রঘোনা কাগযের কলে বাংগালী ও উর্দুভাষী শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাংগা হইয়া যাওয়ায় গবর্নর চৌধুরী খালিকুযযমান হক সাহেবকে তাড়াতাড়ি মন্ত্রিসভা গঠনের তাকিদ দিতেছেন। ভাসানী সাহেব এ ব্যাপারে কিছু বলিলেন না। তরুণদের প্রস্তাব গৃহীত হইল না। তাঁদের প্রায় সার্বজনীন অসন্তোষের মধ্যে অনেক রাত্রে সভা ভংগ হইল।

৯. ভাংগন শুরু

পরদিন ২রা এপ্রিল মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে যুক্তফ্রন্ট পার্টির প্রথম অধিবেশন হইল। সর্বসম্মতিক্রমে হক সাহেব লিডার নির্বাচিত হইলেন। শহীদ সাহেব তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন। মওলানা সাহেব মোনাজাত করিলেন। ডিপুটি-লিডার, সেক্রেটারি, হুইপ প্রভৃতি আর কোনও কর্মকর্তা নির্বাচন না করিয়া শুধু গণ-পরিষদ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাস করিয়াই সভা ভংগ হইল।

আওয়ামী লীগের তরুণ এম. এল. এ.-রা যা আশংকা করিয়াছিলেন, তাই হইল। মন্ত্রিসভা গঠন লইয়া হক সাহেবের সাথে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মতান্তর হইল। এই মতান্তর শুধু দুর্ভাগ্যজনক ছিল না, লজ্জাজনকও ছিল। কারণ এ মতান্তর পলিসি লইয়া হয় নাই, হইয়াছিল মন্ত্রিত্ব লইয়া। সে মতভেদও মাত্র দুইদলের দুইজন তরুণের মন্ত্রিত্ব লইয়া। যে দশ-এগার জন সিনিয়র পলিটিশিয়ান লইয়া হক মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে, হক সাহেবের নেতৃবৃন্দের ও এম. এল. এ.-দের, এমনকি জনসাধারণের, তা একরূপ জানাই ছিল। যে দুইজন তরুণের মন্ত্রিত্ব লইয়া মতভেদ

শুরু হয়, তার একজন কৃষক-শ্রমিক পার্টির, অপর জন আওয়ামী লীগের। একজন হক সাহেবের প্রিয়পাত্র, অপরজন শহীদ সাহেবের। হক সাহেব পার্টিলিডার নির্বাচিত হওয়ার পরেই তাঁর বাড়িতে তিন-নেতার যে বৈঠক হয়, এতেই এই বিরোধ দেখা দেয়। হক সাহেব তাঁর লোকটির নাম প্রস্তাব করায় শহীদ সাহেবও তাঁর লোকটির নাম করেন। এটা ছিল নিছক যিদাযিদির ব্যাপার। নইলে শহীদ সাহেবের লোকটিকে মন্ত্রী করার ইচ্ছা শহীদ সাহেবের নিজেরই ছিল না। বস্তুতঃ ঐ দিনই সকালের দিকে কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ-কর্মী ঐ লোককে মন্ত্রী করার দাবি করাতে শহীদ সাহেব কর্মীদেরে ত ধমকাইয়া দেনই, উপরন্তু তাঁর প্রিয়পাত্রটিকেও ধমকাইয়া দেন। তাঁকে বলেন যে তিনিই ঐসব ছেলে-ছোকরা যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। তিনি অবশ্যই প্রতিবাদ করেন। কিন্তু শহীদ সাহেব সে প্রতিবাদে বিশ্বাস করেন নাই। যা হোক শহীদ সাহেব তাঁকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া বিদায় করেন যে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি করা তিনি আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। শহীদ সাহেব উপস্থিত সকলের সামনেই তাঁকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেন যে ঐ কাজে তাঁর দুইটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ হক সাহেবের মত অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান ও এডমিনিস্ট্রেটরের সাথে কাজ করিয়া তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ হক সাহেবকে দিয়া আওয়ামী লীগ সংগঠনের এবং নির্বাচন-প্রতিশ্রুতি পালনের তাতে অধিকতর সুবিধা হইবে। শহীদ সাহেবের এই সারবান যুক্তিতে আমরা সকলেই খুশী হইয়াছিলাম। তিনিও শহীদ সাহেবের উপদেশ মানিয়া লইয়াছিলেন।

পরে হক সাহেবের বাড়িতে হক সাহেবের প্রিয়পাত্রের মোকাবিলা স্বরূপ শহীদ সাহেবই ঐ নাম করায় এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়াছিল, হক সাহেবকে দিয়া তাঁর প্রস্তাবিত নাম প্রত্যাহার করাইবার জন্যই শহীদ সাহেব এটা করিয়াছিলেন। ভাসানী সাহেবও এটাই বুঝিয়াছিলেন। হক সাহেব তাঁর প্রস্তাবিত নামটি প্রত্যাহার করেন নাই। বরঞ্চ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই তাঁর ঐ লোকটি দরকার বলিয়া নেতৃদ্বয়ের কাছে আপিল করেন। ভাসানী সাহেব কোনও-এক পক্ষে শক্ত হইলেই ব্যাপারটা মিটিয়া যাইত। কিন্তু তিনি তা হন নাই। ফলে এই ছোট কথার উপর যে বিরোধ দেখা দিল তাকে কেন্দ্র করিয়াই অল্পদিন মধ্যেই যুক্তফ্রন্টে ভাংগন দেখা দিয়াছিল।

হক সাহেব আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়া তিনজন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া ফেলিলেন। এ বিরোধ মিটাইবার জন্য অনেক বন্ধু-বান্ধবসহ আমি দুতিয়ালি ও বৈঠক করিলাম। সব ব্যর্থ হইল। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া শহীদ সাহেব করাচি গেলেন। এবং কিছুদিন পরেই চিকিৎসার জন্য বিদেশে গেলেন। ঐ একই বিমানে প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব তাঁর মন্ত্রী ও অনেক কৃষক-শ্রমিক মেম্বর লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে করাচি গেলেন। মওলানা ভাসানী ক্ষুণ্ন মনে মফস্সলের বাড়িতে গিয়া বসিলেন।

যুক্তফ্রন্টে বড় রকমের ফাটল ধরিল। আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে যাতে এই ফাটল বৃদ্ধির কোনও কাজ না হয় সে জন্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকিয়া আমরা সর্ব অবস্থায় এক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। আওয়ামী লীগ হইতে মন্ত্রী নিবার সমস্ত দেন দরবারের একক ক্ষমতা মওলানা ভাসানীর উপর ন্যস্ত করিলাম।

মাসাধিককাল মন্ত্রিত্ব করিবার পর হক সাহেব আওয়ামী লীগ হইতে মন্ত্রী গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিলেন। মওলানা সাহেবকে এই সংবাদ দিলে তিনি স্বয়ং না আসিয়া আমাদের কয়েকজনকে ক্ষমতা দিলেন। আমরা আপোস করিলাম। অবশেষে ১৫ই মে তারিখে আরও দশজন মন্ত্রী লইয়া হক মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হইল। আমিও তার মধ্যে একজন ছিলাম।

কিন্তু শপথ গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই গবর্নমেন্ট হাউস হইতেই আমরা খবর পাইলাম আদমজী জুট মিলের শ্রমিকদের মধ্যে দাংগা হইয়াছে। হক সাহেবের নেতৃত্বে আমরা সব মন্ত্রীরাই ঘটনাস্থলে গেলাম। স্তম্ভিত হইলাম। শত-শত মৃতদেহ ডিংগাইয়া আমাদের পথ চলিতে হইল। যারা মরিয়াছে তাদের কথা ভাবিবার সময় নাই। আরও যে মরিতেছে, তাদের মৃত্যু ঠেকাইবার জন্য ছুটিলাম। উভয় পক্ষ সশস্ত্র অবস্থায় তখনও নূতন করিয়া প্রতিশোধ নিবার জন্য পায়তারা করিতেছে। আমরা মন্ত্রীরা বিভিন্ন ফ্রন্টে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি নিজে যে ফ্রন্টে পড়িলাম সেখানেই বিনা মাইকে চিৎকার করিয়া গলা ফাটাইলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসার দরুনই হোক আর আমাদের চেষ্টায়ই হোক, শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত জনতা কতকটা শান্ত হইল। বিষণ্ন মনে ফিরিয়া আসিলাম। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন দাংগায়ও দেখি নাই। পরবর্তী কয়েক রাত আমি ঘুমাইতে পারি নাই।

১০. পরাজয়ের প্রতিশোধ

নির্বাচনে অমন শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুসলিম লীগ-নেতারা ওৎ পাতিয়াই ছিলেন। কালাহান নামক একজন মার্কিন সাংবাদিক হক সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আদমজী মিলের এই দাংগায় মুসলিম লীগ নেতারা নূতন অজুহাত পাইলেন। কোনও কোনও বিষয়ে পূর্ব-বাংলা সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এক নির্দেশ জারি করিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশাবলী আলোচনার জন্য কেবিনেটের বিশেষ মিটিং দেওয়া হইল। চিফ সেক্রেটারি হাফিয মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব আমাদিগকে হুশিয়ার হইতে উপদেশ দিলেন। তিনি আভাসে-ইংগিতে জানাইলেন যে এই সব নির্দেশ অমান্য করিলে

অধিকতর বিপদের আশঙ্কা আছে। আমরা মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক নির্দেশ মানিতে রাযী হইলাম না বিপদ যত বড়ই আসুক। কয়েকদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার হক সাহেবকে করাচিতে তলব করিলেন। মিঃ আবু হোসেন সরকার ও আমি ছাড়া আর সব মন্ত্রী করাচি যাত্রায় হক সাহেবের সংগী হইলেন। সেখানে হক সাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধিতার অভিযোগ আনা হইল। মিঃ কালাহানের পর্যন্ত সাক্ষ্য লওয়া হইল। পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রীর আনুগত্য যাচাই করা হইল একজন বিদেশী রিপোর্টারের উক্তির দ্বারা। এমন অপমানও হক সাহেবকে সহ্য করিতে হইল। হক সাহেব ও তাঁর মিনিস্টাররা সকলে মাথা নত করিয়াই সব মানিয়া নিলেন। তাঁরা অনুগত পাকিস্তানী, পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা তাঁরা চান না, এই মর্মে সকলে এক যুক্ত বিবৃতি দিলেন। কিন্তু এতেও কিছু হইল না। হক সাহেব ও তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীরা করাচি হইতে ঢাকায় ফিরিবার আগেই ৯২-ক ধারা-বলে গবর্নরের শাসন প্রবর্তন করা হইল। গবর্নর চৌধুরী খালিকুযযমান ও চিফ সেক্রেটারি হাফিয ইসহাকের বদলে শক্তিশালী গবর্নর রূপে ইসকান্দর মির্যাকে ও শক্তিশালী চিফ সেক্রেটারি রূপে মিঃ এন. এম. খাঁকে পাঠান হইল। এটা যে হইবে তা আমি আগের দিনই জানিতে পারিয়াছিলাম। কারণ ঐদিন গবর্নর খালিকুযযামান সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। করাচির ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার মত কি জানিতে চাহিলেন। হক সাহেবও তাঁর সংগী মন্ত্রীদের যুক্ত বিবৃতিতে ব্যাপারটা মিটিয়া গিয়াছে বলিয়া আমার ধারণার কথা গবর্নরকে বলিলাম। গবর্নর তখন আমাকে খোলাখুলি বলিলেন : 'আমার বিশ্বাস তোমাদের মন্ত্রিত্বও শেষ, আমার গবর্নরিও শেষ।' এ বিশ্বাসের কারণ কি জিগ্গাসা করায় তিনি আমাকে জানাইলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা প্রয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁর জবাবে গবর্নর ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁর ধারণা কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের মতে অটল থাকিবেন। আমি গবর্নর হাউস হইতে বাসায় ফিরিয়া বন্ধুবর আবু হোসেন সরকারকে ব্যাপার জানাইলাম। তিনি জবাব দিলেন : যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রস্তুত। রাত্রিবেলাই ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের কথা আমরা জানিতে পারিলাম। কিন্তু তার আগেই হক সাহেব ও তাঁর মন্ত্রীরা যে অবস্থায় ঢাকা আসিলেন তাতেই আমরা বুঝিয়াছিলাম ব্যাপার ভাল নয়।

খুব বিশ্রী ও অভদ্রভাবে ৯২-ক ধারা জারি হইয়াছিল। একথা না বলিয়া উপায় নাই। ৯২-ক ধারা জারি করিবার সংগে-সংগে অন্যতম মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকারী মন্ত্রিভবন হইতে গেরেফতার করা হইল। আমাদের বাড়ি হইতে সরকারী গাড়ি টেলিফোন পিয়ন চাপরাশী গার্ড সবই তুলিয়া নেওয়া হইল। সুপ্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ এই যে মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পরও পনর দিন মন্ত্রীরা

সরকারী বাড়িতে থাকিতে এবং সমস্ত সুবিধা ওঅধিকার ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের বেলা তা করা হইল না। পরদিন সকালে উঠিয়া আমরা একেবারে মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হইলাম। আগের দিন যারা সরকারী উর্দি-পরা সরকারী প্রহরি-বেষ্টিত অবস্থায় সরকারী গাড়িতে চলাফেরা করিতেছিলাম, তারাই পরদিন ঈদের মাঠে গেলাম কয়েক মাইল রাস্তা হাটিয়া। কারণ মন্ত্রি-ভবনের মত বড়লোকের এলাকায় রিক্শা পাওয়ার উপায় নাই। এজন্য আমি কোনও দুঃখ করিলাম না। কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ ভীত-চকিত অবস্থায় এই ৯২-ক ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাতে তাঁরা যে রাতের বেলাই আমাদিগকে সরকারী ভবন হইতে ধাক্কাইয়া বাহির করিয়া দেন নাই, অথবা আমাদের পিঠের নিচে হইতে সরকারী খাট-পালং এবং আমাদের পাছার নিচে হইতে চেয়ার-সোফা টানিয়া নেন নাই, এজন্য আমি মনে-মনে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ দিলাম। চৌধুরী খালিকুযযামানকে গবর্নরি হইতে এবং হাফিয ইসহাককে চিফ সেক্রেটারিগিরি হইতে যেভাবে জরুরী তারের আগায় বরতরফ করিলেন এবং গবর্নর রূপে মেজর-জেনারেল ইসকান্দর মির্যা এবং চিফ সেক্রেটারি রূপে মিঃ এন. এম. খাঁ যেরূপ তলোয়ার ঘুরাইতে-ঘুরাইতে ভারতের আকাশ-বাতাস কম্পিত করিয়া 'ধর-ধর-মার-মার' বলিতে-বলিতে পূর্ব-বাংলার দিকে বাতাসের আগে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, তাতে সকলেরই বোধ হয় মনে হইয়াছিল তাঁরা পূর্ব-বাংলার বিদ্রোহ দমন করিতেই আসিতেছেন। নব-নিযুক্ত গবর্নর ইসকান্দর মির্যা ভারতের বুকে দৌড়াইতে-দৌড়াইতেই ঘোষণা করিলেন ঃ 'ভাসানীকে আমি গুলি করিয়া হত্যা করিব।' বলা আবশ্যক মওলানা ভাসানী তখন পূর্ব-বাংলায় ছিলেন না। তিনি বর্ধিত হক মন্ত্রিসভার শপথের পরেই বিশ্ব-শান্তি সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহমে চলিয়া গিয়াছিলেন।

১১. নেতৃত্বের দুর্বলতা

পরদিন বেলা দুইটায় সিমসন রোডস্থ যুক্তফ্রন্ট আফিসে যুক্তফ্রন্ট পার্টির এক সভা ডাকা হইল। উক্ত সভায় যাইবার জন্য আমরা জনাব আবু হোসেন সরকারের সরকারী বাড়িতে সমবেত হইলাম। পদচ্যুত মন্ত্রীদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর সকলে এবং প্রায় শ-দেড়েক এম. এল. এ. ঐ সভায় সমবেত হইলাম। সমবেত মেম্বরদের মধ্যে কেউ-কেউ জানাইলেন যে যুক্তফ্রন্ট আফিস পুলিশে ঘেরাও করিয়াছে। পার্টির লিডার হক সাহেবকে সভায় আসিতে দেওয়া হইতেছে না। ব্যাপার জানিবার জন্য মিঃ আবদুস সালাম খাঁ ও আমি একটি বেসরকারী জিপে চড়িয়া সিমসন রোডে গেলাম। গেটে পুলিশ আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। একজন অফিসার আসিয়া আমাদিগকে জানাইলেন ঃ যুক্তফ্রন্ট আফিস তালাবদ্ধ করা হইয়াছে।

এখানে কোনও সভা করিতে দেওয়া হইবে না। যতদূর মনে পড়ে, ঐ অফিসারটি হোম ডিপার্টমেন্টের একটি আদেশনামাও আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন।

আমরা ফিরিয়া আসিয়া অবস্থা রিপোর্ট করিলাম। তখন সর্বসম্মতিক্রমে ঐ ইনফরম্যাল মিটিংকেই যুক্তফ্রন্টের ফরম্যাল মিটিং ঘোষণা করা হইল। লিডার উপস্থিত না থাকায় এবং পার্টির কোনও ডিপুটি লিডার না থাকায় সর্ব-সম্মতিক্রমে চৌধুরী আশরাফুদ্দিন আহমদ সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনিয়মতান্ত্রিক ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের নিন্দা করিয়া, পার্টি-লিডারকে নযরবন্দী ও অন্যতম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে গেরেফতার করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর কর্মপন্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই আদেশ অমান্য করিয়া ভূতপূর্ব মন্ত্রিগণের এবং এম. এল. এ. গণের সমবেতভাবে কারাবরণ করার প্রশ্ন আলোচিত হইল। এই কর্মপন্থায় অধিকাংশের সমর্থন দেখা গেল। এই সংগ্রামে পার্টি-লিডারের নেতৃত্বের আশায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা স্থির হইল। প্রস্তাবিত সংগ্রামে পার্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মৌঃ আতাউর রহমান খাঁ, মৌঃ কফিলুদ্দিন চৌধুরী ও মোঃ আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে লইয়া একটি কন্ভেনের বোর্ড গঠন করা হইল। সভা চলিতে থাকা অবস্থায় এখানেও পুলিশের হামলা হইল। পুলিশ অফিসাররা আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন।

সভা ভাংগিয়া গেল। আমরা বেশ কয়েকজন তখন হক সাহেবের সংগে দেখা করিয়া সমস্ত অবস্থা ও আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাইলাম এবং আইন অমান্যে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। আমরা তাঁকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে তাঁর নেতৃত্বে যদি আমরা মন্ত্রীরা এবং সমবেত শ দেড়েক এম. এল. এ. জেলে যাই, তবে কেন্দ্রীয় সরকার এক সপ্তাহ কালও ৯২-ক ধারা চালু রাখিতে পারিবেন না। সপ্তাহ পার না হইতেই কেন্দ্রীয় সরকার হক মন্ত্রিসভাকে পুনর্বহাল করিবেন আর জনগণ আমাদিগকে জেল-গেটে মাল্য-ভূষিত করিয়া মিছিল করিয়া সেক্রেটারিয়েটে লইয়া আসিবে।

হক সাহেব আমাদের এই গোলাবি চিত্রে টলিলেন না। বরঞ্চ আমাদিগকে মফস্সলে যাঁর-তাঁর এলাকায় গিয়া জনগণকে বিপ্লবী বেআইনী ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগ করিবার অবাস্তব ইমপ্র্যাকটিক্যাল ও অনিষ্টকর উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন। আমরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বুঝিয়া আসিলাম শেরে-বাংলা হক সাহেব বেশ একটু ভয় পাইয়াছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে একটা আপোস করিবার চেষ্টা তলে-তলে করিতেছেন।

কাজেই আমরা কেউ কিছু করিলাম না। কিন্তু হক সাহেব ও যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ১৬ই জুন তারিখে এক বেতার বক্তৃতায় হক সাহেবকে 'স্বীকারোক্তিকারী দেশদ্রোহী' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হক সাহেব নিজ ঘরে নযর-বন্দী হইলেন। অতঃপর তাঁর সাথে দেখা-শোনায় খুব কড়াকড়ি করা হইল। গেটে পুলিশের কাছে নাম দস্তখত দিয়া আমি কয়েকবার হক সাহেবের সাথে দেখা করিলাম। শেরে-বাংলাকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখিলাম। অনেক জেরা করিয়াও তাঁর কথিত স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে হাঁ-না স্পষ্ট কিছু আদায় করিতে পারিলাম না। তিনি ঘুরাইয়া-প্যাচাইয়া এমন ধরনের সব শিশু শুলভ কথা বলিলেন, যাতে আমি বুঝিলাম তিনি ঐ গোছের কিছু-একটা করিয়া ফেলিয়াছেন।

হক সাহেব নযর-বন্দী, মওলানা ভাসানী দেশে নাই, শহীদ সাহেবও গুরুতর অসুখ অবস্থায় বিদেশে। চারিদিকেই অন্ধকার। সুষ্ঠু সাহসী নেতৃত্বের অভাবে ছাত্র-তরুণরা বিভ্রান্ত। শেখ মুজিবুর রহমান সহ প্রায় দুই হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী ইউনিভার্সিটির ছাত্র সহ প্রায় দুইশ ছাত্র গেরেফতার হইল। তার মধ্যে আমার দ্বিতীয় পুত্র সলিমুল্লা হলের জেনারেল সেক্রেটারি মহবুব আনামও ছিল। এমনি করিয়া দেশের আকাশে-বাতাসে নৈরাশ্যের ও অস্ফুট ক্রোধের গুমরানো ক্রন্দন শ্রুত হইতে থাকিল।

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে পূর্ব বাংগালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সৌভাগ্য-সূর্য উদিত হইয়াছিল, প্রভাতেই এমনি করিয়া তাতে গ্রহণ লাগিল। পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, সে গ্রহণ আজও ছাড়ে নাই। পিছনের দিকে তাকাইয়া এত দিন পরেও আজ মনে হয়, যদি তিন প্রধানের বিরোধ না হইত, যদি যুক্তফ্রন্টের সর্ব-সম্মত মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিত, যদি হক সাহেব ও শহীদ সাহেব স্ব স্ব প্রিয়পাত্রের জন্য যিদ না করিতেন, যদি মওলানা ভাসানী নিরপেক্ষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, যদি হক সাহেব লিডার নিযুক্ত হইয়াই গণ-পরিষদের মেম্বরগিরি নিজে ছাড়িতেন এবং অন্যান্যদেরে ছাড়িবার নির্দেশ দিতেন, যদি তিনি ২১ দফা কর্মসূচি রূপায়ণে ধীরে ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেন, যদি হক সাহেব কলিকাতা সফরে গিয়া রাজনৈতিক দুশমনদেরে অজুহাত না দিতেন, তবে পূর্ব বাংলার ভাগ্যে কি কি কল্যাণ হইতে পারিত, সারা পাকিস্তানের ভাগ্যে কি কি শুভ পরিণাম হইত, তা আজ সহজেই অনুমেয়। পূর্ব-বাংলার সরকারের জনপ্রিয়তার সংগে তাঁর ঐক্য ও স্থায়িত্বের মুখে নির্বাচনে পরাজিত সরকারী দল আমাদের দাবি মানিয়া লইতেন। গণ-পরিষদে নয়া নির্বাচন হইত। নয়া নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা অবিলম্বে পূর্ব-বাংলার গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচিত হইত; পাকিস্তানে গণতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে রূপায়িত হত পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান চরম দুর্ভাগ্যসমূহের একটাও ঘটিতে পারিত না।

উনিশা অধ্যায়

পাপ ও শাস্তি

১. গবর্নর–জেনারেলের রাজনীতি

সাধারণ নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়া মুসলিম লীগ নেতারা পূর্ব–বাংলার জনপ্রিতিনিধিদের জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে এই অনিয়মতান্ত্রিক প্রতিশোধ নিয়া বেশি দিন সুখের ভাত খাইতে পারিলেন না। পাঁচ মাস যাইতে–নাযাইতেই গবর্নর–জেনারেল ২৩শে অক্টোবর তারিকে গণ–পরিষদ ভাংগিয়া দিলেন। গবর্নর–জেনারেলের এই কাজের আইনগত প্রশ্নের দিক পরে পাকিস্তানের ফেডারেল কোর্টে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল। গণ–পরিষদের প্রেসিডেন্ট মৌঃ তমিযুদ্দিন খাঁ সাহেব গবর্নর–জেনারেলের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করিয়া সিন্ধু চিফ কোর্টে রীটের মামলা দায়ের করেন। চিফ কোর্ট তমিযুদ্দিন খাঁ সাহেবের পক্ষে রায় দেন। গবর্নমেন্ট এই রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে আপিল করেন। সেই সংগে গবর্নর–জেনারেলও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২১৩ ধারার বিধান মতে ফেডারেল কোর্টের নিকট একটি রেফারেন্স করেন। ফেডারেল কোর্টে দীর্ঘদিন সওয়াল–জবাব হইয়াছিল। সে সব কথা এবং তার ফলাফল সবাই জানেন। এটাও জানা কথা যে গবর্নর–জেনারেলের এই কাজে পূর্ব–বাংলার জনসাধারণ এবং তাদের নেতাদের বেশির ভাগ আনন্দিত হইয়াছিলেন। অবশ্য এই আনন্দের মধ্যে কোনও সচেতন বুদ্ধি বা আদর্শবাদ ছিল না। এটা ছিল যালেম শত্রুকে নাজেহাল হইতে দেখার স্বাভাবিক অথচ নীচ অন্যায় অথচ তীব্র আনন্দ। গবর্নর–জেনারেলের এই কাজ অনিয়মতান্ত্রিক ডিক্টেটরি হইয়াছিল, একথা সবাই বুঝিয়াছিলেন। তবু আনন্দিত হইয়াছিলেন। কারণ স্বয়ং মুসলিম লীগ নেতারাই এই অনিয়মতান্ত্রিক ব্যভিচার শুরু করিয়াছিলেন। খাজা নাযিমুদ্দিনের সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে গবর্নর-জেনারেল হইতে প্রধানমন্ত্রী হওয়া, অনিয়মতান্ত্রিক ভাবেই প্রধানমন্ত্রিত্ব হইতে তাঁর বরখাস্ত, বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অসংগতভাবে প্রধানমন্ত্রিত্ব দখল, পূর্ব–বাংলায় ৯২–ক ধারার প্রবর্তন, ইত্যাদি সব অনিয়মতান্ত্রিক কুকর্ম হয় মুসলিম লীগ–নেতারা নিজেরাই করিয়াছিলেন, নয় ত বুরোক্র্যাসির এ সব কাজে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কাজেই মুসলিম লীগ–নেতারা যখন পরের–জন্য–

নিজেদের –খুঁদা কুঁয়ায় নিজেরাই পড়িলেন, তখন তাঁদের জন্য অশ্রুপাত করিবার কেউ রহিল না। তাঁদের দ্বারা উৎপীড়িত পূর্ব–বাংলার জনগণও তাদের নেতারা স্বভাবতঃই এটাকে শত্রু–পক্ষের গৃহ–যুদ্ধ এবং এক শত্রু কর্তৃক আরেক শত্রুর নিধন মনে করিয়াছিলেন। আমার মানসিক প্রতিক্রিয়াও অবিকল ঐরূপ হইয়াছিল। কিন্তু বন্ধুবর আতাউর রহমান সাহেব যখন গবর্নর–জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন আমি তাঁকে সমর্থন করিতে পারিলাম না। যুক্তফ্রন্টের আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা আতাউর রহমান সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ব–বাংলার ৯২–ক ধারা তুলিয়া পার্লামেন্টারি সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আলোচনা শুরু হওয়ায় প্রধানমন্ত্রিত্ব লইয়া কৃষক–শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। হক সাহেবকে কেন্দ্রীয় সরকার দেশদ্রোহী ঘোষণা করায় এবং তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই আশা হইয়াছিল যে প্রধান মন্ত্রিত্ব তাঁদের হাতেই আসিবে। মন্ত্রিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গবর্নর–জেনারেল গোলাম মোহাম্মদই সর্বময় কর্তা, এটা ছিল জানা কথা। অতএব যুক্তফ্রন্টের পক্ষ হইতে যিনি গবর্নর–জেনারেলের গলায় মালা দিবেন, কার্যতঃ যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবে তিনিই মন্ত্রি–সভা গঠনে আহুত হইবেন। এ ধারণায় নেতাদেরে পাইয়া বসিল।

কিন্তু আওয়ামী–নেতাদের এই আশা পূর্ণ হইল না। গবর্নর–জেনারেল ঢাকা আসিবার আগেই কাগযে বিবৃতি দিলেন যে হক সাহেবকে তিনি রাষ্ট্রের দুশমন মনে করেন না, বরঞ্চ একজন বন্ধু মনে করেন। এটা ছিল ধূর্ত গোলাম মোহাম্মদের একটা চাল। এই চালে স্বয়ং হক সাহেবও পড়িলেন। ঐ ঘোষণার পরে গবর্নর–জেনারেলের গলায় মালা দিতে হক সাহেবও প্রস্তুত হইলেন। অবশেষে ১৪ই নবেম্বর বড়লাট ঢাকা আসিলে হক সাহেব ও আতাউর রহমান সাহেব উভয়েই তাঁর গলায় মালা দিলেন। কার্যন হলে অভিনন্দন হইল। আমার মনটা এইসব ব্যাপারে এতটা তিক্ত হইয়াছিল যে আমি ঢাকা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিমান বন্দরে গেলাম না। এই সব ফাংশনেও যোগ দিলাম না। আমার কেবলই মনে হইতেছিল যে গবর্নর–জেনারেলকে লইয়া এইরূপ লাফালাফি করা ঠিক হইতেছে না।

কিন্তু এই মাল্যদানের আশু কোনও ফল হইল না। পূর্ব–বাংলায় পার্লামেন্টারি সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল না।

২. শহীদ সাহেবের ভুল

১৯৫৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর সুহরাওয়ার্দী সাহেব করাচি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই করাচিতে ঐ তারিখে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের একটি বৈঠক আহবান করিয়াছিলেন। সেই বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য অন্যান্য বন্ধুদের সাথে আমিও করাচি গেলাম। যথাসময়ে আমরা শহীদ সাহেবকে বিমান-বন্দরে অভ্যর্থনা করিলাম। বিপুল সম্বর্ধনা হইল। আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাড়াও বিমান-বন্দরে বহু নেতার সমাগম হইল। কারণ ইতিমধ্যেই এই গুজব খুব জোরদার হইয়া উঠিয়াছিল যে শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন বড়লাট একরূপ ঠিক করিয়াই ফেলিয়াছেন।

শহীদ সাহেবের কাচারি রোডের বাড়িতে যথাসময়ে আওয়ামী লীগের বর্ধিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিল। শহীদ সাহেব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া মূল্যবান বক্তৃতা করিলেন। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কি না, সে সম্বন্ধে মেম্বরদের পরামর্শ জিগ্‌গাসা করিলেন। উভয় পাকিস্তান হইতে যাঁরা বক্তৃতা করিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই বলিলেন ঃ শহীদ সাহেব একমাত্র প্রধানমন্ত্রী রূপেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন, অন্যথায় নয়। তাছাড়া একথাও কেউ-কেউ বলিলেন যে মৌঃ তমিযুদ্দিন সাহেবের রীট দরখাস্ত তখনও সিন্ধু চিফ কোর্টের বিচারাধীন রহিয়াছে। কাজেই অনিশ্চিত পরিবেশে শহীদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। এইভাবে শহীদ সাহেব আওয়ামী-নেতাদের মতামত জ্ঞাত হইয়া তিনি গবর্নর-জেনারেলের সাথে দেখা করিতে গেলেন। সাড়ে চারি ঘন্টা কাল তাঁদের মধ্যে আলোচনা হইল। পরদিনের আওয়ামী লীগের বৈঠকে শহীদ সাহেব ঐ আলোচনার সারমর্ম প্রকাশ করিলেন। তাতে বোঝা গেল, বড়লাটের মতে শহীদ সাহেবকে গোড়াতেই প্রধানমন্ত্রী করার অসুবিধা আছে। প্রথমে তাঁকে সাধারণ মন্ত্রী হিসাবেই মোহাম্মদ-আলী কেবিনেটে ঢুকিতে হইবে। তারপর অল্পদিন মধ্যেই শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হইবে। শহীদ সাহেব মন্ত্রিসভায় ঢুকামাত্রই তাঁর উপর শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হইবে। শহীদ সাহেব আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিলেন যে প্রধানমন্ত্রিত্বটা বড় কথা নয়, বড় কথা শাসনতন্ত্র রচনা।

কিন্তু মেম্বররা শহীদ সাহেবের সহিত একমত হইলেন না। তখন তিনি প্রস্তাব দিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ হইতে ৪ জন করিয়া নেতৃস্থানীয় আওয়ামী -নেতা লইয়া গোপন পরামর্শ করিবেন। আমরা তাতেই রাযী হইলাম। হোটেল

মেট্রোপোলের শহীদ সাহেবের কামরায় আটজন নেতাকে লইয়া তিনি গোপন পরামর্শ বৈঠক করিলেন। যতদূর মনে হয় পূর্ব–পাকিস্তানের পক্ষ হইতে জনাব আতাউর রহমান খাঁ, মানিক মিয়া, কোরবান আলী ও আমি ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকিলাম। এই বৈঠকে শহীদ সাহেব যে সব কথা বলিলেন তার সারমর্ম এই ঃ (১) বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ তাঁকে কসম খাইয়া বলিয়াছেন যে শহীদ সাহেবের কেবিনেটে ঢুকার তিনদিন (কারও মতে তিন সপ্তাহ) মধ্যে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করিবেন ; (২) ঐ সময়ে আওয়ামী লীগ হইতে আরও দুইজন মন্ত্রী নেওয়া হইবে ; (৩) শাসনতন্ত্র রচনার ভার শহীদ সাহেবকে দেওয়া হইবে ; (৪) ছয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করিয়া একটি অর্ডিন্যান্স বলে উহাকে ইন্টারিম কনস্টিটিউশন রূপে প্রয়োগ করা হইবে ; (৫) ঐ শাসনতন্ত্র অনুসারে এক বছরের মধ্যে দেশময় সাধারণ নির্বাচন শেষ করা হইবে ; (৬) ঐ ভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের শাসনতন্ত্র যে কোনও রূপে সংশোধন করার পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

শহীদ সাহেব আমাদিগকে আরও জানাইলেন যে বড় লাট এই সব কথা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও প্রভাবশালী কয়েকজন মন্ত্রীর সামনেই বলিয়াছেন এবং তাঁদের সম্মতি সহকারেই বলিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সভারও প্রায় সকলেই আমরা গবর্নর–জেনারেলের সরলতা ও আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিলাম। কাজেই আমরা সকলে যদিও এই সব শর্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিলাম তবু এই সব শর্ত প্রতিপালিত হওয়ার ব্যাপারে আমরা ঘোর সন্দিহান থাকিলাম। শহীদ সাহেব এই বৈঠকে আমাদের দেশ–প্রেমে আবেগপূর্ণ আবেদন করিলেন। বলিলেন ঃ দেশের শাসনতন্ত্র ও গণতন্ত্রই বড় কথা ; কোনও এক ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রিত্বটা বড় কথা নয়। আমরা শহীদ সাহেবের সহিত এ ব্যাপারে একমত হইয়াই বলিলাম ঃ (১) প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্যই শহীদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরকার নাই। কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী হইলেই এই সব শর্ত কার্যকরী হইবে ; অন্যথায় হইবে না ; (২) এই সব শর্ত যে বড়লাট প্রতিপালন করিবেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা ; (৩) অল্প কয়েকদিন পরেই যখন শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করাই হইবে এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীরও যখন তাতে আপত্তি নাই, সে অবস্থায় সেটা এখনই কার্যে পরিণত না করার কোনও কারণ নাই।

আমাদের এই বৈঠক দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া চলিল। এই বৈঠক চলিতে থাকা কালেই ডাঃ খান সাহেব, জেনারেল আইউব ও মেজর–জেনারেল ইস্কান্দর মির্যা তিনজন মন্ত্রী পৃথক–পৃথক ভাবে শহীদ সাহেবের সংগে দেখা করিতে আসিলেন। কি কথা তাঁদের

মধ্যে হইল তার খুটিনাটি আমরা জানিলাম না। তবে শহীদ সাহেবকে মন্ত্রিসভায় নিবার প্রবল আগ্রহ যে বর্তমান মন্ত্রিসভার আছে, এটা বোঝা গেল। কিন্তু আমাদের সন্দেহ দূর হইল না। আমরা শহীদ সাহেবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে আমরা প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের উপর জোর দিতেছি না, বড়লাটের আন্তরিকতার পরখ হিসাবেই এর উপর জোর দিতেছি।

আমাদের বৈঠক চলিল। কিন্তু আমার একটি ব্যবসাগত অনিবার্য কারণে ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। বড় মামলা। শুনানী হইবেই। আর তারিখ পাওয়া যাইবে না। টেলিগ্রাম আসিয়াছে। শহীদ সাহেবকে টেলিগ্রাম দেখাইলাম। ছুটি চাহিলাম। নিজে তিনি উকিল মানুষ। উকিলের অসুবিধা তিনি ভাল বুঝিলেন। ছুটি দিলেন। কিন্তু হুকুম দিলেন : 'তোমার মতামতটা সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়া যাও।' আমি তাই করিলাম। শহীদ সাহেবের হাতে আমার লিখিত নোটটা দিয়া ১৬ই ডিসেম্বর আমি করাচি ত্যাগ করিলাম। শহীদ সাহেব সাধারণতঃ কাগয-পত্র ফেলেন না। আমার নোটটাও ফেলেন নাই। অনেকদিন পরেও আমার হাতের-লেখা ঐ নোটটা শহীদ সাহেবের ফাইলে দেখিয়াছি। তাতে ৮টি দফা ছিল। উপরে বর্ণিত সর্ব-সম্মত ৩টি দফা আগে লিখিয়া পরে নিম্নলিখিত ৫টি দফা আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে লিখিয়াছিলাম : (৪) যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার নির্বাচনী ওয়াদার ১৯নং দফা অনুসারে ৩ বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকারের বিধান শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে বড়লাট ও মন্ত্রিসভার সংগে এখনই বোঝাপড়া করিতে হইবে ; (৫) ইন্টারিম কনস্টিটিউশন অনুসারে নির্বাচিত গণ-পরিষদের সিম্পল-মেজরিটি ভোটে শাসনতন্ত্র সংশোধনের অধিকার থাকিবে ; (৬) পূর্ব-বাংলায় অবিলম্বে ৯২-ক ধারার অবসান করিয়া পার্লামেন্টারি শাসন প্রবর্তন করিতে হইবে ; (৭) শহীদ সাহেবের মন্ত্রিসভায় প্রবেশের আগে বড়লাটের নিকট হইতে এইসব শর্তাবলী লিখিতভাবে আদায় করিতে হইবে ; (৮) মন্ত্রিসভায় প্রবেশের আগেই শহীদ সাহেবকে একবার পূর্ব-বাংলা সফর করিতে এবং যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সাথে আলোচনা করিতে হইবে।

যে-কোন অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে শহীদ সাহেবের একবার পূর্ব-বাংলায় আসা আমার বিবেচনায় খুব জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতাদের অনেকের প্রতি কোনও-কোনও আওয়ামী নেতার মনোভাব ভাল ছিল না স্বাভাবিক কারণেই। তবুও শহীদ সাহেবকে করাচি বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেক কে. এস. পি. নেতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সেইদিন ও পরের দিন শহীদ সাহেবের বাড়িতেও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের বৈঠক হইতেছে এই টেকনিক্যাল

গ্রাউন্ডে তাঁদেরে সভায় উপস্থিত থাকিতে বা শহীদ সাহেবের সাথে কথা বলিতে দেওয়া হয় নাই। এটা আমার কাছে অশোভন মনে হইয়াছিল। তারপর করাচি ত্যাগের সময় আমি জানিতে পারিলাম, হক সাহেব প্রধানমন্ত্রীর ডাকে করাচি আসিয়াছেন। এটা যুক্তফ্রন্ট ভাংগার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর আরেকটা চেষ্টা, সে কথা করাচিতে সমাগত দু'চারজন কে. এস. পি নেতাও বলিলেন। আমিও তাঁদের সাথে একমত হইলাম। তাঁরা আরও বলিলেন এবং আমি একমত হইলাম যে করাচিতেই হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের মোলাকাত হওয়া দরকার। এ সম্পর্কে আতাউর রহমান সহ আওয়ামী নেতারাও আমার সাথে একমত হইলেন। এই ব্যবস্থা করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়া আমি আশঙ্কা–ভরা মন লইয়া করাচি ত্যাগ করিলাম। শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করিবার আমার সময় হইল না।

২০শে ডিসেম্বর বাসায় বসিয়াই রেডিও শুনিলাম, শহীদ সাহেব মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিয়াছেন। আমার আশঙ্কা দৃঢ় হইল। মনটা খারাপ হইল। শহীদ সাহেবকে মোবারকবাদ পাঠাইতে মন উঠিল না। কাজেই বিলম্ব করিলাম। বন্ধু–বান্ধবের পীড়াপীড়িতে অবশেষে যাও একটি টেলিগ্রাম করিলাম, তাতে লিখিলাম : 'কনগ্রেচুলেশনস। হোপ ইউ হ্যাভ এ্যাক্টেড ওয়াইযলি।' শহীদ সাহেব পরে বলিয়া ছিলেন আমার টেলিগ্রামে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। জবাবে আমি বলিয়াছিলাম : 'আমি তাঁর চেয়ে বেশি দুঃখিত হইয়াছিলাম।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুইটি কারণে আমার মন সান্ত্বনা পাইল। এক, শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সাহেবের উদ্যোগে মুক্তি পাইলেন। দুই, শীঘ্রই মওলানা ভাসানী সাহেবকে দেশে ফিরিতে দেওয়া হইবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইল।

৩. ভুলের মাশুল

অল্পদিন মধ্যেই প্রমাণিত হইল যে শহীদ সাহেবকে ধাপ্পা দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র মুজিবুর রহমান সাহেবকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে বড়লাট বা তাঁর সহ–মন্ত্রীরা শহীদ সাহেবের কথা রাখিতেছেন না, এটা স্পষ্ট হইয়া গেল। মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরিবার আদেশ ক্রমেই বিলম্বিত হইতে লাগিল। আওয়ামী লীগ হইতে আরও দুইজন মন্ত্রী গ্রহণ করা ত দূরের কথা, শহীদ সাহেবের অমতে হক সাহেবের দলের বন্ধুবর আবু হোসেন সরকারকে ৪ঠা জানুয়ারি মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইল। খবরের কাগযে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে এবং হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের বিবৃতিতে বোঝা গেল, যুক্তফ্রন্টে বেশ বড় রকমের ভাংগন ধরিয়াছে।

আমার বরাবর ধারণা ছিল যে গবর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ নিজে এবং তাঁর পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের মধ্যে বিরোধ বাঁধাইয়া যুক্তফ্রন্ট ভাংগিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। মওলানা ভাসানী দেশে থাকিলে এই চেষ্টায় তাঁরা সফল হইতে পারিবেন না এই আশঙ্কাতেই তাঁরা মওলানা সাহেবকে দেশে ফিরিতে দিতেছিলেন না। এই ব্যাপারে কি শহীদ সাহেব, কি হক সাহেব, দুই জনের একজনও দেশকে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারিতেছেন না বলিয়া আমার মনটা খুবই খারাপ হইয়াছিল। দুই নেতাই শাসন-নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে। একজনের কথায় নির্ভর করা যায় না ; আরেকজন কারও পরামর্শ মানেন না। এ অবস্থায় একটি মাত্র লোক যিনি উভয়কে শাসন করিতে পারিতেন, তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানী। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ঠিক এই সময়েই দেশে নাই। আজ আমার মনে হইতেছে, মওলানা সাহেবের ঐ সময়ে বিদেশে যাওয়াটা ঠিক হয় নাই। তিনি থাকিলে বোধ হয় হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের ঐ ব্যক্তিগত বিরোধ এবং পরিণামে যুক্তফ্রন্টের ভাংগন রোধ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমার মনে হইলে কি হইবে? পার্টির বা দেশের সবচেয়ে যে সংকট মুহূর্তে মওলানা সাহেবের প্রয়োজন হইয়াছে সবচেয়ে বেশি, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছেন।

৪. হক-নেতৃত্বে অনাস্থা

যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধ আরও বাড়িল। আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান সাহেব হক সাহেবের বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব আনিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে দস্তখত অভিযান শুরু হইল। অভিযানের গোড়ায় মুজিবুর রহমান সাহেব বলিলেন ঃ 'এ অনাস্থা-প্রস্তাব আওয়ামী লীগের তরফ হইতে নয় যুক্তফ্রন্টের তরফ হইতে।' এতে কিছু সংখ্যক আওয়ামী মেম্বর ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার স্বাধীনতা দাবি করিলেন। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ডাকিয়া আওয়ামী মেম্বরদের উপর ম্যান্‌ডেট দেওয়া হইল।

এই ধরনের সভায় কোনদিনই শান্তিপূর্ণ সর্ব-জনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হয় না। গণ্ডগোলেই সভা শেষ হয়। এই অভিজ্ঞতা আমার অনেক দিনের ছিল। কাজেই 'ইত্তেফাক'-সম্পাদক মানিক মিয়া সাহেব ও আমি এই অনাস্থা প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলাম। কিন্তু আমাদিগকে এই বলিয়া চুপ করা হইল যে এটা শহীদ সাহেবের নির্দেশ এবং মওলানা সাহেবেরও এতে মত লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনঃপুত হইল না।

এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আমি শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবের ও মওলানা সাহেবের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করিবার চেষ্টা করিলাম। শহীদ সাহেবকে পাওয়া গেল না। মওলানা সাহেবকে পাইলাম। অনাস্থা-প্রস্তাবে তাঁর অনুমোদনের কথা তিনি অস্বীকার করিলেন। বলিলেন এ কাজে বিরত থাকিবার জন্য তিনি আমাদের কয়েকজনের নামে পত্র দিয়াছেন। আমার চিঠি ময়মনসিংহের ঠিকানায় দিয়াছেন বলিয়া তখনও আমার হাতে পৌঁছে নাই। যাহোক তিনি অনাস্থা প্রস্তাব বিবেচনার সভা স্থগিত রাখিবার জোর পরামর্শ দিলেন।

আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষার কোনও উপায় দেখিলাম না। কাজেই সে চেষ্টা করিলাম না। বরঞ্চ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ম্যানডেটের জোরে জিতিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু শহীদ সাহেব ঢাকা না আসায় ও মওলানা সাহেবের বিরুদ্ধতার কথা জানাজানি হইয়া যাওয়ায় জয়ের সম্ভাবনা কমিয়া গেল। আমি আপোসের চেষ্টা করিলাম। বন্ধুবর আবদুস সালাম খাঁ সাহেবই এ আপোস করাইয়া দিতে পারিতেন। কারণ তিনি পঁচিশজনের মত আওয়ামী মেম্বর লইয়া হক সাহেবের সমর্থন করিতে ছিলেন। আমি তাঁকে এই আপোস-ফরমূলা দিলাম ঃ পার্টির সভায় একই প্রস্তাবে প্রাদেশিক নেতা হিসাবে হক সাহেবের উপর ও কেন্দ্রীয় নেতা হিসাবে শহীদ সাহেবের উপর আস্থা জ্ঞাপন করা হইবে। সালাম সাহেব আমার ফরমূলা খুবই পছন্দ করিলেন। কিন্তু বলিলেন ঃ বড়ই দেরি হইয়া গিয়াছে। ইট ইয টু লেইট। আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম ঃ কিচ্ছু দেরি হয় নাই। সালাম সাহেবের আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি সোজা হক সাহেবের কাছে গিয়া বলিবেন ঃ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের পর তাঁর আর স্বাধীনতা নাই। তিনি ইতিপূর্বে হক সাহেবকে সমর্থনের যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তা হইতে তিনি মুক্তি চান। সত্য-সত্যই সালাম সাহেবের ঐ ওয়াদা খেলাফ করিতে হইবে না। কারণ এ কথা শোনা মাত্র হক সাহেব সালাম সাহেবকে আপোসের জন্য ধরিবেন। সালাম সাহেব তখন আমার ফরমূলায় আপোস করাইবার সুযোগ পাইবেন।

সালাম সাহেব আমার অনুরোধ রাখিতে পারেন নাই। ফলে নির্ধারিত দিনে ১৯৫৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এসেমব্লি হলের রিফ্রেশমেন্ট রুমে যুক্তফ্রন্টের এই ঐতিহাসিক বৈঠক বসিল। সভার প্রাক্কালেও উভয় পক্ষের আপোস-কামী কতিপয় সদস্যের সহযোগিতায় আপোসের একটা চেষ্টা করিলাম। কিন্তু উভয় পক্ষের চরমপন্থীদেরই জয় হইল। সভার কাজ শুরু হইল। এ ধরনের সভায় বরাবর যা হইয়া থাকে তাই হইল। উভয় পক্ষের প্রস্তাব 'পাস' হইল। উভয় পক্ষই জিতিল। উভয় পক্ষের

খবরের কাগযে যার-তার প্রস্তাবের সমর্থকদের যে সংখ্যা বাহির হইল তার যোগফল মোট মেম্বরের চেয়ে বেশি। উভয় পক্ষই জয় দাবি করিলেন। আওয়ামী লীগ ওয়ালারা বলিলেন ঃ আওয়ামী লীগের জয়। কৃষক-শ্রমিক ওয়ালারা বলিলেন ঃ কৃষক-শ্রমিক পার্টির জয়। দুই দলের কেউ তখন বুঝিলেন না যে জয় তাঁদের কারও হয় নাই। আসল জয় হইয়াছে গণ-দুশমন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির।

৫. আশার আলো নিভিল

এই ভাবে যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া গেল। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের বড় শরিক আওয়ামী লীগ এই ভাংগনের কোনও সুবিধা উপভোগ করিতে পারিল না। বরঞ্চ ছোট শরিক কৃষক-শ্রমিক পার্টিই দৃশ্যতঃ এবং স্পষ্টতঃ সব সুবিধা লুটিতে লাগিল। আওয়ামী লীগের নেতা শহীদ সাহেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকার দরুন আওয়ামী লীগের কোনও সুবিধা ত হইলই না, বরঞ্চ প্রতিপদে বেকায়দা হইতে লাগিল। গবর্নর-জেনারেল এই সময়ে কতকগুলি বেআইনী ও অগণতান্ত্রিক অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তার নেতা হক সাহেব জনসভা করিয়া এবং বিবৃতি দিয়া সে সবের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁদের দলের প্রতিনিধি মিঃ আবু হোসেন সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এইসব অগণতান্ত্রিক কাজের জন্য শুধু শহীদ সাহেবকেই দোষী করিতে লাগিলেন। আওয়ামী লীগ আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও সাফাই দিতে পারিল না। কারণ শহীদ সাহেবের মুখ চাহিয়া ঐ সব অগণতান্ত্রিক অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদও তাঁরা করিলেন না। আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরাইয়া আনার আন্দোলন ও জনসভা আওয়ামী লীগের বদলে কৃষক-শ্রমিক পার্টিই করিতে লাগিল। এতে আওয়ামী লীগের মর্যাদা দ্রুত হ্রাস পাইতে লাগিল। এই সময় গবর্নর-জেনারেল একটি গণ-পরিষদের বদলে একটি শাসনতন্ত্র কনভেনশন গঠনের জন্য এক অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন। এটা স্পষ্টতঃই অগণতান্ত্রিক হইল। কৃষক-শ্রমিক পার্টি এই অগণতান্ত্রিক পন্থার তীব্র প্রতিবাদ করিল। তাছাড়া কনভেনশনের সদস্য-সংখ্যায় দুই পাকিস্তানের প্যারিটি-প্রবর্তন করায় পূর্ব-বাংলার সর্বত্র ইহার প্রতিবাদ উঠিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ শহীদ সাহেবের খাতিরে এ সব অন্যায়েরও প্রতিবাদ হইতে বিরত রহিল। আমরা আওয়ামী লীগের কর্মীরা শরমে মরমে মরিতে লাগিলাম। মওলানা ভাসানী কলিকাতা হইতে কনভেনশনের প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়া আওয়ামী লীগের মুখ রক্ষা করিলেন। এই সময়ে কনভেনশনের পক্ষে ক্যানভাস করিবার জন্য শহীদ সাহেব ও ইস্কান্দর মির্যা ঢাকায় আসিলেন। উদ্দেশ্য ঃ শহীদ সাহেব আওয়ামী লীগকে ও

মির্যা সাহেব কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে কনভেনশন গ্রহণ করাইবেন। একই সময়ে গবর্নমেন্ট হাউসের এক অংশে শহীদ সাহেব আওয়ামী লীগকে লইয়া এবং অপর অংশে মির্যা সাহেব কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে লইয়া দরবারে বসিলেন। শহীদ সাহেবের পরামর্শে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত কনভেনশন সম্পর্কে এই মত প্রকাশ করিল যে যদি মওলানা ভাসানী ঢাকায় আসিয়া আওয়ামী লীগের সভায় কনভেনশন সমর্থন করেন, তবে আওয়ামী লীগ তাতেই রাযী আছে। পক্ষান্তরে গবর্নমেন্ট হাউসের অপর অংশে ইস্কান্দর মির্যা কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে যা বুঝাইলেন, তার ফল এই হইল যে পরদিনই হক সাহেব নিজ বাড়িতে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আনুষ্ঠানিক সভা ডাকিয়া কনভেনশন ও প্যারিটির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন গণ-পরিষদ দাবি করিলেন। ঐ সংগে প্রস্তাবিত কনভেনশন বয়কট করার প্রস্তাবও গৃহীত হইল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগও বয়কটের প্রস্তাব করিল। আর সব পার্টিই গণতন্ত্র ও পূর্ব-বাংলার স্বার্থে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। শুধু আওয়ামী লীগ চুপ করিয়া থাকিল। কনভেন্শনের নির্বাচনের নমিনেশন পেপার দাখিলের দিন তারিখ পিছাইয়া দিয়া মির্যা সাহেব ও শহীদ সাহেব করাচি ফিরিয়া গেলেন। দিন সাতেক পরে ২৫শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতা হইতে মওলানা ভাসানীকে সংগে লইয়া শহীদ সাহেব আবার ঢাকায় আসিলেন। আমাদের মধ্যে বিপুল আনন্দ ও আশা জাগিল। আওয়ামী লীগের সভা বসিল। শহীদ সাহেবের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা শুনিয়া আওয়ামী লীগ কন্‌ভেনশন সম্পর্কে চিন্তা করিবার এবং আরও আলোচনা করিবার সময় চাহিল। শহীদ সাহেব এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তি দিলেন। মওলানা সাহেব অগত্যা নমিনেশন পেপার দাখিলের পক্ষে মত দিলেন। পরদিন আমরা নমিনেশন পেপার দাখিল করিলাম। আর কোনও পার্টি নমিনেশন ফাইল করিল না। আমরা অনেকেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইবার আশায় মনে-মনে খুশি হইলাম। কিন্তু বড়লাট নমিনেশন পেপার দাখিলের তারিখ আবার পিছাইয়া দিলেন। আমরা নিরাশ হইলাম। মওলানা ভাসানীর গাল খাইলাম। কিন্তু এর পরেও আমাদের কপালে আরও অপমান ছিল। ১০ই এপ্রিল ফেডারেল কোর্ট কনভেন্শন গঠনে বড়লাটের ক্ষমতা নাই, সাধারণ গণ-পরিষদ গঠন করিতে হইবে, বলিয়া রায় দিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৮শে মে বড়লাট ফেডারেল কোর্টের রায় মোতাবেক নয়া গণ-পরিষদ গঠনের অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন। গণতন্ত্রের নিশ্চিত জয় হইল। কিন্তু এ জয়ে আওয়ামী লীগ শরিক হইতে পারিল না। গণতন্ত্রের জয়ও যে কোনও দিন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরাজয় ও লজ্জার কারণ হইতে পারে, ঐ দিনই প্রথম আমার সে কথা মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু এখানেই আমাদের পরাজয়ের শেষ হয় নাই। দুর্দশা আরও ছিল বরাত্যে।

৬. বিভেদের শাস্তি

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী লীগই বিপুল মেজরিটি পার্টি। সুতরাং ৯২–ক ধারা উঠিলে মন্ত্রিত্ব আওয়ামী লীগেরই প্রাপ্য। তাছাড়া বড়লাট শহীদ সাহেবকে কথা দিয়াছেন বলিয়াও তিনি আমাদেরে জানাইয়াছেন। চিফ সেক্রেটারি মিঃ এন. এম. খাঁও নিজ–মুখে আমাদেরে সে কথা বলিয়াছেন। তবু শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী স্বয়ং ঢাকায় উপস্থিত থাকিয়া কৃষক–শ্রমিক পার্টিকে মন্ত্রিত্ব দিয়া দিলেন। অস্থায়ী গবর্নর বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের অমতেই তিনি এটা করিলেন। গবর্নর–জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তখন লণ্ডনে। শহীদ সাহেবও তাঁর সাথে। তবু তিনি এটা ঠেকাইতে পারিলেন না। প্রধান মন্ত্রীর নিজ–মুখে–কওয়া 'দেশদ্রোহী' হক সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা যায় না বলিয়া তাঁর নমিনি মিঃ আবু হোসেন সরকারকে প্রধানমন্ত্রী করা হইল। তবু মেজরিটি পার্টি আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হইল না। কৃষক–শ্রমিক পার্টির মন্ত্রিসভা হওয়ায় কুড়ি জন আওয়ামী সদস্যসহ দুইজন আওয়ামী–নেতা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। নেযামে–ইসলাম পার্টি, কংগ্রেস পার্টি ও তফসিলী হিন্দুরাও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। গণতন্ত্রী দলও এই মন্ত্রী–সভাকে সমর্থন দিল। সুতরাং কার্যতঃ এবং নামতঃও এই মন্ত্রিসভা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা হইল। শুধু আওয়ামী লীগ পার্টি বাদ পড়িল। আওয়ামী লীগ পার্টির কুড়ি জন সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগ পার্টি নামে কোয়েলিশন পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ১৯ জন আওয়ামী সদস্য শেষ পর্যন্ত কৃষক–শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেওয়ায় আওয়ামী লীগের সদস্য–সংখ্যা ১০৪ জনে আসিয়া দাঁড়াইল।

এটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল না। আমাদের দেশে বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে পার্টি–চৈতন্য ও পার্টি–আনুগত্য আজও দানা বাঁধে নাই। বেশ কিছু–সংখ্যক লোক আজও 'ব্যাণ্ডওয়াগেন'–নীতি, দেশী কথায় 'মামার জয়'–নীতির অনুসারী। তাছাড়া আওয়ামী লীগের আনুগত্য দাবির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক জোর ছিল সত্য, কিন্তু নৈতিক জোর ছিল না। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পার্টি হিসাবে নিজস্ব নমিনি দাঁড় করায় নাই। যুক্তফ্রন্টের অংগ দল হিসাবেই নির্বাচন করিয়াছিল। নির্বাচনী ওয়াদা একুশ দফাও আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো ছিল না। যুক্তফ্রন্টের মেনিফেস্টো ছিল। কাজেই নির্বাচিত সদস্যদের নৈতিক ও রাজনৈতিক আনুগত্য ছিল যুক্তফ্রন্টের কাছে। এ অবস্থায় ৩৯ জন আওয়ামী মেম্বরের যুক্তফ্রন্টের নামে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করাটা আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। বরঞ্চ আরও বেশি–সংখ্যক মেম্বর যে বিদ্রোহ করেন নাই,

এটা আওয়ামী লীগের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও আওয়ামী মেম্বরদের শৃংখলা-বোধের পরিচায়ক।

এইভাবে আওয়ামী লীগ পার্টি আইন-পরিষদের মুসলিম অংশেও মাইনরিটি পার্টিতে পরিণত হইল। অতঃপর আইন-পরিষদের মেম্বরদের ভোটে যে ৩১ জন মুসলমান গণ-পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হইলেন, তাতে আওয়ামী লীগ পাইল মাত্র ১২টি। পক্ষান্তরে কৃষক-শ্রমিক ও নেযামে ইসলাম-গণতন্ত্রী কোয়েলিশন পাইল ১৬টি। মুসলিম লীগ ১টি ও স্বতন্ত্র ২টি। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীই এই একমাত্র মুসলিম লীগ সদস্য।

এইভাবে আমাদের ভুল ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর অপচেষ্টায় আওয়ামী লীগ পার্টি পর পর তিন-তিনটা মার খাইল। যুক্তফ্রন্ট ভাংগিল। মেজরিটি-পার্টি আওয়ামী লীগ মাইনরিটি হইল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে মোহাম্মদ আলীর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শহীদ সাহেব মাইনরিটি-নেতা হইলেন।

বিশা অধ্যায়

ঐতিহাসিক মারি-প্যাক্ট্

১. নয়া গণ-পরিষদ

মন্ত্রিত্ব আদায়ে এবং পরিণামে নয়া গণ-পরিষদের নির্বাচনে কৃষক-শ্রমিক পার্টি মুসলিম লীগের ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। এতে আমাদের মধ্যে অনেকেই যুক্তফ্রন্টের ১৬ জন মুসলিম গণ-পরিষদ মেম্বরকে কার্যতঃ মোহাম্মদ আলীর দলের লোক বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু অতটা নিরাশ হইলাম না। আমার মনে হইল, হক সাহেব শহীদ সাহেবের সহিত ব্যক্তিগত বিরোধের দরুন এবং নিজের দলকে ক্ষমতায় বসাইবার উদ্দেশ্যে, প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সাথে ঐ 'সুবিধার বিবাহ' ম্যারেজ-অব-কনভিনিয়েন্স করিয়াছেন। সে আবশ্যকতা এখন ফুরাইয়াছে। তিনি পূর্ব-বাংলার গদিতে নিজের পার্টিকে বসাইয়াছেন। তাঁর দওলতে গণ-পরিষদের নির্বাচনেও তাঁর দল মেজরিটি হইয়াছে। এইবার আওয়ামী লীগের সহিত একযোগে কাজ করায় তাঁর কোনও আপত্তি হইবে না। কারণ তিনটি ঃ প্রথমতঃ একুশ দফা নির্বাচনী ওয়াদা পূরণে প্রাদেশিক সরকার হিসাবে তাঁর পার্টির দায়িত্বই বেশি। দ্বিতীয়তঃ একুশ দফার ও আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক মেম্বররাই তাঁর দলে বেশি প্রভাবশালী। তৃতীয়তঃ তিন-তিনটা সম্মুখ-যুদ্ধে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করিয়া হক সাহেব নিশ্চয় এখন বিজয়ীর উদার মনোভাব অবলম্বন করিবেন। এইসব কারণে এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শাসক-গোষ্ঠীর মোকাবেলায় পূর্ব-বাংলার ঐক্যের অপরিহার্য প্রয়োজনে কে. এস. পি-আওয়ামী লীগের একযোগে কাজ করার আশায় বুক বাঁধিয়া আমি পশ্চিমের তীর্থক্ষেত্রে রওয়ানা হইলাম।

গণ-পরিষদের পয়লা বৈঠক ৭ই জুলাই মারিতে ডাকা হইয়াছিল। ৫ই জুলাই আমরা পূর্ব-বাংলার অনেক মেম্বর ঢাকা বিমান বন্দর হইতে পশ্চিম-মুখী রওয়ানা হইলাম। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আগে হইতেই লাহোরে ডাকা হইযাছিল। আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান ও আমি সে সভায় যোগ দিবার জন্য একত্রে লাহোর উপস্থিত হইলাম। পশ্চিম পাঞ্জাব আইন-পরিষদের সদস্য ভবন 'পিপল হাউসে' আমাদের থাকার ও ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের স্থান করা হইয়াছিল।

সদস্য ভবনের কমনরুমে ঐ বৈঠক হইল। গণ-পরিষদের মেম্বর ছাড়া আরও অনেক নেতা ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নবাবযাদা নসরুল্লা খাঁ ও মানকি শরিফের পীর সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের কাঠাম ও মোহাম্মদ আলী-মন্ত্রিসভায় শহীদ সাহেবের অবস্থিতি এই দুইটাই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। এ বিষয়ে কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া প্রথম দিনের বৈঠক সমাপ্ত হইল। মারিতে গণ-পরিষদের বৈঠক শুরু হইবার আগেই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ-সভার সম্ভাবনার কথা বলিয়া শহীদ সাহেব আমাদের তিনজন ও মানকি শরিফের পীর সাহেবকে লইয়া মোটর যোগে মারি রওয়ানা হইলেন। নবাবযাদা নসরুল্লার সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলিতে থাকিল। অন্যান্য মেম্বরদেরে সভাশেষে ট্রেনে আসিতে উপদেশ দেওয়া হইল। লাহোর হইতে পিণ্ডি ট্রেনের রাস্তা। পিণ্ডি হইতে মারি পর্যন্ত বাস সার্ভিস। সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গাফফার খাঁর ঐ সময় আলোচনার জন্য মারিতে আসিবার কথা ছিল বলিয়া মানকির পীর সাহেবকে সংগে নেওয়া খুবই আবশ্যক ছিল। দীর্ঘক্ষণের মোটর-পথেও আমরা দেশের এবং সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা ও ভবিষ্যত লইয়া অনেক অনেক শিক্ষাপ্রদ আলোচনা করিলাম। বস্তুতঃ মানকির পীর সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার এটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় সুযোগ। পীর সাহেব মাত্র ত্রিশ বছরের তরুণ যুবক হইলেও দাড়ি-মোচে আরও বেশি বয়সের মনে হইত। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় তিনি অনেক প্রৌঢ়-বৃদ্ধের চেয়েও জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর দেশ-প্রেম ও রাজনীতি-জ্ঞান আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

মারিতে পৌঁছিয়া আমরা হোটেল সিসিল ও ব্রাইটল্যাণ্ড হোটেলে ছড়াইয়া পড়িলাম। আতাউর রহমান ও আমি হোটেল সিসিলে একতলার একই কামরায় থাকিলাম। মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ মেম্বররা হোটেল সিসিলের দুতলা দখল করিলেন। হক সাহেবের দল ব্রাইটল্যাণ্ড দখল করিলেন। শহীদ সাহেব আমাদের খুব কাছেই মন্ত্রী হিসাবে তিন-চার কামরার একটা সুইট দখল করিলেন। ৭ই জুলাই হইতে ১৪ই জুলাই পর্যন্ত গণ-পরিষদের বৈঠক চলিল। আমরা দিন-দশেক মারিতে ছিলাম। এই দশদিনে আমরা মারির দর্শনীয় সকল স্থান দেখিয়া ফেলিলাম। লোয়ার টুপাস্থ ক্যাডেট স্কুলের বাংগালী ছাত্ররা আমাদেরে দাওয়াত করিয়াছিল। সেখানেও গেলাম। মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা-অভিনন্দনের সব পার্টিতেও গেলাম। প্রতি সন্ধ্যায় 'মলে' বেড়াইতাম। এছাড়া সুযোগ পাইলেই আমি পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতাম। এটা আমার চিরকালের অভ্যাস। পাহাড়ের খাড়া ঢালু জায়গায় রাস্তা হাঁটা সহজ নয়। তবু আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ পথ-ঘাটের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে খেচিয়া

লইয়া যাইত। নয় হাজার ফুট উঁচা পর্বতের মাথায় এই সুন্দর শহরটি। সবার উপরে পানির বিশাল রিযার্ভয়ার। পার্শ্ববর্তী পর্বত হইতে বড়–বড় পাইপের সাহায্যে এখানে পানি আনা ও পরিশোধিত করিয়া সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। আমার কাছে হোটেল সিসিলটাই সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছিল। এটি একটি অত্যুচ্চ খাড়া ঠেসের উপর অবস্থিত। রেলিং–ঘেরা বাগ–বাগিচাওয়ালা সুসজ্জিত আংগিনায় বসিয়া আমরা গভীর খাদ দেখিতাম। আমাদের অনেক নিচে দিয়া মেঘ ও বৃষ্টি হইতে থাকিত। মেঘের উপরে বসিয়া উপরে সূর্যকিরণ ও নিচে মেঘের চলাচল ও বৃষ্টিপাত দেখা সে কি অপূর্ব!

যাহোক, গণ–পরিষদ শুরু হইবার আগের দিন আমরা মারি পৌঁছিবার সাথে–সাথেই শহীদ সাহেব আমাকে জানাইলেন যে রাত্রে গবর্নমেন্ট হাউসে ডিনারের দাওয়াত আছে। নবাব মুশতাক আহমদ গুরমানী তখন নব–গঠিত পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের গবর্নর। তাঁরই মারিস্থ বাসভবনে এই দাওয়াত। তিনি গণ–পরিষদের একজন মেম্বর। গবর্নর–জেনারেল কর্তৃক মনোনীত গণ–পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যানও বটে তিনি। সুতরাং এটা শুধু ভদ্রতার ডিনার নয় বুঝিলাম। শহীদ সাহেব ঈশারায় বলিলেনও যে এতে রাজনৈতিক আলাপ–আলোচনা হইতে পারে।

২. পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা

যথাসময়ের বেশ খানিক্ষণ আগেই শহীদ সাহেব তাঁর গাড়িতে করিয়া আতাউর রহমান ও আমাকে লইয়া গবর্নমেন্ট হাউসে গেলেন। গবর্নমেন্ট হাউসের লাউঞ্জে সর্বপ্রথমেই কাল মোচওয়ালা ছয় ফুটের বেশি লম্বা বিশাল আকারের এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা। শহীদ সাহেব পরিচয় করাইয়া দিলেন ঃ ইনিই আমাদের প্রধান সেনাপতি ও বর্তমানে একই সংগে দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ। সজোরে করমর্দন করিলাম। সংগে–সংগেই সদ্য–ঘটিত একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। গবর্নর–জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের 'মিনিস্ট্রি অব ট্যালেন্টসের' উনি যেদিন দেশরক্ষা মন্ত্রী হন, তাঁর কয় দিন পরে লাহোর কর্পোরেশন তাঁকে একটি মানপত্র দিয়াছিল। এই মানপত্রের জবাবে অন্যান্য ভাল কথার মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "ইস্ট পাকিস্তান ইয ইনডিফেনসিবল। ডিফেনস্ অব ইস্ট পাকিস্তান লাইয ইন ওয়েস্ট পাকিস্তান।" সরকারী দায়িত্বশীল লোকের মুখে ঐ ধরনের কথা শুনিয়া আমি যারপর নাই চটিয়া গিয়াছিলাম। এই ধরনের বিপজ্জনক কথা দায়িত্বশীল নেতার মুখের উপযোগী নয়। কলিকাতার তাঁতি বাগান রোডে থাকাকালে প্রতিবেশী বস্তিওয়ালা মুসলমান ভাইদের মুখে এই ধরনের কথা শুনিতাম। পরে পাকিস্তানে আসিয়া

মোহাজের–ভাইদের অনেকের মুখেও শুনিয়াছি। তারা বলিত : হিন্দুস্থান পূর্ব–পাকিস্তান আক্রমণ করিলে আমাদের সেনাবাহিনী হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়া কয়েক ঘন্টার মধ্যে দিল্লি দখল করিবে। হিন্দুস্থান বাহিনী পূর্ব–পাকিস্তান হইতে লেজ গুটাইয়া চলিয়া যাইবে। এই ধরনের গাল–গল্পকে আমি চা–স্টল কাফিখানা বা তাড়ির আড্ডার ব্যাপার মনে করিতাম। এ–কথার তাৎপর্য ছিল এই যে, বাংগালী অসামরিক কাপুরুষের জাত। যুদ্ধ তারা জানে না। পূর্ব–বাংলা তারা রক্ষা করিতে পারিবে না। পশ্চিম পাকস্তানীরাই এদেশ রক্ষা করিবে। এই তাৎপর্যের জন্যই বোধ হয় আমার মেযাজ গরম হইত। আজ আমাদের প্রধান সেনাপতি–দেশরক্ষা মন্ত্রীর মুখে একথা শুনিয়া স্বভাবতঃই আমি তাঁর উপরও রাগ করিয়াছিলাম। অতএব, প্রাথমিক আলাপ–পরিচয় শেষ হওয়ামাত্র আমি ঐ কথাটা তুলিলাম এবং খুব সম্ভব অভদ্রভাবেই তুলিলাম। কারণ আগেই বলিয়াছি ঐ ধরনের কথা শুনিলে আমার মেযাজ ঠিক থাকিত না। কাজেই বলিলাম : 'আপনি ঐ ধরনের কথা কিরূপে বলিলেন? দেশের প্রধান সেনাপতি দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে ঐ কথা বলিয়া আপনি সম্পূর্ণ দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। নিজের দেশের বেশির ভাগই অরক্ষণীয়, একথা কোনও দেশের প্রধান সেনাপতি ঘরের চালে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না।'

প্রথম পরিচয়ের বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে আমি নাহক সিরিয়াস আলোচনার আমদানি করিয়াছি। রসালাপ আর জমিবে না। শহীদ সাহেব এই ধরনের মন্তব্য করিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরের দিকে নিতে চাইলেন। কিন্তু জেনারেল আইয়ুব আমাকে ছাড়িলেন না। তিনি আমার অপর হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলেন : 'আপনি খুব যরুরী কথাই তুলিয়াছেন। আমি আপনাকে আমার কথার তাৎপর্য না বুঝাইয়া ছাড়িব না।' তিনি আমাকে টানিয়া নিয়া একটি দেওয়ানে বসাইলেন। নিজেও পাশে বসিলেন। অগত্যা শহীদ সাহেব আতাউর রহমান সাহেবকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। প্রধান সেনাপতি–দেশরক্ষা মন্ত্রী নিজের ঐ উক্তির সমর্থনে যা–যা বলিলেন তা শুনিয়া আমার চক্ষু চড়কগাছ ! আমাদের প্রধান সেনাপতির মুখেও অবিকল কলিকাতার মুসলিম বস্তিওয়ালার কথাই শুনিলাম। ভারত যদি পূর্ব–বাংলা আক্রমণ করে, তবে পাকিস্তান বাহিনী দিল্লির লালকেল্লা ও লোকসভার শিখরে পাকিস্তানী পতাকা উড্ডীন করিবে। হিন্দুস্থান অতঃপর পূর্ব–পাকিস্তান ফিরাইয়া দিয়া আপোস করিবে।

খুব গরম তর্ক বাধিয়া গেল। অতিকষ্টে আমি মনের রাগ সামলাইয়া বলিলাম : 'তবে কি যতদিন পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা হিন্দুস্থানের রাজধানী দখল করিয়া

আমাদিগকে উদ্ধার না করিবেন, ততদিন আমাদিগকে হিন্দুস্থানের মিলিটারি অকুপেশনে থাকিতে হইবে? আমাদের সহায়-সম্পত্তি, ধর্ম-কৃষ্টি ও মা-বোনের ইয্যৎ-হুরমতের ততদিন কি হাল হইবে?'

আমাদের প্রধান সেনাপতি-দেশরক্ষা মন্ত্রী নিরুদ্বেগে জবাব দিলেন, সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। সত্য গোপন করিয়া তিনি নিজের কর্তব্যে ত্রুটি করিতে পারেন না।

আমি তখন বলিলাম ঃ আপনার কথা সত্য ধরিয়া নিলেও ওটা কেবল সম্ভব হিন্দুস্থান পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করিলে। কিন্তু পূর্ব দক্ষিণ বা উত্তর দিক হইতে কেউ পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করিলে আপনারা আমাদেরে কিভাবে রক্ষা করিবেন? নিরপেক্ষ হিন্দুস্থান তার উপর দিয়া সৈন্য চালনা করিতে দিবে কেন?

আমাদের প্রধান সেনাপতি এ কথার জবাবে শুধু বলিলেন ঃ হিন্দুস্থান ছাড়া আর কোনও দেশ পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করিবে না।

এমন এক-পা-ওয়ালা থিওরির উপর তর্ক চলে না। আমি তখন তর্কের মোড় ঘুরাইয়া আক্রমণাত্মক তর্ক শুরু করিলাম। তিনি যখন একবার আমাকে বলিলেন, এসব সামরিক ব্যাপার আমার মত উম্মি লোকের (লেম্যানের) পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, তখন আমি জবাবে বলিলাম ঃ আমি উম্মি বটে, কিন্তু একাধিক সামরিক বিশেষজ্ঞ আমাকে বলিয়াছেন ঃ ওয়েস্ট পাকিস্তান ইয ইনডিফেনসিবল। ডিফেন্স-অব-ওয়েস্ট পাকিস্তান লাইয ইন ইস্ট পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তান অরক্ষণীয় ; পূর্ব-পাকিস্তানে দাঁড়াইয়াই পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা করিতে হইবে।

জেনারেল হাসিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিতে গেলেন। কিন্তু আমি তাঁর বাধা ঠেলিয়া আমার কথিত সামরিক বিশেষজ্ঞদের যুক্তিটাও জেনারেলকে শুনাইলাম। আমি বলিলাম ঃ ঐসব সামরিক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই ঃ ছুরি যেমন সহজে কেক ভেদ করিয়া যায়, হিন্দুস্থানের সাজোয়া ট্যাংক বাহিনী তেমনি সহজে পশ্চিম পাকিস্তান ভেদ করিবে। পক্ষান্তরে নদী-নালা -জংগল-বহুল পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুস্থান বাহিনীকে পূর্ব-পাকিস্তানের গেরিলা বাহিনীর হাতে নাজেহাল হইতে হইবে। অধিকন্তু হিন্দুস্থানের অধিকাংশ সামরিক টার্গেট পূর্ব-পাকিস্তানের বমিং রেঞ্জের মধ্যে হওয়ায় দুর্লংঘ্য পূর্ব-পাকিস্তান ভাসমান এয়ার-ক্র্যাফট-ক্যারিয়ারের কাজ করিবে।

জেনারেল আমার এই সব যুক্তির কোনও জবাব দিলেন না। শুধু মৃদু হাসিলেন। আমার অজ্ঞতার জন্যই বোধ হয় এই হাসি। কিন্তু আমি শেষে বলিলাম ঃ সত্য কথা

যেটাই হোক পাকিস্তানের মেজরিটি বাসিন্দার রক্ষার জন্য অন্ততঃ অর্ধেক সৈন্যবাহিনী ও অর্ধেক অস্ত্র তৈরির কারখানা পূর্ব-পাকিস্তানে মোতায়েন ও কায়েম করা দরকার। এবার জেনারেল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ঃ 'এটা সামরিক ব্যাপারে আপনার অজ্ঞতার আরেকটা প্রমাণ। আমাদের সৈন্যবাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হইলে আমাদের যুদ্ধ-ক্ষমতা (স্ট্রাইকিং পাওয়ার) অর্ধেক হইয়া যাইবে।

ভিতর হইতে খানার তাকিদ পুনঃ পুনঃ আসিতে থাকায় আমরা শেষ পর্যন্ত উঠিলাম। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান রক্ষার জন্য আমাদের দেশরক্ষা কর্তৃপক্ষ এর চেয়ে কোনও ভাল রাস্তার চিন্তা করেন না দেখিয়া আমার মনটা আরও বেশি খারাপ হইয়া গেল।

৩. দুই অঞ্চলের আপোস-চেষ্টা

ডিনার টেবিলে প্রথমে খোশ-আলাপের আকারে এবং ডিনারের পরে গবর্নর গুরমানীর চেম্বারে বসিয়া উভয় পাকিস্তানের সমঝোতার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার কথা সিরিয়াসলি আলোচিত হইল। এই আলোচনা চলিল ধারাবাহিক দুই-তিন দিন ধরিয়া অনেকগুলি বৈঠকে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের একত্ব ও সংখ্যা-গুরুত্বকে তাঁরা ভয় পান। মেজরিটির জোরে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে প্রাধান্য করিবে। সেজন্য দরকার দুই পাকিস্তানে প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা-সাম্য। শুধু সংখ্যা-সাম্য হইলেও চলিবে না। পূর্ব পাকিস্তান একদম জোট বাঁধা এক-রংগা একটি ভূখণ্ডের একটি প্রদেশ। আর পশ্চিম পাকিস্তান পাঁচ ভাগে বিভক্ত পাঁচ-রংগা পাঁচটি প্রদেশ। পূর্ব পাকিস্তানীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই অনৈক্যের সুযোগ লইয়া তাদের মধ্যে অনবরত ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবে এবং 'ডিভাইড এন্ড রুল'-নীতি অবলম্বন করিয়া সারা পাকিস্তানে সর্দারি করিবে। অতএব, প্রথমতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা গুরুত্ব কমাইয়া সংখ্যা-সাম্য প্যারিটি আনিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য একত্রিত করিয়া একটি মাত্র প্রদেশ করা মানিতে হইবে। এই দুইটা কাজই ইতিপূর্বেই গবর্নর-জেনারেলের অর্ডিন্যান্স বলে সমাধা হইয়াই গিয়াছিল। নয়া গণ-পরিষদে গবর্নর-জেনারেলের আদেশ-বলে ৮০ জন মেম্বর করা হইয়াছিল ৪০ ঃ ৪০ করিয়া। পূর্ব-বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টি বিশেষতঃ তার নেতা হক সাহেব এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীও এই প্যারিটি-ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অসম্মত হন। এই লইয়া আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও আওয়ামী লীগ-ভুক্ত এম. এল. এ.-দের যুক্ত সভার

একাধিক বৈঠক বসিয়াছিল। খুব জোরদার আলোচনা হইয়াছিল। শহীদ সাহেবের কথায় শেষ পর্যন্ত এটা জানা গিয়াছিল যে পূর্ব-বাংলার প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি-ব্যবস্থা মানিয়া না নিলে নয়া পরিষদ গঠনে গবর্নর-জেনারেল ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা রাযী হইবেন না। অগত্যা আওয়ামী লীগ এই প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝান হইয়াছিল যে শুধু নয়া গণ-পরিষদের বেলাই এই সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লওয়া হইল। এটা অস্থায়ী ব্যবস্থা হইবে। বরাবরের জন্য এটা হইবে না। এসবই নয়া গণ-পরিষদ গঠনের আগের কথা।

কিন্তু মারিতে গবর্নরের ডিনার টেবিলে বসিয়াই আমরা বুঝিলাম, এই সংখ্যা-সাম্যের দাবি পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্থায়ী দাবি। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা পাকে-প্রকারে মোলায়েম ভাষায় আমাদেরে বুঝাইয়া দিলেন, কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে বরাবরের জন্য এই সংখ্যা-সাম্যের ব্যবস্থা না হইলে পশ্চিম পাকিস্তানবাসী কোনও শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে না। এক ইউনিট ব্যাপারেও তাঁরা এই এ্যাটিচুড গ্রহণ করিলেন। কথাবার্তায় আমাদেরে সমঝাইয়া দিলেন, ওটা পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার। আমরা পূর্ব-পাকিস্তানীদের ও-ব্যাপারে কথা না বলাই ভাল । আমরা অবশেষে নিম্নলিখিত শর্তে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের এই দুইটি দাবি মানিয়া লইতে রাযী হইলাম। (১) শুধু প্রতিনিধিত্বে নয়, চাকরি-বাকরি, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থ বন্টন সেনাবাহিনী ইত্যাদি সব-তাতেই সংখ্যা-সাম্য হইবে ; (২) পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন দিতে হইবে ; (৩) যুক্ত-নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করিতে হইবে ; (৪) বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।

৪. মারি-চুক্তি

আলোচনা দুই দিন ব্যাপী চার-পাঁচটি বৈঠকে সমাপ্ত হইল। নব গঠিত পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের গবর্নর ও গণ-পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান জনাব গুরমানীর চেম্বারেই এই আলোচনা সভার বৈঠক চলিতে থাকিল। প্রতিদিন দুই-এক-ঘন্টা করিয়া গণ-পরিষদের বৈঠক চলিত। বৈঠক শেষে নেতারা চেয়ারম্যানের চেম্বারে সমবেত হইতেন। অনেকক্ষণ ধরিয়াই এই আলোচনা চলিত। নবাব গুরমানী সাহেব ঠাণ্ডা মেযাজ ও মিঠা যবানের রাশভারী, ভদ্র ও পণ্ডিত লোক। বুদ্ধি তাঁর চানক্যের মত তীক্ষ্ণ। তাঁর তর্কের ধারা ও আলোচনার এপ্রোচ হৃদয়গ্রাহী। প্রধানতঃ তাঁরই মধ্যস্থতায় অবশেষে পাঁচ দফার একটি চুক্তিপত্রের মুসাবিদা চূড়ান্ত হইল। এই পাঁচটি দফা এই ঃ

(১) পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট

(২) পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

(৩) সকল ব্যাপারে দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যা-সাম্য

(৪) যুক্ত নির্বাচন

(৫) বাংলা-উর্দু রাষ্ট্রভাষা।

প্রথমে স্থির হইয়াছিল প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ও নবাব গুরমানী মুসলিম লীগের, প্রকারান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের, পক্ষ হইতে এবং জনাব হক সাহেব ও জনাব সুহরাওয়ার্দী সাহেব অবিভক্ত যুক্তফ্রন্টের, প্রকারান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের, পক্ষ হইতে উক্ত চুক্তিনামার স্বাক্ষর করিবেন। উক্ত নেতাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, নবাব গুরমানী ও জনাব শহীদ সুহরাওয়ার্দীর দস্তখত হওয়ার পর নবাব গুরমানী আমাদের জানান যে হক সাহেব দস্তখত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমরা বিস্মিত দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হইলাম। আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এই আপোস হওয়ায় সকলেই খুশী হইয়াছিলেন। সারা দেশে একটা নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনার স্পন্দন ও আশার আলো দেখা দিয়াছিল। হক সাহেবের মত প্রবীণ ও দূরদর্শী নেতা এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন না কেন তা আমরা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। গুরমানী সাহেব তাঁর স্বাভাবিক রসিকতাপূর্ণ ভাষায় আমাদেরে হক সাহেবের আপত্তির কারণ বুঝাইয়া দিলেন। সে কারণ এই যে হক সাহেব শহীদ সাহেবকে পূর্ব-বাংলার প্রতিনিধি মনে করেন না। কাজেই তাঁর সাথে তিনি পূর্ব-বাংলার পক্ষে দস্তখত করিতে রাযী নন। পূর্ব-বাংলার প্রতিনিধিরূপে জনাব আতাউর রহমান ও আবুল মনসুর দস্তখত দিলে হক সাহেব দস্তখত দিতে রাযী আছেন। হক সাহেব শহীদ সাহেবকে অপদস্থ করিবার মতলবেই এ কথা বলিয়াছেন এতে আমাদের কোনও সন্দেহ রহিল না। ফলে আতাউর রহমান ও আমি দস্তখত দিতে অস্বীকার করিলাম এবং হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের দস্তখতেই চুক্তি-পত্র সম্পাদনের জন্য যিদ করিলাম। কিন্তু শহীদ সাহেব আমাদের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করিলেন এবং দস্তখত দিতে আমাদেরে রাযী করিলেন। কাজেই দুই অঞ্চলের পক্ষ হইতে দুইজন করিয়া চারজনের বদলে চারজন করিয়া আট জনের দস্তখতের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ হইতে আতাউর রহমান ও আমার দস্তখত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ডাঃ খান সাহেবের দস্তখত লওয়া হইল। ৮ই জুলাই তারিখে নবাব

গুরমানী সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে 'এক সুসংবাদ' রূপে এই চুক্তিনামার কথা ঘোষণা করিলেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিলেন যে উভয় অঞ্চলের সন্তোষজনক রূপে এই চুক্তিনামা সম্পাদিত হইয়াছে।

৫. প্রধানমন্ত্রিত্বের সমঝোতা

এই চুক্তি সম্পাদন দেশের সর্বত্র একটা নূতন আশার সঞ্চার করিল বলিয়া আমি অনুভব করিলাম। যাঁদের সাথেই আমার আলাপ হইল তাঁদের সকলেই ঐ মতের বলিয়া মনে হইল। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস হইল যে বাস্তবিকপক্ষে এই দিন হইতেই পাকিস্তানের ভিত্তি স্থাপিত হইল। এই বিশ্বাসের আরেকটি কারণ ছিল এই যে, পাঁচ দফার বাস্তবায়নের একটা গ্যারান্টিও আমরা পাইয়াছিলাম। সে গ্যারান্টি ছিল এই যে পাঁচ দফার অতিরিক্ত একটি অলিখিত শর্ত ছিল শহীদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্ব। শহীদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্ব কোনও ব্যক্তিগত দাবি ছিল না। পাঁচ দফার রূপায়ণের জন্যই ছিল উহা অপরিহার্য। ঐ পাঁচ দফা ছিল পাকিস্তানী জাতীয়তার বুনিয়াদী মসলা। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে যে ঐ পাঁচটি দফাই পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি দাবি করিলেন পূর্ব-পাকিস্তান সংখ্যা গুরুত্বকে তাঁরা ভয় করেন বলিয়া। পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের মন হইতে ভয় দূর করিবার উদ্দেশ্যে যদি প্যারিটি মানিতে হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানীরা পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে মাইনরিটি না হইয়া যায় সে ভয়টা দূর করিবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বস্তুতঃ পৃথক নির্বাচনে হিন্দুদের আসন (পূর্ব-পাকিস্তানের কোটার এক-চতুর্থাংশ) পূর্ব-পাকিস্তানের কোটা হইতেই যাইবে। পৃথক-নির্বাচনে মুসলিম ভোটারদের কাছে হিন্দু প্রতিনিধিদের কোনও দায়িত্ব থাকিবে না। তারা পৃথক দল করিবে। সে অবস্থায় মুসলিম লীগ যদি আবার দেশ শাসনের ভার পায়, তবে সে পার্টিতে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম মেম্বরদের মোকাবিলায় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম মেম্বররা সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবেন। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা যাতে সাম্প্রদায়িক দলে বিভক্ত না হইয়া ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারে সেজন্য যুক্ত নির্বাচন অত্যাবশ্যক। দুইটি অঞ্চলের মধ্যে সাধারণ গণতন্ত্রের ব্যতিক্রমে যদি প্রতিনিধিত্বের ভার-সাম্য আনিতে হয়, তবে সেটা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে কেবলমাত্র দুইটি অঞ্চলকে লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক দুইটি 'অটনমাস ও সভারেন' স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা কল্পনা করিয়া। সেই অবস্থায় পাকিস্তান হইবে সত্যিকার ফেডারেল রাষ্ট্র। তা যদি হয় তবে ফেডারেশনের সকল ক্ষেত্রে ঃ চাকরি-বাকরিতে, শিল্প-বাণিজ্যে, কেন্দ্রীয়

ও বিদেশী সাহায্য বন্টনে, এবং দুই অঞ্চলে ভৌগোলিক দূরত্ব বিবেচনা করিয়া সৈন্যবাহিনীতেও, ভার-সাম্য আনিতে হইবে। পূর্ব-পাকিস্তানীরা যাতে পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভেদ-নীতি চালানোর সুযোগ না পায় সে জন্য ঐ সব প্রদেশ ভাংগিয়া পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় এক প্রদেশ করিতে হইবে। এটা যদি উচিৎ বিবেচিত হয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা যাতে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভেদ-নীতি চালানোর সুযোগ না পায় যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে সেটাও সুনিশ্চিত করিতে হইবে। তাছাড়া আরেক কারণে পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রীয় সত্ত্বা হইতে হইবে। পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি-মোতাবেক রেলওয়ে, ডাক ও তার, টেলিফোন, ব্রডকাস্টিং, সেচ এবং গ্যাস ও পানি বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি বড় বড় বিষয় আঞ্চলিক সরকারের হাতে দিতে হইবে। সে কারণেও পশ্চিম পাকিস্তানকে একটিমাত্র প্রদেশে রূপান্তরিত করা দরকার। বস্তুতঃ প্রধানতঃ এই যুক্তিতেই পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা পূর্ব-পাকিস্তানী নেতাদেরে এক ইউনিটের নীতি গ্রহণ করাইতে পারিয়াছিলেন। বাংলা ও উর্দুকে দুইটি সমমর্যাদায় রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা নিজেরা প্যারিটি দাবি করার পরে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

বস্তুতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের ছিল এটা নয়া এপ্রোচ্। শহীদ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পার্টি নীতি-হিসাবেই এটা গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে গণ-পরিষদের প্রথম বৈঠকেই এই নয়া-নীতি ঘোষণা করা হয়। শহীদ সাহেব তখন মন্ত্রিসভার মেম্বর ছিলেন বলিয়া নিজের মুখে এই নীতি ঘোষণা না করিয়া আমার মুখ দিয়া কওয়াইয়াছিলেন। আমার বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম ঃ 'পূর্ব-বাংলায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মনে করিতেন পশ্চিম পাকিস্তান চারটি প্রদেশে বিভক্ত থাকাই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূল। তাঁরা বিশ্বাস করিতেন, এই বিভেদের সুযোগ লইয়া পূর্ব পাকিস্তানীরা করাচি বসিয়াই গোটা পাকিস্তান শাসন করিবে। ঢাকায় স্বায়ত্তশাসন নিবার দরকার নাই। আমরা আওয়ামী লীগাররা এই নীতিতে বিশ্বাসী নই। আমরা চাই পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলি প্রদেশ ঐক্যবদ্ধ হইয়া পূর্ব-বাংলার সমান স্বায়ত্ত শাসিত হউক। সমান ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসিত দুইটি অঞ্চলের বুঝা-পড়া ও আদান-প্রদানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া উঠুক, এটাই আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শ।" সমবেত পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বররা তুমুল হর্ষ-ধ্বনি ও করতালিতে এই নীতিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে আদান-প্রদানের বেলা তাঁরাই 'বাংগালকে হাইকোর্ট' দেখাইয়াছিলেন।

৬. কৃষক-শ্রমিক পার্টির দলীয় সংকীর্ণতা

কিন্তু শহীদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিটা পূর্ব-পাকিস্তানের সকলের দাবি ছিল না। বরঞ্চ যুক্তফ্রন্টের অন্যতম প্রধান অংশ কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তার নেতা হক সাহেব শহীদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বের বিরোধীই ছিলেন। এর কোনও নীতিগত কারণ ছিল না। ব্যক্তিগতই ছিল বেশি। মাত্র পাঁচ-ছয় মাস আগে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ পার্টি যুক্তফ্রন্ট নেতা হক সাহেবের বিরুদ্ধে যখন অনাস্থা-প্রস্তাব দেয় এবং যার ফলে যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া যায়, সেই সময় আমি উভয় দলের কাছে একটি আপোস প্রস্তাব দিয়াছিলাম। সেটি ছিল এই ঃ যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক নেতা হক সাহেব এবং কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ সাহেব, এটা যুক্তফ্রন্ট পার্টি ফর্মাল প্রস্তাবাকারে মানিয়া নিতে হইবে। কৃষক-শ্রমিক পার্টির অনেকে এবং আওয়ামী লীগ পার্টির কেহ কেহ এই ফর্মুলা মানিয়া লইতে রাযী ছিলেন। কিন্তু শহীদ সাহেব স্বয়ং এই আপোসে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় সাপোর্ট না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই ফর্মুলা গৃহীত হয় নাই। ফলে যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া যায়। হক সাহেবের দল প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সাথে মিশিয়া তয়-তদবির করিয়া পূর্ব-বাংলার মন্ত্রিত্ব দখল করেন।

এই পরিবেশে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য শহীদ সাহেবকে কৃষক-শ্রমিক পার্টি সমর্থন করিবে, এটা আশা করা বাতুলতা। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীও এটা জানিতেন। তবু মোহাম্মদ আলীর, সম্ভবত ঃ, আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা আমাদের সাথে এই অলিখিত চুক্তি করিয়াছিলেন এবং আমরা তাঁদের ওয়াদায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার সাহেব গণ-পরিষদের মেম্বর না হইয়াও মারিতে হাযির হইলেন এবং মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রিত্ব বহাল রাখিবার চেষ্টা-তদবির করিলেন। আবু হোসেন সরকার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজনৈতিক বর্তমান মতভেদ আমাদের সে বন্ধুত্ব নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁর সাথে দেখা করিলাম। অনেক তর্ক-বিতর্ক করিলাম। বোঝা গেল, তিনি হক সাহেবের নির্দেশেই মোহাম্মদ আলীর সমর্থন তথা শহীদ সাহেবের বিরোধিতা করিতেছেন। পূর্ব-বাংলার গণ-প্রতিনিধি ঐতিহাসিক নির্বাচন বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের দুই অংশ আজ ক্ষমতা দখলের আশায় পরাজিত কেন্দ্রীয় সরকারেই দুইটি মুরুব্বি ধরিয়াছি ঃ তাঁরা ধরিয়াছেন মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলীকে ; আমরা ধরিয়াছি সরকারী কর্মচারি বড়লাট গোলাম মোহাম্মদকে। অদৃষ্টের কি পরিহাস। উভয় বন্ধুই দুঃখের হাসি হাসিলাম। কিন্তু তখন বুঝি নাই, পরে বুঝিয়াছিলাম, বন্ধুবর ঐ দুঃখের হাসির নিচে একটি মিচ্‌কি হাসিও হাসিয়াছিলেন। তার কারণ ছিল। প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব দখলের বেলা আমাদের মুরুব্বি ফাঁকি দিয়াছিলেন।

তাঁদের মুরুব্বির কথা ঠিক রাখিয়াছিলেন। কেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রিত্বের বেলাও আমাদের মুরুব্বি আবার ফাঁকি দিতে পারেন, বন্ধুবরের মিচ্‌কি হাসির তাই ছিল তাৎপর্য।

আমার নিজের এবং আমাদের দলের আরও দুই–একজনের সে আশংকা ছিল। কিন্তু শহীদ সাহেব আমাদের সন্দেহকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতেন। প্রচলিত কনভেনশন অনুসারে এবার প্রধানমন্ত্রীকে পূর্ব–পাকিস্তানী হইতেই হইবে। কারণ বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ পশ্চিম পাকিস্তানী। সে হিসাবে ভূতপূর্ব যুক্তফ্রন্ট অর্থাৎ আওয়ামী লীগ বা কে. এস. পি.–র একজনকে প্রধানমন্ত্রী করিতেই হবে। পূর্ব–সমঝোতা মতে এবং হক সাহেব প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রার্থী না থাকায় সকলেই ধরিয়া লইলেন শহীদ সাহেবই একমাত্র প্রার্থী এবং যোগ্যতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ অবস্থায় কে. এস. পি–র কেউ–কেউ বিশেষতঃ বন্ধুবর আবু হোসেন তলে–তলে বগুড়ার প্রধানমন্ত্রিত্ব বহাল রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, এ গুজবে আমাদের অনেকেই বিশেষ আমল দিলেন না। কারণ কৃষক–শ্রমিক সদস্যরা মুসলিম লীগারকে প্রধানমন্ত্রী করিবেন, এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু পর–পর দুইটা আকস্মিক ঘটনায় বা ঘোষণায় আমরা আওয়ামীরা নিরাশ হইলাম ; কোনও কোনও কে. এস. পি. নেতা দাঁত বাহির করিলেন ; মুসলিম লীগ–নেতারা আস্তিনের নিচে মুচ্‌কি হাসিলেন। ঘটনা বা ঘোষণা দুইটি এই ঃ জনাব গুরমানী আমাদেরে জানাইলেন, ঘোরতর অসুস্থতা হেতু গবর্নর–জেনারেল করাচি হইতে নড়িতে পারেন না। কাজেই তাঁর মারি আসা ও মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন উভয়টাই স্থগিত। পররাষ্ট্র–মন্ত্রী ইস্কান্দর মির্যা আমাদেরে একটা টেলিগ্রাম দেখাইয়া বলিলেন, আফগানিস্তান আমাদের সীমান্তে বিপুল সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করিয়াছে। সম্ভবতঃ আমাদের সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই এটা মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের জন্য মোনাসেব সময় নয়।

রুটিন কাজ শেষ করিয়া গণ–পরিষদ ১২ই জুলাই মুলতুবি হইয়া গেল। ৮ই আগস্ট করাচিতে পরবর্তী অধিবেশন হওয়া স্থির হইল। আমরা কতিপয় বন্ধু মারি হইতে আযাদ কাশ্মির সরকারের রাজধানী মোযাফফরাবাদ গেলাম। যুদ্ধ–বিরতি সীমারেখা পর্যন্ত ভ্রমণ করিলাম। পাকিস্তান সরকারের কাশ্মির দফতরের সেক্রেটারি মিঃ আযফার সি. এস. পি. ও আযাদ কাশ্মির সরকারের চিফ সেক্রেটারি মিঃ আযিযুল্লা হাসান সি. এস. পি. আমাদের সংগে–সংগে থাকিয়া সকল প্রকার সুখ–সুবিধার ব্যবস্থা করিলেন। আযাদ কাশ্মির হইতে ফিরিবার পথে আমি ও বন্ধুবর আতাউর রহমান এবোটাবাদে কাশ্মিরী নেতা জনাব চৌধুরী গোলাম আব্বাসের সংগে সাক্ষাৎ ও অনেকক্ষণ আলাপ–আলোচনা করিলাম। তথা হইতে রাওলপিণ্ডি ও লাহোর ঘুরিয়া আমরা ১৭ জুলাই তারিখে ঢাকা ফিরিয়া আসিলাম।

একইশা অধ্যায়

আত্মঘাতী ওয়াদা খেলাফ

১. আওয়ামী লীগের বিপর্যয়

৫ই আগস্ট তারিখে পূর্ব-বাংলা আইন পরিষদের স্পিকার-ডিপুটি স্পিকার নির্বাচন হইবে, এটা আগেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। আমি আগের দিন ৪ঠা আগস্ট তারিখে ঢাকা পৌছিলাম। ঐদিনই খবরের কাগযে পড়িলাম, সুহরাওয়ার্দী সাহেব ১০ই আগস্ট তারিখে করাচিতে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। সুহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে অধিকতর নিঃসন্দেহ হইলাম। ধরিয়া লইলাম প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন লাভের জন্যই এই সভা ডাকা।

স্পিকার-ডিপুটি-স্পিকার নির্বাচনে আমরা হারিয়া গেলাম। সরকার পক্ষ পাইলেন ১৭০-১৭৭ ভোট, আর আওয়ামী লীগ পাইল ৯২-৯৯ ভোট। আমি এতে নিরাশ হইলাম না। কারণ মন্ত্রিত্ব লাভে অসমর্থ হওয়ার পর আইন-পরিষদে মেজরিটি করার আশা সহজ ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র মুসলিম-ভোটে গণ-পরিষদের নির্বাচনেই দেখা গিয়াছিল মুসলিম মেম্বরদের মধ্যেও আওয়ামী লীগ মেজরিটি নয়। তার উপর স্পিকার-ডিপুটি-স্পিকার নির্বাচনে হিন্দু মেম্বররা হক সাহেবের দলের পক্ষে ভোট দিবেন, এটা জানাই ছিল। এর একাধিক কারণও ছিল। আমাদের দেশে পার্টি-আনুগত্য এখনও দানা বাঁধে নাই। তাছাড়া সরকারী দলে থাকিলে নিজ-নিজ নির্বাচনী এলাকার জন্য বেশি কাজ করা যায়, এটাও বাস্তব সত্য। কাজেই প্রাদেশিক আইন-পরিষদের এই পরাজয় মানিয়াই লইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাদেশিক পরিষদের এই পরাজয় কেন্দ্রেও (গণ-পরিষদে) আমাদের পরাজয়ের পূর্বাভাস না হয়, এই প্রার্থনা করিতে-করিতে আমরা পরদিনই করাচি রওয়ানা হইলাম। কিন্তু করাচি রওয়ানার আগেই আর একটি খবর পাইলাম। সেটি এই যে অসুস্থতা-হেতু বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ ছুটি নিয়াছেন; তাঁর জায়গায় ইস্কান্দর মির্যা অস্থায়ী বড়লাট হইয়াছেন। সংবাদটিকে আমি শুভ মনে করিলাম না। কারণ আমাদের নেতা সুহরাওয়ার্দীর সাথে যা-কিছু ওয়াদা-সওগন্দ ও কিরা-কুরুক করিয়াছেন সবই গোলাম মোহাম্মদ সাহেব ; মির্যা সাহেব তেমন কোনও ওয়াদায় বাধ্য নন। নিজের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি হইতে গলা ফসকাইবার

মতলবেই গোলাম মোহাম্মদ অসুস্থতার অজুহাতে সাময়িকভাবে গা-ঢাকা দিলেন কি না, তাই বা কে জানে?

করাচি গিয়াই পড়িলাম একদম তোপের মুখে। গিয়া দেখিলাম মুসলিম লীগ পার্টির লিডার নির্বাচনে বিষম প্রতিযোগিতা ও তদুপযোগী প্রচারণা চলিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মধ্যে। বগুড়া যদি লিডার নির্বাচিত হন, তবে মেজরিটি পার্টি-লিডার হিসাবে তিনিই প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া যান। কারণ তিনি বাংগালী। পক্ষান্তরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যদি লিডার নির্বাচিত হন, তবে যেহেতু তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী, সেই হেতু তিনি প্রধানমন্ত্রী হইবেন না, তিনি সুহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করিবার সুপারিশ করিবেন। এ অবস্থায় বগুড়ার বদলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর লিডার নির্বাচিত হওয়াই আমাদের স্বার্থের অনুকূল। কাজেই আমরা অর্থাৎ জনাব আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান ও আমি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর পক্ষে ক্যানভাসে লাগিয়া গেলাম। আসলে ক্যানভাস করিবার কিছুই আমাদের ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানের কোনও মেম্বরই মুসলিম লীগে ছিলেন না। মুসলিম লীগ পার্টির সব কয়জন মেম্বরই পশ্চিম পাকিস্তানী। তাঁদের কারও উপর আমাদের কোনও প্রভাব ছিল না। কাজেই আমাদের ক্যানভাসের কানাকড়ি মূল্য ছিল না। সেকথা আমরা সরলভাবে স্বীকার করিলাম চৌধুরী মোহাম্মদ আলীসহ মুসলিম লীগ বন্ধুদের কাছে। তবু তাঁরা আমাদেরে রেহাই দিলেন না। যুক্তি দিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলিম লীগারদের উপর আমাদের কোনও প্রভাব না থাকিলেও পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী নেতাদের ত আছে। তাঁদের মারফতেই আমাদের কাজ করা উচিত। কতকটা এই যুক্তিতে এবং কতকটা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে খুশী রাখিবার জন্য আমরা ক্যানভাসে নামিয়া পড়িলাম। কে. এস. পি. নেতাদের কেউ-কেউ আমাদের এই অবাংগালী-প্রীতির কঠোর নিন্দা করিলেন। বাংগালী বগুড়ার নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রিত্ব খসাইবার মত অশুভ ও অন্যায় কাজ করিয়া পূর্ব-বাংলার স্বার্থ-বিরোধী কাজ করিতেছি বলিয়াও শুধু মুসলিম লীগাররা নয়, অনেক কে. এস. পি. নেতাও আমাদের কাজের প্রতিবাদ করিলেন। আমরা তাঁদের বিরূপ সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া চলিলাম। আমাদের যুক্তি সোজা। মুসলিম লীগ পার্টির নেতা বাংগালী বগুড়া হইলে তিনিই প্রধানমন্ত্রী হইবেন। আর অবাংগালী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী হইলে চুক্তি ও প্রথা-মত শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হইবেন।

২. বিশ্বাস ভংগ

পরদিন ৭ই আগস্ট। বিকালেই মুসলিম লীগ পার্টির লিডার নির্বাচন। অসহ্য আগ্রহাতিশয্যে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। ন্যাশনাল এসেমব্লি বিল্ডিং -এ গিয়া লাইব্রেরির বই-পুস্তক ঘাটিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। বস্তুতঃ ন্যাশনাল এসেমব্লির লাইব্রেরিটি দেখিয়া আমি প্রথম দিনেই এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে পরবর্তীকালে করাচি থাকাকালে অধিকাংশ সময় আমি এই লাইব্রেরিতে কাটাইতাম। যা হউক, লাইব্রেরিতে বসিয়া খবর পাইলাম, মুসলিম লীগ পার্টির সভা হইয়া গিয়াছে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী লিডার নির্বাচিত হইয়াছেন। এর অর্থ শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হইয়া গিয়াছেন। কাজেই আমার আনন্দ আর ধরে না। শহীদ সাহেবকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য ছুটিয়া লাইব্রেরি হইতে বাহির হইলাম। শহীদ সাহেব তখনও আইনমন্ত্রী। তাঁর বসিবার ঘর আমার জানা। ওটা এসেমব্লি বিল্ডিং-এর দক্ষিণ অংশে। লাইব্রেরিটা বিল্ডিং-এর উত্তর-পূর্ব অংশে। কাজেই বিল্ডিং-এর পূর্ব দিককার দীর্ঘ বারান্দার সবটুকু মাড়াইয়া আমাকে শহীদ সাহেবের কামরায় যাইতে হইবে। সিঁড়িঘর পার হইয়া খানিকদূর আসিতেই খোদ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবের সাথে দেখা। হাসিমুখে সালামালেকুম দিয়াই বলিলাম ঃ 'কংগ্রেচুলেশন্স্'। চৌধুরী সাহেবও হাসিমুখে বলিলেন ঃ 'ওয়ালেকুম সালাম ঃ মেনি থ্যাংক্স'। বলিয়া অতিরিক্ত নুইয়া সালামের জবাব দিলেন ও মুসাফেহা করিলেন। আর কোনও কথা না বলিয়া ব্যস্ততার সংগে সামনের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমিও শহীদ সাহেবের তালাশে আগ বাড়িলাম। দেখিলাম, তিনি অপর দিক হইতে আসিতেছেন। মুখ-ভরা হাসি লইয়া দূর হইতেই দরায গলায় বলিলাম ঃ শুনছেন ত? চৌধুরী মোহাম্মদ আলী লিডার ইলেকটেড হৈয়া গেছেন।

শহীদ সাহেব কোনও ভাবান্তর না দেখাইয়া সহজভাবে বলিলেন ঃ

হ্যাঁ শুনেছি।

গতি না থামাইয়া আমার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

আমি বলিলামঃ এইমাত্র চৌধুরী সাহেবের সাথে আমার দেখা হইছে।

শহীদ সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ এরই মধ্যে? বেশ তারপর?

আমি ঃ তারপর আমি তাঁকে কংগ্রেচুলেট করলাম ।

শহীদ সাহেব ঃ বেশ করেছ। কিন্তু তিনিও কি তোমাকে কংগ্রেচুলেট করলেন?

'একথার অর্থ কি? তিনি আমাকে কংগ্রেচুলেট করবেন কেন?' —আমি বলিলাম।

শহীদ সাহেব গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন : তবে তিনি তোমাকে কংগ্রেচুলেট করেন নাই? অশুভ লক্ষণ।

আমি : এতে আপনি অশুভ কি দেখলেন?

শহীদ সাহেব : বোকারাম! কিছুই বুঝতেছ না? তাঁর ওয়াদা রক্ষার ইচ্ছা থাকলে তিনি তোমাকেই কংগ্রেচুলেট করতেন।

এতক্ষণে শহীদ সাহেবের কথার তাৎপর্য বুঝিলাম। কিন্তু তাঁর এই সন্দেহকে আমি অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলাম।

বাসায় ফিরিলাম।

গরমের দিন। লম্বা বিকাল। তবু বিকালের চা খাইতে প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। এমন সময় খবর পাইলাম : বগুড়া প্রধান মন্ত্রিত্বে পদত্যাগ করিয়াছেন। নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য শহীদ সাহেব কমিশন পাইয়াছেন। লন্ডনের বি.বি.সি. হইতে এই ঘোষণা করা হইয়াছে। পাকিস্তান রেডিও হইতে না হইয়া বি.বি.সি. হইতে ঘোষণা? হইতে পারে। আমরা এখনও বৃটিশ ডমিনিয়ন ত।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তবে নিজের ওয়াদা রক্ষা করিয়াছেন। শুকর আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ চৌধুরী সাহেবকে। এমন ধার্মিক সত্যবাদী লোকটির প্রতি কি অন্যায় সন্দেহই না করিতেছিলাম! আমরা সবাই ছুটিলাম ক্লিফটনে শহীদ সাহেবের বাড়িতে। গিয়া দেখি এলাহি কারবার! কি ভিড়! সিঁড়িতে পর্যন্ত লোক ভর্তি। হইবে না ভিড়! প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ত।

অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া উপরে উঠিলাম। ভিতরে গেলাম। কামরা ভর্তি লোক। সাহেবের সাথে দেখা হইল। দেখা হইল মানে আমরা তাঁকে দেখিলাম। তিনি আমাদেরে দেখিলেন কিনা সেটা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু আমরা ধরিয়া নিলাম তিনি আমাদিগকে দেখিয়াছেন। লিডারের বেলা অধিকাংশ সময়ই অমন ধরিয়াই নিতে হইত। তাই আমরা গুজবের কথা বলিলাম। কমিশন আসিয়াছে কিনা জিগ্‌গাস করিলাম। উপস্থিত সকলেই প্রায় সমস্বরেই বলিলেন : ওটা গুজব নয়, সত্য। অনেকেই নিজ কানে বি.বি.সি. শুনিয়াছেন বলিলেন। কমিশন আসিল বলিয়া। সব ঠিক আছে। স্বয়ং বড়লাটের বাড়ির খবর। টাইপ-টুইপ হইতে একটু সময় কি আর লাগে না? শহীদ সাহেব মৃদু হাসিয়া বুঝাইলেন বক্তাদের কথা সত্য। কম্পিত বুকে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।অনেকে আসিলেন ; তার মধ্যে অফিসার চেহারার লোকও ছিলেন অনেক।

তাঁরা সবাই আসিলেন শহীদ সাহেবকে কংগ্রেচুলেট করিতে। বড়লাটের কমিশন লইয়া কেউ আসিলেন না। ইতিমধ্যে ঘন-ঘন যরুরী টেলিফোন আসিতে লাগিল। টেলিফোন হাতে নিয়াই কয়েকবারই শহীদ সাহেব আমাদের সবাইকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। গোপনীয় কথা। হইবে না গোপনীয়? সম্ভবত বড়লাটের সাথেই প্রধানমন্ত্রীর কথা। প্রতিবারই বেশ অনেক্ষণ কথা বলার পর আমাদেরে ভিতরে ডাকিলেন। ইতিমধ্যে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও তাঁর সংগে দেখা করিয়া গেলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কি কথা হইল আমরা জানিলাম না। সন্ধ্যার পর শহীদ সাহেব, আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান ও আমি এই তিনজনকে তাঁর গাড়িতে লইয়া বাহির হইলেন। সোজা গিয়া হাযির হইলেন অস্থায়ী বড়লাট ইস্কান্দর মির্যার বাড়িতে।

৩. ষড়যন্ত্র

মির্যা সাহেব বড়লাট হইয়াছেন বটে কিন্তু তখনও বড়লাট ভবনে উঠিয়া যান নাই। ভিক্টোরিরা রোডের অদূরে যে বাড়িতে তিনি আগে হইতে থাকিতেন সেখানেই রহিয়াছেন। বোঝা গেল, টেলিফোনে কথা হইয়াই ছিল। কারণ দেখিলাম মির্যা সাহেব দরজায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শহীদ সাহেব ভিতরে গেলেন না। আমরা থ্রি মাস্কিটিয়ার্সকে মির্যার হাতে সমর্পণ করিয়া তিনি খানিক পরে আসিতেছেন বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মির্যা সাহেব আমাদেরে লইয়া ড্রইংরুমে ঢুকিলেন। আলোচনা তিনি একতরফা ভাবেই শুরু করিলেন। তিনি যা বলিলেন তার সারমর্ম এই যে শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করার ইচ্ছা তাঁর নিজের এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সকলেরই আছে। কিন্তু আমরা নিজেরাই শহীদ সাহেবের কেসটা খারাপ করিতেছি কড়া-কড়া শর্ত দাবি করিয়া। আমরা যদি একটু নরম না হই, তবে শহীদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। আমরা জবাবে বলিলাম যে নূতন কোনও শর্ত-টর্ত ত আমরা দেই নাই ; মারিতে যে পাঁচদফা চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাতেই ত আমরা অটল আছি। মির্যা সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন ঃ মারি চুক্তির চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতেছি। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলিলেন যে তফসিলী হিন্দু নেতারা তাঁর সাথে দেখা করিয়া বলিয়াছেন যে আওয়ামী লীগ নাকি তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্যও রিযার্ভেশন দিতে রাযী না। এটা নাকি তাঁদের সংগে চুক্তির খেলাফ। বর্ণহিন্দু নেতাদের অনেকে মির্যা সাহেবের সাথে দেখা করিয়া নাকি তফসিলীদের এই দাবি সমর্থন করিয়াছেন। মির্যা সাহেব আরও বলিলেন যে আমরা প্যারিটির ব্যাপার নিয়া বাড়াবাড়ি করিতেছি।

আমরা তিনজনেই মির্যা সাহেবের এইসব কথা অস্বীকার করিলাম। প্রমাণ স্বরূপ মারি–চুক্তি–পত্র দেখিতে তাঁকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ 'হাতে পাঁজি মংগল বারের' দরকার কি? তাঁর কাছে ঐ চুক্তিনামার এক কপি আছে। এখনই তা দেখা যাইতে পারে। মির্যা সাহেব ঘন্টা বাজাইয়া তাঁর সেক্রেটারিকে মারি–চুক্তি –নামা আনিতে বলিলেন। সেক্রেটারি সাহেব অল্পক্ষণেই এক টুকরা টাইপ–করা কাগয হাযির করিলেন।

একটা দস্তখতহীন কাগযের টুকরা। আমাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়াই মির্যা সাহেব বলিলেন ঃ ওটা অবশ্য অরিজিনাল নয়, ট্রু কপি। আমরা তিন বন্ধুতে এক সংগে ঝুকিয়া পড়িয়া কাগযটি পড়িয়া ফেলিলাম। কাগযটিতে পাঁচ–দফা এইভাবে ইংরাজীতে লেখা আছে ঃ

(১) ওয়ান ইউনিট

(২) রিজিওন্যাল অটনমি

(৩) প্যারিটি ইন রিপ্রেযেন্টেশন

(৪) জয়েন্ট ইলেকটরেট উইথ রিযার্ভেশন ফর শিডিউলড কাস্ট্ হিন্দুয ফর টেন ইয়ার্স

(৫) টু স্টেট ল্যাংগুয়েজেয—উর্দূ এণ্ড বেংগলি।

আমরা অবাক হইলাম। প্রতিবাদ করিলাম। এটা মারি–চুক্তির ট্রু কপি নয়, বলিলাম। দুই নম্বর দফায় 'রিজিওন্যাল অটনমির ' আগে 'ফুল' কথা ছিল, সেটা বাদ দেওয়া হইয়াছে। তিন নম্বর দফায় প্যারিটির পরে ''ইন অল রেস্পেক্টসের" স্থলে "ইন রিপ্রেযেন্টেশন" লেখা হইয়াছে। চার নম্বর দফায় 'উইথ রিযার্ভেশন ইত্যাদি' কথা নূতন যোগ করা হইয়াছে।

এইসব পরিবর্তন কে করিল? কবে করিল? স্বাক্ষরিত চুক্তি–নামায় কোনও পরিবর্তন করার অধিকার কারও নাই। আমরা অরিজিনাল চুক্তি–নামা দেখিতে এবং দেখাইতে বড়লাটকে অনুরোধ করিলাম। খুব জোরের সংগেই বলিলাম, দুরভিসন্ধিমূলে কেহ বড়লাটকে ঐ বিকৃত নকল দিয়াছেন।

বড়লাট মির্যা সাহেব উক্ত নকলের খাটিত্ব লইয়া আমাদের সাথে তর্ক করিলেন না। বরঞ্চ তিনি প্রথমে তফসিলী হিন্দুদের জন্য রিযার্ভেশনের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তৃতা করিলেন। দশ বছর নাই হোক, অন্ততঃ পাঁচ বছর দিতে আমাদের আপত্তি করা উচিৎ নয়, এই উপদেশ আমাদেরে দিলেন। আমরা মির্যা সাহেবের মূল্যবান বক্তৃতার সারমর্ম হযম করিতে–করিতে বিদায় হইলাম। কারণ ইতিমধ্যে শহীদ সাহেব স্বয়ং

আমাদেরে নিতে আসিলেন। আমরা তিন বন্ধুই মির্যার কথা একই রকম বুঝিলাম। তা এই যে (১) মির্যাসাহেব এবং সম্ভবতঃ মুসলিম লীগ-নেতারা কংগ্রেস ও তফসিলী হিন্দুদের সাথে একটা পৃথক সমঝোতার চেষ্টা করিতেছেন বা করিয়া ফেলিয়াছেন ; (২) মুসলিম লীগ নেতারা শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করার ওয়াদা হইতে গলা ফসকাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন।

বড়লাটের নিকট হইতে ফিরিবার পথেই গাড়িতে শহীদ সাহেবকে সব কথা বলিলাম এবং আমাদের আশংকার কথাও তাঁকে জানাইলাম। সব শুনিয়া শহীদ সাহেব বলিলেনঃ কোনও চিন্তার কারণ নাই। সব ঠিক আছে। হয়ত আগামীকালই একটা সুখবর পাইবে।'

আমরা আশা-নিরাশার মধ্যে রাত কাটাইলাম বটে, কিন্তু পরদিন ৮ই আগস্ট সত্যই সুখবর পাইলাম। মুসলিম লীগ পার্টির তরফ হইতে একটা ঘোষণা খবরের কাগযে বাহির হইয়াছে। তাতে বলা হইয়াছে, মুসলিম লীগের বৈঠকে মুসলিম লীগ-আওয়ামী লীগ কোয়েলিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। শহীদ সাহেবকে কোয়েলিশনের নেতা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে শহীদ সাহেব তাঁর মন্ত্রিসভার নামের তালিকাও প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। পরদিনই শপথ-গ্রহণ কার্যসম্পন্ন হইবে।

বুঝিলাম আমাদের সন্দেহ অমূলক। শহীদ সাহেবের কথাই ঠিক। যতই হউক, তিনি আমাদের চেয়ে বেশি খবর রাখেন ত। ঐ সংবাদটির সংগে-সংগে আরেকটি খবরও ঐদিনকার কাগযে বাহির হইয়াছে। তাতে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগ পার্টি চৌধুরী সাহেবকেই মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমতা দিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। আমরা চৌধুরী সাহেবের ঘোষণা ভাল অর্থেই গ্রহণ করিলাম। মুসলিম লীগ পার্টি তাদের লিডারকে মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমতা ত দিবেই। সেই ক্ষমতা-বলেই ত তিনি শহীদ সাহেবেকে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুরোধ করিবেন এবং শহীদ সাহেবকে কমিশন করিবার জন্য বড়লাটকে সুপারিশ তিনিই করিবেন। পার্লামেন্টারি পদ্ধতি অনুসারে বড়লাটের উপর মেজরিটি পার্টির লিডারের সে সুপারিশ বাধ্যকর হইবে।

সেদিন ৮ই আগস্ট ছিল গণ-পরিষদের বৈঠক শুরু হওয়ার কথা। আমরা সে বৈঠকে গেলাম। জনাব গুরমানীর সভাপতিত্বে পরিষদের বৈঠক বসিল। কিন্তু তখনও মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়ায় গণ-পরিষদের কাজ হইতে পারিল না। পরবর্তী ১২ই আগস্ট তারিখে স্পিকার-ডিপুটি-স্পিকার নির্বাচন হইবে ঘোষণা করিয়া ঐ তারিখ পর্যন্ত পরিষদের বৈঠক মুলতবি হইল। গণ-পরিষদ মুলতবি হওয়ায় মন্ত্রিসভা লইয়া

জল্পনা করা ছাড়া আমাদের আর কাজ থাকিল না। এমন অবসর পাইলে আমি সাধারণতঃ সিনেমা দেখিয়াই সময় কাটাইতাম। কিন্তু আজ ত সিনেমা দেখা যায় না। আজ আমাদের নেতা শহীদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে পাঁচ-দফা চুক্তির সাফল্যে পূর্ব-বাংলার ভাগ্য তথা সারা পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে সরল আন্তরিকতার সংগেই তখন এ কথা বিশ্বাস করিতাম। কাজেই এতবড় গুরুতর দায়িত্ব ফেলিয়া সিনেমা দেখা ত যায় না। দেশের জন্য সিনেমা দেখা স্যাক্রিফাইস করিলাম।

কিন্তু সারাদিনটা অমনি-অমনি গেল। কিছুই ঘটিল না। শহীদ সাহেব কমিশন পাইলেন না। পরদিন ৯ই আগস্টও কমিশন আসিল না। লাভের মধ্যে খবর পাইলাম যে মুসলিম লীগ নেতারা কে.এস.পি. ও তফসিলী সহ কতিপয় হিন্দু নেতার সাথে দেন-দরবার চালাইয়াছেন। এমনও খবর পাইলাম যে ১৩ জন কে.এস.পি. ও ৫ জন হিন্দু মেম্বর বিনা-শর্তে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রিত্ব মানিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কে.এস.পি-র বন্ধুদের সংগে সাক্ষাৎ করিয়া কথাটার সত্যতা যাচাই করিবার চেষ্টা করিলাম। তাঁরা যদিও এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করিলেন, তবু আমরা তাঁদের কাছে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলাম : 'যদি শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী মানিতে আপনাদের আপত্তি থাকে, তবে হক সাহেবকেই প্রধানমন্ত্রী করুন, আমরা আওয়ামী লীগ তা মানিয়া লইব। তবু পূর্ব-বাংলার প্রতিনিধিদেরে দুই ভাগ হইতে দিব না।' আমাদের কথা দুই-চার জন কে.এস.পি. নেতা উৎসাহের সংগে গ্রহণ করিলেন এবং পার্টিতে আলোচনা করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। এঁরা পরে দুঃখের সংগে জানাইলেন যে ব্যাপার অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এখন আর পিছাইবার উপায় নাই।

সারাদিনই শহীদ সাহেবের বাসায় যাতায়াত করিয়া কাটাইলাম। জানিতে পারিলাম, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ঐদিন একাধিকবার শহীদ সাহেবের সহিত মোলাকাত করিয়া তাঁকে ডিপুটি-প্রধানমন্ত্রিত্ব অফার করিয়াছেন। নামে মাত্র চৌধুরী সাহেব প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। আসলে ডিপুটি-প্রধানমন্ত্রী শহীদ সাহেবই প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। এই ধরনের কথা চৌধুরী সাহেব তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ মিষ্ট ও বিনয়-নম্র ভাষায় বলিয়া প্রস্তাবটিকে লোভনীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শহীদ সাহেব নিজে এবং আমরা সকলে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম।

সন্ধ্যার দিকে শহীদ সাহেব তাঁর 'থ্রি মাস্কিটিয়ার্স' আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান ও আমাকে এক কোণে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন : তোমরা এক্ষুণি পাঞ্জাব হাউসে গুরমানী সাহেবের সংগে দেখা কর।'

আমরা তখন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের প্রতি আস্থা হারাইয়াছি। কাজেই বলিলাম : 'গুরমানী সাহেবের সাথে দেখা করিয়া কোনও লাভ আছে?'

শহীদ সাহেব বলিলেন : 'লাভ-লোকসানের কথা নয়। গুরমানী সাহেব তোমাদের তিন জনের নাম করিয়াই তাঁর সাথে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তোমাদেরে পাঠাইব বলিয়া আমি ওয়াদা করিয়াছি।'

৪. আশা কুহকিনী

নেতার ওয়াদা রক্ষার জন্য কতকটা, আর মানুষের আশার শেষ নাই বলিয়াও কতকটা, আমরা গুরমানী সাহেবের সাথে দেখা করিতে পাঞ্জাব হাউসে গেলাম। শহীদ সাহেবের গাড়িতেই গেলাম। লোকজন আমাদের জন্য সিঁড়িতেই দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। বোঝা গেল, আমাদের পাঠাইয়া শহীদ সাহেব গুরমানী সাহেবকে ফোন করিয়া দিয়াছেন। লোকজনের মধ্যে অফিসার-গোছের একজন আমাদের পথ দেখাইয়া গুরমানী সাহেবের ড্রইংরুমে নিয়া গেলেন। ঢুকিয়াই দেখিলাম একদম 'হাউস ফুল।' এক চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশের নেতারা সেখানে জমায়েত হইয়াছেন। জনাব গুরমানী ছাড়া দওলতানা, চুন্দ্রিগড়, দস্তী, খুরো, রাশদী, তালপুর ও হারুনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সকলে উঠিয়া অতিরিক্ত তাযিমের সাথে আমাদেরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা না বসা পর্যন্ত কেউ বসিলেন না। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! আমরা তিন বন্ধুতে চাওয়া-চাওয়ি করিলাম। সব ফতেহ! কোনও আশা নাই।

গুরমানী সাহেবই প্রথমে কথা বলিলেন। তিনি প্রথমে আমাদেরে জানাইলেন যে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী একটা যরুরী কাজে আটকিয়া যাওয়ায় তাঁর আসিতে একটু দেরি হইবে। ইতিমধ্যে আমাদের আলোচনা চলিতে থাকুক। আলোচনার বিষয় কি আমরা জানিতাম না বলিয়া আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। গুরমানী সাহেব তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ মিঠা যবানে ডিপ্লম্যাটিক ল্যাংগুয়েজে অনেক আকাশ-পাতাল ভ্রমণ করিয়া যা বলিলেন তার সারমর্ম এই : শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিবার পথে বিপুল বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। সেসব বাধার মধ্যে মাত্র দুইটির কথাই তিনি বলিতেছেন। প্রথমতঃ

আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টি নয়। তবু তাঁরা প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং তার সাথে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সর্ব-বিষয়ে প্যারিটি দাবি করিতেছেন। নিরঙ্কুশ যুক্ত-নির্বাচন দাবি করার দরুন হিন্দু সদস্যরাও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করিতেছেন না। পক্ষান্তরে হক সাহেবের যুক্তফ্রন্ট পার্টি পূর্ব-পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টি হইয়াও প্রধানমন্ত্রিত্ব দাবি করিতেছে না। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রী করিতে রাযী আছেন। প্যারিটি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে তাঁদের কোন দাবি নাই। এর উপর হিন্দু মেম্বররাও হক সাহেবের পার্টিকেই সমর্থন করিতেছেন। এ অবস্থায় শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিতে মুসলিম লীগ পার্টিকে আর কিছুতেই রাযী করান যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ শহীদ সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম বিশিষ্ট ও সম্মানিত মুসলিম লীগ নেতা জনাব খুরোর বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়া অবস্থা এমন তিক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে গুরমানী সাহেব সহ উপস্থিত সকল নেতার সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ পার্টি মেম্বরগণকে শহীদ সাহেবের প্রতি নরম করা যাইতেছে না। সেজন্য গুরমানী সাহেব সহ উপস্থিত সকল লীগ-নেতাই খুব দুঃখিত। শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিবার যে ওয়াদা তাঁরা করিয়াছিলেন, সে ওয়াদা রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁরা নিরতিশয় লজ্জিত।

বলিলেন বটে লজ্জিত কিন্তু কারও মুখে লজ্জার কোনও লক্ষণ দেখিলাম না। তাছাড়া নবাব গুরমানী সাহেবের মেহমানদারিও নবাবের মতই। তাঁর একতরফা মিষ্টি বক্তৃতার সাথে-সাথে আমাদের মধ্যে প্রচুর মিষ্টিকেক-পেটিস ও চা-কফি বিতরণ করা হইতেছিল। উপস্থিত সকলে সে সব গলাধঃকরণে ব্যস্ত থাকায় তাঁদের চোখে-মুখে লজ্জার ভাব থাকিলেও তা ধরা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে গুরমানী সাহেবের মিঠা বক্তৃতায় আমরা এমন আসুদা হইয়া গিয়াছিলাম যে তাঁর চা-বিস্কুটের মিষ্টতা আমাদের তেমন মুখরোচক হইল না। আমরা গুরমানী সাহেবের এই ভদ্রতার জন্য তাঁকে হাজার হাজার ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম।

৫. চৌধুরী মন্ত্রিসভা

পরদিন ১০ই আগস্ট চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিলেন। যুক্তফ্রন্ট নামে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, কংগ্রেস ও তফসিলী সকলেই মন্ত্রিত্ব লইয়া সে মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। স্বয়ং হক সাহেব চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর অধীনে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হইলেন। আওয়ামী লীগার ও কে.এস.পি-রা একই সোমারসেট হাউসে অথবা নিকটবর্তী বেলুচ মেসে থাকিতাম বলিয়া আগের রাত্রেও

কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে পাঁচ-দফা চুক্তি আদায়ে আমাদের সহযোগিতা অফার করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁরা তখন মন্ত্রিত্ব লইয়াই ব্যস্ত। আমাদের কথাকে তাঁরা বোধ হয় ভাংগানির মতলব মনে করিলেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র হামিদুল হক চৌধুরী ও মোহন মিয়া সাহেবই আমাদের প্রস্তাবের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিলেন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তাঁদের উপদেশও অগ্রাহ্য করিয়া হক সাহেব যখন পরদিন বিনাশর্তে নিজের মর্যাদা হানিকর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন তখন মোহন মিয়া দুঃখিত হইলেন এবং হামিদুল হক মন্ত্রিত্ব নিতে অস্বীকার করিলেন।

পরদিন ১১ই আগস্ট আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান ও আমি এক যুক্ত বিবৃতি দিলাম। তাতে পাঁচ-দফা-চুক্তির উল্লেখ করিলাম। যুক্ত ফ্রন্ট একটু শক্ত হইলে যে আমরা ঐ সব শর্ত আদায় করিতে পারিতাম, সে কথাও বলিলাম। আমাদের অন্তর্বিরোধের ফলে ১৯৫৪ সালের অতবড় জয়টা এমনি করিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।

এরপর আমাদের অপযিশনের পালা শুরু। প্রথমেই আসিল সাবেক গবর্নর-জেনারেল কর্তৃক রচিত ৩৯টি বেআইনী অর্ডিন্যান্স দুরস্ত করার বিল। ফেডারেল কোর্টের রায়ে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে ঐ আইনগুলি নয়া গণ-পরিষদকে দিয়া ভ্যালিডেট করিতে হইবে। এইগুলি হইয়া যাইবার পর আসিল পশ্চিম-পাকিস্তান একত্রীকরণ বিল। অর্ডিন্যান্সরূপে এ ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই প্রযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপারটাকে আইন-সম্মত করা মাত্র। তবু আমরা ইহার জোর বিরোধিতা করিলাম। তিন কারণে : (১) পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রীকরণের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত পূর্ব-বাংলার স্বার্থ-সম্পর্কিত পাঁচ-দফা-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়া একতরফা-ভাবে এই বিল আনা হইয়াছে। (২) পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশসমূহের গণভোট ব্যতিরেকে শুধু মুসলিম লীগ পার্টির দলীয় চাপে প্রদেশগুলি ভাংগিয়া দেওয়া হইতেছে। (৩) প্রদেশগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসিত যোনাল ফেডারেশনরূপে চারটি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি একত্র করার বদলে উহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া গোটা পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি প্রদেশ করা হইয়াছে। বিরোধী দলের পক্ষ হইতে আমিই প্রথম বক্তৃতা করিলাম। আমার সুদীর্ঘ বক্তৃতার মূলকথা ছিল দুইটি : (১) পূর্ব-বাংলার দাবি মত পাঁচ-দফা-চুক্তি কার্যকরী করা : (২) পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের স্বায়ত্ত-শাসন বজায় রাখিয়া পূর্ব-বাংলায় সমান-ক্ষমতাভোগী একটি যোনাল সাবফেডারেশন করা। লাহোরের 'পাকিস্তান টাইমস' আমার এই প্রস্তাবকে 'মনসুর প্ল্যান' নামে যথেষ্ট পাবলিসিটি দিয়াছিলেন।

মুসলিম লীগের দলীয় শৃংখলার খাতিরে বিভিন্ন প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ সকলেই সরকারী বিল সমর্থন করিলেও তলে-তলে অনেকেই এবং গণ-পরিষদের বাইরের প্রায় নেতৃবৃন্দই এই প্ল্যান সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ পার্টি যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে মেজরিটির স্টিম-রোলার চালাইয়া এক ইউনিট আইন পাস করাইয়া ফেলিলেন। এটা ১৯৫৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা। দুইদিন পরেই ৩রা অক্টোবর গবর্নর-জেনারেলের অনুমোদন সহ উক্ত আইন গেযেট হইয়া গেল। ৬ই অক্টোবর নয়া প্রদেশের গবর্নর হইলেন নবাব মুশতাক আহমদ গুরমানী। অর্ডিন্যান্সের-বলে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের গবর্নর তিনি আগে হইতেই ছিলেন। এবার ডাঃ খান সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বে নয়া মন্ত্রিসভাও গঠিত হইয়া গেল। সবই রেডিই ছিল। ১৪ই অক্টোবর জাবেতা ভাবে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হইল।

৬. শাসনতন্ত্র রচনা

অতঃপর ১৯৫৬ সালের ৯ই জানুয়ারি হইতে শাসনতন্ত্র রচনায় হাত দেওয়া হইল। সর্ব-সম্মত শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমরা সকল প্রকার চেষ্টা করিলাম। পাকিস্তানের বয়স আট বছর হইয়া যাওয়ার পরেও শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া একটা পরম লজ্জার ও দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল। এ সম্বন্ধে পযিশন দল ও অপযিশন দলের সবাই একমত হইলাম। সেজন্য শাসনতন্ত্র রচনার কাজে সহযোগিতা করিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত ও আগ্রহশীল ছিলাম। অপযিশন বলিতে তখন কার্যতঃ এক আওয়ামী লীগ। গোড়াতে কিছুদিন অপযিশনে বসিয়া অবশেষে হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবও মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় আওয়ামী লীগ ব্যতীত আর যাঁরা অপযিশনে রহিলেন, তাঁদের মধ্যে জনাব ফিরোয খাঁ নূন ও নবাব মোযাফফর আলী কিযিলবাস ও আযাদ পাকিস্তান পার্টির একমাত্র প্রতিনিধি মিয়া ইফতিখারুদ্দিন এবং 'স্বাধীন' মুসলিম লীগ-মেম্বর জনাব ফযলুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে এঁরা কেউ আওয়ামী লীগের সমর্থন না করায় শাসনতন্ত্রকে গণমুখী করিবার ব্যাপারে এঁরা কোনও কাজে লাগিলেন না। ফলে পাঁচ দফা মারি-চুক্তি কার্যকরী করিবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলাম। যুক্ত-নির্বাচন প্রথাও গ্রহণ করা হইল না। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ত দূরেই থাকিল। 'প্রাদেশিক' স্বায়ত্তশাসনকে অধিকতর সংকুচিত করা হইল। আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আমরা 'জীবন-মরণ সংগ্রামের পথ' বাছিয়া লইলাম।

এবারও আমি অপযিশনের 'ওপেনিং ব্যাটসম্যান' হইলাম। এর আগেই আমি ১৬৭টি সংশোধনী দাখিল করিয়া রাখিয়াছিলাম। সাধারণ আলোচনার বিতর্কে প্রথম বক্তা হিসাবে আমি একনাগাড়ে দুই দিনে সাত ঘন্টা সময় লইয়াছিলাম। অবশ্য এই সাত ঘন্টার মধ্যে ডিপুটি-স্পিকারের বাধা দানে অনেক সময় নষ্ট হইয়াছিল। তবু আমার বক্তৃতায় (১) পূর্ব-বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আবশ্যকতা ; (২) ভৌগোলিক অবস্থার হেতু অর্থনৈতিক বিভিন্নতা ; (৩) ঐতিহ্যিক ও কৃষ্টিক পার্থক্য ; (৪) পূর্ব-বাংলার প্রতি ক্রিমিন্যাল ঔদাসীন্য ; (৫) রাষ্ট্রের আয়ের প্রায় সবটুকু পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের ভয়াবহ পরিণাম; (৬) অর্থনেতিক অসাম্য; (৭) চাকরিতে পূর্ব-বাংগালীর শোচনীয় অবস্থা ; (৮) তিন সাবজেক্টের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের যৌক্তিকতা ও সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম। ১৯৫৬ সালের ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারির গণ-পরিষদের 'ডিবেট' বা প্রসিডিং-এর সরকার প্রকাশিত বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে বিনা বাধায় আমি অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু অত বাধা দিয়াও ডিঃ স্পিকার মিঃ গিবন আমাকে ক্লান্ত, বিরক্ত ও রাগান্বিত করিতে পারেন নাই। আমি হাসিমুখে তাঁর বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। আমার ধৈর্য দেখিয়া আমার নেতা অপযিশন লিডার মিঃ সুহরাওয়ার্দী পর্যন্ত তাজ্জব হইয়াছিলেন। মিঃ গিবনের পুনঃ-পুনঃ বাধা দানে আপত্তি করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন ঃ মিঃ ডিপুটি স্পিকার, বক্তাই অপযিশন দলের প্রথম বক্তা ; তাঁকে বিনা বাধায় বক্তৃতা করিতে দিন। আপনি তাঁর বক্তৃতার ধারা পছন্দ নাও করিতে পারেন কিন্তু এটা তাঁর নিজস্বধারা।'

ডিপুটি-স্পিকার মিঃ গিবন মিঃ সুহরাওয়ার্দীকে বাধা দিয়া বলেন ঃ 'কে বলিয়াছে আমি তাঁর বক্তৃতার ধারা পসন্দ করি না? আমি তাঁর ধারা খুবই পসন্দ করি। আপনি এঁর বক্তৃতার গোড়ার দিকে এখানে ছিলেন না বলিয়াই আপনি শুনেন নাই, আমি এঁর সম্পর্কে কি বলিয়াছি। আমি বলিয়াছি ঃ মিঃ আবুল মনসুর একজন 'লাভেবল্ লইয়ার (প্রিয়ভাষী উকিল)।'

জনাব সুহরাওয়ার্দী ঃ ' সে কথা সত্য। কিন্তু তবু আমি বলিতেছি যে আপনি যখন এঁর বক্তৃতায় ঘনঘন বাধা দিতেছিলেন তখন আমি তাঁর পাশে বসিয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিলাম ঃ আমি নিজে অত বাধা পাইলে একবিন্দু অগ্রসর হইতে পারিতাম না এবং বক্তৃতার খেই হারাইয়া ফেলিতাম।'

৭. শাসনতন্ত্রের বাঞ্ছিত মূলনীতি

আমি নাম-করা বাগ্মী নই। কিন্তু দেওয়ানী উকিল। এতক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিতে পারিয়াছিলাম আমার কাছে বিষয়-বস্তু তথ্য-পরিসংখ্যা প্রচুর ছিল বলিয়া। আমি অনেক বই-পুস্তক পড়িয়া ঐ বক্তৃতার জন্য তৈয়ার হইয়াছিলাম। আমি জানিতাম, আমি মাঠে-ময়দানে জনসভায় বক্তৃতা করিতে যাইতেছি না, গণ-পরিষদে শাসন-তন্ত্রের কাঠামোর উপরে বক্তৃতা করিতে যাইতেছি। আমার বক্তৃতায় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই কয়টি মূলনীতির অপরিহার্যতা উল্লেখ করিয়াছিলাম ঃ (১) পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত হইতে হইবে। কারণ (ক) লাহোর প্রস্তাব একটি নির্বাচনী ওয়াদা। উহারই ভিত্তিতে ভারতের মুসলমান ভোটাররা ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। (খ) লাহোর প্রস্তাব তদানীন্তন ভারতের স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশসমূহের মধ্যে একটা পবিত্র চুক্তি। এই চুক্তির পক্ষগণের সকলের সম্মতি ব্যতীত কোনও এক পক্ষের ইচ্ছায় এই চুক্তির রদ-বদল হইতে পারে না। (গ) লাহোর প্রস্তাব একটি দূরদর্শী, বাস্তবধর্মী, সুচিন্তিত পরিকল্পনা। পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান, দুই অঞ্চলের ভাষিক, কৃষ্টিক ও ঐতিহ্যিক পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়াই উহা রচিত হইয়াছে ; (ঘ) মুসলিম লীগের পরবর্তী অধিবেশনের কোনও প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাব সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় নাই ; হইবার কোনও কারণ ও অধিকার ছিল না ; (ঙ) পূর্ব-পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ওয়াদা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত। পূর্ব-পাকিস্তানের উহা জাতীয় দাবি এবং পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের উহা পবিত্র ওয়াদা। (চ) উক্ত ২১ দফা ওয়াদার ১৯ দফায় যে তিন বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলা হইয়াছে, উহা অবাস্তব-অসাধ্য দাবি নয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে বৃটিশ সরকারের কেবিনেট মিশন যে গ্রুপিং সিস্টেম ও ফেডারেল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব দিয়াছিল তাতেও তিন-বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা ছিল। (ছ) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত না হইলে তা পরিণামে যে টিকিবেও না, দেশবাসী তা গ্রহণও করিবে না, সে কথা লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই সুস্পষ্ট হুশিয়ারি স্বরূপ উচ্চারিত হইয়াছে।

লাহোর প্রস্তাব ব্যতীত অন্য কোনও বুনিয়াদে যে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হইতে পারে না, তা দেখাইতে গিয়া আমি বলিয়াছিলাম ঃ (২) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আসলে দুইটি দেশ, (৩) উহাদের বাশেন্দারা আসলে দুইটি জাতি ; (৪) দুই

পাকিস্তানের আসল সমস্যা রাজনৈতিকের চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক ; কারণ অর্থনৈতিক স্বার্থ দুই-এর এক ও অভিন্ন নয় ; (৫) সরকারী আয় জনগণের ব্যয়, সরকারী ব্যয় জনগণের আয়, এই নীতিতে সরকারী ব্যয় হইতে পূর্ব-বাংলার কোনও লাভ হয় নাই; (৬) পূর্ব-বাংলা হইতে যে টাকা পশ্চিমে আসে, তা আর ফিরিয়া যায় না। এটা কার্যতঃ একরোখা অর্থনীতি ; (৭) এই একরোখা অর্থনীতির বিষময় পরিণাম কিভাবে দেশের অনিষ্ট সাধন করিতেছে তা দেখাইতে গিয়া আমি সরকারী ষ্টেটিসটিকস্ হইতে বিস্তারিতভাবে 'ফ্যাক্ট্স্ এণ্ড ফিগার্স কোট' করিয়া দেখাইয়াছিলাম ঃ

(ক) দেশের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে মবিলিটি অব লেবার ও ক্যাপিটেল না থাকায় সরকারী সমস্ত ব্যয়ের, সরকারী গৃহ-নির্মাণাদি সাকুল্য খরচের, সবটুকু সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তান পাইতেছে। পূর্ব-পাকিস্তান এর একবিন্দু সুবিধা পাইতেছে না।

(খ) শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সব প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত ও এখান হইতে পরিচালিত হওয়ায় এই সবের সকল সুবিধাই আঞ্চলিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতি সাধন করিতেছে।

(গ) দেশের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় ব্যাংকিং ইনশিওরেন্স ইত্যাদি সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস এবং বিদেশী মিশনসমূহের অফিস ও ক্রিয়া-কলাপ পশ্চিম পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকিতেছে। এ সবের আর্থিক সুবিধা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানপাইতেছে।

(ঘ) সরকারী চাকুরিতে দেশের মোট রাজস্বের শতকরা পঁচিশ টাকার বেশি (তৎকালে একশ পঞ্চাশ কোটির মধ্যে সাড়ে বত্রিশ কোটি) ব্যয় হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরের চাকুরির শতকরা একশটি এবং মধ্য ওনিম্ন-মধ্য চাকুরির শতকরা আশি-নব্বইটি পশ্চিম পাকিস্তানীরা অধিকার করিয়া থাকায় এই হইতে যে বিপুল আয় হয় তার সবটুকু পশ্চিম পাকিস্তানীরাই পায়। ব্যয়ও হয় পশ্চিম পাকিস্তানেই। প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তান এই হারে ধনী ও পূর্ব পাকিস্তান এই হারে গরিব হইতেছে।

(ঙ) দেশরক্ষা বাহিনীর পিছনে দেশের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ ভাগ (তৎকালে এক শ পঞ্চাশ কোটির মধ্যে একশ দশ কোটি) ব্যয় হয়। দেশরক্ষা বাহিনীর কোনও বিভাগে পূর্ব-পাকিস্তানী অফিসার একরূপ না থাকায় এই বিপুল আয় হইতে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। চাকুরি-বাকুরি ছাড়াও সরবরাহ বা নির্মাণকার্যের কন্ট্রাকটারি হইতেও তারা বঞ্চিত। ইহার ফল স্বরূপ প্রতি বছর এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানকে ধনী ও তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানকে গরিব করিতেছে।

এই ব্যাপারটাই পরিষ্কার হইয়াছিল নবাব গুরমানীর সাথে আমার কথা কাটাকাটিতে। আমি আমার বক্তৃতায় যখন উভয় পাকিস্তানের সমান অধিকার দাবি করিতেছিলাম, তখন আমার বক্তৃতায় বাধা দিয়া নবাব গুরমানী বলিলেন ঃ বন্ধুবর ভুলিয়া যাইতেছেন' যে পাকিস্তান সরকারের রাজস্বে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আসে শতকরা চৌরাশি টাকা ; পূর্ব-পাকিস্তান দেয় মাত্র শতকরা ষোল টাকা।

জবাবে সরকারী হিসাবের খাতা দেখাইয়া আমি বলিয়াছিলাম ঃ নবাব সাহেব একটু ভুল করিয়াছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের দান শতকরা ষোল নয়। আরও কম। মাত্র চৌদ্দ টাকা।

নিজের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতেছি দেখিয়া নবাব গুরমানী সহ পশ্চিমা নেতারা কৌতূহলে আমার দিকে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁদের আরও বিস্মিত করিয়া বলিয়াছিলাম ঃ 'বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান দেয় শতকরা চৌদ্দ। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার বছর দিয়াছিল শতকরা ত্রিশ। আট বছরে শতকরা ষোল কমিয়া হইয়াছে চৌদ্দ। বছরে দুই কমিয়াছে। বাকী চৌদ্দ কমিয়া শূন্যে আসিতে লাগিবে আর মাত্র সাত বছর। ১৯৬৩ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের জমার খাতায় যখন শূন্য হইবে, তখন আপনারা ন্যায়তঃই বলিতে পারিবেন ঃ পূর্ব-পাকিস্তান লোকসানের কারবার। ওটা লিকুইডেট করা যাইতে পারে।'

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যাংকিং ইনশিওরেন্সসহ সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস করাচিতে হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানে অর্জিত সকল আয় পশ্চিম পাকিস্তানের হিসাবে জমা করার সুবিধা ছিল।

আমি বক্তৃতার উপসংহারে বলিয়াছিলাম ঃ 'আপনারা ভূগোলকে অগ্রাহ্য করিবেন না। মনে রাখিবেন ভূগোল ও ইতিহাস যমজ সহোদর। যদি ভূগোলকে আপনারা অস্বীকার করেন, তবে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করিবে না। মনে রাখিবেন ইতিহাসের পুনরাবর্তন অবশ্যম্ভাবী।'

গবর্নমেন্ট পার্টি আমার এইসব আর্তনাদে কর্ণপাত করিলেন না। মাঝে হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষতঃ করাচির উর্দু কাগযসমূহ আমার বিরুদ্ধে 'ধর্মদ্রোহ', দেশদ্রোহের বিক্ষোভ তুলিলেন। আমার বিচারের দাবি করিলেন। কেউ কেউ বিনা-বিচারে চৌদ্দ বছর জেলের বা সংগেসার করিয়া গর্দান লইবার ফরমায়েশ দিলেন। গণ-পরিষদে 'প্রিভিলেজ মোশন' আসিল। যথারীতি প্রিভিলেজ কমিটিও বসিল এবং সম্পাদকদের তলবের ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না। কারণ সরকারী-দল তাঁদের পক্ষে।

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে এই ধরনের প্রায় সার্বজনীন নিন্দা ও কঠোর-কর্কশ প্রতিবাদের ঝড়-তুফানের মধ্যেও আমার বুকে বল, অন্তরে সান্ত্বনা ও মনে আত্ম-

বিশ্বাস জাগরুক রাখিয়াছিল ঢাকা ও চাটগাঁও হইতে প্রায় একই সংগে অজানা বন্ধুদের কয়েকখানা মোবারকবাদের টেলিগ্রাম। ঐ সবগুলিতে বিভিন্ন উপাধিতে আমাকে তাঁরা ইতিহাস বিখ্যাত অমর বাগ্মী এড্‌মণ্ড বার্কের সাথে এবং আমার বক্তৃতাকে বার্কের বৃটিশ পার্লামেন্টের বক্তৃতার সাথে তুলনা করিয়া প্রাপ্যাধিক গৌরব ও সম্মান দান করিয়াছিলেন। তার কোনটাতে আমাকে বার্ক–অব বেংগল, কোনটাতে বার্ক–অব–ইস্ট বেঙ্গল, আর কোন কোনটাতে বার্ক অব–পাকিস্তান বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। স্বতঃস্ফূর্ত গণ–মনের উল্লাসের প্রতীক হিসাবে ঐ সবের স্মৃতি আজও আমাকে আনন্দ দেয় বলিয়াই ওদের উল্লেখ করিলাম।

সরকার–পক্ষ স্টিম রোলার চালাইলেন। আমরাও দস্তুর মত 'ফিলিবাস্টারিং' শুরু করিলাম ঃ 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'। সংশোধনী, মুলতবি ও অধিকার প্রস্তাব এবং 'ধারাবাহিকতার নুক্তা' (পয়েন্টস–অব–অর্ডার) ইত্যাদিতে সরকার পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত রাখিলাম। আমরা আওয়ামী লীগের মেম্বররা বেশির ভাগই ছিলাম আমাদের পার্লামেন্টারি কর্তব্য সম্বন্ধে সদা–সচেতন নিরলস কঠোর পরিশ্রমী ও কর্মব্যস্ত। দিনরাত অধ্যয়ন মুসাবিদা ও পরামর্শ করিয়া শত শত সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করিলাম এবং পাহারা কুত্তার মত সর্বদা হাযির থাকিয়া চব্বিশ ঘন্টা ঘেউ–ঘেউ করিতে থাকিলাম। আমি একাই আগেই ১৬৭টি সংশোধনী দিয়া রাখিয়াছিলাম। তারপর আরও বাড়াইয়া দুইশর উপর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করিলাম। একটিও বাদ না দিয়া প্রতি সংশোধনী পেশ ও তার সমর্থনে দুই–তিন বার পাঁচ–সাত মিনিট করিয়া বক্তৃতা করিয়া যাইতে লাগিলাম। সরকার পক্ষও নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে কম বুদ্ধি রাখিতেন না। কর্মোদ্যমও তাঁদের আমাদের চেয়ে কম ছিল না। আমাদের কৌশলের জবাবে তাঁরা ঠিক করিলেন দিন–রাত 'ননস্টপ' এসেমব্লির অধিবেশন চালাইবেন। এইখানে আমরা চালে হারিয়া গেলাম। আমরা প্রতিবাদে ওয়াকআউট করিলাম। আমার একারই সংশোধনী মারা গেল একশ তেতাল্লিশটা।

এই বয়কটটা নিশ্চিতই আমাদের বোকামি হইয়াছিল। কারণ আমরা যে প্রতিপদে সরকার পক্ষকে বাধা দিয়া সময় নষ্ট করিতেছিলাম সেটা শুধু বিরোধিতায় সময় নষ্ট করিবার জন্য নয়। আমাদের আন্তরিক আশা ছিল ইতিমধ্যে পূর্ব–বাংলার সবকে না হউক মেজরিটিকে আমরা ঐক্যমতে আনিতে পারিব। পূর্ব–বাংলার দুই–একজন বাদে সবাই যুক্তফ্রন্টের লোক। এঁরা যাঁদের ভোটে নির্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন তাঁরা সবাই যুক্তফ্রন্টের এম. এল. এ.। পূর্ব–বাংলা–আইন–পরিষদে যুক্তফ্রন্ট পার্টিই সরকারী দল। তাঁরা পার্টি মিটিং–এ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় মেম্বরদের ম্যানডেট দিয়াছেন। এই ম্যানডেট অনুসারে কাজ করাইবার জন্য একদল প্রতিনিধিও করাচি আসিয়াছেন। তাঁদের সাথে একযোগে আমরা অনেক লবিওয়ার্ক করিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বাংলাকে অন্যতর রাষ্ট্রভাষা করিয়া নির্বাচন–প্রথা স্থগিত রাখিয়া

'শক্তিশালী কেন্দ্রে'র নামে ফেডারেশনের পোশাকে একটি ছদ্ম-ইউনিটরি শাসনতন্ত্র রচনা হইয়া গেল। নাম হইল তার 'ইসলামিক রিপাবলিক'। হক সাহেবের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের পূর্ব-বাংলায় মুসলিম মেম্বররা একুশ দফার নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করিয়া এই 'শক্তিশালী কেন্দ্রে'র পক্ষে ভোট দিলেন। ১৯৫৪ সালের বিপ্লবী নির্বাচন বিজয়টা এইভাবে সমাধিস্থ হইয়া গেল। আমরা আওয়ামী লীগাররা আর কি করিব ? ঐ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব-বাংলার জনমত যাচাই করিবার চ্যালেঞ্জ দিয়া আমরা শাসনতন্ত্রে দস্তখত দিতে অস্বীকার করিলাম।

তবুও একটা শাসনতন্ত্র হইয়া গেল। ভালই হোক আর মন্দই হোক। এই ঘটনায় এই সত্যও প্রমাণিত হইল যে দেশের শাসনতন্ত্র রচনা এমন অসাধারণ ব্যাপার নয়, যা রচনার জন্য নয়টি বছর লাগিতে পারে। বস্তুতঃ বর্তমান গণ-পরিষদ কিছু বেশি দেড় মাসের মধ্যে এই শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করিয়াছে। এটা অনেকেরই সান্ত্বনার কথা। শুভবুদ্ধির কথা। শান্তিপ্রিয় নাগরিকের কথা। শান্তিপূর্ণ পথে গণতন্ত্র বিকাশের কথা। আমরা নিজেরাও অনেকে শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলিলাম। এইভাবে বর্তমানকে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু শুভ বুদ্ধিই শেষ কথা নয়। শান্তিপ্রিয়তাই সমস্যা সমাধানের অস্ত্র নয়। এই শাসনতন্ত্রের বলে কেন্দ্রে সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত হইল এবং পূর্ব-বাংলা প্রবঞ্চিত হইল। এটাই যদি শেষ কথা হইত, তবে ব্যাপারটা তেমন জটিল হইত না। আসল কথা এই যে, এই শাসনতন্ত্র সমস্যার সমাধান করে নাই, আরও সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। যতই ইসলামী বিশেষণ দেওয়া হউক, যে শাসনতন্ত্র দুই পাকিস্তানের ভৌগোলিক পৃথক সত্তা ও আর্থিক বিভিন্নতার স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তা পাকিস্তানের সত্যিকার বাস্তবানুগ শাসনতন্ত্র হইতে পারে না। সে শাসনতন্ত্র স্থায়ী হইতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবিচার ও অসাম্যকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রলেপ দিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করিলে তাতে ইসলামেরই অপমান করা হয়। যতদিন আমরা এই অসাধু চেষ্টা চালাইব, ততদিন আমাদের জাতীয় জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝা চলিতেই থাকিবে।

এই শাসনতন্ত্র দুইটা বড় রকমের সংস্কার প্রবর্তন করিল। পূর্ব-বাংলা পূর্ব-পাকিস্তান হইল ; আর পশ্চিম অঞ্চলের চার-চারটা স্বায়ত্ত শাসিত প্রদেশ নিজ নিজ অস্তিত্ব লোপ করিয়া এক পশ্চিম পাকিস্তান হইল। নামে কিছু আসে যায় না যদি পরিবর্তনের সাথে স্বকীয়তার বিলোপ না হয়। বৈচিত্রহীন ইউনিফরমিটির চেয়ে জাতির শতদল রূপ অনেক বেশি কাম্য। দেশের ক্ষমতাশীল নেতারা, শুধু ক্ষমতাহীন চিন্তুকরা নয়, যত তাড়াতাড়ি এই সত্য বুঝিবেন, ততই মংগল।

বাইশা অধ্যায়

ওযারতি প্রাপ্তি

১. শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ব ধারণা

১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান খাঁর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কোয়েলিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কংগ্রেস পার্টি, প্রগ্রেসিভ পার্টি ও তফসিলী ফেডারেশন এই তিনটি হিন্দু দলও এই মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। আমিও একজন মন্ত্রী হই। শিক্ষা–দফতরের ভার নেই।

মন্ত্রী হইলে শিক্ষা-দফতরের ভার নিব, এটা আমার অনেক দিনের শখ। এ শখের বিশেষ কারণ এই যে প্রাইমারি শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার দাবি বাংলার জনগণের অনেক দিনের পুরান দাবি। প্রাক–স্বাধীনতা যুগে প্রজা–সমিতির সৃষ্টি হইতেই আমরা প্রতিটি সভা সম্মিলনীতে এই দাবি করিয়া আসিতেছিলাম। প্রজা–নেতা হক সাহবের প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে আমরা বহুবার এ প্রশ্ন তুলিয়াছি। পাকিস্তান হাসিলের পরও বহু সভা–সম্মিলনে এসব কথা বলা হইয়াছে। মন্ত্রীরাও ওয়াদা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য, খুব কম করিয়া হইলেও ত্রিশটা বছর ধরিয়া আমরা যেখানে ছিলাম সেইখানেই আছি। প্রাইমারি শিক্ষা আজও বাধ্যতামূলক হয় নাই।

তাছাড়া আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কতকগুলো মতবাদ ছিল। সার আশুতোষ মুখার্জীর মতবাদ ও মার্কিন শিক্ষা-পদ্ধতিই বোধ হয় আমার মত প্রভাবিত করিয়াছিল। আমি কোনও শিক্ষাবিদ বা বিশেষজ্ঞ নই। সামান্য শিক্ষকতা যা করিয়াছি তাতে অভিজ্ঞতা বলিয়া বড়াই করা যায় না। শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ পড়াশোনা বা পরীক্ষা–নিরীক্ষা করিয়াছি, তাও বলা যায় না। তবু শিক্ষার মত গুরুতর ব্যাপারে আমি কতকগুলি মত পোষণ করি, এটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু সাহিত্যিক ও সংবাদিকদের সব ব্যাপারেই কিছু-কিছু মত থাকে। বিশেষতঃ সাংবাদিকদের। সম্পাদকীয় লিখিতে হইলে সম্পাদকদিগকে সব বিষয়ে 'পন্ডিত' হইতে হয়। এঁরা সব–ব্যাপারে সকলের স্বনিয়োজিত উপদেষ্টা। এঁরা জিন্না সাহেবকে রাজনীতি সম্বন্ধে গান্ধীজীকে অহিংসা সম্বন্ধে, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রকে রসায়ন সম্বন্ধে, ডাঃ আনসারীকে চিকিৎসা সম্বন্ধে, হক সাহেবকে ওযারতি সম্বন্ধে, শহীদ সাহেবকে দলীয় রাজনীতি

সম্বন্ধে, মওলানা আযাদকে ধর্ম সম্বন্ধে, এমনকি জেনারেল দ্যগলকে যুদ্ধ-নীতি ও স্ট্যালিনকে কমিউনিযম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। সেই উপদেশ না মানিলে কষিয়া গালও তাঁদের দিয়া থাকেন। উপদেশ দেওয়া এঁদের কর্তব্য ও ডিউটি। ঐ জন্যই তাঁরা সম্পাদক। ঐ জন্যই ওঁদেরে বেতন দেওয়া হয়। মাস্টারদেরে বেতন তেমন দেওয়া হয়। বেতনের বদলে এঁরা ছাত্রদেরে পাঠ দেন। সম্পাদকরাও দেশের রাষ্ট্র নায়ক ও চিন্তা-নায়কদের পাঠ দেন। সম্পাদকরা মাস্টার, নেতারা ছাত্র। কিন্তু পাঠশালার মাস্টার-ছাত্র এঁরা নন। কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার-ছাত্র। প্রতিদিন সকালে ক্লাস হয়। কলেজের অধ্যাপকরা যেমন পরের বই-পুস্তক পড়িয়া নিজেরা তৈয়ার হইয়া ক্লাসে লেকচার দেন, সম্পাদকরাও বই-পুস্তক ঘাঁটিয়া ঐ ঐ বিষয়ে ওয়াকিফহাল হইয়া সম্পাদকীয় ফাঁদিয়া থাকেন। আমিও প্রায় ত্রিশ বছরকাল ঐ কাজ করিয়াছি। কাজেই কোন-বিষয়ে-কিছু-না-জানিয়া সর্ববিষয়ে 'পণ্ডিত' হইয়াছি। যাকে বলা যায় ঃ 'জ্যাক অব-অল-ট্রেডস্ মাস্টার-অব-নান।'

শিক্ষা সম্বন্ধেও কাজেই আমি অনেক কথা লিখিয়াছি। আগে না থাকিলেও লিখিতে-লিখিতেই বোধ হয় পরে একটা মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মতবাদটা আমার অনেক দিনের। সুতরাং যত দিন যাইতেছে, আমি যত বুড়া হইতেছি, আমার মত তত পাকা হইতেছে। অনেকে বলিলেন ঃ 'মূঢ়ের মতবাদ ও-রূপ দৃঢ় বা গোড়া হইয়াই থাকে।' তা যাই হোক, আমার দৃঢ় মতবাদটা এই ঃ

সাধারণ শিক্ষাকে সহজ ও সস্তা করিয়া অল্প সময়ের নির্দিষ্ট মুদ্দতের মধ্যে দেশের নিরক্ষরতা দূর করার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। প্রাইমারি শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা আমি আমার কলেজ-জীবন হইতে ভাবিয়া আসিতেছি। প্রথম সুযোগেই রাজনৈতিক সভার (প্রজা-সমিতির) প্রস্তাবরূপে গ্রহণ করাইয়াছি। এটাত গেল প্রাইমারি ও এডাল্ট এডুকেশনের কথা। শুধু প্রাইমারি সম্বন্ধেই নয়, মধ্য ও উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেও আমার দৃঢ় ও একগুঁয়ে মত ছিল এবং এখনও আছে। আমার মতে এ দেশে শিক্ষার চেয়ে পরীক্ষায় বেশি কড়াকড়ি করা হয়। যথেষ্ট স্কুল কলেজ নাই। যা আছে তাতেও শিক্ষক নাই। সময় মত বই-পুস্তক পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তাও খরিদ করিবার সাধ্য খুব কম অভিভাবকেরই আছে। ফলে পড়াশোনা হয় না। কিন্তু পরীক্ষার সময় প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকদের উস্তাদি দেখে কে ? প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকদের উস্তাদি ও পাণ্ডিত্য যাহির করিবার এইটাই সময়। ইয়া-ইয়া উস্তাদি প্রশ্ন ! যা পড়ান হয় নাই, তার উপরও প্রশ্ন ! এমন কঠিন যে প্রশ্নকর্তারাই তার উত্তর দিতে পারিতেন না খুঁজিয়া-খুঁজিয়া প্রশ্ন করার আগে। তর্ক

করিয়া দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষক-অধ্যাপকই এ বিষয়ে আমার সাথে একমত। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন করিবার বা খাতা দেখিবার সময় ও-সব কথাই ওঁরা ভুলিয়া যান। তখন বলেন, শিক্ষার উন্নত মানের কথা। যেমন শিক্ষক-অধ্যাপক তেমনি গবর্নমেন্ট। এক ব্যাপারে শিক্ষক-সরকারের সম্বন্ধ একেবারে অহি-নকুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষকরা সরকারী ও আধা-সরকারী দফতরের কেরানীর মাহিয়ানাও পান না। তাঁদের মাইনাটা বাড়াইয়া দিবার কথা বলিলেই সরকার বলেন, তহবিলে টাকা নাই। শিক্ষকরা কত দাবি-দাওয়া ও ধর্মঘট করিলেন, জনসাধারণ কত আন্দোলন করিল, সরকার কান পাতিলেন না। এইখানে শিক্ষক-সরকারের সম্বন্ধটা শোষিত শোষকের তিক্ত সম্পর্ক। কিন্তু ছাত্র ফেল করাইবার বেলা এই শোষিত-শোষকদের মধ্যেই দেখা যায় ঐক্যমত ও সংহতি।

শিক্ষার মানের দোহাই দিয়া এই যে পরীক্ষা-নীতি চলিতেছে, তার ভয়াবহ পরিণামের কথা যেন কেউ ভাবিতেছেন না। প্রতি বছর শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ধেকের বেশি ছেলেকে ফেল করাইয়া দেশের কি ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছেন, সেজন্য যেন কারও মাথাব্যথা নাই। শিক্ষকের মান ও মর্যাদার জন্য, শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করিবার জন্য শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াও সরকার তাঁদের মাইনা বাড়ান না টাকার অভাবের যুক্তিতে। কিন্তু পরীক্ষা সহজ ও বাস্তববাদী করিতে অর্থাৎ বেশি ছাত্র পাস করাইতে টাকার অভাবের প্রশ্ন উঠে না। তবু কেন ফেল করান হয় ? পরীক্ষকরা করান উস্তাদি-পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য। কিন্তু সরকার করান কেন ? দুই-একজন উচ্চপদস্থ ক্ষমতাসীন লোকের সাথে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি ঃ তাঁরা ছাত্র ফেল করান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে। তাঁরা বলেন, অত লোক ম্যাট্রিক-গ্রাজুয়েট হইলে তাদেরে চাকুরি দেওয়া সম্ভব হইবে না। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। দেশে বিপ্লব ও এনার্কি আসিবে। কমিউনিস্টরাও আসিয়া পড়িতে পারে। অতএব শিক্ষা কনট্রোল হওয়া দরকার। বুঝিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবদান খাদ্য কনট্রোল হইতেই আসিয়াছে শিক্ষা কনট্রোল। কনট্রোলড় ডেমোক্রেসিও ওটারই পরিণাম। কিন্তু তখনও দেশে তা আসে নাই।

এ মত আমি সমর্থন করিতাম না। বরঞ্চ আমি দেশ ম্যাট্রিক, এমনকি গ্র্যাজুয়েট, দিয়া ভরিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী ছিলাম। এ বিষয়ে সার আশুতোষের মত আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 'আমি বাংলার প্রতিটি হালের পিছনে একজন করিয়া গ্র্যাজুয়েট দেখিতে চাই।' স্পষ্টই দেখা যায়, গ্র্যাজুয়েটের আতিশয্যকে সার

আশুতোষ ভয় করিতেন না। অতি-গ্র্যাজুয়েটে যদি দেশে কোনও বিপ্লব আসেই, তবে সে বিপ্লবে দেশের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ হইবে না।

শিক্ষক-অধ্যাপকদের জিগ্‌গাসা করিতাম ঃ তাঁরা কি জানেন না, পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটটা আসলে জীবন সংগ্রামে প্রবেশের পাসপোর্ট মাত্র ? চাকুরির নিয়োগপত্র নয় ? তবে তাঁরা ইংরাজী আরবী ফার্সী সংস্কৃতের জন্য এমনকি ইউরোপের ইতিহাস ইংল্যান্ডের ভূগোলের জন্যই বা ছেলেদেরে ফেল করান কেন ? তাঁরা কি জানেন না ঐ সব বিষয় আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিকদের বৈষয়িক জীবনের জন্য কত অনাবশ্যক ? তাঁরা কি জানেন না, একটি ছেলেকে পরীক্ষায় ফেল করাইয়া প্রকারান্তরে তাঁরা কতজন ছেলের লেখা-পড়ার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন? তাঁরা কি ভুলিয়া গিয়াছেন, অতঃপর আমাদের শিক্ষার মিডিয়ম হইবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ? উত্তরে অনেকেই বলিয়াছেন ঃ ও-সব শিক্ষা-দফতর ও শিক্ষা-বিভাগের আইন-কানুন। শিক্ষার মিডিয়ম বাংলা করা সরকারের কাজ। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা দফতর, এক কথায় মন্ত্রীরা, ওসব আইন-কানুনে শিক্ষার মিডিয়ম না বদলানো পর্যন্ত তাঁদের কিছুই করণীয় নাই।

২. ছয়দিনের শিক্ষা-মন্ত্রিত্ব

কাজেই স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলাম, মন্ত্রী হইবার সুযোগ পাইলে শিক্ষা-মন্ত্রীই হইব। নিজে শিক্ষা মন্ত্রী হইবার আগে কি তবে কিছুই করণীয় নাই ? নিশ্চয়ই আছে। তাই আমাদের নেতা হক সাহেব যেদিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী হইলেন, সেদিন হইতেই তাঁর পিছনে লাগিলাম। শিক্ষাকে সহজ ও সস্তা করিবার, প্রাইমারি শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার এবং এডাল্ট এডুকেশনকে নৈশ শিক্ষায় পরিণত করিবার, প্রস্তাব দিতে লাগিলাম। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও আমি চার বছরে বাংলার নিরক্ষরতা দূর করিবার একটি স্কিম পর্যন্ত তৈয়ার করিয়া ফেলিলাম। মাত্র ছয় কোটি টাকায় এই কাজ হইয়া যাইত। ১৯৪১ সালে বাংলার আদমশুমারিতে 'অশিক্ষিতের' ঘরে 'শূন্য' পড়িত। এসব আমার অনভিজ্ঞ 'তরুণের স্বপ্ন' হইতে পারে। ছিলও বোধ হয় তাই। নইলে আমাদের স্কিম কার্যকরী হইল না কেন?

কিন্তু আশা ছাড়ি নাই। ভাবনা-চিন্তাও কমে নাই। তাই বিতর্ক-আলোচনা ও পড়াশোনা করিতেই থাকিলাম। এই কাজে মার্কিন শিক্ষাপদ্ধতি ও ইউরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতির তুলনা করিয়া কিছুটা জ্ঞান লাভ করিলাম। সেই সামান্য জ্ঞান হইতে এটা বুঝিলাম, ইউরোপ বিশেষতঃ ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস ও ইটালীতে শিক্ষার

প্রধান উদ্দেশ্য একটা শিক্ষিত কৃষ্টিবান শ্রেণী গড়িয়া তোলা। গোটা জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা নয়। তথায় জনসাধারণের শিক্ষিত হওয়ায় কোন বাধা নাই। বরঞ্চ সুযোগ-সুবিধা আছে। ঐ সব দেশে নিরক্ষর লোক নাই বলিলেই চলে। তবু ঐ সব দেশের জনসাধারণকে শিক্ষার তালাশে শিক্ষাকেন্দ্রে যাইতে হয়। স্বয়ং শিক্ষা জনসাধারণের দুয়ারে আসে না। ফলে ঐসব দেশে শিক্ষার মান সত্য-সত্যই উন্নত। কারণ উচ্চ শিক্ষা সেখানে সকলের জন্য নয়। বিশেষ অধিকার ভোগী বিত্তশালী শ্রেণীর জন্য। এই কারণে কারিকুলাম ও সিলেবাসের দ্বারা সেখানে শিক্ষাকেও উঁচা করা হইয়াছে। পরীক্ষাও করা হইয়াছে তেমনি কড়া।

কিন্তু মার্কিন মুল্লুকের শিক্ষা-নীতি তা নয়। সেখানে বংশাভিজাত্য নাই ; আছে ধনাভিজাত্য। সেজন্য শিক্ষা সেখানে জনসাধারণের জন্য, শ্রেণীর জন্য নয়। এই কারণেই তথায় সাধারণ শিক্ষার মান উচ্চ নয়। শুধু উচ্চ শিক্ষার মানই উচ্চ। শিক্ষা সেখানে বাস্তববাদী। শিল্প কারিগরি ও অর্থকরী বিদ্যার প্রাধান্য সেখানে বেশি। এই কারণেই প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি শিক্ষা ইউরোপের চেয়ে আমেরিকায় অনেক সহজ। ইংলন্ডসহ ইউরোপের একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন করা হইবে, আমেরিকায় দশম শ্রেণীতেও সেসব প্রশ্ন কঠিন বিবেচিত হইবে। ইউরোপে প্রশ্ন করা হয় শিক্ষার্থী বাদ দিবার উদ্দেশ্যে। মার্কিন মুল্লুকে করা হয় শিক্ষার্থী বাড়াইবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আমরা আমাদের দেশে ইংরেজের শিক্ষা-নীতিই আজও মানিয়া চলিতেছি। কাজেই আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্তর হইতেই কঠিন করা হয়। মার্কিন জাতির প্রভাবে এবং যুগের প্রয়োজনে ইউরোপীয় জাতিসমূহও ইদানিং তাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন আনিয়াছে। সেখানেও শিক্ষাকে এখন অনেক বাস্তববাদী ও গণমুখী করা হইয়াছে। বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়া শিক্ষাকে আরো অধিক গণমুখী বাস্তববাদী ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক করায় সব সভ্য রাষ্ট্রেই শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা দেশেই আজো মান্ধাতার আমলের শিক্ষা-নীতি চলিতেছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার মিডিয়াম, বাধ্যতামূলক তিন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আজো লজ্জাস্করভাবেই আমাদের শিক্ষার পথকে কন্টকিত করিয়া রাখিয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী হইবার সময় এসব কথাই আমার মনে ছিল। কাজেই শিক্ষা বিষয়ে একটা-কিছু করিবার সংকল্প নিলাম। দুই-এক দিনের মধ্যেই শিক্ষাবিদদেরে লইয়া একটি পরামর্শ সভার ব্যবস্থা করিতে শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলাম।

৩. রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি

মন্ত্রিসভার হলফ নেওয়ার পর আমরা প্রথম কাজ করিলাম রাজনৈতিক বন্দীদেরে মুক্তি দেওয়া। আওয়ামী লীগাররা এ বিষয়ে ২১ দফা স্বাক্ষরকারী চুক্তিবদ্ধ পার্টি। অন্যেরাও সবাই এ বিষয়ে একমত। কাজেই প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কেবিনেটের এক বিশেষ সভার বৈঠক দিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সকল রাজনৈতিক বন্দীদেরে মুক্তি দেওয়ার এবং সমস্ত নিরাপত্তা আইন-কানুন বাতিল করিবার প্রস্তাব পাস হইল। আইন বাতিলের যথা-নিয়ম ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়া বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র বিভাগকে নির্দেশ দিলেন। তড়িতে সে আদেশ সব স্তর পার হইয়াও গেল। আমরা মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জেলখানায় গেলাম। বন্দীরা নিজেদের খরচায় ও উদ্যোগ-আয়োজনে জেল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আমাদেরে আপ্যায়নের জন্য জেলখানার ভিতরে মন্ডপ রচনা করিয়াছিলেন। তাতে চা-নাশতার ব্যবস্থাও তাঁরা করিয়াছিলেন। মন্ত্রীদের সাথে রাজবন্দীদের সে মিলনে কি আনন্দ ! কত উল্লাস ! কি কোলাকুলি ! প্রধানমন্ত্রী সময়োপযোগী ছোট বক্তৃতা করিলেন। জেলখানার মধ্যে পাবলিক মিটিং আর কি ? নযিরবিহীন ? নিশ্চয় ! রাজবন্দীদেরে মুক্তি দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর গোটা মন্ত্রিসভা লইয়া জেলখানায় গিয়াছেন এর নযির ইতিহাসে আর নাই। স্বাধীনতা সংগ্রাম করিয়া যাঁরা দেশ আযাদ করিয়াছেন (যেমন ভারত), কিম্বা বিপ্লব করিয়া যাঁরা রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র করিয়াছেন (যেমন রাশিয়া), তাঁরাও শাসনভার পাইয়াই পূর্ববর্তী শাসকদের আমলের রাজবন্দীদেরে পাইকারীভাবে খালাস দিয়াছেন। কিন্তু কেউ জেলখানায় গিয়া রাজবন্দীদেরে অভ্যর্থনা করেন নাই। আওয়ামী লীগ সরকারের এ কাজ ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকিবে। এটাকে সেন্টিমেন্টাল বলিবেন ? সেন্টিমেন্টাল ত বটেই। কিন্তু উঁচু দরের সেন্টিমেন্ট। প্রতীকে রূপায়িত সেন্টিমেন্ট। প্রেম-ভালবাসা হইতে শুরু করিয়া মে ডে শহীদ দিবস স্বাধীনতা দেশ-প্রেম ইত্যাদি ভাবালুতা যে ধরনের সেন্টিমেন্ট এটাও তাই । রাজনৈতিক অজুহাতে কাউকে বিনা বিচারে বন্দী করার বিরোধী আওয়ামী লীগ। একুশ দফার ওয়াদা এটা। এটা যে সত্যই ওয়াদা ছিল, ধাপ্পা ছিল না, দেখাইবার জন্য দফতরে বসিয়া প্রধানমন্ত্রী মুক্তির আদেশ দিলেই ওয়াদা পূরণ হইত। কিন্তু আওয়ামী লীগ যে সত্যই বিশ্বাস করে বিনা-বিচারে কাউকে বন্দী করা অন্যায়, তা দেখান হইত না। মন্ত্রিসভার জেলখানায় যাওয়া এরই প্রতীক। এই প্রতীকের দরকার ছিল এবং আছেও এ দেশে। বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মী-নেতাদেরে বিনা-বিচারে বন্দী করা

আমাদের দেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্য। পর পর যত দল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে, সবাই এই কাজ করিয়াছেন। বিরোধী দলের লোকের দেশ-প্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিদেশীর ইংগিতে ও সাহায্যে দেশ ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমনি সব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। বছরের পর বছর ধরিয়া লোকজনকে বন্দী রাখিয়াছেন। তাঁদের শুধু স্বাধীনতা হইতে, দেশ সেবার অধিকার হইতেই বঞ্চিত রাখেন নাই, পারিবারিক জীবন হইতে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি ফরয দায়িত্ব পালন হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে স্বাস্থ্যভংগ করা ছাড়াও তাঁদের সংসার ও পরিবার ধ্বংস করিয়াছেন। এটা যে কত বড় নৈতিক পাপ, রাজনৈতিক অপরাধ, সে কথা জোরের সংগে বলার ও দৃঢ়তার সংগে প্রতিকার করার দরকার ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার তাই করিয়াছিলেন। ফলে দেশে রাজনৈতিক নিরাপত্তার ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিরোধী দলের মধ্যে বিশেষভাবে এবং জনসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল। আরও বিশেষভাবে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে এ আশ্বস্তি আসিয়াছিল যে অতীতে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের প্রতি তাঁরা যে অন্যায় যুলুম করিয়াছিলেন, আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা তার প্রতিশোধ লইবেন না।

বস্তুতঃ কথাটা উঠিয়াছিলও। আমরা কেবিনেট-সভায় যখন রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি ও নিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রস্তাব আলোচনা করি, তখন কোন কোন বাস্তববাদী মন্ত্রী মাত্র কয়েক মাসের জন্য নিরাপত্তা আইন বলবৎ রাখিতে বলিয়াছিলেন। তাঁরাও নীতি হিসাবে বিনা-বিচারে আটক রাখার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে যাঁরা অতীতে এইরূপ আটকাদেশ দিয়াছিলেন, তাঁদের কিছুদিন জেলের ভাত খাওয়াইয়া নিরাপত্তা আটকের মজা চাখান দরকার। তাঁরা খুব জোরের সংগেই বলিয়াছিলেন যে ওঁদেরে মজা চাখাইলে ভবিষ্যতে তাঁরা আর ও-রূপ কাজ করিবেন না। আর যদি ঐরূপে মজা না চাখাইয়া অমনি-অমনি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাঁরা ভবিষ্যতে আবার মন্ত্রীর গদিতে বসিয়াই বিরোধীদলের লোককে আটক করা শুরু করিবেন। বাস্তববাদী বিষয়ীর দিক হইতে তাঁদের যুক্তিতে জোর ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা তাঁদের ঐ যুক্তি গ্রহণ করেন নাই। অধিকাংশেই বলিলেন ঃ রাজনৈতিক প্রতিশোধ-নীতির কোন শেষ নাই। ঐ নীতিতে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া কোনদিনই আসিবে না। তাতে গণতন্ত্র বিকাশের পথ রুদ্ধ হইবে।

পরবর্তীকালের শাসকদের হাতে সত্য-সত্যই আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দই বেশি মার খাইয়াছেন। এবারের যুলুম আরো বেশি। আটক ছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগ।

মামলা-মোকদ্দমা খানা-তাল্লাশি। সম্পত্তি ক্রোক। মায় সংবাদপত্র আফিসে তালা লাগান ও প্রেস বাযেয়াফতি পর্যন্ত। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মতামত তাতেও বদলায় নাই। এর পরেও তাঁরা যদি কোন দিন ক্ষমতায় যান তখনও আজিকার যালেমদেরও বিনা-বিচারে আটকের আদেশ দিবেন না।

৪. শিক্ষা-মন্ত্রিত্বের উদ্যোগ

ওযারতি পাওয়ার দুএকদিন পরেই শিক্ষাবিদদের সাথে আমার পরামর্শ সভা বসিল। শিক্ষা পরীক্ষা পাসের হার ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি উপরে বর্ণিত-মতই আমার অভিমত প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা দিলাম। উপসংহারে নীতিনির্ধারণের ভাষায় বলিলাম ঃ 'আমরা পরিণামে পরীক্ষা ব্যবস্থা উঠাইয়া দিব। তারই পরখ স্বরূপ আপনারা এবার শতকরা আশি জন, আগামী বৎসর শতকরা নব্বই জন এবং তৃতীয় বছরে শতকরা এক শ' জনই পাশ করাইবেন।'

বোধ হয় সমবেত সুধীবৃন্দ স্তম্ভিত হইলেন। কেউ-কেউ বলিলেন ঃ 'কেমন করিয়া তা হইবে ? প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিলেও পাশ করাইতে হইবে ?'

আমি জোরের সাথেই বলিলাম ঃ 'জি হাঁ ! প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলেও পাস করাইতে হইবে।'

অনেক যুক্তি-তর্ক ও কথা-কাটাকাটি হইল। অবশেষে একজন বলিলেন ঃ তাতে শিক্ষার মান যে নিচু হইয়া পড়িবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম ঃ 'হোক না একটু নিচু। আমাদের দেশের সবকিছুরই ত মান নিচু হইয়াছে। মন্ত্রিত্বের মান নিচু না হইলে আমি কি শিক্ষামন্ত্রী হইতে পারিতাম? আমার বেআদবি মাফ করিবেন। শিক্ষকতার মান নিচু না হইলে আপনারই কি সকলে অধ্যাপক ও বিভাগীয় হেড হইতে পারিতেন ? কেরানী প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন। দারোগা এস পি হইয়াছেন। মুনসেফ জাস্টিস হইয়াছেন। পাকিস্তান হওয়ার ফলেই। এই পাকিস্তান আনিয়াছে ছাত্ররা। তারাও পাকিস্তানের এক-আধটু সুবিধা ভোগ করুক না।

শিক্ষাবিদরা বেজার হইলেন। আমি শিক্ষা-সমস্যার কথা না বলিয়া রাজনৈতিক কথা বলিতেছি, একথা মুখ ফুটিয়া বলিলেন না বটে, কিন্তু ভাবেগতিকে তা বুঝাইলেন। আমি সাধ্যমত বুঝাবার চেষ্টা করিলাম যে শিক্ষার মান নিচু করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তার দরকারও নাই। কারণ শিক্ষার মান এখন নিচুই আছে। আমার উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষার মানটাকে নিচু করিয়া শিক্ষার মানের সমপর্যায়ে আনা। আমরা সমবেত

চেষ্টায় যেদিন শিক্ষার মান উন্নত করিতে পারিব, সেইদিন পরীক্ষার মানও তদনুপাতে উন্নত করিব। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ত আসলে এই যে আমরা বছর দীঘালি ছাত্রদেরে যা পড়াইলাম, তা তারা পড়িয়াছে বুঝিয়াছে কি না তারই টেস্ট করা ? তার বদলে আমরা যদি ছাত্রদেরে না পড়াইয়াই, শুধু কতকগুলো পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াই, সেই সব পুস্তক হইতে, অনেক সময় সেইসব পুস্তকের বাইরে হইতেও, প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদের বিদ্যা পরখ করিতে চাই, তবে সেটা পরীক্ষা হয় না, হয় অবিচার। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তা নিষ্ঠুরতা, যুলুম। এর ফলে শিক্ষার গতি ব্যাহত হইতেছে, কত শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সর্বনাশ হইতেছে গ্রাম্য জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিয়া তা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। শিক্ষার মান সম্পর্কে আমি বলিলাম যে শিক্ষার মানের তুলনামূলক বিচার হয় বিদেশী শিক্ষা-প্রাপ্তদের সাথে আমাদের শিক্ষা-প্রাপ্তদের মোকাবিলা হওয়ার বেলাতেই। আমাদের শিক্ষিতদের কয়জন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশীদের মোকাবেলা করিবার সুযোগ পায় ? দেশী-বিদেশী বৃত্তি পাইয়া যে সব ছাত্র শিক্ষা ও ট্রেনিং লাভের জন্য বিদেশে যায়, শুধু তাদের বিদ্যাই আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ডের কষ্টিপাথরে পরখ করা হয়। আমাদের দেশীয় বিভিন্ন পরীক্ষায় শতকরা একশ জনই পাস করাই আর শতকরা ত্রিশ জনই পাস করাই, উপরের দশটি ছেলে ভাল হইবেই। এরাই বিদেশে যাওয়ার চান্স পায়। তাদের প্রায় সবাই এই উপরের দশটি প্রতিভাবান ছেলের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হয়। বাকী শতকরা নব্বই জনই দেশের অভ্যন্তরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি-বাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া জীবনযাপন করে। বিদেশী শিক্ষার মানের সাথে মোকাবিলা করার কোন কারণ বা সুযোগ এদের ঘটে না। ঘটিবেও না। অবিলম্বে আমাদের সকল স্তরে শিক্ষার মিডিয়ম হইবে বাংলা। তবে ইংরাজীতে কাবেলিয়ত না থাকিলে আমাদের ছেলেদের ফেল করান হইবে কেন ? কাজেই আমাদের শিক্ষাবিদরা ও শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এক কল্পিত আকাশচুম্বী শিক্ষার মানের নিরিখ দিয়া আমাদের ছাত্র-জনতাকে বিচার করিবার চেষ্টা করিয়া শুধু ভুল নয় অবিচার ও অন্যায়ও করিতেছেন। আন্তর্জাতিক উচ্চ মান দিয়া বিচার করিলে স্বয়ং আমাদের অধ্যাপক-শিক্ষকরা শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং দেশী অনেকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে বিদেশীদের মোকাবিলায় পাত্তা পাইবেন না, সে কথা বলিতেও ছাড়িলাম না।

আমার শিক্ষা-নীতির কথা শুনিয়া অনেকেই বিপদ গণিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কানে কেউ-কেউ কথাটা তুলিয়াও ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খাঁ সাহেব এসব ব্যাপারে মূলতঃ আমার সহিত একমত ছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে

শিক্ষাবিদদের বিশেষ কোনও সুবিধা হইল না। আমি এ বিষয়ে সক্রিয় পন্থা গ্রহণের চিন্তার আলোচনা করিতে লাগিলাম।

৫. শিক্ষা–মন্ত্রিত্বের অবসান

কিন্তু আমাদের লিডার শহীদ সাহেব সব ওলট–পালট করিয়া দিলেন। তিনি কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। আমাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বানাইলেন। শিক্ষা প্রাদেশিক বিষয়। কেন্দ্রে ও–বিষয়ে বিশেষ কিছু করণীয় নাই। অতএব আমার ঘাড়ে চাপাইলেন কেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় দুইটি বিষয় ঃ শিল্প ও বাণিজ্য। ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক মন্ত্রী হইয়াছিলাম। ১২ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইলাম। ছয়দিনের শিক্ষামন্ত্রিত্ব হারাইয়া খুবই দুঃখিত ও নিরাশ হইয়াছিলাম। শিক্ষা পরিকল্পনার বিরাট সৌধ আমার তাসের ঘরের মতই ভাংগিয়া পড়িল। প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান স্বয়ং শিক্ষা–দফতরের ভার নিলেন বলিয়া অনেকখানি সান্ত্বনা লইয়া করাচি গেলাম।

কিন্তু অল্পদিনেই আমি শিক্ষা–দফতর হারাইবার দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। শিল্প–বাণিজ্য দফতরের বিশাল ও অসীম সাগরে ডুবিয়া গেলাম। শুধু কথার কথা নয়। সত্যই যেন এক–একটা মহাসাগর। কত বিভাগ, আর কত অফিসার ! শিক্ষা দফতর ও বাণিজ্য দফতর দুইটি পৃথক এবং খানিকটা দূরে অবস্থিত। বাণিজ্য দফতর ছিল সাবেক সিন্ধু চিফকোর্ট বিল্ডিং–এ। আর শিল্প–দফতর ছিল মূল পাক সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং–এ। আমি সাধারণতঃ বাণিজ্য–দফতরে অবস্থিত মন্ত্রির চেম্বারেই বসিতাম। এটাই নাকি ছিল তৎকালের প্রথা। দুই দফতরের দুই মন্ত্রী থাকিলে অবশ্য তাঁরা–যাঁরা–তাঁর দফতরেই বসিতেন। কিন্তু দুই দফতরের এক মন্ত্রী থাকিলে তিনি বাণিজ্য দফতরেই বসিতেন। আমার নিকটতম পূর্ববর্তী মিঃ ইব্রাহিম রহিমতুল্লা আমার মতই দুই দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিও বাণিজ্য দফতরের চেম্বারেই বসিতেন। আমাকেও সেখানে বসান হইল। শিল্প দফতরের সেক্রেটারি মিঃ আব্বাস খলিলী ও বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারি মিঃ কেরামতুল্লাহ উভয়েই জাঁদরেল আই. সি. এস.। উভয়েই আমাকে ঘুরাইয়া–ঘুরাইয়া সারা আফিস দেখাইলেন এবং সকলের সাথে পরিচয় করাইয়া দিলেন।

তেইশা অধ্যায়

ওযারতি শুরু

১. সেক্রেটারিদের মোকাবেলা

কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী হইয়াই আমি দুই দফতরের সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডিপুটি সেক্রেটারিদের এবং এটাচড্ ডিপার্টমেন্টসমূহের বিভাগীয় প্রধানদের এক সম্মিলিত কনফারেন্স ডাকিলাম। কোন দিন মন্ত্রিত্ব করি নাই। কাজেই পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার কিছুই ছিল না। শুধু উপস্থিত-বুদ্ধি খাটাইয়া সাধারণ বুদ্ধির কাণ্ডজ্ঞানের বক্তৃতা করিলাম। আমি জানিতাম, 'আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই' একথা বলার মত বুদ্ধিমানের কাজ আর হইতে পারে না। কাজেই আমি সেই পন্থাই ধরিলাম। বক্তৃতায় বলিলাম ঃ 'যে কাজের ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তার কিছুই আমি জানি না। আপনারাই আপনাদের অভিজ্ঞতা দিয়া আমাকে ঠিক পথে চালাইবেন।' তাঁরা যে শুধু অভিজ্ঞতাই নয়। লেখাপড়া ও বিদ্যা-বুদ্ধিতেও তাঁরা সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। ছিলেন বলিয়াই ঐ সব সরকারী চাকুরি পাইয়াছেন। আমি নিচুমানের ছাত্র ছিলাম বলিয়াই চেষ্টা করিয়াও সরকারী চাকুরি পাই নাই। চাকুরি পাই নাই বলিয়াই ওকালতি ধরিয়াছিলাম। বাংলার প্রবচন 'যার নাই অন্য গতি সেই ধরে ওকালতি'ও শুনাইলাম। ঐ ওকালতি করিতে করিতে জনগণের দাবি-দাওয়া লইয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম করিয়াছি। তাদের ভোটে নির্বাচিত হইয়া আইন-সভার মেম্বর ও মন্ত্রী হইয়াছি। মন্ত্রীরূপে আজ তাঁদের উপরে বসিয়াছি বটে কিন্তু তাতেই জ্ঞান-বুদ্ধিও আমার তাঁদের চেয়ে বেশি হইয়া যায় নাই। আমার দায়িত্ব ও অধিকার জনগণের মংগলের জন্য নীতি নির্ধারণ করা। আর অফিসারদের কর্তব্য সে নীতি নির্ধারণে আমাকে উপদেশ দেওয়া ও সহায়তা করা। উপদেশ দিয়াই তাঁদের কর্তব্য শেষ। তাঁদের উপদেশ অগ্রাহ্য করার অধিকার মন্ত্রীর আছে। তাঁদের পসন্দ না হইলেও মন্ত্রীর আদেশ তাঁদের পালন করিতে হইবে।

২. অবস্থা পর্যবেক্ষণ

মাত্র বার জন আওয়ামী লীগ মেম্বর লইয়া লিডার প্রায় পঞ্চাশ জনের কোয়েলিশনের মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কোয়েলিশনের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানী।

সুতরাং ইঁহাদের দয়ার উপরেই আমাদের মন্ত্রিসভা একান্তভাবে নির্ভরশীল। এঁদের প্রায় সকলেই অল্পদিন আগে পর্যন্ত মুসলিম লীগার ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যার প্ররোচনায় এঁরা মুসলিম লীগ ছাড়িয়া 'রিপাবলিকান পার্টি' গঠন করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই প্রেসিডেন্ট মির্যার প্রভাব এঁদের উপর অসীম। ইস্কান্দর মির্যার কুনযরে পড়িলেই আমাদের মন্ত্রিত্ব খতম। তেমন দুর্ঘটনা যেকোন সময়ে ঘটিতে পারে, সে সম্বন্ধে আমরা গোড়া হইতেই সচেতন ছিলাম। প্রধানতঃ যুক্তনির্বাচনের ভিত্তিতে যথাসম্ভব সত্বর সাধারণ নির্বাচন করাইবার উদ্দেশ্যেই লিডার মন্ত্রিত্ব গঠনের দায়িত্ব নিয়াছিলেন। আমি লিডারের সহিত একমত হইয়াও বলিয়াছিলাম যে ঐভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করাইতে হইবে ঠিকই, কিন্তু কিছু-কিছু কাজ না করিলে জনগণ আমাদেরে ভোট দিবে কেন? লিডারের নীরব সমর্থন লাভ করিয়া আমি কালবিলম্ব না করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প-এলাকা সফর করিলাম। শিল্প-বৈষম্যের মোটামুটি একটা ধারণা হইল।

দেখিলাম, পূর্ব পাকিস্তানে শুধু যে প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠাই হয় নাই, তা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। এমন বহু শিল্প সেখানে স্থাপিত হইয়াছে, কাচামালের জন্য যাদের প্রায় সর্বাংশেই আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের কত কাচামাল পড়িয়া রহিয়াছে ; তাদের ব্যবহারের জন্য কোনও শিল্প স্থাপিত হয় নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের এই শিল্প চালু রাখিতেই আমাদের অনেক বিদেশী মুদ্রা খরচ হইয়া যাইতেছে।

৩. হাই লেভেল কনফারেন্স

শাসনতন্ত্র অনুসারে বিশেষ ধরনের কতিপয় শিল্প ছাড়া সব শিল্পই প্রাদেশিক বিষয়। কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রয়োগের আট মাস পরেও সমস্ত শিল্প কার্যতঃ আগের মতই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আছে। বাণিজ্য কেন্দ্রীয় বিষয়। কাজেই আমদানি-রফতানির ব্যাপারে পূর্ব-পাকিস্তানীদের করাচির দিকেই চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। সফর শেষ করিয়া লিডারের নীরব অনুমোদন ধরিয়া লইয়া ঘোষণা করিলাম : 'অতপর আমাদের শিল্পায়ন পূর্ব-পাকিস্তানমুখী হইবে। নয়া সব শিল্প পূর্ব-পাকিস্তানে স্থাপিত হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানে আর কোনও নয়া শিল্প স্থাপিত হইবে না।'

এর পর প্রথম সাক্ষাতেই লিডার আমাকে বলিলেন : এসব কি পাগলামি শুরু করিয়াছ তুমি ?

লিডারের সামনেই দু-চারজন পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রী ও অফিসার বসা ছিলেন। আমি ঈষৎ হাসিয়া জবাব দিলাম : 'ইলেকশনের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, সার।' যেন মাটির নিচে হইতে সুড়ং বাহিয়া একটা আওয়ায হইল : হুম্‌ম্‌। এই বিশাল আওয়াযকে আমার কাজে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবাদ মনে করিয়া ওঁরা সবাই খুশী হইলেন। আমি কিন্তু আমার নেতার মুখে কোনও বিরক্তি আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। মুখে তিনি ওসম্বন্ধে কিছু বলিলেনও না আমাকে। অতএব আমি নির্ভয়ে নিজের কাজ করিয়া চলিলাম। শিল্প-দফতরের তৎকালীন সেক্রেটারি মিঃ আব্বাস খলিলীর পরামর্শে উৎসাহে ও সহযোগিতায় আমি শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মিলনী ডাকিলাম আমাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের দুই মাসের মধ্যে। কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারিদ্বয়সহ অন্যান্য অফিসাররা, প্রাদেশিক শিল্প-বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রিদ্বয়সহ অফিসাররা এই সম্মিলনীতে যোগ দিলেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরের এই সম্মিলনীর বৈঠক বসিল। কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে আমিই এই সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিলাম। পরম হৃদ্যতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার আন্তরিক আগ্রহের আবহাওয়ার মধ্যে সম্মিলনীর কাজ চলিল। অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইল ? অধিকার দেওয়া-নেওয়ার অত্যাবশ্যক উদারতার দ্বার খুলিয়া গেল। শাসনতান্ত্রিক অনেক দৃশ্যতঃ দুঃসাধ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বাহির হইয়া পড়িল। সম্মিলনীতে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইল, তার মধ্যে এই কয়টা প্রধান :

(১) শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ শিল্প ছাড়া আর সব শিল্পের পূর্ণ ও একক কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হইল।

(২) আমদানি-রফতানির ব্যাপারে করাচিস্থ চিফ কন্ট্রোলার অফিসের কতৃত্বের অবসান করা হইল। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য চাটগাঁয়, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য লাহোরে এবং ফেডারেল অঞ্চলের জন্য করাচিতে তিনটি স্বাধীন ও অন্য-নিরপেক্ষ আমদানি-রফতানি কন্ট্রোলার-অফিস স্থাপিত হইল।

(৩) পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ও সরবরাহের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সাপ্লাই এণ্ড ডিভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চাটগাঁ শাখা আপগ্রেড করিয়া একজন এডিশনাল ডাইরেক্টর-জেনারেলের পরিচালনাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজন মিটাইবার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইল।

(৪) ব্যবস্থা হইল, বৈদেশিক মুদ্রার দুই প্রদেশের ও করাচির অংশ পূর্বাহ্নে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে এবং চাটগাঁর কন্ট্রোলার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের, লাহোরের

কন্ট্রোলার পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের এবং করাচির কন্ট্রোলার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরের সহিত পরামর্শ করিয়া লাইসেন্স বিতরণ করিবেন।

৪. স্পেশাল কেবিনেট মিটিং

এইসব সিদ্ধান্তের সব কয়টাই নীতি-নির্ধারক বিধায় এবং ওসবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার ও এলাকা সংকুচিত হইতেছে বলিয়া নিয়মানুসারে ওতে কেবিনেটের অনুমোদন দরকার ; আমি সে অনুমোদন চাহিলাম। কেবিনেটের বিশেষ বৈঠকে আমার প্রস্তাব পেশ করা হইল। সে কেবিনেট মিটিং-এর কথা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কেবিনেট রুমে এই বৈঠক। মিটিং শুরু হইবার আগেই আমরা অনেকে হাযির হইয়াছি। পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদের অনেককেই দেখিলাম গম্ভীর। সেদিনকার আলোচ্য বিষয় লইয়া আমাকে কেউ-কেউ ঠাট্টা করিয়া বলিলেনঃ 'আপনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী না প্রাদেশিক মন্ত্রী তা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।' বুঝিলাম, ঝড় উঠিবার পূর্ব লক্ষণ। আমাকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। এঁদের সাথে এক হাত লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

কিন্তু কেবিনেট মিটিং-এ আমার উপর হামলা হইল সম্পূর্ণ আশংকাতীত দিক হইতে। কেউ কিছু বলিবার আগে প্রধানমন্ত্রীই আমাকে হামলা করিলেন। বুঝিলাম, শত্রুপক্ষের সেনাপতিত্ব নিয়াছেন স্বয়ং আমার নেতা। এজন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। হামলাও কি যেমন-তেমন ? দক্ষ তীরন্দাযের ক্ষিপ্রতায় ও কৌশলে লিডার আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করিতে লাগিলেন। বড়ই বেকায়দায় পড়িলাম। তিন ঘন্টাব্যাপী কেবিনেট মিটিং ত নয়, দস্তুরমত সেশন আদালত। আমি যেন আসামীর কাঠগড়ায় । চার্জ যেন নরহত্যা বা হত্যার চেষ্টা। সুহরাওয়ার্দীর মত কুশাগ্র-বুদ্ধি সুদক্ষ ব্যারিস্টার মার্কিন বা ফরাসী আইন মোতাবেক আসামীকে জেরা করিতেছেন। সে জেরায় আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা, শাসনতান্ত্রিক বাধা-নিষেধ, পাকিস্তানের অখণ্ডতা, শক্তিশালী ঐকিক কেন্দ্র বনাম ফেডারেল কেন্দ্রের তুলনামূলক গুণাগুণ, কিছুই বাদ গেল না। এমন কি আমার অখণ্ড পাকিস্তানী দেশ-প্রেমের প্রতি কটাক্ষ পর্যন্ত হইয়া গেল। আমি সাধ্যমত সব কথার জবাব দিতে লাগিলাম। কিন্তু সুহরাওয়ার্দীর জেরার সামনে সম্বিৎ রাখা চলে কতক্ষণ ? আমার জিভ ও গলা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে অপমানে, তার পরে অভিমানে, আরও পরে রাগে

আমি ফুলিতে লাগিলাম। কিন্তু তবু লিডারের দয়া হইল না। মাঝে-মাঝে জেরার ফাঁকে-ফাঁকে আমি কেবিনেট কলিগদের দিকে নযর ফিরাইতে লাগিলাম। পূর্ব পাকিস্তানী সকলের মুখেই দরদ ও সহানুভূতি দেখিলাম। আমার বিপদে তাঁদের মুখ শুকনা। পক্ষান্তরে পশ্চিমা ভাইদের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। তাঁরা সবাই শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতী ; সুতরাং শক্তি বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধী। আমার লিডারের মতও তাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রীর হাতে তাঁদের স্বার্থ নিরাপদ বলিয়া তাঁরা নিশ্চিন্ত। কাজেই আমার নিজের লিডারের হাতে আমি নাকানি-চুবানি খাইতেছি দেখিয়া তাঁরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা উপভোগ করিতেছেন।

৫. শহীদ সাহেবের অপূর্ব কৌশল

বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে তাঁদের যা যা বলিবার ছিল, যেসব কথা অহরহ তাঁদের মুখে শুনিয়াছি, সেসব কথাই প্রধানমন্ত্রী তাঁদেরই মত করিয়া তাঁদেরই ভাষায়, তাঁদের চেয়েও অনেক জোরালোভাবে, বলিতে লাগিলেন। এমনকি যে সব কথা তাঁরা কোনও দিন বলেন নাই, হয়ত ভাবেনও নাই, সেই ধরনের কথাও তিনি অনেক বলিলেন। কত কথা তুলিয়া-তুলিয়া তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন ঃ 'এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে ?' 'এ সমস্যায় তোমার সমাধান কি ?' 'এ আপত্তি তুমি খণ্ডাও কি করিয়া ?' ইত্যাদি ইত্যাদি। যেসব বেকায়দার আতেক্কা প্রশ্নের জবাব আমি তাড়াতাড়ি দিতে পারি নাই, সেসব ক্ষেত্রে তিনি ধমকের সুরে 'তুমি কি বলিতে চাও ?'—বলিয়া আমার মুখে উত্তর যোগাইয়া দিলেন। আমি তাতে সাহায্য পাইলাম বটে কিন্তু বিষম অপমানও বোধ করিলাম। আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবে, বহুক্ষণ আগেই তা বুঝিয়া ফেলিয়াছিলাম। এতক্ষণে সম্মানটুকুও গেল। মনে মনে ঠিক করিলাম, কেবিনেট মিটিং-এর পর গোপনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করিয়া পদত্যাগ করিয়া চুপে-চুপে দেশে ফিরিয়া যাইব। মাত্র দুই মাস মন্ত্রিত্ব করিয়াই মন্ত্রীগিরির সাধ আমার মিটিয়াছে। কাজেই অতঃপর বেপরোয়াভাবে কথা বলিতে শুরু করিলাম। পশ্চিমা বন্ধুরা আমার রাগ দেখিলেন। কিন্তু কোনও কথা বলিলেন না। আমাকে তাঁরা একটি প্রশ্নও করিলেন না। তার দরকারই ছিল না। তাঁদের সব কথাই ত প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলিতেছেন। তবু যদি তাঁদের মধ্যে কেউ কখনো-সখনো কোনও কথা বলিতে বা আমাকে কোন প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রী মুচকি হাসিয়া হাতের ইশারায় তাঁকে নিরস্ত করিয়াছেন। ভাবটা এই ঃ তোমরা আর কি করিবে ? আমিই একে ফিনিশ করিতেছি।' ফলে কেউ কিছু বলিলেন না। তিন ঘন্টাব্যাপী কেবিনেট মিটিং কার্যতঃ হইয়া গেল

প্রধানমন্ত্রী ও আমার মধ্যে কথা কাটাকাটির বৈঠক। তার পরিণামও সকলেরই একরূপ জানা। কাজেই সবাই নীরব। আমাকে এমনভাবে নাস্তা-নাবুদ করিয়া নাকানি-চুবানি খাওয়াইয়া হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী চেয়ারটা পিছনে ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আমরাও সকলে দাঁড়াইলাম। হাতের ইশারায় আমাদিগকে বসিতে বলিয়া তিনি কেবিনেট রুমের এটাচ্ড বাথরুমের দিকে অগ্রসর হইলেন। বাথরুমের দরজার হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। বলিলেন ঃ 'আবুল মনসুর, তুমি আমাকে কনভিন্স্ড্ করিতে পারিয়াছ। এইবার তুমি তোমার কলিগদেরে কনভিন্স্ করিবার চেষ্টা কর।' বলিয়াই তিনি বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িলেন।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। প্রধানমন্ত্রী কনভিন্স্ড্ হইয়াছেন? আমার লিডারকে আমি কনভিন্স্ড্ করিতে পারিয়াছি ? বিশ্বাস হইল না। আমাকে বিদ্রূপ করিলেন না ত? দ্বিধায় পড়িলাম। লিডারের স্বভাবত তা নয়। তবে এটা কি ? কলিগদেরে কনভিন্স্ করিতে তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন কেন? কাদের কথা বলিয়াছেন, বুঝিলাম। কিন্তু কনভিন্স্ করিব কি? আমি মাথা তুলিয়া কারোর দিকে চাহিতেই পারিলাম না। ঘাড়সোজা না করিয়া চোখ যতটা কপালের দিকে তুলা যায় তা তুলিয়া কলিগদের মুখ-ভাব দেখিবার চেষ্টা করিলাম। সবাই পাশের লোকের সাথে কানাকানি ফিসপাস করিতেছেন। কেউ কোনও কথা বলিলেন না। আমাকে কোন প্রশ্নও করিলেন না। প্রশ্ন আর কি করিবেন ? কে করিবেন ? পশ্চিমা বন্ধুরা ? তাঁরা ত জিতিয়াই গিয়াছেন ? আমার মত পরাজিত পর্যুদস্ত ভূলুণ্ঠিত আহত সৈনিকের গায় 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' মারিয়া লাভ কি ? কাজেই তাঁরা কানাকানি করিয়াই চলিলেন । আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

এমনিভাবে দশ-পনর মিনিট কাটিয়া গেল। বাথরুমের দরজা খোলার আহট পাইলাম। সকলে সে দিকে চাহিলাম। প্রধানমন্ত্রী তোয়ালিয়ায় চোখ-মুখ মুছিতে-মুছিতে বাহির হইলেন। ঐ অবস্থায় প্রশ্ন করিলেন ঃ 'আবুল মনসুর, তুকি কি তোমার কলিগদেরে কনভিন্স্ করিতে পারিয়াছ ?' এ প্রশ্নের আমি কি জবাব দিব ? কনভিন্স্ করিব কি আমি যে ইতিমধ্যে একটি কথাও বলি নাই। কাজেই নিরুপায় সহায়হীনের একটুখানি জোর-করা শুষ্ক হাসি হাসিলাম মাত্র। প্রধানমন্ত্রী চোখ-মুখ ও হাত মুছা শেষ করিয়া ঈষৎ পিছন হেলিয়া হাতের তোয়ালিয়াটা বোধ হয় বাথরুমের টাওয়েল স্ট্যাণ্ডে রাখিলেন এবং যেন কতই চিন্তা করিতেছেন এমনিভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া নিজের আসনেবসিলেন। আমরা সবাই দাঁড়াইয়াছিলাম। আমরাও

বসিলাম। প্রধানমন্ত্রী আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পশ্চিমা বন্ধুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ 'আমি মনে করি, আবুল মনসুর যদি এই-এই কয়েকটা সংশোধনী গ্রহণ করে, তবে আমরা তার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি।' এই বলিয়া তিনি নিতান্ত মামুলি ভাষিক ও ব্যাকরণিক কয়েকটা সংশোধনী পেশ করিলেন এবং পশ্চিমা বন্ধুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ 'কি বলেন আপনারা ?'

তাঁরা আর কি বলিবেন ? প্রধানমন্ত্রী এতক্ষণ তাঁদেরে সমর্থন করিয়াছেন, এখন তাঁদের কর্তব্য প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করা। প্রধানমন্ত্রী আমাকে বকিয়া তাঁদের খুশী করিয়াছেন। এইবার তাঁদের উচিত প্রধানমন্ত্রীকে খুশী করা। সকলে এক বাক্যে বলিলেন ঃ 'আপনি যা ভাল বুঝেন।'

প্রধানমন্ত্রী এতক্ষণে ঘাড় ফিরাইয়া অমার দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ 'দেখ, যদি তুমি এই-এই সংশোধনী গ্রহণ কর তবে কেবিনেট তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। বুঝিলে আমার কথা ? তুমি এতে রাযী ?' এতক্ষণে আমি যেন লিডারকে কিছু-কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম। তাঁর চোখ যেন আমাকে ইশারা করিল ঃ 'সহজে রাযী হইও না।' আমি সে ইশারা মানিলাম। মাথা নাড়িলাম। আপত্তি করিলাম। ও-সব সংশোধনী গ্রহণ করিলে আমার স্কিমগুলি-ই অর্থহীন বেকার হইয়া পড়ে, এমনিভাব প্রকাশ করিলাম। ঝাঁকাঝাঁকি করিলাম। নৈরাশ্য দেখাইলাম। আমার স্কিমগুলি অবিকৃত গ্রহণ করিবার অনুরোধও করিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অটল-অনড়। ভাবটা যেন 'হয় গ্রহণ নয় বর্জন।' অগত্যা শেষ পর্যন্ত আমি হার মানিলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হইল। আমার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। লিডার আমাকে কংগ্রেচুলেট করিলেন। দেখাদেখি সকলেই করিলেন। এতক্ষণে আমি বুঝিলাম, তেমন কড়া শীতের মওসুমেও আমার জামা-কাপড় ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী কেবিনেট রুম হইতে বাহির হইয়া সোজা দুতলায় উঠিবার লিফটে চড়িলেন। আমাদের কাউকে কিছু বলিবার সুযোগ দিলেন না। তাঁর সাথে লিফটে উঠিবার জন্য আমাদের কাউকে ডাকিলেন না। লিফট এক লাফে দুতালায় উঠিয়া গেল। আমরা সকলে গাড়ি বারান্দার দিকে চলিলাম। আশাতীত জয়ের পুলকানন্দে আমি একরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন। হঠাৎ কার হাত আমার কাঁধে পড়িল। আমার চমক ভাংগিল। দেখিলাম, অর্থমন্ত্রী সৈয়দ আমজাদ আলী। তাঁর সুন্দর মুখের স্বাভাবিক মিষ্টি হাসি ক্রূর ভূ-ভংগিতে বিকৃত করিয়া দুষ্টামিপূর্ণ ভাষায় বলিলেন ঃ 'অভিনয়টা পারফেক্ট্ হইয়াছে। সারারাত ধরিয়া রিহার্সেল দিয়া ছিলেন বুঝি ?'

৬. মক্‌ফাইট ?

আমি বরাবরই অল্প-বুদ্ধি লোক। বন্ধুবরের রসিকতাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আন্দায করিলাম। তবু বোকার মত তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলাম। এবার তিনি সহজ-সুন্দর স্বাভাবিক মিষ্টি হাসিটা ফিরাইয়া আনিয়া বলিলেন ঃ 'প্রাইম মিনিস্টার ও আপনি যে মকফাইটটা করিলেন, তার কথাই আমি বলিতেছি। কাজ ত হইয়াই গিয়াছে। এখনও অভিনয় চালাইয়া যাওয়ার দরকার কি ?'

লিডারের তিন-তিন ঘন্টাব্যাপী পারফরমেন্সের আগাগোড়া ছবিটা নূতন রূপের চাকচিক্যে আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সত্যই তাই নাকি ? তাই ত কত জায়গায় তাঁর কত প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই আমার মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। পুলক-আনন্দ গর্ব-অহংকার ও বিনয়-কৃতজ্ঞতার ঢেউ-এর নিচে আমি তলাইয়া গেলাম। হে মহান নেতা, এমন করিয়া তুমি আমাকে জিতাইয়া দিয়াছ ? আমাকে নীরব দেখিয়া বন্ধুবর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া নিতে-নিতে বলিলেন ঃ 'ভয় নাই, আমি কাউকে বলিয়া দিব না। কেউ বুঝেন নাই। প্রধানমন্ত্রী সবাইকে হিপনোটাইয্‌ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন।'

একটু থামিয়া আবার তিনি বলিলেন ঃ 'আপনি যাই মনে করেন ভাই সাহেব, প্রধানমন্ত্রী অমন না করিলে আপনার প্রস্তাব পাশের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।'

কথায়-কথায় আমরা বিশাল লাউঞ্জটা পার হইয়া গাড়ি বারান্দার সামনে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমার গাড়িটা আগে আসিয়া গাড়িবারান্দাটা আটকাইয়া রাখার দরুন আমজাদ আলীর গাড়িটা দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি হাত উঠাইয়া আমাকে সালাম করিয়া হাসি-মুখে হন-হন করিয়া নিজের গাড়ির দিকে ছুটিলেন।

একদৃষ্টে অথবা দৃষ্টিহীনভাবে তাঁর দিকে চাহিয়া-চাহিয়া আবার আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারি অথবা বডিগার্ডের ডাকে আমার চমক ভাংগিল। আমি গাড়িতে চড়িবার জন্য সিঁড়িতে পা দিবার আগে একবার ছাদের দিকে ভক্তিভরে তাকাইলাম। ঠিক উপরেই প্রধানমন্ত্রীর বেডরুম।

৭. বিদেশী মুদ্রার অভাব

কেবিনেটে আমার স্কিম অনুমোদিত হওয়ার সংগে সংগেই আমি ফাইনান্স মিনিস্টার জনাব আমজাদ আলীর পিছনে লাগিলাম। চাহিলাম তাঁর কাছে আমার

প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা। তিনি তাঁর স্বাভাবিক মিঠা–মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন ঃ 'বিদেশী মুদ্রা নাই ভাই সাহেব, সে কথা আগেই বলিয়াছি।' একথা সত্য। কেবিনেটে আমার স্কিম আলোচনা হওয়ার সময় এই ধরনের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা ওটাকে আমার স্কিম রুখিবার একটি ধাপ্পা মনে করিয়াছিলাম। কাজেই তখন ও-কথায় আমি কোনও গুরুত্ব দেই নাই। কিন্তু এখন দিলাম। আমি রাগিয়া গেলাম। বলিলাম ঃ 'পূর্ব–পাকিস্তানের প্রয়োজনের বেলা টাকা ত থাকিবেই না। বরাবর আপনারা এসব করিয়াছেন। আর চলিবে না। টাকা আমাকে দিতেই হইবে। যেখান হইতে পারেন। আমার রাগ দেখিয়া বন্ধুবর হাসিলেন। বলিলেন ঃ 'ভাইসাব, যেদিন খুশী আপনি আমার দফতরে আসুন। সব কাগযপত্র দেখুন। অফিসারদের সাথে নিজে আলোচনা করুন। সব অফিসারকে আপনার সামনে হাযির করিয়া আমি সরিয়া পড়িব। আপনি ইচ্ছামত সব কাগযপত্র দেখিয়া এবং অফিসারদেরে জেরা করিয়া সব খবর নিবেন। তাতে যদি আমার কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তবে আপনি বিশ্বাস করিবেন ত ?'

বড় কঠিন কাজ। কঠিন ফরমায়েশ। আমি অর্থনীতির কিচ্ছু জানি না। অর্থ দফতরের কাগযপত্র কি বুঝিব ? কাজেই প্রথমে অসম্মতি জানাইলাম। বলিলাম ঃ 'আমি কাগযপত্র চাই না, চাই টাকা। আপনি অর্থমন্ত্রী। যেখান হইতে পারেন টাকা আনিয়া দেন।'

কিন্তু মিষ্টভাষী বন্ধুবরের টানে শেষ পর্যন্ত রাযী হইলাম। তাঁর চেম্বারে বসিয়া সেক্রেটারি-জয়েন্ট সেক্রেটারিসহ অনেক অফিসারের সাথে পুরা দুইদিন আলোচনা করিলাম। তাঁরা কাগযপত্র দেখাইলেন। আমি বুঝিলাম, সত্যই বিদেশী মুদ্রা নাই। শুধু যে বর্তমানে নাই, তাও নয়। আগামী প্রায় দুই বৎসরের আনুমানিক আয়ও অগ্রিম ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এমন সব খরচের খাতে বিদেশী পক্ষের সাথে এ রকম পাকাপাকি চুক্তি হইয়া গিয়াছে যে একতরফা তার একটা চুক্তিও বাতিল করিবার উপায় নাই।

আমি শুকনা–মুখে অর্থমন্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় হইলাম। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সব বিস্তারিত রিপোর্ট করিয়া তাঁর উপদেশ চাইলাম। তিনি গম্ভীর ও চিন্তাযুক্ত হইলেন। বলিলেন ঃ 'আমি ত আগেই তোমাকে হুঁশিয়ার করিয়াছিলাম, তোমার এই লম্ফ–ঝম্পে কোন কাজ হইবে না। এখন লাভটা কি হইল ? পূর্ব–পাকিস্তানীদের মধ্যে জাগাইলে বৃথা আশা। আর পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে সৃষ্টি করিলে নাহক দুশমনি।'

আমি বিশেষভাবে চাপিয়া ধরিলাম। বলিলাম ঃ 'আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভাবিবেন না। একটা কিছু উপায় বাহির করুন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আপনি খালি হাতে পূর্ব পাকিস্তানী ভোটারদের কাছে যাইতে পারেন না। কি জবাব দিবেন তাদের কাছে?'

আগামী ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি–মার্চে সাধারণ নির্বাচন করাইব, এ বিষয়ে আমরা তখন দৃঢ়সংকল্প। প্রধানমন্ত্রীই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অনড়। সুতরাং আমার এই কথাটায় বোধহয় আগামী নির্বাচনের কথাটা তাঁর মনে পড়িল। তাঁকে চিন্তাযুক্ত দেখা গেল। লিডারের চিন্তায় সাহায্য করিবার আশায় আমি বলিলাম ঃ 'মার্কিন বন্ধুরা আপনার খাতিরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কিছু করিবেন না?'

অন্য সময় হইলে কিম্বা অন্য কেউ একথা বলিলে লিডার বোধ হয় চটিয়া যাইতেন। কারণ এই সময় আওয়ামী লীগের ভিতরের একদল-সহ বামপন্থীরা সুহরাওয়ার্দী সাহেবকে গোপনে 'মার্কিন দালাল' বলিয়া গাল দিতেছিলেন। এ অবস্থায় এটাকে বক্রোক্তি মনে করা অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু আজ আমার ব্যাকুল আগ্রহাতিশয্য দেখিয়াই বোধ হয় ঐ ধরনের কোন সন্দেহই তাঁর মনে আসিল না। মুহূর্তমাত্র ভাবিয়া তিনি ফোন উঠাইয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলিকে ঐদিন বিকালে চারটার সময় চায়ের দাওয়াত দিলেন। আমাকে ঐ সময় হাযির থাকিতে বলিলেন।

৮. মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাহায্য প্রার্থনা

চায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সোজা বিষয়ী কথা পাড়িলেন। পূর্ব–বাংলার শিল্পায়নের জন্য সাহায্য দিতে হইবে। মিঃ ল্যাংলি সহজেই রাযী হইলেন সুপারিশ পাঠাইতে। জানাইলেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলেই মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে দশ মিলিয়ন ডলার (পাঁচ কোটি টাকা) 'কমডিটি এইড' রূপে দেওয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তা না আনায় ঐ সাহায্য অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। উহাকেই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এইডে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সেজন্য আইন পাস করিতে হইবে। মার্কিন রাষ্ট্রে উহাই নিয়ম। রাষ্ট্রদূত তা করাইবার ভার নিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করিলেন কয়েকজনকে ব্যক্তিগত পত্র লিখিতে।

মিঃ ল্যাংলির ভরশায় এবং প্রধানমন্ত্রীর তৎপরতায় আমি আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যান্য বিষয়ে মন দিলাম।

৯. আন্ত-আঞ্চলিক বৈষম্য

বাণিজ্য-দফতরের বিষয়াদি অধ্যয়ন করিতে গিয়া আমার ধারণা হইল আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দুইটি ত্রুটি দেশের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। একটি, ভারতের সংগে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রয়োজন ও সম্ভবমত বাড়িতেছে না। দ্বিতীয়টি, কমিউনিস্ট দেশসমূহের সাথে আমাদের কোনও ব্যবসা-বাণিজ্যিই হইতেছে না। এই দুইটিই রাজনৈতিক কারণসম্ভূত। কাশ্মিরের অধিকার লইয়া ভারতের সাথে আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক অতিশয় তিক্ত। কাজেই তার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াইবার চেষ্টা হয় নাই। ফলে আমাদের দুইটি বড় লোকসান হইতেছে। এক, আমরা পাটের একটা বড় ও ভাল খরিদ্দার হারাইতেছি। দুই, ভারত হইতে সস্তাদরে অল্প ভাড়ায় যে কয়লা পাইতে পারিতাম তা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এছাড়া আরও একটি ব্যাপারে আমরা ভারতের সহিত সদ্ভাবের সুযোগ নিতে পারি। ধরুন, নোয়াখালি, কুমিল্লা ও সিলেটের সীমান্তবাসী বহু পাকিস্তানী নাগরিক পুরুষানুক্রমে পার্শ্ববর্তী ভারতীয় জমি চাষাবাদ করিয়া ধান এদেশে আনে। ইহারা 'জিরাতিয়া' বলিয়া পরিচিত। ভারতের সহিত কোন চুক্তি না থাকায় ইহাদের প্রতি নানারূপ যুলুম করা হইতেছে। এদের সংখ্যা অনেক। এদের জন্য একটা চুক্তি করা আশু প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানে একটিমাত্র সিমেন্ট কারখানা। কলিকাতা তার হেড অফিস। তার কাচামাল চুনাপাথর আনা হয় ভারতীয় এলাকা হইতে রোপওয়ে বা দড়ির ঝোলানো সাঁকুর সাহায্যে। যদিও কারখানাটির ক্যাপাসিটি এক লক্ষ টনের উপর, কিন্তু তাতে উৎপন্ন হয় মাত্র ৪৭ হাজার টন। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের চিফ ইঞ্জিনিয়ার আবদুল জব্বার সাহেব আমাকে জানাইয়াছেন, বর্তমানেই আমাদের সিমেন্টের চাহিদার পরিমাণ দেড়লক্ষ টনের উপর। আগামী সনেই এর পরিমাণ দাঁড়াইবে আড়াই লক্ষ টন। কাজেই বর্তমানেই আমাদের একলক্ষ টন বাহির হইতে আমদানি করা দরকার। পশ্চিম পাকিস্তানই এই ঘাটতি মিটাইতে পারে। কিন্তু জাহাজের অভাবে ঐ সিমেন্ট আমদানির পরিমাণও যথেষ্ট নয় ; জাহাজ ভাড়ার দরুন দামও অনেক বেশি। সময় মত সরবরাহও হয় না। এতে পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত নির্মাণ-কাজ ও উন্নয়নমূলক কাজ সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হইতেছে।

আমি এইসব সমস্যা লইয়া শিল্প-দফতরের সেক্রেটারি মিঃ আব্বাস খলিলী ও বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারি মিঃ কেরামতুল্লার সাথে এবং তাঁদের সহকারীদের সাথেও বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। মিঃ খলিলী এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ ও

উদ্যম দেখাইলেন। কিন্তু মিঃ কেরামতুল্লাকে তেমন উৎসাহী দেখিলাম না। আমার মনে হইল, তিনি নিজেই ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। উভয়েই প্রবীণ আই. সি. এস.। অনেকদিন ধরিয়া যাঁর-তাঁর ডিপার্টমেন্টের হেড আছেন। কিন্তু মিঃ কেরামতুল্লাহ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর সংগে আমার স্কিম ও সে সম্পর্কে সেক্রেটারিদের ভাব-গতিকের আলোচনা করিলাম।

১০. সেক্রেটারিয়েটে ওলট-পালট

কয়েক দিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী অবস্থার প্রতিকার করিলেন। তিনি মিঃ কেরামতুল্লার বদলে মিঃ আযিয আহমদকে বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারি নিযুক্ত করিলেন। এই নিয়োগের পিছনে একটা ইতিহাস আছে। আমি অল্পদিনেই বুঝিয়াছিলাম যে চাকুরি-বাকুরির ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানীদের সুবিধা করিতে গেলে সেক্রেটারি-জেনারেলের অফিসের বিলোপ সাধন করিতে হইবে। শাসনতন্ত্রে চাকুরি-বাকুরির ব্যাপারে প্যারিটি আনয়নের বিধান থাকা সত্ত্বেও সেক্রেটারি-জেনারেলের দফতর সকল চেষ্টা ব্যাহত করিয়া দিতেছিল। এই দফতর থাকা পর্যন্ত এর অনুমোদন ছাড়া চাকুরি-বাকুরিতে কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমি গোপনে প্রধানমন্ত্রীকে আমার মনোভাব জানাইলাম। দেখিলাম, তিনিও সেই চিন্তাই করিতেছেন। বলিলেন : 'আমার ইচ্ছাও তাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ঐ দফতর ভাংগিয়া দিলে আযিয আহমদকে কোথায় বসাইবে ?' আমি বলিলাম : 'কেন, তাঁকে কোথাও এম্বেসেডর করিয়া পাঠাইয়া দিন। তাঁর ভাই মিঃ গোলাম আহমদও এম্বেসেডর আছেনই।' প্রধানমন্ত্রী বলিলেন : 'সরকারী কর্মচারীরা এম্বেসেডরিতে যাউক, এটা আমি পছন্দ করি না। আমার মনে হয় আমাদের কূটনৈতিক দফতরকে সজীব ও সক্রিয় করিতে হইলে রাজনৈতিকদের মধ্যেই ঐ সব পদ সীমাবদ্ধ করা দরকার। সরকারী কর্মচারীদের মন ধরা-বাঁধা নিয়মের কাঠামোতে গড়া। তাঁরা কূটনীতিক ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন না। কাজেই আমি নূতন করিয়া সরকারী কর্মচারীদেরে কূটনৈতিক চাকুরিতে পাঠাইব ত নাই, বরঞ্চ যাঁরা আছেন, তাঁদেরও উঠাইয়া আনিব। অতএব সেক্রেটারিয়েটের মধ্যেই কোথাও আযিয আহমদের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমি তাঁকে সেক্রেটারি-জেনারেলের পদ হইতে সরাইতে পারি না।'

এর কয়েকদিন পরেই বাণিজ্য দফতরে আমার নূতন স্কিম নয়ানীতি ও এর কার্যকারিতার খাতিরেই সেক্রেটারি বদলের কথা উঠিল।

খানিক থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া প্রধানমন্ত্রী নাটকীয় ভংগিতে আমার দিকে শাহাদত আংগুলের একটা তীর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন ঃ 'ইউ ! ইউ টেক হিম অ্যায্ ইওর কমার্স সেক্রেটারি।'

আমি ঘাবড়াইয়া গেলাম। মিঃ আযিয আহমদ শুধু সর্বজ্যেষ্ঠ আই.সি.এস.ই নন। 'মোস্ট স্টিফনেকেড বুরোক্র্যাট' বলিয়া তাঁর বদনাম বা সুনাম আছে। মন্ত্রীদের কোনও কথা তিনি শোনেন না। মন্ত্রীদেরই তিনি কানি আংগুলের চার পাশে ঘুরান। কথাটায় আমার বিশ্বাসও হইয়াছিল। পূর্ব-বাংলার চিফ সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় জনাব নূরুল আমিনের আমলে একবার তিনি হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'আমি প্রধান মন্ত্রীসহ সমস্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সিক্রেট-ফাইল রাখি এবং তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাই।' পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী বা কেবিনেট এই কাজের জন্য চিফ সেক্রেটারির বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় নাই। বরঞ্চ লোকে বলাবলি করিত আসলে চিফ সেক্রেটারিই পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী।

আমি প্রধানমন্ত্রীকে আমার আশংকার কথা বলিলাম। তিনি অভয় দিয়া বলিলেন ঃ 'ভয় পাইও না। আযিয আহমদের আর যত দোষই থাকুক, তিনি খুব যোগ্য ও দক্ষ অফিসার। তুমি তাঁকে নেও। আমি ত আছিই। কোনও অসুবিধা হইলে পরে দেখা যাইবে।' এইভাবে পাকিস্তান সরকারের সর্বাপেক্ষা দোর্দণ্ড-প্রতাপ 'আড়ষ্ট-গ্রীব বুরোক্র্যাট' জনাব আযিয আহমদ আমার মত সাদাসিধা 'লেদাভূষা' মন্ত্রীর সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন।

১১. একটি গুরুতর লোকসান

এই সঙ্গে আমার আরেকটি গুরুতর লোকসান হইল। বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারি বদলাইবার সময় প্রধান মন্ত্রী শিল্প-দফতরের সেক্রেটারিও বদলাইলেন। মিঃ আব্বাস খলিলীর জায়গায় মিঃ মোহাম্মদ খুরশিদকে শিল্প-দফতরের সেক্রেটারি করা হইল। আমি প্রধান মন্ত্রীর নিকট নালিশের ভাষায় কথাটা বলিতে গেলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন ঃ তোমার কথা মতই ত আমি খলিলীকে সরাইয়াছি।

প্রকৃত ঘটনা এই যে আমি সত্যই একদিন মিঃ খলিলীর বিরুদ্ধে এবং অপরদিন শিল্প-বাণিজ্য উভয় দফতরের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলাম। উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগটা করি অপযিশনে থাকিতে। সেটা ছিল এইরূপ ঃ প্রায় পাকিস্তানের সৃষ্টি-অবধি এই দুইজন সেক্রেটারি একই দফতরের সেক্রেটারিগিরি করিতেছেন। ফলে তাঁরা যাঁরা-তাঁর

দফতরকে নিজের জমিদারি মনে করিয়া থাকেন। চলেনও জমিদারের মতই। অফিসারদের প্রতি ব্যবহারও তাঁদের ব্যক্তিগত কর্মচারির মতই।

আর মন্ত্রী হইবার পর খলিলী সাহেবের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলাম যে মন্ত্রীদের তিনি মৌসুমী পাখী মনে করেন। কোন এক ক্লাবে বসিয়া বন্ধুদের কাছে মন্ত্রীদেরে 'সিযন্যাল বার্ড' বলিয়াছিলেন এবং সেক্রেটারিরাই আসল শাসনকর্তা, মন্ত্রীরা কিছু না, এই ধরনের উক্তি করিয়াছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ আমার কাছে নালিশ করায় আমি মিঃ খলিলীর কৈফিয়ৎ তলব করি। তিনি হাসি-মুখে সব কথা স্বীকার করিয়া তার যে ব্যাখ্যা দেন, তাতে আমি সন্তুষ্ট হই এবং উচ্চহাস্য করিয়া তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণ করি। এই ঘটনা সম্পর্কে ক্লাবে বন্ধুদের সাথে কথা বলিতে গিয়া মিঃ খলিলী আবার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করিয়াছেন বলিয়া আবার অমার কাছে খবর আসে। খলিলী সাহেব তারও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেন। আমি তাঁর ব্যাখ্যায় এবারও সন্তুষ্ট হই। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর চেম্বারে কথাটা উঠে। তিনি কার কাছে সবই শুনিয়াছিলেন। আমি ঘটনার বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। আমি নিজেই যে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করিয়াছিলাম, তাও সত্য। কিন্তু মিঃ খলিলীর ব্যাখ্যা যে যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য এবং তা যে গ্রহণ করিয়াছি, সব কথাও বলিলাম। প্রধানমন্ত্রী আর কিছু বলিলেন না। শুধুমাত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ একটা 'হুম' করিয়া অন্য কাজে মন দিলেন। তার পরেই এই বদলি। আমার সব কথার উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ খুরশিদ তোমার সব স্কিম ও প্ল্যানে তোমার সমর্থন ও সহায়তা করিবেন। আমি তোমার ধ্যান-ধারণার কথা তাঁকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি। তুমি শুনিয়া খুশি হইবে যে খুরশিদ নিজেকে আসলে সিলেট জিলার অধিবাসী বাংগালী মনে করেন।' বলিয়া হাসিলেন এবং আমাকে হাসাইবার চেষ্টা করিলেন।

১২. বাণিজ্য-দফতরের সেক্রেটারি

বাণিজ্য সেক্রেটারি হিসাবে মিঃ আযিয আহমদের সাথে প্রথম-প্রথম খুব সাবধানে কথা বলিলাম। তিনি কিন্তু প্রথম হইতেই বিনয়-নম্রতা ও আনুগত্যের পরকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। তথাপি তিনি যে পরিমাণে যত বেশি ভদ্রতা ও আনুগত্য দেখাইলেন, আমি সেই পরিমাণে ততবেশি সাবধান হইলাম।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মিঃ আযিয আহমদের প্রতি আমার ধারণা বদলাইতে লাগিল। আমার প্রতি তাঁর ভক্তি ও আনুগত্যের মধ্যে কোনও চালাকি বা ভন্ডামির আঁচ পাইলাম না। কারণ যেসব ব্যাপারে তিনি আমার সাথে একমত হইতেন না, সেসব বিষয়ে খুব জোরের সংগেই আমার সাথে তর্ক করিতেন। আমাকে অনড় দেখিলে শেষ পর্যন্ত বলিতেন ঃ 'আমার উপদেশ যা দিবার ছিল, তা দিলাম। আমার কর্তব্য এখানেই শেষ। এরপর আপনি যে আদেশ দিবেন, তাই বলবৎ হইবে এবং আমি অক্ষরে-অক্ষরে তাই পালন করিব। বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষা এবং বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক ঐতিহ্যই তাই।'

আমি তাঁর এই নীতি খুবই পসন্দ করিলাম। আমরা মন্ত্রীরা ভুল করিলে যেসব সেক্রেটারি আমাদের ভুল দেখাইয়া দেন, ভুলটাতেও সমর্থন দিয়া 'হাঁ হুযুর' করিয়া আমাদেরে খুশী করেন না, তাঁদেরে আমি খুবই পসন্দ করি। একথা আমি তাঁকে খোলাখুলিই বলিলাম ঃ 'নিজে কোনদিনই 'হাঁ হুযুরি' রাজনীতি করি নাই। অপরে আমার নিকট তা করুক, এটাও আমি চাই না।'

১৩. ভারত ও কমিউনিস্ট দেশের বাণিজ্য

কাজেই মিঃ আযিয আহমদের সহিত আমার বনিল ভাল ! আমি ভারতের সাথে ও কমিউনিস্ট দেশের সাথে আমাদের দেশের বাণিজ্যের সম্ভাবনা ও তার ভাল দিক দেখাইলাম। ইতিমধ্যে আমার এক ঘোষণায় বলিয়াছিলাম ঃ 'আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক রাজনৈতিক সীমান্ত ডিংগাইয়া যাইবে।' সে কথাটা তাঁকে বুঝাইয়া বলিলাম। আমার মতবাদের সমর্থনে ইংরাজ জাতির বাণিজ্য-নীতি, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়েও সে নীতি বলবৎ রাখার প্রথার কথা বলিলাম। মিঃ আযিয আহমদ খুবই মার্কিন ভক্ত হওয়ার এবং পাক-মার্কিন-চুক্তি-আদির দরুন এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোনও দ্বিধা-সন্দেহ থাকিতে পারে মনে করিয়া আমি তাঁকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে ইংরাজের এই বাণিজ্য-নীতিতেও ইংগ-মার্কিন বন্ধুত্বে কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই।

আমার এতসব বক্তৃতার পর মিঃ আযিয আহমদ পাক-ভারত বাণিজ্য-ব্যাপারে আমার সহিত একমত হইলেন। কমিউনিস্ট দেশের সাথে বাণিজ্যের ব্যাপারে তিনি রাযী হন কয়েক মাস পরে। তার আগে প্রাইম মিনিস্টার ও প্রেসিডেন্টের সহিত আলোচনা করিতে তিনি আমাকে উপদেশ দেন। এটাকে আমি আমার আংশিক সাফল্য মনে করিলাম। কারণ দেখিলাম, ভারত-বিরোধী মনোভাব তাঁর মুসলিম লীগারদের চেয়েও তীব্র। তবে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। পাকিস্তানের ভালর জন্য তিনি সব কাজে

রাযী ছিলেন। অতএব নিছক বাণিজ্যিক সম্পর্কের দিক দিয়া তিনি আমার মতবাদ গ্রহণ করিলেন। পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি রিনিউ করিবার সময় আগত-প্রায়। কাজেই আমি তাঁকে আমার সংকল্প বিস্তারিতভাবে বলিলাম। কেবিনেটে পেশ করিবার জন্য কাগযপত্র তৈয়ার করিতে আদেশ দিলাম। আমার সংকল্পিত পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির অন্যতম প্রধান নূতনত্ব ছিল এই যে বরাবরের ন্যায় এক-বৎসর মেয়াদী চুক্তির বদলে আমি তিন-বৎসর-মেয়াদী চুক্তির পক্ষপাতী ছিলাম। তিনি সহজেই আমার মত গ্রহণ করিলেন। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছিল যে আমদানি-রফতানি লাইসেন্স ইশু করা ও অন্যান্য আনুষংগিক আয়োজন করিতে-করিতেই বৎসরের বেশি সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। উভয় পক্ষ হইতে মেয়াদ বাড়াইবার জন্য দেন-দরবারও করিতে হয়। এতে অনেক সময় আমদানি-রফতানি দ্রব্যের মৌসুম পার হইয়া যায়।

১৪. ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি

ভারতের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাপারে আরেকটি বিষয়ে আমার পূর্ব-ধারণা ছিল। এটা পশ্চিম-বাংলায় নির্মিত ছায়াছবির ব্যাপার। পশ্চিম-বাংলায় উন্নত ধরনের ছায়াছবির নির্মাণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। তারই স্বাভাবিক উপসর্গরূপে তথায় অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ফিল্ম স্ক্রিপ্ট লেখকও হু হু করিয়া বাড়িতেছিল। পূর্ব-বাংলায় ছায়াছবি নির্মাণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বইও রচিত হয় নাই। অভিনেতা-অভিনেত্রীও পয়দা হয় নাই। এ অবস্থা আমাকে খুবই পীড়া দিত। অথচ এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা ও সম্ভাবনা ছিল না। পশ্চিম-বাংলার ছবিতে স্বভাবতঃই পূর্ব-বাংলা ছাইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার ছবি-নির্মাতাদেরই এজেন্টরা ঢাকায় বসিয়া ছবি-প্রদর্শনীর ব্যবসা করিত। দুই-একজন পাকিস্তানী যারা কোনও ফাঁকে এই ব্যবসায়ে ঢুকিয়াছিল, তারাও পশ্চিম পাকিস্তানী। পূর্ব-বাংলার ফিল্ম-শিল্প গড়নে তাদের কোনও স্বার্থ বা চেতনা ছিল না। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ফিল্ম রচনার যথেষ্ট উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল। এসবের প্রতিকার সম্বন্ধে কতিপয় পূর্ব-পাকিস্তানী উৎসাহী লোকের সাথে আমি আগেই আলোচনা করিয়াছিলাম। তাতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সরকারী উৎসাহ ও সহায়তা না পাইলে পূর্ব-বাংলায় ফিল্ম-শিল্প গড়িয়া উঠিবে না। ফলে মনে-মনে স্থির করিয়াছিলাম গবর্নমেন্ট হাতে পাইলে প্রথম সুযোগেই এটা করিব। সত্যসত্যই সরকার যখন হাতে আসিল, তখন জনাব আতাউর রহমান ও জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পরামর্শ করিয়া

প্রদেশে শিল্প-উন্নয়ন কর্পোরেশন স্থাপন করা ঠিক হইল। আর এদিকে কেন্দ্রে আমি এই সংকল্প করিলাম যে পূর্ব-বাংলায় যারা ফিল্ম-শিল্প গড়নে ওয়াদাবদ্ধ হইবেন, শুধু তাঁদেরই ভারতীয় ফিল্ম আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হইবে। আসন্ন পাক-ভারত চুক্তির এটা অন্যতম শর্ত হইবে বলিয়া সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদকে জানাইয়া দিলাম।

বাণিজ্য-দফতর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিয়া আমি পূর্ব-পাকিস্তান সফরে আসিলাম। পূর্ব-পাকিস্তানের সিমেন্ট ও চিনি-শিল্প পরিদর্শন এবারের সফরের আমার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের আমদানি-রফতানি কন্ট্রোলার পদের জন্য একজন উপযুক্ত অফিসার তালাশও এ সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই নূতন পদটি সৃষ্টি করিয়া অবধি এ বিষয়ে খুবই চিন্তাযুক্ত ছিলাম। পদটি যে কত বড় বিশাল দায়িত্বপূর্ণ পদ সেটা আমি ভাল করিয়াই বুঝিলাম। যাকে-তাকে এ পদ দেওয়া যাইবে না। সততা, সাধুতা ও সাহস এ পদের জন্য অত্যাবশ্যক। আমি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দী ও প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান উভয়ের সংগেই আলোচনা করিয়াছিলাম। তাঁরা বিভিন্ন অফিসারের নাম করিয়াছিলেন। মনে-মনে তাঁদেরই তালিকা করিয়া নিজে দেখিবার জন্যই এবারে পূর্ব-পাকিস্তানে আসিলাম।

সিমেন্ট সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তানের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সংগে পরামর্শ করিয়া ঢাকা-সিলেটে বসিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম ও আদেশ দিলাম। সাপ্লাই এণ্ড ডিভেলাপমেন্ট-এর ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ বি. এ. কোরেশীকে সংগে লইয়াই আসিয়াছিলাম। তাঁকে সংগে নিয়াই ছাতক সিমেন্ট ফেক্টরিতে গেলাম। ফেক্টরি-কর্তৃপক্ষের সংগে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, এই পরিমাণ টাকার মেশিনারি আমদানি লাইসেন্স পাইলে ছয় মাসের মধ্যে তাঁদের ফেক্টরিতে সাতচল্লিশ হাজারের জায়গায় এক লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদন করিতে পারেন। তাঁরা বলিলেন ঃ দুই-তিন বৎসর ধরিয়া তাঁদের দরখাস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে পড়িয়া আছে। মিঃ কোরেশীকে জিগ্‌গাসা করিয়া ওঁদের অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি প্রয়োজনীয় পরিমাণে লাইসেন্স ইশুর আদেশ দিয়া দিলাম। সে লাইসেন্স তাঁরা পাইয়াছিলেন। সিমেন্ট উৎপাদনও প্রায় একলক্ষ টন করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী হিসাবে তা দেখিয়া আসিতে পারি নাই।

কনট্রোলার পদের জন্য উপযুক্ত অফিসারও আমি এই সফরেই পাইয়াছিলাম। ইনি ছিলেন মিঃ শফিউল আযম। তিনি তখন খুলনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আমি তাঁর সাথে কথা বলিয়া তাঁর কাজ-কর্ম দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হইলাম যে তাঁকে আমার কাজের

জন্য সবচেয়ে যোগ্য লোক মনে করিলাম। তৎক্ষণাৎ সেইখানে বসিয়াই তাঁকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি স্বভাবতঃই খুশী হইলেন। কিন্তু আপত্তি জানাইলেন এবং আপত্তির কারণও প্রকাশ করিলেন। চাটগাঁয় কনট্রোলার অফিস। চাটগাঁ তাঁর বাড়িও। কাজেই আত্মীয়-স্বজনের চাপ পড়িবে। চাকরিটাও ত চাপের চাকরি। কাজেই তিনি অসুবিধায় পড়িবেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম ঃ এই রকম বিবেকবান লোকই ত আমি চাই। বলিলাম ঃ 'তোমার আপত্তি আমি মানিলাম না। তুমি প্রস্তুত হও।' তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমি করাচি ফিরিয়াই তাঁকে সেখানে কয়েকদিন ট্রেনিং দেওয়াইলাম। আমার পরিকল্পনা ও চিন্তাধারার সাথে তাঁকে পরিচিত করিয়া চাটগাঁ কনট্রোলার করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। তিনি পরম যোগ্যতা ও সাধুতার সাথে সে কাজ চালাইলেন।

১৫. দুর্ঘটনায় আহত

কিন্তু চিনি-শিল্প সম্বন্ধে কিছুই সুবিধা করিতে পারিলাম না। প্রথম মিল দর্শনা শুগার মিল পরিদর্শন করিতে গিয়া সেখানেই দুর্ঘটনায় আহত হইলাম। দুর্ঘটনাও একেবারে অদ্ভুত এ্যাক্সিডেন্ট। সারা মিল ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিলাম। ষাট বৎসরের বুড়া তরুণ সাহেব ম্যানেজারদের আগে-আগে এক শ ফুট উচা লোহার রডের সিঁড়ি বাহিয়া সুউচ্চ ট্যাংকগুলির মাথায় উঠিলাম নামিলাম। তরুণ সাহেবরা বলিলেন ঃ আমার চলাফেরা দেখিয়া তাঁরা পর্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাইতেছেন। কিন্তু কিছু হইল না। সারা মিল দেখিয়া অবশেষে লেবার কোয়ার্টার দেখিতে গিয়াই বিপদে পড়িলাম। গরুর খুড়ের বর্ষাকালের গাতা শুকনার দিনে 'গোস্পদ' হইয়া আছে। এই গোস্পদই আগামী বর্ষায় 'গোস্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ' হইবে। এই গোস্পদের একটিতে আমার ছেলেবেলার-ফুটবল-খেলায় ভাংগা পাটা পড়িল। হাঁটু মচকাইয়া গেল। আমি যে পড়িলাম, আর উঠিতে পারিলাম না। আমাকে ধরাধরি করিয়া সেলুনে আনা হইল। দেখিতে-দেখিতে হাঁটু ফুলিয়া ইয়া-বড় কলাগাছ হইয়া গেল। স্থানীয় সকল ডাক্তার সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। কিছুই হইল না। সেদিনকার সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল হইল। ডাক্তাররা উপদেশ দিলেন, আগামী সব প্রোগ্রামও ক্যানসেল করিয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে। কিন্তু আমার কপালে আরও কষ্ট ছিল। কাজেই ডাক্তারদের এবং সংগীয় অফিসারদের উপদেশ মানিলাম না। বলিলাম ঃ 'শেতাবগঞ্জ ও গোপালপুরের কল দেখিয়া যাইব। কাল সকালেই ভাল হইয়া যাইব। এখানে যদি কোনও বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেনসারি থাকে, তবে সেখান হইতে এক মাত্রা আর্নিকা ২০০

আনাইয়া খাওয়াইয়া দেন।' তাই করা হইল। আর্নিকা খাইয়া আমি বাতি নিবাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। বলিলাম ঃ 'পার্বতীপুরের আগে আমাকে কেউ ডাকিবেন না।'

পার্বতীপুরে আসিয়া দেখিলাম রাজশাহী বিভাগের কমিশনার সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহের জিলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ উপস্থিত আছেন। তাঁরা সকলে একমত হইয়া বলিলেন আমার ঢাকায় ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ। আমি বুঝিলাম আর্নিকা বরাবরের মত কাজ করে নাই। কাজেই রাযী হইলাম। তাড়াতাড়ি ঢাকা ফিরা দরকার। কিন্তু ফের ঈশ্বরদী-পোড়াদহ হইয়া ঘুরিয়া যাইতে অনেক সময় লাগিবে। কাজেই ফুলছড়ি হইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ঐ লাইন মিটার গজের। আমি বাহির হইয়াছি ব্রডগজের সেলুনে। সুতরাং সেলুন ছাড়িয়া সাধারণ গাড়ি ধরিতে হইল। শুধু টানা-হেঁচড়া। আর কোনও অসুবিধা না। তারপর ফুলছড়ি ঘাটে ট্রেন হইতে স্টিমারে নেওয়া হইল ইযি চেয়ারে শোওয়াইয়া। ইযিচেয়ার ! শুনিতে বড় আরাম। কিন্তু চারজন কুলির কাঁধে যিন্দা লাশের মত প্রায় আধ মাইল যাওয়া, তারপর স্টিমার ঘাটের স্লোপে নামা, খাড়া সিঁড়ি দিয়া দুতলায় উঠা এমন সব কীর্তি-কাণ্ড বোধ হয় মৃত অবস্থায় খুব আরামের কিন্তু যিন্দা অবস্থায় খুব সুখের নয়।

স্টেশন হইতে সোজা হাসপাতালে নেওয়া হইল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন নিলেন। বিশেষতঃ ডাঃ শামসুদ্দিন ও ডাঃ আসিরুদ্দিন দিন-রাত খাটিলেন। চারদিনের দিন অপরের কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম। প্রাইম মিনিস্টার যরুরী বার্তা পাঠাইলেন ঃ 'অসম্ভব না হইলে এখনি চলিয়া আস'। ডাক্তাররা সম্মতি দিলেন বটে কিন্তু বলিলেন, আর কয়েকটা দিন থাকিয়া গেলে সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতাম।

অপরের কাঁধে ভর করিয়া বিমান বন্দরে গেলাম। ধরাধরি করিয়া বিমানে তোলা হইল। করাচিতেও সেইভাবে পৌছিলাম। ধরাধরি করিয়া বাসার দুতালায় তোলা হইল। আমার অবস্থা দেখিয়া প্রধানমন্ত্রী আমার দুতালায় কেবিনেট মিটিং নিলেন। ভ্রমণের ঝাঁকিতে আমার অবস্থা খারাপ হইয়াছিল। বিছানায় শুইয়া আমি কেবিনেট করিলাম। অর্থাৎ আমার শোবার ঘরেই কেবিনেট মিটিং হইল। বিছানা ছাড়িবারও আমার শক্তি ছিল না।

অথচ ঘটনাচক্রে এটাই সেই কেবিনেট-সভা যাতে অন্যান্য ব্যাপারের সাথে পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তির পাকিস্তানের পক্ষের দাবি-দাওয়া স্থিরীকৃত হইবে। সেইজন্যই প্রধানমন্ত্রী আমাকে যরুরী তাগাদা দিয়া ঢাকা হইতে আনিয়াছেন এবং

২২—

আমার উপস্থিতির ব্যবস্থা হিসাবে আমার শোবার ঘরেই কেবিনেট মিটিং দিয়াছেন।

আমি বাণিজ্য সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদকে আগেই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলাম। কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট হইতে প্রচারিত হইবার আগেই মিঃ আযিয আহমদের রচিত কাজের কাগযপত্র (ওয়ার্কিং পেপার) আমাকে দেখাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। কাজেই আমার বিশেষ কিছু বলিতে হইল না। মাঝে-মাঝে মিঃ আযিয আহমদের কথার ঈষৎ সংশোধন করিয়া আমার মনোভাব প্রকাশ করিতে হইয়াছিল মাত্র। কেবিনেট আমার সবগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কিন্তু সংকট দেখা দিল আমার দিল্লি যাওয়া লইয়া। আমি বর্তমানে দিল্লি যাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। এটা মন্ত্রী স্তরের আলোচনা। শুধু সেক্রেটারি দিয়া হইবে না। মন্ত্রী একজনকে পাঠাইতেই হইবে। অথচ অন্য কোনও মন্ত্রী দিয়া আমার ভরসা নাই। প্রধানমন্ত্রীও আর কাহাকেও পাঠাইতে রাযী নন। মিঃ আযিয আহমদেরও মত তাই। আমাকেই যাইতে হইবে। তবেই দিল্লির বৈঠক পিছাইতে হয়। এদিকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হইতেও বেশি বাকী নাই। আমাকে আরোগ্য হইয়া দিল্লি যাওয়ার যোগ্য হওয়াতক বর্তমানে চুক্তির মেয়াদ বাড়ান দরকার। ডাক্তারদের মত নেওয়া হইল : পনর দিনের কমে আমাকে খাড়া করা যাইবে না। ভারত সরকারকে সব অবস্থা বলিয়া চলতি বাণিজ্য-চুক্তি এক মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইল। পনর-বিশ দিন পরে একদিন দিল্লি যাওয়ার দিন তারিখ করা হইল।

চব্বিশা অধ্যায়

ভারত সফর

১. পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

যথাসময়ে এক হাতে লাঠিতে অপর হাতে অন্যের কাঁধে ভর করিয়া দিল্লি গেলাম বোধ হয় ১৯৫৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি। অফিসারদের এক বাহিনী সাথে গেলেন। তার উপর গেলেন আমার স্ত্রী ও ছোট ছেলে মহফুয আনাম ওরফে তিতু মিয়া। তার বয়স তখন মাত্র ন বছর। দিল্লি বিমান বন্দরে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ মুরারজী দেশাই আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আমার থাকার ব্যবস্থা হইল নিযাম-ভবনে। বিরাট ও বিশাল শাহী বালাখানা। এলাহি কারখানা। অফিসারদেরে স্থান দেওয়া হইল অশোক হোটেলে। কূটনৈতিক জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া আমি রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর জন্য দুই হাড়ি মধুপুরের মধু লইয়া গিয়াছিলাম। বক্তৃতায় বলিলাম ঃ 'পাকিস্তানের জনগণ ভারতের জনগণের সাথে যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় তারই প্রতীক এই মধু। পাকিস্তান ও ভারত উভয়েই ভারত-মাতার যমজ-সন্তান। দুই সহোদর।' ভারতীয় কাগযে 'সাধু সাধু' রব ধ্বনিত হইল।

প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ সহানুভূতির ফলে আমাদের সমস্ত দাবি-দাওয়াই চুক্তিতে গৃহীত হইল। চুক্তির মেয়াদ আমাদের দাবি মত তিন বছর করা ছাড়াও তিনটি বিষয়ে ভারত আমাদের প্রতি বিশেষ বন্ধুত্বের পরিচয় দিল ঃ (১) প্রচলিত ছয় লক্ষ বেলের জায়গায় আঠার লক্ষ বেল পাট আমদানি করিতে রাযী হইল ; (২) ৫০ হাজার টন ভারতীয় সিমেন্ট পূর্ব-পাকিস্তানে দিয়া তার বদলা ঐ পরিমাণ সিমেন্ট পশ্চিম পাকিস্তান হইতে নিতে রাযী হইল। (৩) পূর্ব-পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় সমস্ত কয়লা সরবরাহ করিতে এবং রেলযোগে পূর্ব-পাকিস্তান রেল-মুখে পৌঁছাইয়া দিতে রাযী হইল। জিরাতিয়াদের সমস্যারও সমাধান হইল। একবার প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে উদারতার দরজাও প্রসারিত হয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের তাই হইল। উভয় পাকিস্তানের মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগের জন্য ভারতের মধ্যে দিয়া থ্রুরেল চালাইবার যে স্বপ্ন আমরা দেখিয়াছিলাম, ভারতের নেতৃবৃন্দ সে প্রস্তাবও বিবেচনা করিতে রাযী হইলেন। কথা হইল উভয় দেশের রেল মন্ত্রীদ্বয় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

২. পাক-ভারত সম্পর্কে নূতনত্ব

আমাদের আলোচনার মধ্যে যে প্রীতি-সদ্ভাবের আবহাওয়া বিরাজ করিতেছিল, তা শুধু কূটনৈতিক ভাষার 'প্রীতি সদ্ভাব' ছিল না। অনেকটা আন্তরিক সদ্ভাব ছিল। বাণিজ্য চুক্তি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বিষয় হইলেও আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারদ্বয়কে গোড়া হইতেই পাক-ভারত বাণিজ্য আলোচনায় শামিল করিয়াছিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমার বিশেষ আমন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খাঁ ও শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ মোযাফফর হুসেন কিযিলবাস তাঁদের অফিসার-দলসহ দিল্লিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লি পৌঁছিয়াই আমি প্রথম কাজ করি পণ্ডিত নেহরুর সংগে সাক্ষাৎকার। জনাব আতাউর রহমান ও জনাব মুজিবুর রহমান এ সাক্ষাৎকারে শামিল ছিলেন। জনাব সুহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বর্তমান পাকিস্তান সরকার যে ভারতের সাথে সত্যিকার বন্ধু ভাবে যার-তার আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে শান্তি ও প্রীতিতে বাস করিতে চান, সে কথা আমরা পণ্ডিত নেহরুকে বুঝাইবার চেষ্টা করি। পাক-ভারত সম্পর্ক সম্বন্ধে মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের মতাদর্শের বুনিয়াদী পার্থক্য আমরা তাঁকে বুঝাইয়া দেই। এটা বিশেষভাবে দরকার হয় এইজন্য যে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক প্রভাবশালী শ্রেণীর মনোভাব আমাদের নেতা সুহরাওয়ার্দীর প্রতি অতিশয় বিরূপ ছিল। পাকিস্তান সংগ্রামের সময়ের এবং পাকিস্তান হাসিলের পরের ভূমিকায় জনাব সুহরাওয়ার্দী এপ্রোচের পার্থক্য গণতান্ত্রিকতা যৌক্তিকতা ও নির্ভুলতার দিকে আমরা পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমরা দেখিয়া পুলকিত হই যে জনাব সুহরাওয়ার্দীর প্রতি পণ্ডিত নেহরুর মনোভাব সাধারণ হিন্দু-মনোভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি স্পষ্টই বলেন যে, সুহরাওয়ার্দী-নেতৃত্বে পাক-ভারত সম্পর্কের মধ্যে উভয় পক্ষ হইতে বাস্তব-বাদী দৃষ্টি-ভংগির উন্মেষ হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। জনাব আতাউর রহমান ও জনাব মুজিবুর রহমান বিশেষভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের অভাব-অভিযোগগুলির উল্লেখ করেন। পূর্ব-পাকিস্তান চার দিক দিয়া ভারত-বেষ্টিত। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর শান্তিপূর্ণ নিরাপত্তা-বোধ অনেকখানি নির্ভর করে ভারত সরকার এবং পশ্চিম বাংলা ও আসাম সরকারের নীতি ও মনোভাবের উপর। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে পণ্ডিত নেহরু পূর্ব-পাকিস্তানের অসুবিধা-অভিযোগের প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন ও সহানুভূতিশীল। আমরা আন্তরিক সৌহার্দের মধ্যে আমাদের সাক্ষাৎকার সমাপ্ত করিলাম।

এই পরিবেশে আমাদের বাণিজ্য-চুক্তির আলোচনা শুরু হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের নয়া দিল্লি গমন এমন সফল হইয়াছিল। আমরা করাচি হইতে যেসব প্রস্তাব ও শর্ত যে আকারে লইয়া আসিয়াছিলাম, প্রায় সবগুলিই সেইরূপেই গৃহীত হইয়াছিল। বাণিজ্য সেক্রেটারি জনাব আযিয আহমদ খুটি-নাটি নির্ধারণে ও চুক্তির ভাষা রচনায় সম্পূর্ণ দক্ষতার পরিচয় দেন। ঐ দক্ষতার জন্য আমি তাঁর তারিফ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'সার, সব কৃতিত্ব আপনার। কারণ সর্বত্র আপনি মধু মাখাইয়া রাখিয়াছিলেন।' দেখিলাম, আযিয আহমদ সাহেবের ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

সরকারী কাজ ছাড়া নয়া দিল্লিতে আমি দুইটা বেসরকারী কাজ করিয়াছিলাম। একটা মওলানা আজাদ সাহেবের সংগে মোলাকাত। অপরটি মনের মত, বোধ হয় শেষবারের মত, পুরান দিল্লি দেখিয়া লওয়া। দ্বিতীয় কাজটির ব্যাপারে আমার স্ত্রী আরও বেশি করিয়াছিলেন। আমাদের সরকারী বৈঠকাদির ফাঁকে-ফাঁকে সব দর্শনীয় বস্তু মায় আগ্রার তাজমহলাদি দেখিয়া লইয়াছিলেন। ফলে সরকারী কাজের শেষে আমি যখন মোগল-পাঠান দিল্লির দর্শনীয় বস্তুসমূহ দেখিতে বাহির হইলাম, তখন তিনি আমার আগে-আগে চলিয়া এবং আমাকে এটা-ওটা বুঝাইয়া এমন ভাবখানা দেখাইলেন, যেন বাংগালকে তিনি হাইকোর্ট দেখাইতেছেন।

মওলানা আযাদের সাথে দেখা না করিয়া নয়াদিল্লি ছাড়িব না, একথা আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। বন্ধুবর হুমায়ুন কবিরকে আগেই সেকথা বলিয়া রাখিয়া ছিলাম। হুমায়ুন কবির তখন মওলানার সেক্রেটারি হইতে স্টেট-মিনিস্টারের পদে উন্নীত হইয়াছেন। তবু যোগাযোগ আগের মতই আছে। কাজেই আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থার তিনি ভার নিলেন। একবেলা সেখানে খাওয়ার কথা উঠিলে অফিসাররা বলিলেন তার সময় হইবে না। কারণ আমাকে আমার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ মুরারজী দেশাইর ওখানে একটি পারিবারিক ডিনার খাইতে হইবে।

৩. দেশাইর ডিনার

সত্য-সত্যই মিঃ দেশাই একদিন মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষে আমাকে দাওয়াত করিলেন এবং আমার স্ত্রীকে দাওয়াত করিবার জন্য দরবার হল হইতে আমার সুইটে আসিলেন। আগেই বলিয়াছি নিযাম ভবনেরই একটি কনফারেন্স হলে আমাদের বাণিজ্য-চুক্তির কনফারেন্স হইতেছিল। নির্ধারিত সময়ে মিঃ দেশাইর বাড়িতে

গেলাম। দেখা গেল, পারিবারিক–ডিনার সত্য–সত্যই পারিবারিক। ছোট একটি ডিনার টেবিলে ছয়জনের বসিবার ব্যবস্থা। মিঃ ও মিসেস দেশাই, আমি ও আমার স্ত্রী। আমার নয় বৎসরের ছোট ছেলেটার প্রতিপক্ষ রূপে ঐ বয়সের তাঁদের একটি ছেলেকে টেবিলে বসান হইয়াছে। খানার আগে খানার পরে মোট ঘন্টা দুই আমরা নীরবে শান্তিতে অফিসার সংগহীন অবস্থায় একা–একা আলাপ করিতে পারিয়াছিলাম। তাতে দেশাই পরিবারের প্রতি আমরা সকলে এবং মিঃ দেশাইর প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। তিনি ভয়ানক গোড়া ব্রাহ্মণ হিন্দু, একথা আগেই শুনিয়াছিলাম। পারিবারিক ডিনারের দাওয়াত কূটনৈতিক ব্যবস্থার কোন আংশ নয়। মিঃ দেশাই এ ধরনের পারিবারিক ডিনারের দাওয়াত আর কোনও বিদেশী শিল্প–বাণিজ্য মন্ত্রীকে করেন নাই বলিয়াও সকলে বলাবলি করিলেন। আমাকেই কেন্ তিনি এই ধরনের দাওয়াত করিলেন, তাও কেউ বুঝিলেন বলিয়া মনে হইল না। কাজেই আমি যথেষ্ট সংকোচ ও দ্বিধার মধ্যেই মিঃ দেশাইর বাড়িতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁদের ব্যবহারে আদর–যত্নে আলাপে–আলোচনায় আমাদের সকল দ্বিধা–সংকোচ দূর হইয়া গেল। নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের বাড়িতে ডিনার খাইয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। নিষ্ঠাবান গোড়া হিন্দু সত্যই। মাছ–গোশ্তের কোনও বালাই নাই। কিন্তু মাছ–গোশ্ত ছাড়াও কি উপাদেয় ডিনার হইতে পারে তা দেখাইয়া দিলেন মিসেস দেশাই। নিজ হাতে পাক করিয়াছেন ; নিজ হাতে পরিবেশন করিলেন। নিজে আমাদের সাথে টেবিলে বসিয়া খাইলেন। আমার স্ত্রীর সাথে মিসেস দেশাইর বনিলও ভাল। উনার বোম্বাইয়া হিন্দী আর ইনার বাংগালী উর্দু। মিলিল ভাল। দুই ঘন্টা কাটাইতে তাঁদের কোনও অসুবিধা হইল না। ভাষা না বুঝিলেও বোধ হয় চলিত। নারীরা নাকি ভাষার চেয়ে চোখ–মুখ ও হাতের ইশারায়ই কথা বলে বেশি। মানুষ চিনিবার ও বন্ধু বাছিবার পক্ষে নাকি তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমরা পুরুষরা দুইজন আমাদের নিজস্ব দফতরের আলোচনাতেই বেশিক্ষণ কাটাইলাম। পাক–ভারতের সম্পর্কের কথা বিশেষ বলিলাম না বোধ হয় উভয় পক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়াই। কাজেই শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপারে আমরা কে কি করিতে চাই তার আলোচনাতেই কাল কাটাইলাম।

৪. মওলানা আযাদের খেদমতে

পরদিনই গেলাম মওলানা আযাদ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। বন্ধুবর হুমায়ুন কবির আমাদের সংগে গেলেন। আর থাকিলেন সেখানে মওলানা সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ খোরশেদ। আলাপ তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় খুবই প্রাণখোলা

হইল যাকে বলে হার্ট-টু-হার্ট। প্রায় এক ঘন্টা থাকিলাম। কাজেই অনেক কথা হইল। পাক-ভারত সম্পর্ক, ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা, পাকিস্তানের ভবিষ্যত ইত্যাদি ইত্যাদি। অত বড় পণ্ডিত অত বড় আলেম বিশ্ব-রাজনীতির এত সূক্ষ্মদর্শী বিচারক যেসব কথা বলিলেন, তার সবই শুনিবারও চিন্তা করিবার বস্তু। সুতরাং গো-গ্রাসে গিলিলাম। কিন্তু আমাদের নিজেদের আশু বিচার্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যা বলিয়াছিলেন, সেটাই মাত্র সংক্ষেপে স্মরণ করিতেছি। তিনি যা বলিলেন তার সারমর্ম এই ঃ 'আমি সারা অন্তর দিয়া সমস্ত শক্তি দিয়া পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করিয়াছি। আজ তেমনি সারা অন্তর দিয়া পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও সাফল্য কামনা করিতেছি। শক্তি থাকিলে এ কাজে সহায়তাও করিতাম। পাকিস্তান না হইলে ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষতি হইত, এটা আমি আগেও বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করি না। কিন্তু পাকিস্তান যখন একবার হইয়া গিয়াছে, তখন ওটাকে টিকিতেই হইবে এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র হইতে হইবে। না হইলে শুধু পাকিস্তানের মুসলমানদের নয় ভারতের মুসলমানদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তোমরা পাকিস্তানীরা সর্বদা একথা মনে রাখিও। এ জন্য দরকার পাক-ভারতের মধ্যে বাস্তব বুদ্ধিজাত সম্মান-জনক সমঝোতা। তার জন্য তোমরা তৈয়ার হও। আমি যতদিন আছি, নেহরু যতদিন আছেন, এদিকে সহানুভূতির অভাব ততদিন হইবে না।' চিন্তাভারাক্রান্ত মনে মওলানা সাহেবের নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

৫. নির্বোধের প্রতিবাদ

কিন্তু পাক-ভারত সমঝোতা যে কঠিন কাজ, এটা দিল্লি বসিয়াই আমি টের পাইলাম। নয়াদিল্লিতে আমার মধু লইয়া আসা ও পাকিস্তান-হিন্দুস্থানকে ভারত-মায়ের যমজ সন্তান বলায় 'মর্নিং নিউয' ও অন্যান্য মুসলিম লীগবাদী খবরের কাগয আমার বিরূপ সমালোচনা করিতেছেন, তা আমি দিল্লিতেই পড়িলাম। অপর দিকে কলিকাতার একটি ইংরাজী দৈনিক চুক্তি সম্পাদনের পরেপরেই এক জোরালো সম্পাদকীয়তে লিখিলেন ঃ 'আমরা আগেই বলিয়াছিলাম, নয়াদিল্লির কর্তাদেরে হুশিয়ার করিয়াছিলাম যে আবুল মনসুর মুখে মধু লইয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্তরে আনিয়াছেন বিষ। আবুল মনসুরের মধু দেখিয়া ভারতীয় নেতারা এমন বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে আবুল মনসুর তাঁদের পিঠে হাত বুলাইয়া চোখে ধুলি দিয়া সবগুলো অধিকার আদায় করিয়া নিলেন। ভারতের কর্তারা টেরই পাইলেন না।'

ভাবখানা এই যে ভারতের যেন সিন্দুক মারা দিয়াছে। একটা বাণিজ্য-চুক্তি মাত্র। উভয় পক্ষের লাভ-লোকসান বিবেচনা করিয়াই এটা করা হইয়াছে । উভয় পক্ষের অভিজ্ঞ অফিসাররাই এ সবের খুঁটি-নাটি ভাল-মন্দ বিচার করিয়াছেন। কোনও এক বিষয়ে এক পক্ষকে এক-আধটুক বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকিলেও অন্য দিকে নিশ্চয়ই তা পোষাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তা নাও যদি হইয়া থাকে তবু দেশের সর্বনাশ হইয়া যাইবে না। এটা জানিয়াও ভারতের ঐ কাগযটি শুধু আমাকে 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' বলিলেন না। নিজের দেশের সরকারকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন।

এরাই ভারতে পাকিস্তানের 'মর্নিং নিউয'-ওয়ালাদের জবাব, প্রতিবিম্ব, কাউন্টার পার্ট। এরা পাক-ভারত মৈত্রী চায় না। এরা বিশ্বাস ও অনুভব করে যে পাক-ভারত সম্প্রতি স্থাপিত হইয়া গেলে এদের এডিটরিয়াল লিখিবার বিষয় থাকিবে না। স্বাধীনতার আগে এক পক্ষ মুসলিম লীগ, তার আদর্শ ও নেতৃবৃন্দকে, অপর পক্ষ কংগ্রেস, তার আদর্শ ও নেতৃবৃন্দকে, গালদিয়া সাংবাদিকতা করিত। হিন্দু-মুসলিম, কংগ্রেস-লীগ বা গান্ধী-জিন্না মিলনের কথা শুনিলেই এরা আঁৎকিয়া উঠিত। গেল গেল বুঝি এদের দম আটকাইয়া। হায়াত ফুরাইয়া। প্রধানতঃ এদের চেষ্টাতেই সকলের বাঞ্ছিত ও প্রার্থিত সমঝোতা হয় নাই। এদেরই প্রচার-ফলে পাকিস্তানে শেখ আবদুল্লা ও আবদুল গফফার খাঁকে এবং হিন্দুস্থানে শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে বরাবর ভুল বুঝা হইয়াছে। উপমহাদেশ ভাগ হইয়া দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র যে স্থাপিত হইয়াছে, সেটাও মূলতঃ হইয়াছে হিন্দু-মুসলিম কংগ্রেস-লীগ ও গান্ধী-জিন্নার ঐক্যেরই ফল স্বরূপ। যে দাবির জন্য দুই দলে ঝগড়া হয়, সেটা মিটিয়া গেলে দুই দলে প্রীতি স্থাপিত হইবার কথা। কিন্তু দশ বছরেও আমাদের মধ্যে তা হয় নাই। কেন হয় নাই ? কারণ উভয় দেশেই 'মর্নিং নিউয' শ্রেণীর সংবাদপত্র আছে। কংগ্রেস ও লীগকে হিন্দু ও মুসলমানকে গাল দেওয়ার অভ্যাস এরা ছাড়িতে পারে নাই। তাই পরিবর্তিত পরিবেশেও এরা ভারত ও পাকিস্তানকে গাল দিয়া চলিয়াছে। আগে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের অভিযোগ ও রাগ-বিদ্বেষের কারণ ছিল। অপর পক্ষেরও ছিল। এখন ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযোগের ও রাগ বিদ্বেষের কারণ আছে। অপর পক্ষেরও আছে। আগে ঐগুলি খোঁচাইয়া, বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাইয়া এরা সাংবাদিকতা ও রাজনীতি করিত। বর্তমানে এইগুলো খোঁচাইয়া বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাইয়া সাংবাদিকতা ও রাজনীতি করে। আগের অভিযোগ-পাল্টা-অভিযোগ সবারই ভাল জানা আছে। এখনকার অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগও কম না।

এপক্ষ হইতে বলা চলে ঃ 'আমরা দাবি মত জমি পাই নাই ; ভারত পাকিস্তান ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁরা অন্তর দিয়া দেশ-বিভাগ মানিয়া লয় নাই।' ইত্যাদি ইত্যাদি। অপর পক্ষ হইতে বলা চলে ঃ 'ইংরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেসের দুর্বলতায় এই অস্বাভাবিক দেশ বিভাগ হইয়াছে। ভারত-ভূমির বই দ্বিধাবিভক্তি কিছুতেই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না।' ইত্যাদি। ভারতে মুসলমানদের এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর ভীষণ যুলুম চলিতেছে, এ কথা উভয় পক্ষই খুব জোরের সাথে বলিতে পারে। এসব কথা বলিয়া উভয় দেশের লোক ক্ষেপানো যাইতে পারে এবং এরা তাই করিতেছে। ফলে দেশ-বিভাগের আগে যেমন উভয় সম্প্রদায়কে সর্বদাই সাজ-সাজ যুদ্ধং দেহি ভাবে উদ্দীপিত করা যাইত এবং হইত, এখনও তেমনি উভয় দেশের সরকার ও জনতাকে সাজ-সাজ যুদ্ধং দেহি ভাবে উদ্দীপিত করা যায় এবং হয়। আগে মহল্লায়-মহল্লায় লাঠি-সোঁটা যোগাড় করিয়া সম্ভাব্য দাংগায় 'আত্মরক্ষার' আয়োজন করা হইত। এখন উভয় দেশের দেশ রক্ষা দফতরের খরচ বাড়াইয়া যুদ্ধাস্ত্র আমদানি ও প্রস্তুত করিয়া 'আত্মরক্ষার' আয়োজন চলিতেছে। আগে গরিবের শ্রমের পয়সা বা ভিক্ষার চাউল দিয়া লাঠি-সোটা যোগাড় হইত শ্রমিক ও ভিক্ষুককে উপাস রাখিয়া। এখন জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগে সমস্ত উন্নয়ন-মূলক কাজ বন্ধ রাখিয়া 'ফরেন এইডে' অস্ত্র যোগাড় করা হইতেছে দেশবাসীকে ভুকা রাখিয়া।

৬. নেহরুর সাথে নিরালা তিন ঘন্টা

এ সব কথাই আলোচনা হইয়াছিল পন্ডিত নেহরু ও মওলানা আযাদের সাথে। বাণিজ্য-চুক্তি-বৈঠক শেষে আমরা দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতেছি। এমন সময় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দাওয়াত দিলেন তাঁর সাথে বোম্বাই যাইতে। আমি রাজি আছি কি না। ব্যাপার এই যে বোম্বের নিকটবর্তী টোম্বে নামক স্থানে পাক-ভারতের প্রথম এটমিক রিসার্চ রিয়েকটর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাই উদ্বোধন করিবার জন্য পণ্ডিত নেহরু বোম্বাই যাইতেছেন। করাচি হইতেই উহার দাওয়াত আমি পাইয়াছিলাম। কিন্তু দিল্লি আসার দরুন আমার সে দাওয়াত রাখার প্রশ্নই উঠিতে পারে না বলিয়া আমাদের এটমিক কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ নাযির আহমদকেই পাকিস্তান সরকারের পক্ষে দাওয়াত রাখিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম। বাণিজ্য-সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদকে সে কথা বলিলে তিনি ভারতীয় অফিসারদের সাথে পরামর্শ করিয়া বলিলেন ডাঃ নাযির আহমদ দাওয়াত রাখিলেও আমার যাওয়ায় কোনও অসুবিধা নাই। বরঞ্চ মন্ত্রী-স্তরে

দাওয়াত রাখিলে ভারত-সরকার আরও খুশী হইবেন। আমি নেহরুজীকে আমার সম্মতি জানাইলাম। আমার সংগে আমার স্ত্রী ও ছোট ছেলে মহফুয আনাম (তিতু মিয়া) যাইবে, সে কথাও জানাইলাম। বোম্বাই সরকারকে সে-মত এত্তেলা দেওয়া হইল। বোম্বাইর গবর্নর মিঃ শ্রীপ্রকাশের মেহমানরূপে গবর্নর হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হইল। কথা হইল, আমি আমার স্ত্রী-পুত্রসহ প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রেসিডেন্টের 'বিশেষ প্লেইনে' যাইব। আমার অফিসাররা যাত্রীবাহী সার্ভিসের বিমানে যাইবেন।

যথাসময়ে পণ্ডিতজীর সাথে আমরা প্লেইনে উঠিলাম। নাশতা খাওয়া-দাওয়া সারিয়াই উঠিয়াছিলাম। তবু আমার স্ত্রী ও পুত্রের খাতিরে পণ্ডিতজী ভদ্রতা করিয়া কিছু চা-নাশ্‌তার ব্যবস্থা করিলেন। নিজ হাতে পরিবেশন করিলেন। বিশাল সুন্দর প্লেইনে শোওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। অল্পক্ষণেই আমার স্ত্রী ও পুত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। পণ্ডিতজী নিজ হাতে তাদের গায়ের কম্বল টানিয়া-গুঁজিয়া দিয়া আমার সাথে আলাপে বসিলেন। বোম্বাই পৌঁছাইতে সাড়ে তিন ঘন্টা লাগিল। এই সাড়ে তিন ঘন্টায় আমরা কত কাপ চা ও কফি এবং কত কাঠি সিগারেট খাইয়াছিলাম, তার হিসাব নাই। কিন্তু এই সুযোগে রাজনৈতিক আলাপ যা করিয়াছিলাম, তা জীবনে ভুলিতে পারিব না। উপরে আমি যে সব কথা বলিয়াছি, ভাষান্তরে বা প্রকারান্তরে তার সবগুলিই আমাদের আলোচনায় আসিল। পণ্ডিতজী একজন অসাধারণ স্কলার-পলিটিশিয়ান। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ স্টেট্‌সমেনদের অন্যতম। তাঁর কথা শোনা একটা মস্তবড় প্রিভিলেজ। শিক্ষার একটা অপূর্ব সুযোগ। তিনি বলিয়া গেলেন। আমি শুনিয়া গেলাম। প্রশ্ন করা না করা পর্যন্ত কথা বলিলাম না। তাঁর সব কথার সারমর্ম ছিল দুইটি ঃ এক, ভারতের দিক হইতে পাকিস্তানের কোন বিপদ নাই। দুই, পাক-ভারত সমঝোতার পথে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মনোভাবই একমাত্র প্রতিবন্ধক। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিলেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তান গ্রাস করিতে চায়, এটা ভুল ধারণা। ভারত নিজের স্বার্থেই দুই বাংলাকে একত্র করার বিরোধী। যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ বাটোয়ারা হইয়াছে, পূর্ব বাংলার চার কোটি মুসলমানকে ভারতে আনিলে সেই সমস্যাই পুনরুজ্জীবিত হইবে। পাক-ভারত সমঝোতায় পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মনোভাবই যে অন্তরায় তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া পণ্ডিতজী 'নো-ওয়ার' চুক্তি প্রত্যাখ্যানের কথা তুলিলেন। তিনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে কাশ্মির-প্রশ্ন মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত 'নো ওয়ার' চুক্তি হইতে পারে না বলিয়া পাকিস্তানের নেতারা যে যুক্তি দিতেছেন, ওটা ভ্রান্ত। তিনি নিজের কথার সমর্থনে যে সব যুক্তি দিলেন, তার আবশ্যকতা ছিল না। কারণ আমার ব্যক্তিগত মতও তাঁর মতের অনুরূপ। তাঁর মত

আমিও বিশ্বাস করি, কাশ্মির-প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়াও পাক-ভারতের মধ্যে 'নো ওয়ার' চুক্তি হইতে পারে। এ সব কথা আমি অনেক আগে হইতেই বলিতেছি। মোহাম্মদ আলী বগুড়া ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেও আমি তাঁদেরে এবং আমার নেতা শহীদ সাহেবকে এ ধরনের কথা বলিয়াছি। প্রথমতঃ ভারতের সাথে আমাদের অনেক ব্যাপারে বিরোধ আছে। সবগুলি আমরা মিটাইতে চাই। সম্ভব হইলে সবগুলি এক সাথে মিটাইব। তা সম্ভব না হইলে একটা-একটা করিয়া মিটাইব। এক এক করিয়া মিটাইতে হইলে কোন্‌টা আগে ধরিব? কাণ্ডজ্ঞানের কথা এই যে সবচেয়ে সোজা যেটা সেইটাই আগে ধরিব। ব্যক্তিগত পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে আমরা যা করি, কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও তাই করা বুদ্ধিমানের কাজ। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের যারা আগে সোজা প্রশ্নের উত্তর দিয়া সবার শেষে কঠিনটা ধরে, তারাই পরীক্ষায় পাস করে। দুনিয়াবী ব্যাপারে আমাদের বিরোধসমূহ মিটাইবার বেলা যদি আগে সহজগুলি মিটাই, তবে কঠিনগুলি মিটাইবার সাইকলজিক্যাল পরিবেশ স্বতঃই সৃষ্টি হবে। পাক-ভারতের বেলাও ওটা সত্য হইতে বাধ্য। কাশ্মির-প্রশ্নটাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জটিল সমস্যা। এই জটিলতম প্রশ্নটার মীমাংসা না হইলে, বা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত, অপেক্ষাকৃত সহজগুলিও মীমাংসা করিব না, এটা কোনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমাদের সীমা-সরহদ্দ আমাদের উভয় পাকিস্তানের মধ্যেকার যাতায়াত, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলা ও বিহারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা, পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব পাঞ্জাব ও রাজস্থানের মধ্যেকার সিন্ধু-অববাহিকার সেচ ও পানি সরবরাহ সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা পাকিস্তান ও ভারতের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত হইতে পারে না।

খোদ কাশ্মির-সমস্যাটা লইয়াও পাকিস্তান সরকার বিশেষতঃ মুসলিম লীগ নেতারা বরাবর ভুল নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। এটাই ছিল আমার বরাবরের মত। শেখ আবদুল্লার মত কাশ্মিরের জাতীয় জনপ্রিয় নেতার প্রতি মুসলিম লীগ নেতাদের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণাই এই ভুল নীতির মূলীভূত কারণ। শেখ আবদুল্লার সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস ও তাঁর স্বাধীনতা-প্রীতির যাঁরা বিস্তারিত খবর রাখেন, তাঁরাই জানেন যে শুধু ভারতের কেন কোনও শক্তিরই তিনি দালালি করিতে পারেন না। তদুপরি তিনি নিষ্ঠাবান খাঁটি মুসলমান। তিনি পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তানের অহিতকামী হইতে পারেন না। বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে ১৯৫৮ সালের আগে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে স্বাধীন-গণভোট হইলে কাশ্মিরী মুসলমানরা এক বাক্যে পাকিস্তানে যোগ দিবার পক্ষে ভোট দিত। ১৯৪৮ সালের

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অথবা মার্চ মাসের গোড়ার দিকে শেখ আবদুল্লার এক বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর আমাকে বলিয়াছিলেন যে শেখ আবদুল্লা মনের দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের সমর্থক এ কথা যেন আমি পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের গোচর করি। আমি তৎকালে পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিনকে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য নেতাকে সেকথা বলিয়াছিলাম। নেতারা আমার কথায় আমল দেন নাই। অবশেষে ১৯৫৪ সালে যখন ভারত সরকার প্রকাশ্যভাবে শেখ আব্দুল্লার বিরুদ্ধে একের-পর-আরেকটা কর্মপন্থা গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ডিসমিস করিয়া জেলে পুরেন, এখনও পাকিস্তানী নেতাদের অনেকের কাছেই আমার মতামত প্রকাশ করি এবং শেখ আবদুল্লার প্রতি তাঁদের মনোভাব পরিবর্তনের অনুরোধ করি। কিন্তু তখনও তাঁদের হুশ হয় নাই। পরে বহুদিন পরে জেনারেল আইউবের দ্বারা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের হত্যাকাণ্ডের পর বড় দেরিতে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের কেউ-কেউ শেখ আবদুল্লাকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে অনেকেই সে কথা স্বীকার করেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র অভিমত এই যে পাকিস্তানে গণতন্ত্র হত্যার ফলে আমাদের কাশ্মির গণ-ভোটের দাবি অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

যা হোক কাশ্মির-প্রশ্ন সম্পর্কে আমার মতামত আমি পণ্ডিতজীকে সরলভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলাম না। তিনি আমার কোন কথাই মানিলেন না বটে কিন্তু জোরে প্রতিবাদও করিলেন না।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে কাশ্মির সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা কি এ সবের সমাধান করিব না? যতই নীতিগত প্রশ্ন হউক, চল্লিশ লক্ষ কাশ্মিরীর জন্য কি পাকিস্তানের এক-এক অঞ্চলের চার কোটি লোককে মারিয়া ফেলিব? কাজেই, কি জনগণের সুবিধা, কি সমাধানের পন্থা, উভয় দিক বিচার করিয়াই পাকিস্তানী নেতাদের এই অবাস্তব অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করিয়া বাস্তববাদী হইতে হইবে। কাশ্মির বাদ দিয়া নয়, কাশ্মির বিরোধ বাকী থাকিল এই মূলসূত্র ধরিয়া, উভয় দেশের অন্যান্য ছোট সমস্যার সমাধানে হাত দেওয়া উচিৎ। এইসব কথা নানাভাবে আমি আমাদের বিভিন্ন নেতা ও মন্ত্রীকে বলিয়াছি। আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী ভাইদেরে আমি বুঝাইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমার সহকর্মীরা সকলেই আমার এই মতের পোষকতা করেন। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, আমার নেতা শহীদ সাহেবেরও এই মত। পাক-ভারত সম্প্রীতি সম্বন্ধে তাঁর আস্থা এমন দৃঢ় ছিল যে তিনি উভয় দেশের মধ্যে কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের মত ভিসা-প্রথা উঠাইয়া অবাধ যাতায়াতের পক্ষপাতি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তাঁর এই মত বদলায় নাই। এই

মূলসূত্র হইতেই আমাদের 'নো ওয়ার'–চুক্তিতে সই করা উচিৎ। 'নো ওয়ার'–চুক্তির প্রস্তাবটা আসিয়াছে ভারতের পক্ষ হইতে। কেন আসিয়াছে ? যেহেতু, ভারত সত্যসত্যই আশংকা করে পাকিস্তান যুদ্ধ বাধাইতে পারে। দেশ বিভাগে পাকিস্তানের উপর যে সব অন্যায় ও চক্রান্তমূলক অবিচার হইয়াছে, তার প্রতিকারের জন্য পাকিস্তান যদি যুদ্ধ বাধায় তবে যুদ্ধনীতি, রাজনীতি, এমনকি ন্যায়–নীতির দিক হইতেও তা অন্যায় হইবে না। ভারত এটা জানে, বুঝে এবং হৃদয়ংগম করে। পক্ষান্তরে ভারতের পাকিস্তান আক্রমণের কোনও যুক্তি ও কারণ নাই। বাটোয়ারায় ভারত জিতিয়াছে এবং অন্যায় রূপেই জিতিয়াছে। তবু যদি বিনা–কারণে পাকিস্তান আক্রমণ করিবার ইচ্ছা তার থাকিত, তবে ১৯৪৭–৪৮ সালেই তা করিত। ঐটাই তার পক্ষে পূর্ণ সুযোগ ছিল। হায়দরাবাদ কাশ্মির জুনাগড় মানবাদাড় আক্রমণ ও দখল করিয়া সে সুযোগ পুরাপুরিই ভারত গ্রহণ করিয়াছে। ঐ সব জায়গা দখল করিয়া ভারত 'দখলই স্বত্বের দশ ভাগের নয় ভাগ' এই নীতিতে বিশ্বাসী বুদ্ধিমানের মতই অতঃপর চুপ করিয়া আছে এবং দখল–করা দেশগুলিতে নিজের স্থিতিশীলতার চেষ্টা করিতেছে। এর পরেও যদি তার পূর্ব ও পশ্চিম সীমায় আরও কিছু জায়গা দখল করিবার ইচ্ছা ভারতের থাকিত, তবে ঐ সুযোগেই–ভারত তা করিয়া ফেলিত। যদি তা করিত, তবে জাতিসংঘে মামলা দায়ের করা ছাড়া আমরা আর কিছুই করিতে পারিতাম না। তা করিয়া আমরা কাশ্মিরের চেয়ে বেশি কিছু প্রতিকারও করিতে পারিতাম না। সুতরাং কোনও সীমান্তেই ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করিতে চায় না। এ বিশ্বাস আমার খুবই দৃঢ়।

পক্ষান্তরে বাটোয়ারায় পাকিস্তানের উপর অন্যায় ও চক্রান্তমূলক অবিচার হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান যুদ্ধ করিয়া তার সীমা প্রসারিত করিতে চায় না। এটা পাকিস্তানের সকল দলের নেতাদের মত বলিয়াই আমার ধারণা ও বিশ্বাস। কাজেই 'নো–ওয়ার'–চুক্তি করিতে পাকিস্তানের পক্ষে কোনও আপত্তির বাস্তব কারণ নাই। তবু কাশ্মির মীমাংসা না হইলে 'নো–ওয়ার'–চুক্তি করিব না যাঁরা বলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভারতকে ডর দেখাইবার জন্যই তা বলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সেই ডরে ভারত কাশ্মির ত্যাগ করিবে কিনা? তা যদি না করে, তবে পাকিস্তান যুদ্ধ করিয়া কাশ্মির উদ্ধার করিবে কিনা? ন বছরের অভিজ্ঞতায় এই উভয় প্রশ্নের না–বাচক উত্তর পাওয়া গিয়াছে।

পন্ডিত নেহরু তাঁর কথাবার্তায় সুস্পষ্ট আন্তরিকতার সাথে যে সব কথা বলিলেন, মোটামুটি তা উপরের কথাগুলির অনুরূপ। সুতরাং এসব ব্যাপারে তাঁর মতের সহিত আমার মতের মিল ছিল। তবু আমি বলিলাম ঃ আপনার সব কথা সত্য হইতে পারে,

কিন্তু আপনেরাই বা কাশ্মির সমস্যাটা আগে মিটাইতে রাযী হন না কেন ?' জবাবে তিনি বলিলেন : 'মিটাইতে আমরা সব সময়েই রাযী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে কিভাবে মিটান যায় ? কোন একটি ব্যাপারেই ত ভারত-পাকিস্তান একমত হয় না।' আমি কথার পিঠে কথা বলিলাম : 'কোন পন্থাতেই যদি ভারত-পাকিস্তান একমত হইতে না পারে, তবে শেষ পন্থা সালিশ মানা। সালিশের মাধ্যমেই এ ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলেন না কেন ?' পন্ডিতজী সরলভাবে বলিলেন : 'সেটাও সম্ভব হইতেছে না। কারণ উভয় দেশের গ্রহণযোগ্য কোনও সালিশই পাওয়া যাইবে না। ইনি পাকিস্তানের গ্রহণযোগ্য হইলে ভারতের অগ্রহণযোগ্য। আর উনি ভারতের গ্রহণযোগ্য হইলে পাকিস্তানের অগ্রহণযোগ্য। দুই পক্ষ একই ব্যক্তিকে কখনো গ্রহণ করিবে না। মুশকিল হইয়াছে ত এইখানেই।' পন্ডিতজীর মুখে সত্যই বিষণ্নতা ফুটিয়া উঠিল। আমার মাথায় হঠাৎ একটা ফন্দি জুটিল। বলিলাম : 'না পন্ডিতজী, আমি আপনের সাথে একমত নই। উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য লোক চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইবে।' খুব জোরের সাথে মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন : 'দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝিয়াছি, সারা দুনিয়া তালাশ করিয়াও তুমি এমন একজন লোক পাইবে না যাঁকে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে সালিশ মানিবে।' আমিও সমান জোর দিয়া বলিলাম : 'আপনের কথা সত্য হইতে পারে না। কারণ আমি অন্ততঃ একজনের কথা জানি যিনি ভারত ও পাকিস্তানের নিকট সমান গ্রহণযোগ্য হইবেন।' পন্ডিতজী আরো জোরে প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন : 'অসম্ভব। এমন লোকের অবস্থিতি অসম্ভব। কারণ এরা দুইপক্ষ কথিত ব্যক্তির গুণাগুণ নিরপেক্ষতা বিচার করিবে না । একপক্ষ যাঁকে বলিবে 'হাঁ', অপর পক্ষ নির্বিচারে তাঁকেই বলিবে 'না'। বিচারের এদের আর কোন মাপকাঠি নাই।' আমি ঠেটামি করিয়া বলিলাম : 'আপনের কথা ঠিক। কিন্তু আমি যে ব্যক্তির কথা ভাবিতেছি তাঁর বেলা ঐ নিয়ম চলিবে না। তিনি উভয় দেশের গ্রহণযোগ্য হইবেন। উভয় দেশ সমান আগ্রহে তাঁকে গ্রহণ করিবে।' পন্ডিতজী হাসিয়া বলিলেন : 'দুনিয়ায় এমন একজন লোকও নাই জানিয়াও তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি : ঐ অদ্ভুত ভদ্রলোকটি কে ?'

আমি পন্ডিতজীর চোখে-মুখে অপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীর সুরে বলিলাম : পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু।' পন্ডিতজী হাসিয়া বলিলেন : 'ওঃ তুমি তামাশা করিতেছ ?' আমি সে হাসিতে যোগ না দিয়া গম্ভীর ভাবেই বলিলাম : 'জি না, আমি ঠাট্টা করিতেছি না। সারা অন্তর দিয়াই কহিতেছি। আপনে রাযী হন। আমি আজই আমার প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া এই মর্মে ঘোষণা করাইতেছি।' পন্ডিতজী তাঁর হাসি না থামাইয়া বলিলেন : তোম্ বড়া বদমায়েশ হো।' আমি আগ্রহ দেখাইয়া বলিলাম :

'এতে বদমায়েশির কি হইল? আপনে বিশ্বাস করুন, আমার প্রধানমন্ত্রী, এমনকি গোটা পাকিস্তানবাসী, এক বাক্যে আপনাকে সালিশে মানিয়া লইবেন। আপনে রাযী হোন।' এতক্ষণে পন্ডিতজীর হাসি বন্ধ হল। তিনি গম্ভীর মুখে কিন্তু রসিকতার ভংগিতে হাত জোড় করিয়া বলিলেন ঃ 'হাম কো মাফ করো। মুঝসে ইয়ে কাম নেহি হোগা।' আমি যিদ করিয়া বলিলাম ঃ 'কেন হইবে না? পাকিস্তানের পক্ষ হইতে আপনাকে মানা হইতেছে। ভারতের পক্ষ হইতে আপনাকে মানা হইবে না, এটা হইতে পারে না। তবে আপনার দ্বারা হইবে না একথা কেন বলিতেছেন?' পন্ডিতজী আরো গম্ভীর হইয়া বলিলেন ঃ 'তুমি জান, কেন আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়।' কথাটা এইখানে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এ সুযোগ আমি ছাড়িলাম না। কারণ মস্তবড় ঝুঁকি আমি লইয়াছিলাম। যদি পন্ডিতজী বলিয়া বসিতেন ঃ বহুৎ আচ্ছা! তবে আমার অবস্থা কি হইত? পন্ডিতজী শেষবারের মত না বলার পর আমার গলার জোর বাড়িয়া গেল। এতক্ষণ পন্ডিতজীই বেশির ভাগ কথা বলিতেছিলেন। এইবার আমার পালা শুরু। বলিলাম ঃ 'আপনাকে আমি আজো আমার নেতা বলিয়া মানি। আপনি শুধু ভারতের নেতা নন। এই উপমহাদেশের এমনকি সারা বিশ্বের নেতা। মহাত্মাজীর মৃত্যুর পর তাঁর দায়িত্বও আপনার ঘাড়ে পড়িয়াছে। যে মহান উদ্দেশ্যে আপনারা দেশ বিভাগ মানিয়া লইয়াছিলেন, তা আজো সম্পন্ন হয় নাই। আমার ভাবিতে লজ্জা হয় যে আপনেরা একটা বিবাদ মিটাইতে মূল গাছটা দুই ভাগ করিয়া শাখা-প্রশাখা পাতা-পুতুড়ি লইয়া ঝগড়া জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। আপনাকে এটা বুঝান অনাবশ্যক যে আপনি জীবিত থাকিতে-থাকিতে যদি পাক-ভারত বিরোধ মিটাইয়া না যান, তবে এ বিরোধ চিরস্থায়ী হইতে পারে।' অতঃপর পন্ডিতজীর সুরে বেদনা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেনঃ 'প্রশ্নটা দুইটা জাতির, দুই রাষ্ট্রের। ব্যক্তির ক্ষমতা এখানে কতটুকু? পরিবেশ সৃষ্টি আগে দরকার। তোমরাও পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা কর।

অতঃপর আমাদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হইল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা এই যে তিনি শহীদ সাহেবের সাথে বৈঠক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমাকে আয়োজন করার উপদেশ দিলেন।

অতঃপর গবর্নর মিঃ শ্রীপ্রকাশের শাহী আতিথেয়তায় তাঁর আয়োজিত সম্বর্ধনা ও গানের জলসার আনন্দ উপভোগ করিয়া কায়েদে-আযমের বাড়ি-সহ বোম্বাইর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া তিন-চার দিন পর পি. আই. এ. বিমানে করাচি ফিরিয়া আসিলাম। করাচি বিমান-বন্দরে সাংবাদিকরা ভিড় করিলেন। বাণিজ্য-চুক্তিতে

জিতিয়া আসিয়াছি স্বীকার করিয়াও তাঁরা মধু ও যমজ ভাইর জন্য এমন ভাব দেখাইলেন যে আরেকটু হইলে কালানিশান দেখাইতেন আর কি?

করাচি ফিরিয়া প্রথম সুযোগেই প্রধানমন্ত্রীকে আমার দিল্লি সফরের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করিয়া পণ্ডিত নেহরুর সাথে আমার আলাপের কথাটা, সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। আমি যে পণ্ডিতজীকে সালিশ মানিয়া কি সাংঘাতিক ঝুঁকিটা লইয়াছিলাম, বাহাদুরি দেখাইবার জন্য তার উপর বিশেষ জোর দিলাম। লিডার ফুৎকারে ওটা উড়াইয়া দিলেন। 'কোনও ঝুঁকিই তুমি নেও নাই' তিনি অবহেলায় বলিলেন। 'ওতে কোনও ঝুঁকিই ছিল না। কারণ জওয়াহের লাল অমন দায়িত্ব নিতেই পারেন না। অমন অবস্থায় কেউ পারে না। তবে প্রস্তাবটি দিয়া তুমি মন্দ কর নাই। আমাদের প্রতি তাঁর ধারণা ভাল হইতে পারে।' ঐ সংগে তিনি বলিলেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে মোলাকাতের খুবই ইচ্ছা তাঁর আছে। তিনি নিজেই ঐ লাইনে চিন্তা করিতেছিলেন। শীঘ্রই তিনি ঐ ব্যাপারটা হাতে লইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

ভারত সফরের শ্রমে অতিরিক্ত নাড়াচাড়ায় আমার আহত হাঁটুটা আবার প্রদাহিত, ব্যথিত ও অচল হইল। পা আবার ফুলিয়া গেল। ফলে আবার বন্দী হইলাম। বাসা হইতেই অফিস করিতে লাগিলাম। কেবিনেট সভাও আমার বাসাতেই হইতে লাগিল। বাহিরে যাইতে না হওয়ায় অধিক চিন্তা করিবার ও ফাইল-পত্র ডিসপোয করিবার অনেক সময় পাইলাম।

পঁচিশা অধ্যায়

কত অজানারে

১. লালফিতার দৌরাত্ম্য

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া প্রথম সুযোগেই শিল্পকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে হস্তান্তর করিয়া এবং লাইসেন্সিং-এর ব্যাপারে উভয় প্রদেশের জন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কন্ট্রোলার আফিস স্থাপন করিয়া দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অল্পদিনেই বুঝিলাম, ওতেই আমার কর্তব্য শেষ হয় নাই। প্রাদেশিক সরকারদ্বয় তাতেই পুরা অধিকার ও সুবিধা পান নাই। ধরুন আগে শিল্পের কথাটাই। শিল্প প্রাদেশিক বিষয় বটে, কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে এবং চালাইতে বিদেশী মুদ্রা লাগে। বিদেশী মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে। কেন্দ্র বিদেশী মুদ্রা দিবার আগে নিজে স্বাভাবতঃই দেখিয়া লইতে চায়, তার সদ্ব্যবহার হইবে কিনা। প্ল্যানিংটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কোনও শিল্প প্ল্যান-মোতাবেক হইতেছে কিনা, তাও দেখা কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকা। এই সব কারণে প্রাদেশিক সরকারের সব শিল্পায়ন-প্রচেষ্টাই কেন্দ্রের দ্বারা অনুমোদিত হইতে হয়। এই অনুমোদন পাইতে অনেক সময় লাগে। প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে তাঁরা এলটেড টাকা খরচ করিতে পারেন না বলিয়া বছর শেষে টাকা ফেরত যায়। কথাটা সত্য । সত্যই পূর্ব পাকিস্তান সরকার অনেক সময় তাঁদের ভাগের টাকা খরচ করিতে পারেন নাই বলিয়া টাকা ফেরত গিয়াছে। বলা হয় এতে দুইটা কথা প্রমাণিত হইতেছে ঃ এক, পূর্ব-পাকিস্তানে এবযর্বিং ক্যাপাসিটি (হযম করিবার ক্ষমতা) নাই। দুই, প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে শিল্পোন্নতির মত বড় কাজ চালান সম্ভব না। সুতরাং যারা অধিকতর অটনমির দাবি করে তারা ভ্রান্ত।

ব্যাপারটা সত্যই আমাকে চিন্তায় ফেলিল। আমি লাহোর প্রস্তাবের দুই পাকিস্তানে বিশ্বাসী । আসলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুইটা পৃথক দেশ, দুইটা পৃথক জাতি। তাদের অর্থ-নীতি সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে দুইটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইলেই ঠিক হইত। কিন্তু তা হয় নাই। পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হইয়াছে। সেই জন্য এক পাকিস্তান কায়েম রাখিয়া উভয় অঞ্চলকে সমানভাবে উন্নত করার পন্থা হিসাবেই আমি একুশ দফার ১৯ দফা রচনা করিয়াছিলাম। সকল শ্রেণীর পূর্ব পাকিস্তানবাসী, বিশেষতঃ

যুক্তফ্রন্ট এবং আওয়ামী লীগ, লাহোর-প্রস্তাব-নির্ধারিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনে বিশ্বাসী। এই হিসাবে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ঘোরতর ত্রুটি পূর্ণ। তবু এই শাসনতন্ত্র অনুসারে কাজ করিতে রাযী হইয়াছি এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আশা এই যে শাসনতান্ত্রিক পন্থার দ্বারাই আমরা এই শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিয়া পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিতে পারিব। আমরা বিপ্লব করিয়া সে পরিবর্তন আনিতে চাই না। তা করিলে পরিণামে পাকিস্তানের অনিষ্ট হইতে পারে। সে জন্য আমরা সারা প্রাণ দিয়া সাধারণ নির্বাচন করিতে চাই। বস্তুতঃ এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই আমাদের নেতা শহীদ সাহেব মাইনরিটি দলের নেতা হইয়াও মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব নিয়াছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সাধারণ নির্বাচন হইলেই তিনি মেজরিটি লাভ করিবেন এবং মেজরিটি দলের নেতা হিসাবে জাতিগঠন-মূলক কাজে হাত দিতে পারিবেন। নেতার সহিত আমিও সম্পূর্ণ একমত ছিলাম। আমিও আগামী নির্বাচনে মেজরিটি লাভ করিয়া শাসনতন্ত্র সংশোধনের আশা করিতেছিলাম।

কিন্তু ইতিমধ্যে শাসনতন্ত্রের আওতার মধ্যে থাকিয়া যত বেশি প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা বাড়ান যায় তার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সত্য স্বীকার করিতে আমার লজ্জা নাই যে প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার বাড়াইবার চেষ্টাতেই আমি সব করিয়াছি। কিন্তু ঐ সংগে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের অধিকার বাড়াইতেও ত্রুটি করি নাই। প্রাদিশেক সরকারের এলাকা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যা-কিছু করিয়াছি, সে সবেই স্বভাবতঃই পূর্ব পাকিস্তানের সাথে-সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকারও বাড়িয়াছে। এমনকি বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার, পি.আই.ডি.সি.এবং এস.এন্ড ডি. প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সংস্থার সাথে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বিরোধ বাধিলে আমি প্রায়শঃ পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন করিয়াছি এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের পক্ষে রায় দিয়াছি। এ কাজ শাসনতন্ত্রের বিধানকে যথাসম্ভব টানিয়া-মোচড়াইয়া প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে নিতে কসুর করি নাই।

২. কেন্দ্রীয় অনুমোদনের নামে

কেন্দ্রীয় সরকারী অনুমোদনের নামে প্রাদেশিক সরকারের প্রজেক্টগুলি নিষ্ঠুরভাবে অবহেলিত অবস্থায় কেন্দ্রীয় বিভিন্ন দফতরের পায়রার খোপে পড়িয়া থাকে । এই কারণেই প্রাদেশিক সরকারদ্বয় বিশেষতঃ পূর্ব-পাক সরকার তাঁদের ভাগের বরাদ্ধ টাকা সময় মত খরচ করিতে পারেন না, এটা বুঝিতে আমার সময় লাগিয়াছিল। প্রাদেশিক সরকার কোন বরাদ্দ-টাকা খরচ করিতে পারেন না, তার সন্ধান করিতে

গিয়া আমি দেখিয়া তাজ্জব হইলাম যে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের প্রস্তুত কোন-কোন প্রজেক্ট তিন-চার বছর ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে পচিতেছে। কারণ বাহির করিতে গিয়া যা দেখিলাম তাতে আরও বিস্মিত ও লজ্জিত হইলাম। প্রাদেশিক সরকারের কোন বিভাগের একটি প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রথমে ঐ প্রজেক্টের সব কাগযপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের করেসপন্ডিং দফতরে (অর্থাৎ শিল্প হইলে শিল্প দফতরে, শিক্ষা হইলে শিক্ষা দফতরে) পাঠাইতে হয়। কেন্দ্রীয় দফতর উহা সংশোধন-অনুমোদন করিলে পর উহা প্রাদেশিক সরকারে ফেরত যাইবে। প্রাদেশিক সরকার যদি সংশোধন না মানেন, তবে লেখালেখি শুরু হইবে। যদি সংশোধন মানিয়া লন, তবে ক্রমে ক্রমে (এক সাথে নয়) শিল্প, বাণিজ্য, প্ল্যানিং ইকনমিক এফেয়ার্স এবং ফাইনান্স দফতরে পাঠাইতে হইবে। এক দফতরে অনুমোদন পাইয়া অপর দফতরে যাইতে হইবে। এক দফতরের বাধা পাইলে, সংশোধন করিতে চাইলে, ত কথাই নাই। তাতে যে 'রথিডং বুথিডং' 'ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড টু স্টেপ ব্যাক' শুরু হয় তাতে বছরকে-বছর চলিয়া যাইতে পারে। আর বাধা যদি কেউ না-ও দেন সংশোধন যদি কেউ না-ও করেন, তথাপি একটি প্রাদেশিক প্রজেক্টকে সাতটি সিংহদরজা পার হইয়া মণি-কোঠায় ঢুকিয়া কেন্দ্রীয় অনুমোদনের রাজকন্যার সাক্ষাৎ পাইতে কয়েক বছর কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে বরাদ্দ টাকা ফিরিয়া যায়! সুতরাং দোষ কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রাদেশিক সরকারের কোনও দোষ নাই। তবু দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রাদেশিক সরকার বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও মন্ত্রীরা চুপ করিয়া এই মিথ্যা তহমত বরদাশ্‌ত্‌ করিয়া আসিতেছেন। আমি এই অবস্থার প্রতিকারে উদ্যোগী হইলাম। প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন পাইয়া প্রসিডিওর সংক্রান্ত নিয়ম বদলাইলাম। নিজের সভাপতিত্বে কেবিনেটে এসব পাস করাইলাম। আশ্চর্য এই, পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রীরাও এর প্রতিবাদ করিলেন না। বরঞ্চ উৎসাহের সাথে সমর্থন করিলেন। পরিবর্তিত ও সংশোধিত নিয়মে এই ব্যবস্থা করা হইল যে প্রাদেশিক সরকার তাঁদের প্রজেক্টের সাত-আট কপি একই সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল কেন্দ্রীয় দফতরে এক-এক কপি পাঠাইয়া দিবেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন বা সংশোধন না আসিলে অনুমোদিত বলিয়া ধরিয়া লইবেন এবং কার্যে অগ্রসর হইবেন। আরও নিয়ম করা হইল যে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের টাকা কোন অবস্থাতেই ল্যাপস বা বাতিল হইবে না। কারণ পূর্ব-বাংলায় ছয় মাসের বেশি বর্ষার দরুন নির্মাণ-কার্য বন্ধ থাকে। প্রাকৃতিক কারণে কাজ বন্ধ থাকার দরুন টাকা খরচ না করা গেলে তার জন্য কর্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। পূর্ব-বাংলার ঋতুর সাথে সম্পর্ক রাখিয়া পাকিস্তানের আর্থিক বছর এপ্রিলের বদলে জুলাই হইতে শুরু করার প্রস্তাব পূর্ব

পাকিস্তানের আতাউর রহমান মন্ত্রিসভাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করিয়াছিলেন। আমাদের আমলে সব গোছাইয়া ইহা করিয়া উঠিতে পারি নাই। ফিরোয খাঁ মন্ত্রিসভার আমলে তা করা হইয়াছিল। বর্তমান সরকাও তা বজায় রাখিয়াছেন।

নিয়ম-কানুন বদলান ছাড়া শিল্প বাণিজ্য দফতরে কতকগুলি বিশেষ সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল। তার মধ্যে এই কয়টির নাম বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য : (১) সওদাগরি জাহাজ (২) আর্ট সিল্ক-শিল্প (৩) ডবল লাইসেন্সিং, (৪) বোগাস লাইসেন্সিং, (৫) ফিল্ম লাইসেন্সিং এবং নিউকামার। এছাড়া আমার অধীনস্থ দুইটি দফতরেই যথাসাধ্য চাকুরি-গত প্যারিটি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। চাকুরির ব্যাপারে দু-একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ পরে করিব। আগে সংস্কারের চেষ্টা ও তার প্রতিক্রিয়ার কথাটাই বলিয়া নেই।

৩. সওদাগরি জাহাজ

সওদাগরি জাহাজের কথাটাই সকলের আগে বলি। সওদাগরি জাহাজের দিকে আমার নযর পড়ে পূর্ব-পাকিস্তানের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিচার করিতে গিয়া। পূর্ব-পাকিস্তান তার প্রয়োজনীয় চাউল সিমেন্ট সরিষার তেল লবণ সূতা কাপড় ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানি করিয়া থাকে। জাহাজ ছাড়া এসব আমদানির আর কোনও যান-বাহন নাই। কাজেই এসব আমদানির ব্যাপারে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার ও ব্যবসায়ীদের একমাত্র জাহাজের দিকেই চাহিয়া থাকিতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এইসব জিনিসের দামের চেয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের দাম অনেক বেশি। এর একমাত্র কারণ জাহাজের মালিকরা গলাকাটা চড়া রেটে ভাড়া আদায় করিয়া থাকেন। আমি সরকারী কর্মচারী ও এক্সপোর্টারদের অভিমত লইয়া জানিতে পারিলাম, জিনিস-ভেদে করাচি হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত প্রতি টনে পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশ টাকার বেশি ভাড়া হইতে পারে না। কাজেই আমি প্রতি টন একান্ন টাকা বাঁধিয়া ফরমান জারি করাইলাম। জাহাজে স্থান বন্টন-বিতরণে দুর্নীতি মূলক পক্ষপাতিত্ব নিবারণের কড়া ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু অল্পদিনেই খবর পাইলাম সরকার-নির্ধারিত রেট অমান্য করিয়া মালিকেরা নব্বই-পচানব্বই টাকা টন প্রতি ভাড়া আদায় করিতেছেন। স্বয়ং ব্যাপারীরাই প্রতিযোগিতা করিয়া বেশি ভাড়া দিয়া থাকেন। জাহাজে জায়গার অভাব কেন? অফিসারদের লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলাম। তাঁরা সবাই আমার চেয়ে অভিজ্ঞ লোক। তাঁরা খাতা-পত্রের হিসাব দেখাইয়া বলিলেন, উপকূল বাণিজ্যের জন্য আমাদের মোট উনচল্লিশটা জাহাজ আছে। অত

জাহাজ থাকিতে জায়গার অভাব কেন, সে প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা যা বললেন, তাতে বুঝা গেল আসলে কাজের জাহাজ অত নাই। তদারক করিয়া দেখা গেল, মাত্র উনিশটা জাহাজ চালু আছে। বাকী বিশটাই মেরামতে আছে। মেরামতের দিন–তারিখ হিসাব করিয়া দেখা গেল, বহু বছর ধরিয়া ওদের মেরামত চলিতেছে। অভিজ্ঞ অফিসারেরা তাঁদের বহু অভিজ্ঞতার নযির দিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, জাহাজের মালিকদের চালাকি ধরা খুব কঠিন। আসল ব্যাপার এই যে তারা বরাবর একই জাহাজ বিকল ও 'আন্ডার রিপেয়ার' দেখায় না। একটার পর আর একটা দেখায়। এই সমস্ত সওদাগরি জাহাজের মালিক মাত্র জন তিন–চারেক। কাজেই খুব প্রভাবশালী। ইচ্ছা করিলে তাঁরা গোটা কোস্টাল ট্রাফিক অচল করিয়া দুই পাকিস্তানের যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। পরামর্শ সভার ফল বিশেষ কিছু হইল না। জাহাজ ভাড়ার 'রেট' এবং পরিণামে পূর্ব পাকিস্তানী কনযিউমারদের দুর্দশা আগের মতই চলিল। আমি নিরুপায় হইয়া দাঁতে হাত কামড়াইতে থাকিলাম।

ইতিমধ্যে সওদাগরি জাহাজের মালিকদের যিনি প্রধান তিনি অসুস্থতার অজুহাতে ইযি–চেয়ারে শুইয়া লোকের কাঁধে চড়িয়া আমার সাথে দেখা করিলেন। তিনি খোলাখুলি আমাকে বলিলেন ঃ টন প্রতি একান্ন টাকা ভাড়া বাঁধিয়া দেওয়া সরকারের ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে। তথ্য ও বৃত্তান্তমূলক আমার সমস্ত যুক্তির জবাবে তিনি বলিলেন ঃ তাঁরা সরকারের বাঁধা দর মানিতেছে না, মানিবেও না। তিনি সগর্বে আমাকে জানাইয়া দিলেন, তাঁরা বর্তমানে পচানব্বই টাকা ভাড়া আদায় করিতেছেন এবং সেজন্য রশিদ দিতেছেন। ইচ্ছা করিলে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন। সে ভয়ে কম্পিত নন তিনি।

আমি ভদ্রলোকের দুঃসাহস দেখিয়া অবাক হইলাম। এত সাহস তিনি পাইলেন কোথায়? অফিসার যাঁরা এই যোগাযোগের সময় হাযির ছিলেন তাঁরা আমাকে বুঝাইলেন, খুঁটির জোরেই ছাগল কুঁদে। অল্পদিন পরেই জানিতে পারিলাম, ঐ ভদ্রলোক করাচির সবচেয়ে বড় ক্লাবে বসিয়া (আমাদেরও বড়–বড় অফিসাররাও ঐ ক্লাবের মেম্বার) সগর্বে অফিসারদের বলিয়াছেন ঃ 'বলিয়া দিবেন আপনাদের মন্ত্রীকে, প্রেসিডেন্ট আমার ডান পকেটে। প্রধানমন্ত্রী আমার বাম পকেটে। অমন মন্ত্রীকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।'

যে অফিসাররা আমাকে এই রিপোর্ট দিলেন তাঁরা এই বলিয়া আমাকে তসল্লি দিলেন, লোকটা স্বভাবতঃই অমন গাল–গপ্পী ; ওর কথা যেন আমি সিরিয়াসলি না

নেই। তাঁদের তসল্লির দরকার ছিল না। সিরিয়াসলি নিবার কোনও উপায় ছিল না। মিনিস্টাররা কি সত্যই অমন নিরুপায়?

কথায় বলে 'নিরুপায়ের উপায় আল্লা'। আমার বেলায় তাই হইল। এই সময় আমি পরপর কতকগুলি বেনামী পত্র পাইলাম। তার মধ্যে নামে-যাদে জাহাজের মালিকদের শয়তানির বিস্তারিত বিবরণ থাকিত। উহাদের বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়ার অনুরোধ থাকিত। অতীতে কোনও মন্ত্রী বা অফিসার এসব শয়তানি রোধ করিতে পারেন নাই, আমিও পারিব কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আমাকে রাগাইবার চেষ্টা থাকিত। এইসব পত্রের মধ্যে দুইটির কথা আমার আজও মনে আছে। একটিতে ছিলঃ উক্ত বড় মালিকের ফলানা নামে একটি জাহাজ করাচি বন্দরে বহুদিন অকেজো পড়িয়া আছে, যদিও কাগযে-পত্রে মাঝে-মাঝেই উহাকে চালু দেখান হইয়াছে। তদন্ত কমিশনের খবর পাইয়া এই জাহাজখানাকে মেরামতের নামে ফলানা তারিখে করাচি বন্দর ত্যাগ করিয়া বোম্বাই মুখে রওনা করান হইবে। আর ফিরিয়া আসিবে না। পথে সমুদ্দুরে আত্মহত্যা (স্কাটল) করিয়া জাহাজ ডুবির রিপোর্ট দিবে এবং সরকার ও ইনসুরেন্স কোম্পানির কাছে বিপুল ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে। এটা বন্ধ করা দরকার। খুব গোপনীয়ভাবে কাজ করিতে হইবে। জানাজানি হইলে সব ব্যর্থ হইবে। নির্ধারিত দিনের আগেই ওটাকে সরান হইবে। ইহাই পত্রের সারমর্ম। পত্রখানি 'ব্যক্তিগত' মার্ক করিয়া আমার নামে দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই অফিসারেরা কেউ খোলেন নাই।

আমি নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এ্যাডমিরাল চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করিয়া ইতিমধ্যে একটা তদন্ত কমিশন বসাইয়াছিলাম। কমিশনের রিপোর্টের আশায় অপেক্ষা করিতেছিলাম। যথাসাধ্য গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদের সহিত গোপনে পরামর্শ করিলাম। সব ব্যাপারে আমরা একমত হইলাম। তিনি সেখানে বসিয়াই একটি অর্ডার শিটে কন্ট্রোলার-অব-শিপিং-এর উপর একটি যরুরী অর্ডার লিখিলেন। তাতে উক্ত জাহাজের নামোল্লেখ করিয়া পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে করাচি বন্দর ত্যাগ করিতে না দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইল এবং তাতে আমার অনুমোদন লইয়া সেক্রেটারি সাহেব আমার পার্সনাল স্টাফ ডাকিয়া 'আর্জেন্ট' 'ইমিডিয়েট' 'মোস্ট ইমিডিয়েট' 'স্ট্রিক্টলি কনফিডেনশিয়াল' 'স্পেশ্যাল ম্যাসেঞ্জার' ইত্যাদি অনেক রকমের বড় বড় স্ট্যাম্প মারিয়া গালামোহর করাইয়া স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার মারফত ডেলিভারি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আমি সেক্রেটারি সাহেবের ক্ষিপ্র নিপুণতার তারিফে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি ঐ কাজ শেষ করিলে আমি এই পত্রখানাও অমনভাবে স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার মারফত এডমিরাল চৌধুরীর নিকট পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ করিলাম। কথাটা তিনি খুব পসন্দ করিলেন। কিন্তু জানাইলেন এডমিরাল চৌধুরী সরকারী কাজে পাকিস্তানের বাহিরে গিয়াছেন। দুই-এক দিনের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। তখনই ওটা তাঁর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে পৌঁছাইতে হইবে।

সমস্ত ব্যবস্থার পাকা-পুখ্তিতে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যান্য কাজের চাপে ব্যাপারটা ভুলিয়াই গিয়ছিলাম। হঠাৎ একদিন আরেকখানা বেনামী পত্র পাইলাম। তাতে লেখা হইয়াছে ঃ হাজার আফ্সোস্ যথাসময়ে হুশিয়ার করা সত্ত্বেও আমি 'ফলানা' জাহাজ সম্পর্কে কোনও সতর্কতা অবলম্বন করি নাই। জাহাজখানা উল্লিখিত তারিখে কিম্বা তার একদিন আগেই মেরামতের পারমিশন লইয়া করাচি বন্দর ত্যাগ করিয়াছে। আমার মত মন্ত্রীর দ্বারা কোনও কাজ হইবে না, পত্র-লেখক আগেই সে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তবু লোকমুখে আমার তেজস্বিতার কথা শুনিয়া তিনি ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। ইত্যাদি। আমি পত্র পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদকে ডাকিলাম। তিনিও পত্র পড়িয়া অবাক হইলেন। কন্ট্রোলার-অব-শিপিংকে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করিলেন। কন্ট্রোলার ঐ ধরনের কোনও নোট বা অর্ডার পান নাই। আযিয আহমদ সাহেব কড়া অফিসার বলিয়া মশহুর। সত্যই তাই। তিনি কয়দিন ধরিয়া সমস্ত বিভাগ তোলপাড় করিলেন। ডিসপ্যাচ বুক ডেলিভারি রেজিস্টার পিয়ন বুক সব তন্নতন্ন করিয়া তদারক করিলেন। কোথায় সে অর্ডারশিটটা গায়েব হইয়াছে, তিনিও ধরিতে পারিলেন না।

কয়েকদিন পরে খবরের কাগযে পড়িলাম, ঐ ফলানা জাহাজ সত্য-সত্যই বোম্বাইর নিকটবর্তী স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা যথারীতি তদন্ত কমিশনের কাছে পাঠান হইল।

আরও কয়দিন পরে আরেকটি জাহাজ সম্পর্কে এক-বেনামী পত্র আসিল। তাতে লেখা হইয়াছে ঃ ঐ বড়লোক জাহাজওয়ালা অস্ট্রেলিয়া হইতে একটি জাহাজ খরিদ করার জন্য সরকার হইতে তেত্রিশ লাখ টাকার বিদেশী মুদ্রা নিয়া সেখানে বড়জোর তিন-চার লাখ টাকা দামের একটি লক্কড় জাহাজ কিনিয়াছেন। ওয়েলিংডন বন্দর হইতে উক্ত জাহাজ নামক লক্কড়টি অন্য একটি জাহাজের পিছনে বাঁধিয়া টোউ করিয়া টানিয়া আনার ব্যবস্থা হইয়াছে। করাচি বন্দরে ইহা প্রবেশ করার আগে বিশেষ করিয়া রেজিস্ট্রেশন দিবার আগে যেন আমি এই জাহাজ সম্পর্কে গোপনীয় তদন্ত করাই।

ইত্যাদি। মনে হইল, এই পত্রের লেখক আগের লেখক নন। কারণ এতে আগের পত্রের কোনও উল্লেখও নাই। আমার যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ প্রকাশও নাই।

সেক্রেটারি সাহেবের সহিত গোপন পরামর্শ করিয়া এ সম্পর্কে পাকা ব্যবস্থা করিলাম। অতিরিক্ত সাবধানতা স্বরূপ আযিয আহমদ সাহেব এবার জয়েন্ট সেক্রেটারি মিঃ ইউসুফ সাহেবকেও এ-বিষয়ে সংগে লইলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়াই আট-ঘাট বাঁধিলেন। মিঃ ইউসুফ খুব মেথডিক্যাল মানুষ। কাজেই এবার চোর ধরা পড়িবেই মনে করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আবার আমি কাজের চাপে সব ভুলিয়া গেলাম। কিছুদিন পরে আরেকটা বেনামা পত্র পাইলাম। তাতে দুঃখ করিয়া লেখা হইয়াছে, আগে হইতে সাবধান করা সত্ত্বেও আমরা কিছুই করিলাম না। উক্ত লক্কড় জাহাজটি যথাসময়ে করাচিতে পৌছিয়া 'সিওয়ার্দির' (সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী) সার্টিফিকেট লইয়া রেজিস্ট্রেশন পাইয়া সার্ভিসে কমিশনড্ (নিয়োজিত) হইয়া গিয়াছে। এই পত্রখানিও বাণিজ্য সেক্রেটারি ও জয়েন্ট সেক্রেটারিকে দেখাইলাম। আমার মত তাঁদেরও তালু-জিভ লাগিয়া গেল। কি ভৌতিক ব্যাপার! অনারেবুল মিনিস্টার, দোর্দন্ড-প্রতাপ সেক্রেটারি, কর্তব্য-চেতন জয়েন্ট সেক্রেটারি সবারই চোখে ধুলা দিয়া, কার্যতঃ আমাদেরে বুড়া আংগুল দেখাইয়া, রাষ্ট্র ও সমাজের শত্রুরা তাদের মতলব হাসিল করিয়া যাইতেছে। অথচ তারা আমাদের হাত দিয়াই ত তামাক খাইয়া যাইতেছে। আমাদেরই দফতরের কোনও স্তরে আমাদের আদেশ আটকাইয়া বা বাতিল হইয়া যাইতেছে। মনে পড়িল প্রধানমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দীর এক দিনের হুংকারের কথা। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর-পরই তিনি একটি আদেশ দিয়াছিলেন। পাঁচ মাস পরে তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁর আদেশ তখনও কার্যকারী হয় নাই। সংশ্লিষ্ট দফতরের সেক্রেটারি সহ কতিপয় সেক্রেটারির সামনে তিনি হুংকার দিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'আমি জানিতে চাই আমিই প্রধানমন্ত্রী না আর কেউ?' এর পর তাঁর সেই আদেশ কার্যকরী হইয়াছিল। বাণিজ্য-সেক্রেটারিদ্বয়ের ও-ব্যাপার জানা ছিল। আমি তাঁদেরে সে কথা স্মরণ করাইয়া বলিলাম ঃ 'আমাদেরও সেই দশা নয় কি?' তাঁরা উভয়ে এই অবস্থার প্রতিকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানাইলেন ।

যথা সময়ে এডমিরাল চৌধুরী কমিশনের রিপোর্ট পাইলাম। ঐ রিপোর্ট বুঝাইতে তিনি আমার সাথে দেখাও করিলেন। আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। উভয়ে সম্পূর্ণ একমত হইলাম। বেনামা পত্রগুলির সব অভিযোগই সত্য। এ ছাড়াও আরও বহু কেলেংকারি আছে। তিনি সুপারিশ করিলেন ঃ একমাত্র প্রতিকার ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন গঠন করিয়া কোস্টাল শিপিং পুরাপুরিভাবে কর্পোরেশনের হাতে তুলিয়া

দেওয়া। এডমিরালের সুপারিশ আমার খুবই পছন্দ হইল। দুই অংশের মধ্যে নিয়মিত মাল বহন ছাড়াও গরিব জনসাধারণের যাতায়াত সহজ ও সস্তা করিয়া উভয় পাকিস্তানের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। উভয় পাকিস্তানের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানী জাতি গড়িতে হইলে জনগণের মিলা-মিশার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। রাজধানীর সাথে পূর্ব-পাকিস্তানী জনগণের সস্তা যোগাযোগ স্থাপন শুধুমাত্র জাহাজ-পথেই হইতে পারে। পি. আই. এ.-র যোগাযোগটা বড় লোক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই এডমিরাল চৌধুরীর সুপারিশে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম।

৪. উপকূল বাণিজ্য জাতীয়করণ

আমি সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদ ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মিঃ ইউসুফের সাথে পরামর্শ করিয়া ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন গঠন করা স্থির করিলাম। কোস্টাল শিপিং সম্পর্কে খুঁটি-নাটি জানিবার জন্য মিঃ ইউসুফকে বোম্বাই পাঠান হইল। কিছুদিন আগে হইতেই ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে ইস্টার্ন শিপিং কর্পোরেশন নামে বোম্বাই-এ একটি কর্পোরেশন চালাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি বোম্বাই হইতে ফিরিয়া ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন বিলের কাঠামো খাড়া করিলেন। আমার অনুমোদনক্রমে বিলের মুসাবিদা রচনার জন্য আইন দফতরে উহা পাঠান হইল। জাহাজের মালিকরা প্রেসিডেন্ট মির্যা ও প্রধানমন্ত্রী শহীদ সাহেবের কাছে হত্যা দিয়া পড়িলেন। মালিকদের প্ররোচনায় খবরের কাগযে হৈ চৈ পড়িয়া গেল ঃ বাণিজ্য মন্ত্রী আবুল মনসুর দেশে কমিউনিযম আনিতেছেন। ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী আমাকে জাহাজের মালিকদেরে আমার দফতরে ডাকিয়া বুঝাইতে উপদেশ দিলেন। আমি তদনুসারে জাহাজের মালিকদের সভা ডাকিলাম। তাঁদেরে বুঝাইলাম। কর্পোরেশন তাঁদেরে শেয়ার দেওয়া হইবে, তাঁদেরে জাহাজগুলি কর্পোরেশনের কাছে উপযুক্ত মূল্যে বেচিতে চাইলে কর্পোরেশন খরিদ করিয়া নিবে, এমন কি কর্পোরেশনের ডিরেক্টর বোর্ডে তাঁদের প্রতিনিধি নেওয়া হইবে, সব কথা বুঝাইলাম। এতে কমিউনিযমের কিছু নাই, তা বলিলাম। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী সাহেব পি. আই. এ. স্থাপন করিতে গেলে তৎকালীন 'ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েয' নামক কোম্পানির মালিকরা যে হৈ চৈ করিয়াছিলেন, তার দৃষ্টান্ত দিলাম। কর্পোরেশনের শুধু উপকূল বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে মালিকরা নিজ-নিজ ব্যবসা অবাধে চালাইয়া যাইতে পারিবেন, এ সব কথাও বলিলাম।

কিছুতেই কিছু হইল না। মালিকরা খবরের কাগযে আন্দোলন করিয়াই চলিলেন। অনেকগুলি কাগয সম্পাদকীয় লিখিয়া আমার কাজের নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রস্তাবিত কর্পোরেশন টন প্রতি পঞ্চাশ টাকাও জনপ্রতি তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কুড়ি টাকা বাঁধিয়া দিলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে জনগণের ইনটিগ্রেশন যে কত ত্বরান্বিত হইবে আমার এসব কথা অরণ্যে রোদন হইল। অনেকে মনে করেন, সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ আমার এই প্রস্তাব। অসম্ভব নয়। প্রেসিডেন্টের সহিত জাহাজের মালিকদের যোগাযোগ পুরাদমে চলিল। প্রেসিডেন্ট আমাকে ধমকাইলেন। প্রধানমন্ত্রী আমাকে 'আস্তে চল'–নীতি গ্রহণের উপদেশ দিলেন। আমি আস্তে চলিলাম।

বাণিজ্য–সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদ কড়া লোক। তিনি নিজের যিদ ছাড়িলেন না। অন্য পথ ধরিলেন। দুই দুইবার একই ব্যক্তির হাতে মার খাইয়া তিনি অন্যদিকে এর প্রতিকারের উপায় বাহির করিলেন। একই ব্যাক্তি মানে একই মালিক। যে দুইটি জাহাজের ঘটনা উপরে বলা হইল, উভয়টির মালিক একই ব্যক্তি। এডমিরাল চৌধুরী কমিশনের রিপোর্টে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনেক কুকীর্তির কথা বলা হইয়াছে। ঐ রিপোর্ট ভিত্তি করিয়া সেক্রেটারি নৌ–আইন অনুসারে চারটে ফৌজদারি মোকদ্দমা দায়ের করার প্রস্তাব করিলেন। আমি তাঁর সাথে একমত হইলাম। তিনি সব মোকদ্দমার পূর্ণাঙ্গ নথিপত্র তৈয়ার করিয়া পাবলিক প্রসিকিউটরের অনুকূল মন্তব্য সহ আমার দস্তখতের জন্য পেশ করিলেন। বলিলেন ঃ শিগ্‌গির দস্তখত দিবেন। দেরি হইলে উপর হইতে চাপ আসিবে।'

সত্য–সত্যই উপর হইতে চাপ আসিল। আমি দেওয়ানি উকিল। খুঁটি–নাটি না দেখিয়া কাগয সই করি না। সেক্রেটারি সাহেবের হুঁশিয়ারি ও তাগিদ সত্ত্বেও সই করিবার জন্য মাত্র একটা দিন সময় নিলাম। সেক্রেটারি সাহেবকে বিদায় করার দুই–এক ঘন্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্টের ফোন পাইলাম। মামলার আয়োজনের কথা তাঁর কানে গিয়াছে। আপাততঃ ঐ সব বন্ধ রাখিতে এবং তাঁর সাথে কথা না বলিয়া মামলা দায়ের না করিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন। প্রেসিডেন্টের ফোন রাখিয়াই প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ 'প্রেসিডেন্ট স্বয়ং যখন অনুরোধ করিয়াছেন, তখন শুধু তাঁর খাতিরে দুই–একদিন বিলম্ব করা তোমার উচিৎ।'

আমি অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর সহিত দেখা করিলাম। সেক্রেটারির সহিত পরামর্শ করিলাম। সেটা ছিল বোধ হয় বৃহস্পতিবার। সোমবার পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে সেক্রেটারি সাহেব রাজি হইলেন। আমি ঐ মর্মে অর্ডার শীটে অর্ডার লিখিয়া সমস্ত কাগযপত্র

সেক্রেটারিকে দিয়া দিলাম। তিনি সোমবারের মধ্যেই নথিপত্র পাবলিক প্রসিকিউটর মিঃ রেমণ্ড (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান হাই কোর্টের জজ) সাহেবের কাছে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। আমি প্রধানমন্ত্রীকে এবং প্রেসিডেন্টকে জানাইলাম ঃ তাঁদের আদেশ আমি রক্ষা করিয়াছি।

যথাসময়ে চার-চারটা মামলা দায়ের হইয়া গেল। বড়লোক আসামী বিলাত, হইতে ব্যারিস্টার আনিলেন। সমানে-সমানে লড়াইর জন্য সরকার পক্ষ হইতেও বিলাতী ব্যারিস্টার আনার কথা উঠিল। পাবলিক প্রসিকিউটর মিঃ রেমণ্ড বলিলেন তিনিই যথেষ্ট। আমি তাঁর সাথে একমত হইলাম। মামলা এত পরিষ্কার যে বিলাতী ব্যারিস্টারের দরকার নাই। তাই হইল। একটা মামলায় সরকারের জিত হইল। বাকী তিনটা মামলা বিচারাধীন থাকাকালেই সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতন ঘটিল। পরে শুনিলাম ঐ সব মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

৫. ডবল ও বোগাস লাইসেন্সিং

বাণিজ্য দফতরের ডবল লাইসেন্সিং ও বোগাস লাইসেন্সিং এর দিকে আমার নযর পড়িল। বোগাস লাইসেন্সিংটা দুর্নীতি। কিন্তু ডবল লাইসেন্সিং দুর্নীতি নয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ম মোতাবেকই এই প্রথা চালু ছিল। লাইসেন্সিং দুই প্রকারের ঃ একটা কমার্শিয়াল, অপরটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল। এছাড়া এক প্রকার লাইসেন্সিং আছে, সেটা কর্মাশিয়ালও নয় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালও নয়। সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কলেজ-ইউনির্ভাসিটিকে এবং কোন-কোনও বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিকে নিজ-নিজ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্যও লাইসেন্স দেওয়া হয়। কিন্তু আমার এখানকার বক্তব্য তাদের সম্বন্ধে নয়। শুধু প্রথমোক্ত কর্মাশিয়াল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং এখানকার আলোচ্য। আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কয়েকদিন মধ্যেই কোন কোনও অফিসার এবং পাবলিকের কেউ-কেউ ডবল লাইসেন্সিং-এর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এটা যে পরিণামে জনসাধারণেরই ক্ষতিকর তা বুঝাইয়া দেন। একই ব্যক্তিকে উভয় প্রকার লাইসেন্স দেওয়ার নাম ডবল লাইসেন্সিং। কর্মাশিয়াল লাইসেন্সওয়ালারা বিক্রির উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে মাল আমদানি করেন। আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সওয়ালারা নিজ-নিজ শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির জন্য লাইসেন্স পান। সুতরাং কর্মাশিয়াল লাইসেন্স সওদাগর-ব্যবসায়ীদের জন্য। আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স শিল্পপতিদের জন্য। শিল্পপতিদের কর্মাশিয়াল

লাইসেন্স দিলেই এটা হয় ডবল লাইসেন্সিং। ধরুন, ঔষধ তৈয়ারের একটি কারখানাকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স দিলেন। তার উপরেও তৈয়ারী ঔষধ আমদানির কর্মাশিয়াল লাইসেন্স তাকেই দেওয়া হইল। এতে জনসাধারণের কিভাবে ক্ষতি হইল, তার বিচার করা যাউক। দেশী কারখানার তৈয়ারী ঔষধ আমদানি করা বিদেশী ঔষধ একই মালিক-বিক্রেতার হাতে পড়িল। তাতে তারা কৌশলে কৃত্রিম ঘাট্‌তি ও অভাব সৃষ্টি করিয়া উভয় প্রকার ঔষধের দাম বাড়াইয়া অতিরিক্ত মুনাফা লুটিতে পারে। কার্যতঃ অনেকে তাই করিতেছিল। এ ধরনের প্রথম অভিযোগ আসে কয়েকটি ঔষধ তৈয়ারীর কারখানার বিরুদ্ধে। এরা সকলেই নামকরা বিদেশী কোম্পানী। আইন বাঁচাইবার জন্য এরা পাকিস্তানে কোম্পানি রেজিস্টারি করিয়াছে। কিন্তু লোক-দেখানো-গোছের নাম মাত্র ঔষধ এদেশে তৈয়ার করে। আসলে যার-তার দেশের ঔষধ-পত্র মাস্‌-স্কেলে বাল্ক আমদানি করিয়া এ দেশে শুধু বটলিং ও লেভেলিং করে। বোতলও এদেশে কিনে না। লেভেলও এদেশে ছাপে না। সব যার-তার দেশ হইতে আনে। তবু এদের ঔষধের নাম 'মেড-ইন-পাকিস্তান'। এরা যে লুটতরাজ করিতেছে তার প্রমাণ বাজারের দাম। জনসাধারণ যে অভিযোগ করিতেছে তার প্রমাণ দফতরেই অনেক নালিশ অভিযোগ-পত্র পড়িয়া আছে। অফিসারের সাথে পরামর্শ করিলাম। প্রায় সবাই এক বাক্যে ডবল লাইসেন্সিং এর বিরুদ্ধে সুপারিশ করিলেন। আমি ডবল লাইসেন্সিং উঠাইয়া দেওয়ার আদেশ দিলাম। ভাবিলাম, তবে এতদিন এই ব্যবস্থা চলিল কেমন করিয়া? আমার আদেশ জারী হওয়ায় ঐসব কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমার সহিত সাক্ষাত করিয়া আমার আদেশের প্রতিবাদ জানাইলেন। স্থানীয় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদেরও কেউ-কেউ তাঁদের পক্ষে সুপারিশ করিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিলেন। এই অন্যায় ব্যবস্থা এতদিন কেন চলিতেছিল, এখন তার কারণ বুঝিলাম। কোম্পানিগুলি আসলে বিদেশী হইলেও এ সবের পাকিস্তানী সংস্থায় স্থানীয় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ অংশীদার। এঁদের সুপারিশে আমি টলিলাম না। এঁরা আমার উপর গোস্‌সা হইলেন।

আরেক প্রকার লাইসেন্সিং চলিতেছিল। তাকে বলা যায় বোগাস লাইসেন্সিং। আদতে শিল্পের নামগন্ধ নাই। অথচ এইসব অস্তিত্বহীন 'শিল্পের' জন্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স এবং তৈয়ারী মালের কর্মাশিয়াল লাইসেন্স বছরের-পর-বছর ইশু হইয়া আসিতেছে। এইরূপ অনেকগুলি বোগাস লাইসেন্সিং-এর অভিযোগ আমার কানে আসে। আমি বিনাদ্বিধায় এক-ধারসে এদের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেই। এইরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। ইতিহাস বিখ্যাত একজন মুসলিম বৈজ্ঞানিকের নাম অনুসারে এই কোম্পানির

গালভরা নাম। প্রতি শিপিং পিরিয়ডে অর্থাৎ ছয়মাসে এগার লাখ করিয়া এই কোম্পানি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ও কর্মাশিয়াল লাইসেন্স বাবৎ বছরে বাইশ লক্ষ টাকার লাইসেন্স পাইয়া আসিতেছিল। আমি পরপর কয়েকটি বেনামাপত্র পাই। অভিযোগ গুরুতর। কাজেই যাঁকে-তাঁকে দিয়া তদন্ত করান চলিবে না। স্বয়ং শিল্প-সেক্রেটারি মিঃ মোহাম্মদ খুরশিদের উপর এই তদন্তের ভার দিলাম। বলিয়া দিলাম তাঁর নিজের তদন্ত করিতে হইবে।

যথাসময়ে তার রিপোর্ট পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। যতদূর মনে পড়ে তাঁর রিপোর্টের সারমর্ম ছিল এই ঃ করাচির বাহিরে এক রাস্তার ধারে একটি ভাঙ্গা দালানে ঐ নামে একটি সাইনবোর্ড লটকানো। দালানের বারান্দায় কয়েকটি ভেড়া বান্ধা। পাশেই দড়ির খাটিয়ায় একটি বুড়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। তাকে ডাকিয়া তুলিয়া ঔষধের কারখানার কথা জিগ্‌গাসা করিলে বুড়া ভড়কাইয়া গেল। সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় ভিতর-বাহির তালাশ করিয়া একটি একসারসাইজ বুক পাওয়া গেল। তাতে করাচি শহরের তিন -জায়গার-ঠিকানা-দেওয়া তিনজন লোকের নাম পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে দুইজনকে পাওয়া গেল। অবশেষে তারা স্বীকার করিল যে তারা কথিত কোম্পানি হইতে মাসে একশ টাকা বেতন পায়। ঔষধ বিক্রির তারা এজেন্ট মাত্র এই কথা বলাই তাদের কাজ। ঔষধ বিক্রি তারা কোনও দিন করে নাই। সেক্রেটারির সুপারিশ মত আমি তৎক্ষণাৎ ঐ লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিলাম। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলাম। সেই দিন বা পরের দিন রাত্রে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে এক ডিনারে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ও প্রাইম মিনিস্টার এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সাথে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। উভয়ে প্রায় একই ধরনের কথা বলিলেনঃ 'এঁরা আমার বিশেষ বন্ধু লোক। এঁদের কোনও উপকার করিলে আমি ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হইব।' আমি ওঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম, ঐ কোম্পানি এঁদেরই। সরলভাবে তাঁরা স্বীকার করিলেন, ওটা অপরাধ হইয়াছে। কৈফিয়ত দিলেন, করি-করি করিয়াও প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কারখানাটা আজো করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁরা দুঃখিত। অতএব তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত হইতে হইবে। তাঁদের লাইসেন্সটা অন্ততঃ অংশতঃ মঞ্জুর করিতে হইবে। তাঁরা বাদশাহী বংশের লোক। বর্তমানে অভাবে আছেন। আমাদের দেশের 'গরিব ভদ্রলোক' আর কি? ঐ করিয়াই তাঁরা দুইটা পয়সার মুখ দেখেন। নিজেদের অপরাধকে লঘু করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তি দিলেন, নিজেরা কারখানা করিতে না পারিলেও তাঁদের লাইসেন্স তাঁরা কালাবাজারে বিক্রয় করেন না। জেনুইন ঔষধের কারখানাওয়ালার কাছে সামান্য মাত্র লাভে বিক্রয় করেন। কাজেই আমার বিবেচনা

করা উচিৎ যে সরকারের বিদেশী মুদ্রার ঐ লাইসেন্স অপব্যয়িত হয় না, বরঞ্চ সৎকাজেই লাগে।

আমি ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলার দুঃসাহসিক বুকের পাটা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বলা বাহুল্য তাঁদের প্রতি আমি বিন্দুমাত্র দরদ দেখাইতে পারিলাম না। কিন্তু ফৌজদারিও লাগাইতে পারিলাম না।

৬. আর্টসিল্ক ইণ্ডাস্ট্রি

বোগাস লাইসেন্সের কথা বলিতে গিয়া মনে পড়িতেছে একটি এজমালি বোগাস লাইসেন্সের লুট-পাটের কথা। এটি আর্ট-সিল্কের ব্যাপার। আর্টিফিশিয়াল সিল্ক (নকল রেশম) শিল্প পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বিলাসদ্রব্য-শিল্প। আমি শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী হওয়ার সাথে-সাথেই এই শিল্পপতিদের মোলাকাত দাওয়াত ও অভিনন্দনের হিড়িক দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হয়। আমি অফিসারদের মতামত লইতে শুরু করি। এঁদের মধ্যে মিঃ ইসমাইল নামে জনৈক ডিপুটি সেক্রেটারিকে আমার খুব পসন্দ হয়। অফিসারটি সৎ ও ধার্মিক বলিয়া মনে হয়। তিনি এ ব্যাপারে আমাকে অনেক জ্ঞান ও পরামর্শ দান করেন। এই সময় পাকিস্তান সরকার বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আর্টসিল্ক শিল্পে ব্যয় করিতেন। বোঝা গেল, প্রচুর অপব্যয় অবিশ্বাস্য দুর্নীতি ঐ ব্যাপারে চলিতেছে। কাগয-পত্রে দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় পাঁচ হাজার একশ ও পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ছিয়ানব্বইটা তাঁত চালু আছে। আমার প্রাদেশিক সংকীর্ণ মন প্রথম চোটেই ঐ বিপুল অসাম্যে আহত হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় অন্য কথা মনে আসিল। কাগযে-পত্রে ঐ তাঁত চাটগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু তথায় কিম্বা পূর্ব পাকিস্তানের কোনও শহরে নকল সিল্কের তাঁত দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। আমি আগামী সফরে চাটগাঁয় গিয়া ঐ শিল্প পরিদর্শন করিব একথা অফিসে রটনা করিয়া দিলাম। তাতে ফল হইল। সংশ্লিষ্ট-বিভাগ তাঁদের আগের রিপোর্ট সংশোধন করিয়া বলিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানের তাঁত সংখ্যা ছিয়ানব্বই নয়, ছয়চল্লিশ। আমার যা বুঝিবার বুঝিলাম। সত্য-সত্যই চাটগাঁয়ে ছয়চল্লিশ কেন ছয়টি তাঁতও পাইলাম না।

আমি মিঃ ইসমাইলকে গোপনে তদন্ত করিবার ভার এবং লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দান করিলাম। গোটা ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীর গোচর করা দরকার মনে করিলাম। আশ্চর্য ও খুশী হইলাম। তিনি নিজেও কিছুদিন হইতে এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছিলেন এবং আমাকে কিছু-একটা করিতে বলিবেন-বলিবেন মনে

করিতেছিলেন। আমি মিঃ ইসমাইলকে গোপন তদন্তের ভার দিয়াছি শুনিয়া তিনি খুশি হইলেন। বুঝিলাম মিঃ ইসমাইলের প্রতি তাঁরও বিশ্বাস আছে। তবে তিনি বলিলেন ঃ 'এ ধরনের ব্যাপারে একজনের তদন্তে ক্রটি থাকিতে পারে। কাজেই আরেকজনকে দিয়া তদন্ত করান দরকার। তবে দু'জনের একজনও জানিবেন না যে আরেকজনও তদন্ত করিতেছেন। গোপন তদন্ত ষোলআনাই গোপন রাখিতে হইবে।

মনে-মনে প্রধানমন্ত্রীর বুদ্ধির তারিফ করিলাম। তাঁরই প্রস্তাব-মত কর্নেল নাসির নামে মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের একজন অফিসারের উপর গোপন তদন্তের ভার দিলাম। মিঃ ইসমাইলের কথা তাঁকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলাম না। বলিলাম ঃ 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখিবেন।' কর্নেল মিলিটারি মানুষ। হাসিয়া জবাব দিলেন ঃ 'সে কথা আর বলিতে হইবে না, সার।'

যথাসময়ের মাত্র দু-চার দিনের আগে-পরে উভয় রিপোর্টই পাইলাম। আশ্চর্য! উভয় রিপোর্টেরই তথ্য-বিবরণই প্রায় এক। সত্যতা ও নির্ভুলতার অকাট্য প্রমাণ। উভয় রিপোর্টের সারমর্ম এই ঃ (১) পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁতের সংখ্যা একান্ন শ না, মাত্র বত্রিশ শ। (২) পূর্ব পাকিস্তানে পাঁচটি তাঁত আছে বটে, তবে চালু না। ইন্স্টলই করা হয় নাই। (৩) পশ্চিম পাকিস্তানের বত্রিশ শ'র অধিকাংশ (প্রায় দুই হাজার) তাঁতের যে হিসাব সরকারে দাখিল হইতেছে এবং আমদানি লাইসেন্স পাইতেছে, সবই বোগাস। যে তাঁতগুলি চালু আছে তাদেরও ক্যাপাসিটি অনেক বেশি করিয়া দেখান হয়। অত সূতা খাইবার ক্ষমতা তাদের নাই। (৪) যে বত্রিশ শ তাঁতের অস্তিত্ব আছে, তারও মধ্যে প্রায় অর্ধেক (পনর শ) দেশী কারিগরের তৈয়ারী। এ কথার তাৎপর্য এই যে সমস্ত চালু তাঁতের বাবতই মালিকরা বিদেশী মুদ্রা নিয়াছেন বিদেশী তাঁতের মূল্য বাবৎ। অথচ এই তাঁতগুলি বিদেশ হইতে আমদানি করা হয় নাই। এইসব তাঁত মেরামত করিবার নাম করিয়া স্পেয়ার পার্টস বাবৎ যে বিদেশী মুদ্রা নেওয়া হয়, তাও পার্টস আমদানিতে ব্যয় না করিয়া অন্য অসদুপায়ে ব্যয় করা হয়। (৫) বছরে যে সাড়ে তিন কোটি টাকার সূতা আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হয় উপরোক্ত কারণে তার অর্ধেক সূতাও আমদানি হয় না। বাকী টাকা দিয়া উচ্চ চাহিদার মাল আনিয়া শতকরা চার-পাঁচ শ টাকা মুনাফায় বিক্রি করা হয়।

রিপোর্ট দুইটি বিস্তারিত তথ্য-বিবরণ-পূর্ণ বিশাল আকারের দলিল হইয়াছিল। নষ্ট করা না হইয়া থাকিলে আজও নিশ্চয়ই শিল্প-দফতরে বিদ্যমান আছে। এই রিপোর্ট দুইটি বিচারবিবেচনা করিয়া প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে আমি চলতি শিপিং পিরিয়ডের (ছয় মাসের) সব আমদানি লাইসেন্স এক হুকুমে বাতিল করিয়া দিলাম। করাচি ও

সারা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। খবরের কাগযওয়ালারাও আমার উপর আগুন হইয়া গেলেন। পশ্চিমা অনেক মন্ত্রী ও মেম্বর এবং অফিসারদেরও কেউ-কেউ আমাকে বলিলেন : সৎ-অসৎ সবাইকে আমি এক সঙ্গে শাস্তি দিয়াছি। ফলে আর্ট-সিল্ক-শিল্প একদম মারা পড়িবে। জবাবে আমি বলিলাম : যদি শিল্পপতিরা লাইসেন্সের পরিমাণ মত সূতা আমদানি করিয়া থাকেন, তবে এক শিপিং পিরিয়ডের আমদানিতে এক বছরের বেশি চলিবার কথা। কাজেই এই ছয়মাসে শিল্প বন্ধ হইবে না।

সহকর্মী ও অফিসাররা নানা যুক্তি দিলেন। হঠাৎ বিনা-নোটিসে বন্ধ করা উচিৎ হয় নাই। আগে নোটিস দিলে এক বছরের খোরাকি জমা রাখিত। জেনুইন মিল কতকগুলি আছে যাদের কাজে ও হিসাবে কোনও ত্রুটি নাই ; অন্ততঃ এইসব মিলের লাইসেন্স দেওয়া উচিৎ। ইত্যাদি ইত্যাদি। কারও উপর অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব না করিয়া কি করা যায়, অফিসারদের সঙ্গে সে বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলাম। এমন সময় খবরের কাগযে এক রিপোর্ট বাহির হইল : তেষট্টি লক্ষ টাকা আদান-প্রদানের ফলে শিল্প-দফতরের আর্ট-সিল্ক-বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা শীঘ্রই প্রত্যাহৃত হইবে।'

এই সময় ন্যাশনাল এসেমব্লির বৈঠক চলিতেছিল। বন্ধু ফরিদ আহমদ হাউসের ফ্লোরে প্রশ্ন করিলেন: 'এ বিষয়ে শিল্প-মন্ত্রীর কি বলিবার আছে? আমি উত্তরে বলিলাম : 'কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীর অনুরোধে ও উচ্চপদস্থ বিভাগীয় অফিসারদের পরামর্শে আমি উক্ত নিষেধাজ্ঞার আংশিক সংশোধনের চিন্তা করিতেছিলাম। কিন্তু এই গুজব প্রকাশের পর এ বিষয়ে আর কোনও উপায় থাকিল না।'

পার্লামেন্ট শান্ত হইল বটে, কিন্তু শিল্পপতিরা অশান্ত হইয়া উঠিলেন। আমার সঙ্গে মোলাকাত চাহিলেন। আমি দেখা দিলাম না। আর্টসিল্ক এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে বর্ডার-ঘেরা এক বিশালাকারের বিজ্ঞপ্তিতে তাঁরা মাফ চাহিলেন এবং পর পর কয়েক দিন ধরিয়া ঐ বিজ্ঞপ্তি বড়-বড় দৈনিকে ছাপা হইল। তাতে যা বলা হইল তার সারমর্ম এই : ঐ গুজবের মূলে তাঁদের কোনও হাত নাই। শিল্পপতিদের অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই শত্রুপক্ষ হইতে ঐ গুজব রটান হইয়াছে। গুজবটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর্ট-সিল্ক-শিল্প মালিকদের পক্ষ হইতে এ ব্যাপারে কোনও আদান-প্রদান করা বা তার কথা হয় নাই। শিল্প মালিকরা এই গুজবের জন্য শিল্প মন্ত্রীর খেদমতে ক্ষমা চাহিতেছেন। এই গুজবে প্রভাবিত না হইয়া আর্ট-সিল্ক-মালিকদের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইত্যাদি।

ওঁদের কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু আমার কোনও উপায় ছিল না। প্রাপ্ত দুইটি রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাকে কাজ করিতে হইবে। যে কিছু সংশোধন আমি করিতে রাযী হইয়াছিলাম, তাও আমি এখন পারি না। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি লইয়া আমি ব্যাপারটা কেবিনেটে পাঠাইলাম এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার শত্রুর সংখ্যা ও শক্তি উভয়টাই বাড়িয়া গেল।

৭. তঞ্চকী লাইসেন্স

বোগাস লাইসেন্সিং-এর প্রকারান্তর ছিল তঞ্চকী লাইসেন্স। এমনি একটা ব্যাপারের দৃষ্টান্ত দেই। খুব বড় এক শিল্পপতি। বর্তমানে আরও বড় হইয়াছেন। হরেক রকমের শিল্প করেন। তৎকালে এঁরা পাইপ ম্যানুফেক্‌চারিং করিতেন। খুব নিচের তলা হইতে একটি মোটা ফাইল আপিলের আকারে আমার সামনে পেশ হইল। আমি কি কারণে মনে নাই, ফাইলটির আগাগোড়া পড়িলাম। হঠাৎ খুব নিচের তলার একজন কেরানির একটি নোট আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাতে লেখা আছে যে অমুক ব্যাপারটা সম্বন্ধে উক্ত অফিসার একাধিক বার উপরস্থ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। উক্ত বড় শিল্পপতির কারখানার তৈয়ারী পাইপ সরকারের বিভিন্ন দফতরের পক্ষে ডি. জি. এস. এণ্ড ডি. খরিদ করিয়াছেন। কয়েক লক্ষ টাকার বিল বাকী পড়িয়া আছে। অনেকবার তাগাদায়ও কোম্পানি টাকাটা পাইতেছে না। এই জন্যই মন্ত্রী পর্যায়ে এই নালিশ আসিয়াছে। বিভিন্ন দফতর বিভিন্ন অজুহাতে নিজেদের বিলম্বের হেতু দেখাইয়াছে। বিল চেক হয় নাই, মাল শর্ট সাপ্লাই আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এরই মধ্যে এক দফতরের নিম্নস্তরের উক্ত কর্মচারি এক্সেসিভ বিলিং এর হেতু খাড়া করিয়াছেন। ভদ্রলোকের নোটে বলা হইয়াছে, তিনি এর আগেও এই হেতু দিয়াছিলেন। কিন্তু উপরস্থ কর্তৃপক্ষ তাঁর কথায় কান দেন নাই। আমার কান খাড়া হইল। সুতরাং কান দিতে বাধ্য হইলাম। ফাইলটা আরও পিছন দিক হইতে পড়িলাম। বুঝিলাম পাইপ-নির্মাতা কোম্পানি আমদানি মালের যে দাম বলেন, আসলে তার অর্ধেক দামে মাল আনেন। কিন্তু বেশি দাম দেখাইয়া তৈয়ার-খরচা বেশি দেখাইয়া সরকার ও পাবলিক উভয়ের নিকট হইতে প্রায় ডবল দাম আদায় করিয়া থাকেন। আমি ব্যাপারটা লইয়া অর্থ-মন্ত্রী মিঃ আমজাদ আলীর সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তাঁর উপদেশ মত বিদেশে খবর নিলাম। পাইপ তৈয়ারি হইত পশ্চিম জার্মানি হইতে আমদানি-করা স্টিলের পাত দিয়া। আমি বনে অবস্থিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কর্মাশিয়াল সেক্রেটারি ও ডি. জি. এস.এণ্ড ডি-র অফিসারের মারফত অতি সহজেই উক্ত পাতের জার্মান সরবরাহকারীর-নেওয়া দাম জানিতে পারিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল, উক্ত শিল্পপতি এইরূপ তঞ্চকতা করিয়া এই কয় বছরে

সরকারকে বহু লাখ টাকা ঠকাইয়াছেন। পাবলিকের দেওয়া টাকার হিসাব ধরিলে কয়েক কোটি হইবে। আমি স্বভাবতঃই খুব কড়া আদেশ দিলাম। বিচারাধীনে বিলের টাকা আটক দিলাম। অতীতের দেওয়া টাকা কেন রিফাণ্ড হইবে না, তার কারণ দর্শাইবার অর্ডার দিলাম। লাইসেন্স বাতিল করিলাম। খুবই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী পার্টি। সুতরাং ব্যাপারটা কেবিনেটে গেল। তথায় অর্থ-মন্ত্রী মিঃ আমজাদ আলী আমাকে জোর সমর্থন দিলেন। শিল্পপতি ন্যায্য দামের হিসাবে টাকা নিবেন এই শর্তে শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হারে তাঁর লাইসেন্স বজায় রাখা হইল। সরকারের বহু টাকা বাঁচিয়া গেল। আমি উক্ত নিম্নস্তরের কর্মচারির প্রমোশনের সুপারিশ করিয়াছিলাম; কিন্তু শিল্পপতিটি বোধ হয় জীবনেও আমাকে মাফ করিতে পারেন নাই।

৮. নিউ কামার

বাণিজ্য দফতরে আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলাম। এটি আমদানি ব্যবসায়ে 'নিউ কামারের' সুবিধা দান। পূর্ববর্তী সরকারেরা আমদানি ব্যবসায়টি একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। এঁদেরে বলা হইত 'কেটিগরি-হোল্ডার।' ১৯৫২ সালে যাঁরা আমদানি-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, সরকার তাঁদের একটা তালিকা করিয়াছিলেন। এঁদের নামই কেটিগরি-হোল্ডার। শুধু এঁরাই আমদানি লাইসেন্স পাইতেন। আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া যখন ব্যাপারটা দেখিতে পাইলাম তখন ঘোষণা করিলাম এটা ন্যায়-নীতি গণতন্ত্র এমনকি ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী। কেটিগরি-হোল্ডার নামক শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া কার্যতঃ মুসলিম সমাজে এক বৈশ্য সম্প্রদায় আমদানি করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালে বা তার আশেপাশে পূর্ব-বাংগালীরা আমদানি ব্যবসায়ে কোনও উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করে নাই। ফলে কেটিগরি-হোল্ডারদের মধ্যে কি সংখ্যায় কি পরিমাণে পূর্ব বাংগালীর কোনও স্থান ছিল না বলিতে পারা যায়। এই ধরনের কেটিগরি-হোল্ডার শ্রেণী রাখিলে পূর্ব-বাংলার লোকেরা চিরতরে আমদানি ব্যবসা হইতে বাদ থাকিবে। এই ঘোষণায় কেটিগরি-হোল্ডারদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাঁরা সবাই বিত্তশালী ও প্রভাবশালী লোক। তাঁদের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে সময় লাগিয়াছিল। অনেক সাধ্য-সাধনার পর বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় সমর্থনের ফলে শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবিত 'নিউ কামার' নীতি গৃহীত হইল। ব্যবস্থা হইল, নূতন লোক বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তানী নূতন ব্যবসায়ীকে আমদানি লাইসেন্সের অধিকার দেওয়া হইবে এবং পুরাতন কেটিগরি-হোল্ডারদের কার্য-তৎপরতা, সাধুতা, সততা বিচার করিয়া ঐ তালিকা সময়-সময় সংশোধন করা হইবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে পূর্ব-পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের মধ্যে যেমন উল্লাস সৃষ্টি হইল, পশ্চিম পাকিস্তানী বিশেষতঃ করাচির ব্যবসায়ী মহল আমার প্রতি উষ্মায় তেমনি ফাটিয়া পড়িল।

৯. দেওয়ানী কার্যবিধির প্রবর্তন

লাইসেন্সিং ব্যাপারে আমার আরেকটি সংস্কার একেবারে ছিল অভিনব ধরনের।। এটি ছিল দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ব্যবস্থা প্রবর্তন। দেওয়ানী কার্যবিধিতে মামলার পক্ষগণের প্রতিকারের উপায় তিনটি ঃ রিভিউ, আপিল ও রিভিশন। আমি লাইসেন্সিং ব্যাপারে এই তিনটি স্তরের প্রবর্তন করিলাম। লাইসেন্স ইশুর ব্যাপারে কারও আপত্তি থাকিলে প্রার্থীকে সর্বপ্রথম ইশুইং অফিসারের কাছে রিভিউ পিটিশন দিতে হইবে। তাঁর বিচারে যে পক্ষ আপত্তি করিবেন তিনি বাণিজ্য–সেক্রেটারির কাছে আপিল দায়ের করিবেন। সেক্রেটারির উভয় পক্ষকে যথাযোগ্য শুনানি দিবার পর রায় দিবেন। সেই রায়ে যে পক্ষের আপত্তি থাকিবে, তিনি সর্বশেষ পন্থা হিসাবে মন্ত্রীর কাছে রিভিশন পিটিশন দায়ের করিবেন। এই তিন প্রকারের দরখাস্তে দেওয়ানী মোকদ্দমার মতই নির্ধারিত হারে কোর্ট–ফি দেওয়ার আইন করিলাম।

এই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, প্রধানতঃ মন্ত্রীর সাথে মোলাকাতীর ভিড় কমাইবার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় প্রকৃত অবিচারিত লোকদের উপকার হইয়াছিল। কিভাবে, এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন। মন্ত্রীদের দরবারে স্বভাবতঃই সমর্থক ও উপকার–প্রত্যাশীদের ভিড় হয়। হওয়া স্বাভাবিক। মন্ত্রীরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। নিয়ম–কানুনের সাত দরজা পার হইয়া মন্ত্রীদের সাক্ষাৎ পাওয়া এবং নিজেদের দুঃখের কথা বলার সুযোগ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কাজেই মন্ত্রীরা মফস্বলে সফর করিতে বাহির হইলে অভিনন্দন–সম্বর্ধনার নামে এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ–মোলাকাত করিয়া তাঁরা নিজেদের অভাব–অভিযোগের কথা বলেন। রাজধানীতে আসিয়া তাঁরা অফিসে দেখা–সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করিয়া মন্ত্রীদের বাড়িতে ভিড় করেন। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে এটা আমার জানা ছিল। জন–প্রতিনিধি হিসাবে এ ব্যাপারে আমি খুবই সচেতনও ছিলাম। কাজেই ফাইল–পত্র ডিসপোয করা বিলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষাৎ–প্রার্থীদের সহিত অল্পক্ষণের জন্য হইলেও মোলাকাত দিতাম। এই ধারণা ও পণ লইয়াই আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। প্রথম–প্রথম চালাইলামও ঐভাবে। কিন্তু নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের শিল্প দফতর ও বাণিজ্য দফতর যে কত বড় মহা সমুদ্দুর এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মোলাকাতীর সংখ্যা যে কি পরিমাণ হইতে পারে, মন্ত্রিত্ব জীবনের ছয় মাস যাওয়ার আগে তা সঠিকভাবে অনুভব করিতে পারিলাম না। যখন পারিলাম, তখন আমার অনাহারে মরিবার দশা। সকালে ছয়টার সময় হইতেই দর্শনপ্রার্থীর ভিড়। একাধিক ড্রয়িং রুম, অফিস ঘর, ওয়েটিং রুম ও বারান্দাসমূহ লোকারণ্য। গোসল নাশ্তা সারিয়া সাতটার আগে নিচে নামা সম্ভব হইত না। সাতটা হইতে নয়টা পর্যন্ত বাড়িতে মোলাকাতীদের চার ভাগের একভাগ লোককেও দেখা দিয়া সারিতে পারিতাম না।

এঁদের সকলেই বিনা-এপয়েন্টমেন্টে আসিয়াছেন। সুতরাং প্রাইভেট সেক্রেটারিরাই এঁদের ক্রম নির্ধারণ করিয়া এক জনের পর আরেক জনকে আমার সামনে আনিতেন। এ ব্যাপারে প্রাইভেট সেক্রেটারিদের বিবেচনাকেই চূড়ান্ত বলিয়া না মানিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু দর্শনপ্রার্থী যাঁরা পিছে পড়িতেন এবং তার ফলে বাদ পড়িতেন, তাঁদের অনেকের অভিযোগ ছিল যে প্রাইভেট সেক্রেটারিরা পক্ষপাতিত্ব করিয়া তাঁদের পিছে ফেলিয়াছেন এবং ঐ কৌশলে মন্ত্রীর সাথে তাঁদের মোলাকাত হইতে দেন নাই। এই শ্রেণীর অভিযোগের কোনও সীমা ছিল না। প্রতিকারেরও কোনও উপায় ছিল না।

তারপর ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় নয়টার সময় উঠিয়া পড়িতাম। মোলাকাতীদের এড়াইয়া পিছনের গেট দিয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। এই উদ্দেশ্যে ড্রাইভার গাড়ি লইয়া অফিস ঘরের ঠিক পিছনেই অপেক্ষা করিতে থাকিত।

১০. মন্ত্রীর দুদর্শা

আফিসে কিন্তু মোলাকাতীর ভিড় ঠেলিতে হইত না। মোলাকাতী থাকিতেন ঢের। কিন্তু তাঁদের জন্য ওয়েটিং রুম ছিল। বান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেওয়া হইত না। লম্বা বারান্দার আগা-গোড়াই সেক্রেটারি, জয়েন্ট-সেক্রেটারি ও ডিপুটি সেক্রেটারিদের অফিস-ঘর। কাজেই আমি যখন এক প্রান্তের সিঁড়ি দিয়া দুতালায় উঠিয়া আগাগোড়া বারান্দাটা হাঁটিয়া অপর প্রান্তে আমার অফিসে ঢুকিতাম, তখন সবগুলি অফিস-ঘরের সামনে দিয়া আমার যাওয়া, প্রকারান্তরে পরিদর্শন, হইয়া যাইত। অথচ মোলাকাতীরা আমার পথ আটকাইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। আমি অসুস্থ বলিয়া ডাক্তারদের এবং বিশেষ করিয়া আমার স্ত্রীর তাগিদ ছিল ঠিক একটার সময় বাসায় ফিরিয়া খানা খাইতে হইবে। দুইটার মধ্যে খানা শেষ করিয়া পান খাইয়া ও হুক্কার নল মুখে লইয়া বিছানা লইতে হইবে। দুই ঘন্টা ঘুমাইয়া চারটা সাড়ে চারটায় উঠিতে হইবে। আধ ঘন্টায় হাত-মুখ ধুইয়া বিকালের চা খাইয়া তারপর বাসার আফিস ঘরে বসিতে পারা যাইবে।

কিন্তু কার্যতঃ তা হইতে পারিত না। কারণ অফিসের চার ঘন্টা সময়ের মধ্যে সেক্রেটারি-প্রাইভেট সেক্রেটারিরা পরামর্শ করিয়া মাত্র এক ঘন্টা মোলাকাতের জন্য রাখিতেন। বাকী তিন ঘন্টা মিনিট-সেকেণ্ড হিসাব করিয়া অফিসের কাজ ও বিদেশী ডেলিগেশন ইত্যাদির জন্য মোকররর করিতেন এবং সময় ঠিক রাখিবার কড়াকড়ি চেষ্টা করিতেন। বিদেশী ডেলিগেশন ইত্যাদি ঠিক টাইম মত আসিতেন। আফিসের ফাইল-পত্র দেখা ও অফিসারদের সাথে আলোচনা নির্ধারিত সময়-মতই হইয়া যাইত। কিন্তু মুশকিল হইত মোলাকাতীদেরে লইয়া। প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ত

প্রতিজনের জন্য পাঁচ–ছয় মিনিট করিয়া এক ঘন্টায় দশজন মোলাকাতী রাখিলেন। তাঁদের একাজে অসুবিধা হইত না। কারণ চিঠিপত্র–যোগে এপয়েন্টমেন্ট না করিয়া এখানে কেউ মন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইতেন না। কিন্তু মুশকিল হইত আমার। বোধ হয় সব মন্ত্রীরই। কারণ পাঁচ মিনিটের জন্য প্রবেশাধিকার দেওয়া হইলেও আধঘন্টা অন্ততঃ দশ–পনর মিনিটের কমে কেউ বাহির হইতেন না। আফিসের কাজ শুরু করিবার আগে মোলাকাতী শেষ করার নিয়ম ছিল। কিন্তু আমি এই নিয়ম পাল্টাইয়া দিয়াছিলাম। আফিসের কাজ শেষ করিয়াই মোলাকাত শুরু করিতাম। তদনুসারে মোলাকাতীরা আগের মত সকালে না আসিয়া বিকালে আসিতেন। তাঁদের পাওয়া–পত্রে অবশ্যই মোলাকাতের সময় ঘন্টা–মিনিটসহ লেখা থাকিত। কিন্তু প্রথম মোলাকাতী ছাড়া আর কেউ সেই নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎ পাইতেন না। কারণ প্রথম মোলাকাতীই বেশি সময় নিয়া পরবর্তীদের আনুপাতিক হারে পিছাইয়া দিতেন। যেহেতু আফিসের কাজ আগেই শেষ হইয়া যাইত, সেইজন্য নির্দিষ্ট সব মোলাকাতী শেষ না করিয়া আমি উঠিতাম না। মনে করিতাম, বেচারা আগে হইতে এপয়েন্টমেন্ট করিয়া আসিয়াছেন। তাঁকে মোলাকাত দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। অপরাপর মোলাকাতীরা তাঁদের প্রাপ্য সময়ের বেশি সময় নিয়াছেন বলিয়া কাউকে ত বঞ্চিত করা যায় না। সময় কন্ট্রোল না করার জন্য কাউকে যদি শাস্তি পাইতে হয়, তবে আমাকেই। কাজেই শাস্তি আমিই বহন করিতাম। মোলাকাত শেষ করিতে–করিতে প্রায়ই আমার তিনটা বাজিয়া যাইত। বাড়ি হইতে স্ত্রীর কম–সে–কম দশটা টেলিফোন পাইতাম। প্রথম–প্রথম অনুরোধ, তারপর তাগাদা, তারপর ধমক ও রাগ। আসি–আসি করিয়াও আসিতে পারিতাম না। প্রাইভেট সেক্রেটারিরাও তাগিদ করিতেন। শুকনা হাসি–হাসিয়া বলিতাম ঃ 'আর কতজন আছেন?'

অবশেষে ক্ষুধায় ক্লান্ত পিয়াসে শুকনা–মুখ ও স্ত্রীর রাগে মেযাজ খারাপ করিয়া তিনটার পরে যখন বাসায় ফিরিতাম, তখন দেখিতাম গেট হইতে সিঁড়ি পর্যন্ত মোলাকাতীর ভিড়। দারওয়ান, ড্রাইভার, বডিগার্ড, প্রাইভেট সেক্রেটারি সকলের তাগাদা এ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁরা পথ ছাড়িতেন না। কাজেই গেটেই গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া ঘর পর্যন্ত পৌছিতে আমার খুব কম করিয়া হইলেও আধঘন্টা লাগিত। আমি ক্ষিধায় মারা গেলাম, রোগী মানুষ, ঔষধ খাইতে হইবে ইত্যাদি কত আবেদন–নিবেদন করিতাম হাতজোড় করিয়া। বডিগার্ড ও গেটকিপাররা পুলিসের লোক। তারা বাধ্য হইয়া প্রথম–প্রথম পুলিসী মেযাজ ও কায়দা দেখাইতে চাহিত। আমি ধমক দিয়া বারণ করিতাম। কারণ আমি মোলাকাতীদেরই চাকর। কিন্তু আমার 'মনিব'রা আমার স্বাস্থ্য ও সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতেন না। তাঁদের পক্ষেও যুক্তি

ছিল। বহুদূর হইতে তাঁরা আসিয়াছেন। করাচিতে অত-অত করিয়া আর থাকিতে পারেন না। তুলনায় তাঁদের অসুবিধা কত। আমার ত মাত্র একদিনই খাওয়ার সামান্য বিলম্ব হইবে। এইটুকু অসুবিধা কি আমি তাঁর জন্য মানিয়া নিব না? সকলেরই ঐ এক কথা। সকলেই মনে করেন তাঁর অসুবিধাটাই বড়। সকলেই মনে করেন, তারটা শুনিলেই আমার কর্তব্য শেষ হইবে। সমবেত লোকদের সকলকে পাঁচ মিনিট করিয়া শুনিলেও আমাকে ঐখানেই রাত দশটা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, একথা যেন কারও মনে পড়ে না। প্রত্যেক দিনের এই দর্শনার্থীদের ধারণা শুধু ঐ একটা দিনই আমি তিনটার সময় অভুক্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া বাড়ি ফিরিতেছি। কাজেই একটা দিন না খাইয়া থাকিলেই বা কি? তাঁরা নিজেরা কতদিন অমন সারাদিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রে খানা খাইয়াছেন। আমি মন্ত্রী হইয়াছি বলিয়াই কি তা পারিব না? তাঁদের দিক হইতে ঐ অভিযোগ ঠিক। কারণ তাঁরা সকলে জানিতেন না, জানিলেও বুঝিতেন না, যে ঐ এক দিন নয়, দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই গরিব বেচারা মন্ত্রীর উপর দিয়া অমনি ধরনের মোলাকাতীর ঝড়-তুফান চলিতেছে।

কাজেই দেওয়ানী কার্যবিধি-আইন চালাইয়া নিজেকে বাঁচাইলাম। কয়েকদিন সময় লাগিল। অফিসে ও বাড়ির সাইনবোর্ডে খবরের কাগযে প্রেসনোট এবং ব্যক্তিগত পত্রের জবাবে এই নব-বিধান প্রচারিত হইতে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। আল্লার মর্জিতে তারপর সব পরিষ্কার। বাড়ির বৈঠকখানা ওয়েটিং রুম বারান্দা এবং অফিসের ওয়েটিং রুম একেবারে সাফ। শূন্য ময়দান খা খা করিতেছে। নিজের বুদ্ধির তারিফ করিলাম নিজেই। অফিসাররাও বাহ-বাহ করিতে লাগিলেন। দর্শনাভিলাষীরা গাল দিতে লাগিলেন। সভা-সমিতি ও পথে-ঘাটে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। আমি নীরবে, নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে অফিসের কাজে ও পলিসি নির্ধারণে প্রচুর সময় পাইলাম ও তার সদ্ব্যবহার করিলাম।

১১. শিল্প-বাণিজ্যের যুক্ত চেম্বার

শিল্প-বাণিজ্য দফতরের সংস্কার প্রবর্তন ছাড়াও আমি স্বয়ং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টাও করিয়াছিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি চেম্বার-অব-কমার্স ও চেম্বার-অব-ইণ্ডাস্ট্রিসকে একত্রে করিয়া চেম্বার-অব-কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ করিবার পরামর্শ দেই। উভয় চেম্বারের নেতাদের সভা ডাকিয়া বক্তৃতা করি। মন্ত্রী হিসাবে যেখানেই এঁরা আমাকে অভ্যর্থনা-অভিনন্দন দিয়াছেন সেখানেই আমি এই উপদেশ বর্ষণ করিয়াছি। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা,

প্রতিযোগিতা হইতে রেষারেষি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শত্রুতার ভাব, বিদ্যমান ছিল। কাজেই তাঁরা আমার উপদেশ মানেন নাই। বরঞ্চ তাঁদের স্বার্থ-বিরোধী কথা বলিতেছি মনে করিয়া অনেকেই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার কার্য-কলাপে শিল্পপতি ও সওদাগরদের অনেকেই আমাকে তাঁদের দুশমন মনে করিতেন। কাজেই আমার দ্বারা তাঁদের স্বার্থের অনুকূল কোনও সদুপদেশ সম্ভব, এটা তাঁরা বিশ্বাস করিতেন না। আমি কিন্তু সত্য-সত্যই তাঁদের ঐক্যে বিশ্বাস করিতাম। আমি মনে করিতাম তাঁদের ঐক্যে সরকার ও তাঁরা নিজেরা উভয় পক্ষই লাভবান হইবেন। দেখিয়া শুনিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল যে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে যতদিন সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা না হইতেছে, ততদিন সংঘবদ্ধ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের যুক্ত উপদেশ পাওয়া সরকারের সুষ্ঠু নীতির জন্য অপরিহার্য। ব্যক্তিগতভাবে কোনও শিল্পপতির বা ব্যবসায়ীর কিছু না করার একমাত্র রক্ষাকবচ এঁদের চেম্বার। ওঁদের যা বলার চেম্বার হইতে বলা হউক, এই কথা বলিতে পারিলেই আপনি ব্যক্তি সন্তুষ্টির চাপ হইতে রক্ষা পান। ঠিক তেমনি পৃথক-পৃথকভাবে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্টির চাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র প্রতিষেধক তাঁদের যুক্ত প্রতিষ্ঠান। আমি অল্পদিনের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম বাণিজ্যনীতি নির্ধারণ ও ঘোষণার সময় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা শুধু যার-তার সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তদবির ও চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তাঁদের অনুরোধ বা সুপারিশ শুধু পরস্পরের বিরোধী হয় না, সরকার ও দেশের স্বার্থ-বিরোধীও হইয়া থাকে। সেজন্য আমি তাদের মধ্যে বক্তৃতা করিয়া সরলভাবে আমার মনের কথা যেমন বলিলাম, তেমনি তাঁদের শক্তিবৃদ্ধির নিশ্চিত সম্ভাবনাও দেখাইলাম। আমি বলিলাম ঃ শিল্প ও বাণিজ্য-নীতি নির্ধারণে সরকার কোনও ভুল না করেন, সেজন্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী উভয় সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত ও সংঘবদ্ধ উপদেশ পাওয়া দরকার। সরকার ভুল করিলে দেশবাসীর সাথে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সেজন্য সরকারকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার ও দায়িত্ব তাঁদের। আর সংঘবদ্ধভাবে উপদেশ দিলে সরকার সে উপদেশ মানিতে বাধ্য হইবেন।

আগেই বলিয়াছি, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আমার অমন ভাল উপদেশটাও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তাঁরা আমার কথা রাখেন নাই। সুখের বিষয় মার্শাল ল'র আমলে সরকার একরূপ জোর করিয়াই যুক্ত চেম্বার-অব-কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ করাইয়াছেন। এতদিনে নিশ্চয় তাঁরা বুঝিয়াছেন এতে তাঁদের ভালই হইয়াছে!

১২. চাকুরিতে পূর্ব-পাকিস্তানী

মন্ত্রী হিসাবে আমার অপর উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চাকুরিতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের দাবি যথাসম্ভব পূরণের চেষ্টা করা। চাকুরি-বাকুরিতে প্যারিটির পক্ষে আমি যত বক্তৃতা করিয়াছি, তেমন আর কেউ করেন নাই। কিন্তু কিছুদিন মধ্যেই আমি বুঝিয়াছিলাম স্বাভাবিক অবস্থায় প্যারিটি দাবি করা অবাস্তব, আশা করা পাগলামি। একথা আমাকে সমঝাইয়াছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চ পদাধিকারী একজন রাষ্ট্র নেতা। তিনি আমাকে অত্যন্ত সরলভাবে বলিয়াছিলেন ঃ 'মনে রাখিও মুসলমানেরা ভারতে সরকারী চাকুরিতে অংশ দাবি করায় হিন্দুরা তাদের ভারত মাতাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে রাযী হইয়াছে তবু চাকুরিতে অংশ বসাইতে দেয় নাই।' অতঃপর প্যারিটি লাভের আশা মনে মনে ত্যাগ করিলেও মুখে-মুখে প্যারিটির কথা পুনঃ-পুনঃ উচ্চারণ করিতাম। তাই আমার অধীনস্থ দুইটা দফতরে কোনও ভ্যাকেন্সি হইলেই পূর্ব পাকিস্তানী নিবার প্রস্তাব দিতাম। আমার অভিপ্রায় ব্যাহত করিবার জন্য অফিসারেরা কত যে প্রথা-রীতি আইন-কানুন রুল ও রেগুলেশন দেখাইতেন তাতে আমার মত অনভিজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধির লোক ভেবাচেকা খাইতে বাধ্য হইত। রাগ করা ছাড়া কোন উপায় থাকিত না। আমার রাগকে বিষহীন ধোঁড়া সাপের ফনা মনে করিয়া অফিসাররা বোধ হয় আস্তিনের নিচে হাসিতেন। অনেক ঘটনার মধ্যে একটির কথা বলিতেছি।

আমার কথা-মত একজন 'পূর্ব-পাকিস্তানীকে' তাঁরা একবার চাকুরি দিলেন। আমার সন্দেহ হওয়ায় কাগযপত্র তলব করিয়া দেখিলাম ঃ একজন লোক মাত্র দুই বছর আগে মাদ্রাজ হইতে পাকিস্তানে আসিয়াছেন। তাঁর কোনও আত্নীয় কোয়েটার চাকরি করেন। সেখানেই তিনি দুই বছর যাবত আছেন। পূর্ব পাকিস্তানীর কোটায় এই চাকুরিটি খালি হওয়ার পর ঐ যুবক পূর্ব-পাকিস্তানী হিসাবে দরখাস্ত করিয়াছেন। দফতর হইতে তাঁর নাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিবেচনার জন্য পাঠান হইয়াছে। কমিশন যথারীতি কর্তব্য করার পর তাঁর নিয়োগ সুপারিশ করিয়াছেন। তিনি চাকরিতে বহাল হইয়াছেন। কোয়েটাবাসী মাদ্রাজী যুবক পূর্ব-পাকিস্তানী হইলেন কিরূপে? অতি সহজে। ঢাকা জিলা কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে উক্ত যুবক এক বৎসরের অধিককাল পূর্ব-পাকিস্তানের ডমিসাইল। আমার তালু-জিহ্বা লাগিয়া গেল। আমি এ বিষয় লইয়া তোলপাড় শুরু করিলাম। কমিশন ঠিকই জানাইলেন সরকারী ডমিসিল সার্টিফিকেট পাইবার পর ও বিষয়ে আর তাঁদের করণীয় কিছু ছিল না। আমাকে শান্ত করিবার জন্য বিভিন্ন দিক হইতে এবং অফিস ফাইলে এমনও 'নোট' আসিল যে একজন পাকিস্তানীর চাকুরি যেভাবেই হউক যখন হইয়া গিয়াছে, তখন এটা নিয়া

এখন হৈ চৈ করা ঠিক হইবে না। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে ত যে ভারত হইতে আগত মোহাজেরদেরও আমাদের চাকুরি-বাকুরিতে একটা দাবি আছে। সব নোটের শেষে আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম : 'কিন্তু একথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে পাকিস্তানের দুইটি মাত্র উইং। ভারতে ইহার কোনও তৃতীয় উইং নাই।'

আরেকটি ঘটনা আরও মর্যাদার। বিভিন্ন দফতরের অফিসারদেরে বিদেশে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ৯ জন অফিসার পাঠাইতে হইবে। আমার কাছে অভিযোগ আসিল সিলেকশনে একজন পূর্ব-পাকিস্তানীও নেওয়া হয় নাই। আমি তখন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী। কাজেই সংশ্লিষ্ট দফতরের সেক্রেটারিকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি একা আসিলেন না। সঙ্গে আনিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারিকে। আমি তাঁদের কাছে আমার উদ্দেশ্য বলিলাম। তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানী একাধজন পাঠান নিতান্ত উচিত ছিল স্বীকার করিয়াও পরিতাপের সাথে বলিলেন : বড় দেরি হইয়া গিয়াছে সার। নামগুলি বিদেশে পাঠান হইয়া গিয়াছে। তাঁরা সেজন্য বড়ই দুঃখিত। আয়েন্দাতে তাঁরা এর ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। আমি তাঁদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইলাম না। বলিলামঃ 'ওটা ফিরান যায় না?' তাঁরা বলিলেন : 'অসম্ভব। কারণ ওটা এতদিনে গন্তব্য স্থানে যদি পৌঁছিয়া নাও থাকে তবে পথিমধ্যে আছে। পাকিস্তানের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে নিশ্চয়।' ততক্ষণে আমার যিদ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ভিতরের গরম গোপন করিয়া শান্তভাবে বলিলাম : 'এক্ষুণি এই মর্মে উক্ত সরকারের কাছে ক্যাবল করিয়া দেন যে ঐ নামগুলি বাতিল করা হইল, নূতন নামের তালিকা অনতিবিলম্বেই পাঠান হইতেছে।'

একটু দম ধরিয়া বলিলাম :'আর হাঁ, এক্ষুণি টেলিফোনে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসকে বলিয়া দেন যে ঐ মর্মে আমরা তাঁদের সরকারকে ক্যাবল করিয়াছি। তাঁরাও তাঁদের সূত্রে তাঁদের সরকারকে পাকিস্তান সরকারের মত জানাইয়া দেন।'

দুইজন অফিসারই পুরান অভিজ্ঞ আই. সি. এস.। দোর্দণ্ড-প্রতাপ বলিয়া সারা সেক্রেটারিয়েটে সুনাম আছে। অতিশয় দক্ষ অফিসার তাঁরা। কিন্তু আমার এই সব কথার পিঠে কোনও কথাও বলিলেন না। আমার হুকুম তামিলের কোনও লক্ষণও দেখাইলেন না।'

আমি আমার টেবিলের একাধিক টেলিফোন গুলি দেখাইয়া বলিলাম : 'কই বিলম্ব করিতেছেন কেন? টেলিফোন করুন।'

দুইজনই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে থাকিলেন। একটুও নড়িলেন না। আমি তাগিদের সুরে বলিলাম : 'একজন সংশ্লিষ্ট এমবেসিতে টেলিফোন করুন।

আরেকজন টেলিগ্রামের মুসাবিদা করুন এখানেই। ঐ যে সামনেই প্যাড আছে। কাগয-কলম হাতে নিন।'

অতবড় ঝানু দোর্দণ্ড-প্রতাপ দুইটি আ. সি. এস. (সি. এস. পি. নয়) অফিসার অমনোযোগী অপরাধী ছাত্রের মত বসিয়া রহিলেন। আর আমি পাঠশালার কড়া গুরুর মত আদেশ দিতে লাগিলাম। আমার ভাষায় তিরস্কারের উষ্মা নাই। কিন্তু অনমনীয়তার দৃঢ়তা আছে। তাঁদের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তায় রাগ করিলাম না। মৃদু হাসিলাম। বলিলামঃ 'আপনারা দেরি করিতেছেন কেন ? কিছু ভাবিতেছেন কি ? কিছু বলিতে চান ?'

ছোটটির দিকে এক নজর চোখ বুলাইয়া বড়টি বলিলেন ঃ 'বেআদবি মাফ করিবেন সার, একটা কথা আরয করিতে চাই।'

আমি যেন কত জ্ঞানী অভিজ্ঞ মুরব্বি! যেন ভীতি-গ্রস্ত নাবালকদের মনে সাহস-ভরসা দিতেছি এমনিভাবে হাসি মুখে বলিলাম ঃ বলুন বলুন। তাঁরা উভয়ে পালা করিয়া এঁ-ওঁরে সমর্থন করিয়া যা বলিলেন, তার মর্ম এই যে বিদেশী সরকারকে টেলিগ্রাম ও এমবেসিতে টেলিফোন করিবার আগে তাঁরা নিশ্চিত হইতে চান, ঐসব কাগয-পত্র সত্য-সত্যই চলিয়া গিয়াছে কিনা। কারণ যদিও বেশ কিছুদিন আগে সহি-সাবুদ হইয়া তালিকাটা ও সংগীয় আবশ্যকীয় কাগয-পত্র তাঁদের দফতর হইতে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সত্য-সত্যই করাচির বাইরে চলিয়া গিয়াছে কি না তাঁরা তা বলিতে পারেন না। কত যে ফর্মালিটির দেউড়ি পার হইয়া চিঠি-পত্র বাইরে যায় তা আমি আন্দায করিতে পারিব না।

আমি মুচকি হাসিলাম। সে হাসির অর্থ তাঁরা বুঝিলেন। তাঁদের চালাকি ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু কি সাংঘাতিক ঝানু-বুরোক্র্যাট! একটু শরমিন্দা হইলেন না। হইলেও বাহিরে সে ভাব দেখাইলেন না। আমি বলিলাম ঃ 'যাক, এখন আপনাদের তালিকা বদলাইয়া নয় জনের পাঁচ জন পূর্ব-পাকিস্তানী ও চারজন পশ্চিম পাকিস্তানীর একটা নূতন তালিকা করুন। এতদিন পূর্ব-পাকিস্তানীরা বাদ গিয়াছে বলিয়া তাদেরে একটু ওয়েটেজ দেওয়া দরকার। কি বলেন ?'

উভয়ে সমস্বরে বলিলেনঃ 'তা বটেই সার। তা ত বটেই।' কথায় জোর দিবার জন্য খুব জোরে মাথা ঝুকাইলেন এবং বলিলেন ঃ 'পূর্ব-পাকিস্তানী কারে-কারে দিব, নাম বলিয়া দিলে ভাল হয় সার।'

টেবিলের উপর হইতে চট করিয়া একশিট কাগয নিয়া একজন কলম উঠাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি আবার একটা মুচকি হাসি–হাসিয়া বলিলাম ঃ 'আমি নূতন মন্ত্রী হইয়াছি। অফিসারদের সঙ্গে এখনও যথেষ্ট পরিচয় হয় নাই। অফিসারদের কার কি গুণ, কে পূরবী আর কে পশ্চিমা আমি বিশেষ খবর রাখি না। আর অফিসার বাছাই করিতে আপনারাই বা মন্ত্রীর মতামত জিগ্‌গাসা করেন কেন? আপনারা অভিজ্ঞ সিনিয়র অফিসার। অধীনস্থ অফিসারদেরও ভালরূপ জানেন। কার কি ট্রেনিং দরকার তাও আপনারাই ভাল বুঝেন। কাজেই তালিকাটা আপনারাই করিবেন। শুধু দেখিবেন, পূর্ব–পশ্চিমের আমার নির্দেশিত রেশিও যেন ঠিক থাকে।'

সেক্রেটারিদ্বয় পরস্পরের মুখ চাওয়া–চাওয়ি করিতে লাগিলেন। স্পষ্ট নৈরাশ্যের এবং বিস্ময়ের ভাব। একটা অফিসার–তালিকা বদলাইবার জন্য মন্ত্রী সাহেব এমন আকাশ–পাতাল তোলপাড় করিলেন, অথচ তাঁর নিজের একটা লোকও নাই? এটা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু এঁদেরে দোষ দিয়া লাভ নাই। এতেই এঁরা অভ্যস্ত। আমার বেলায়ও গোড়া হইতেই এই সন্দেহই তাঁরা করিয়াছিলেন।

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম ঃ আর কিছু বলিবার আছে?

উভয়ে সমস্বরে বলিলেন ঃ না সার।

আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বিশাল টেবিল পাথালি হাত বাড়াইয়া দিলাম। তার অর্থ ঃ এইবার আপনারা বিদায় হন।

উভয়ে ঝটপট করিয়া উঠিয়া মাথা অতিরিক্ত নোওয়াইয়া মুসাফেহা করিয়া বিদায় হইলেন।

আফিস হইতে ফিরিয়া দুপুরের খানা খাইতে বাজিত আমার তিনটা। খাওয়ার পর বিছানায় লম্বা গইড় দিয়া হুক্কা টানিতে–টানিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। উঠিতাম একেবারে পাঁচটায়। বিকালে অফিস করিতাম বাসাতেই।

সেদিন পাঁচটায় উঠিয়া চা খাইবার সময় প্রাইভেট সেক্রেটারি খবর দিলেন ঃ সেই সেক্রেটারিদ্বয় দেড় ঘন্টার বেশি নিচের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করিতেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁদেরে উপরে ডাকিয়া আনিলাম। একেবারে বিনয়–নম্রতার অবতার ! ফাইল–পত্র সব নিয়াই আসিয়াছেন। কত হাঙ্গামা করিয়া গোটা সেক্রেটারিয়েট তচ্‌নচ্‌ করিয়া ডিচ্‌প্যাচ্‌ দফতর পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া কথিত ফাইলটি উদ্ধার করিয়াছেন। একজন বলেন, অপরজন সমর্থন করেন। আমি চোখ কপালে তুলিয়া মুচকি হাসিলাম। অমানুষিক পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। তাঁরা বুঝিলেন ওঁদের একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিলাম না। কিন্তু তাঁরা বিন্দুমাত্র লজ্জা পাইলেন না। বলিলেন ঃ'সার, আপনার

আদেশ মতই তালিকা করিয়াছি। শুধু আপনার অনুমোদন-সাপেক্ষে একটা রদ-বদল করিয়াছি। উভয় প্রদেশে চারজন-চারজন করিয়া দিয়া করাচিকে একজন দিয়াছি। তবে যদি সারের আপত্তি থাকে তবে ওটা কাটিয়া আরেকজন পূর্ব-পাকিস্তানী দিতে পারি। সে নামও আমাদের কাছে আছে। এখন সারের যা হুকুম।'

বলিয়া ফাইলটা আমাকে দেখাইবার জন্য একজন উঠিয়া আমার দিকে আগ বাড়িলেন। আমি হাতের ইশারায় তাঁকে বিরত করিয়া বলিলামঃ 'যে-যে মিনিস্ট্রির অফিসার তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, তাঁদের সুপারিশ মতই করিয়াছেন ত?'

উভয়ে বলিলেনঃ নিশ্চয় সার, নিশ্চয়।

আমি এবার সরল হাসি মুখেই বলিলামঃ 'এবারের জন্য আপনাদের সুপারিশ মানিয়া নিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগে ভাল ওয়েটেজ দিবেন ত?'

এটা তাঁরা আশা করেন নাই। তাঁদের চোখ-মুখে স্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। বলিলেনঃ 'তা আর বলিতে সার? বাস্তবিকই পূর্ব-পাকিস্তানীরা এতকাল বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে। সত্য বলিতে কি সার পূর্ব-পাকিস্তানীদের জন্য এমন করিয়া আর কোন মন্ত্রী—'

শেষ করিতে দিলাম না। উঠিয়া মোসাফেহার জন্য হাত বাড়াইলাম। মুসাফেহা করিয়া সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত তাঁদেরে আগাইয়া দিলাম।

পরদিন সেক্রেটারিয়েটে ছড়াইয়া পড়িল, এমন কড়া বদ-মেযাজী মন্ত্রী আর আসে নাই। বাংগালী অফিসাররা খুশী হইলেন। পশ্চিমারা গম্ভীর হইলেন। কলিগরা পুছ করিলেন ঃ 'কি ঘটিয়াছিল বলুন ত!'

ছাব্বিশা অধ্যায়
ওযারতির ঠেলা

১. আই. সি. এ. এইড

ওদিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলির সহায়তায় ও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অবিরাম অধ্যবসায়ের ফলে যথাসময়ে ৫ কোটি টাকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি এইড মার্কিন সাহায্যের সুসংবাদ আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। আমার আনন্দ দেখে কে? পূর্ব-পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার আমার এতদিনের স্বপ্ন সফল হইতে যাইতেছে। পূর্ব-পাকিস্তানী মন্ত্রীরা সবাই উল্লসিত হইলেন। পশ্চিম-পাকিস্তানী মন্ত্রীদের অনেকেই আমাকে কংগ্রেচুলেট করিলেন। অর্থ-উজির বন্ধুবর আমজাদ আলী তার মধ্যে একজন। প্রাপ্ত ৫ কোটি বিদেশী মুদ্রা দিয়া কি কি শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, সে সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান ও শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মুজিবুর রহমানের সহিত আলাপ করিয়া দফতরে-দফতরে যোগাযোগ করিতেছি এমন সময় প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন : 'এই টাকা হইতে কিছু টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে দিতে হইবে।' আমি ঘোর প্রতিবাদ করিলাম। বলিলামঃ 'এই টাকা পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য আনা হইয়াছে; এর এক কানাকড়িও পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য চান না বলিয়া অর্থমন্ত্রী ও অন্যান্য পশ্চিমা মন্ত্রীরা আমাকে কথা দিয়াছেন ; এই টাকা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইবে।' ইত্যাদি অনেক যুক্তি দিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মাথা নাড়তে থাকিলেন। বলিলেন : 'দেখ, এটা অবিচার হইবে। আমি শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নই, উভয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আগের-আগের প্রধানমন্ত্রীরা পূর্ব-পাকিস্তানের উপর অবিচার করিয়াছে বলিয়া আমি পশ্চিম-পাকিস্তানের উপর অবিচার করিব না। আর তুমি যে নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠার যুক্তি দিতেছ সে যুক্তিও আমি খণ্ডন করিতেছি না। পশ্চিম পাকিস্তানের নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমি টাকা চাই না। চল্তি শিল্পের র‍্যাশন্যালিযেশনের জন্য তুমি টাকা দিতে পার।'

বলিয়া শিল্প-দফতরের বিঘোষিত গেযেট নোটিফিকেশনটি বাহির করিয়া রেড-ব্লু পেন্সিলে-দাগ-দেওয়া একটা অংশ আমাকে দেখাইলেন। আমি বুঝিলাম প্রধানমন্ত্রী কাগযপত্র দেখিয়া প্রস্তুত হইয়াই আমাকে ডাকিয়াছিলেন। সত্যই আমারই বিঘোষিত শিল্প-নীতি ঘোষণায় বলা হইয়াছে : পশ্চিম-পাকিস্তানে নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে না বটে, তবে চল্তি শিল্প র‍্যাশন্যালাইয করিবার উদ্দেশ্যে টাকা ব্যয় করা চলিবে।

আমি হার মানিলাম। প্রধানমন্ত্রী মুচকি হাসিয়া বলিলেন ঃ 'বেশি না, এই তহবিল হইতে মাত্র এক কোটি টাকা পশ্চিম-পাকিস্তানকে দিয়া পশ্চিমা-ভাইদেরে দেখাইয়া দাও, আমরা তাঁদের চেয়ে বেশী বিচারী লোক।'

তাই হইল। ঘোষণা করা হইল, পূর্ব-পাকিস্তানের নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠার বাবদ চার কোটি ও পশ্চিম-পাকিস্তানের চলতি শিল্প র‍্যাশন্যালাইয করার জন্য এক কোটি ব্যয় হইবে। উভয় প্রাদেশিক সরকারকে এই মর্মে অবগত করান হইল এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত করিতে তাগিদ দেওয়া হইল। যথাসময়ে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে নয়া শিল্পের তালিকা লইয়া শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মুজিবুর রহমান সাহেব তাঁর অফিসারদের সহ করাচিতে আসিলেন এবং তথায় প্রস্তাবিত শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় দফতরসমূহকে অবহিত করাইলেন।

কিন্তু এই সময়ে আমরা জানিতে পারিলাম, ঐ সাহায্যের টাকা দ্বারা টেক্সটাইল মিল অর্থাৎ পাট ও কাপড়ের কল করা চলিবে না। অন্য যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হইবে তাও মার্কিন সরকারের পক্ষ হইতে আই. সি. এ. নামক মার্কিনী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত হইতে হইবে। অতএব উক্ত চারকোটি বিদেশী মুদ্রার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার পাট-কল ও কাপড়ের কল বাদে অন্যসব শিল্পের সংশোধিত স্কিম যথাসম্ভব শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লইবেন এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইল। পূর্ব-পাক সরকার তদনুসারে নতুন করিয়া অনেকগুলি প্রজেক্ট তৈয়ার করিলেন।

অল্পদিনের পরেই আই. সি. এস.এ. প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে চার-পাঁচ জন 'প্রজেক্ট লিডার' আসিলেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তৈয়ারী প্রজেক্টসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখাই তাঁদের উদ্দেশ্য। ভাল কথা। আমাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিবেন, টাকাগুলি সত্যসত্যই আমাদের শিল্পায়নের কাজে লাগিতেছে কি না দেখিবেন না? আমাদের সরকার যে সব প্রজেক্ট বানাইয়াছেন, তার প্রত্যেকটির কার্যকারিতা তয্দিক করিয়া দেখিলে আমরা ত নিশ্চিত হই। কারণ আমাদের এক্সপার্টদের চেয়ে মার্কিন মুল্লুকের মত শিল্পোন্নত দেশের এক্সপার্টরা নিশ্চই অধিকতর জ্ঞানী ও নির্ভরযোগ্য। প্রজেক্ট লিডাররা পূর্ব-পাকিস্তানে আসিলেন। বেশ কিছুদিন থাকিলেন। সব-কিছু বিচার-বিবেচনা করিয়া পূর্ব-পাকিস্তান হইতে তাঁরা বিদায় হইলেন। আমরা জানিলাম, পূর্ব-পাক সরকারের প্রস্তুত প্রজেক্টগুলি তাঁরা পুংখানুপুংখরূপে তয্দিক করিয়া তার মধ্যে ৫৮টি শিল্প অনুমোদন করিয়াছেন এবং প্রস্তাবিত শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যোগ্যতাও তাঁরা পরীক্ষা করিয়া ঝাড়াই-বাছাই করিয়াছেন।

শিল্পায়নের প্ল্যান, বিদেশী মুদ্রা ও লাইসেন্সিং প্রাদেশিক সরকারের হাতে এইভাবে তুলিয়া দিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। কাজেই ব্যাপারটা আমি ভুলিয়াই গেলাম। অন্য ব্যাপারে মন দিলাম। দিতে বাধ্যও হইলাম।

২. আওয়ামী লীগের অন্তর্বিরোধ

কারণ পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্তর্বিরোধ জমাট বাঁধিয়া উঠিল। প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীর সাথে বাহ্যতঃ ও প্রধানতঃ বৈদেশিক নীতি লইয়া ভিতরে-ভিতরে বিরোধ ছিলই। কাগমারি আওয়ামী লীগ সম্মেলনে এই বিরোধ উপরে ভাসিয়া উঠে। আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার প্রতিও মওলানা সাহেব বিরূপ হইয়া উঠেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলেন যে আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা ২১ দফার খেলাফ কাজ করিতেছেন। কথাটা সত্য ছিল না। কারণ আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা সাধ্যমত ২১ দফার কার্যক্রম কার্যে পরিণত করিয়া চলিতেছিলেন। শাসন-সৌকর্যের ব্যাপারে ও অফিসারদের ট্রেন্সফারাদি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী স্বভাবতঃই এবং ন্যায়তঃই সকল আওয়ামী লীগ কর্মীদের খুশী করিতে পারিতেন না। তাঁরাই মওলানা সাহেবের কানভারি করিতেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। মওলানা সাহেব স্বভাবতঃই সরকার-বিরোধী মনোভাবের লোক বলিয়া মাত্রা-ছাড়া ভাবে তিনি নিজের দলের সরকারের নিন্দা করিতেন। তাতে আতাউর রহমান সাহেব ত অসন্তুষ্ট হইতেনই শহীদ সাহেবও হইতেন। একদিকে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অপর দিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি নেতৃদ্বয়ের মধ্যে এই বিরূপ মনোভাব আমার কাছে অশুভ ও বিপজ্জনক মনে হইত। আমি জোড়াতালি যুক্তি দিয়া এই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিতাম। মওলানা সাহেবকে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের এবং জনপ্রিয় নেতৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অনুরোধ করিতাম। অপরপক্ষে দুই প্রধানমন্ত্রীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম যে সরকারের সমালোচনা করিয়া মওলানা সাহেব নিজেকে তথা প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় রাখিয়া ভালই করিতেছেন। বরঞ্চ তলে-তলে সহযোগিতার ভাব রাখিয়া বাইরে-বাইরে প্রতিষ্ঠানের প্রধান যদি সরকারী কার্য-কলাপের সমালোচনা করেন, তবে তাতে পরিণামে লাভ আমাদেরই। কারণ আমাদের সরকার কোয়েলিশন মন্ত্রি-সভা। আমাদের ইচ্ছা ও জনগণের দাবি মত সব কাজ সত্যই ত আমরা করিতে পারিতেছি না। এই ব্যাপারে আমি ভারতের কংগ্রেসের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিঃ সঞ্জীব রেড্ডি ও প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরুর মধ্যে গোপন সহযোগিতা ও প্রকাশ্য সমালোচনার দৃষ্টান্ত দিতাম।

পক্ষান্তরে এই বিরোধে ইন্ধন যোগাইবার লোকেরও অভাব ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানে এই বিরোধে বাতাস করিয়া এক শ একজন এক শ এক উপলক্ষে উহা বাড়াইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কেন্দ্রে যিনি এটা করিতেন, তিনি একাই এক শ। ইনি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যা। এটা আমি বুঝিলাম যেদিন প্রধানমন্ত্রী আমাকে গোপনে বলিলেনঃ প্রেসিডেন্ট মির্যা মওলানা ভাসানীকে অবিলম্বে গেরেফতার করিবার জন্য তাঁর উপর খুবই চাপ দিতেছেন। আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমরা মন্ত্রিত্ব করিব, আর আমাদের সভাপতিকে গেরেফতার করিব আমরাই? লিডার আমার ভাব দেখিয়া বলিলেনঃ 'বিস্ময়ের কিছু নাই। সিক্রেট ফাইল দেখিলে তুমিও প্রেসিডেন্টের সাথে একমত হইবে।' অনেক কথা কাটা-কাটি হইল। অবশেষে তিনি আমাকে একটা বিশাল ফাইল গছাইলেন। বলিলেন ঃ 'পড়িয়া দেখ।'

পড়িয়া দেখিলাম। খুব মনোযোগ দিয়া। কয়েকদিন লাগিল। সিক্রেট ফাইল ত। নিজ হাতে আয়রন সেফে রাখিতাম। রাত্রে-রাত্রে পড়িতাম। অন্য কেউ দেখিয়া না ফেলে। প্রধানমন্ত্রী টুওরে বাহিরে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়াই জিগ্‌গাসা করিবেন। পড়িলামও উকিল যেমন করিয়া নথি-পত্র পড়ে প্রতি লাইনে-লাইনে। সবগুলি ফটোস্টেট কপি। হুবহু অরিজিনাল। পাকিস্তানস্থ ভারতীয় দূতাবাস হইতে যে সব চিঠি-পত্র দিল্লিতে ভারত সরকারের বৈদেশিক দফতরে লেখা হইয়াছে, তাতে মওলানা ভাসানীর নাম আছে। লেখকের সাথে ভাসানী সাহেবের কোনও এক লোকের মারফত কোনও একটি কথা হইয়াছে। এই বিশাল ফাইলের তিন-চারটি পত্রে তিন-চার বারের বেশি মওলানা সাহেবের নাম নাই। তবু ঐ বিরাট ফাইলকেই মওলানার বিরুদ্ধে সিক্রেট ফাইল কেন বলা হইল, আমি তা বুঝিতে পরিলাম না। এই না বুঝার দরুন আরও বেশি করিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম নিশ্চয়ই কিছু আছে, আমিই বোধ হয় বুঝিতে পারি নাই।

লিডার আসিয়াই জিগ্‌গাস করিলেন ঃ 'পড়িয়াছ ত?' আমি 'জি হাঁ' বলিতেই আগ্রহভরে বলিলেন ঃ 'কি পাইলে ?' বলিলামঃ 'কেন মওলানাকে গেরেফতার করিতে হইবে, তার কোনও কারণ পাইলাম না।' প্রধানমন্ত্রী আশ্চর্য হইলেন। বল কি ? তবে কি ঐ বিশাল ফাইলটায় কিছু নাই? যা যা আছে, খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সব বলিলাম। তাঁর পর মন্তব্য করিলাম ঃ 'আমারে দিবার আগে আপনে নিজে কি তবে ওটা পড়েন নাই? আপনি পাইলেন, আমি পাইলাম না। তবে কি সার আমারে ভুল ফাইল দিয়া গেলেন?' প্রধানমন্ত্রী হাসিলেন। ভুল ফাইল দেওয়া হয় নাই। তবে যে প্রেসিডেন্ট বলিলেন, ওটা পড়িলেই সাংঘাতিক সব কথা পাওয়া যাইবে। মওলানাকে আর এক

মুহূর্ত জেলের বাইরে রাখা যয় না। প্রধানমন্ত্রী ও আমি একমত হইলামঃ ওতে কিছু নাই। শুধু ফাইলের সাইয দিয়াই আমাদেরে কাবু করিবার উদ্দেশ্য ছিল।

৩. সেকান্দরী ফন্দি

লিডার যাই বুঝিয়া থাকুন আমি বুঝিয়াছিলাম, মওলানা ও শহীদ সাহেবের মধ্যে বিরোধ বাধাইবার এটা একটা সেকান্দরী কৌশল। আওয়ামী লীগে ভাংগন আনাই তাঁর উদ্দেশ্য। মির্যা শহীদ সাহেবকে দিয়া মওলানাকে আক্রমণ করাইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি মওলানাকে দিয়া শহীদ সাহেবকে আক্রমণ করাইবার আয়োজন করিলেন। কোথা দিয়া কি হইল বোঝা গেল না। হঠাৎ মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। মওলানা সাহেবের ঘনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত দুই জন আওয়ামী -নেতা একজন পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পপতি সহ ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করিয়া গিয়াছেন। এইটুকুমাত্র শুনিয়াছিলাম। তার সাথে মওলানার পদত্যাগে কোনও সম্পর্ক থাকে কেমন করিয়া? মওলানার পদত্যাগ যে আওয়ামী লীগের জন্য একটা ক্রাইসিস, আগামী নির্বাচনে যে এর ফল আমাদের জন্য বিষময় হইবে, একা আমি যেমন বুঝিলাম প্রধানমন্ত্রীকেও তেমনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। প্রধানমন্ত্রী যেমন বুঝিলেন, মওলানা সাহেবও তেমনি বুঝিলেন অবশ্য বিভিন্ন অর্থে। অন্ততঃ তাঁকে তেমনি বুঝান হইল। তাই তিনি আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের প্রাক্কালে পদত্যাগ করিলেন। মওলানা সাহেব নিশ্চয়ই আশা করিয়াছিলেন, কাউন্সিল মিটিং -এ তিনি জিতিবেন। কারণ এই সময়ে ছাত্র-তরুণদের বিপুল মেজরিটি মার্কিন-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আওয়ামী লীগের কাউন্সিলারদেরও অনেকেই সেই মত পোষণ করেন। কাগমারি সম্মিলনীতে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মতের মধ্যে আমরা যে আপোস ফর্মূলা বাহির করিয়া দিয়াছিলাম, সেটার আর দরকার নাই, মওলানার মনে নিশ্চয় এই ধারণা হইয়াছিল। যে কোনও কারণেই হোক মওলানা সাহেব মনে-মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই ফেলিয়াছিলেন যে, হয় তিনি সুহরাওয়ার্দী-হীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব করিবেন, নয় ত তিনি আলাদা পার্টি করিবেন। এটা আমি বুঝিতে পারি হাসপাতালে তাঁর সাথে আলাপ করিয়া। প্রথমতঃ তিনি পদত্যাগের ঘোষণাটি করিয়াছিলেন অস্বাভাবিক নযিরবিহীন গোপনীয়তার সাথে। সহ-কর্মীদের সাথে রাগ করিয়া পদত্যাগ করিলে মানুষ স্বভাবতঃ তাঁদেরে জানাইয়া পদত্যাগ করেন। এ ক্ষেত্রে মওলানা সাহেব প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান ও জেনারেল সেক্রেটারি মুজিবুর রহমানের সাথে এবং কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ সাহেবের সাথে বিরোধের জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন, এটা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি তাঁর পদত্যাগ-পত্র সেক্রেটারি মুজিবুর রহমানের কাছে পাঠাইয়া

দিতেন। মুজিবুর রহমান আতাউর রহমানকে এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবকে জানাইতেন। আওয়ামী লীগ মহলে হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁকে পদত্যাগে বিরত করিতাম। এইটাই মওলানা এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি বিশ্বস্ত অনুগত মিঃ অলি আহাদকে নির্বাচন করেন। পদত্যাগ-পত্রটি আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমান কাউকে না দেখাইয়া বামপন্থী খবরের কাগযে পৌঁছাইয়া দিবার ওয়াদা করাইয়া তিনি উহা মিঃ অলি আহাদের হাতে দেন। মিঃ অলি আহাদ সরল বিশ্বস্ততার সাথে অক্ষরে-অক্ষরে তা পালন করেন। এ কাজে তিনি মওলানা সাহেবের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য দেখাইয়া থাকিলেও প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য ভংগ করিয়াছেন, এই অপরাধে মিঃ অলি আহাদকে সাসপেন্ড করা হয়। প্রতিবাদে ৯ জন ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার পদত্যাগ করেন।

এমনি ক্রাইসিস মুখে লইয়া আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠক হয় প্রধানতঃ মওলানা সাহেবের ইচ্ছা-মত। তার আগে-আগে প্রসারিত ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারি পার্টির যুক্ত বৈঠক দেওয়া হয়। মওলানা সাহেব তখন হাসপাতালে। আমিও। উভয়ে প্রায় সামনা-সামনি কেবিনে থাকি। প্রধানতঃ আমারই প্রস্তাবে মওলানা সাহেবকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করিয়া সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কখনো আমি ও মুজিবুর রহমান একত্রে কখনও আমি একা মওলানা সহেবকে ইস্তফা প্রত্যাহারের অনুরোধ-উপরোধ করি। পদত্যাগী ওয়ার্কিং কমিটি মেম্বরদের এবং মিঃ অলি আহাদ সম্পর্কে মওলানার ইচ্ছামত কাজ হইবে, এ আশ্বাসও আমরা দেই। কিন্তু মওলানা অটল। যা হয় কাউন্সিল মিটিং-এ হইবে, এই তাঁর শেষ কথা। কাউন্সিল মিটিং-এ তিনি জয়লাভ করিবেন, এটা তিনি আশা করিলেও নিশ্চিত ছিলেন না। সেই জন্য আগেই তিনি মিয়া ইফতিখারুদ্দিন ও জি. এম. সৈয়দ প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানী বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ও শহিদ সাহেব কর্তৃক বিতাড়িত সাবেক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি মিঃ মাহমুদুল হক ওসমানীর সাথে গোপন পরামর্শ করিতে থাকেন। এটা আমি জানিতে পারি হাসপাতালের লোকজনের কাছে। ডাক্তারের পরামর্শে আমি রোজ বিকালে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের দিকে বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে ঘন্টাখানেক খোলা ময়দানে হাওয়া খাইতাম। একদিন হাসপাতালে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা বদ্ধ দরজায় মওলানা সাহেবের সাথে পরামর্শ করিয়া গিয়াছেন। এটা চলে পর-পর কয়দিন। কাউন্সিল মিটিং-এ ভাসানী সাহেব হারিয়া যান। তবু কাউন্সিল মওলানাকে ইস্তাফা প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। মওলানা তদুত্তরে ন্যাপ গঠন করেন। ন্যাপ গঠনে প্রেসিডেন্ট মির্যার হাত ছিল এতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায়

করাচির শিল্পপতিরা এ কাজে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। অথচ এই সময়েই প্রেসিডেন্ট মির্যা 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেন : 'প্রধানমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দী ও আমি এক সংগে থাকিব। তাঁরমত যোগ্য লোক পাকিস্তানে আর হয় নাই।' মির্যার ঐ উক্তির মধ্যে সবটুকু ভন্ডামি ছিল না। কিছুটা আন্তরিকতা ছিল। তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বিশেষতঃ ভাসানীর প্রভাব-মুক্ত সুহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী রাখিতে সত্য-সত্যই উদগ্রীব ছিলেন বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ওটা সম্ভব না হওয়ায় তিনি সুহরাওয়ার্দী-বিরোধী হইয়া পড়েন। সে কথা যথাস্থানে বলিব।

ঢাকা হইতে ফিরিয়াই কয়েকদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্য ইংলন্ড ও আমেরিকা ভ্রমণে প্রায় দুই মাসের জন্য সফরে বাহির হন। বরাবরের মত আমাকেই অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়া যান। এই সময়কার দুই-তিনটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে।

৪. ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট

একটি ঘটে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট লইয়া। এটি ছিল ঢাকায়। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব আবদুল জব্বার ইহার সেক্রেটারী। কার্যতঃ তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। শিল্পমন্ত্রী হিসাবে আমার এলাকাধীন এটা। আমি মন্ত্রী হওয়ার পর হইতেই জব্বার সাহেব আমার কাছে নালিশ করিতেছিলেন, পাকিস্তান সরকার বহু বছর ধরিয়া নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে ইন্সটিটিউটের মন্যুরি ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। আমাকে এটার প্রতিকার করিতেই হইবে। আমি ফাইল তলব করিয়া দেখিলাম বিরাট ব্যাপার। সব দফতর হইতেই ইন্সটিটিউটের রিকগনিশনের বিরোধিতা করা হইয়াছে। ইন্সটিটিউটের পরম হিতৈষী পশ্চিম পাকিস্তানী একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ যাফর। তিনি এবং ইন্সটিটিউটের তৎকালীন চেয়ারম্যান পাকিস্তানের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মোহসিন আলী আমাকে ব্যাপারটা বুঝাইলেন। আমি বিস্মিত ও লজ্জিত হইলাম। এই ইন্সটিটিউট ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকার কর্তৃক রিকগনাইযড। অপর দিকে দিল্লির ও লন্ডনের এই একই প্রকারের ইন্সটিটিউটও পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রিকগনাইযড। কিন্তু বিদেশ কর্তৃক স্বীকৃত নিজের দেশের এই ইন্সটিটিউট পাকিস্তান সরকার স্বীকার করেন না। অদ্ভুত না? জব্বার সাহেব বলিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী উক্ত দুইজন ইঞ্জিনিয়ার সমর্থন করিলেন যে, যদি উহার হেড্ অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হয়, তবে উহার মন্যুরি পাইতে এক মুহূর্ত দেরি হইবে না।

আমি সমস্ত নথি পড়িয়া-শুনিয়া এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া লম্বা নোট লিখিলাম। তাতে ইন্সটিটিউট মনযুরির সুপারিশ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পাঠাইলাম। নিয়ম মোতাবেক এ সম্পর্কে চূড়ান্ত আদেশ দিবার মালিক প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী ফাইল দেখিয়াই ধরিয়া লইলেন এটা আমার পূর্ব-বাংলা-প্রীতির আরেকটা ব্যাপার। তিনি হাসিয়া বলিলেনঃ 'এটাও একুশ দফায় ছিল নাকি?' তাঁর হাসির জবাবে না হাসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে এ ব্যাপারে অবিচার ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি দিতে লাগিলাম। তিনি হাতের ইশারায় আমাকে থামাইয়া বলিলেনঃ 'উত্তেজিত হইবার কিছু নাই। ধীরে-সুস্থে ভাবিবার অনেক আছে। আগুন যা জ্বালাইয়াছ, তাই আগে নিভাইতে দাও। আর নতুন করিয়া আগলাগাইও না।'

আঞ্চলিক সংকীর্ণতার জন্যই এটা মনযুরি পাইতেছে না প্রধানমন্ত্রীর কথায় সে বিশ্বাস আমার আরও দৃঢ় হইল। আমি আমার যুক্তির পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলাম। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী বলিলেনঃ 'দেখিতেছ না, সব দফতর হইতে মনযুরির বিরুদ্ধে সুপারিশ করা হইয়াছে?' আমি জোর দিয়া বলিলাম ঃ 'সব দফতরের যুক্তি আমার নোটে খন্ডন করিয়াছি।' তিনি আবার তাঁর মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া বলিলেনঃ 'তুমি ভাবিতেছ খন্ডন করিয়াছ। আমি মনে করি কিছু হয় নাই। ভাল ইংরাজী লিখিলেই ভাল অর্ডার হয় না।'

এই কথা বলিয়া ফাইলটা এমনভাবে সরাইয়া রাখিলেন যে আমি বুঝিলাম এ ব্যাপারে আজ আর কথা বলা চলিবে না। এমনি ভাবে তিনি যে ফাইলটা নিজের দফতরে চাপা দিলেন, আমার শত তাগাদায়ও তিনি ঐ ব্যাপারে কিছু করিলেন না। এদিকে ঢাকা হইতে রিমাইন্ডার ও করাচি হইতে মিঃ যাফরের তাগাদা আমাকে অস্থির করিয়া ফেলিল। আমি একটা রিস্ক নিলাম। এর পরে এ্যাকটিং প্রধানমন্ত্রী হইয়াই আমি ঐ ফাইল তলব করিলাম এবং শিল্প-মন্ত্রী হিসাবে আমার নোটটার নিচে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি 'অনুমোদিত' লিখিয়া দিলাম। পরে করাচিতেই ইন্সটিটিউটের উদ্বোধনী উৎসব হইয়াছিল প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর। ওঁরা আমাকেই উৎসবের প্রধান অতিথি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বহুৎ অনুরোধ-উপরোধ করিয়া প্রধানন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হইতে রাযী করিয়াছিলাম। তাঁর অমতে এ কাজ করিয়াছিলাম বলিয়া প্রধানমন্ত্রী আমাকে কোনদিন তিরস্কার করেন নাই।

৫. ওয়াহ্ কারখানা পরিদর্শন

আরেকটি ঘটনা আমার ওয়াহ অস্ত্রকারখানা পরিদর্শন। এটিই পাকিস্তানের প্রধান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি। আমার শখ হইল আমাদের জাতীয় অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিটি দেখিব। তদনুসারে টুওর প্রোগ্রাম প্রচারিত হইল। তৎকালীন ডিরেক্টর (বোধ হয় জেনারেল আযম খাঁ) আমাকে পিন্ডি হইতে আগাইয়া নিয়া যান। আমার অভ্যর্থনার বিপুল

আয়োজন হইয়াছিল। হরেক বিভাগে আমার অভ্যর্থনার পৃথক-পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা মানে অভিনন্দন-পত্র পাঠ ও বক্তৃতা নয়। সব মিলিটারি ব্যবস্থা। বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহারের নুমায়েশ। ফুলদল দিয়া কামান-বন্দুক সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আমি ট্রিগার টিপিলাম। আওয়ায হইল। টার্গেট সই অর্থাৎ চানমারি হইল। আমার কোনও কৃতিত্ব ছিল না। ঠিকমত সই করিয়া বসাইয়া রাখা ইয়াছিল। এসব উৎসব শেষ করিয়া আমি বিভিন্ন গোলা-বারুদ, মানে এমিউনিশন, তৈয়ার দেখিলাম। এলাহি কারখানা। উৎসাহিত, আশান্বিত ও গৌরবান্বিত হইলাম। দেশ রক্ষার সব অস্ত্র-শস্ত্রই আমাদের নিজস্ব কারখানায় তৈয়ার হয়। তবে আর চিন্তা কি? ভয় কিসের? চার ঘন্টার মত পরিদর্শন করিলাম। মাঝখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হইয়াছিল ফ্যাক্টরির মধ্যেই। আমি যখন ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন জিনিস গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করি, সেই সময় দুই-একজন শ্রমিক আমার নিতান্ত কাছ ঘেঁষিয়া বাংলায় কথা বলিতে শুরু করেন। আমার কৌতূহল হয়। তাঁদের দিকে ফিরি। আমার চোখে বোধ হয় তাঁরা সহানুভূতি দেখিতে পান। নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা বলিতে শুরু করেন। এটা বোধ হয় ডিসিপ্লিন অথবা মন্ত্রীর মর্যাদার খেলাফ। তাই উপরস্থ অফিসাররা তাঁদেরে ধমক দিয়া সরাইয়া দেন। কিন্তু পিছে-পিছে তাঁরা ঘুরিতেই থাকেন। সুযোগ পাইলেই চুপে-চুপে দুই একটি কথা বলিয়াও ফেলেন।

কিন্তু কারখানায় বিরাটত্বে ও প্রডাকশনের বিপুলতায় আমি এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে তাঁদের অভিযোগের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারিলাম না। অফিসারদের সাথে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ আলাপ শুরু করিলাম। তাঁদের কৃতিত্বে আমার অফুরন্ত আনন্দ ও বুক-ভরা গৌরবের কথা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিলামঃ 'বলুন ত আমাদের কোন্ বস্তুর দৈনিক বা মাসিক বা বাৎসরিক তৈয়ারির পরিমাণ কত?' আমার ভাবখানা এই যে তাঁরা বলিবেন আমি আমার নোটবই-এ লিখিয়া নিব। পকেটে হাত দিলাম নোটবুকের তালাশে।

অফিসাররা খানিক এঁ-ওঁর দিকে চাহিলেন। তারপর ডিরেক্টর সাহেব বলিলেনঃ 'মাফ করিবেন সার, আমরা বলিতে পারিব না।' আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলামঃ 'তার অর্থ? বলিতে পারিবেন না? না বলিবেন না?'

সরলভাবে তিনি বলিলেনঃ 'বলিতে মানা আছে এসব টপ-সিক্রেট।' আমি আরও তাজ্জব হইলাম। বলিলামঃ 'বলেন কি আপনেরা? আপনাদের প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসাবেও আমি জানিতে পারিব না আমাদের কত তৈয়ার হয়? তবে আমরা কি করিয়া জানিব আমাদের দরকার কত? কতই বা আমাদের আমদানি করিতে হইবে?'

আমার সব কথাই সত্য। তবে এসব ব্যাপার জানিতে হইলে প্রপার চ্যানেলে আসিতে হয়। আমি ডিফেন্স সেক্রেটারি, প্রধান সেনাপতি, এমন কি প্রেসিডেন্টের মারফত সবই জানিতে পারিব। ওঁরা জানিতে না চাওয়া পর্যন্ত প্রপার চ্যানেল হইবে না। ঐ চ্যানেলে অর্ডার না আসা পর্যন্ত কারখানার অফিসারগণ কারও কাছে কিছু বলিতে পারেন না।

আমি শুধু খুশী হইলাম না। গর্ব বোধও করিলাম। কি চমৎকার ডিসিপ্লিন! এ না হইলে আর দেশরক্ষা দফতরের কাজ হয়? সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম।

৬. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

করাচি ফিরিয়াই ডিফেন্স-সেক্রেটারি মিঃ আখতার হুসেনকে ধরিলাম। তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম আমার উদ্দেশ্যের কথা। তিনি বলিলেনঃ 'বরঞ্চ প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করুন।' করিলাম প্রেসিডেন্টকে জিগগাস। তিনি প্রথমে তর্ক করিলেন, এসব খবরে প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রীদের দরকার কি? প্রধান সেনাপতিই যথেষ্ট। আমি তর্ক করিলাম। প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কমাণ্ডার। তাঁর সব ব্যাপার জানা দরকার। প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রীরও অবশ্যই জানিতে হইবে। নইলে প্রস্তুতি হইবে কিরূপে? আমি বিলাতের নযির দিলাম। প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিলেন, তিনি কিচ্ছু জানেন না। প্রধান সেনাপতির সহিত যোগাযোগ করিতে তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন। প্রধান সেনাপতি এই সময় হয় বিলাতে বা আমেরিকায় ছিলেন। আমি ডিফেন্স সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলাম, প্রধান সেনাপতি ফিরিয়া আসা মাত্র বিহিত ব্যবস্থা যেন তিনি করেন।

কোনো 'বিহিত ব্যবস্থা' হইল না। অথবা 'বিহিত ব্যবস্থাই' বোধ হয় হইল। আমাকে কিচ্ছু জানান হইল না। প্রধানমন্ত্রী ফিরিয়া আসা মাত্র আমি তাঁর কাছে নালিশ করিব, স্থির করিয়া রাখিলাম।

নালিশ আর আমার করিতে হইল না। প্রধানমন্ত্রী ফিরিয়া আসার পর আমার সহিত প্রথম একক সাক্ষাতেই তিনি বলিলেন ঃ এ সব কি শুনিলাম? তুমি দেশরক্ষার গোপন-তথ্য সম্বন্ধে অত কৌতূহলী কেন?'

আমি স্তম্ভিত হইলাম। কি গুরুতর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি। প্রধানমন্ত্রীকে সব খুলিয়া বলিলাম। দেখিলাম, অনেক কথাই তিনি জানেন। সব শুনিয়া এবং আমার উদ্দেশ্য ও যুক্তির বিবরণ শুনিয়া অবশেষে বলিলেন ঃ 'তোমাকে এঁরা কত সন্দেহের

চোখে দেখেন তা কি তুমি জান না? তুমি একুশ দফার রচয়িতা। তুমি সাবেক কংগ্রেসী। ভারতের অনেক নেতার তুমি বন্ধু।'

আমি প্রতিবাদ করিয়াও অবশেষে তাঁর যুক্তি মানিয়া নিলাম। বলিলামঃ 'বেশ, আমার বেলা তাঁদের সন্দেহ আছে। কিন্তু আপনে? আপনে কি এসব ব্যাপার জানেন? আপনে শাসন-সৌকর্য হইতে শুরু করিয়া অর্থনীতির পোকা-মাকড় পর্যন্ত মারিতে দক্ষ। প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার আপনে কতটুকু জানিয়াছেন?' আমার কথাগুলি ফেলিয়া দিবার মত নয়। তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মির্যার মতই তিনি যুক্তি দিতে লাগিলেন, দেশরক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও মন্ত্রীদের অতসব কর্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে যে ঐ সব কাজ করিয়া মন্ত্রীদের অবসর থাকা সম্ভবও নয়, উচিৎও নয়। বোঝা গেল, তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না। মানে, আসল কথা জানেন। অর্থাৎ এ ব্যাপারে যে কিছু জানা উচিৎ নয়, এটা জানেন। তাই জিগ্গাসা করাও তিনি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন না।

আমার বাঘা প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী সুহরাওয়ার্দীরই এই অবস্থা। আর-আর প্রধানমন্ত্রীদের কি ক্ষমতা ছিল, তা অনুমান করিলাম। বুঝিলাম, নামে-মাত্র পার্লামেন্টারি সরকার চলিতেছে দেশে। কিন্তু দেশরক্ষা দফতরে মন্ত্রীদের বা মন্ত্রিসভার বা আইন-পরিষদের কোনও ক্ষমতা নাই। সেখানে সামরিক কর্তৃত্ব চলিতেছে। লিডার যা বলিলেন, তার চেয়েও তিনি বেশি জানেন। আমরা যে কত অক্ষম, অসহায়,তা বোধ হয় তিনি আমার চেয়েও বেশি উপলব্ধি করেন। তিনি যে দুই-একবার প্রকাশ্যভাবে এবং অনেকবার আমদের কাছে বৈঠকে মার্শাল লর ডর দেখাইয়াছেন, তার কারণ নিশ্চয়ই আছে।

৭. পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা

তৃতীয় ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি সরকার পুনর্বহাল। ডাঃ খান সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বে লাহোরে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা চলিতেছিল। ডাঃ সাহেবের মেজরিটি বিপন্ন হওয়ায় সেখানে গবর্নর-শাসন প্রবর্তিত হয় ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে। তিন মাস চলিয়া যাইতেছে। রিপাবলিকানরা দাবি করিতেছেন, তাঁদের নিরংকুশ মেজরিটি হইয়াছে। তবু প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দিতেছেন না। রিপাবলিকান পার্টির জোরে আমরা কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব করি। অথচ প্রদেশে সেই রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রিসভা হইতে দিতেছি না, এটা কত বড় অন্যায়, অপমানকর? দিন-রাত রিপালিকান নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে তাগাদার উপর তাগাদা করিতেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অনড়। শেষ পর্যন্ত কোনও কোনও রিপালিকান নেতা অভিযোগ করিতে

লাগিলেন যে দৌলতানা-গুরমানী–নেতৃত্বে মুসলিম লীগের সাথে শহীদ সাহেব একটা গোপন আঁতাত করিয়াছেন যার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত লাহারে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা কায়েম করিবেন। এর পরিণামে শহীদ সাহেব শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রেও রিপাবলিকানের বদলে মুসলিম লীগের সাথে কোয়েলিশন করিবেন। শুধু রিপাবলিকান–নেতারা নন, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মির্যাও আমাকে এ ধরনের কথা বলিয়াছেন অবশ্য রিপাবলিকানদের কথা হিসাবে।

আমি ওঁদের অভিযোগ ও সন্দেহে বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এ কাজ সমর্থনও করিতাম না। কেন তিনি আমাদের কোয়েলিশনী বন্ধুদের সাথে প্রাদেশিক রাজনীতিতে এই দুর্ব্যবহার করিতেছেন, তার কোনও কারণ পাইতাম না। লিডারকে জিগ্‌গাস করিলে তিনি ধমক দিতেনঃ 'পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতি তুমি কিচ্ছু জান না। এ ব্যাপারে কথা বলিও না।'

কিন্তু তবু আমি বলিলাম। প্রেসিডেন্ট মির্যার কথা তুলিলে তিনি হাসিয়া বলিলেনঃ 'প্রেসিডেন্ট ইয অল রাইট।' এর সমর্থনে তিনি আভাসে–ইংগিতে এমন দুচারটা কথা বলিলেন যা হইতে আমি বুঝিলাম মির্যা একদিকে রিপাবলিকানদেরে মন্ত্রিসভার দাবিতে উস্কানি দিতেছেন, অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশ দিতেছেন রিপাবলিকানদের দাবি না মানিতে। দস্তুরমত 'চোরকে চুরি করিতে এবং গিরস্তকে সজাগ থাকিতে বলার' দৃষ্টান্ত আর কি! আমার সন্দেহের কথা প্রকাশ করা মাত্র লিডার কথাটাকে মাটিতে পড়িতে দিলেন না। এমন ধমক দিলেন যেন আমি কোন সাধু আউলিয়া–দরবেশের চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছি। ফলে প্রধানমন্ত্রী কিছু করিলেন না। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রিপাবলিকান–অসন্তোষ বাড়িয়াই চলিল।

এমন সময় তিনি লম্বা সফরে বিদেশে গেলেন। আমি তাঁর স্থলবর্তী হওয়া মাত্র রিপাবলিকানরা আমার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। ওঁদের সবাই আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু হইলেও সৈয়দ আমজাদ আলীর উপদেশের প্রতিই আমি অধিকতর গুরুত্ব দিতাম। তিনিও আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শুধু অনুরোধ–উপরোধ নয়। রিপাবলিকানরা একটা কাজের কাজও করিলেন। মুসলিম লীগ যখন কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব করিতেছিল, সেই সময় ১৯৫৫ সালে পূর্ব–পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা গঠনে কৃষক–শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের পরস্পর–বিরোধী দাবির মীমাংসার জন্য গবর্নরের সামনে ফিযিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন করার (মেম্বর হাযির করার) আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। আমার মনে হয় যেন তারই জবাবে শহীদ সাহেব কিছুদিন আগে গবর্নর গুরমানীকে আদেশ দিয়াছিলেন, উভয় দলের শক্তির ফিযিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন নিতে। সুহরাওয়ার্দী

সাহেব বিদেশ সফরে যাওয়ার কিছুদিন পরে লাহোরে তাই হইল। সে ডিমনষ্ট্রেশনে রিপাবলিকান পার্টি জয় লাভ করিল। কিন্তু এই ধরনের প্রক্রেমেশন বা তার রিভোকেশনে গভর্ণরের 'রিপোর্ট' দরকার শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে। গুরমানী সাহেব কি রিপোর্ট দেন, তা দেখিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া আছেন। রিপাবলিকান বন্ধুদের তাগাদার জবাবে আমি দুই–একবার বলিয়াছি : 'আপনারা প্রেসিডেন্টকে দিয়া বলান না কেন?'

প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন আমাদের গ্রীষ্মাবাস নাথিয়াগলিতে। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির মধ্যে কথাবার্তার জন্য সেক্রোফোনের ব্যবস্থা থাকে। আমি অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হইলেই এই যন্ত্রটা আমার শোবার ঘরে পাতা হইত। সেক্রোফোনের ব্যবস্থা গোপনীয় কথা আদান–প্রদানের জন্য। সাধারণ টেলিফোনের মত এটা ট্যাপ করা যায় না অর্থাৎ অন্য কেউ হাযার যন্ত্র লাগাইয়াও এর কথা বুঝিতে পারিবে না। কারণ ট্রান্সমিটিং বাক্সে কথাগুলি বলিলেই এলোমেলো হিজিবিজি হইয়া যায়। ঐ এলোমেলো অবস্থাতে গিয়া রিসিভিং বাক্সে পড়ে। সেখানে গিয়া যেমনকার কথা তেমনি হইয়া যায়। বলা বাহুল্য এই পরিবর্তন এমন পলকে হয় যে আলাপের দুই পক্ষ সেটা বুঝিতেই পারেন না।

এবারও এই যন্ত্র আমার শোবার ঘরে পাতা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট মির্যা কখনও এই সেক্রোফোনের মাধ্যমে, কখনও সাধারণ ট্রাংক কলে, আমার সাথে কথা বলিতেন। প্রায়ই বলিতেন। দিনে তিনবারও বলিতেন কোনও দিন। কোনও সংগত কারণ নাই। হঠাৎ একদিন আমার মনে হইল প্রেসিডেন্ট সেক্রোফোনে যে সুরে কথা বলেন, সাধারণ ট্রাংক কলের কথায় যেন ঠিক সেই সুর থাকে না। সন্দেহ হওয়ায় আরও একটু মন দিয়া বিচার করিতে লাগিলাম। আমার সন্দেহ বেশ দৃঢ় হইল যে যখন ট্রাংক কলে কথা বলেন, তখন তিনি আমাকে খুব জোর দিয়া ধমকের সুরে বলেনঃ 'তুমি অনতিবিলম্বে লাহোরে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভার হুকুম দিয়া দাও। তাঁরা পরিষ্কার মেজরিটি। তাঁদেরে মন্ত্রিসভা না দিলে কেন্দ্রে যদি তাঁরা তোমাদের বিরুদ্ধে যান, তবে আমাকে দোষ দিতে পারিবা না। ইত্যাদি ইত্যাদি।' সব কলেই মোটামুটি এই ভাব।

কিন্তু সেক্রোফোনে যখন কথা বলেন, তখন তিনি নরম সুরে বলেনঃ তা ত বটেই, সবদিক দেখিয়া–শুনিয়াই ত তোমার কাজ করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রীর অবর্তমানে যা–তা একটা করাও ত তোমার উচিৎ না। হাঁ, সব দেখিয়া–শুনিয়া তুমি যা ভাল বুঝ তাই কর। সম্ভব হইলে রিপাবলিকান পার্টির দাবিটা বিচার করিও। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। মির্যা আমার সাথেও সেই 'চোর–গিরস্তের' নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি আসলে চান না যে আমি রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা গঠনের হুকুম দেই। আমি মোটামুটি ঠিক করিয়া ফেলিলাম, গভর্নর গুরমানী যদি অনুকূল রিপোর্ট দেন, তবে আমি রিপাবলিকান মন্ত্রিসভার হুকুম দিয়া দিব। ভাবিতে–ভাবিতে গবর্নরের রিপোর্ট লইয়া স্পেশাল মেসেঞ্জার আসিয়া পড়িলেন। পড়িয়া দেখিলাম গবর্নর রিপাবলিকান পার্টির মেজরিটি দেখাইয়াছেন এবং ১৯৩ ধারা প্রত্যাহারের সুপারিশ করিয়াছেন। আমি কর্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব তাঁকে জানান দরকার মনে করিলাম। আমি ওয়াশিংটনে টেলিফোন করিলাম। কোনও দিন ত এসব বড় কাজ করি নাই। একেবারে বিস্মিত হইলাম। আমার কল গেল আমাদের আর্মি হেড কোয়ার্টার পিণ্ডিতে। সেখান হইতে গেল লণ্ডনের আর্মি হেড কোয়ার্টারে। তাঁরা পাঠাইলেন ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে। নিউইয়র্ক বলিল ওয়াশিংটন, ওয়াশিংটন বলিল ফ্লোরিডা, ফ্লোরিডা বলিল সানফ্রানসিসকো। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে পাওয়া গেল কলর‍্যাডোয়। কারণ আমি ছাড়িলাম না। প্রতিবারই আমি বলিলাম, প্রধানমন্ত্রীকে আমার চাইই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর গলা শুনিয়া ধরে জান আসিল। কিন্তু তাঁর ধমকে গলা শুকাইয়া গেল। আমি রিপাবলিকান মেজরিটি, গবর্নরের রিপোর্ট ও আমার মত সবই বলিলাম। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন ঃ 'আমার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত স্থগিত রাখ।' আমি জোরের সংগে বলিলাম ঃ 'এ অবস্থায় আর স্থগিত রাখিতে পারি না।' তিনি বলিলেন ঃ 'রাখিতেই হইবে।' আমি বলিলামঃ 'আমি ন্যায়তঃ ও আইনতঃ এটা করিতে বাধ্য'। তিনি বোধ হয় চারবার 'না' 'না' 'না' 'না' বলিয়া টেলিফোন ছাড়িয়া দিলেন। আমি খটখটাইলাম। হ্যালো হ্যালো করিলাম। লণ্ডনের এক্সচেঞ্জ আমাকে জানাইলেন, প্রধানমন্ত্রী ফোন ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বড়ই বিপদে পড়িলাম। জিগ্‌গাস না করিতাম তবে সেটা ছিল আলাদা কথা। এখন তাঁর মত জিগ্‌গাস করিয়া তাঁর 'না' পাইয়া কেমনে তাঁর কথা লংঘন করি? উভয় সংকটে পড়িলাম। আইনতঃ ও ন্যায়তঃ আমি গবর্নরের রিপোর্ট মোতাবেক কাজ করিতে বাধ্য। রিপাবলিকান বন্ধুরা লিডারের হুকুম ও আমার উপদেশ মতই 'ফিযিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন' করিয়াছেন। যে গবর্নরের দিকে চাহিয়া লিডার এতদিন রিপাবলিকান পার্টিকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বন্ধুদের অভিযোগ সেই গবর্নরই যখন নিজ হাতে সুপারিশ করিয়াছেন, তখন লিডারের আর কি করণীয় রহিল? আমি নিজের রাজনৈতিক সহকর্মী আতাউর রহমান ও মুজিবুর রহমানের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করিলাম। লিডারের আপনজন ও হিতৈষী মেয়ে ও জামাই মিসেস আখতার সোলেমান ও মিঃ সোলেমানের মত সামনা সামনি জিগ্‌গাস করিলাম। সকলে মত

দিলেন। বিশেষতঃ মিসেস ও মিস্টার সোলেমানকে প্রেসিডেন্টের ভাবগতিকটার কথাও বলিলাম। তাঁরা আমার সন্দেহে সম্পূর্ণ একমত হইলেন।

আমি অসুস্থতার দরুন নিজের বাসায় কেবিনেট মিটিং ডাকিয়া সিদ্ধান্ত নিলাম। রিপাবলিকান বন্ধুরা স্পষ্টতঃই উল্লসিত হইলেন। কারণ প্রধানমন্ত্রীর নিষেধের কথা তাঁরা কেমনে যেন জানিয়া ফেলিয়াছিলেন।

লিডারের নিষেধের মুখে আমার এই সাহস হইবে, এটা তাঁদের বিশ্বাস হয় নাই। মিটিং শেষে তাঁরা আমাকে জড়াজড়ি করিতে এমনকি পশ্চিমী কায়দায় আমাকে চুমা দিতে লাগিলেন। সৈয়দ আমজাদ আলী উল্লাসে বলিয়া ফেলিলেন ঃ 'ইউ আর টুডে দি টলেস্ট ম্যান ইন পাকিস্তান'।

আমাকে আগেই জানান হইয়াছিল যে ডাক্তার খান সাহেবের বদলে সর্দার আবদুর রশিদকে পার্টি-লিডার করা হইয়াছে। কাজেই যথাসময়ে লাহোরে সর্দার আবদুর রশিদের প্রধানমন্ত্রিত্বে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া গেল।

আমি ধরিয়াই নিয়াছিলাম, লিডার আমার উপর রাগ করিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া তিনি আমাকে ধমকাইবেন। কিন্তু কিছুই তিনি বলিলেন না। বিমান-বন্দরে তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলিয়া নিলেন। ধরিয়া নিলাম, গাড়িতেই বকা দিবেন। কিন্তু কিচ্ছু না। স্বাভাবিকভাবেই সব হালহকিকত পুছ করিতে লাগিলেন। যেটা ভয় করিতেছিলাম, আভাসে-ইংগিতেও আর সেদিকে গেলেন না। আমার বুকের বোঝা নামিয়া গেল। পরে মিঃ সোলেমান একদিন বলিয়াছিলেন, লণ্ডনেই তিনি শ্বশুরকে সব ব্যাপার বলিয়াছিলেন। সব শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেনঃ 'আমি জানিতাম আবুল মনসুর ঠিক কাজই করিবে'। লিডারের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা আরো নুইয়া পড়িল।

৮. সমাজতন্ত্রী দেশে বাণিজ্য মিশন

বাণিজ্যমন্ত্রী হইবার কয়েকদিন পরেই আমি ঘোষণা করিয়াছিলামঃ আমাদের বাণিজ্য-নীতি রাজনৈতিক সীমা ডিংগাইয়া যাইবে। 'আওয়ার ট্রেড-পলিসি উইল ট্রানস্যাণ্ড পলিটিক্যাল বাউণ্ডারিয' কথাটা বলিয়াছিলাম পাক-ভারত-বাণিজ্য চুক্তির আসন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে। কয়দিন পরেই এই চুক্তির মেয়াদ বাড়াইবার আলোচনা শুরু করিবার কথা। কিন্তু কথাটা আসলে শুধু পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তির বেলায় বলি নাই। সাধারণ বাণিজ্য-নীতি হিসাবেই তা বলিয়াছিলাম। আমার নয়া বাণিজ্য সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহ্মদই শুধু আমার এই ঘোষণার খোলাখুলি সমালোচনা করিলেন

আমারই নিকট। কিন্তু পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির আলোচনায় আমার ঐ বিঘোষিত নীতির প্রয়োগ দেখিয়া তিনি খুশী হন। ক্রমে বাণিজ্য-নীতি সম্পর্কে আমাদের মধ্যেকার আলোচনা ঘনিষ্ঠ হয়।

ইতিমধ্যে আমার নীতি ঘোষণার পর চীন রুশ যুগোস্লাভিয়া চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি সমাজতন্ত্রী দেশের রাষ্ট্রদূতেরা ঘন-ঘন আমার সাক্ষাৎ চাইতে থাকেন এবং পাকিস্তানের সাথে যাঁর-তাঁর দেশের বাণিজ্য শুরু করিবার এবং বাড়াইবার নানা রূপ লোভনীয় প্রস্তাব দিতে থাকেন। এসব আলোচনার অনেক গুলিতেই মিঃ আযিয আহ্‌মদ শামিল ছিলেন। তিনিও আকৃষ্ট হইলেন বলিয়া মনে হইল।

এসব প্রস্তাবের মধ্যে রুশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রস্তাবই আমার সর্বাগ্রে বিবেচনা করিবার ইচ্ছা হইল। কারণ এদের প্রস্তাবের মধ্যে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের প্রশ্ন ছিল না। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার খুব টানাটানি। এই অভাবের কথার জবাবেই উহারা প্রথমে বার্টার-সিস্টেমে বা বিনিময়-পন্থায় বাণিজ্যের কথা বলেন। এই বার্টার সিস্টেমও পাকিস্তানের জন্য সহজ-সাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রস্তাব দেন ঃ (১) তাঁরা পাকিস্তানের আমদানি-কৃত জিনিসের দাম পাকিস্তানী মুদ্রায় গ্রহণ করিবেন এবং দামের টাকা দিয়া পাকিস্তানী জিনিস খরিদ করিয়া যাঁর-তাঁর দেশে পাঠাইবেন। (২) ঐ টাকার পরিমাণ-মত পাকিস্তানী জিনিস কোনও এক বছরে সবটুকু পাওয়া না গেলে বাকী টাকায় পর বছর ঐ জিনিস খরিদ করা হইবে। যতদিন সব টাকা পাকিস্তানী জিনিস খরিদে ব্যয়িত না হইবে, ততদিন ঐ টাকা পাকিস্তান সরকারের পছন্দ-মত পাকিস্তানী ব্যাংকে জমা থাকিবে।

আমি এই প্রস্তাবে উল্লসিত হইলাম। উভয় দেশের প্রতিনিধিদেরে বলিলাম, 'তাঁদের দেশ হইতে আমরা শুধু যন্ত্রপাতি আমদানি করিব। কোনও বিলাস-দ্রব্য আমদানি করিব না। ঐ যন্ত্রপাতির মধ্যেও আমি জুটলুমের উপর বেশি জোর দিলাম। বিলাতের তৈয়ারী প্রতি জুট-লুমের দাম ছিল এই সময় পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চান্ন হাজার টাকা। তাতে ঐ সময় ২৫০ লুমের একটি ক্ষুদ্রতম পাট কল বসাইতেও আমাদিগকে সোওয়া কোটি হইতে দেড়কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা খরচ করিতে হইত। রুশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া কয়েকটি শর্তে এর প্রায় অর্ধেক দামে লুম তৈয়ার করিয়া দিতে রাযী হইল।

প্রস্তাবগুলি আমার কাছে ত লোভনীয় হইলই, মিঃ আযিয আহমদ ও মিঃ ইউসুফও পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। আমি খুশী হইয়া প্রধানমন্ত্রীকে সব কথা বলিলাম। তিনি প্রথমে চোখ বড় করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। খানিক আলাপের পর তিনি বলিলেন ঃ 'এটা মস্তবড় ফরেন পলিসির কথা তা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। ভাল

হয় যদি তুমি প্রেসিডেন্টের সাথে বিষয়টার আলোচনা কর। তবে আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমাদের 'আস্তে চল' নীতি অবলম্বন করাই উচিৎ। ওরা আমাদের ভাল করিবার জন্য অত ব্যস্ত হইয়া পড়িল কেন, সেটা চিন্তা করিতে হইবে না? ধর যদি পাকিস্তানের নিকট বিক্রয়–করা সব টাকা ওরা আমাদের ব্যাংকে জমা রাখে। চুক্তির জিনিস পাওয়া যায় না এই অজুহাতে ইচ্ছা করিয়া খরচ যদি না করে, এমনি করিয়া যদি কয়েক বছরের টাকা জমা করে এবং অবশেষে একদিন সুযোগ বুঝিয়া সবটাকা এক সংগে চাইয়া বসে তবে আমাদের ব্যাংকে 'রান' হইয়া দেশে ইকনমিক ক্রাইসিস দেখা দিবে না?'

আমি ভাবনায় পড়িলাম। আমি ফাইনান্সের কিছুই জানি না। পাবলিক ফাইনান্স ত নয়ই। পক্ষান্তরে আমার নেতা প্রধানমন্ত্রী একজন নাম–করা ইকনমিক এক্সপার্ট। তিনি যা আশংকা করিয়াছেন, সব সত্য হইতে পারে। আমি ত ও–সব দিক ভাবিয়া দেখি নাই। কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করিব বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় হইলাম। পরদিনই রুশ–রাষ্ট্রদূতকে তলব করিলাম। আমাদের সন্দেহের কথা তাঁকে বলিলাম। সব শুনিয়া রাষ্ট্রদূত নিজের সরকারের সাথে আলোচনা করিবার সময় নিলেন। কয়েকদিন পরে আসিয়া বলিলেনঃ 'বেশ, তবে আমরা পাকিস্তানে অর্জিত সব টাকাই বছর–বছর খরচ করিয়া ফেলিব। কোনও টাকা জমা রাখিতে পারিব না ; বছর–শেষে যদি কোনও টাকা অব্যয়িত থাকে, তবে তা পাকিস্তান সরকার বাযেয়াফ্ত করিতে পারিবেন।'

এবার আমার সরল মনও সন্দিগ্ধ হইল। এঁরা আমাদের এত ভাল করিতে চান কেন? কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও সন্দেহের কিছু পাইলাম না। প্রধানমন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া সর্বশেষ প্রস্তাবটা তাঁকে শুনাইলাম। তিনি উচ্চ হাসিতে ছাত ফাটাইয়া বলিলেন ঃ 'সন্দেহ আরও গাঢ় হইয়াছে। তবে চল প্রেসিডেন্টের মতটাও জানা দরকার।' যা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাই হইল। প্রধান মন্ত্রী যা–যা আশংকা করিয়াছিলেন, প্রেসিডেন্টও ঠিক সেই সব সন্দেহই করিলেন। আমি যত তর্ক করিলাম, যত বলিলাম, এমন সোজা খরিদ–বিক্রির দ্বারা কমিউনিস্টরা আমাদের কি কি অনিষ্ট করিতে পারে, একটা অন্ততঃ দেখাইয়া দেন। একটাও তিনি দেখাইতে পারিলেন না। অথচ একটু নরমও হইলেন না। বরঞ্চ পাল্টা প্রশ্ন করিলেন ঃ 'তুমিই বা কমিউনিস্ট দেশসমূহের সংগে বাণিজ্য করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?'

প্রধানমন্ত্রীর চোখ-ইশারায় আমি বিরত হইলাম। আর তর্ক করিলাম না। তবু প্রেসিডেন্ট আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন ওদিকে যেন আমি পা না বাড়াই।

আমার মনটা খারাপ হইল। এসব ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের কাছে জিগ্‌গাস করিতে গেলাম কেন? তাঁর কি এলাকা আছে এ ব্যাপারে? প্রধানমন্ত্রী না বলিলে আমি যাইতামও না তাঁর কাছে। প্রধানমন্ত্রীই বা গেলেন কেন গলা বাড়াইয়া প্রেসিডেন্টের সম্মতি লইতে?

কিছু দিনের মধ্যেই কারণ বুঝিলাম। প্রধানমন্ত্রী ঠিকই করিয়াছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্টের সম্মতি চাহিয়াছিলেন প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য নয়, রিপাবলিকান সহকর্মীদের সম্মতি লইতে। কয়েক দিনের মধ্যেই রিপাবলিকান মন্ত্রীদের এক-একজন করিয়া অনেকেই আমাকে জিগ্‌গাস করিতে লাগিলেন, আমি নাকি রুশিয়ার কাছে পাকিস্তান মর্গেজ দিবার প্রস্তাব করিয়াছি? সুবিধা-জনক বার্তার বাণিজ্যের কি কদর্থ?

রিপাবলিকান ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে বাস্তববাদী ছিলেন অর্থ-ওযির সৈয়দ আমজাদ আলী। তাঁর কাছে আগে না বলিয়া প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়াটাই ভুল হইয়াছে। অতএব এর পর আমি আমজাদ আলীর পিছনে লাগিলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট দেশসমূহে একটি বাণিজ্য মিশন পাঠাইতে রাযী হইলেন। তবে বলিলেন তাতেও প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর অগ্রিম সম্মতি লওয়া দরকার।

আমি অতঃপর মিঃ আযিয আহ্‌মদের সাথে ব্যাপারটা আগাগোড়া ঢালিয়া বিচার করিলাম। বাণিজ্য-মিশনের আইডিয়াটা তিনি খুব পসন্দ করিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই মিশনের নেতৃত্ব করিতেও তিনি সম্মত হইলেন। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ-সফর কালে তাঁর এ্যাকটিনি করিবার সময় কেবিনেট মিটিং ডাকিয়া দিলাম। প্রেসিডেন্টও তখন নাথিয়াগলিতে বিশ্রাম করিতেছেন। আমজাদ আলী ও আযিয আহমদ আমার পক্ষে। কাজেই কোনও চিন্তা নাই। আযিয আহ্‌মদের সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান হইতে চারজন করিয়া আট জন প্রতিনিধির দল করা হইল। মিঃ আযিয আহমদ প্রতিনিধি দলের নেতা হইলেন। শেষ দিনে আমি মিঃ আযিয আহমদের উপরও একটা সারপ্রাইয নিক্ষেপ করিলাম। সাপ্লাই এন্ড ডিভেলপমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ বি. এ. কোরায়শীকে টেকনিক্যাল এডভাইযার হিসাবে ডেলিগেশনের সাথে জুড়িয়া দিলাম। তিনি ডেলিগেশনের মেম্বরের সমমর্যাদাসম্পন্ন হইবেন বলিয়া লিখিত আদেশ দিলাম।

এটা ছিল মিঃ কোরায়শীর সাথে আমার গোপন ষড়যন্ত্র। কোরায়শীকে আমি নিজ পুত্রের মত স্নেহ ও বিশ্বাস করিতাম। তিনিও আমাকে আপন পিতার মতই ভক্তি করিতেন এবং লোকের কাছে আমার তারিফ করিয়া বেড়াইতেন। পক্ষান্তরে মিঃ

আযিয আহমদের যোগ্যতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে আমার বিশেষ আস্থা ছিল বটে কিন্তু কমিউনিস্ট দেশ সমূহের ব্যাপারে তাঁর বিচার–বিবেচনার নিরপেক্ষতার প্রতি আমার ততটা আস্থা ছিল না। ওদের বিরুদ্ধে মিঃ আযিয আহ্‌মদ বায়াসৃড্ বলিয়াই তখনও আমার বিশ্বাস। সেজন্য কয়েকদিন আগেই আমি মিঃ কোরায়েশীকে গোপনে ডাকিয়া মনের কথটা বলিয়াছিলাম। বলিলামঃ ডেলিগেশনের নেতা হিসাবে মিঃ আযিয আহমদ যে রিপোর্ট দিবেন কোরায়শী সে রিপোর্ট–নির্বিশেষে একটি বিশেষ ও সিক্রেট রিপোর্ট আমার কাছে কনফিডেনশিয়ালি দাখিল করিবেন। কোরায়শীকে প্রকারান্তরে বুঝাইয়া আযিয আহমদের রিপোর্ট নিরপেক্ষ হইবে না বলিয়া আমি সন্দেহ করি। সেজন্য এবিষয়ে নীতি নির্ধাণের ভিত্তিরূপে কোরায়শীর রিপোর্টের উপর নির্ভর করিতে চাই। কাজেই কোরায়শীর দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর।

'দোওয়া করিবেন যেন আপনার আস্থার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি।' এই বলিয়া কোরায়শী সালাম করিয়া বিদায় লইলেন। যথাসময়ে বাণিজ্য মিশন বাহির হইয়া গেল।

মোট পাঁচ ছয়টি দেশ সফর করিবার কথা। দুইটি বাকী থাকিতেই বাণিজ্য মিশন পিছনে ফেলিয়া কোরায়শী একাই দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই আমার সাথে দেখা করিলেন। বলিলেন ঃ মিঃ আযিয আহ্‌মদ তাঁর গোয়েন্দাগিরি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তিন চার দেশের সফর শেষ করিয়াই তিনি কোরায়শীকে একদিন গোপনে বলেনঃ 'অনারেবল মিনিস্টার তোমাকে যে উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন, তার আর দরকার নাই। তোমাকে আর কোনও সিক্রেট রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে না। আমার রিপোর্টই তাঁর মনোমত হইবে। দেশে দরকারী কাজ থাকিলে তুমি এখনই দেশে ফিরিয়া যাইতে পার। গিয়া অনারেবল মিনিস্টারকে বলিও, তোমার রিপোর্টটা আমিই লিখিতেছি।'

কিরূপে মিঃ আযিয আহ্‌মদ অমন গোপনীয় বিষয়টা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, কোরায়শী ও আমি অনেকক্ষণ মাথা খাটাইয়াও তা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ফলে উভয়েই একমত হইলাম ঃ ধন্য মিঃ আযিয আহ্‌মেদের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি।

সত্যই মিঃ আযিয আহ্‌মদ আমার মনের মত রিপোর্টই দিয়াছিলেন। কিন্তু মিশন দেশে ফিরিবার আগেই আমাদের মন্ত্রিত্ব গিয়াছিল। কাজেই রিপোর্টটা আমার হাতে আসে নাই। আসিয়াছিল আমার পরবর্তীর কাছে। তিনি অমন কমিউনিস্ট ধরনের রিপোর্টটা হজম করিতে পারেন নাই। সেজন্য সেটা পেশ করেন প্রেসিডেন্টের কাছে। প্রেসিডেন্ট অগ্নিশর্মা হন এবং রিপোর্ট বদলাইয়া দিতে মিঃ আযিয আহ্‌মদকে অনুরোধ করেন। তিনি প্রেসিডেন্টের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হন। এই লইয়া করাচির রাজনৈতিক মহলে এবং খবরের কাগযের সার্কেলে খুব হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কিন্তু

আযিয আহ্মদ স্বমতে অটল থাকেন। বাধ্য হইয়া তৎকালিন মন্ত্রিসভা ঐ রিপোর্ট চাপা দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে মার্শাল লর আমলে এবং তারও পরে মিঃ আযিয আহ্মদের রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাদের বাণিজ্য-নীতির যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে।

৯. সেকান্দরী খেল

কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিলাম, প্রেসিডেন্ট মির্যা যেন কোনও নতুন খেলা শুরু করিয়াছেন। তিনি কথায়-কথায় আমার কাছে প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা করেন। তিনি ইতিমধ্যে ইরান লেবানন তুরস্ক গিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর 'কেলেংকারি'র জন্য আর কান পাতা যায় না। আমেরিকা হইতে তিনি অনুরূপ রিপোর্ট পাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীকে হুশিয়ার করা আমাদের উচিৎ। যেন কত সাধু, মহৎ হিতৈষী ব্যক্তি শহীদ সাহেব ও ঐ সংগে আমাদের কল্যাণ-চিন্তায় ঘুমাইতে পারিতেছেন না। ভাবখানা এই। আমি প্রেসিডেন্টের এই মতি পরিবর্তনের কারণ খুঁজিতে লাগিলাম। তিনি আমার ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্যই যেন সবচেয়ে অধীর। আমাকে তিনি বুদ্ধিমান হইবার উপদেশ দিলেন। পাগলামি ছাড়। শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের সাথে ঝগড়া করা আহাম্মকি। ওযারতি স্থায়ী জিনিস নয়। আজ আছে কাল নাই। 'যে কয়দিন আছ আপনা কাম বানা লো। সবকুই বানায়া। আয়েন্দা ভি সবকুই বানায়েগা।' আমার মনে পড়িত বিভিন্ন লোকের জন্য তাঁর স্লিপগুলির কথা। আমি হাসিয়া বলিতাম ঃ 'হামকো মাফ কিজিয়ে স্যার' আমার স্ত্রীকে তিনি আমার সামনেই বলিতেন ঃ 'বেগম সাব, এ পাগলগো আপ সামালিয়ে।'

আমার মনে পড়িল প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রেসিডেন্টের রাগের কারণটা। প্রধানমন্ত্রী যথাসম্ভব শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন দিতে চান। প্রেসিডেন্ট নানা যুক্তিতে তাড়াহুড়া না করার উপদেশ দেন। আর তাঁর হাতের পুতুল চিফ ইলেকশন কমিশনার মিঃ এফ. এম. খাঁকে দিয়া প্রধানমন্ত্রীর সব নির্দেশ ভণ্ডুল করিয়া দেন। ভোটার তালিকা ছাপা ও ব্যালট বাক্স তৈয়ারির অসুবিধার সব যুক্তি আমরা কাজের দ্বারা খণ্ডন করিয়াছি। তবু যখন চিফ ইলেকশন কমিশনার কেবিনেটের সব সিদ্ধান্তে আপত্তি করিতে থাকিলেন, তখন তাঁকে একদিন কেবিনেট সভার মধ্যেই ডাকা হইল। দুই-এক কথার পরেই তিনি স্পষ্ট বলিয়া বসিলেন ঃ 'আমি প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কারো এলাকাধীন নই।' কথাটা আংশিক সত্য। তিনি প্রেসিডেন্টের নিজস্ব নিয়োজিত ব্যক্তি ঠিকই। কিন্তু সেই জোরে সাধারণ নির্বাচন ঠেকাইয়া রাখিবেন এমন অধিকার তাঁর নাই। কিন্তু আমরা জানিতাম, তাঁর এই দুঃসাহসিক আচরণের হেতু কি? কাজেই প্রেসিডেন্টের অভিপ্রায় মত প্রথমে আমি ওয়াদা করিলাম, আগামী নির্বাচনে মির্যাকেই আমরা প্রেসিডেন্ট করিব। আতাউর রহমান ও মুজিবুর রহমানকে দিয়াও এমনি ওয়াদা করাইলাম। পূর্ব-পাকিস্তানী সব কয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দিয়াও এই একই আশ্বাস দেওয়াইলাম।

সকলের ওয়াদা পাইবার পর তিনি যিদ ধরিলেন শহীদ সাহেবকে দিয়া এই ওয়াদা করাইতে হইবে। শহীদ সাহেব স্বভাবতঃ এই ধরনের ওয়াদা করার বিরোধী। প্রথম প্রথম কিছুতেই তিনি এতে রাযী হইলেন না। অবশেষে আমাদের সকলের পীড়াপীড়ি অনুনয়-বিনয়ের ফলে তিনি একদিন গোপনে প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করিলেন। উভয়েই সে আলাপে সন্তুষ্ট বলিয়া মনে হইল। ঐ ঘটনার কয়েকদিন মধ্যেই মির্যা সাহেব পরিষ্কাররূপে 'নিউইয়র্ক টাইমসের' প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেনঃ 'প্রধানমন্ত্রী ও আমি কদাচ পরস্পরকে ছাড়িব না। শহীদ সাহেবের মত যোগ্য লোক পাকিস্তানে আর হয় নাই।'

এরপর প্রধানমন্ত্রী শেষোক্ত লম্বা টুওরে বিদেশ গেলেন। লণ্ডন বিমান-বন্দরে রিপোর্টারদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছিলেনঃ 'আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আমি দুইজন লোকের কথা ভাবিতেছি।' এই সংবাদটি পড়িয়াই প্রেসিডেন্ট সকাল বেলা আমাকে ডাকিলেন। আমি যাইতেই কাগযটি আমার হাতে দিয়া বলিলেনঃ 'এই দেখ তোমার নেতার কাণ্ড।' আমি অবশ্য ঐ সংবাদের নানারূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোনটাই তাঁর পছন্দ হইল না। তিনি বলিলেনঃ 'দুই জনের কথা বলিয়াছেন আমাকে ধাপ্পা দিবার জন্য। আসলে তিনি গুরমানীকেই প্রেসিডেন্ট করা স্থির করিয়াছেন।' এই গুরমানী ফোবিয়ায় তাঁকে বহু আগেই পাইয়াছে। আগেও আমরা যে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তা সবই এই গুরমানীর বিরুদ্ধেই। তবু প্রধানমন্ত্রীর লণ্ডনের এই উক্তিটা আমাদের আগের সব প্রতিশ্রুতি নস্যাৎ করিয়া দিল। আমি এই বলিয়া বিদায় হইলাম যে, প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরার পর তাঁর সাথে এক মিনিট আলাপ করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এবার শহীদ সাহেব সফর হইতে ফিরিয়া এই ব্যাপারে মির্যাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস এই কারণেই প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই নিন্দা-কুৎসা প্রচার শুরু করিয়াছেন। এই সব কথা লিডারের কানে তুলিব-তুলিব ভাবিতেছি, এমন সময় একদিন প্রথমে ফিরোয খা নুন এবং পরে প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুনিলাম, প্রেসিডেন্ট আমার বিরুদ্ধে সাংঘাতিক কুৎসা করিয়া বেড়াইতেছেন। শুনিলাম তাঁদের উভয়ের কাছে পৃথক-পৃথক ভাবে বলিয়াছেনঃ কোনও এক বিদেশী প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি বলিয়াছি ঃ পূর্ব-পাকিস্তানকে আমি স্বাধীন রাষ্ট্র করিতে চাই। যে বিদেশী প্রধানমন্ত্রীর কথা তিনি বলিলেন, মাত্র মাসখানেক আগে তিনি পাকিস্তান সফর করিতে আসিয়াছিলেন। এ্যাকটিং প্রাইম-মিনিস্টার হিসাবে স্বভাবতঃই আমাকেই তাঁর অভ্যর্থনা-অভিনন্দন দিতে হইয়াছে। তাঁকে করাচির পার্শ্ববর্তী শিল্প-এলাকা-বন্দরাদি দর্শনীয় জিনিস আমাকেই দেখাইতে হইয়াছে। প্রথম-প্রথম আমার সহিত তাঁর খুবই বনিয়াছিল। আলাপ করিয়াছি অনেক ধরনের। কিন্তু ঐ বিশেষ ধরনের

২৬—

কথা বলিবার কোনও কারণ বা সুযোগ ঘটে নাই। সব আলাপ হইয়াছে উভয় দেশের অফিসারদের সামনে তাঁদের উপস্থিতিতে। দুইজনে একা আলাপ করিবার প্রথম সুযোগেই ভদ্রলোকের প্রতি আমার ধারণা এমন খারাপ হইয়া যায় যে পরবর্তী সময়টা তাঁর সাথে কোনও সিরিয়াস আলাপ করিতে আমার মন চায় নাই। ঘটনাটা এইঃ একটা বড় কাপড়ের মিল পরিদর্শন করিতে গিয়াছি। এক-এক রকমের বিভিন্ন ডিযাইন ও রং-এর কাপড়ের স্টলে যাই, আর আমাদের মাননীয় মেহমান বলেন ঃ 'এর কাপড়টা আমার খুব পসন্দ হইয়াছে, ঐ কাপড়টা আমার বেগম সাহেবা খুব পসন্দ করিবেন।' আর মিল-মালিক মেহমানের কথায় সংগে সংগে প্রত্যেক শ্রেণীর রং ও ডিযাইনের কাপড় দুই প্রস্থ করিয়া প্যাক করিতে বলেন। মিল-মালিক যত বলেনঃ প্যাক কর, মাননীয় মেহমান তত বলেন ঃ 'এটা আমার খুব পছন্দের। ওটা আমার বেগমের পসন্দের।' বেগম সাহেবা কিন্তু তাঁর সংগে আসেন নাই। নিজের দেশেই আছেন। তবু মাননীয় মেহমান নিজের ও বেগমের নামে বিদেশে অত-অত কাপড় পসন্দ করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম পসন্দ সাহেবেরই হউক, বেগম সাহেবেরই হউক, উভয় পসন্দেরই দুই দুই প্রস্ত কাপড়ের দুইটা বিশাল-বিশাল প্যাকেট করা হইতেছে সাহেব ও বেগমের জন্যই। আমি লজ্জায় মরিতে লাগিলাম। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীরা বিদেশে গিয়া এমন স্তূপাকার জিনিস পসন্দ করিয়া আনেন, এমন কথা কখনো শুনি নাই। আর কোনও বিদেশী প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এই অনভিজ্ঞতার দরুনই বোধ হয় আমি মেহমান সাহেবের এই ধুছিয়া পসন্দ করিবার কাজটা পসন্দ করিতেছিলাম না। ভদ্রলোকের চরিত্র সম্বন্ধেই আমার ধারণা ছোট হইয়া গেল। মনের ভাব মুখে লুকাইবার ব্যাপারে আমি কোনও দিনই বিশেষ দক্ষ ছিলাম না। এবারেও বোধ হয় তাই হইল। ভদ্রলোক বোধ হয় আমার বিরক্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই এর পর দুই এক বার মালিকের 'প্যাকেট কর' আদেশের জবাবে তিনি বলেন ঃ 'থাক, আর দরকার নাই।' মিল-মালিক বোধ হয় নিজেই ইতিমধ্যে মেহমানের অসাধারণ লোভ দেখিয়া উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ঐ 'থাক থাক, আর দরকার নাই' এর জবাবে যেন যিদ করিয়াই বলিলেনঃ 'আপনার দরকার না থাকিলেও আমার দরকার আছে। আপনে আমাদের সম্মানিত মেহমান ত!'

পরিদর্শন শেষে গেটে আসিয়া যা দেখিলাম তাতে আমার তালু জিভ লাগিয়া গেল। দুইটা ট্রাক কাপড়ের বড় বড় প্যাকেটে আধ-বুঝাই।

আমি বোধ হয় রসিকতার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলাম ঃ বেগম সাহেবা ও সাহেবের কাপড়গুলির জায়গা এক ট্রাকেই হইত। দুইটায় দেওয়াটাকি কোন বিশেষ কারণ আছে?'

আমার রসিকতার জবাবে মিল–মালিক বলিলেন ঃ 'মেহমান ও তাঁর বেগমের কাপড় এক ট্রাকেই দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ট্রাকের কাপড় মেহমানের নয়, আপনার।'

আমি বিস্মিত হইলাম। রাগ সামলাইতে পারিলাম না। বলিলাম ঃ 'আমাকে কাপড় কেন? আমি কি মেহমান? আমি এ কাপড় নিব না। ট্রাক হইতে মাল নামাইয়া ফেলুন।'

মিল–মালিক অনেক চাপাচাপি করিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে মেহমানও সে অনুরোধে যোগ দিলেন। বলিলেনঃ 'আপনি না নিলে আমিও নিতে পারি না।'

মনে–মনে বলিলামঃ 'না নিলেই ভাল করিতেন।' মুখে বলিলাম ঃ 'না না আপনার কেস ও আমার কেস সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি মেহমান আর আমি এঁদের মন্ত্রী।'

শেষ পর্যন্ত আমার যিদ বজায় রাখিলাম। আমাদের সামনেই ট্রাক হইতে 'আমার কাপড়গুলি' নামাইয়া রাখা হইল। তারপর আমরা আমাদের গাড়ি ছাড়িবার হুকুম দিলাম। স্পষ্ট দেখিলাম, মেহমানের মুখখানা কালা যহর হইয়া গিয়াছে।

এমনি লোকের সাথে গিয়াছিলাম আমি পূর্ব–পাকিস্তান স্বাধীন করিবার পরামর্শ করিতে। এটা মির্যার নিজস্ব বানান কথা। বরঞ্চ খোদ মির্যার কাছে আলাপে–আলাপে আমি দুই–একবার লাহোর প্রস্তাবের আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং বহুবচনের 'এস' হরফটা বাদ দেওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছি। হয়ত সেটাকেই বুনিয়াদ করিয়া তিনি এই কাহিনী তৈয়ার করিয়াছেন। সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল, মির্যা কোনও প্ল্যান করিতেছেন।

এমন সময় করাচি চেম্বার–অব–কমার্সের আমাদের হিতাকাংখী একজন মেম্বর আমাকে জানাইলেন, প্রেসিডেন্ট হাউসে বসিয়া শিল্পী–বণিকরা আমার বিরুদ্ধে জোট পাকাইতেছেন। অতঃপর বন্ধুবর মাঝে–মাঝেই এইরূপ খবর দিতেন। বলিতেন আমার কার্যকলাপে তাঁরা আগে হইতেই আমার উপর ক্ষেপা ছিলেন। মার্কিন সাহায্যের চার কোটি টাকা পূর্ব–পাকিস্তানে নিয়া যাওয়ায় তাঁরা রাগে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

১০. লাইসেন্সের বিনিময়ে পার্টি–ফণ্ড

বন্ধুবরের খবর ক্রমেই সত্য প্রমাণিত হইতে শুরু করিল। ঝট পট কয়েকখানা ইংরাজী সাপ্তাহিক বাহির হইল। তাতেই নানা ঢংগে প্রচার শুরু হইল ঃ চার কোটি বিদেশী মুদ্রা এ্যাবযর্ব করিবার মত মূলধন পূর্ব পাকিস্তানীদের নাই। কাজেই চার কোটি

টাকার লাইসেন্স পাইয়া পূর্ব পাকিস্তানীরা সব লাইসেন্সই বিদেশীদের কাছে বেচিয়া ফেলিবে। এই বিক্রয়টা যদি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিকট হইত, তা হইলে অবশ্য বলিবার বিশেষ কিছু থাকিত না। কিন্তু বিপদ এই যে পূর্ব পাকিস্তানীরা ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের নিকট বেশী দামে লাইসেন্স বেচিয়া ফেলিবে।

এই যুক্তিটাই একটু প্রসারিত করিয়া বলা হইল যে আওয়ামী লীগেরই যখন গভর্ণমেন্ট তখন সব লাইসেন্সই আওয়ামী লীগারদের মধ্যে বিতরিত হইবে। কিন্তু আওয়ামী লীগারদের মধ্যে কোনও ধনী লোক নাই। কাজেই লাইসেন্স বিক্রয় করিয়া তারা অনেক টাকা পাইবে। এই টাকা দিয়া তারা আগামী ইলেকশনে লড়িবে। সুতরাং আমদানি লাইসেন্স বিক্রয় করিয়া আওয়ামী লীগাররা পার্টি-ফণ্ড তুলিবে। 'তুলিবে'টা অল্প দিনেই 'তুলিতেছে' ও পরে 'তুলিয়াছে' হইয়া গেল লাইসেন্স ইশু হইবার অনেক আগেই। শুধু ঐ সব সাপ্তাহিক কাগযের রিপোর্টার-সম্পাদকরাই এ ধরনের কথা বলিলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদেরও কেউ-কেউ এই ধরনের বক্রোক্তি করিতে লাগিলেন।

তখন আমি চাটগাঁ টুওর করিতেছি। কাগযে পড়িলাম রিপাবলিকান দলের কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ খান সাহেব এক জনসভায় বলিয়াছেনঃ 'মন্ত্রীরা লাইসেন্স বিক্রয় করিয়া পার্টি-ফণ্ড তুলিতেছেন।' করাচি ফিরিয়া প্রথম সাক্ষাতেই ডাঃ খান সাহেবকে ওটা জিগ্‌গাস করিলাম। তিনি দৃঢ়তার সংগে অস্বীকার করিলেন। ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেনঃ করাচির এক রিপাবলিকান জনসভায় শ্রোতাদের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইয়াছিল পার্টি-ফণ্ডের কি হইবে? তহবিল ছাড়া ত কাজ করা যায় না। তারই উত্তরে ডাঃ খান সাহেব বলিয়াছেন ঃ 'যার-তার পার্টি-ফণ্ড নিজেরা করিয়া লউন। আমি ত আর লাইসেন্স বিক্রয় করিয়া পার্টি-ফণ্ড তুলিতে পারি না।' এটাকেই খবরের কাগযওয়ালারা ব্যাংগোক্তি মনে করিয়াছেন। তাঁর বক্তৃতা এত স্পষ্ট ছিল যে ওটাকে ভুল বুঝিবার কোনও উপায় ছিল না। মুসলিম-লীগাররা আমাদের বিরুদ্ধে কত কথা বলিবে, তাতে চঞ্চল হইবার কিছুই নাই। ডাঃ সাহেব এই প্রসংগে আফসোস করিলেনঃ 'পূর্ব-পাকিস্তানে তবু তোমাদের নিজের একখানা খবরের কাগয আছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ত সবই মুসলিম লীগের।'

ডাঃ খান সাহেবের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না। তিনি সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার বা ব্যক্তিগতভাবে আমার অপসারণ চান, এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু ছিল না।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট মির্যা নতুন ফেঁকড়া বাহির করিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ 'দেখ আবুল মনসুর, শহীদের সাথে আমার গরমিল হওয়ার কোনও কারণ নাই। শুধু তাঁর ঐ প্রিন্সিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি আফতাব আহমদটাই

যত অনিষ্টের মূল। সে আসলে গুরমানীর লোক। তাকে প্রধানমন্ত্রীর দফতর হইতে তাড়াও। সব লেঠা চুকিয়া যাইবে। অন্যথায় আমাদের মধ্যেকার অশান্তি দূর হইবে না। কারণ সে প্রধানমন্ত্রীকে সব সময় কুবুদ্ধি দেয়। প্রধানমন্ত্রী তার পরামর্শেই চলেন।'

লিডারের মত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি লোককে কেউ কুবুদ্ধি দিয়া বিপথগামী করিতে পারে, বিশেষতঃ আফতাব আহমদের মত লোক। এটা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট যেরূপ অনাবশ্যক দৃঢ়তা দেখাইলেন তাতে আমি তাঁর কথা উড়াইয়াও দিতে পারিলাম না। কারণ গত কিছুদিন হইতে বাজারে খুব জোর গুজব রটিতেছিল যে সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন। প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান ও মুসলিম লীগ পার্টির মধ্যে আপোস করাইয়া দিয়া সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার বদলে মুসলিম লীগ গবর্নমেন্ট গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কথাটা লিডার ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেও আমি তা পারিলাম না। মির্যাই মুসলিম লীগ দল ভাংগিয়া রিপাবলিকান দল করিয়াছিলেন। সেটা আবার জোড়া দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নাও হইতে পারে। আমি আফতাব আহমদের কথাটা অতি সাবধানে তুলিলাম। তাঁকে সরাইয়া প্রেসিডেন্টকে খুশী রাখিতে দোষ কি? আফতাব আহমদকে আপাততঃ একটা ভাল পদ দিয়া অন্যত্র পাঠাইলে আফতাবের তাতে আপত্তি হইবে না। কারণ তিনি সত্য সত্যই লিডারের ভক্ত ও হিতৈষী।

লিডার রাযী হইলেন না। তিনি আমাকে বুঝাইলেন : 'ওটা আসলে আফতাব আহমদকে সরাইবার দাবি নয়। ওটা ছুরির ধারাল দিকঃ থিন এণ্ড অব দি এইজ।' এই দিনই লিডার আমাকে ঈশারায় জানাইলেন, আমার হাত হইতে শিল্প-বাণিজ্য দফতর নিয়া কোনও পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রীকে দেওয়াই মির্যার পরিণামের দাবি। আমি তখন বলিলামঃ মির্যাকে হাতে রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে আমার দফতর ত দফতর আমাকেই তাঁর সরাইয়া দেওয়া উচিৎ। কারণ যুক্ত-নির্বাচন প্রথায় সাধারণ নির্বাচনের জন্য তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব অপরিহার্য। লিডার জবাবে বলিলেনঃ এটা প্রিন্সিপালের কথাও বটে। প্রধানমন্ত্রী কাকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিবেন, প্রেসিডেন্ট তাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এটা মানিয়া নিলে ইতিহাস তাঁকে মাফ করিবে না। লিডার তাঁর পনে অটল থাকিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই দিককার অনমনীয়তায় মির্যা অন্য দিকে শক্ত হইলেন। তিনি রিপাবলিকান পার্টির অধিকাংশকে দিয়া দাবি উঠাইলেন গবর্নর গুরমানীকে সরাইতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের রুলিং পার্টি প্রাদেশিক রিপাবলিকান পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি করিলেন যে গুরমানী গবর্নর থাকিলে মন্ত্রিসভার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালান অসম্ভব।

আমরা সকলেই বুঝিলাম, মির্যাই এই দাবির গোড়ায় আছেন। আফতাব আহমদকে সরাইতে না পারিয়া তিনি একেবারে মূলোচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু জানিয়া-বুঝিয়াও কিছু করিবার উপায় ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নিজের দায়িত্বে কিছু করিতে রাযী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কেবিনেটে দিলেন। রিপাবলিকানদের ভয় ছিল আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা কেহ তাঁদেরে সমর্থন করিবেন না। কিন্তু কেবিনেট মিটিং-এ আমিই এ বিষয়ে প্রথম কথা বলিলাম এবং গুরমানীকে অপসারণের প্রস্তাব সমর্থন করিলাম। আমার যুক্তি ছিল শাসনতান্ত্রিক। পার্লামেন্টারি শাসন-ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্নরকে অবশ্যই মন্ত্রিসভার আস্থাভাজন হইতে হইবে। এর পরে এ বিষয়ে একমাত্র সর্দার আমিরে আযম ছাড়া আর কেউ বিরুদ্ধতা করিলেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত এই ইশুতে পদত্যাগই করিলেন। কারণ তিনি গুরমানীর একজন খাঁটি অনুরক্ত লোক ছিলেন। যা হোক গুরমানী সাহেবকে অপসারণের প্রস্তাব প্রায় সর্ব-সম্মতরূপে গৃহীত হইল। আমার সমর্থনের অর্থ রিপাবলিকান বন্ধুরা এই করিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর গোপন ইংগিতেই আমি এটা করিয়াছি। তাতে লাভই হইল। রিপাবলিকান বন্ধুরা লিডারের উপর আস্থাবান হইয়া উঠিলেন।

শান্তিতেই দিন কাটিতে লাগিল। গুজব শান্ত হইল।

সাতাইশা অধ্যায়

ওয়ারতি লস্ট

১. সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার বিপদ

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসের শেষদিকে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল **আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়।** আওয়ামী লীগ পার্টির দলত্যাগী কতিপয় সদস্য, গণতন্ত্রী **দলের কয়েকজন** এবং বামপন্থী হিন্দু সদস্যদের কতিপয় লইয়া আইন-পরিষদের **মধ্যেও জন-ত্রিশেক সদস্যের** ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হইল। এঁদের সকলেই **আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার সমর্থক** ছিলেন। আওয়ামী লীগের সহিত ঝগড়া করিয়া **মওলানা ভাসানী** এই নূতন দল করায় এই দল সরকার-বিরোধী হইবে, স্বভাবতঃই **লোকের মনে এই আশংকা** হইল। ন্যাশনাল এসেম্রির একজন আওয়ামী সদস্য এই **নতুন দলে যোগ** দেওয়ায় কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগ অন্ততঃ এক ভোটে দুর্বল হইল, এটাও **লোকজনের** চোখ এড়াইল না। জুন মাসের শেষ দিক হইতেই কেন্দ্রে শহীদ **মন্ত্রিসভার পতনের গুজব** কোথা হইতে যেন রটান হইতেছিল। আওয়ামী লীগের এই **ভাংগনে এবং** আইন-সভায় আওয়ামী লীগের শক্তি হ্রাসের ফলে এই গুজবে আরও **ইন্ধন যোগান হইল।** অনেকগুলি উপ-নির্বাচন সামনে লইয়াই মওলানা ভাসানী **আওয়ামী লীগকে এই** আঘাত করিয়াছিলেন। তার কয়েকটিতে মওলানা নিজস্ব প্রার্থী **খাড়া করিয়া** আওয়ামী লীগের মোকাবিলাও করিলেন। কিন্তু সব কয়টিতে আওয়ামী **লীগ জিতিল। কাজেই** আইন সভার বাহিরে আপাততঃ কোনও বিপদ নাই, আমাদের **এবং লোকজনেরও** এই আশা হইল। কিন্তু মন্ত্রিসভার বিপদ ঘটে নাই। বিশেষতঃ **কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার** বিপদ।

সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনে আর কোনও ক্ষতি না হউক যুক্ত নির্বাচন-প্রথার **ভিত্তিতে আসন্ন সাধারণ** নির্বাচন বানচাল হইবে এবং তাতে প্যারিটি-শৃংখলিত পূর্ব-**পাকিস্তানের সমূহ ক্ষতি হইবে,** একথা চিন্তা করিয়া পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ, বিশেষ **করিয়া কৃষক-শ্রমিক** পার্টির অধিক-সংখ্যক মেম্বর, বিচলিত হইলেন। হক সাহেব **তখন পূর্ব-পাকিস্তানের** গবর্নর। সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার শক্তিহ্রাস ও পতনের **সম্ভাবনায় তিনিও বিচলিত** হইলেন। শহীদ সাহেবের সহিত তাঁর বহুদিনের ব্যক্তিগত **শত্রুতার কথা ভুলিয়া** তিনি তাঁর কৃষক-শ্রমিক পার্টির মেম্বরদের শহীদ সাহেবের **সহিত আপোস করিবার** উপদেশ দিলেন। তাঁদের একদল প্রতিনিধি করাচি গিয়া

প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিলেন। সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার ও আওয়ামী লীগের আসন্ন বিপদের অতিরিক্ত সুযোগ লইয়া তাঁরা একটু বেশী দাম হাকিলেন। সাবেক যুক্তফ্রন্টের পযিশনে ফিরিয়া যাইবার দাবি করিলেন। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মুজিবুর রহমান ও আমি এই আলোচনায় শরিক ছিলাম। শহীদ সাহেব আশাতিরিক্ত কূটনৈতিক ভাষায় তাঁদেরে বিদায় করিলেন। তাঁর উপর মুজিবুর রহমান তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার না করায় তাঁরা স্বভাবতঃই রাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। আমি নিতান্ত বন্ধুভাবে তাঁদেরে তাঁদের চড়া দাবি ত্যাগ করিয়া বাস্তববাদী হইতে উপদেশ দিলাম। প্রতিনিধি দলের মধ্যে অ-মেম্বর আমার বিশেষ বন্ধু মিঃ রেযায়ে-করিমও ছিলেন। তিনি আমার কথার মর্ম বুঝিলেন। ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এই আপোস-ফরমূলার অনুমোদন চাহিলেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টির মধ্যে ভাংগন আসিল। জনাব আবু হোসেন সরকারকে অপসারিত করিয়া তাঁর স্থলে মিঃ সৈয়দ আযিযুল হককে (নান্না মিয়া) পার্টির নয়া লিডার করা হইল। আওয়ামী লীগের সহিত আপোস বিরোধীরা সরকার সাহেবের নেতৃত্বে আলাদা পার্টি করিলেন।

২. আত্মরক্ষার চেষ্টা

এরপর আওয়ামী লীগ পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ-আলোচনা চালান হইল। লিডারের অনুমতিক্রমে আমি ঢাকা আসিলাম। আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান, মানিক মিয়া ও আমি সকলেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিলাম। মানিক মিয়া ও আমি চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত থাকিলাম। বন্ধু রেযায়ে-করিমের বাড়িতে রোজ রাত্রে আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতারা বিশেষতঃ নান্না মিয়া ও মোহন মিয়া প্রশংসনীয় বাস্তব-বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। একরূপ বিনা-শর্তে তাঁরা আওয়ামী লীগ কোয়েলিশনে যোগ দিতে রাযী হইলেন। কথা হইল লিডারের পছন্দমত কে. এস. পি.র দুই-একজনকে মন্ত্রী নিবেন। আগামী নির্বাচনে কৃষক-শ্রমিক পার্টি তাঁদের মনোনীত প্রার্থীর তালিকা লিডারের নিকট পেশ করিবেন। লিডারের সিলেকশনই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। এই কোয়েলিশনের ফলে এই মুহূর্তে অন্ততঃ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন (চল্লিশও হইতে পারে) মেম্বর আওয়ামী কোয়েলিশনে যোগ দিবেন। তাতে আতাউর রহমান সরকারের স্থায়িত্ব নিরাপদ হইবে। ন্যাপ দলের অনিশ্চিত সমর্থনের কোনও দরকারই থাকিবে না। অধিকন্তু আওয়ামী লীগ কোয়েলিশন নিরংকুশ মুসলিম মেজরিটির দল হইবে। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় এরও প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এই ভাবে সব ঠিক হইয়া যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় আসিলেন। গবর্নমেন্ট হাউসে উঠিলেন। তাঁর কাছে আমরা বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করিলাম। কিন্তু বলিলেনঃ 'কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে কোয়েলিশনে আনিয়া এটাকে নিরংকুশ মুসলিম মেজরিটির

দল করিতেছি দেখিয়া হিন্দু মেম্বররা ভুল না বুঝেন, সে জন্য তাঁদের মত লওয়া আমি উচিৎ মনে করি।' আমরা সোল্লাসে তাতে সায় দিলাম। কারণ আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনার গতি-ধারা সম্বন্ধে হিন্দু মন্ত্রীদেরে অবহিত করিয়া রাখিয়াছি। তাঁরা জানিতেন কৃষক শ্রমিক পার্টি আওয়ামী লীগের মতই সেকিউলারিস্ট দল। কাজেই তাঁদের কোন আপত্তি ছিল না। লিডার হিন্দুদের মধ্যে ধীরেন বাবু ও মনোরঞ্জন বাবুর সাথে আমাদের সামনেই আলোচনা করিলেন। তাঁরা সাগ্রহে এ ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন। তফসিলী হিন্দু মন্ত্রীদ্বয়ের মত আছে, তাও লিডারকে জানান হইল। তিনি প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমানকে বলিয়া দিলেনঃ 'সব ঠিক হইয়া গেল। এখন ব্যবস্থা কর।' 'ব্যবস্থা করার' মানে কবে-তক কাকে-কাকে মন্ত্রীর শপথ দেওয়া হইবে তার ব্যবস্থা কর, আমি এই কথাই বুঝিলাম। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতাদেরেও তাই বলিয়া দেওয়া হইল। নান্না মিয়ারা গবর্নমেন্ট হাউসের হক সাহেবের দখলে হাযিরই ছিলেন। তাঁরাও সুখবরটা গবর্নরকে দিতে গেলেন। প্রাইম মিনিস্টার সিলেট ও যশোহর ভ্রমণে গেলেন। আমরাও যার-তার কাজে গেলাম।

নির্ধারিত দিনে চিফ মিনিস্টারের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি মিঃ যমিরুদ্দিন আহমদের বাসায় বৈঠক বসিল। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতারা তাঁদের সংখ্যা শক্তির প্রমাণ স্বরূপ প্রায় ত্রিশজন মেম্বর লইয়া বৈঠকে উপস্থিত থাকিলেন। আমাদের পার্টির কারো মনে যদি কোনও দ্বিধা-সন্দেহ থাকিয়াও থাকে, তবে তাঁদের এই সংখ্যা-শক্তি প্রদর্শনের পরে তাঁদের দ্বিধা নিশ্চয় দূর হইবে এবং আজই কোয়েলিশন ঘোষণা ও ওঁদের মধ্য হইতে দুই-এক জন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করা হইবে, এ সম্পর্কে আমার নিজের এবং উপস্থিত অনেকের আর কোনও সন্দেহ থাকিল না। আমাদেরই মনের অবস্থা যখন এই, তখন কে. এস. পি. নেতাদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। আমরা সকলে গলা লম্বা ও কান খাড়া করিয়া প্রাইম মিনিস্টারের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

৩. চেষ্টা ব্যর্থ

প্রাইম মিনিস্টার আসিলেন। হাসিহীন গম্ভীর মুখে বসিলেন। এটা-ওটা দুই-এক কথা বলিলেন। তারপর বজ্রপাতের মত ঘোষণা করিলেন যে প্রস্তাবিত কোয়েলিশন আপাততঃ সম্ভব নয়। পাবলিকও এটা চায় না। তিনি নিজেও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, এটা উচিৎ হইবে না। প্রাইম মিনিস্টারের কথায় ফাইনালিটি মানে চূড়ান্তের সুর মালুম হইল। আমি বুঝিলাম ইতিমধ্যে প্রাইম মিনিস্টারকে অন্যরূপ বুঝাইতে কেউ সমর্থ হইয়াছেন। প্রাইম মিনিস্টার আমাদের সুপ্রিম নেতা। তাঁর অনিচ্ছায় কিছু হইবেও না। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে. এস. পি. র-ও আমাদের দলে

আসা উচিৎ নয়ঃ তাঁদের মর্যাদার দিক হইতেও না, আমাদের ঐক্য-সংহতির দিক হইতেও না। সুতরাং আমাদের এতদিনের চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইল। বুঝিলাম কে. এস. পি.র সাথে শুধু আপাততঃ নয়, ভবিষ্যতেও কোনও দিন কোয়েলিশন করার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল। কিন্তু এসবই আমাদের দিককার কথা। ওঁদের দিককার কথাও ত ভাবিতে হইবে। কে.এস. পি. নেতারা যে নিজেদের দল ভাংগিয়া আমাদের সাথে কোয়েলিশনে তাঁদের মেজরিটি মেম্বরকে রাযী করিয়াছেন, আজ যে তাঁরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মেম্বরকে একত্রে করিয়া আমাদের লিডারের সামনে হাযির করিতে পারিয়াছেন, তার একমাত্র সুস্পষ্ট কারণ এই যে তাঁরা নিজেদের সমর্থকদের কাছে প্রাইম মিনিস্টারের-দেওয়া নিশ্চিত 'পাকা কথা'ই জানাইয়াছেন। সুহরাওয়ার্দী একবার কথা দিলে তার আর ওদুল করেন না, এটা সবার স্বীকৃত সত্য। সেই বিশ্বাসেই ঐ মেম্বাররা আজ এখানে উপস্থিত। প্রাইম মিনিস্টার যে-সুরে ও যে-ধরনে কথাটা উড়াইয়া দিলেন, তাতে সকলেই বুঝিলেন তিনি কাকেও কোনও কথা দেন নাই পাকা কথা ত দূরের কথা। আমি কল্পনা-নেত্রে দেখিলাম, এখান হইতে বাহিরে গিয়াই কে· এস· পি· মেম্বরেরা তাঁদের নেতাদের ধরিবেন। বলিবেনঃ 'শহীদ সাহেব ত মিথ্যা বলিতে পারেন না। আপনারাই আমাদেরে ব্লাফ দিয়া এতদিন ঘুরাইয়াছেন। আজ এখানে আনিয়া অপমান করিয়াছেন।' অনুসারীদের আস্থা হারানো নেতাদের পক্ষে চরম শাস্তি। কে· এস· পি'র যে সব নেতা এতদিন আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিলেন, তাঁদেরে বন্ধুত্ব দিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু নিজেদের অনুসারীদের দিয়া তাঁদেরে অপমান করাইবার কোনও অধিকার আমাদের নাই। আমার বিবেক চিল্লাইয়া উঠিল : 'এঁদেরে অন্যায় অভিযোগ ও অনুচিত অপমান হইতে বাঁচাও।'

আমি আমার লিডারের আস্থা ও মন্ত্রিত্ব হারাইবার একটা রিস্ক নিলাম। প্রধানমন্ত্রীর ঐ ধরনের কথার প্রতিবাদে কেউ যখন কথা বলিলেন না, কে. এস. পি. নেতাদের যে কথা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও শুধু ভদ্রতার খাতিরে অথবা বিস্ময়ে বলিতে পারিলেন না, তখন সেই কথাটা বলিবার দায়িত্ব নিলাম আমি। আমি প্রধানমন্ত্রীর পাশ ঘেঁষিয়া বসিয়াছিলাম। সকলে আমার সরু গলা শুনিতে নাও পারেন সেই আশংকায় আমি ঐ বসা মজলিসেই দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম : 'তবে কি আমরা বুঝিব, প্রাইম মিনিস্টার তাঁর গত কয়দিনের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি হইতে সরিয়া গিয়াছেন? তিনি ইচ্ছা না করিলে কিছু হইবে না ঠিক, কিন্তু এটা সকলের জানা দরকার যে প্রাইম মিনিস্টার কে.এস.পি.র সাথে আপোস করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁর কথা-মতই আজ এঁরা এই বৈঠকে হাযির হইয়াছেন।' প্রধানমন্ত্রী আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন না? 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলিলেনও না। কিন্তু তাতেই আমার কাজ হইয়া

গেল। কৃষক-শ্রমিক নেতাদেরে তাঁদের সমর্থকদের হামলা হইতে বাঁচানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হইল। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী করাচি যাওয়ার জন্য বিমান বন্দরে রওয়ানা হইলেন। আমি বুঝিলাম, বিপদ আসন্ন।

৪. ইউনিট সম্পর্কে ভ্রান্ত নীতি

কয়েক মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের আরেক খপ্পরে পড়িলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশগুলির জনমত যাচাই না করিয়াই উহাদিগকে ভাংগিয়া এক প্রদেশ করা হইয়াছিল। কাজেই সেখানকার অসন্তোষ ছাই-চাপা আগুনের মত ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল। সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার আমলে যথেষ্ট দেওয়ানী আযাদির আবহাওয়া বিদ্যমান থাকায় ঐ ব্যাপারে প্রবল জনমত ফাটিয়া পড়িল। জনগণের চাপে আইন-পরিষদের মেম্বররাও এক ইউনিট ভাংগিয়া প্রদেশগুলির পুনঃ প্রবর্তনের পক্ষে মত দিলেন। এই সময় রিপাবলিকান পার্টিই পশ্চিম পাকিস্তানের রুলিং পার্টি। এই পার্টির এক সভায় জাবেদা ভাবে এক-ইউনিট ভাংগিয়া স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই দেখিয়া অপযিশন পার্টি মুসলিম লীগ দলও ঐ একই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের তিনটি পার্লামেন্টারি দল যথা মুসলিম লীগ, রিপাবলিকান ও ন্যাপ সকলেই একমত হইয়া পরিষদে এক-ইউনিট ভাংগার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এক-ইউনিট করার সময় আওয়ামী লীগ উহার বিরোধিতা করিয়াছিল। তাদের যুক্তি ছিল অগণতান্ত্রিক পন্থায় ঐ ব্যবস্থা মাইনরিটি প্রদেশসমূহের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আওয়ামী লীগ বরাবর বলিয়াছে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ব্যাপার। পূর্ব-পাকিস্তানীরা উহাতে সম্পর্কিত শুধু এই কারণে যে যদিও পূর্ব-পাকিস্তানীদের মোকাবিলা পশ্চিম-পাকিস্তানের সকল প্রদেশকে সংঘবদ্ধ করিবার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য হইতেই পাঞ্জাবী নেতারা ও অফিসাররা এই ফন্দি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাপি পশ্চিম পাকিস্তানের একটি যোনাল ফেডারেশন-গোছের ঐক্যবদ্ধতা লাহোর প্রস্তাব-ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশের সকল দলের নেতারা সেই এক-ইউনিট ভাংগিয়া দিবার প্রস্তাব করায় আওয়ামী লীগের এবং পূর্ব-পাকিস্তানীদের স্থূল দৃষ্টিতে খুশী হওয়ার কথা। খুশী হইলামও। কিন্তু আমাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দী আমাদের বিবেচনায় বিস্ময়কর রূপে উল্টা বুঝিলেন। এ সম্পর্কে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা আগে হইতে চলিতে থাকিলেও সরকারী দল রিপাবলিকান পার্টি ও অপযিশন দল মুসলিম লীগ পার্টি একমত হইয়া যখন ফরম্যালি

এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী ও আমরা কতিপয় পূর্ব-পাকিস্তানী মন্ত্রী পূর্ব-বাংলা সফর করিতেছি। এই সংবাদ খবরের কাগযে প্রকাশ হওয়ার দুই-একদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী করাচি ফিরিয়া গেলেন। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে প্রধানমন্ত্রীর বিদায়-উপলক্ষে আমিও মফস্সল হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান সাহেবও প্রধানমন্ত্রীর বিদায়-প্রাক্কালে গবর্নমেন্ট হাউসে উপস্থিত থাকিলেন। আমাদের কথাবার্তায় স্বভাবতঃই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের ঐ প্রস্তাবের কথা উঠিল। প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ করিলেন যে প্রেসিডেন্টের সহিত তাঁর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে। করাচি ফিরিবার পরই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী একই সময়ে এ বিষয়ে রেডিও ব্রডকাস্ট করিবেন।

এমন রাজনৈতিক ব্যাপারে মির্যার নাম শুনিয়া আমি ঘাবড়াইয়া গেলাম। কারণ এ ব্যাপারে মির্যা ষড়যন্ত্র করিতেছেন, প্রধানমন্ত্রীকে ভুল বুঝাইবার সাধ্য-মত চেষ্টা করিতেছেন, এসব কথা আমি অনেকের মুখে, এমনকি কোনও-কোনও সহকর্মী মন্ত্রীর মুখেই শুনিয়াছিলাম। কাজেই আমি স্বভাবতঃই কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলামঃ প্রস্তাবিত ব্রডকাস্টে তাঁরা কি বলিবেন? প্রধানমন্ত্রী জানাইলেনঃ প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী উভয়েই ইউনিট ভাংগিবার বিরোধিতা করিবেন। আমার আশংকা সত্য হইল। গবর্নমেন্ট হাউসে উপস্থিত আমরা সকলে সমবেতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে এই ধরনের রেডিও-বক্তৃতা হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলাম। অনেক যুক্তি-তর্ক দিলাম! প্রধানমন্ত্রী অটল রহিলেন। প্রেসিডেন্টের সহিত তাঁর কথা হইয়া গিয়াছে। তাঁর সাথে ত তিনি ওয়াদা খেলাফ করিতে পারেন না! অতঃপর আমরা মির্যার ষড়যন্ত্রের কথা বলিলাম। প্রমাণাদি পেশ করিলাম। তাঁকে খানিকটা নরম লাগিলেও আমার আশংকা দূর হইল না। প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে চড়িয়া আমি এয়ারপোর্টতক তাঁর সাথে গেলাম। তাঁর হাত চাপিয়া ধরিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া দুইটা অনুরোধ করিলাম। প্রথম, তিনি কেবিনেটে আলোচনা না করিয়া রেডিও-ব্রডকাস্ট করিবেন না। দুই, করাচি এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিবেন ঃ এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের রায়-মতই কাজ হইবে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে ধমক দিলেন ঃ 'তুমি আমাকে রাজনীতি শিখাইতে আসিয়াছ? কি ভাবে সাংবাদিকদেরে ফেস্ করিতে হয়, তাও তুমি আমাকে শিখাইবে?' লিডারকে আমি চিনি। তিনি আমার উপর এমন রাগও করেন, আবার কথাও মানেন। আমি তাঁর ধমকে রাগ বা গোস্বা না করিয়া হাসিয়া বলিলামঃ 'আপনেরে আমি কি শিখাইব? আপনার কাছে আমি যা শিখিয়াছি, তাই আপনেরে স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র।' তিনি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ণ-বিস্তৃত নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া বলিলেন ঃ 'আগের কথা ভুলিয়া যাও আবুল মনসুর, এখন আমি

মনে করি, এক-ইউনিট ভাংগিবার অর্থ পাকিস্তান ভাংগিয়া যাওয়া।' আমি স্তম্ভিত হইলাম। এই ভাষা আমার কাছে চিনা লাগিল। মনে পড়িল প্রেসিডেন্ট-হাউসে প্রেসিডেন্ট মির্যা ও ডাঃ খান সাহেবের মুখে এই ভাষাই শুনিয়াছিলাম। লিডার তবে সত্য-সত্যই মির্যার খপ্পরে পড়িয়াছেন! আমি মির্যার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিলাম। তার মধ্যে এও বলিলাম যে মির্যা শুধু প্রধানমন্ত্রীকে দিয়াই বক্তৃতা করাইবেন ; অসুখ-বিসুক বা অন্য কোনও অজুহাতে তিনি গা ঢাকা দিবেন। কথাটা আমি নিতান্ত যিদের বশে বলিলাম। নিজেও ওতে বিশ্বাস করি নাই। কাজেই প্রধানমন্ত্রী আমাকে ধ্যেৎ বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। তবু আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ বিমানের সিঁড়িতে খানিকদূর আগাইয়া মুসাফেহার সময় খুব জোরে হাত চাপিয়া বলিলাম ঃ 'স্যার, আমার অনুরোধ দুইটা রক্ষা করিবেন।' তিনি যেন হাতের ধাক্কায় আমার শেষ কথাটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই হাতই আরও উঁচা করিয়া সালাম দিতে-দিতে জাহাজে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমি মনে-মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। নিশ্চয় লিডার মির্যার খপ্পরে পড়িয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিবেন। এই সময় আমরা পূর্ব-পাকিস্তানী মন্ত্রীরা প্রায় সবাই টুওরে ছিলাম। বন্ধুবর যহিরুদ্দিনকে ব্যাপার বুঝাইয়া করাচি পাঠাইলাম পরদিনই। তিনি মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি হইতে টেলিফোনযোগে আমাকে জানাইলেন ঃ আশংকিত বিপদের সম্ভাবনা কতকটা দূর হইয়াছে। কারণ প্রধানমন্ত্রী জ্বরে শয্যাগত। রেডিও-বক্তৃতা করা সম্ভব নয়।

কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। লিডারের কাছছাড়া না হইতে বন্ধুকে উপদেশ দিলাম। পরবর্তী টেলিফোনেই আবার চিন্তিত হইলাম। যহিরুদ্দিন জানাইলেন, রেডিও পাকিস্তানের যন্ত্রপাতি ও কর্মচারিরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হাযির।

রেডিওর পরবর্তী বৈঠকেই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা প্রচারিত হইয়া গেল। পার্থক্য শুধু এই প্রধানমন্ত্রীরটা তাঁর নিজ গলায়। প্রেসিডেন্টেরটা তাঁর নিজ গলায় নয়। রেডিওর বুলেটিন রিডারের গলায়।

আশংকা সত্যে পরিণত হইতেছে দেখিয়া টুওর প্রোগ্রাম বাতিল করিলাম। করাচি ফিরিয়া গেলাম। প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলিয়া বুঝিলাম, ওয়ান-ইউনিটের ব্যাপারকে তিনি মূলনীতির প্রশ্ন করিয়াছেন। দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছেন। সে সংকল্পের সামনে আমার সমস্ত যুক্তি অর্থহীন হইয়া গেল। তিনি এক কথায় বলিলেন ঃ এজন্য তাঁর মন্ত্রিত্ব গেলেও তিনি পরওয়া করেন না। তাঁর মন্ত্রিত্ব যাওয়া শুধু একটা মন্ত্রিসভার পতন নয়, সাধারণ নির্বাচন ভণ্ডুল হইয়া যাওয়া, একথাও তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন ঃ আমার আশংকা অমূলক ও অতিরঞ্জিত।

লিডার এই পথে আরও অগ্রসর হইলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের তিনটি পার্লামেন্টারি পার্টিই একমত হইয়া এক-ইউনিট ভাংগিয়া পূর্বতন স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশে ফিরিয়া

যাইতে রাযী হইয়াছেন, এটা যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনমতের বিরুদ্ধে, তা প্রমাণের জন্য তিনি টুওর প্রোগ্রাম করিলেন। পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরেই প্রথম সফর। আমরা নিশ্চিত পতনের অপেক্ষায় ঘরে বসিয়া থাকিলাম। প্রতিদিন খবরের কাগযে প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ-লক্ষ লোকের বিরাট জনসভায় প্রাণস্পর্শী বক্তৃতার রিপোর্ট পড়িতে লাগিলাম। সে সব বক্তৃতায় তিনি এক ইউনিট বিরোধীদের পাকিস্তানের অনিষ্টকারী বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এইসব সভায় প্রায় সবগুলিই রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রীদের দ্বারা আয়োজিত এবং তাঁদের উপস্থিতিতেই সমবেত। পরে দুই-একজন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী কাঁদ-কাঁদ ভাষায় আমাকে বলিয়াছিলেন ঃ 'আমাদের চেষ্টায় ও টাকায় আয়োজিত সভায় আমাদের টাকায় সজ্জিত মঞ্চে বসিয়া আমাদের-কেনা মালা গলায় লইয়া আমাদের সামনে আমাদেরে দেখাইয়া আমাদের ভোটারদেরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন ঃ 'এরা পাকিস্তানের দুশ্‌মন। লজ্জায়-ঘৃণায় আমাদের মাথা হেট হইয়াছে।'

৫. রিপাবলিকান দলে প্রতিক্রিয়া

করাচিতে এর ফল ফলিল। প্রেসিডেন্ট আমাকে ডাকিলেন। তিনি কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রীর-লেখা পত্র আমাকে পড়িতে দিলেন। সব কয়টাতেই লেখা ঃ প্রধানমন্ত্রী তাঁদেরে এবং তাঁদের পার্টিকে ট্রেটর বলিয়া গাল দিয়াছেন ঃ এ অবস্থায় তাঁরা এই প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করিতে অনিচ্ছুক। এই সব পত্রে এক-ইউনিট ছাড়াও অন্য ব্যাপারের উল্লেখ বা ইংগিত আছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের প্রতি কবে এমন অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, তারও উল্লেখ আছে। প্রধানমন্ত্রীর রিপাবলিকান দলের বিরুদ্ধে নবাব গুরমানী-পরিচালিত মুসলিম লীগ পার্টির সহিত ষড়যন্ত্রেরও অভিযোগ আছে। প্রেসিডেন্ট ডাঃ খান সাহেব-সহ কতিপয় রিপাবলিকান নেতার টেলিগ্রামও আমাকে দেখাইলেন। তাতে লেখা ছিলঃ তাঁরা সবাই পরের দিন করাচি আসিতেছেন একটা হেস্ত-নেস্ত করিতে।

সেদিন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যুগোশ্লাভ ভাইস-প্রেসিডেন্টের একটা স্টেট রিসেপশন ছিল। পূর্বাহ্নে যুগোশ্লাভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্টের সহিত প্রেসিডেন্ট হাউসের দুতলায় দরবার হলে আমার ইন্টারভিউ। এটা হওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর সাথে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আরেকটা কি গুরুতর কাজে ব্যাপৃত থাকায় আমার উপরই এই মোলাকাতের ভার পড়ে। প্রায় দুই ঘন্টা মোলাকাতের পর নিচে নামিয়া দেখিলাম ডাঃ খান সাহেব, সৈয়দ আমজাদ আলী, তাঁর সহোদর শাহ ওয়াজেদ আলী ও কতিপয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী প্রেসিডেন্টের সহিত দরবার করিতেছেন। আমাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন না। বরঞ্চ ডাকিয়া তাঁদের দরবারে নিলেন। প্রেসিডেন্টের সামনেই এবং স্পষ্টতঃ তাঁর অনুমোদনক্রমে বলিলেন, তাঁরা আমাদের লিডারের

প্রধানমন্ত্রিত্ব আর সমর্থন করিবেন না, স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমার কর্তব্য তাঁকে পদত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়া। আমি সাধ্যমত তাঁদের সাথে তর্ক করিলাম। যুক্তি-তর্ক দিলাম। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বেশ নরম ভাবও দেখাইলেন। কিন্তু অন্যান্যেরা অনমনীয় থাকিলেন। কথা শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী আসিতেছেন। কাজেই ইচ্ছা করিয়াই আমি দেরি করিলাম। প্রধানমন্ত্রী আসিলেন। প্রেসিডেন্টের সহিত গোপন পরামর্শ করিলেন। আমরা বারান্দায় ও সম্মুখস্থ বিশাল সেহানে পায়চারি করিতে-করিতে গ্রুপ ডিসকাশন করিতে লাগিলাম।

প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের সহিত আলাপ শেষ করিয়া বাহির হইলেন। সকলের সহিত হাস্য-রসিকতা করিয়া আমার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গাড়ি-বারান্দায় আসিলেন। আমি কোনও প্রশ্ন করিবার আগেই নিতান্ত স্বাভাবিক সহজ গলায় যুগোস্লাভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্টের সহিত আমার মোলাকাতের কথা জিগ্‌গাসা করিলেন। কি কি বিষয়ে আলাপ হইল, তার খুটিনাটি জানিতে চাহিলেন। আমি নিজের অধৈর্য গোপন করিয়া তাঁর সব কথার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়া আসল কথা পাড়িলাম। প্রেসিডেন্টের সহিত তাঁর কি কথা হইল? তিনি হাতের ধাক্কায় আমার কথাটা উড়াইয়া দিলেন। বলিলেনঃ 'ওটা কিছু না, সব মিটিয়া গিয়াছে।'

৬. সিকান্দরের জয়

সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী-ভবনে স্টেট-রিসেপশন। অভিজাত জন-সমাবেশ। আলোক-মালায় সজ্জিত বিশাল আংগিনা লোকে লোকারণ্য। সবাই আসিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রীরা একজনও আসেন নাই। টোটাল বয়কট। কেউ সেটা লক্ষ্য করিবার এবং কানাঘুষা আরম্ভ হইবার আগেই প্রধানমন্ত্রী ফাংশন শুরু করিলেন। উভয় রাষ্ট্র-নেতাই পরস্পরের উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করিলেন এবং টোস্ট প্রস্তাব ও স্বাস্থ্য পান করিলেন। খাওয়ার ধুম লাগিল।

কিন্তু সাংবাদিকরা খাওয়ায় ভুলিবার পাত্র নন। তাঁরা তাঁদের কাজ শুরু করিলেন। এঁ-ওঁর কাছে, মন্ত্রীদের কাছে এবং বিশেষ করিয়া আমার নিকট, নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বিদেশী সম্মানিত অতিথির সহিত আলোচনায় রত বলিয়া প্রধানমন্ত্রী তাঁদের নাগালের বাইরে। সুতরাং আমাদের উপরই শিলা-বৃষ্টি হইতে লাগিল। কি হইল? কেন পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রীরা পার্টিতে আসিলেন না? তাঁরা নাকি একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন? প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং পদত্যাগ করিয়াছেন কিংবা করিবেন কি না? তিনি নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন কি না? ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন। আসন্ন অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশংকায় আমারও বুক কাঁপিতে ও গলা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু অতি কষ্টে সব গোপন করিয়া হাস্য-রসিকতা করিয়া সাংবাদিকদেরে বুঝাইতে

চাহিলাম তাঁরা যা শুনিয়াছেন সব ভুল। তাঁরাও ছাড়িবার পাত্র নন। আমিও হারিবার পাত্র নই।

এমনি করিয়া অনেক রাত হইয়া গেল। আস্তে–আস্তে মেহমানরা এবং ফলে সাংবাদিকরাও চলিয়া গেলেন। থাকিলাম আমরা মাত্র পূর্ব–পাকিস্তানী দুইজন মন্ত্রী মিঃ দেলদার আহমদ ও আমি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ আফতাব আহমদ খাঁন। আমাদের সাথে পরামর্শ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে নিয়া গেলেন। দরজা বন্ধ করিয়া তিনি আমাদেরে প্রেসিডেন্ট মির্যার একটি পত্র দেখাইলেন। তাতে প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান পার্টির অনাস্থার কথা জানাইয়া প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরামর্শ করিবার পর প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের পত্রের জবাব মুসাবিদা করিলেন। আমরা সকলে তাঁর সাথে একমত হইলাম। চিঠি টাইপ হইল। তাতে বলা হইল, প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট ডাকুন। পার্লামেন্টের মোকাবিলা না করিয়া প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রেসিডেন্টের কাছে এই পত্র পাঠান হইল। সংবাদ–পত্রে প্রকাশের জন্যও দেওয়া হইল।

পরদিন রিপাবলিকান বন্ধুরা বলিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর জবাবটা খবরের কাগযে দিয়া সর্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ; নইলে একটা আপোস–রফা হইতে পারিত। এখন আর তার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা বুঝিলাম ওটা বাজে কথা। পশ্চিমারা জোট বাঁধিয়াছেন। কিছুতেই সুহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রাধান্য মানিবেন না। আমরা আভাস পাইয়াছিলাম আগের রাত্রেই। লিডার সত্য–সত্যই গুরমানী–দওলতানা গ্রুপের উপর ভরসা করিতেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপে বুঝিলাম, তিনি গতরাত্রের ঐ চিঠির পরে সত্যসত্যই প্রেসিডেন্টের কাছে পদত্যাগ–পত্র দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বেশী ঘাটাঘাটি করিতে আমাদের মানা করিলেন। আমাকে গোপনে বলিলেন, ঐ পদত্যাগ–পত্রে কিছু ক্ষতি হয় নাই। ক্রুদ্ধ রিপাবলিকানদের মোকাবিলায় প্রেসিডেন্টের হাত শক্ত করিবার জন্যই তিনি তা করিয়াছেন। তাঁর কথায় বুঝিলাম, প্রেসিডেন্ট তাঁকে বুঝাইয়াছেন, ঐ পদত্যাগ–পত্র গ্রহণ করা মানেই মুসলিম লীগকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করা। মুসলিম লীগ মানেই গুরমানী দওলতানা। 'তোমরা যদি তাই চাও, আমি তাই করিব।' প্রেসিডেন্টের এই কথা শুনামাত্র রিপাবলিকানরা প্রেসিডেন্টকে এবং প্রয়োজন হইলে শহীদ সাহেবকে খোশামুদ করিয়া শহীদ সাহেবের মন্ত্রিসভা বজায় রাখিবেন।

লিডারের যুক্তি ও পন্থাটা আমার খুব না পসন্দ না হইলেও আমি ওটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু দেখিলাম লিডার মির্যার এই আশ্বাসে খুবই বিশ্বাস করিয়াছেন। এতটা বিশ্বাস করিয়াছেন যে তিনি ইতিমধ্যে পোর্ট ফলিও রদ–বদল করিবার চিন্তা, হয়ত বা, আলোচনাও শুরু করিয়াছেন। এমনকি আমাকে শিল্প–বাণিজ্যের বদলে ফাইন্যান্স দিলে কেমন হয়, তাও জিগ্গাসা করিলেন। লিডারের

শিশুসুলভ সরলতায় দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তাঁর আত্মবিশ্বাস দেখিয়া সাহসও পাইলাম। আমি জানিতাম পশ্চিমা সওদাগর-শিল্পপতিদের ঘা কোথায়। বলিলামঃ 'আপনার মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের জন্য পোর্টফলিও কেন আমি মন্ত্রিত্বও ত্যাগ করিতে পারি। সেজন্য আপনি কোনও ভাবনা করিবেন না। কিন্তু কথা এই যে আমি ফাইন্যান্সের জানি কি?' লিডারে তাঁর স্বাভাবিক শ্রুতি-কটু কিন্তু ধারাল রসিকতায় বলিলেনঃ 'ওহো, যেন মন্ত্রিত্ব নিবার আগে তুমি শিল্প-বাণিজ্যের একটা এক্সপার্ট ছিলে। মাথায় পড়িলে সবই তুমি পারিবে। তাছাড়া আমি আছি ত।'

ধরিয়া নিলাম পোর্টফলিও রদ-বদলের শর্তে লিডার ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকানদের সাথে রফা করিয়াই ফেলিয়াছেন। খুশীই হইলাম। যে কোনও মূল্যে আগামী ইলেকশন পর্যন্ত শহীদ মন্ত্রিসভার টিকিয়া থাকা দরকার। সেই দরকার মন্ত্রিসভায় থাকিয়া ইলেকশনে সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যে নয়। কারণ সে রকম সুবিধায় আমি কোনও দিনই বিশ্বাসী ছিলাম না। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের অবস্থা দেখিয়া আরও অনেকের সে বিশ্বাস বদলাইয়াছে। তবু যে আমি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত শহীদ মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সারা অন্তর দিয়া কামনা করিতাম, তা শুধু নির্বাচন-প্রথার জন্য। অনেক কষ্টে আমরা যুক্ত-নির্বাচন প্রথার আইনটি পাস করিয়াছি। শহীদ মন্ত্রিসভার পতনের সাথে-সাথে যুক্ত-নির্বাচন-প্রথা বাতিল হইবে, এ সম্পর্কে আমার আশংকার মধ্যে কোনও ফাঁক ছিল না।

কিন্তু আমার আশংকাই সত্যে পরিণত হইল সন্ধ্যার দিকে। প্রেসিডেন্টের দফতর হইতে পত্র আসিল তিনি প্রধানমন্ত্রী শহীদ সাহেবের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং নয়া মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আগের মতই কাজ চালাইয়া যাইতে বলিয়াছেন। লিডার চিরকালের 'অসংশোধনীয়' আশাবাদী। মির্যা তাঁর সাথে চালাকি করিতেছেন এটা তিনি তখনও বিশ্বাস করিলেন না। করিলেও আমাদেরে জানিতে দিলেন না। বিশেষতঃ চুন্দ্রিগড়-দওলাতানা সকালে-বিকালে লিডারের সাথে যোগাযোগ করিয়া তাঁর মনের ধারণা আরও দৃঢ় করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ এক সন্ধ্যায় লিডার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চুন্দ্রিগড় ও দওলতানা আসিবার কথা। বুঝিলাম, লিডার নাহক আশা করিতেছেন না। সন্ধ্যা আসিল, গেল। রাতও আসিল। কিন্তু চুন্দ্রিগড়-দওলতানা আসিলেন না। অগত্যা লিডারই টেলিফোন করিলেন। কয়েকবার। শেষে যখন তাঁদেরে পাওয়া গেল, তখন তাঁরা বলিলেন, এই আসিতেছেন। আশা করিলাম নিজেদের মধ্যে কথা একদম ফাইনাল করিয়াই আসিতেছেন। ভালই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আসিলেন না। বোধ হয় পরের দিনের কথা বলিলেন। লিডার আমাকে বলিলেনঃ 'আজ যাও, কাল খবর দিব।'

লিডার আর খবর দিলেন না। তবু প্রতিদিনই যাইতে থাকিলাম। প্রধানমন্ত্রীর অনেকগুলি দফতর। তাছাড়া প্রায় সব দফতরের কতকগুলি ফাইলে প্রধানমন্ত্রীর 'এপ্রুভাল' দরকার। সেগুলিও জমিয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী সে সব ফাইলের গাদা লইয়া বসিলেন। আমি ব্যাপার অনুমান করিলাম। তাছাড়া লিডারও বলিলেনঃ 'ফাইল জমা থাকিলে ডিসপোয-অব করিয়া ফেল।' এসব ইশারা বুঝিতে বেশী আক্কেলমন্দ লাগে না। কিন্তু আমার ফাইল বড়-একটা জমা হইত না। সাধ্যমত ঠিক সময়ে ফাইল ডিসপোয-অব করা আমার অভ্যাস। একরূপ বাতিকও বলিতে পারেন। মুত্তাকী নমাযী মানুষ যেমন নমাযের ওয়াক্ত্ হইলে নমায না পড়া পর্যন্ত একটা বেচায়নি বোধ করেন, আমার ছিল তেমনি অভ্যাস। ফাইল পড়িয়া থাকিলে আমার গায় যেন সুড়-সুড়ি লাগিত। কোনও অফিসার যদি বলিতেনঃ 'সার, আমার ফাইলটা আজও আপনার টেবিলে পড়িয়া আছে,' তবে তখন আমি লজ্জা পাইতাম। আমার দুইজন প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন, দুই দফতরের জন্য। দুই জনই পুরান অভিজ্ঞ ও অফিসার শ্রেণীর দক্ষ সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁরা তৎপরতার সংগে বিভাগীয় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই যেন যাঁর-তাঁর দফতরের ফাইল ডিসপোয করাইতেন। ফেলিয়া রাখার উপায় ছিল না। টুওরে থাকিবার সময়ও রাত্রে এবং ট্রেনে-ভ্রমণের সময় সেলুনে এঁরা ফাইল নিয়া হাযির।

কাজেই প্রধানমন্ত্রীর ইশারার উত্তরে আমি বিশেষ ব্যস্ত হইলাম না। তবু কয়দিন নিয়মিত সময়ের বেশী সময় কাজ করিতে লাগিলাম।

আটাইশা অধ্যায়

ঘনঘটা

১. পার্টি-ফণ্ডের কেম্পেইন শুরু

শেষ পর্যন্ত ১৮ই অক্টোবর (১৯৫৭) ১৪ জন মন্ত্রীর চুন্দ্রিগড়-মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। আমরা বিদায় নিলাম। বিদায়ের আগে লিডার একটা প্রেস-কনফারেন্স করিলেন। আমাদের যাওয়ার কথা নয়। তবু আমরা দুই-একজন গেলাম। কনফারেন্সের কাজ আগেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। দেখিলাম, রিপোর্টাররা শহীদ সাহেবকে নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন। শহীদ সাহেব কষিয়া জবাব দিতেছেন। তিনি মন্ত্রিত্বের তোয়াক্কা করেন না ; বড় একটা আদর্শের জন্যই তাঁর মন্ত্রিত্ব স্যাক্রিফাইস করিতে হইয়াছে ঃ এসব কথা তিনি খুব জোরের সংগেই যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝাইলেন। আমি খুশী হইলাম।

কোনও কোনও সংবাদিক বন্ধু আমাকে জানাইলেন ঃ 'মর্নিং নিউযে'র রিপোর্টার আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। ঐ রিপোর্টার বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ তাঁর বাণিজ্য মন্ত্রী লাইসেন্স পারমিট বিতরণ করিয়া চার কোটি টাকা পার্টি-ফণ্ড তুলিয়াছেন একথা তিনি অবগত আছেন কি না? আমি স্বাভাবিক কৌতূহলে বন্ধুদেরে জিগ্‌গাসা করিলাম ঃ 'শহীদ সাহেব কি জবাব দিলেন?' বন্ধুরা বলিলেন ঃ 'বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ধীর কণ্ঠে জবাব দিয়াছেন ঃ 'আপনার কাছেই আজ সর্বপ্রথম এই কথা শুনিলাম।'

পরদিন 'মনিং নিউযে' ঐ প্রশ্নোত্তর ছাপা হইল। শুধু তাই নয়। বাণিজ্য দফতরে আমার উত্তরাধিকারী মন্ত্রী মিঃ ফযলুর রহমান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই একটি প্রেস-কনফারেন্স করিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনিও ঐ চার কোটি-ফণ্ড তোলার অভিযোগের পুনরুল্লেখ করিলেন। তবে তিনি সোজাসুজি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী না বলিয়া 'আওয়ামী লীগ মন্ত্রীরা' বলিলেন। আমি তখনও সরকারী মন্ত্রি-ভবনেই আছি। ফযলুর রহমান সাহেব তখনও নিজের বাড়িতেই আছেন। আমি কাগযটা পড়িয়াই তাঁকে ফোন করিলাম। লাইসেন্স বিতরণে আমার প্রবর্তিত নয়া কানুনে, এবং আই. সি. এর সাহায্যের, সব লাইসেন্স বিতরণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের, এসব কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ 'ভাই, আমি সব কথা জানি। আপনে মনে কিছু করিবেন না। আমি বাণিজ্য দফতরে আগেও মন্ত্রিত্ব করিয়াছি। আপনার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না। বলিও নাই। শুধু প্রাদেশিক মন্ত্রীরে একটু খোঁচা দিয়া রাখিলাম।'

আমি বন্ধুবরের রসিকতার জবাবে রসিকতা করিয়াই বলিলাম ঃ 'খোঁচার টার্গেট আপনার যেই থাকুক, ওটা কিন্তু লাগিয়াছে সাহায্য দাতাদের গায়। কারণ লাইসেন্স প্রাপকরা তাঁদেরই বাছাই-করা লোক।' জবাবে ফযলুর রহমান সাহেব শুধু বলিলেন ঃ 'তাই নাকি? এটাত জানিতাম না।' আমি গম্ভীরভাবে বলিলামঃ 'ফাইল-পত্র দেখুন। এবং পযিশন ক্লিয়ার করিয়া একটা বিবৃতি দিন।' টেলিফোন রাখিয়া দিলাম।

করাচির কাগযগুলির বেশির ভাগই এ ব্যাপারটা লইয়া রোজ আওয়ামী লীগ পার্টির ও ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগ্যাণ্ডা চালাইয়া যাইতে লাগিল। ফযলুর রহমান সাহেব 'পযিশন ক্লিয়ার' করিয়া কোনও বিবৃতি দিলেন না। আমি অগত্যা লিডারের অনুমতি চাহিলাম 'মর্নিং নিউযের' বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করিতে। আমার বিরুদ্ধে 'মর্নিং নিউযের' আক্রোশ আছে, একথাও তাঁকে বলিলাম। ঘটনাটা এই ঃ নিউয প্রিন্ট কনট্রোলার শিল্প দফতরের অধীন। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় সব কয়টা দৈনিকের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও কোনও দৈনিকের পক্ষে আমার কাছে নালিশ করা হইল যে নিউয প্রিন্টের ব্যাপারে তাঁরা সুবিচার পান না। অডিট বুরোর রিপোর্ট মোতাবেক প্রচার সংখ্যা অনুসারে সবাই কাগয পান, এটাই ছিল আমার বিশ্বাস। এঁদের অভিযোগে কাজেই নিউয প্রিন্ট কনট্রোলারের রিপোর্ট তলব করিলাম। তাঁর রিপোর্টের সমর্থনে কনট্রোলার মিঃ আবদুল আযিয আমার নিকট কাগয-পত্র দাখিল করিলেন। আমি ঐসব কাগয-পত্র দেখিয়া প্রয়োজন মত প্রতিকার করিলাম। কিন্তু ঐসব কাগয-পত্র দেখিতে-দেখিতে একটা 'কেঁচু খুঁড়িতে সাপ' দেখার ব্যাপার ঘটিয়া গেল। দেখিলাম, কত পৃষ্ঠার কাগয, শুধু তাই দেখিয়া নিউযপ্রিন্টের কোটা ঠিক করা হয়। 'ডন', 'পাকিস্তান টাইমস্', 'পাকিস্তান অবযারভার', 'আজাদ', 'ইত্তেফাক', মর্নিং নিউয' সবারই এক হিসাব। আমি কনট্রোলারকে বলিলাম ঃ 'এটা কি আপনার বিবেচনায় আসে নাই যে অন্য সব কাগযই ডবল-ডিমাই ; একমাত্র 'মর্নিং-নিউযই' ডবল ক্রাউন? ডবল-ডিমাই ও ডবল ক্রাউনে কত তফাৎ আপনি জানেন?' কনট্রোলার ভুল স্বীকার করিলেন। হিসাবে 'মর্নিং নিউযের' কোটা অনেক কমিয়া গেল। এতদিন যে 'মর্নিং নিউয' অতিরিক্ত নিউয প্রিন্ট নিয়াছে, তার ব্যবহার কিভাবে হইয়াছে, এর মধ্যে বজ্জাতি আছে কি না, থাকিলে বজ্জাতিটা কার, এসব কথা স্বভাবতঃই আসিল। শেষ পর্যন্ত 'মর্নিং নিউযে'র কিছু হইল না উপরের তলার ধরাধরিতে। কিন্তু কোটার বাড়তিটা তার আর থাকিল না। এই বাড়তি কাগয দিয়া তারা এতদিন কি করিত, তা আল্লাই জানেন। কিন্তু এটা কমিয়া যাওয়ায় আমি যেন তাদের জানী দুশ্মন হইয়া গেলাম। মালিকদের দুশ্মন হইবার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু জার্নালিস্টদের দুশ্মন কেন হইলাম, তা বুঝিতে আমার অনেক দিন লাগিয়াছিল।

যা হোক, লিডারকে এসব কথা বলিবার পরে তিনি হাসিয়া বলিলেন ঃ আইনের দিক হইতে বলিতে গেলে তোমার মামলা খুবই ভাল। কিন্তু তুমি রাজনীতিক। রাজনীতিককে এমন পাতলা-চামড়া হইলে চলে না। দুর্নীতির অভিযোগ কোন্ নেতার বিরুদ্ধে না হইয়াছে? বিদেশে জর্জ ওয়াশিংটন, লিংকনের কথা বাদ দিলেও এ দেশেরও গান্ধী-জিন্না-সি.আর.দাস্-সুভাষচন্দ্র-ফযলুল হক এমনকি তোমার নেতা এই সুহরাওয়ার্দী পর্যন্ত কে রেহাই পাইয়াছেন? কে কবে গিয়াছেন মানহানির মামলা করিতে? কেউ যান নাই।' একটু থামিয়া একটা অট্টহাসি দিয়া বলিলেনঃ 'হাঁ, পূর্ব বাংলার এক নেতা মানহানির মামলা করিয়াছেন। জিতিয়াছেনও। তুমি যদি আমাদের সবাইকে ছাড়িয়া তাঁর অনুকরণ করিতে চাও, যাও তবে মামলা কর গিয়া।'

মামলা করার উৎসাহ পানি হইয়া গেল, তার বদলে একটা লম্বা বিবৃতি দিলাম। যে 'মর্নিং নিউযে'র অভিযোগের জবাবে ঐ বিবৃতি, সেই কাগযটি ছাড়া আর সব কাগযই মোটামুটি আমার বিবৃতি ছাপাইলেন। করাচির 'ডন' ও ঢাকার 'ইত্তেফাক' আমার পূরা বিবৃতি ছাপিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধিলেন।

২. আসল মতলব ফাঁস

এদিকে নয়া প্রধানমন্ত্রী মিঃ চুন্দ্রিগড় তাঁর প্রথম বেতার ভাষণেই যুক্ত-নির্বাচনের বদলে পৃথক-নির্বাচন পুনঃপ্রবর্তনের সংকল্প ঘোষণা করিলেন। এই বেতার ভাষণে তিনি দুইটি দাবি করিলেন। এক, মুহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্না চুন্দ্রিগড়-মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দিয়াছেন। দুই, রিপাবলিকান পার্টি পৃথক-নির্বাচনে সম্মত হইয়াছে।

মুহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্না পরের দিনই এক বিবৃতি দিয়া মিঃ চুন্দ্রিগড়ের দাবি অস্বীকার করিলেন। ফলে মিঃ চুন্দ্রিগড়ের দুইটা লোকসান হইল। প্রথমতঃ তিনি ব্যক্তিগতভাবে অসত্যবাদী প্রমাণিত হইলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর মন্ত্রিসভার নৈতিক শক্তি অনেকখানি কমিয়া গেল।

রিপাবলিকানদের অনেকেই আসলে মুসলিম লীগার। সুতরাং তাঁরা পৃথক-নির্বাচনে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া বিস্মিত হইলাম না। কিন্তু ডাঃ খান সাহেব প্রভৃতি কতিপয় নেতাকে আমি নীতিগতভাবেই যুক্ত-নির্বাচনের সমর্থক করিয়া জানিতাম। তিনিও পৃথক নির্বাচনে সম্মত হইয়াছেন এটা বিশ্বাস করিলাম না। ঢাকা হইতে মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী খবরের কাগযে বিবৃতি দিয়া চুন্দ্রিগড়-মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিলেন। কিন্তু সংগে-সংগেই যুক্ত-নির্বাচন প্রথা বজায় রাখিবার অনুরোধও তিনি করিলেন। নয়া মন্ত্রীদের মধ্যে আমি বাছিয়া-বাছিয়া সৈয়দ আমজাদ আলী, মিয়া যাফর শাহ, আবদুল লতিফ বিশ্বাস প্রভৃতিকে এ ব্যাপারে জিগ্গাসাবাদও করিলাম। আকার-

ইংগিতে ক্যান্‌ভাসও করিলাম। ভরসাও তাঁরা মোটামুটি দিলেন। চুন্দ্রিগড়-মন্ত্রিসভার প্রথম কেবিনেট বৈঠকে যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার বদলে পৃথক নির্বাচন চালু করিবার প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইতে পারে নাই, এ সংবাদ পড়িয়া কতকটা আশ্বস্তও হইলাম।

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে আইন-পরিষদের আগামী বৈঠক ঢাকায় হইতে বাধ্য। সেই বৈঠকে যুক্ত-নির্বাচন-প্রথাকে বাঁচাইয়া রাখার শেষ চেষ্টা করিব ভাবিতেছিলাম। এমন সময় মন্ত্রিসভা ঠিক করিলেন যে নবেম্বর মাসেই নির্বাচন-প্রথা বদলাইবার জন্য পরিষদের একটা বৈঠক তাঁরা করাচিতেই করিবেন। আমরা বিপদ গণিলাম। কিন্তু চেষ্টা ছাড়িলাম না।

৩. আত্মঘাতী পর-নিন্দা

এদিকে ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজিয়া উঠিল। আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে কিছু না করিলেও স্বয়ং এইড-দাতারা মাঠে নামিলেন। বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ ফযলুর রহমানের বিবৃতিতে বলা হইয়াছিল : 'আই.সি.এ.এইড বাবত লাইসেন্স বিতরণে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।' পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলি এক বিবৃতিতে বলিলেন : 'বাণিজ্য-মন্ত্রীর এই অভিযোগ গুরুতর। ইহা কার্যতঃ মার্কিন অফিসারদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানে নয়া-শিল্প বাবত লাইসেন্স বিতরণের জন্য যেসব শিল্প ও তার দরখাস্তকারী নির্বাচন করা হইয়াছে, তা করিয়াছেন আই.সি.এ.'র প্রেরিত প্রজেক্ট লিডারগণ নিজেরা। এ অবস্থায় ঐ নির্বাচনে যদি কোনও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে আই.সি.এ.'র অফিসাররাই করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা মার্কিন সরকারের কর্তব্য। সে অনুসন্ধান হওয়া সাপেক্ষে আই.সি.এ. এইড দেওয়া স্থগিত রাখিবার জন্য আমার সরকারকে সুপারিশ করিয়া আমি তারবার্তা পাঠাইলাম।'

চুন্দ্রিগড়-মন্ত্রিসভা ব্যস্ততার সংগে তড়িৎগতিতে এক বিশেষ যরুরী বৈঠকে মিলিত হইলেন। মিঃ ল্যাংলিকে অনেক প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা হইল। প্রস্তাবে বলা হইলঃ 'আই. সি. এ. অফিসারদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করিবার ইচ্ছা ক্ষুণাক্ষরেও বাণিজ্য-মন্ত্রীর ছিল না। তিনি শুধু আওয়ামী লীগ-নেতাদের দোষী করিতে চাহিয়াছিলেন। তবু যদি আই.সি.এ. অফিসাররা ও মিঃ ল্যাংলি মনক্ষুণ্ন হইয়া থাকেন, তবে মন্ত্রিসভা সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ ল্যাংলি যেন তাঁর সুপারিশ প্রত্যাহার করিয়া এইড বজায় রাখেন।'

কিন্তু মার্কিন সরকার তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলাইলেন না। চুন্দ্রিগড় মন্ত্রিসভা শেষ পর্যন্ত উক্ত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি এইড'কে 'কমোডিটি এইড' এ রূপান্তরিত করিতে রাযী হইয়া মার্কিন সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠাইলেন। তবু মার্কিন সরকার সেই পাঁচ কোটি টাকার সাহায্য দিতে রাযী হইলেন না। বরঞ্চ উহা চূড়ান্তরূপে বাতিল

ঘোষণা করিলেন। কিন্তু মার্কিন সরকার যদি রাযী হইতেনও তথাপি শিল্পোন্নয়নের দিক হইতে উক্ত এইড মূল্যহীন ও অবান্তর হইত। চুন্দ্রিগড় মন্ত্রিসভা অবশ্য ভরশা দিয়াছিলেন যে পাকিস্তানের নিজস্ব অর্জিত বিদেশী-মুদ্রা হইতে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিকল্পিত শিল্পগুলি স্থাপন করিবেন। কিন্তু কেউ তাতে বিশ্বাস করে নাই। মুখ ও মন্ত্রিত্ব রক্ষার জন্য ওটাকে তাঁদের ভাওতা মনে করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ওটা ভাওতাই প্রমাণিত হইল। পূর্ব-পাকিস্তানে ৫৮টি নয়া-শিল্প প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা পূর্ব-পাক সরকার করিয়াছিলেন, তা আর কার্যকরী করা হইল না। প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বিশেষ সাহস ও উদ্যোগে পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব কোটা হইতে বিদেশী মুদ্রা দিয়া উক্ত ৫৮টি শিল্পের মধ্যে মাত্র ৩/৪টি স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল। প্রতিপক্ষীয় রাজনীতিক নেতাদের ও পার্টির বিরুদ্ধে প্রপাগ্যান্ডা করিতে গিয়া দায়িত্বশীল ব্যক্তির অসাবধান উক্তির ফলে দেশের কি অনিষ্ট হইতে পারে, এই ঘটনাটি তার প্রমাণ স্বরূপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দুরপনেয় হইয়া থাকিবে।

৪. নির্বাচনে বাধা

পূর্ব-পাকিস্তানের এই সর্বনাশ করিবার পর চুন্দ্রিগড়-সরকার গোটা পাকিস্তানের সর্বনাশ করার কাজে হাত দিলেন। প্রধানতঃ যুক্ত-নির্বাচন-প্রথা বাতিল করিয়া পুনরায় পৃথক নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তনের যিকির তুলিয়াই মুসলিম লীগ-নেতারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াই তাঁরা নির্বাচন-প্রথা সংশোধনী বিল ও নির্বাচনী আইন সংশোধনী বিল রচনা করিয়া ফেলিলেন। বিস্ময়কর অসাধারণ অদূরদর্শিতার (অথবা দূরদর্শিতার?) দরুনই এটা তাঁরা করতে পারিলেন। তাঁরা ভুলিয়া গেলেন ঃ

(১) ভোটের লিস্ট সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নূতন করিয়া রচনা করিতে হইবে।

(২) হিন্দু-মুসলিম আসনের হার ও সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার জন্য ১৯৫১ সালের আদমশুমারির উপর নির্ভর করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর সাংঘাতিক অবিচার করা হইবে। কারণ ঐ আদমশুমারির পরে এই সাত বছরে বহু হিন্দু পাকিস্তান ছাড়িয়া গিয়াছে।

(৪) অতএব নূতন করিয়া আদমশুমারির দরকার হইবে ; অথবা ১৯৬১ সালের আদমশুমারি-তক অপেক্ষা করিতে হইবে।

(৫) সাধারণ নির্বাচন পাঁচ বছরের জন্য পিছাইয়া দিতে হইবে।

আমরা বলিলাম বটে এটা মুসলিম লীগ-নেতাদের অদূরদর্শিতা ; কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান লোক বলিলেন এটা তাঁদের দূরদর্শিতা। কারণ সাধারণ নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়াই বুদ্ধিমান লোকদের উদ্দেশ্য। তাঁদের কথা সত্য হইতে পারে। মুসলিম লীগ

নেতারা নির্বাচনকে ভয় পান, সেটা তাঁরা অতীতে বহুবার প্রমাণ করিয়াছেন। পূর্ব-পাকিস্তানে ৩৫টি উপ-নির্বাচন আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। নয় বছর তাঁরা শাসনতন্ত্র রচনা আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ৫৪ সালের পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনের ঘা তখনও শুকায় নাই। এটা ত মুসলিম লীগ নেতাদের নিজেদের ভাব-গতিক। তার সংগে যোগ দিয়াছিলেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যা। সাধারণ নির্বাচনের সাথে সাথেই তাঁর আয়ু শেষ হইবে, এ আশংকা তাঁকে ভীষণরূপে পাইয়া বসিয়াছিল।

৫. চুন্দ্রিগড়-মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

এসব কারণে চুন্দ্রিগড়-মন্ত্রিসভা পূর্ব-পাকিস্তানের মেজরিটি মেম্বরদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। প্রেসিডেন্ট মির্যা প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে ও প্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাবলিকান দলে ভাংগন ধরাইতে পারিলেন না। ফলে চুন্দ্রিগড়-মন্ত্রিসভার বিলগুলি বিলে পড়িল। তাঁরা কেন্দ্রীয় আইন-সভায় মেজরিটি করিতে পারিলেন না। অনেক টিলামিছি করিয়া শেষ পর্যন্ত ১১ই ডিসেম্বর আইন পরিষদের বৈঠক দিলেন। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয় জানিয়া তার আগেই পদত্যাগ করিলেন।

আমাদের নেতা শহীদ সাহেব একমাত্র যুক্ত নির্বাচন প্রথায় সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার শর্তে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা গঠনের অফার দিলেন। আমাদের কয়েকজনকে দিয়া রিপাবলিকান নেতাদের আশ্বাস দেওয়াইলেন। জনাব আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান ও আমি বিনা-মন্ত্রিত্বে শুধু যুক্ত-নির্বাচন-প্রথায় অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন করার শর্তে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা সমর্থন করিতে সম্মত হইলাম। যুক্ত-নির্বাচন-বাদী পূর্ব পাকিস্তানী অন্য যে কোনও ব্যক্তি বা দলকে মন্ত্রিসভায় নিতে আমাদের আপত্তি নাই, তাও জানাইয়া দিলাম। শুধু আমরা আওয়ামী লীগের কেউ মন্ত্রিত্ব নিব না এই কথায় আমরা দৃঢ় থাকিলাম।

তাই হইল। ফিরোজ খাঁ-মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। তাঁরা তাঁদের ওয়াদা রক্ষাও করিলেন। সর্বদলীয় সম্মিলনীর বৈঠক ডাকিয়া প্রধানমন্ত্রী ফিরোয খাঁ নুন ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত দিন-তারিখ ঘোষণা করিলেন।

৬. আওয়ামী লীগে গৃহ-বিবাদ

মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পর আমার যথারীতি বরাবরের কর্মস্থল ও ওকালতির জায়গা ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাওয়ারই কথা। ইতিমধ্যে করাচি ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে যাওয়ার পথে ভায়রা-ভাই খোন্দকার আবদুল হামিদ এম. এল. এ.-র মধ্যস্থতায় কয়েকদিনের জন্য জনাব কে. জি. আহমদ সাহেবের আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া ঢাকায়

থাকিয়া গেলাম। প্রধানমন্ত্রী বন্ধুবর আতাউর রহমান খাঁ ও অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে ময়মনসিংহের বদলে ঢাকায় থাকিতে এবং হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করিতে অনুরোধ করিলেন। লিডারও ঐ একই পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন রাজনৈতিক প্রয়োজনেও আমাকে ময়মনসিংহের চেয়ে ঢাকায় থাকিতে হইবে। কিন্তু সবার উপরে কাজ করল নিজের অহমিকা। এর হাত হইতে বোধ হয় কোনও সাধারণ মানুষই রক্ষা পায় না। এই অহমিকা আমাকে বলিল ঃ বড়-বড় সব নেতাই ত রাজধানীতে থাকেন। তুমি কেন রাজধানীতে থাকিবে না? তুমি ত এখন আর একটা জেলার নেতামাত্র নও।' সুতরাং আর চিন্তা-ভাবনার কিছু নেই। ঢাকাই ঠিক হইল। বাড়ি ভাড়া করিলাম। লাইব্রেরি ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় লইয়া আসিলাম।

কিন্তু ওকালতি শুরু করা সম্ভব হইল না। প্রথম কয়দিন হাইকোর্টে যাতায়াত করিয়াই কয়েকটা ব্রিফ পাইলাম। আলীপুরে প্র্যাকটিস করিবার সময় যাঁরা আমার জুনিয়র ছিলেন তাঁরা অনেকেই ইতিমধ্যে প্র্যাকটিসের দিক দিয়া আমার সিনিয়র হইয়া গিয়াছেন। তবু বয়সে আমি তাঁদের অনেক বড় বলিয়া, একটা এক্স-মিনিস্টার বলিয়া এবং সম্ভবতঃ বিচারপতিদের অনেকেই আমারে 'সম্মান' করেন বলিয়া ওঁদের দুই-একজন আমাকে সিনিয়র এন্‌গেজ করিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই আমাদের পার্টি রাজনীতিতে, কাজেই মন্ত্রিসভায়, এমন ঝামেলা বাঁধিয়া গেল যে আমি দিন-রাত তাতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার বাসা চব্বিশ ঘন্টার রাজনীতিক আখড়ায় পরিণত হইল। মওক্কেলও জুনিয়ররা ঢুকিতেই পারেন না। বেশ কয়টা এডজোর্নমেন্ট নিয়া অবশেষে ব্রিফ ও বায়নার টাকা ফেরত দিলাম। লিডার বলিলেন, আগামী নির্বাচনের আগে ওকালতির আশা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। শুধু কথায় নয়, কাজেও তিনি নিজে তাই করিলেন। ঢাকাকেই তিনি তাঁর প্রধান বাসস্থান বানাইলেন। কাজেই আমিও ওকালতির আশা আপাততঃ ত্যাগ করিলাম। কয়েকটা বাই-ইলেকশন ছিল। আমরা তাই লইয়া ব্যস্ত হইলাম। সব-কয়টা বাই-ইলেকশনেই আমরা জিতিলাম।

কিন্তু ইতিমধ্যে গৃহ-বিবাদের অশান্তি আমাদের পাইয়া বসিয়াছিল। আতাউর রহমান সাহেব ও মুজিবুর রহমান সাহেবের মধ্যে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামিয়া পড়িয়াছিল। দুইজনই আদর্শবাদী দেশ-প্রেমিক। দুই-এর দক্ষ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ-মন্ত্রিসভা এক বছরে অনেক ভাল কাজ করিয়াছে। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, ওয়াপদা, আই-ডবলিউ-টি-এ, ফিল্ম কর্পোরেশন, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ইত্যাদি নয়া-নয়া শিল্প ও সংস্থা স্থাপন এবং খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড, কাপতাই পানি-বিদ্যুৎ এই ধরনের আরদ্ধ স্কিমগুলি ত্বরান্বিত করণ, বর্ধমান হাউসে আইন-মাফিক বাংলা একাডেমি স্থাপন ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ তাঁরা করিয়াছেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা ইহাদের পার্লামেন্টারি সদাচার। নির্বিচারে সমস্ত রাজ-বন্দীর মুক্তিদান, নিরাপত্তা আইনসমূহ বাতিলকরণ, নিয়মিতভাবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচনকে

নিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্যে অফিসারদিগকে কঠোরভাবে রাজনীতিমুক্ত রাখা, নির্ধারিত সময়ে আইন-পরিষদের বৈঠক ডাকা, বিনা-বাজেট-মনযুরিতে খরচ না করা, ইত্যাদি সকল ব্যাপারে আদর্শ গণতান্ত্রিক সরকারের উপযোগী কাজ করিয়াছেন।

এই সর্বাংগীন সদাচারের মধ্যে চাঁদের কলংকের মতই ছিল আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত বিরোধ। এই বিরোধের সবটুকুই ব্যক্তিগত ছিল না, অনেকখানিই ছিল নীতিগত। কিন্তু কতটা নীতিগত আর কতটা ব্যক্তিগত, তা নিশ্চয় করিয়া বলা এখন সম্ভব নয়, তখনও ছিল না। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়কে নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য অনেকেই দায়ী ছিলেন। কতকগুলি নীতিগত বিরোধও দায়ী ছিল। কিন্তু সবার চেয়ে বেশি ও আশু দায়ী ছিল মুজিবুর রহমানের একগুয়েমি। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া দেওয়ার মূলেও ছিল মুজিবুর রহমানের কার্য-কলাপ। মুজিবুর রহমানের নিজের কথা ছিল এই যে ঐ পাঁচমিশালী আদর্শহীন ম্যারেজ-অব-কনভিনিয়েন্স যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া আওয়ামী লীগকে প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাঁচাইয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অনেকের মত, আমার নিজেরও, যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া তিনি পূর্ব-বাংলার বিপুল ক্ষতি করিয়াছেন। এপক্ষে-ওপক্ষে বলিবার কথাও অনেক আছে। বলিবার অনেক লোকও আছেন। কিন্তু শেষ কথা এই যে যুক্তফ্রন্ট ভাংগা যদি দোষের হইয়া থাকে তবে সে দোষের জন্য মুজিবুর রহমানই প্রধান দায়ী। প্রায় সব দোষই তাঁর। আর ওটা যদি প্রশংসার কাজ হইয়া থাকে তবে সমস্ত প্রশংসা মুজিবুর রহমানের। তবে যুক্তফ্রন্টের বিরোধের সুযোগ লইয়া পরাজিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যে পূর্ব-বাংলার উপর গবর্নরী শাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যুক্তফ্রন্ট ভাংগার ফলে যে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব-বাংলার দাবি-দাওয়া গৃহীত হইতে পারে নাই, এবং সেই হইতে ১৯৫৮ সালে দেশের চরম দূর্দৈব আসা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাকে যে যুক্তফ্রন্ট ভাংগার বিষময় পরিণাম বলা যায়, এটা দল-মত-নির্বিশেষে প্রায় সবাই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবু এর বিচারের জন্য ইতিহাসের রায়ের অপেক্ষা করিতে হইবে।

৭. লিডারের দূরদর্শিতা

কিন্তু ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিডার যখন আমাকে আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমান বিরোধের কারণ নির্ণয় ও প্রতিকার নির্দেশ করিতে আদেশ করেন, তখন একমাস পরে চরম বিপদের কথা কল্পনাও করিতে পারি নাই। তথাপি মুজিবুর রহমানের কাজ-কর্ম আমার ভাল লাগিতেছিল না। তাঁর প্রতিষ্ঠান-প্রীতি আসলে নিজের প্রাধান্য-প্রীতি বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছিল। আমার নিজেরও এ ব্যাপারে অভিযোগ ছিল। কেন্দ্রে আমাদের মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পরে লিডার প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের দিকে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। লিডারের বিপুল সংগঠনী প্রতিভা ও অমানুষিক

পরিশ্রম সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও সংগঠন লইয়া লিডারের সংগে আমার শুধু মতভেদ নয়, বিরোধও অনেক হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পরে তিনি আমাকে একদিন খুব সিরিয়াসলি বলিলেন : 'তুমি অন্য সব কাজ ফেলিয়া আওয়ামী লীগকে ইংলণ্ডের লেবার-পার্টির ধরনে গড়িয়া দাও।' আমি প্রতিবাদ করিবার আগেই আমার পেটের কথা তিনি বুঝিয়া ফেলিলেন। বলিলেন : 'মানে, গড়িব আমিও, তুমি শুধু প্ল্যান দাও।' আমি হাসিলাম। লিডার বুঝিলেন। আমি দায়িত্ব নিলাম। তিনি অতঃপর ইংলন্ডের লেবার পার্টির হিস্ট্রি, সংগঠন, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক আমাকে দিলেন। আমি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া লিডারকে বলিলাম : 'এ দায়িত্ব পালন করিতে হইলে আমাকে পার্লামেন্টারি রাজনীতি হইতে মুক্তি দিতে হইবে।' তিনি হাসিয়া ইংরাজীতে বলিলেন : 'পুলের নিকট আসিলেই তা পার হইব।' আমি পার্টি সম্বন্ধে অধ্যয়ন শুরু করিলাম। এ খবর আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমান উভয়েই রাখিতেন। কাজেই তাঁদের সংগেও আমার আলোচনা চলিল। একদিন কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের বৈঠকের সময় করাচিতে সমারমেন্ট হাউস নামক মেম্বরমেসে কতিপয় প্রথম কাতারের আওয়ামী নেতার সামনে আতাউর রহমান প্রস্তাব দিলেন যে আমার পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতিত্ব গ্রহণ করা উচিৎ। মওলানা ভাসানীর পদত্যাগের পর কয়েকমাস ধরিয়া ঐ পদ খালি ছিল। ভাইস-প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ স্থলবর্তী হিসাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছিলেন। সবাই উৎসাহের সাথে আতাউর রহমানের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রতিষ্ঠানের অফিসবিয়ারাররা মন্ত্রিত্ব বা অন্য কোনও সরকারী পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। পার্লামেন্টারি রাজনীতি হইতে সরিয়া যাইবার উপায় হিসাবে এই একটা বড় সুযোগ। লিডারের দেওয়া পার্টি-সংগঠনের দায়িত্বও এতে পালন করিতে পারিব। আমি আতাউর রহমানের প্রস্তাবে তাই মোটামুটি সম্মতি দিলাম।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই আমরা করাচি থাকিতেই জানিতে পারিলাম মুজিবুর রহমান ইতিমধ্যে ঢাকা ফিরিয়া ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় মওলানা তর্কবাগীশকে স্থায়ী সভাপতিত্বে বহাল করিয়াছেন। আতাউর রহমান কাগযে প্রকাশিত খবরটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন : 'দেখলেন ভাইসাব, আপনেরে সভাপতি করায় সেক্রেটারির অসুবিধা আছে।'

ঘটনাটা ছোট কিন্তু তুচ্ছ নয়। অথচ ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য খুবই এমবেরেসিং। সমালোচনা করা কঠিন ; প্রতিবাদ করা আরও কঠিন। অথচ আতাউর রহমানের অভিযোগ সত্য। সত্যই মুজিবুর রহমানের মধ্যে এই দুর্বলতা ছিল যে তিনি যেটাকে পার্টি-প্রীতি মনে করিতেন সেটা ছিল আসলে তাঁর ইগইযম আত্ম-প্রীতি। আত্ম-প্রীতিটা এমনি 'আত্মভোলা' বিভ্রান্তিকর মনোভাব যে ভাল-ভাল মানুষও এর

মোহে পড়িয়া নিজের পার্টির, এমন কি নিজেরও, অনিষ্ট করিয়া বসেন। আমি যখন কংগ্রেসের সামান্য একজন কর্মী ছিলাম, তখনও উঁচুস্তরের অনেক কংগ্রেস নেতার মনোভাব দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইতাম। তাঁদের ভাবটা ছিল এই ঃ 'স্বরাজ দেশের জন্য খুবই দরকার। কিন্তু সেটা যদি আমার হাত দিয়া না আসে, তবে না আসাই ভাল।' আমার বিবেচনায় মুজিবুর রহমানের মধ্যে এই আত্ম-প্রীতি ছিল খুব প্রবল। এটাকেই তিনি তাঁর পার্টি-প্রীতি বলিয়া চালাইতেন। এই জন্যই আতাউর রহমানের সহিত তাঁর ঘন-ঘন বিরোধ বাধিত। এই বিরোধে উভয়েই আমার বিচার চাহিতেন, অর্থাৎ সমর্থন দাবি করিতেন। সে বিচারে আমি অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছি। নিরপেক্ষ সুবিচারের 'ভড়ং দেখাইতে গিয়া' আমি অপরাধ করিয়াছি বলিয়া এতদিনে আমার মনে হইতেছে।

৮. বিরোধের কারণ

১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকেই এই বিরোধ পাবলিকের আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া পড়ে। জুন মাসের প্রাদেশিক পরিষদ বৈঠকে আমরা সরকার পক্ষ ভোটে হারিয়া যাই। কে. এস্. পি.র সাথে প্রায়-সমাপ্ত ব্যবস্থাটা শেষ মুহূর্তে ভাংগিয়া দেওয়ার এটাই ছিল প্রথম শাস্তি। ন্যাপের ভোটের উপর আমাদের গবর্নমেন্ট নির্ভরশীল ছিল। তারা ছিল পিছু-টান। এন্টি-স্মাগ্লিং কোযডোর অপারেশনে প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান রাযী হওয়ায় হিন্দু সমর্থকদের অনেকেই বিরুদ্ধে গেলেন। আমাদের সংগীন অবস্থা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। লিডার আমাকে গোপনে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিতে বলেন ঃ কার দোষ ? কি কারণে এই বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে ? লিডারের তখন পুরা সন্দেহ হইয়া গিয়াছে যে মুজিবুর রহমান নিজে প্রধানমন্ত্রী হইবার জন্য আতাউর রহমানের অযোগ্যতা ও অজনপ্রিয়তা প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন। এর মধ্যে তদন্ত করিবার কি আছে ? লিডার নিজেই দুইজনকে পৃথক-পৃথকভাবে জেরা-যবানবন্দি করিলেই ত হয়। আমি তাই বলিলাম। লিডার জবাব দিলেন, তিনিও ও-ধরনের সবই করিয়াছেন। এখন আমি কি করিতে পারি তাই দেখিতে চান। আমি সাধ্যমত চেষ্টা ও 'তদন্ত' করিলাম। 'তদন্তের' বিষয় ছিল উভয় বন্ধুর সাথে প্রাণ খুলিয়া দেশের মানে পূর্ব-বাংলার ভবিষ্যৎ নির্মাণে আওয়ামী লীগের ভূমিকা এবং সেই পটভূমিকায় তাঁদের উভয়ের কর্তব্য। উভয়েই খুব জোরের সংগে যে সব কথা বলিলেন তার সারমর্ম গিয়া দানা বাঁধিল দুইটি পৃথক শাসননীতিতে। আতাউর রহমান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দায়িত্ব শৃংখলাবদ্ধ দক্ষ এডমিনিস্ট্রেশন। জিলা-মহকুমা শাসকবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত সকল অফিসার রাজনীতিক পার্টিবাযি, মেম্বরদের প্রভাব ও কর্মীদের চাপমুক্ত অবস্থায় নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি মত কাজ করুন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা

এই। দলীয় কর্মী ও মেম্বরদের হস্তক্ষেপ তিনি পসন্দ করিতেন না। পার্মানেন্ট অফিশিয়ালরা সর্বদাই রাজনীতিক প্রভাবমুক্ত থাকিবেন, অন্যথায় পার্লামেন্টারি শাসন-ব্যবস্থা চলিতে পারে না, এই মত তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেন।

পক্ষান্তরে মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। এ বিষয়ে তাঁর মত সুস্পষ্ট। প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করা তাঁর দায়িত্ব। নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করা এবং দলীয় সরকারকে দিয়া সেসব ওয়াদা পূরণ করান প্রতিষ্ঠানের নেতা হিসাবে তাঁর কর্তব্য। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেখা গিয়াছে, মুষ্টিমেয় অফিসার ছাড়া সকলেই মুসলিম লীগ মনোভাবাপন্ন। আওয়ামী লীগ সংগঠনের উপর আগে তাঁরা শুধু যুলুমই করেন নাই, আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় আসাটাও তাঁরা পসন্দ করেন নাই। তাই নানাভাবে আওয়ামী মন্ত্রিসভাকে ডিসক্রেডিট করাই এঁদের সংঘবদ্ধ ইচ্ছা। এঁদের দিয়া আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও কর্মপন্থা সফল করাইতে হইলে ইঁহাদের উপর আওয়ামী লীগ কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। এই উদ্দেশ্যে জিলা ও মহকুমা অফিসারদের উপর আঞ্চলিক আওয়ামী লীগের যথেষ্ট প্রভাব থাকা আবশ্যক।

প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এইরূপ শক্তিশালী করিতে চাহিতেছেন ; পার্টির প্রধানমন্ত্রী তাতে বাধা দিতেছেন। সেক্রেটারির নযরে জিলা আওয়ামী লীগ বড়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বড়। এটা আসলে শাসনযান্ত্রিক প্রশ্ন নয়, শাসনতান্ত্রিকও বটে। পার্টি বড় না, মন্ত্রিসভা বড় ? প্রশ্নটা কিন্তু আকারে ও এলাকায় আরও বড়। পার্টি বড় না, আইনসভা বড়। আইনতঃ নিশ্চয়ই আইন-সভা বড়। কারণ আইনসভার সার্বভৌমত্বের, সভারেইন্টি-অব-দি লেজিসলেচারের, উপরই গণতন্ত্রের বুনিয়াদ। কিন্তু ন্যায়তঃ পার্টি বড়। পার্টিতে আগে সিদ্ধান্ত হইবে ; আইন-সভা সেই সিদ্ধান্তে অনুমোদনের রবার স্ট্যাম্প মারিবে মাত্র। কারণ অপযিশন দলের মেম্বররাই শুধু সরকারী বিলের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন, 'পযিশন' দলের মেম্বররা পারেন না। পার্টি গবর্নমেন্ট চালাইতে পার্টি ডিসিপ্লিন দরকার। পার্টি 'পযিশনে' আসে নির্বাচনে মেজরিটি করিতে পারিলে। নির্বাচনে জয়ী হইতে গেলে নির্বাচনী ওয়াদা বা মেনিফেস্টো দেওয়া দরকার। সে মেনিফেস্টো কার্যকরী করা পার্টির নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব। কাজেই সে দায়িত্ব পালনের উপায় নির্ধারণ ও আইন-রচনার কাজটা পার্টিতে স্থির হওয়া দরকার। পার্টির মেম্বররা কাজেই আইন-পরিষদে দাঁড়াইয়া পার্টি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না। এই ভাবেই পার্টি গবর্নমেন্ট কার্যতঃ আইন-পরিষদের সভারেইনটিকে পার্টি-প্রতিষ্ঠানের সভারেইনটিতে পরিণত করেন। এটা গণতন্ত্র ও পার্টি গবর্নমেন্টের চিরন্তন অন্তর্বিরোধ, ইন্টার্নেল কনট্রাডিকশন। ইহার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁদের সমাধানের আশায় আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও পার্টি–সেক্রেটারির বিরোধ এমন আসন্ন হইয়াছে যে এটা এখনি মিটানো দরকার। আমি লিডারকে তদনুসারে আমার মত জানাইলাম। আমার অভিমত অনুসারে 'দোষ কার' প্রশ্নের মীমাংসার কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। আমার মতে উভয়ের দোষ ফিফ্‌টি–ফিফ্‌টি। আমার একটা সুনাম বা বদনাম ছাত্রজীবন হইতেই ছিল। আমি নাকি কোনও বিতন্ডায় এক পক্ষ নিতে পারিতাম না। বলিতাম ঃ এটাও সত্য, ওটাও সত্য। সেজন্য কলিকাতায় বন্ধু–মহলে, বিশেষতঃ সাংবাদিক–মহলে, আমার অপর এক নাম ছিল 'মিঃ এটাও সত্য ওটাও সত্য।' মুসলিম লীগের ত্রিশের দশকের সাম্প্রদায়িক নীতির জন্য আমি ঘোরতর মুসলিম লীগ–বিরোধী ছিলাম। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব আমাকে অতিশয় ভাবাইয়া দেয়। এই সময় হইতে প্রায় তিন বছর কাল আমার রাজনীতিক চিন্তায় ভাবান্তর ঘটে। এই সময় আমি যা–যা বলিতাম, তারই নাম দিতেন বন্ধুরা ঃ 'কংগ্রেসও ঠিক, মুসলিম লীগও ঠিক ; জাতীয়তাও ঠিক, সাম্প্রদায়িকতাও ঠিক ; পাকিস্তানও ঠিক, অখণ্ড ভারতও ঠিক।' অবশ্য আমার মত অতটা বিদঘুটে ছিল না। তবু সুবিচারী র‍্যাশনালিস্ট হিসাবে আমার সুনাম রক্ষার জন্য ঐ বদনাম বহনের মত স্যাক্রিফাইসটুকু করিতাম। ফলে বুদ্ধিমান গোঁড়ারা আমাকে র‍্যামনালিস্ট না বলিয়া এম্বিভ্যালেন্ট (মতহীন লোক) বলিতেন গোঁড়ামির বদনামের চেয়ে এই বদনামটাকে আমি অধিক সম্মানজনক মনে করিতাম।

লিডার কিন্তু আমার নিরপেক্ষতায় খুশি হইলেন কিন্তু। হাসিয়া বলিলেন ঃ 'বিবদমান দুই পক্ষেরই দুশ্‌মন হওয়ার এমন সোজা রাস্তা আর নাই। কিন্তু আমি এদেরে লইয়া করি কি ?' আমি সহজ উত্তর দিলাম ঃ 'নির্বাচন পর্যন্ত স্টেটাস কোও, যেমন আছে তেমনি, বজায় থাক।'

৯. লিডারের দুশ্চিন্তা

লিডারের দুশ্চিন্তা দূর হইল না। তিনি তখন সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসে থাকিতেন। একদিন খুব সকালে টেলিফোনে ডাকিলেন। গিয়া দেখিলাম, আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় আরও অনেকেই আসিয়াছেন। কিন্তু সবার সাথে লিডার এক সাথে দেখা করিবেন না। পৃথক–পৃথক দেখা করিবেন। আমাকেই বোধ হয় প্রথম ডাকিলেন একদম মেটার–অব–ফ্যাক্ট বিষয়ী আলাপ। প্রধানমন্ত্রী ও সেক্রেটারির বিরোধের ফলে পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বিধাবিভক্তি, বিভিন্ন জিলায় তার প্রতিক্রিয়া (লিডারও এই সময় জিলায়–জিলায় সফর করিতেছিলেন), তাঁর ফলে মন্ত্রিসভার সংকটজনক অবস্থা, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন ঠিক হইয়া গিয়াছে) আমাদের আভ্যন্তরীণ বিভেদের কুফল ইত্যাদি সংক্ষেপে অথচ দক্ষতার সংগে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। সবই ঠিক। সুতরাং মতভেদের ফাঁক নাই। লিডারের সংগে একমত হইলাম। তিনি শুইয়াছিলেন। এইবার উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন ঃ 'আমি

গভীরভাবে চিন্তা করিয়া ঠিক করিয়াছি তোমাকেই প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নিতে হইবে। আতাউর রহমানের দ্বারা আর চলিতেছে না।' আমি তাজ্জব হইলাম। তলে-তলে অবস্থা এতটা খারাপ হইয়াছে ? এই পরামর্শ লিডারকে কে দিয়াছে ? আমি মনে-মনে খুবই গরম হইলাম। কিন্তু বাহিরে শান্ত থাকিয়া লিডারের সংগে তর্ক জুড়িলাম। আধ ঘন্টা-চল্লিশ মিনিটের মত তর্ক করিয়া লিডারকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম : (১) নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাস আগে প্রধানমন্ত্রী বদলাইয়া লাভের চেয়ে লোকসান হইবে বেশি ; (২) নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নিতে ব্যক্তিগতভাবে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে ; (৩) আতাউর রহমানের উপর বেশির ভাগ দলীয় সদস্যের আস্থা নষ্ট হইয়াছে, কথাটা মোটেই সত্য নয়। প্রথম দফার পক্ষে যুক্তি দিলাম : আতাউর রহমান-বিরোধী এই অভিযান দলাদলির ফল। এই উপদলীয় কোন্দলে লিডারের সারেন্ডার করা উচিত নয়। তার বদলে 'নির্বাচনের পরে যাকে খুশি প্রধানমন্ত্রী করিও' এই কথা বলিয়া সব থামাইয়া দেওয়া লিডারের উচিৎ। যদি তিনি তা না করেন তবে উপদলীয় কোন্দল আরও বাড়িবে ; আতাউর রহমানের সমর্থকরা এই অপমান শুইয়া গ্রহণ করিবেন না। নূতন আকারে উপদলীয় কলহ দেখা দিবে। দ্বিতীয় দফার পক্ষে আমার যুক্তিটা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত। সাধারণ নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাস আগে প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাঁধে ফেলিলে আমার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটিবে। আতাউর রহমান তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে যত ভাল কাজ করিয়াছেন, তাঁর প্রশংসাটুকু থাকিবে তাঁরই। আর তিনি যদি কোন খারাপ কাজ করিয়া থাকেন, তবে, তার নিন্দাটুকু সবই আসিবে আমার ঘাড়ে। কাজেই যিনি এ সময় আমার উপর প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব চাপাইতে চান, তাঁকে আমার পরম হিতৈষী বলা চলে না। তৃতীয় দফায় আমার যুক্তি ছিল এই যে আওয়ামী লীগ দলীয় মেম্বরদের প্রায় সকলেই আতাউর রহমানের সমর্থক, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জাত ধারণা। সুতরাং তাঁর প্রতি অধিকাংশ মেম্বরের আস্থা নাই, এ কথা সত্য নয়। লিডারকে অন্যরূপ ধারণা যাঁরা দিয়াছেন তাঁরা ভুল খবর দিয়াছেন।

লিডারের মুখে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। আমি সাহস পাইয়া আরও কিছু কথা বলিলাম। আসন্ন আইন পরিষদের বৈঠকে আমাদের স্ট্রাটেজি ও আগামী নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য আলোচনা করিলাম। মনে হইল আতাউর রহমান বিরোধী মতটা তাঁর অনেকখানি নরম হইয়াছে। আমি বিদায় হইলাম।

নেতাদের যাঁরা অন্য রুমে অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবার আগে ডাক পড়িল দলের চিফ হুইপ মিঃ আবদুল জব্বার খদ্দরের। আমি তাঁর সাথে খুব জোরে মুসাফেহা করিয়া বিকালে আমার সংগে দেখা করিতে বলিলাম। তিনি লিডারের কামরায় ঢুকিলেন। সমবেত অন্যান্য বন্ধুদের জেরা এড়াইয়া দ্রুতগতিতে গিয়া নিজের গাড়িতে উঠিলাম। পথে সমস্ত ব্যাপারটা দুহ্‌রাইলাম। কল্পনায় একটা আন্দায করিলাম। না, যেকোনও শক্তি দিয়া এই পতন রুখিতেই হইবে। খদ্দরকে আসিতে

বলিয়াছিলাম বিকালে। তার বদলে তিনি আসিলেন তখনই। আমার বাসায় ফিরার বড়জোর এক ঘন্টা পরেই। তিনি আসিয়া লিডারের সাথে তাঁর আলাপের রিপোর্ট করিলেন। মোটামুটি প্রায় একই কথা। প্রধানমন্ত্রী বদলাইতে হইবে। ঐ প্রসংগে লিডার আমার নাম করায় তিনি আর বিকাল পর্যন্ত ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। তিনি মনে-মনে ধরিয়া লইয়াছিলেন, আমি রাযী হইয়াছি। তিনি আতাউর রহমান সাহেবের একজন ঘোর সমর্থক। কাজেই আমাদের সে মর্মে অনুরোধ করিতেই তাঁর আসা। আমি হাসিয়া সব কথা বলিলাম। যুক্তিও দিলাম। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ি গেলেন।

১০. বিরোধের পরিণাম

সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানকে টেলিফোনে ধরিলাম। রাতে আসিতে বলিলাম। তিনি আসিলেন। হাসিমুখে তাঁর প্রতি চরম রাগ দেখাইলাম। তাঁর উপর অসাধু উদ্দেশ্য আরোপ করিলাম। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারিবার চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছ, ভাই।' তিতা সুরে হাসিমুখে বলিলাম। তিনি অবাক হইলেন। 'অবাক হইবার ভংগি করিও না।' আমি বলিলাম।'আতাউর রহমানকে বেইযযত করিয়া তাড়াইয়া আমাকে সেখানে পাঁচ মাসের জন্য বসাইয়া অযোগ্য প্রমাণ করিয়া নির্বাচনের পরে নিজে প্রধানমন্ত্রী হইবার বেশ আয়োজনটা করিয়াছ।' আমি কঠোর বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বলিলাম। তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন : 'মুরুব্বি মানি বলিয়া যা-তা বলিবেন না। শ্রদ্ধা রাখিতে পারিব না। তর্ক করিলাম। যার-তার যুক্তি দিলাম। রাগা-রাগি সাটা-সাটি করিলাম। এক স্তরে আমার উপর রাগ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। জোর করিয়া বসাইলাম। যতই রাগ করুন, শেষ পর্যন্ত শান্ত হইলেন যখন আমি পরিণামে দেশের অবস্থা ও পার্টির পরাজয়ের কথা বলিলাম। যত দোষই তাঁর থাক, তিনি দেশকে ভালবাসেন। পার্টিকেও। সুতরাং শেষ পর্যন্ত উভয়ে শান্তভাবে একমত হইলাম : যেকোনও ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা আমাদের দলীয় ঐক্য বজায় রাখিতে এবং আতাউর রহমান-মন্ত্রিসভাকে পদে বহাল রাখিতে হইবে। ইতিমধ্যে দুই-তিনবার মন্ত্রিসভার ওলট-পালট হইয়াছে। আমাদের মন্ত্রিসভা কায়েম করিবার জন্য হক সাহেবকে গবর্নরের পদ হইতে সরাইয়া বুড়া বয়সে তাঁকে অপমান করিতে হইয়াছে। বন্ধুবর সুলতান উদ্দিন আহমদকে হক সাহেবের স্থলে গবর্নর করিয়া আনিতে হইয়াছে। বামপন্থী আদর্শবাদী ন্যাপ-পার্টি তিন-তিনবার পক্ষ পরিবর্তন করিয়াছে। এর কোনটাই আমাদের জন্য প্রশংসার কথা নয়। এসব ব্যাপারেই মুজিবুর রহমান ও আমি একমত হইলাম। আমার কোনও সন্দেহ থাকিল না যে মুজিবুর রহমান সত্যই অন্ততঃ আগামী নির্বাচন পর্যন্ত আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব কামনা করেন। আমি লিডার ও আতাউর রহমানকে আমার মত জানাইলাম।

ইতিমধ্যে ১৯৩ ধারা জারি হইয়াছিল। লিডারের চেষ্টায় আগস্ট মাসের শেষ দিকে আতাউর রহমানকে মন্ত্রিসভা গঠনের কমিশন দেওয়া হইল। নয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইল বটে, কিন্তু আতাউর রহমান আমাকে জানাইলেন, মন্ত্রী নিয়োগে তাঁর মত টিকে নাই। লিডারই মন্ত্রীদের তালিকা, এমন কি তাঁদের দফতর বন্টন পর্যন্ত সবই, করিয়াছেন। তিনি অভিযোগ করিলেন, লিডার মুজিবুর রহমানের পরামর্শ মতই এসব করিতেছেন। এই দুঃখে তিনি একবার প্রধানমন্ত্রিত্বের এই বোঝা বহিতে অস্বীকার করিতে চাহিলেন। আমি তাঁকে অনেক অনুরোধ করিয়া 'বিদ্রোহ' হইতে বিরত করিলাম। কিন্তু আতাউর রহমান শান্ত হইলে কি হইবে, মিঃ কফিলুদ্দিন চৌধুরী ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি আমার বাসায় আসিয়া পদত্যাগের হুমকি দিলেন। আগে রেভিনিউ, সি.এণ্ড বি. ও লেজিসলেটিভ তিন–তিনটা দফতর ছিল তাঁর। তাঁকে না জানাইয়াসি. এন্ড বি. দফতর কাটিয়া নিয়া নয়া মন্ত্রী মিঃ আবদুল খালেককে দেওয়া হইয়াছে। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে মিঃ আবদুল খালেক আমার বিশেষ স্নেহ–ভাজন 'ছোট ভাই।' তিনি যোগ্যতার সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। আমরা যারা এক সময় কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব করিয়াছি, তাঁদের কারও পক্ষেই আর প্রাদেশিক মন্ত্রী হওয়া উচিত নয়। একথা আমি নীতি হিসাবে লিডারের কাছে এবং পার্টি–বৈঠকে বলিয়াছি। তবু খালেক সাহেবকে একরূপ জোর করিয়া এই নয়া মন্ত্রিসভায় নেওয়া হইয়াছে এবং তাঁকেই সি. এন্ড বি. দফতর দেওয়া হইয়াছে। মিঃ কফিলুদ্দিনের অভিযোগ, এটা মুজিবুর রহমানের কাজ। তিনি অপমানিত হইয়াছেন। কাজেই আর মন্ত্রিত্ব করিবেন না। কফিলুদ্দিন বয়সে আর সবার বড় হইলেও আমার ছোট। কাজেই তাকে ধমকাইলাম। বেগার্তা করিলাম। হাতে ধরিলাম। বলা যায় পায়েও ধরিলাম। কারণ বড় ভাই ছোট ভাই–এর হাত ধরাকেই পা ধরা বলা যায়। অবশেষে কফিলুদ্দিন শান্ত হইলেন।

১১. লিডারের ভুল

কিন্তু আমার মন শান্ত হইল না। মাত্র পাঁচমাস বাকী ইলেকশনের। এ সময়ে মন্ত্রীদের রদ–বদলের কোনও দরকারই ছিল না। তার উপর প্রধানমন্ত্রীর অমতে এটা করা আরও অন্যায় হইয়াছে। এটা আমাদের পার্টির দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ; পতনেরও পূর্বাভাস। আমার আশংকার কথা লিডারকে বলিলাম। তিনি ভুল বুঝিলেন। ভাবিলেন, আতাউর রহমানের কথামত আমি লিডারকে এসব কথা বলিতেছি। লিডারের এক শ' একটা গুণের মধ্যে এই একটা সাংঘাতিক দোষ। তাঁর মত ডেমোক্র্যাটও খুব কম নেতাই আছেন। আবার তাঁর মত ডিক্টেটরও খুব কম দেখিয়াছি। তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত এই বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়াই আমি লিডারকে কথায়–কথায় বলিতাম ঃ 'ইউ আর এ ডিক্টেটর টু এস্টাব্লিশ ডেমোক্র্যাসি।' তিনি অনেক সময় হাসিতেন। কিন্তু

দুই–একবার গম্ভীরও হইয়া পড়িতেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও অসংখ্য গুণের জন্য আওয়ামী লীগ উপকৃত হইয়াছে যেমন, তাঁর দুই–একটা দোষের জন্য তেমনি আওয়ামী লীগের এবং পরিণামে দেশের ক্ষতিও হইয়াছে অপরিসীম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সম্প্রসারিত সভার সর্বসম্মত অভিমতের বিরুদ্ধে তিনি মোহাম্মদ আলী বগুড়ার কেবিনেটে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর এক সাংবাদিকের ঐ প্রকার প্রশ্নের জবাবে বলিলেন ঃ 'আওয়ামী লীগ আবার কি ? আমিই আওয়ামী লীগ।' সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করিলেন ঃ 'এটা কি আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো–বিরোধী না ?' জবাবে লিডার বলিলেন ঃ 'আমিই আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো—এই ঘটনার পরে লিডারের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতেই দুঃখ করিয়া বলিলাম ঃ 'কার্যতঃ আপনিই আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের 'মেনিফেস্টো' এটা ঠিক, কিন্তু প্রকাশ্যে ও–কথা বলিতে নাই। তাতে আওয়ামী লীগের মর্যাদা ত বাড়েই না, আপনারও না। জিন্না সাহেব মুসলিম লীগের ডিক্টেটর–নেতা ছিলেন। কিন্তু কোনও দিন তা মুখে বলেন নাই। বরং কংগ্রেস ও বড়লাটের সহিত আলোচনা করিতে গিয়া সব সময়েই বলিতেনঃ 'ওয়ার্কিং–কমিটির সাথে পরামর্শ না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারিব না।' লিডার নিজের ভুল স্বীকার করিয়া আফসোস করিয়াছিলেন। কিন্তু অনিষ্টটা তখন হইয়া গিয়াছে। অতীতের ভুলের অভিজ্ঞতায় তিনি ভবিষ্যতে ভুল করিতে বিরত হইতেন না। একই ধরনে একই কারণে তিনি পুনঃ পুনঃ একই রকম ভুল করিতেন। ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে কৃষক–শ্রমিক পার্টির মেজরিটির সাথে গবর্নর হক সাহেবের সমর্থন দেওয়ায় আওয়ামী লীগের একটা বোঝাপাড়া হয়। এই বোঝাপড়ায় কে. এস. পি'র নান্না মিয়া–মোহন মিয়া গ্রুপ সুহরাওয়ার্দী–নেতৃত্ব মানিয়া নেন। লিডার নিজেই সে বোঝাপড়া অনুমোদন করেন। তারপর হঠাৎ বিনা–কারণে এই বোঝাপড়া ভাংগিয়া দেন। বুঝা গেল মুজিবুর রহমানের পরামর্শেই তিনি এটা করিলেন। তাতে লিডার শুধু নিজেকেই ছোট করিলেন না। আওয়ামী লীগ, আওয়ামী মন্ত্রিসভা ও পূর্ব–পাকিস্তানের ভবিষ্যৎও বিপন্ন করিলেন। আমার বিবেচনায় এটা ছিল বিশাল ব্যক্তিত্বশালী লিডারের নিতান্ত শিশু সুলভ দুর্বলতার দিক। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইস্কান্দর মির্যার কথায় আমাদের সর্বসম্মত অনুরোধ ঠেলিয়া 'এক ইউনিট' ব্যাপারে রিপাবলিকান পার্টির সহিত শত্রুতা শুরু করিয়াছিলেন। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতন হয়। বেশ কিছুদিন পরে বড় দেরিতে তিনি মির্যার ষড়যন্ত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে পূর্ব–বাংলার লিডার ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই দশ–এগার বছর লিডারকে একই রকম শিশু–সুলভ ভুল করিতে

দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইত। অত দুঃখেও আমি রসিকতা করিয়া একদিন বলিয়াছিলাম ঃ 'স্যার, খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাধ, আপনার বিবি নাই।' তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন ঃ 'কেন ?' আমি বলিলাম ঃ 'থাকিলে অনেকবার আপনার বিবি তালাক হইয়া যাইত। হাদিস শরিফে আছে ঃ একই রকমে কোনও মুসলমান তিনবার ঠকিলে তার বিবি তালাক হইয়া যায়।' হাদিসটা সহি কি যইফ জানি না। তবে তাতে মূল্যবান উপদেশ ও প্রচুর অম্ল রস আছে। তা লিডার আগে ছাত-ফাটা অট্টহাসি করিলেন। পরে গম্ভীর হইয়া বলিলেন ঃ 'জীবনে শুধু জিতিলেই চলে না, হারিতেও হয়। জান, মহত্ত্বের জয়ের চেয়ে হারই বেশি। ?'

১২. লজ্জাস্কর ঘটনা

যা হোক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াই আইন পরিষদের বৈঠক ডাকিতে হইল। স্পিকার আবদুল হাকিম সাহেবের প্রতি আমাদের পার্টি-নেতাদের আস্থা ছিল না। তাঁর উপর একটা অনাস্থা-প্রস্তাবও দেওয়া হইয়াছিল। সে প্রস্তাব বিবেচনার সুবিধার জন্য নিজে হইতে ডিপুটি-স্পিকারের উপর ভার দিয়া সরিয়া বসা তাঁর উচিৎ ছিল। তিনি তা না করিয়া নিজেই সে প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। এই ভাবে স্পিকারের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত লাগায় মুজিবুর রহমান আমাকে বলিলেন ঃ ডিপুটি-স্পিকারকে শক্ত করিয়া আমাদের পক্ষ করিতে হইবে। ডিপুটি-স্পিকার শাহেদ আলী আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ও হোস্টেল-মেট। আমরা উভয়ে অনার্স দর্শনের ছাত্র বলিয়া আমাদের হৃদ্যতাও ছিল আর সকলের চেয়ে গভীর। তিনি ইতিপূর্বেও হাউসে প্রিযাইড করিয়াছেন এবং আমাদের পক্ষেই রুলিং দিয়াছেন। কিন্তু স্পিকার ছিলেন তখন বিদেশে। এখন স্পিকার দেশে হাযির। তাঁর সাথে আমাদের পার্টির সংঘাত। এই অবস্থায়ই তাঁকে বুঝাইয়া একটু মযবুত করিয়া দিতে মুজিবুর রহমান আমাকে ধরিলেন। আমি ডিপুটি স্পিকারের বাড়ি গেলাম। অনেক কথা হইল। তিনি মযবুত হইলেন।

ডিপুটি-স্পিকারের সভাপতিত্বে হাউস শুরু হইল। হাউস শুরু হইল মানে অপযিশন দলের হট্টগোল শুরু হইল। শুধু মৌখিক নয়, কায়িক। শুধু খালি-হাতে কায়িক নয়, সশস্ত্র কায়িক। পেপার ওয়েট, মাইকের মাথা, মাইকের ডান্ডা, চেয়ারের পায়া-হাতল ডিপুটি-স্পিকারের দিকে মারা হইতে লাগিল। শান্তিভংগের আশংকা করিয়া সরকার পক্ষ আগেই প্রচুর দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁরা হাতে-চেয়ারে ডিপুটি-স্পিকারকে অস্ত্র-বৃষ্টির ঝাপটা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অপযিশনের কেউ-কেউ মঞ্চের দিকে ছুটিলেন। তাঁদের বাধা দিতে আমাদের পক্ষেরও স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী দু-চারজন আগ বাড়িলেন। আমার পা ভাংগা ছিল। তাই না যোগ

দিতে পারিলাম মারামারিতে, না পারিলাম সাবধানীদের মত হাউসের বাহিরে চলিয়া যাইতে। নিজ জায়গায় অটল-অচল বসিয়া বসিয়া-সিনেমায় ফ্রি স্টাইল বক্সিং বা ষ্টেডিয়ামে ফাউল ফুটবল দেখার মত এই মারাত্মক খেলা দেখিতে লাগিলাম। খেলোয়াড়দের চেয়ে দর্শকরা খেলা অনেক ভাল দেখে ও বুঝে। আমি তাই দেখিতে ও বুঝিতে লাগিলাম।

যা দেখিলাম, তাতে ভদ্রের ইতরতায় যেমন ব্যথিত হইলাম ; বুদ্ধিমানের মুর্খতায় তেমনি চিন্তিত হইলাম। গণ-প্রতিনিধিরা বক্তৃতা ও ভোটের দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব লইয়াই আইনসভায় আসিয়াছেন। গুন্ডামি করিয়া কাজ হাসিল করিতে আসেন নাই, ভাল কাজ হইলেও না। শিক্ষিত ভদ্র ও সমাজের নেতৃস্থানীয় বয়স্ক লোকেরাও কেমন করিয়া ইতরের মত গুন্ডামি করিতে পারেন, চেনা-জানা সুপরিচিত, সমান শিক্ষিত ভদ্র সহকর্মী ডিপুটি-স্পিকারের উপর সমবেতভাবে মারাত্মক অস্ত্রের শিলা-বৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন, তা দেখিয়া আমার সারা দেহমন ও মস্তিষ্ক বরফের মত জমিয়া গিয়াছিল। সে বরফেরও যেন উত্তাপ ছিল। আমারও রাগ হইয়াছিল। সে অবস্থায় আমার হাতে রিভলভার থাকিলে আমি নিজের আসনে বসিয়া আক্রমণকারীদের গুলি করিয়া মারতে পারিতাম। ওঁরা সবাই আমার সহকর্মী শিক্ষিত ভদ্রলোক। অনেকেই অন্তরংগ বন্ধু। তবু তাঁদের গুলি করিয়া মারিতে আমার হাত কাঁপিত না। নিছক অক্ষমতার দরুন অর্থাৎ রিভলভারের অভাবে তা করিতে পারি নাই। করিতে পারিলে আমিও ওঁদেরেই মত গুন্ডা আখ্যা লাভের যোগ্য হইতাম। বেশকম শুধু হইত ওঁদের হাতে মাইকের মাথা, পেপার ওয়েট আমার হাতে রিভলভার। বুঝিলাম ওঁদেরও মনে আমারই মত রাগ ছিল। সে রাগের কারণ ডিপুটি-স্পিকার অন্যায়ভাবে সরকার পক্ষকে সমর্থন করিতেছিলেন। ডিপুটি-স্পিকারকে হত্যা করিবার ইচ্ছা অপযিশন মেম্বরদের কারও ছিল না নিশ্চয়ই। এমনকি, অমন অসভ্য গুন্ডামিতে যাঁরা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁদের সকলে জানিয়া-বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া ঐ আক্রমণ করেন নাই। আমি নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়াছি, হামলাকারীদের অনেকেই স্পন্টেনিয়াসলি, নিজের অজ্ঞাতসারেই, যেখন শুধু দেখাদেখি পাটকেল নিক্ষেপ করিতেছেন। এটা যেন হাটের মার। সবাই মারিতেছে, আমিও একটা মারি, ভাবটা যেন এই। কিন্তু ফল কি হইতেছিল ? দেহরক্ষীরা চেয়ারের উপর চেয়ার খাড়া করিয়া ডিপুটি স্পিকারের সামনে প্রাচির তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে প্রাচিরটা ভেদ করিয়া হামলাকারীদের পাটকেল ডিপুটি-স্পিকারের মাথায় নাকে মুখে লাগিতেছিল। শাহেদ আলী কোনও বীর বা ডন-কুস্তিগির পাহলওয়ান ছিলেন না। সাদা-সিধা শান্ত-নিরীহ ছোট কদের একটি অহিংস

ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। দর্শনের ছাত্র না শুধু। চলনে-আচরণেও ছিলেন দার্শনিক। ওকালতি বা রাজনীতির চেয়ে স্কুল-কলেজের মাস্টারি করাই তাঁকে বেশি মানাইত। এমন লোকের উপর অমন হামলা ! দেহরক্ষীরা চেয়ারের পাহাড় না তুলিলে তিনি ঐ মঞ্চের উপরই মরিয়া একদম চ্যাপ্টা হইয়া যাইতেন। পরের দিন হাসপাতালে তিনি সত্য-সত্যই মারা যান। এই হত্যাকান্ডের আদালতী বিচার হয় নাই। ভালই হইয়াছে। বিচার হইলে অনেক মিয়ারই শাস্তি হইত। দেশের মুখ কালা হইত। কিন্তু আদালতী বিচার না হইয়া গায়েবী বিচার হইয়াছে। তাতে দেশের মুখ কালা হইল কিনা পরে বুঝা যাইবে ; কিন্তু দেশের অন্তর যে কালা হইয়াছে সেটা সংগে সংগেই বোঝা গিয়াছে। ঐ ঘটনার পনর দিনের মধ্যেই মার্শাল ল। শাহেদ আলীর অপমৃত্যুকে মার্শাল ল প্রবর্তনের অন্যতম কারণ বলা হইল। অর্থাৎ পরের ঘটনার জন্যই আগেরটা ঘটিয়াছিল বা ঘটান হইয়াছিল। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিতে গিয়া শাহেদ আলী নিহত হইলেন অপযিশনের ঢিল-পাটকেলে। অথচ পূর্ব বাংলার দুশমনরা তখনও বলিলেন এবং আজও বলেন ঃ আওয়ামী লীগই শাহেদ আলীকে হত্যা করিয়াছে। কোন্ পাপে এ মিথ্যা তহমত !

দুর্ভাগ্য একা আসে না। তার মানে, দুর্ভাগ্যের কারণ বা কর্তা যাঁরা তাঁদের যেন শনিতে পাইয়া বসে। শনিতে ধরে উভয় পক্ষকেই। কারণ দুর্ভাগ্যের মধ্যেও এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দোষ দেয়। ঢাকায় এই কেলেংকারিতেও আমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল না। করাচিতেও দরকার হইল যত নষ্টের গোড়া মির্যার আর এক চাল। সরল-সোজা আয়েশী প্রধানমন্ত্রী ফিরোয নুনকে দিয়া বলাইলেন ঃ আওয়ামীদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ঢুকিতে হইবে। মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। বাহির হইতে সমর্থন দিয়া ফপরদালালি টপ্ কামাতব্বরি করিতে দেওয়া হইবে না। এসব কথায় আওয়ামী লীগ নেতাদের কান না দেওয়া উচিৎ ছিল। আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় না যাওয়ার অনেক কারণ ছিল। তার মধ্যে প্রধান কারণ আওয়ামী লীগ মন্ত্রিত্বে অংশ না নিয়াই নূন-মন্ত্রিসভার সমর্থন দিবে এই চুক্তি হইয়াছিল। এই ত্যাগের বদলা যুক্ত-নির্বাচন প্রথায় আগামী সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে। নির্বাচনের আগে আইন-পরিষদের আর কোনও অধিবেশন হওয়ার দরকার নাই। নূন-মন্ত্রিসভা বিনাবাধায় মন্ত্রিত্ব চালাইয়া যাইতেছেন। তবু আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভায় যাচিয়া জায়গা দেওয়ার প্রস্তাবকে স্বভাবতঃই সন্দেহের চোখে দেখা উচিৎ ছিল এবং খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করা কর্তব্য ছিল। আওয়ামী লীগকে লইয়া খেলা করিবার জন্যই যে মির্যা এই প্রস্তাব দেওয়াইয়াছেন, এটা ছিল সুস্পষ্ট। করাচির খবরের কাগযগুলি গোড়া হইতেই বলা

শুরু করিল আওয়ামী লীগের মন্ত্রী নেওয়া হইবে বটে, কিন্তু সহরাওয়ার্দী ও আবুল মনসুরকে নেওয়া হইবে না। এই ধরনের 'সংবাদ' ছাপিয়া মির্যার দল গোড়া হইতেই লিডার ও আমাকে বেকায়দায় ফেলিলেন। এ অবস্থায় আমাদের মুখ দিয়া মন্ত্রিত্বে না যাওয়ার কথাটা কেমন অশোভন দেখায় না ? বন্ধুরা ভাবিবেন আমরা নিজেরা যাইতে পারিব না বলিয়াই বুঝি বিরোধিতা করিতেছি। এ রিস্ক নিয়াও বাধা দিলাম। আতাউর রহমান, মানিক মিয়া ও আমি বিরোধিতা করিলাম। যতদূর জানি লিডারও এ সময়ে মন্ত্রিত্বে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। এটা যে মির্যার একটা চাল, এ কথায় মুজিবুর রহমানও আমার সাথে একমত ছিলেন। কিন্তু কেন জানি না, কার বুদ্ধিতে বুঝি নাই, মুজিবুর রহমান আমাদের কাউকে না জানাইয়া কয়েকজন হবু মন্ত্রী লইয়া হঠাৎ করাচি চলিয়া গেলেন। মন্ত্রিত্বের শপথ নিলেন। ভাল পোর্টফলিও পাওয়া গেল না বলিয়া চার-পাঁচ দিন পরে পদত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রেই মার্শাল ল। কি চমৎকার প্ল্যান্‌ড্ ওয়েতে সব কাজ করা হইয়াছিল ! প্ল্যান্‌টা ছিল সুস্পষ্ট। স্বার্থান্ধ ছাড়া আর সবাই বুঝিয়াছিলেন ! লিডারও বুঝিয়াছিলেন । কিন্তু সেই দুর্বলতার জন্য তিনি এবারেও দৃঢ়ভাবে 'না' বলিতে পারেন নাই। ১৯৪৮ সালের আগস্টে, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল ও অক্টোবরে লিডারের যে সামান্য দুর্বলতায় দেশ ও আওয়ামী লীগ চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল, ১৯৫৮ সালের অক্টোবরেও সেই একই দুর্বলতা আমাদের কাল হইল।

উনত্রিশা অধ্যায়
ঝড়ে তছ্‌নছ্‌

১. বজ্রপাত

৭ই অক্টোবর ১৯৫৮ সাল। রাত আটটা। রেডিওতে শুনিলাম, দেশে মার্শাল ল হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যা শাসনতন্ত্র 'এ্যাব্রোগেট' করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও আইন-পরিষদ ভাংগিয়া দিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খাঁকে প্রধানমন্ত্রী ও চিফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করিয়াছেন।

স্তম্ভিত হইলাম। রেডিওতে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সেনাপতির মুখে কথাটা না শুনিলে বিশ্বাস করতিাম না। ওঁদের মুখে শুনিয়াও বিশ্বাস করা সহজ হইল না। শাসনতন্ত্র বাতিল করার ক্ষমতা এঁরা পাইলেন কোথায় ? মিলিটারি কু করিতে যে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা লাগে না, এটা আমি তখনও বুঝি নাই। কিন্তু শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া সামরিক বাহিনী রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিলে শাসনতন্ত্রের সৃষ্ট প্রেসিডেন্টও যে থাকেন না, এটাও কি ওঁরা বুঝেন নাই ? না বুঝার কথা নয়। কাজেই কোথাও কোনও মার-প্যাঁচ আছে। যত মার-প্যাঁচই থাকুক, কোমরে যার জোর আছে, অর্থাৎ দেশরক্ষা বাহিনী যাঁর পক্ষে তাঁরই জয় হইবে, এটা বুঝা গেল। কিন্তু কেন কি উদ্দেশ্যে এই বিপ্লবের তছ্‌নছ্‌ করা হইল, বোঝা গেল না। রাজাহীন প্রজাতন্ত্রে শাসনতন্ত্র বাতিল করার উদ্দেশ্য কি হইতে পারে ?

অন্য কিছু চিন্তা করিবার ছিল না বলিয়াই এইসব সুস্পষ্ট নিরর্থক চিন্তা করিতেছিলাম। আর ভাবিবই কি ছাই ! কোনই কূল-কিনারা করিতে পারিলাম না। কার সাথেই বা কথা বলিব ? প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান করাচিতে। পার্টির সেক্রেটারি মুজিবুর রহমানও সেখানে। লিডার সুহরাওয়ার্দীও করাচিতেই থাকেন। কেউ নাই ঢাকায়। দলের মন্ত্রীদের কারো-কারো খোঁজ করিলাম। না, কেউ বাসায় নাই। গবর্নর জনাব সুলতানুদ্দিন আহমদ অন্তরংগ বন্ধু-মানুষ। তাঁকে টেলিফোন করিতে হাত উঠাইলাম। দ্বিতীয় চিন্তায় বাদ দিলাম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী কয়েকদিন আগে ঢাকায় আসিয়াছেন। অগত্যা তাঁকেই ধরিলাম। কথা হইল। তিনিও আমার মতই স্তম্ভিত। আর কিছু জানেন না। ইশারা-ইংগিতে বলিলেন ঃ টেলিফোনে এ বিষয়ে আলাপ করা নিরাপদ নয়। ঠিকই ত ! ছাড়িয়া দিলাম। বাসার কাছেই 'ইত্তেফাক' অফিস। অগত্যা সেখানে যাইব ভাবিলাম। এমন সময় গবর্নরের টেলিফোন পাইলাম। স্বয়ং তিনিই ধরিয়াছেন। বলিলেন ঃ 'গাড়ি পাঠাইছি। চইলা আস।' আর কিছু বলিলেন না।

গাড়ি আসিল। গবর্নমেন্ট হাউসে গেলাম। কথা হইল। তিনিও স্তম্ভিত হইয়াছেন। আভাসে-ইংগিতেও কোনও আহট পান নাই। বলিলাম ঃ 'কাজটা সম্পূর্ণ বে-আইনী। গবর্নর শাসনতন্ত্র বজায় রাখিতে আইনতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। কাজেই তিনি এটা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। স্বীকার করিলেন। কিন্তু এটাও তিনি বলিলেন ঃ শাসনতন্ত্র অনুসারেই প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ছাড়া তিনি কিছু করিতে পারেন না। তিনি আসলে প্রধানমন্ত্রীর রবার স্ট্যাম্প মাত্র। বুঝিলাম তাঁর কথাই ঠিক। আরেকটা খবর দিলেন। তাঁর বেগম সাহেব করাচি গিয়াছিলেন। তাঁকে প্রেসিডেন্ট হাউসে নেওয়া হইয়াছে। খানিক আগে তাঁর সাথে কথা হইয়াছে। ব্যাপার-স্যাপার সুবিধার নয়। সাবেক আইজি মিঃ যাকির হোসেনকে যরুরী খবরে করাচি নেওয়া হইয়াছে। সুলতানুদ্দিনের দৃঢ় সন্দেহ তাঁর বদলে মিঃ যাকির হোসেনকেই গবর্নর করা হইতেছে। দেখা গেল, আমরা দুইজনই সমান নিরুপায়। উভয়ের মন খারাপ। আলাপ জমিল না। বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। যাইতে-আসিতে দেখিলাম সারা শহর থমথমা।

বাড়ির সবাই স্তম্ভিত, বিষণ্ন। কারও মুখে কথা নাই। কাজেই নির্বিবাদে নির্বিঘ্নে সবাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পর-পর কয়েকটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। একটা মাত্র তিন-চারদিন আগের ঘটনা। বাসায় একটা প্রেস-কনফারেন্স ডাকিয়াছিলাম। প্রায় জন পঁচিশেক সাংবাদিক সমবেত হইয়াছিলেন। আসন্ন নির্বাচনে শান্তি-শৃংখলার সংগে দেশের এই সর্বপ্রথম জাতীয় নির্বাচন সমাধায় সাংবাদিকরা কিরূপে সাহায্য করিতে পারেন, তা বলার জন্যই এই প্রস-কনফারেন্স। আমি নিজে ত্রিশ বছরের সাংবাদিক। রাজনীতিক কর্মী হিসাবে বহু নির্বাচন করার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাঁদেরে দেখাইলাম ঃ সাংবাদিক ইচ্ছা করিলে শান্তি-শৃংখলার সাথে নির্বাচন সমাধাও করিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে মারাত্মক অশান্তিও সৃষ্টি করিতে পারেন। সাংবাদিকরা সকলে আমার সাথে একমত হইলেন। যাঁর-তাঁর দলীয়-আস্থা-নির্বিশেষে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে তাঁদের কর্তব্য করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া সন্ধ্যার অনেক পরে তাঁরা বিদায় হইলেন।

সাংবাদিকরা চলিয়া যাওয়ার পরও তিন-চারজন লোক থাকিলেন। এরা একেবারে পিছনের কাতারে ছিলেন বলিয়া তাঁদের দিকে এতক্ষণ বিশেষ লক্ষ্যও করি নাই। এক-আধবার ওদিকে নযর দিয়াই বুঝিয়াছিলাম, ওঁরা আমার রোজকার মজলিসী বন্ধু। কিন্তু সাংবাদিকরা চলিয়া যাইবার পর দেখিলাম ওঁদের মধ্যে একজন আমার বন্ধু হইলেও রোজকার মজলিসী দরবারী লোক নন। তিনি আমার ল্যান্ডলর্ড মিঃ ই. এ. চৌধুরী। তিনিও মাঝে মাঝে আসেন। আমাকে বড়-ভাই মানেন। আমিও তাঁকে ছোট-ভাই মানি। কিন্তু অমার দরবারী তিনি নন। কাজেই তাঁকে দেখিয়া অবাক হইলাম। বাড়ি-ভাড়ার তাগাদায় আসেন নাই ত ? হাসিয়া বলিলাম ঃ 'চৌধুরী, কবে থনে সাংবাদিক হৈলা ?' তিনি খুবই রসিক যুবক। আমার রসিকতার রস গ্রহণ

করিয়া হাসিলেন। বলিলেন : 'কিন্তু ভাইসাব আমি ভাবতাছি, আপনে এই বৃথা পরিশ্রম ও অর্থ–ব্যয়টা করলেন কেন?' আমি বিস্ময়ে বলিলাম : 'কোনটারে তুমি বৃথা পরিশ্রম ও অর্থ–ব্যয় কইতেছ ?' চৌধুরী সাহেব গম্ভীর হইয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলেন : 'আপনে কি সত্যই বিশ্বাস করেন ইলেকশন হবে ?' আমি আরও বিস্মিত হইয়া বলিলাম : 'বিশ্বাস–অবিশ্বাসের প্রশ্ন কোথায় ? ইলেকশনের দিন–তারিখ ত ঠিক হৈয়াই গেছে।'

অতঃপর চৌধুরী সাহেব দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলিলেন যে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস নির্বাচন হইবে না। নির্বাচনের আগেই একটা কিছু ঘটিয়া যাইবে। তার অনেক আলামতই তিনি দেখিতেছেন। একটা আলামত এই যে মাত্র দুই–একদিন আগে তিনি নিজে দেখিয়াছেন চাঁটগা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেন বোঝাই হইয়া মিলিটারি ঢাকার দিকে আসিতেছে। অতি উচ্চ হাসিতে তাঁর সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিলাম। বলিলাম : ও–সব স্মাগলিং বন্ধ করার জন্য 'অপারেশন ক্লোযড ডোরের' আয়োজন। তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। না করিবার অনেক কারণও বলিলেন। কেউ কাকেও বুঝাইতে পারিলাম না। যার–তার মত লইয়া বিদায় হইলাম।

এর পর মনে পড়িল, কয়েকদিন আগে বন্ধুবর আবু হোসেন সরকার ও মোহন মিয়াও এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন। শহরে বন্দরে ও রেল স্টেশনে সৈন্যবাহিনীর অস্বাভাবিক যাতায়াত দেখিয়াই তাঁরা বলিয়াছিলেন : 'একটা কিছু যেন হইতেছে।' ঐ অপারেশন ক্লোযড ডোর দিয়া তাঁদেরও বুঝাইয়াছিলাম। তাঁরা যেন অগত্যা বলিয়াছিলেনঃ 'হৈতেওবা পারে।'

২. পূর্বাভাস

সুতরাং দেখা গেল, আমি ছাড়া আর সকলেই যেন বিপদ আশংকা করিতেছিলেন। আজ বুঝিলাম, ওঁদের চেয়ে আমি কত নির্বোধ। নইলে এসব কথা আমার মনে বাজিল না কেন ? অল্প কিছুদিন আগে করাচিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলি এবং তাঁরও আগে মার্কিন ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ ড্যাম্বোর সাথে পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন এ্যাটিচুড নিয়া আলাপ–আলোচনা করিতেছিলাম। উভয়েই পাকিস্তানী রাজনীতির সাম্প্রতিক ভাব–গতিতে দুর্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আসন্ন নির্বাচনে পূর্ব–পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ জয়লাভ করিবে এবং প্রাদেশিক সরকার গঠন করিবে, এসম্বন্ধে তাঁদের পূর্ব–ধারণা দৃঢ় ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করিতেন আওয়ামী লীগ মার্কিন–বিরোধী। আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট মত সিটো–বাগদাদ প্যাক্টের বিরুদ্ধে এটা তাঁদের জানা কথা। মওলানা ভাসানী বাহির হইয়া যাওয়ার পরও আওয়ামী লীগে এই মতের লোকই বেশি। কিন্তু তাতে তাঁদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আওয়ামী লীগের অধিকাংশের মত যাই থাকুক, তাঁদের

অবিসম্বাদিত নেতা সুহরাওয়ার্দীকে মার্কিন–নেতারা বিশ্বাস করেন। তিনি নীতি হিসাবেই ইংগ–মার্কিন বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। মুসলিম লীগও মার্কিন সমর্থক, এ বিশ্বাসও তাঁদের দৃঢ়। সুতরাং আগামী নির্বাচনের পরে যখন পূর্ব–পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করিবে, তখন কেন্দ্রে দুই পার্টির কোয়েলিশন সরকার হইতেই হইবে। এই কোয়েলিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দী ছাড়া আর কেউ হইতে পারেন না। সুতরাং মার্কিন–সমর্থক পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ও সুহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারও মার্কিনঘেষা হইতে বাধ্য। মার্কিন দূতাবাসের চিন্তা–ধারা যখন এই পথে, ঠিক সেই সময় সর্দার আবদুর রব নিশতারের মৃত্যুতে খান আবদুল কাইউম খাঁ মুসলিম লীগের সভাপতি হন। সভাপতি হইয়াই তিনি মার্কিনীদের প্রতি কটু–কাটব্যে মওলানা ভাসানীকেও ছাড়াইয়া গেলেন। বিরাট–বিরাট জনসভায় তিনি এই ধরনের বক্তৃতা করিয়া বিপুল সম্বর্ধনা–অভিনন্দন পাইতে লাগিলেন। সারা পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র এবং খোদ করাচিতে মুসলিম লীগ–সমর্থক বিরাট জনতা মার্কিন দূতাবাসের সামনে যুক্তরাষ্ট্রের ও মার্কিনী দালাল বলিয়া কথিত ইস্কান্দর মির্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাইতে লাগিল। ঠিক এই সময়েই মার্কিন–দূতাবাসের ঐসব অফিসারকে বিষণ্ন ও পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন দেখিয়াছিলাম। আসন্ন নির্বাচনের ফলে পাকিস্তান পশ্চিমা রাষ্ট্র–গোষ্ঠী হইতে বাহির হইয়া যাইবে, স্বয়ং সুহরাওয়ার্দীও আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন না। এ সম্পর্কে তাঁদের মনে এই সময়ে আর কোনও সন্দেহ দেখিলাম না। আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট মির্যা আর প্রেসিডেন্ট হইতে পারিবেন না। এই সন্দেহ হওয়ার পর হইতে তিনিও নানা কৌশলে নির্বাচন ঠেকাইবার চেষ্টায় ছিলেন। আমার সন্দেহ, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও আমেরিকানরা এই কারণে এই সময়ে পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচনের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট মির্যার সাথে তাঁদের যোগাযোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই কারণে আমার মনে হয় পূর্ব–পাকিস্তান আইন–পরিষদে বিরোধী দলের গুণ্ডামি, কেন্দ্রে ফিরোয খাঁর মন্ত্রিসভায় খামখা রদ–বদল, পোর্ট–ফলিও লইয়া অর্থহীন বিসম্বাদ ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একই অদৃশ্য হস্ত পর্দার আড়াল হইতে এই পুতুল নাচ করাইয়াছিল। এমন কি সি. আই. এ.-র হাত থাকাও অসম্ভব নয়।

৩. কর্ম শুরু

পরদিন। ৮ই অক্টোবর। সেক্রেটারিয়েট–ভবনে একটা মিটিং ছিল। কয়েকদিন আগে পূর্ব–পাকিস্তান সরকার নিত্য–প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উর্দ্ধগতি দাম সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কমোডিটি–প্রাইস–কমিশন নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমাকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান করা হইয়াছিল। এই কমিশনেরই প্রথম বৈঠক ছিল ৮ই অক্টোবর সকাল নটায়। সেক্রেটারিয়েট–ভবনে। মার্শাল ল জারি হওয়ায়

কমিশনের বৈঠক মোটেই হইবে কি না, জানিবার জন্য আমি কমিশনের সেক্রেটারি মিঃ কেরামত আলী সি. এস. পি.-কে টেলিফোন করিলাম। তিনি জানাইলেন তিনি কোনও বিপরীত নির্দেশ পান নাই। কাজেই কমিশনের কাজ চলিবে। নির্ধারিত সময়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি গেলাম। আমার সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হইল। সব মেম্বররাই উপস্থিত হইলেন। দশ-বারজন মেম্বরের মধ্যে জন-তিনেক এম. এল এ. ছাড়া আর সবাই সেক্রেটারি ও ডি. আই. জি. স্তরের অফিসার। নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা শেষ হইবার আগেই কমিশনের সেক্রেটারির বাহিরে ডাক পড়িল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে কমিশনের সর্বশেষ পযিশন জানার জন্য গবর্নমেন্ট হাউসে নির্দেশ চাহিয়া ফোন করা হইয়াছে। সে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কমিশনের কাজ আর আগাইতে পারে না। অতএব, আমরা সভার কাজ বন্ধ করিয়া চা-বিস্কুট-পান-সিগারেট খাওয়ায় মন দিলাম। হাযার বিপদেও মানুষ খোশালাপে বিরত হয় না। জানাযার নমাযে ও দাফনে সমবেত মানুষও গল্প করে। আমরাও খোশালাপ শুরু করিলাম। মার্শাল ল সম্বন্ধেও। মার্শাল ল'টা সে জাতির বিপদ, অন্ততঃ পূর্ব-পাকিস্তানে মার্শাল ল'র সমর্থনে কোনও লোক পাওয়া যাইবে না, আমার এই আস্থা ও বিশ্বাস এক ফুৎকারে মিলাইয়া গেল এই বৈঠকেই। মার্শাল ল'র পরে এটাই আমার বাহিরের লোকের সাথে প্রথম মিলন। সমবেত লোকেরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত চিন্তাশীল লোক। আমি দেখিয়া মর্মাহত হইলাম যে এই উচ্চ পদস্থ অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই এটাকে জাতির বিপদ বলিয়া মনে করেন নাই। বরং কাজে কথায় ও মুখ-ভংগিতে মনে হইল এতে যেন তাঁদেরই জয় হইয়াছে। মনটা দমিয়া গেল। আর কোনও উৎসাহ থাকিল না। গবর্নমেন্ট হাউস হইতে হাঁ-সূচক কোনও নির্দেশ আসিল না। সাইনিডাই সভা ভাংগিয়া দিয়া বিদায় হইলাম। আর কি কি বিপদ আসিতে পারে, তার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

৪. গেরেফতার

বেশিদিন ভাবিতে হইল না। অতঃপর যা শুরু হইল, তা রাজনীতি নয় রাজা-নীতি। ১০ই অক্টোবরের রাত দুইটার সময় প্রায় ভাংগিয়া-ফেলার-মত দরজা-ধাক্কা-ধাক্কিতে ঘুম ভাংগিল। দরজা খুলিতেই দেখিলাম এলাহি কাণ্ড। আংগিনা-ভরা সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী। আমাকে গেরেফতার করিতে আসিয়াছে। বেশ, ধরিয়া নিয়া যান। না, বাড়ি খানা-তল্লাশ হইবে। কারণ নিরাপত্তা আইনে নয়, দুর্নীতি দমন আইনে। বলিলাম : দুর্নীতি দমন আইনে এমন অগ্রিম গেরেফতার করার ত বিধান নাই। আগে নোটিশ দিতে হইবে। কেস করিতে হইবে। তারপর না গেরেফতার ? পুলিশ বাহিনীর নেতা ডি. এস. পি.। তিনি হাসিয়া বলিলেন : 'এতদিন আইন তাই ছিল বটে, এখন তা বদলান হইয়াছে। মিঃ যাকির হোসেন গবর্নর হইয়া সন্ধ্যার দিকে ঢাকা ফিরিয়াই

গবর্নমেন্ট হাউসে পুলিশ ও অন্যান্য বড়-বড় অফিসারদের কনফারেন্স করিয়াছেন। সেখানেই তিনি দুর্নীতি দমন আইন সংশোধন করিয়া অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। ডি. এস. পি. সাহেব এই কনফারেন্স হইতেই সোজা আমার বাসায় আসিয়াছেন। তিনি এক কপি আইনের বই ও তার লাইনের ফাঁকে হাতের-লেখা সংশোধনটি দেখাইলেন। বলিলেন ঃ 'অর্ডিন্যান্সের সারমর্ম' ঐ। গবর্নর সাহেব করাচি হইতে তালিকা লইয়াই আসিয়াছেন। তালিকাভুক্ত সবাইকে গেরেফতারের জন্য চারিদিকে পুলিশ অফিসাররা বাহির হইয়া গিয়াছেন। ডি.এস.পি. সাহেব ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়া বলিলেন ঃ 'সবাই আপনার মত বড়-বড় নেতা।' আরও ঘনিষ্ঠভাবে বলিলেন ঃ 'মোটমাট চৌদ্দজনের তালিকা। কে কে, আভাসে-ইংগিতে তাও বলিয়া ফেলিলেন। সব শুনিয়া আমি বলিলাম ঃ 'কিন্তু ডি.এস.পি. সাহেব, ঐ অর্ডিন্যান্স গেযেট না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ হইতে পারে না।' ডি.এস.পি. হাসিয়া বলিলেন ঃ 'সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না সার, গেযেট একস্ট্রা-অর্ডিনারি ছাপার জন্য ই. বি. জি. প্রেসে কপি চলিয়া গিয়াছে। আপনাদেরে কোর্টে নেওয়ার আগেই ছাপা হইয়া আসিয়া পড়িবে।' অগত্যা আমি সন্তুষ্ট, ইংরাজিতে যাকে বলে স্যাটিসফাইড, হইলাম। বলিলাম: 'তবে খানা-তল্লাশ শুরু করেন।' তাঁরা শুরু করিলেন। রাত্র দুইটা হইতে বেলা দশটা পর্যন্ত আটটি ঘন্টা বাড়িটা তছনছ করিলেন। আলমারি, বাক্স, সুটকেস, তোষক, বালিশ, বিছানার উপর-নিচ, বাথরুম, পাকঘর, আমার মোটামুটি বড় লাইব্রেরির বড়-বড় আইন পুস্তকের মলাট-পাতা, কিছু বাদ রাখিলেন না। দীর্ঘ আট ঘন্টা ধরিয়া এই তছ্নছ্ চলিল। বেলা দশটার দিকে আমাকে এনটি-কোরাপশান আফিসে নেওয়া হইল। সেখানে গিয়া যাঁদেরে পাইলাম, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই যাঁদেরে আনা হইল, সব মিলাইয়া হইলাম আমরা মোট এগার জন। তাঁদের মধ্যে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আবদুল খালেক, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি মিঃ আযগর আলী শাহ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আবদুল জব্বার প্রভৃতির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডি.আই.জি. মহীউদ্দিন আহমদের আগমন অপেক্ষায় আমাদের বসাইয়া রাখা হইল। ঘন্টা দুই-তিন অপেক্ষা করা হইল। তাঁর দেখা নাই। অবশেষে সমবেত এস.পি.ডি.এস.পি.রাই আমাদের পৃথক-পৃথক বিবৃতি নিতে লাগিলেন এক-একজন করিয়া। সম্পত্তির তালিকা। আয়-ব্যয়ের হিসাব। লম্বা লম্বা বিবৃতি। এসব করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ইতিমধ্যে আসামীদের সকলের বাড়ি হইতেই খানা আসিয়াছিল। পরিবারের লোকজনকেও আসিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁরাই দুইটা-তিনটার দিকে আমাদের খাওয়াইয়া গিয়াছেন।

অবশেষে সন্ধ্যার সময় আমাদের এস.ডি.ও.র এজলাসে হাযির করা হইল। এজলাসে এস.ডি.ও. সাহেব একা নন। তাঁর পাশে বসা কর্নেল স্তরের একজন মিলিটারি অফিসার। আমাদের পক্ষের উকিলরা যামিনের দরখাস্ত করিলেন। কোন

এযাহার ছাড়াই আমাদের গেরেফতার করা হইয়াছে, সে কথা বলিলেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৭ ধারা মতে আমাদের যামিন দিতে বাধ্য, এই মর্মে অনেক আইন-নযির দেখাইলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর যামিনের বিরুদ্ধতা করিলেন। আসামীরা সবাই প্রভাবশালী জনপ্রিয় নেতা। এঁরা বাহিরে থাকিলে সমস্ত তদন্ত কার্যই ব্যাহত হইবে।

এস.ডি.ও. সাহেব কথা বলিলেন না। চোখ তুলিয়া আমাদের বা উকিলদের দিকে একবার নযরও করিলেন না। মাথা হেট করিয়া যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া আমাদের দরখাস্তে 'রিজেক্টেড' লিখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমাদেরে জেলখানায় নেওয়া হইল। সবাইকে নেওয়া হইল পুরানা হাজতে। শুনিতে যত খারাপ; আসলে অত খারাপ নয়। বরঞ্চ জেলের মধ্যে একটা সবচেয়ে ভাল জায়গার অন্যতম । প্রকাণ্ড একটা হলঘর। সবাই এক সংগে থাকা যায়। এটাই এ ঘরের আকর্ষণ। দিনে ত বটেই রাতেও সব একত্রে, সভা করিয়া, তাস-দাবা খেলিয়া কাটান যায়।

৫. জেল খানায়

এখানে ঢুকিয়াই পাইলাম মওলানা ভাসানীকে ! তাঁকে অবশ্য করাপশান আইনে ধরা হয় নাই, ধরা হইয়াছে নিরাপত্তা আইনে। যে আইনেই হউক, আমরা সবাই মেঝেয় ঢালা বিছানা করিয়া রাত কাটাইলাম। তাতে কোনই অসুবিধা হইল না। কারণ সারারাত দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনায় ব্যস্ত রহিলাম।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেন আমাদের 'জেলের মধ্যে অত সুখ' সহ্য করিতে পারিলেন না। পরদিনই মওলানা ভাসানীকে 'সেলে' নিয়া গেলেন। তারপর এক-এক করিয়া মুজিবুর রহমান, আবদুল খালেক ও আমাকে পৃথক-পৃথক সেলে আবদ্ধ করিলেন। প্রথম-প্রথম মানসিক কষ্ট হইল খুবই। কিন্তু সহিয়া উঠিলাম। তখন নিজের চেয়ে বন্ধুদের জন্য চিন্তা হইল বেশি। আমি নিজে লেখক ও পাঠক। দিন-রাত হাবি-জাবি লিখিয়া ও বই পড়িয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু বন্ধুরা না লেখেন, না পড়েন। সুতরাং 'সেলে' ওঁদের দিন কিভাবে একাকী কাটে সে দুশ্চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিল। এত কষ্টেও একটা খবর পাইয়া নিজের কথা ভুলিয়া গেলাম। ২৮শে অক্টোবরের খবরের কাগযে পড়িলাম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যা 'স্টেপ ডাউন' করিয়াছেন। প্রেসিডেন্টির গদি ত্যাগ করিয়াছেন। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আইউব খাঁ প্রেসিডেন্টের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। হাসিব কি কাঁদিব হঠাৎ স্থির করিতে পারিলাম না। নিজের ফাঁদে নিজে পড়িবার এমন দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক ইতিহাসে ত নাই-ই, নীতি কথার বই-এ ছাড়া আর কোথায় পড়িয়াছি, তাও মনে করিতে পারিলাম না। হায় বেচারা মির্যা ! ইলেকশন ঠেকাইয়া প্রেসিডেন্টি কায়েম করিবার উদ্দেশ্যেই নিশ্চয় ঐ 'বিপব' করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টগিরিই ছাড়িতে হইল। বিপ্লব ঘোষণার মাত্র একুশদিন পরেই খবরের কাগযে পড়িলাম,

তিনি সস্ত্রীক বিলাত চলিয়া গেলেন। বলা হইল, সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে থাকিবেন। 'বিপ্লব' ঘোষণা করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন ঃ 'এ বিপ্লবের বিরুদ্ধতা বরদাশত করা হইবে না। যাদের এটা পসন্দ হইবে না, তারা সময় থাকিতে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাউক।' হায় কপাল ! সকলের আগে এবং সম্ভবতঃ একা তাঁকেই 'সময়ে থাকিতে দেশ ছাড়িতে' হইল।

বাইরে আমাদের পরিবার-পরিজন যামিনের জন্য রোজ এ-কোর্ট-ও-কোর্ট করিতেছিল। তাই সরকার ইতিমধ্যে আমাদের তিন জনকেই নিরাপত্তা আইনে বন্দী করিয়া যামিনের সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, মওলানা সাহেব ও মুজিবুর রহমানের জন্য আমার দুশ্চিন্তা ছিল নিতান্ত অনাবশ্যক। তাঁরা সকাল-সন্ধ্যা সব্জীর বাগান করিয়া মরিচ-বেগুনের ও নানা প্রকারের মৌসুমী ফুলের চারা লাগাইয়া আনন্দেই কাল কাটাইতেছেন। নিজের হাতে লাগানো গাছের ফুল ত তাঁরা উপভোগ করিবেনই, এমন কি, মরিচ-বেগুন দিয়া ভর্তা-চাটনিও খাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত তাঁরা করিয়া ফেলিয়াছেন। মুজিবুর রহমান আর এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছেন। অন্য ওয়ার্ড হইতে একটা ফজলী আমের চারা (কলম নয়) জোগাড় করিয়া নিজের সেলের ছোট আংগিনায় লাগাইয়াছিলেন। জেলার-সুপারকে বলিয়াছিলেন, ঐ গাছের আম খাইয়া যাইবার জন্য তিনি মন বাঁধিয়াছেন। মুজিবুর রহমানের মনের বল দেখিয়া অফিসাররা অবাক হইয়াছিলেন। কিন্তু বেচারা আবদুল খালেক সেলের একাকিত্ব সহিতে পারিলেন না। তিনি ছিলেন হার্টের রোগী। ঘোরতর অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বদলি করা হইল। ডাক্তারদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে হামিদুল হক চৌধুরী, আযগর আলী শাহ ও আবদুল জব্বার সাহেবের বিভিন্ন তারিখে যামিনে খালাস হইয়া গেলেন। ওঁরা কেউ নিরাপত্তা বন্দী ছিলেন না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত আমরা জন-চারেক আওয়ামী লীগারই জেলখানায় থাকিলাম নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে। তিন-চার মাসেও 'গ্রাউন্ড অব ডিটেনশন' না দেওয়ায় আমার দ্বিতীয় ছেলে মহবুব আনাম আমার মুক্তির জন্য হাইকোর্টে রীট করিল। অসুস্থ শরীর লইয়াও সুহরাওয়ার্দী সাহেব জোরালো সওয়াল-জবাব করিলেন। আমার বিচার স্প্যাশাল বেঞ্চে গেল। সেখানেও সুহরাওয়ার্দী সাহেব লম্বা সওয়াল-জবাব করিলেন। শেষ পর্যন্ত ২৯শে জুন ১৯৫৯ সাল হাইকোর্টের স্প্যাশাল বেঞ্চ আমাকে খালাস দিলেন।

ইতিমধ্যে আমার বিরুদ্ধে তিনটা দুর্নীতি দমন আইনের কেস দায়ের হইয়াছিল। মুজিবুর রহমান, ক্যাপটেন মনসুর আলী, কোরবান আলী, আবদুল হামিদ চৌধুরী ও নুরুদ্দিন আহমদ সাহেবানের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির কেস হইয়াছিল। আমরা আসামীরা সবাই আওয়ামী লীগার। আওয়ামী লীগাররাই দুর্নীতিবায এটা দেখানোই এই সব কেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত আদালতের বিচারে কারো বিরুদ্ধেই

কোনও মামলা টিকে নাই। কথায় বলে, ভালরূপ কাদা ছুঁড়িতে পারিলে কাদা গেলেও দাগ থাকে। আমাদের বিরুদ্ধে কেসগুলো কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, এটা অবশ্য দেশবাসীই শেষ বিচার করিবে। কিন্তু এ ব্যাপারে দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।

৬. দুর্নীতির অভিযোগ

আমাদেরে গেরেফতার করার দুই-এক দিন পরেই গবর্নর যাকির হোসেন আমাদের সাথে জেলখানায় দেখা করেন। কথা প্রসংগে বলেন ঃ তাঁর ইচ্ছায় আমাদেরে গ্রেফতার করা হয় নাই। কেন্দ্রের হুকুমেই এটা হইয়াছে। এর কয়দিন পরে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যা খবরের কাগযের রিপোর্টারদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ পূর্ব-পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের গেরেফতার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই জানেন না। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছামতই ওঁদের গেরেফতার করা হইয়াছে। এরও কিছুদিন পরে তৎকালিন আই.জি.ও অস্থায়ী চিফ সেক্রেটারি জনাব কাযী আনওয়ারুল হক মেহেরবানি করিয়া আমার সাথে দেখা করেন। কাযী আনওয়ারুল হকের মরহুম পিতা কাজী এমদাদুল হক, আমাদের সাহিত্যিক-গুরু ছিলেন। সেই উপলক্ষে আমি কাযী আনওয়ারুল হককে ছোট ভাই-এর মতই স্নেহের চোখে দেখিতাম। তিনিও বোধ হয় আমাকে বড় ভাই-এর মতই সম্মান করিতেন। জেলখানার সাক্ষাতে তাঁর সে-শ্রদ্ধার ভাব অক্ষুণ্ন পাইলাম। তিনি দরদ-মাখা গলায় বলিলেন ঃ 'আপনার মত লোকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হওয়ায় আমরা অনেকেই অন্তরে ব্যথা পাইয়াছি। কিন্তু সার, আপনারও দোষ আছে। চার কোটি টাকার এতবড় একটা বদনাম খবরের কাগযে ছড়াইয়া পড়িল, আপনি তার কি প্রতিকার করিলেন ?' আমি বিস্ময়ে বলিলাম ঃ 'বলেন কি কাযী সাহেব ? আমি প্রতিবাদ করি নাই ? যে 'মর্নিং নিউয' এই বদনামের প্রচারক, তারা আমার প্রতিবাদ ছাপে নাই সত্য কিন্তু করাচির 'ডন' ও ঢাকার সব কাগযে বিশেষতঃ 'ইত্তেফাকে' পুরা প্রতিবাদ ছাপা হইয়াছে। আপনি পড়েন নাই ?'

'পড়িয়াছি নিশ্চয়ই।' কাযী সাহেব বলিলেন। 'কিন্তু আমি প্রতিবাদের কথা বলি নাই। প্রতিকারের কথা বলিয়াছি। আপনার মানহানি মামলা করা উচিত ছিল।'

মামলা করার আমার ইচ্ছা, শহীদ সাহেবের বাধা দান, সব কথা কাযী সাহেবকে বলিয়া উপসংহারে বলিলাম ঃ 'কিন্তু কাযী সাহেব, খবরের কাগযে রাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পড়িয়াই বিনা-তদন্তে এর আগে কাউকে গেরেফতার করিয়াছেন কোনও দিন ? রাজনীতিক দলাদলিতে কত অভিযোগ-পাল্টা-অভিযোগই ত হয়। সেসব দোষাদুষিই যদি মামলা দায়েরের বুনিয়াদ হয়, তবে আপনারা আছেন কিসের জন্য ?' এতক্ষণে কাযী সাহেব স্বীকার করিলেন এসব

রাজনৈতিক ব্যাপার। উপরের হুকুমেই সরকারী কর্মচারিরা এটা করিতে বাধ্য হয়। আমি প্রেসিডেন্ট মির্যা ইস্কান্দরের ঘোষণার দিকে কাযী সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তিনি মুচকি হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

ব্যক্তিগত কথা বাড়াইয়া পাঠকদের ধৈর্যের উপর যুলুম করিতে চাই না। শুধু দুই-একটা কথা বলিয়াই এ ব্যাপারে ইতি করিতে চাই। আমি পারমিট-লাইসেন্সের মালিক বাণিজ্যমন্ত্রী। শিল্প-পতিদের ভাগ্যবিধাতা শিল্পমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর উপর আমার বেজায় প্রভাব। তাই পারমিট-লাইসেন্সের বদলা আমি চার কোটি টাকা পার্টি-ফণ্ড তুলিয়াছি। যে দেশে স্কুল-মাদ্রাসা মসজিদ-হাসপাতালের তহবিলও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া যায়, সেখানে চার কোটি টাকার পার্টি-ফন্ড হইতে আমি ব্যক্তিগত সুবিধা কিছুই গ্রহণ করিব না, এমন অবাস্তব কথা বিশ্বাস করিবার মত আহাম্মক লোক আমাদের দেশে একজনও নাই। কাজেই তারা যদি মনে করিয়া থাকে, ঐ টাকা দিয়া আমি অন্ততঃ বেনামিতে পাকিস্তানের বড় বড় শহরে কয়েকখানা বাড়ি-ঘর করিয়াছি, দুই-চারটা শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছি, তবে দেশবাসীকে দোষ দেওয়া যায় না। চার কোটি টাকার এতসব বড়-বড় পর্বত যখন মাত্র দশ-পনর হাজারের তিনটি কেসের মূষিক প্রসব করিল, তখন যারা বিস্মিত হইয়াছিল, তারা দুঃখিত হয় নাই। আর যারা দুঃখিত হইয়াছিল তারা বিস্মিত হয় নাই। তিনটি কেসের প্রথমটি আয়ের চেয়ে সম্পত্তি বেশি করার অভিযোগ। মার্কিন সাহায্যের পূর্ব-পাকিস্তানের অংশ চার কোটি টাকার সবটাই আমি মারিয়া দিয়াছি, এই ধারণা হইতেই অভিযোগটা উঠিয়াছিল। যারা অভিযোগটা করিয়াছিল তারা নিজেরাই ওটায় বিশ্বাস করে নাই। ইট ওয়ায টু বিগ টু বিলিভ। কিন্তু চার কোটি না হউক, চল্লিশ লক্ষ, চল্লিশ লক্ষ না হউক, চার লক্ষ, চার লক্ষ না হউক চল্লিশ হাজার টাকাও এতবড় প্রতাপশালী শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী ডান হাত -বাঁ হাত করে নাই ! এতবড় বেওকুফকে কোনও প্রধানমন্ত্রী তাঁর শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী করিতে পারেন, এটা স্বয়ং পুলিশও বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাই তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তান চাষ করিয়া শেষ পর্যন্ত বহু অর্থব্যয়ে উচ্চপদস্থ অনেক পুলিশ কর্মচারি পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাইয়াছিল। ঐসব সুযোগ অভিজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুলিশ কর্মচারি, যাঁরা ত্রিশ হাত কূঁয়ার নিচে হইতে চোরাই মাল উদ্ধার করিতে পারেন তাঁরা, দীর্ঘদিন পশ্চিম পাকিস্তানের শহর-নগর ও ব্যাংকাদি চাষ করিলেন। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বোধ হয় রাগ করিয়া বলিলেন : 'এত শুনিলাম ! কিছু পাইলাম না ! এতবড় ক্ষমতাশালী মন্ত্রী হইয়াও কিছু করিল না। লোকটা মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যই না। আসলে লোকটা একটা ইডিয়ট !' অগত্যা ফাইনাল রিপোর্ট দিলেন। বাকি থাকিল দুইটা। তার একটাতে এক ভদ্রলোক আমার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া এক শিল্প-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তের হাযার টাকা আদায় করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর সাথে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের দেখা নাই। কোনও

মন্ত্রী বা পদস্থ লোকের নাম করিয়া অন্য কেউ কিছু করিলে মন্ত্রী বা পদস্থ লোক অপরাধী হন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত একথা বিশ্বাস করিলেন না। গেল সে কেসও। বাকি থাকিল একটি। এটি করাচিতে। ঐ ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে টেক্সট বুক আমদানির জন্য দশ হাজার টাকার লাইসেন্স পাইয়াছিলেন। তিনি টেক্সট বুক কমিটির বই-এর একজন পাবলিশার। আমার মন্ত্রিত্বের বহু আগে হইতেই তিনি পাবলিশার ও ছাপাখানার মালিক। তিনি ঐ টাকায় টেক্সট বুক আমদানিও করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পুস্তক নিজের জিলায় না দিয়া ঢাকার বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন, এই তাঁর অপরাধ। অপরাধ যদি হইয়াই থাকে, তবে তা করিয়াছেন তিনি। অথচ পুলিশ তাঁর নামে মামলা না করিয়া মামলা লাগাইলেন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে— আমার নামে। বাণিজ্যমন্ত্রী লাইসেন্স না দিলে ত তিনি ঐ অপরাধ করিতে পারিতেন না। এটাই বোধ হয় ছিল পুলিশের যুক্তি। কিন্তু গবর্নমেন্ট পুলিশের এই যুক্তি মানিলেন না। মামলা স্যাংশনের জন্য যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে গেল, পুলিশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মিঃ হবিবুল্লা খান যিনি অল্পদিন আগেও ছিলেন একজন সেশন জজ। তিনি মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন। জনাব হবিবুল্লা খান সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ। তিনি ঐ নির্দেশ না দিলে আমার মত অসুস্থ লোক করাচি কেস করার টানা-হেচড়া সত্যই বরদাশত করিতে পারিতাম না। এটাও খান সাহেব নিশ্চয়ই বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এইভাবে শারীরিক দুর্গতির হাত হইতে আমি রক্ষা পাইলাম। কিন্তু মানসিক দুর্গতি কাটিল না। দুর্নীতির অভিযোগের এই বিশেষ দিকটি লইয়া আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়াছি। মন্ত্রীদের ঘুষ-রেশওয়াত খাওয়ার অভিযোগ সম্বন্ধে আমি একটা বিশেষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কায়েমী স্বার্থীদের ভুক্তিত অধিকারের মনোপলিতে হাত দিলেই আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হইবে। এটা আসলে দুর্নীতি করিতে রাযী না হওয়ার দুর্নীতি। মন্ত্রী হইয়া যদি ওদের ভুক্তিত অধিকারের হাত না দেন, তবে আপনি খুব ভাল মন্ত্রী। এক-আধটু খোঁচা-টোচা মারিয়া 'তুষ্ট' হইয়া হাত গুটাইলে আরও ভাল। এইভাবে আপনি আরামে তাঁদের মনোপলি মুনাফার 'ছটাকখানি' অংশও পাইতে পারেন। মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পরেও গুড কণ্ডাক্টের পুরস্কার স্বরূপ পেনশনও পাইতে থাকিতে পারেন।

পক্ষান্তরে যেকোনও সংস্কার প্রবর্তন করিয়া যদি আপনি ওদের ভুক্তিত অধিকার নষ্ট করেন, যদি ওদের 'দই -এর হাড়িতে কৃষ্ট বা লাঠির বাড়িতে ঘৃষ্ট' কোনটাই না হন, তবে আপনার কপালে দুঃখ আছে ? 'ভাল' কথায় যদি আপনি 'নিজের ভাল' না বুঝেন, তবে 'আপ ক্যা সমঝা ? আওয়াম কা রাজ আ গিয়া ? জনাব, ভুল যাই-এ ইয়ে খেয়াল ! পিছে বুরা না মানিয়ে।'

৭. সুহরাওয়ার্দী গেরেফতার

মার্শাল ল'র পৌনে চার বছর পশ্চিম পাকিস্তানে মার্শার ল-বিরোধী কোনও আন্দোলন হইয়াছে কিঁ না জানি না। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে হয় নাই। বরঞ্চ প্রথম কয়েক মাস যেন জনসাধারণকে এতে খুশীই মনে হইয়াছিল। আমাদের রাজনীতিকদেরে সিভিল মিলিটারি গবর্নমেন্ট চাকুরিয়ারা যত দোষই দেন না কেন, আমাদের একটা গুণ তাঁদের স্বীকার করিতেই হইবে সেটা এই যে জনমতের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করি না। কোনও একটা রাজনৈতিক কাজকে আমরা নিজেরা যত ভাল বা মন্দ মনে করি না কেন, যতক্ষণ জনমত পক্ষে আসা সম্ভবপর না দেখি, ততক্ষণ তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কাজ করি না।

যথাসময়ে জনগণের মধ্যে বাস্তব চেতনা ফিরিয়া আসার পরও রাজনীতিক নেতা-কর্মীরা কোনও আন্দোলনের সংকল্প করেন নাই। ইচ্ছা বা চিন্তা যে করেন নাই, তা নয়। চিন্তাও করিয়াছিলেন, ইচ্ছাও করিয়াছেন। কিন্তু উচিৎ মনে করেন নাই। একটা ছোট নযির দিলেই চলিবে। অত অসুখ, গায়ে ১০৩ ডিগ্রি জ্বর ও পায়ের বুড়া আংগুলের প্রদাহহেতু পা ফুলিয়া যাওয়ায় জুতা-ছাড়া পর-পর কয়টা দিন হাইকোর্টে বক্তৃতা করিয়া সুহরাওয়ার্দী আমাকে খালাস করিলেন। জেলখানা হইতে বাড়ি ফেরা-মাত্র ঐ অসুখ শরীরেই তিনি আমাকে দেখিতে আসিলেন। ঐ শরীর নিয়া আমার জন্য অত কঠোর পরিশ্রম করায় আমার স্ত্রী ও আমি লিডারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন ঃ শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতায় তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না। তিনি আমার কাছে একটা বড় ফিস্ চান। সে ফিস্ হইতেছে গণ-আন্দোলনের একটা স্কিম। আমাদের মধ্যে আমিই একমাত্র কংগ্রেস-ট্রেইণ্ড কর্মী। কাজেই এটা করা আমার ডিউটি। প্রধানতঃ এই কারণেই তিনি আমার খালাসের উপর এত গুরুত্ব দিয়াছেন।

লিডারের চোখে-মুখে প্রবল আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্প দেখিলাম। কিন্তু আমি যখন বুঝাইলাম বিনা-প্রস্তুতি ও বিনা-ট্রেনিং-এ গণ-আন্দোলন শুরু করিলে পরিণামে তাকে অহিংস রাখা যাইবে না এবং তাতে রাষ্ট্রের ও খোদ গণ-আন্দোলনের ক্ষতি হইবে, তখন চট করিয়া লিডার তা বুঝিয়া ফেলিলেন। গণ-ঐক্য গণ-আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য এবং সে গণ-ঐক্য আসিতে পারে শুধু নেতা-কর্মীদের ঐক্যের মারফত। অতঃপর লিডার সেই দিকেই মনোনিবেশ করেন। ফলে সে সময়ে দেশে কোনও আসন্ন আন্দোলন ছিল না। কিন্তু যেখানে অশান্তি বা আন্দোলন নাই সেখানেও উস্কানি দিয়া অশান্তি সৃষ্টি করায় আমাদের দেশের আমলাতন্ত্র উস্তাদ।

তাই তারা ১৯৬২ সালের ৩১শে জানুয়ারি করাচিতে জনাব শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে নিরাপত্তা আইনে গেরেফতার করিল। পরদিন ১লা ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব ঢাকায় তশরিফ আনিলেন। বিমান বন্দরেই তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ 'বিদেশীর অর্থ-সাহায্যে পাকিস্তান ধ্বংস করিতে যাইতেছিলেন বলিয়াই সরকার মিঃ সুহরাওয়ার্দীকে গেরেফতার করিয়াছেন।'

৮. আমরাও জেলে

পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা বিশেষতঃ ঢাকার ছাত্র-তরুণ ও জনসাধারণ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল। পনর দিন ঢাকায় রাস্তায়-রাস্তায় কি কি ঘটিয়াছিল এবং তার পরেও বহুদিন পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র কি প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলিয়াছিল, তা সকলের চোখের-দেখা ব্যাপার। আমার উল্লেখের প্রয়োজন করে না। আমার সে যোগ্যতাও নাই। কারণ ৬ই ফেব্রুয়ারির রাত্রেই আমাকে আমার চতুর্থ পুত্র মনযুর আনাম (তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র)-সহ গেরেফতার করা হয়। জেলখানায় অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মিঃ তফাযযল হোসেন (মানিক মিয়া), শেখ মুজিবুর রহমান, কফিলুদ্দীন চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মিঃ কোরবান আলী, মিঃ তাজুদ্দিন আহমদ প্রভৃতি প্রায় বিশ-বাইশ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী (অধিকাংশই আওয়ামী লীগার) আমাদের সহিত একই ওয়ার্ডে মিলিত হইলেন। আমরা জেলখানায় থাকিতে-থাকিতেই প্রেসিডেন্ট আইউব নয়া শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিলেন। ঐ সময়েই ২৭শে এপ্রিল (১৯৬২) শেরে-বাংলা এ. কে.ফযলুল হক এন্তেকাল করিলেন। আমরা শোকে সত্যসত্যই মুহ্যমান হইলাম। শোক-চিহ্ন স্বরূপ আমরা কাল ব্যাজ পরিতে জেলকর্তৃপক্ষের অনুমতি চাহিলাম এবং কাল সালু অথবা ছাতির কাপড় যা পাওয়া যায়, আমাদের নিজস্ব পয়সা হইতে তা কিনিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। জেলকর্তৃপক্ষ আমাদের প্রার্থনা মনযুর করিলেন। আমদের সাথে অন্যান্য ওয়ার্ডের রাজবন্দীরা এবং দেখাদেখি সাধারণ কয়েদীরাও কাল ব্যাজ পরিলেন। আমরা গোড়াতে সাতদিনের জন্য ব্যাজ ধারণের অনুমতি পাইয়াছিলাম বটে কিন্তু বহুদিন আমরা সে ব্যাজ খুলি নাই। জেলকর্তৃপক্ষও ব্যাজ খুলিবার তাকিদ দেন নাই।

৯. নয় নেতার বিবৃতি

নয়া শাসনতন্ত্র ঘোষণার দুই মাস মধ্যে উহা জারি হয়। জারি হওয়ার পনর দিনের মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধি-স্থানীয় নয় জন নেতা ঐ শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া এবং নয়া গণ-পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার প্রস্তাব দিয়া এক বিবৃতি প্রচার করেন ২৫শে জুন। এই বিবৃতি খুবই জনপ্রিয় হয় এবং 'নয় নেতার বিবৃতি' বলিয়া প্রচুর

খ্যাতি লাভ করে। পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র জনসাধারণ, তাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যথা উকিল-মোখতার লাইব্রেরি, চেম্বার-অব-কমার্স, বিভিন্ন সভা-সমিতি-এসোসিয়েশন বিপুলভাবে এই বিবৃতির সমর্থন করে। আমি এই সময়ে দুরন্ত প্লুর‍্যাল এফিউশন রোগে গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ি। তাতে আঠার দিন সংজ্ঞাহীন বা 'কোমায়' ছিলাম। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতাল হইতে মুক্তি পাইবার পরেও উহার পুনরাক্রমণ হওয়াতে আবারও মাসখানেকের মত হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। অবশ্য সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে আমার প্রায় দুই বছর লাগিয়াছিল। কিন্তু প্রাথমিক সংকট কাটিয়া যাওয়ার পরই আমি 'নয় নেতার বিবৃতিতে' জনগণের সমর্থন ও উল্লাস দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। এবং তাতেই আমার রোগ অর্ধেক সারিয়া গিয়াছিল। আমার ঐ মারাত্মক রোগে আমার নেতা সহকর্মীরা, তদানীন্তন গবর্নর জনাব গোলাম ফারুক, তৎকালীন হাসপাতাল-প্রধান ডাঃ কর্নেল হক, বিশেষজ্ঞ ডাঃ শামসুদ্দিনের নেতৃত্বে হাসপাতালের সকল ডাক্তাররা আমার জন্য যেভাবে রাত-দিন পরিশ্রম খোঁজ-খবর ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, সে কথা আমার কৃতজ্ঞতার সাথে চিরকাল মনে থাকিবে।

যা হোক এরপর শহীদ সাহেব মুক্তি পাইয়া পূর্ব-পাকিস্তানে আসেন এবং 'নয় নেতার বিবৃতি' সমর্থন করেন। এই সময় তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে সর্বত্র সভা-সমিতি করিয়া বেড়ান। দেশের সর্বত্র জীবন ও জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। আমি এই সময় হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইয়াছি বটে, কিন্তু ঘরের বাহির হইতে পারি না। সভা-সমিতিতেও যোগ দিতে পারি না। কাজেই লিডারের ঐসব ঝটিকা সফরে সংগী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু খবরের কাগয পড়িয়া, অপরের মুখে, বিশেষতঃ লিডারের নিজ-মুখে, ও-সবের বিবরণ ও তাৎপর্য শুনিয়া আমি গণতন্ত্রের আসন্ন জয়ের সম্ভাবনায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিতাম।

১০. পার্টি রিভাইভ্যাল

এই মুদ্দতের সবচেয়ে বড় বিচার-বিবেচনার বিষয় ছিল রাজনীতিক পার্টিসমূহ পুনরুজ্জীবিত করা-না-করার প্রশ্নটি। তার বিশেষ কারণ ছিল এই, যে-'বিপ্লবী' নেতারা মার্শাল ল' করিয়া সব পার্টি ভাংগিয়া তাদের টেবিল-চেয়ার নিলাম করাইয়া এবং কাগয-পত্র পোড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং সব পার্টি-ফন্ড বাযেয়াফত করিয়াছিলেন, তাঁরাই এখন 'পলিটিক্যাল পারর্টিয এ্যাক্ট' নামক আইন জারি করিয়াছেন। নিজেরা 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ' নামে পার্টি করিয়াছেন। অপর-অপর লোককে যার-তার পার্টি জিয়াইয়া তুলিবার উস্কানি দিতেছেন। পার্লামেন্টারি আমলের পার্টি-চেতনা, পার্টি-স্পিরিট ও পার্টি-মনোবৃত্তি চার বছরের মার্শাল ল'তেও আমাদের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। কাজেই বর্তমান পরিবেশে বর্তমান

স্বৈরতন্ত্রের মোকাবেলায় পার্টি-অক্ষমতা সম্বন্ধে সকলে সমান সচেতন হন নাই। এ অবস্থায় সর্বোচ্চ স্তরের পার্টি-নেতৃবৃন্দের মধ্যে শহীদ সাহেবই প্রথম পার্টি-রিভাইভ্যালের বিরুদ্ধতা করায় আমাদের জন্য ওটা ছিল গর্বের বিষয়। কিন্তু অনেকে তাঁকে ভুলও বুঝিয়াছিলেন। শহীদ সাহেব তৎকালে সর্ববাদি-সম্মত মতে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নেতা হওয়ায় অন্যান্য দলীয় নেতাদের কেউ-কেউ মনে করেন সুহরাওয়ার্দী পার্টি রিভাইভ্যালের বিরুদ্ধতা করিতেছেন নিজে একচ্ছত্র আধিপত্য রক্ষার জন্য। কোনও পার্টি না থাকিলে সুহরাওয়ার্দী একমাত্র নেতা ; আর সব পার্টি রিভাইভ হইলে সুহরাওয়ার্দী অন্যতম নেতা; এটা তাঁদের চোখে সহজেই ধরা পড়িল। কিন্তু এটা ধরা পড়িল না এবং সাধারণতঃ ধরা পড়ে না যে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের অবর্তমানে সকলের পার্টিও 'ঠোটো জগন্নাথ' মাত্র।

কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানে সব নেতারাই যাঁর-তাঁর পার্টি রিভাইভ করিয়া ফেলিলেন। এ ব্যাপারে জামাতে-ইসলামীর নেতা মওলানা আবদুল আলা মওদূদীই রাস্তা দেখাইলেন। অন্যান্য পার্টি-নেতারা তাঁর অনুসরণ করিলেন। তাঁরা অবশ্য যুক্তি দিলেন ঃ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মত রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন না হওয়ায় সেখানে পার্টি রিভাইভ না করিয়া কোনও কাজই করা যাইবে না। ফলে লিডার পশ্চিম পাকিস্তানে রিভাইভ্যাল ও পূর্ব-পাকিস্তানে নন-রিভাইভ্যাল এই দ্বৈতনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। এই অবস্থায়ই তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন. ডি. এফ.) গঠন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা যাঁর-তাঁর পার্টি রিভাইভ করিলেও পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁদের পার্টি-কার্য-কলাপ প্রসারিত করিবেন না, এই ধরনের আশ্বাস তাঁরা লিডারকে দিলেন। কিন্তু ঐ দ্বৈত-নীতি শহীদ সাহেবের মত সবল ও সুউচ্চ নেতা ছাড়া আর কাকেও দিয়া কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য শহীদ সাহেব পূর্ব-পাকিস্তানের সকল দলের নেতাদেরই রিভাইভ্যাল-বিরোধী রাখিবার কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের চেষ্টায় তৎপর হন। এটা লিডারের কাছে যেমন সুস্পষ্ট ছিল, অপর সকলের কাছেও তেমনি সুস্পষ্ট ছিল যে আর যে পার্টি যাই করুক, যতদিন ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ রিভাইব না হইতেছে, ততদিন গণ-ঐক্যের কোনও ক্ষতিই কেউ করিতে পারিবেন না। পূর্ব-পাকিস্তানে আসল গণ-সমর্থিত পার্টি বলিতে এই দুইটি। আর এখানকার ছাত্র-তরুণসহ গোটা জনসাধারণ রিভাইভ্যালের বিরোধী। শহীদ সাহেবের ঝটিকা সফরের বিরাট-বিরাট জনসভার বক্তৃতায় এই গণ-ঐক্য দিন দিন অধিকতর শক্ত ও মযবুত হইতেছিল।

১১. এক দফা জাতীয় দাবি

লিডার তাঁর সফরের ফাঁকে–ফাঁকে ঢাকায় আসিলে আমার রোগশয্যায় আমাকে দেখিতে আসিতেন। স্বভাবতঃই তাঁর সাথে উচ্চস্তরের অন্যান্য নেতারাও থাকিতেন। এমনি এক সাক্ষাতে সংগী নেতাদের সামনেই তিনি বলিলেন যে ন্যাপ–নেতারা তাঁর কাছে মিনিমাম প্রোগ্রাম হিসাবে চৌদ্দ–পনরটা দফা উপস্থিত করিয়াছেন। প্রসংগক্রমে বলা ভাল যে অনেকেই মনে করিতেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের উদ্দেশ্য হিসাবে শুধু 'গণতন্ত্র পুনর্বহালে'র মত অস্পষ্ট ও জনগণের দুর্বোধ্য কথার বদলে ধরা ছোঁয়ারও মত একটি সুস্পষ্ট আদর্শ দরকার। তারই নাম দেওয়া হইয়াছিল মিনিমাম প্রোগ্রাম। বিভিন্ন পার্টি–নেতারা এই মিনিমামই লিডারের খেদমতে পেশ করিতেছিলেন। এটা অন্যায়ও ছিল না, অনধিকার চর্চাও ছিল না । তবু মিনিমাম দাবির দফা–সংখ্যা এত বেশি দেখিয়া আমাদের বাস্তব–বুদ্ধির অভাবেই বোধ হয় লিডার বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। আমি লিডারকে বলিলাম ঃ অত বেশি দফার দাবি তিনি না মানিতে পারেন, তবে তাঁর নিজেরও 'এক দফা দাবির' দৃঢ়তা কিছুটা শিথিল করিতে হইবে। খানিক আলোচনার পর তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার মত তাঁকে জানাইতে উপদেশ দিলেন।

কয়েকদিন পরে কিছুটা ভাল হইয়া মানিক মিয়ার বাড়িতে লিডারের সাথে দেখা করিলাম এবং এ বিষয়ে আমার চিন্তার ফল তাঁকে জানাইলাম। তিনি মোটামুটি নিমরাযী হইয়া আমাকে খুব সংক্ষেপে একটি বিবৃতি মুসাবিদা করিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন ঃ উভয় পাকিস্তান হইতে ৫০ জন করিয়া মোট এক শ' নেতার বিবৃতি হইতে হইবে। আমি লিডারের আদেশমত ফুলস্কেপ শিটের এক পৃষ্ঠায় একটি বিবৃতির মুসাবিদা করিলাম। তাতে নয় নেতার বিবৃতির সারকথার উপর বুনিয়াদ করিয়া দু–এক দফার দাবি খাড়া করিলাম। উহাই টাইপ করিতে আতাউর রহমান সাহেবের কাছে দিলাম। টাইপ করার সময় আতাউর রহমান আমাকে ফোনে জানাইলেন যে আমার মুসাবিদাটা অতিরিক্ত মাত্রায় ছোট হইয়া গিয়াছে। দু–এক যায়গায় একটু বাড়াইয়া লেখিলে ভাল হয়। তবে তিনি আমার মুসাবিদায় হাত না দিয়া ঐ ধরনের একটা মুসাবিদা করিতে চান। আমার আপত্তি আছে কি না। আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম। পরের দিন আমরা দুই মুসাবিদারই টাইপ কপি লইয়া লিডারের সাথে দেখা করিলাম। তিনি উভয় মুসাবিদাই মনোযোগ দিয়া পড়িলেন। আমারটা ফুলস্কেপ এক পৃষ্ঠা। আতাউর রহমান সাহেবেরটা দেড় পৃষ্ঠা। তবু লিডার বলিলেন ঃ তিনি আরও ছোট বিবৃতির মুসাবিদা চাহিয়াছিলেন। উভয় মুসাবিদায়ই খানিকক্ষণ চোখ বুলাইয়া অবশেষে বলিলেন ঃ তোমরা দুইজনে যখন দুইটা করিয়াছ, তখন আমিও একটা করি।

কি বল? আমরা সানন্দে সাগ্রহে রাযী হইলাম। পরের দিন তিনি ফুলস্কেপের আধা পৃষ্ঠার একটি মুসাবিধা আমাদেরে দেখাইলেন। তাতে তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনর্বহালকেই আমাদের একমাত্র জাতীয় দাবী করিয়াছেন। সুস্পষ্ট ধরা-ছোঁয়ার মত এবং জনগণের বোধগম্য হওয়ার দিক হইতে এমন পরিষ্কার দাবি আর হইতে পারে না। আমরা তা স্বীকার করিলাম। কিন্তু ঐ শাসনতন্ত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয় নাই ; তার ফলে আমরা উহাতে দস্তখত করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম ; কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে পূর্ব-পাকিস্তানীদের দাবিদাওয়া আরও বেশি দানা বাঁধিয়াছে। ইত্যাদি যুক্তি দিয়া লিডারের মুসাবিদায় আমরা আপত্তি করিলাম। কিন্তু সংগে সংগেই একথাও আমরা বলিলাম যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা যদি এই বিবৃতিতে অগ্রিম ওয়াদা করেন যে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠকেই তিন বিষয়ের কেন্দ্রীয় ফেডারেশন ও উভয় অঞ্চলকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়া শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হইবে, তবে আমরা লিডারের মুসাবিদা ঐরূপ সংশোধিত মতে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

১২. শেষ বিদায়

লিডার আমাদের কথাটা ফেলিয়া দিলেন না। চিন্তা করিলেন। নোট করিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বুঝাইবার দায়িত্ব নিলেন। আমাদের প্রস্তুত থাকবার আদেশ-উপদেশ দিয়া তিনি করাচি চলিয়া গেলেন। সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসার জন্য যুরিখ লণ্ডন বৈরুত গেলেন। আর আসিলেন না। তাঁর বদলে আমাদের দুর্ভাগ্যের ঘোর অন্ধকার ছায়া লইয়া আসিল তাঁর লাশ। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তিনি বৈরুতের এক হোটেলে এন্তেকাল করিলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে করাচিতে দাফন করিতে চাহিলেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানবাসী দাবি করিল তাদের প্রাণ-প্রিয় নেতাকে পূর্ব-পাকিস্তানের মাটিতে দাফন করিতে হইবে। তাই হইল। পূর্ব-পাকিস্তানের অপর প্রাণ-প্রিয় নেতা শেরে বাংলার পাশে তাঁকে দাফন করা হইল।

তারপর-তারপর দু'চারদিন আগে-পিছে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানই রিভাইভ হইয়া গেল। ফলে ঐ দূরদর্শী মহান নেতার উপদেশ কার্যতঃ তাঁরই অনুসারীরা অগ্রাহ্য করিলেন। একমাত্র পূর্ব-পাকিস্তানের এন. ডি. এফ. অন্ততঃ মতবাদের দিক দিয়া মহান নেতার ওসিয়ত পার্টিহীন গণ-ঐক্যের কথা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়া যাইতে থাকিল।

এরপরে দেশের রাজনীতিতে যা-যা ঘটিয়াছে তার সবগুলিকেই 'ডিভিয়েশনের' 'অরিজিনাল সিনের' স্বাভাবিক পরিণতি বলা যাইতে পারে। পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় যা

করা সম্ভব ও উচিৎ, বর্তমান 'বুনিয়াদী গণতন্ত্রের' অবস্থাতেও তাই করা যায় মনে করিয়া ১৯৬২ সাল ও ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে নেতারা সিরিয়াসলি অংশ গ্রহণ করিলেন। পরিণামে যা অবশ্যম্ভাবী তাই হইল। বিশেষতঃ ১৯৬৫ সালের নির্বাচনটাই গণতন্ত্রী নেতাদের চৈতন্য উদয়ের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল। মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার জনপ্রিয়তা ও প্রাইমারি ভোটারদের বিপুল সমর্থনও অপযিশনকে জিতাইতে পারে নাই। পারিলে আইউব শাসনতন্ত্রকে অগণতান্ত্রিক বলা যাইত না।

ঐ সনেরই অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাক–ভারত যুদ্ধ। 'যুদ্ধ নয় শান্তি' 'শত্রুতা নয় বন্ধুত্বই' পাকিস্তান ও ভারতের বাঞ্ছনীয় সম্পর্ক, এই খাঁটি সত্য ও বাস্তব কথাটা প্রেসিডেন্ট আইউব যতবার যত জোরে বলিয়াছেন, তেমন আর কোনও পাকিস্তানী নেতা বলেন নাই। তথাপি ভাগ্যের পরিহাস, তাঁরই আমলে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটিল যা পার্লামেন্টারি আমলে কোনও পক্ষই কল্পনাও করে নাই।

অথচ তার মাত্র পাঁচ বছর আগে ১৯৬০ সালেই সিন্ধু অববাহিকা চুক্তির মত মহাপরিকল্পনাটা স্বাক্ষরিত হয় এবং সে উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরু প্রথম ও শেষবারের মত পাকিস্তান পর্দাপণ করেন। এর সবটুকু প্রশংসা প্রেসিডেন্ট আইউবের এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই সংগে এও মানিতে হইবে যে যতদিন কাশ্মির বিরোধ না মিটিবে, ততদিন ভারতের সাথে অন্য কোন ব্যাপারে কথাই বলিব না, এ যুক্তিটাও ঠিক নয়। সিন্ধু অববাহিকা চুক্তির শিক্ষা এই।

১৯৬৭ সালে অপযিশন দলের 'বিপ্লবী' যুগের সব চেয়ে বড় কাজ পি. ডি. এম. গঠন। এর প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে ১৯৬৫ সালের 'কপের' মত এটা শুধু নির্বাচনী মৈত্রী নয়। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব–পাকিস্তানের গ্রহণযোগ্য একটা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর এর বুনিয়াদ। শহীদ সাহেবের শেষ ইচ্ছাই এতে রূপ পাইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সকল দলের নেতারা এই সর্বপ্রথম তিন বিষয়ের ফেডারেল কেন্দ্র মানিয়া লইয়াছেন। ইহা নিশ্চিত রূপেই পাকিস্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভ সূচনা।

•

ত্রিশা অধ্যায়

কালতামামি

১. ইন্টারিম রিপোর্ট

১৯৪৮ হইতে ১৯৬৭ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরের মুদ্দতটাকে 'কাল' না বলিয়া 'মহাকাল' বলাই উচিৎ। এই মুদ্দতে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, তা অঘটনই হোক আর দুর্ঘটনাই হোক সবই মহাঘটনা। মুদ্দতটাও বিশ বছরের। প্রায় দুই যুগের সমান। দুই ডিকেড ত বটেই। অতএব এটা মহাকাল। আজও তামাম হয় নাই। কাজেই এর কাল তামামি লেখা চলে না। এ কাল আজও চলিতেছে। যতদূর নযর চলে আরও চলিবে। কাজেই আমার দেখা রাজনীতির শেষ অধ্যায় হিসাবে আমি যে কাল-তামামি লিখিতেছি, এটাকে পাঠকরা ইন্টারিম রিপোর্ট ধরিয়া লইবেন। আমার হায়াতে না কুলাইলে আমার পরবর্তীরাই এর চূড়ান্ত রিপোর্ট (উকিল মানুষ বলিয়া 'ফাইনাল রিপোর্ট' কথাটা ব্যবহার করিলাম না) লিখিবেন। তখন সব ব্যাপারই আরও পরিচ্ছন্ন প্রেক্ষিতে ট্রু পারসপেকটিভে দেখা যাইবে। ফলে সে চূড়ান্ত রিপোর্ট আমার আজকার ইন্টারিম রিপোর্টের সিদ্ধান্ত ওলট-পালট হইয়া যাইতে পারে। তবু আমার কথাটা বলিয়া যাওয়া উচিৎ মনে করিলাম।

কেউ-কেউ মনে করিতে পারেন, এই বিশ বছরের লম্বা মুদ্দতটাকে দুই ভাগে দুই যুগে ভাগ করিলেই ত অন্ততঃ প্রথম দিককার যুগ সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত কাল তামামে লেখা যাইত। এটা করাও সহজ ছিল। কারণ এই মুদ্দতের সাবেক ও বর্তমান শাসকরা এই বিশ বছরের দুই বিপরীতধর্মী যুগে ভাগ করিয়া থাকেন। অবশ্য বিপরীত মতলবে। সাবেকরা বলিয়া থাকেন, প্রথম দশ বছর পার্লামেন্টারি যুগ, আর দ্বিতীয় দশ বছর ডিক্টেটরি যুগ। বর্তমানরা বলিয়া থাকেন, আগেরটা ডিকেড অব ডিকে, আর পরেরটা ডিকেড-অব-প্রোগেস। সাবেকদের যুক্তি এই যে তাঁদের আমলে দেশে গণতন্ত্র ছিল না। বর্তমান শাসকরা দেশরক্ষা বাহিনীর অসদ্ব্যবহার করিয়া মার্শাল ল' জারি করিয়াছেন। বেআইনীভাবে শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়াছেন। দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়িয়া নিয়াছেন। দেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমানরা জবাবে বলেন যে আগে দেশে গণতন্ত্র-টন্ত্র কিচ্ছু ছিল না। বাতিল শাসনতন্ত্রটাও ওয়ার্কেব্‌ল ছিল না। রাষ্ট্র-নায়কদের পদ ও ক্ষমতা লইয়া নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করিয়া দেশটাকে রসাতলে নিতেছিলেন। তাই বর্তমান নেতারা আগের নেতাদের ধাক্কা মারিয়া গদি হইতে সরাইয়া দেশটাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই দুই পক্ষের যে পক্ষের মতই ঠিক হোক, উভয়ের মতেই এই মুদ্দতটা দুই সুস্পষ্ট যুগে বিভক্ত। এই হিসাবে আমিও দুই দলের দুই মতের সহিত এক হইয়া এই যুগকে দুই কালে ভাগ করিতে পারিতাম। কাল তামামি লেখা আমার পক্ষে সহজ হইত।

কিন্তু এই সহজ পথ ফেলিয়া আমি কঠিন পথ ধরিলাম এই জন্য যে, এই দুই দলের কারও মত আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার বরাবরের তথাকথিত 'অভ্যাস'-মত 'এটাও সত্য' এটাও সত্য বলিতে পারিলাম না। জীবনের প্রথম এইবার বলিলাম ঃ 'এটাও সত্য না ; ওটাও সত্য না।' এ জন্য আমি দুঃখিত। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই মুদ্দতটা আসলে দুই যুগ নয়, একই যুগ। অন্ততঃপক্ষে একই যুগের এপিঠ-ওপিঠ। আইনতঃ ও টেকনিক্যালি দুই আমলের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, কার্যতঃ পার্লামেন্টারি শাসন এদেশে কোন দিনই ছিল না। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ 'পার্লামেন্টের' ফ্লোরে দাঁড়াইয়া সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ 'আমার বিচারে আমার পার্টি (মুসলিম লীগ) পার্লামেন্টের চেয়ে বড়।' কাজেই তাঁর আমলে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। তবে কি এক-পার্টি-শাসন ছিল? জনগণের মুখের উপর মুসলিম লীগের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন, তাঁর আমল পার্টি-ডিক্টেটর শিপও ছিল না। তারপর প্রধানমন্ত্রীর দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ডের পরে পার্লামেন্ট বা মুসলিম লীগকে জিগ্‌গাসা না করিয়াই গবর্নর-জেনারেল নাযিমুদ্দিন যেদিন প্রধানমন্ত্রী হইলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি শাসন ছিল না। আইন-পরিষদে মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও যেদিন তিনি বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক ডিস্‌মিস হইলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি শাসন ছিল না। তারপর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যেদিন আমেরিকা হইতে গবর্নর-জেনারেলের বগল-দাবা হইয়া উড়িয়া আসিয়া প্রধানমন্ত্রী হইলেন এবং পরে মুসলিম লীগেরও প্রেসিডেন্ট হইলেন, তখনও দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। এই প্রধানমন্ত্রীই যখন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সদলবলে হারিয়া গিয়া বিজয়ী যুক্তফ্রন্টকে গবর্নমেন্ট চালাইতে দিলেন না, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। তারপর বেশির ভাগ তথাকথিত পার্লামেন্টারি নেতার নীরব ও সরব সমর্থনে গবর্নর-জেনারেল গণ-পরিষদ ও পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিয়া যেদিন অর্ডিন্যান্স-বলে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, অর্ডিন্যান্স বলেই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলি উড়াইয়া দিলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচ কোটি ও সাড়ে তিন কোটি লোকের প্রতিনিধিত্ব প্যারিটি প্রবর্তন করিলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। তারপর নির্বাচন করিয়া নয়, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে মামলা-মোকদ্দমা করিয়া

যেদিন একটি নয়া গণ-পরিষদ আদায় করা হইল, চালাকি ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া গবর্নর-জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী একই পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লইয়া নয়া সরকার গঠন করা হইল এবং সেই সরকার জোড়াতালি দিয়া একটি নির্বাচন-পদ্ধতিবিহীন অসমাপ্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি শাসন চালু ছিল না। এক কথায় উপরে বর্ণিত কোন সরকারই ভোটারদের নাগালের মধ্যে ছিলেন না। আট বছরে দেশে কোনও শাসনতন্ত্রই রচিত হয় নাই। শাসনতন্ত্র রচনার পরও দুই বছরে কোন নির্বাচন হয় নাই।

সুতরাং জেনারেল আইউব ১৯৫৮ সালে যা করিলেন তাতে তিনি কোনও গণতন্ত্র হরণ করেন নাই। এক প্যাটার্নের অগণতন্ত্র হইতে অন্য প্যাটার্নের অগণতন্ত্রে দেশকে নিয়া গেলেন মাত্র। আগের প্যাটার্নের অগণতন্ত্রীরা জনগণের ভোটাধিকার আইন করিয়া কাড়িয়া নেন নাই সত্য, কিন্তু কাজে-কর্মে স্বীকারও করেন নাই। নির্বাচনের নামও মুখে আনেন নাই। সে-স্থলে আইউব সাহেব আসিয়া আইন করিয়া ভোটাধিকার বিলোপ করিয়া দিয়াছেন। বলিতে গেলে আইউব সাহেবের কথাটাই সহজবোধ্য। তিনি সোজাসুজি দেশবাসীকে বলিয়াছেন ঃ 'তোমরা ভোট দিতে জান না। কাজেই তোমাদের ভোটাধিকার দিলাম না।' বড় সাফ কথা। কোনও হাংকি-পাংকি নাই। কথাটা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। এই জন্যই আইউব সাহেব বলিয়াছেন দেশবাসী যেটা ভাল বুঝে সেই মত শাসনতন্ত্রই তিনি দিয়াছেন। একেই বলে 'সুটেড টু আওয়ার জিনিয়াস।' পক্ষান্তরে সাবেক নেতারা দেশবাসীকে বলিতেন ঃ 'তোমাদের ভোটাধিকার স্বীকার করি কিন্তু নির্বাচন দিব না।' এটা জনগণের বুঝা সত্যই কঠিন ছিল। সেজন্য ঐ ব্যবস্থা 'সুটেড টু আওয়ার জিনিয়াস' ছিল না।

অতএব দেখা গেল সাবেক আমলেও জনগণের শাসন ছিল না। বর্তমান আমলেও জনগণের শাসন নাই। জনগণ হইতে দূরে থাকিতে হইবে, এই নীতিতে দুই আমলই সমান বিশ্বাসী। এই হিসাবেই আমি এই বিশ বছরের মুদ্দতকে দুই বিপরীত-ধর্মী বা স্বতন্ত্র-ধর্মী পৃথক যুগ বলিয়া মানিতে পারিলাম না। তাই উভয় আমল লইয়াই একটি ইন্টারিম সাল-তামামি লিখিলাম।

২. পাপের প্রায়শ্চিত্ত

এবার আলোচনায় আসা যাক। রাজনৈতিক নেতারা যে অনেক পাপ করিয়াছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর অভিযোগও তাই। নেতারা আট বছরে একটা শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন নাই। পুরাতন শাসনতন্ত্রের দেওয়া বাই-ইলেকশনগুলি পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সরকারের আইনসংগত সমালোচনার জন্য অপযিশন পার্টি

গঠন করিতে দেন নাই। সরকারের সমালোচকদের পাকিস্তানের দুশ্‌মন,ভারতের চর ও ইসলামের শত্রু আখ্যা দিয়া তাঁদেরে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করিয়াছিলেন। খবরের কাগযের আফিসে তালা লাগাইয়া সাংবাদিক-স্বত্বাধিকারীদেরে জেলে আটক করিয়াছিলেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পূর্ব-বাংলার ন্যায়সংগত দাবিটাকে পশ্চিম-বাংলার উস্কানি আখ্যায় গালি-গালাজ করিয়াছিলেন। ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালাইয়াছিলেন। পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা শহীদ সাহেবকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁর গণ-পরিষদের মেম্বরশিপ কাটিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচন-বিজয়ী প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়া তাঁকে নযরবন্দী করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যায়-অসংগত অগণতান্ত্রিক অত্যাচার চলে আট-আটটা বছর ধরিয়া। কিন্তু তবু এই মুদ্দতে আমাদের দেশরক্ষা বাহিনী রাষ্ট্র-শাসনে হস্তক্ষেপ করে নাই। তারপর এই আট বছরের অপকর্মীদেরে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া যখন অবশেষে দেশে একটা শাসনতন্ত্র রচিত হইল, যখন সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া নয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে দেশময় একটা সাধারণ নির্বাচন হওয়ার দিন-তারিখ স্থির হইল, ঠিক সেই মুহূর্তে মার্শাল ল আসিল। বলা হইল ঐ শাসনতন্ত্র কার্যোপযোগী নয়। তদনুসারে ইলেকশন হইলে অনেক অর্থের অপচয় হইত। এমন কি অনেক খুন-জখম হইয়া যাইত। এর আগেই স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দর মির্যা বলিয়া রাখিয়াছিলেন : 'এ দেশের মূর্খ জনসাধারণ ভোট দিতে জানে না। তার প্রমাণ, এই মূর্খেরা না বুঝিয়া ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে শতকরা সাড়ে সাতানব্বইটা ভোট দিয়াছিল। এতে প্রমাণ হইয়াছিল এরা গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়। এদেরে শুধু ডাণ্ডাপিটা করিয়া শাসন করা দরকার।' ইলেকশনের নির্ধারিত সময়ের প্রাক্কালে অদৃশ্য হস্তের খেলা চলিল। সুন্দর কাগযে বড় বড় টাইপে সুদৃশ্য-ছাপা পোস্টারে বলা হইল : 'রিভলিউশনারি কাউন্সিল চাই।' সত্য-সত্যই একদিন 'রিভলিউশন' আসিল। মার্শাল ল প্রবর্তিত হইল। রাজনৈতিক নেতাদের পাপের প্রতিকার করিবার জন্যই মার্শাল ল হইয়াছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সে পাপটা করিয়াছিল কারা ? আমরা যে সব কাজকে রাজনৈতিক নেতাদের পাপ মনে করি, সেই পাপের শাস্তি স্বরূপই কি মার্শাল ল হইয়াছিল ? প্রশ্নটার উত্তর দিয়াছেন স্বয়ং মার্শাল ল-কর্তারা। তাঁরা মার্শাল ল করিয়া ঘোষণা করিলেন : ১৯৫৪ সালের পরে যাঁরা দেশ শাসন করিয়াছেন, বিচার হইবে শুধু তাঁদেরই। এর অর্থ এই যে, তার আগে যাঁরা দেশ শাসন করিয়াছিলেন, তাঁদের কোনও পাপ ছিল না। যাঁরা তাঁদেরে হটাইয়া নির্বাচনে হারাইয়া শাসনক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন, অপরাধ তাঁদের। আট বছরের শাসনতন্ত্রহীন দেশকে যাঁরা একটা শাসনতন্ত্র দিলেন অপরাধ তাঁদের। এই একটিমাত্র ব্যাপার হইতেই মার্শাল ল প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ধরা পড়িবে। অন্য

কিছু বিচার করার দরকারই হইবে না। মার্শাল ল প্রবর্তনের নয় বছর পর প্রেসিডেন্ট আইউব তাঁর 'ফ্রেণ্ডস্ নট মাষ্টার্স' নাময রাজনৈতিক আত্ম-জীবনী লিখিয়াছেন। তাতে তিনি কিভাবে মার্শাল ল আনিলেন তা না বলিলেও কি কারণে আনিলেন তা বলিয়াছেন। জোরদার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। ও-ধরনের কৈফিয়ত অতীতে সব মার্শাল ল-ওয়ালারাই দিয়াছেন। ভবিষ্যতেও দিবেন। ওতে কোনও নূতনত্ব নাই। ও-সবই ধরা-বাঁধা গৎ। ও-সব গতের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কথাটা এই যে, বৃটিশ প্যাটার্নের গণতন্ত্র পাকিস্তানে ব্যর্থ হইয়াছিল। কথাটা সত্য হইলে 'আইউবী বিপ্লব' সত্যই দরকার ছিল। সত্য হওয়াও অপরিহার্য। কারণ ওটা ছাড়া আইউবী-বিপ্লবের আর কোনও সংগত কারণ ছিল না। বেশির ভাগ দেশেই 'বিপ্লব' হইয়াছে 'রাজতন্ত্র' বরতরফ করিয়া 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য। স্বাভাবিক কারণেই ডিক্টেটর বরতরফ করিবার জন্যও বিপ্লব হইয়াছে। কারণ 'রাজা' ও 'ডিক্টেটর' মূলতঃ এবং গণতন্ত্রের দিক হইতে একই চিজ। আমাদের দেশে 'রাজাও' ছিল না, 'ডিক্টেটর'ও ছিল না। তবে প্রধান সেনাপতি আইউব 'বিপ্লব' করিলেন কেন ? একমাত্র উত্তর ঃ শাসনতন্ত্রে বিপ্লবী পরিবর্তন আনিবার জন্য। দেশের শাসনতন্ত্র সত্যই 'বিপ্লব' ছাড়া ভাংগা যায় না।

কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিয়াছে ঃ পাকিস্তানে গণতন্ত্রই সত্যই ব্যর্থ হইয়াছিল কি না ?

৩. গণতন্ত্র কি ব্যর্থ হইয়াছিল ?

সত্য কথা এই যে পাকিস্তান গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পথে চলিয়াছিল। সমস্ত লক্ষণই ঐদিকে অংগুলি নির্দেশ করিতেছিল। আর কিছুদিন গেলে বোধ হয় সত্য-সত্যই ব্যর্থ হইত। তবে এটাও সত্য যে যেদিন আইউব সাহেব বিপ্লব করিলেন, সেদিন পর্যন্ত গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় নাই। প্রয়োগই হয় নাই, ব্যর্থ হইবে কি ? আট বছর ধরিয়া শাসনতন্ত্র রচনা লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইল। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকার ডিসমিস করা হইল। কেন্দ্রেও নাযিমুদ্দিন সরকার ডিসমিস হইলেন। এবং সর্বশেষ গণ-পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়া হইল। এর যেকোনও একটাকে বিপ্লবের অজুহাত করিয়া প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিলে তাঁর কাজের নৈতিক সমর্থন থাকিত। তিনি জনগণের সমর্থন পাইতেন। ঠিক তেমনি, তিনি যদি ১৯৫৯ সালের প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন, নির্বাচনে তাঁর আশংকিত খুন-খারাবি আরম্ভ হইলে পরে তিনি যদি মার্শাল ল প্রবর্তন করিতেন, তবেই তিনি যুগপৎভাবে দেশবাসীর ও বিশ্ববাসীর নিকট সম্মান ও সমর্থন পাইতেন।

অথচ তিনি নির্বাচনের প্রাক্কালে মার্শাল ল করিলেন তাঁর নিজের কল্পিত ও অনুমিত বিপদ ঠেকাইবার জন্য। এমন সময় করিলেন, যখন রাষ্ট্রচালক রাজনীতিকরা অনেকবার পথভ্রষ্ট হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত টাল সামলাইয়া লইয়াছিলেন। অতীতে অনেকবার বিপ্লব করা দরকার হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল আইউব রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত ছিলেন। বিপ্লব না করিয়া বরঞ্চ তিনি রাজনীতিকদের সহায়তা করিয়াছেন। গণ-পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার মত অন্যায় বেআইনী ও অগণতান্ত্রিক কাজ হওয়ার সময় তিনি 'বিপ্লব' করিয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করেন নাই। বরঞ্চ নিজে রাজনীতিকের অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতে তাঁর সাধু ইচ্ছা এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থাই প্রমাণিত হইয়াছিল। দেশে গণতন্ত্র বাঁচাইবার শেষ চেষ্টায় তিনি রাজনীতিকদের সহায়তা করিবার জন্যই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এসব কথা যদি সত্য হয়, তবে গণতন্ত্র যখন টাল সামলাইয়া উঠিয়াছিল, শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া যখন নির্বাচনের দিন-তারিখ পড়িয়াছিল, তখন তিনি তলওয়ার মারিলেন কেন ? রচিত শাসনতন্ত্র অচল বলিয়া ? সাধারণ নির্বাচনে খুন-খারাবি হইত বলিয়া ? এতই দৃঢ় যদি তাঁর বিশ্বাস ছিল, তবে ওটা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন না কেন ? এ প্রশ্নের জবাব কেউ দেন নাই। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইউবের বই -এও এর জবাব নাই।

কাজেই যদি মনে করা হয়, পাকিস্তান রক্ষার জন্য নয়, দেশের আর্থিক কাঠামো বাঁচানোর জন্যও নয়, ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা পূরণের জন্যই প্রেসিডেন্ট আইউব রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিয়াছেন, তবে তা নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। কিন্তু সে ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখাও দেশ-সেবার জন্য হইতে পারে। হাযার সাধু উদ্দেশ্য লইয়াও সামরিক শক্তি-বলে বা বেআইনীভাবে দেশের রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের কোনও অধিকার কোনও সেনা-নায়ক বা সরকারী কর্মচারির নাই, সেটা আলাদা কথা। এখানে তা আমার আলোচ্যও নয়। এখানে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু এই যে প্রধান-সেনাপতি জেনারেল আইউব নিতান্ত সাধু-উদ্দেশ্য-মিশ্রিত-ব্যক্তিগত-উচ্চাকাংখায় মার্শাল ল করিয়াছেন। তা করিতে গিয়া তিনি অনেক ভাল কাজও করিয়াছেন, অনেক খারাপ কাজও করিয়াছেন। তুলনায় যদি দেখা যায়, তাঁর ভাল কাজের ওজন খারাপ কাজের চেয়ে ভারি, তবে তাঁর তারিফ ও তাঁর কাজের সমর্থন করিতেই হইবে।

৪. অবিমিশ্র অভিশাপ নয়

মার্শাল ল, সামরিক বিপ্লব ও ব্যক্তিগত ডিক্টেটর-শিপের কোনওটাই নির্ভেজাল অভিশাপ নয়। অনেক সময় ঐ সবের দ্বারা পরিণামে দেশ ও দেশবাসী জনসাধারণের

উপকার হইয়া থাকে। রাজতন্ত্র ও ডিক্‌টেটর-শিপের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধরনের বিপ্লব সর্বদাই দেশের কল্যাণ করিয়া থাকে, তাতে দ্বিমত নাই। তাছাড়াও শুধুমাত্র শাসনতন্ত্র ও সামাজিক-অর্থনীতিক কাঠামো বদলাইবার উদ্দেশ্যে বিপ্লব হইলেও তা দেশের মংগল সাধন করিতে পারে। আইউব সাহেব যদি মোটামুটি দেশের কল্যাণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁর গোড়ার ক্ষমতা দখলের অন্যায় ও বেআইনী কাজটাও জনসাধারণ ও ইতিহাসের বিচারে ভাল কাজ বিবেচিত হইবে।

আগে তাঁর ভাল কাজগুলিরই উল্লেখ করা যাক। তিনি (১) পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার নীতিতঃ অবসান করিয়াছেন, (২) একবিবাহকে কার্যতঃ বাধ্যতামূলক করিয়াছেন, (৩) দুই পাকিস্তানের আর্থিক বৈষম্য স্বীকার করিয়াছেন, (৪) রেলওয়ে প্রদেশকে দিয়াছেন, (৫) কয়েকটি নিখিল পাকিস্তানীয় অর্থ-বন্টন প্রতিষ্ঠানের হেড আফিস ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন, (৬) শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনকে দুই প্রদেশের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছেন, (৭) পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করিয়া উভয় পাকিস্তানের নিম্নস্তরের স্বায়ত্তশাসনকে একই প্যাটার্নের করিয়াছেন, (৯) জাতীয় শিপিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছেন এবং (১০) সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করিয়া বৈদেশিক নীতিকে সুসংগত করিয়াছেন।

এসবই ভাল কাজ। দেশের কল্যাণজনক ও উন্নয়নমূলক কাজ। পার্লামেন্টারি আমলের যে কোনও সরকারের জন্য এর সব কয়টা এবং যে কোনও একটা গৌরব ও অহংকারের বিষয় হইত। কারণ এর মধ্যে কয়েকটি কাজ পার্লামেন্টারি সরকারের পক্ষে করা খুবই কঠিন হইত। মুসলিম ওয়ারিসী ও বিবাহ আইন সংশোধন ও পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদারি উচ্ছেদ এই ধরনের কাজ। পার্লামেন্টারি সব সরকারকেই জন-মতের উপর নির্ভর করিতে হয়। সেজন্য সব কাজই তাঁদের করিতে হয় ধীরে-ধীরে সহাইয়া-সহাইয়া। কোনও ব্যাপারেই বিপ্লবী কোনও পরিবর্তন তাঁরা আনিতে পারেন না। পারেন না বলিয়াই প্রয়োজন-বোধে জনকল্যাণের জন্যই বিপ্লবের দরকার হয়। বিপ্লবী-সরকার প্রচলিত আইন জন-মত সমাজ-ব্যবস্থা ভুক্তিত অধিকার কিছুই মানিয়া চলিতে বাধ্য নন। কারণ ও-সব ওলট-পালট করিবার জন্যই বিপ্লব আসিয়াছে। ঠিক তেমনি পার্লামেন্টারি সরকারকে কোনও না-কোন পার্টি বা অর্গানিযেশনের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রতি কাজে পার্টির অনুমোদন লইতে হয়। তারপর আইন-সভায় যাইতে হয়। সেখানে আইন পাস করাইতে হয়। বাজেট মনযুর করাইতে হয়। তারপর কার্যে পরিণত করিতে হয়। বিপ্লবী সরকারকে এসব কিছুই করিতে হয় না। কাজেই ইচ্ছা করিলেই তাঁরা দেশের কল্যাণজনক ও উন্নয়নমূলক কাজ আশাতীত দ্রুতগতিতে

করিতে পারেন। এই হিসাবে আমাদের বিপ্লবী সরকারের কাজ মোটেই আশানুরূপ হয় নাই। অন্য কাজের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কারণ কোনটা ভাল আর কোনটা ভাল নয়, তা নিয়া বর্তমান সরকার ও আমাদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু যে বিষয়ে মতভেদ নাই এবং যে কাজটা তাঁরা করিতে চান বলিয়া থাকেন, তার কথাই বলা যাক। এটা কার্টেল-প্রথা ও দুই অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার কথা। এ দুইটা দূর হয়ই নাই, বরঞ্চ দিন-দিন বাড়িতেছে।

কিন্তু এটাও আসল কথা নয়। সরকারের ভাল-মন্দ কাজের বিচারে গণতান্ত্রিক সরকার ও বিপ্লবী সরকারের মাপকাঠি এক নয়। গণতান্ত্রিক সরকারকে ভোটাররা ভোট দিয়া গদিতে বসান। কাজেই তাঁরা যদি ভাল কাজ করেন, তবে তার জন্যও যেমন ভোটাররাই প্রশংসার অধিকারী, তেমনি ঐ সরকার যদি খারাপ কাজ করেন তবে তার নিন্দার ভাগীও ভোটাররা। এটা ন্যায়-সংগতও। কারণ তেমন অবস্থায় ভোটাররাই আবার ভোট দিয়া সে সরকারকে বরতরফ করিতে পারেন এবং করেনও।

৫. বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক সরকারের পার্থক্য

কিন্তু বিপ্লবী সরকারের কেস তা নয়। ভোটাররা তাঁদের ভোট দিয়া গদিতে বসান নাই। বিপ্লবের নেতারা নিজের ইচ্ছায়, নিজের প্ল্যান-প্রোগ্রাম লইয়া ভোটারগণের মত না লইয়া অনেক সময় ভোটারদের অমতে জোর যবরদস্তিতে, গদি দখল করেন। উদ্দেশ্য দেশের ভাল করা। দরকার এই জন্য যে ভোটের সরকার দিয়া ঐসব কাজ হইতেছিল না। হওয়ার উপায়ও নাই। গণতন্ত্রী সরকার ঠিকমত দেশকে চালাইতে পারিতেছিলেন না বলিয়াই বিপ্লবের নেতারা জোর করিয়া তাঁদের হাত হইতে গদি ছিনাইয়া নিয়া নিজেরা বসিয়াছেন। কাজেই ভাল তাঁদের করিতেই হইবে। কোনও অজুহাতেই তাঁদের ব্যর্থ হওয়া চলিবে না। ব্যর্থ হইলে তাঁরা নিজেরা এবং তাঁরা একা অপরাধী হইবেন। সুতরাং ভাল কাজ করিলে তাঁরা প্রশংসা পাইবেন না। কারণ ওটা করা ছিল তাঁদের ফরয। বিপ্লবীর দায়িত্বে মজার ব্যাপার এইখানে। সফল হইলে প্রশংসা নাই কিন্তু ব্যর্থ হইলে নিন্দা আছে।

তথাপি বিপ্লবী সরকার প্রশংসা পাইতে পারেন এবং পাইয়াও থাকেন যদি তারা বিপ্লবকে জাস্টিফাই করিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁরা যদি এমন কাজ করেন যা কোনও গণতন্ত্রী সরকারের দ্বারা সম্ভব হইত না, যত যোগ্য বা যত ভাল সরকারই হউন না কেন। যেমন রাজতন্ত্র তুলিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ধনিকদের ধন বাযেয়াফত করিয়া

এক চোটে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন। এমন বিপ্লবী পরিবর্তন আনা ছাড়া আর কোন কাজের জন্যই বিপ্লবী সরকার প্রশংসা পাইতে পারেন না। সাধারণ মামুলি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ত নয়ই। তাছাড়া দৃশ্যতঃ যে সব কাজ কোনও সরকারের আমলের আসলে সে কাজ তাঁদের নাও হইতে পারে। বাপ আম গাছ লাগাইয়া গেলে ছেলের আমলে তাতে যদি ফল ধরে, তবে সে উন্নতিকে ছেলের আমলের উন্নতি না বলিয়া বরঞ্চ বাপের আমলের উন্নতিই বলিতে হইবে। পাকিস্তানের বর্তমান শিল্পোন্নয়নের অনেক কাজই আগের সরকাররা করিয়া গিয়াছেন। সবদেশেই অমন হইয়া থাকে। সরকারের মধ্যে একটা কনটিনিউটি একটা অবিচ্ছিন্নতা থাকিলে এই ধরনের কাজ হয় সকল সরকারের। প্রশংসা পান আগে পরের সব সরকাররাই সমানভাবে। বর্তমান সরকার যদি আগের-আগের সব সরকারকেই ধূচিয়া গাল দিয়া সব কাজের কৃতিত্ব নিজেরা নিতে চান, তবেই এ ধরনের হিসাবের কথা উঠে। তবেই লোকের মনে পড়ে : করাচি ও চাটগা বন্দর, আদমজী জুট মিল, কর্ণফুলী পেপার মিল, খুলনা নিউযপ্রিন্ট মিল ও ডকইয়ার্ড, ফেঞ্চুগঞ্জ সার-মিল, কাপ্তাই বাঁধ ইত্যাদি সবই আগের সরকাররা করিয়া গিয়াছেন। লোকের আরও মনে পড়ে যে বর্তমান সরকারের রূপপুর ঘোড়াশাল ইত্যাদি স্কিম পাঁচ-ছয় বছরের প্রসব-বেদনার পরেও মাঝে-মাঝেই ফল্‌স্‌ পেইন প্রমাণিত হইতেছে।

তবু এসব শিল্পিক ও আর্থিক উন্নতি-অবনতি লইয়া বর্তমান সরকার ও অপযিশন নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিতেছে সে বিতর্কে আমি লেখক সাহিত্যিক হিসাবে এই পুস্তকে কোনও একপক্ষ অবলম্বন করিতে চাই না। ও-সবের বিচার-ভার ইতিহাসের উপরই ছাড়িয়া দিতে চাই। কোনও লোক গদিতে থাকা পর্যন্ত তাঁর আমল সম্বন্ধে সত্যিকার নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা চলে না। যা চলে তা একদিকে সীমাহীন তোষামোদ, অপরদিকে পক্ষপাত-দুষ্ট একতরফা নিন্দা।

একটু গভীরভাবে তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে এবং বর্তমান শাসকরাও ধীর-ভাবে যথাসময়ে বিচার করিলে বুঝিবেন, মার্শাল আইন জারির দ্বারা যে বিপ্লব আমাদের দেশে আনা হইয়াছে মোটের উপর তাতে আমাদের লাভের চেয়ে লোকসান হইয়াছে অনেক বেশি। সে লোকসানগুলির কুফল মারাত্মক, সুদূরপ্রসারী। সে সবের প্রতিকার খুব কঠিন, সংশোধন খুবই সময়সাপেক্ষ। এমন কয়টি ব্যাপারের দিকে দেশবাসী এবং বর্তমান শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমার এই 'ইন্টারিম কাল তামামি' শেষ করিতে চাই।

৩০—

৬. লোকসানের খতিয়ান

সংক্ষেপে এইসব লোকসানের সংখ্যাও মোটামুটি দশটি। যথা ঃ

(১) মার্শাল ল প্রবর্তনে গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের ইমেজ ভাংগিয়া গিয়াছে। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দুনিয়ার নযরে বর্তমানে ভারতই যে এশিয়ার একমাত্র 'শো পিস অব ডেমোক্র্যাসি' আখ্যা পাইতেছে, এই সার্টিফিকেটের হকদার পাকিস্তানও ছিল। মার্শাল ল প্রবর্তন জাস্টিফাই করিতে গিয়া পাকিস্তানের সে অধিকার হরণ করা হইয়াছে।

(২) রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন গণতন্ত্রে সুশিক্ষিত এবং স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া পাকিস্তানের জনগণের যে একটা সুনাম ছিল, সে সুনাম কলংকিত হইয়াছে। এটা সাংঘাতিক রকম মারাত্মক হইয়াছে এই জন্য যে পার্শ্ববর্তী এবং গতকালের একই জনতার অংশ ও একই পরিবেশের সৃষ্ট ফল ভারতীয়দের সংগে তুলনায় আমাদেরে হীন ও অনুন্নত জাতি বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। এর তাৎপর্য প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানের তুলনায় হিন্দুদিগকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছে। ভারতের হিন্দুদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানেরা বাধা দিয়া ইংরাজের তাবেদারি করিয়া ভারতে ইংরাজ শাসন বহাল রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, হিন্দুদের এই অভিযোগ সত্য প্রমাণ করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিকশিত ও প্রসারিত কাঠামোর উপর রচিত ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া ১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্রের সংকুচিত কাঠামোর উপর ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র জারি করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে, ভারতবাসী অর্থাৎ প্রাক-স্বাধীনতার ভারতীয় হিন্দু গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য বটে কিন্তু মুসলমানরা সে যোগ্যতা আজো অর্জন করে নাই। তাদেরে ফের-শুরু, সে-শুরু করিয়া ১৯১৯ সালের 'গ্র্যাজুয়েল রিয়েলিযেশন অব সেল্ফ গবর্নমেন্ট' ট্রেনিং দিতে হইবে। সেই জন্যই ১৯১৯ সালের আগের লর্ড রিপনের আমলের মত মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলা বোর্ডে সরকার মনোনীত অফিশিয়াল চেয়ারম্যানের বিধান পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছে।

(৩) পাইকারীভাবে সমস্ত রাজনীতিকদের অর্ডিন্যান্স বলে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্বই মসি-লিপ্ত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাটা উপরের দুই নম্বর দফায় খুবই পরিপূরক হইয়াছে। বলা হইয়া গিয়াছে যেমন জনতা, তেমনি তাদের নেতা। এই সব দণ্ডিত নেতাদের প্রায় সবাই কায়েদে-আযম ও কায়েদে-মিল্লাতের

সহচর অনুচর সহকর্মী ও মন্ত্রী ছিলেন। 'সহচর দিয়াই মানুষের বিচার করা যায়' এই নীতির বলে এতে কায়েদে আযম-কায়েদে মিল্লাতেরও বিচারটা হইয়া গেল। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে হিন্দু-নেতারা মুসলিম-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখে-মুখে যে সব গাল দিতেন, আইউব সাহেব হাতে-কলমে তা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

(৪) ভোটাধিকার খাটাইবার যোগ্যতা নাই, এই অভিযোগেই পাকিস্তানের জনগণের ভোটাধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। এই তহমতের দ্বারা পাকিস্তানের বুনিয়াদী অসূলই উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোট দিয়াই জনগণ পাকিস্তান হাসিল করিয়াছিল। বলা হইয়া গেল ওটাও ছিল ভোটাধিকার প্রয়োগের অযোগ্যতার প্রমাণ।

(৫) পাকিস্তান রাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামো ভাংগিয়া দিয়া সে স্থলে ঐকিক ইউনিটারি কেন্দ্র দাঁড় করাইয়া পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনার ভিত্তি ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাতে পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করা হইয়াছে।

(৬) এতে উভয় অঞ্চলের পাকিস্তানীদের ঐক্য-বোধের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। তাদের মধ্যে 'আমরা' ও 'তোমরা'-ভাব সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট আইউব নিজে পূর্ব-পাকিস্তানীদের 'ভারতের আদিম অধিবাসী, ধর্ম-কৃষ্টিতে হিন্দু-প্রভাবাধীন, চির-পরাধীন, সন্দেহপরায়ণ ও স্বাধীন জীবনযাপনে অনভ্যস্ত' আখ্যা দিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিমের গৃহ-যুদ্ধের হুমকি দিয়া জাতীয় সংহতির ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছেন। এসব কথা বলিতে গিয়া তিনি শুধু গোটা পূর্ব-পাকিস্তানীদের উপর অবিচারই করেন নাই ; সত্য ও ইতিহাসের তিনি অপমান করিয়াছেন। এই পরিস্থিতি ব্যক্তির সৃষ্ট নয়, বিপ্লবের কুফল ; কারণ স্বয়ং আইউব সাহেবই বিপ্লবের অবদান।

(৭) জাতির পিতা কায়েদে-আযমের জন্মস্থান ও মৃত্যুস্থান করাচি হইতে জাতির পিতার নিজ হাতে স্থাপিত রাজধানী সরাইয়া পাঞ্জাবে নিয়া যাওয়ায় জাতির পিতার সম্মান, মর্যাদা ও ইমেজে আঘাত করা হইয়াছে। জাতির পিতার ইমেজ তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা ও ওসিয়ত রক্ষার দায়িত্ব-বোধ আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। সব নব-সৃষ্ট জাতির পিতা সম্বন্ধেই একথা সত্য। ভৌগোলিক ব্যবধান ও অন্যান্য পার্থক্যের দরুন এটাই আমাদের প্রধান জাতীয় সম্পদ।

(৮) এই রাজধানী স্থানান্তরে রাষ্ট্রের রাজধানী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ব-পাকিস্তানী জনগণের নাগালের বাহিরে নেওয়া হইয়াছে। কোস্টাল ট্রাফিক

ন্যাশনালাইজ করিয়া জাহাজের সংখ্যা বাড়াইয়া সাবসিডির সাহায্যে ভাড়া কমাইয়া রাজধানীতে যাতায়াত পূর্ব-পাকিস্তানীদের জন্য সহজ ও সুলভ করিয়া এবং উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া জনগণের স্তরে জাতীয় সংহতিকে সফল করিবার যে বিপুল সম্ভাবনা ও একমাত্র পন্থা ছিল, রাজধানীকে সমুদ্র পথ হইতে বহু দূরে সরাইয়া সে সম্ভাবনা ও পন্থা চিরতরে লোপ করা হইয়াছে।

আইউব যতগুলি সেটল্ড বিষয় আন্‌সেটল্ড করিয়াছেন, তার মধ্যে রাজধানী স্থানান্তরটাই সবচেয়ে মারাত্মক। মারাত্মক এই জন্য যে আইউব-কৃত অন্যান্য ওলট-পালটের সংশোধনের মত সহজে এটার সংশোধন হইবে না। হইবে না এই জন্য যে যাদের ঘরের দুয়ারে রাজধানী গিয়াছে তাঁরা ছাড়িতে চাহিবেন না। অর্থ-ব্যয় বারবার রাজধানী স্থানান্তর ইত্যাদি অনেক কুযুক্তি দিবেন। দেওয়া শুরুও করিয়াছেন। রাজধানীর হকদার ছিল পূর্ব-পাকিস্তানীরা। শুধু জাতির পিতার খাতিরে তারা করাচিতে রাজধানী মানিয়া লইয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি কায়েদের স্মৃতির মর্যাদা না দেয়, তবে একা পূর্ব-পাকিস্তানীরা দিলে কি লাভ? অতএব পূর্ব-পাকিস্তানীরা এখন ন্যায়তঃই চাইবে ঢাকায় রাজধানী আসুক। এটা শুধু মেজরিটির গণতান্ত্রিক দাবিই নয়, শতকরা নব্বইজন পূর্ব-পাকিস্তানী নব্বই বছর বাঁচিয়াও নিজের দেশের রাজধানী দেখিয়া মরিতে পারিবে না, প্রশ্নটা শুধু তাও নয়, রাজধানীর সংগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থ বন্টন ও প্রয়োগ, আঞ্চলিক অসাম্য দূরীকরণ, সরকারী-বেসরকারী চাকুরী, সাপ্লাই, কন্ট্রাকদারি, বিদেশী মিশন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অবস্থাগতিকে অন্যান্য সব কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানই পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই পূর্ব-পাকিস্তানীরা রাজধানী ছাড়া বাঁচিতে পারে না। এই জটিল সমস্যাটিই আইউব খুলিয়া দিয়াছেন।

(৯) পার্টি-রাজনীতিকে মসি-মলিন কুৎসিৎ করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্সিয়াল বা পার্লামেন্টারি কেবিনেট যে সিস্টেমেই দেশ শাসিত হউক না কেন, রাজনৈতিক পার্টি উভয় ক্ষেত্রেই আবশ্যক। বর্তমান 'বিপ্লব' এই দলীয় রাজনীতিকেই কুৎসিৎ মসিলিপ্ত ও বদ্-সুরত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইউব নিজে কায়েদে-আযমের পরিচালিত ও পাকিস্তান অর্জনকারী 'মুসলিম লীগের' নামানুসারে নিজের পার্টি খাড়া করিয়াছেন বটে কিন্তু তাতে ঐ মুসলিম লীগকে পার্টির মর্যাদা দেওয়া হয় নাই, ক্যারিকেচার করা হইয়াছে মাত্র। কায়েদে-আযম গভর্নর জেনারেল হইয়া মুসলিম

লীগের সভাপতিত্বে ইস্তাফা দিয়াছিলেন। আইউব সাহেব হেড-অব-দি স্টেট হিসাবেই হেড-অব-দি- মুসলিম লীগ হইয়াছেন ও থাকিতেছেন। এই মুসলিম লীগের অফিসবিয়ারাররা নির্বাচিত হন না। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত ও পদচ্যুত হন। নির্বাচনে 'মুসলিম লীগ মেনিফেস্টো' প্রচারিত হয় না, হয় 'মাই মেনিফেস্টো।'

(১০) গণতন্ত্রের চেহারা খারাপ করা হইয়াছে। প্রেসিডেনশিয়াল ও পার্লামেন্টারি এই দুইটা পশ্চিমী গণতান্ত্রিক পন্থা ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যে পার্টি-ডিক্টেটরশিপ চলিতেছে, তাকেও গণতান্ত্রিক বলা যায় এবং বলা হইতেছে। কারণ, সেখানে রাষ্ট্র-নায়করা পশ্চিমা গণতন্ত্রের মত সোজাসুজি ভোটারদের আয়ত্তাধীন না হইলেও পার্টির সদস্যগণের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু আইউব সাহেব যে পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন, তাতে প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রীদের উপর মুসলিম লীগ পার্টির বা আইন পরিষদের অথবা ইলেকটরেল কলেজ নামক ব্যাসিক ডিমোক্র্যাটদের কোনও ক্ষমতা নাই। কারণ ব্যাসিক ডিমোক্র্যাটরা সরকারী কর্মচারির অধীন। সরকারী কর্মচারিরা প্রেসিডেন্টের অধীন। কাজেই এটা আসলে পার্টি-ডিক্টেটরশিপ নয়, ব্যক্তি-ডিক্টেটরশিপ। এটাকে ব্যাসিক ত দূরের কথা, কন্‌ট্রোলড্‌ ডিমোক্র্যাসি বলিলেও 'ডিমোক্র্যাসি' কথাটার অমর্যাদা করা হয়।

এইসব লোকসানের কুফলের সবগুলি মিলিয়া বা এর যে-কোনও দুই-একটা পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে এবং করিতেছে। দেশবাসীর দুর্ভাগ্য এই যে রাষ্ট্র-নেতারা একজনের পর আরেকজন কেবল ভুলের উপর ভুলই করিয়া যাইতেছেন। পূর্ববর্তী সরকারের ভুল-ভ্রান্তির জন্য দেশবাসীর ভোগান্তির সীমা ছিল না। সেই ভোগান্তির অবসান ঘটাবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যাঁরা আসিলেন, তাঁরা আগের ভুলের প্রতিকারের বদলে নূতন করিয়া মারাত্মক সব ভুল করিতে লাগিলেন।

এতসব ভুল-ভ্রান্তি অন্যায়-অনাচার সহিয়াও পাকিস্তান টিকিয়া আছে। ইনশাআল্লাহ্ টিকিয়া থাকিবেও। কিন্তু এই টিকিয়া থাকায় নেতাদের কোনও কৃতিত্ব নাই। পাকিস্তান টিকিয়া আছে রাষ্ট্র-নেতাদের জন্য নয়, তাঁরা সত্ত্বেও। সকল দলের সকল আমলের রাষ্ট্র-নায়করা চেষ্টা করিয়াও রাষ্ট্র ধ্বংস করিতে পারেন নাই খোদার ফযলে সে রাষ্ট্রের হায়াত আছে। এর শুধু টিকিয়া থাকার নয়, বাঁচিয়া থাকারও

অধিকার আছে। বুদ্ধি যতই কম হউক, আর ভুল-ভ্রান্তি যতই জটিল হউক, বিশ বছর সময় তা বুঝিবার জন্য যথেষ্ট। এবার সকলে মিলিয়া নয়া অভিজ্ঞতার আলোতে নব উদ্যমে পাকিস্তানকে সুগঠিত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্রে ও পাকিস্তানীদের সুসংবদ্ধ সুখী ও সুশিক্ষিত নাগরিক-গোষ্ঠীতে পরিণত করিয়া ওদিককার কায়েদে-আযম ও কায়েদে-মিল্লাতের আর এদিকের শেরে-বাংলা ও শহীদে-মিল্লাতের লাহোরের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলুন। আমিন।

পুনশ্চ

১. কৈফিয়ত

'আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বাহির হইবার পর দেশের রাজনীতিক জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্তন আইউব শাহির অবসান। গণ-আন্দোলনের ফলেই এই ডিক্টেটরের পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু সে পতনের ফল জনগণ ভোগ করিতে পারে নাই। কারণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় নাই। পুনরায় মার্শাল ল প্রবর্তিত হইয়াছে।

কাজেই আমিও আমার বই-এর 'পুনশ্চ' লিখিতে বসিলাম। চিঠি-পত্রেই পুনশ্চ লেখার রেওয়াজ আছে। বই-এ পুস্তকে পুনশ্চ লেখার রেওয়াজ নাই। তবু পুস্তকটিকে আপ-টু-ডেট করিবার জন্যই এই 'পুনশ্চ' লেখা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। একটি আলাদা 'অধ্যায়' না লিখিয়া 'পুনশ্চ' লিখিলাম কেন, বিভিন্ন পাঠক তার বিভিন্ন কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু আমার নিজের বিবেচনায় কারণ মাত্র তিনটি ঃ

এক, আমার বই এর শেষ অধ্যায়ের নাম কালতামামি। সে 'কালতামামিতে' আমি 'ইন্‌টারিম রিপোর্ট' দিয়াছি, 'ফইনাল রিপোর্ট' দেই নাই। তারপরে দুই বছর চলিয়া গিয়াছে। আরেকটা মার্শাল ল হইয়াছে। সেটা আজও চলিতেছে। তাই 'ফাইনাল রিপোর্টের' সময় আসে নাই। পাকিস্তানের ইতিহাসেই নতুন অধ্যায় যোগ হয় নাই। এ অবস্থায় আমার বই-এ একটা নূতন অধ্যায় যোগ করা ভাল দেখায় না।

দুই, ইন্টারিম রিপোর্টকে 'ফাইনাল রিপোর্ট' না করা পর্যন্ত আরেকটা অধ্যায় লেখাও যায় না। শুধু আরেকটা অধ্যায় যোগ করার জন্যই যদি 'ইন্‌টারিম রিপোর্টকে' 'ফাইনাল রিপোর্ট' করিতে চাই, তবে শেরে-বাংলার স্বনাম-ধন্য আযিমুদ্দিন দারোগার 'ফাইনাল রিপোর্টের' মতই ফাইনাল রিপোর্ট লিখিতে হয়। পাঠকরা প্রায় সবাই আযিমুদ্দিন দারোগা সাহেবকে জানেন। শেরে-বাংলা তাঁর সত্তুর বছরের রাজনীতিক জীবনের হাজার-হাজার জন-সভায় লক্ষ-লক্ষ শ্রোতার কাছে এই দারোগা সাহেবের 'ফাইনাল রিপোর্টের' কথা বলিয়াছেন। তাতে দারোগা সাহেব হইয়াছেন যেমন মশহুর, তাঁর 'ফাইনাল রিপোর্টটিও হইয়াছে তেমনি চিরস্মরণীয়। এই রিপোর্টে দারোগা সাহেব লিখিয়াছিলেন ঃ 'কেস ট্রু নো ক্লু ; সাইন্‌ড আযিমুদ্দিন।' আমার ইন্‌টারিম রিপোর্টকে ফাইনাল রিপোর্ট করিতে হইলে দারোগা সাহেবকেই অনুকরণ করিতে হয়। কারণ কেস মোটামুটি একই। কিন্তু 'ফার্দার ক্লু'র আশায় আমি তা করিলাম না। আমার রিপোর্টও ফাইনাল হইল না। নয়া অধ্যায়ও লেখা হইল না।

তিন, আমাদের শাসক-গোষ্ঠীর প্রায় সকলের স্বীকৃত মতেই পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পাকিস্তানী জনগণ পুনঃ পুনঃ ধ্বংসের কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছে। প্রতিবারই একজন রক্ষা কর্তা আসিয়া আমাদের সে 'আসন্ন ধ্বংস' হইতে 'রক্ষা' করিতেছেন। কিন্তু প্রতিবারই আমরা ধ্বংসের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছি। প্রতিবারই পরের বারের 'রক্ষা-কর্তা' আসিয়া বলিতেছেন : 'এমন ঘোর সংকট পাকিস্তানের জীবনে আর হয় নাই।' এ কথার তাৎপর্য এই যে আগের বারের 'রক্ষা-কর্তা, যে পরিমাণ বিপদ হইতে আমাদিগকে 'রক্ষা' করিয়াছিলেন, পরের বারের 'রক্ষা-কর্তার' সামনের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশী ঘোরতর। এ কথার মানে এই যে আগের বারের রক্ষা-কর্তা, আমাদিগকে বিপদ হইতে 'রক্ষা' করিতে গিয়া আরও বেশী বিপদে ফেলিয়াছেন। গোলাম মোহাম্মদ হইতে জেনারেল আইউব, জেনারেল আইউব হইতে জেনারেল ইয়াহিয়া সবাই পাকিস্তানকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে 'রক্ষা'ও যেমন করিয়াছেন, দেশকে তেমনি ধ্বংসের আরও কাছে পাইয়াছেন। দুই-দুইবারই মার্শাল ল' প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। আগের বারে গোলাম মোহাম্মদ যা করিয়াছিলেন, সেটাও কার্যতঃ মার্শাল ল'ই ছিল। কাজেই দেখা যায় পুনঃ পুনঃ মার্শাল ল'ই আমাদের বরাত। বর্তমান মার্শাল ল' উঠাইবার জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া স্পষ্টতঃই আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের বরাতের দোষেই নেতাদের কার্য-কলাপে 'ঠকের বাড়ির নিমন্ত্রণে'র মত যা ঘটিতে পারে তারই নাম পুনশ্চ।

২. রাজনৈতিক ঘূর্ণীঝড়

১৯৪৮, ১৯৫৮, ১৯৬৮ এই তিনটি সালই আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতির পিতা কায়েদে-আযমের আকস্মিক জীবনাবসান। দশ বছর পরে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অবসান। আরও দশ বছর পরে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে গণতন্ত্র হত্যাকারী জেনারেল আইউবের স্বৈরাচারের অবসান।

প্রথম দুইটি সাল সম্বন্ধে কোনও অস্পষ্টতা ও দ্বিমত নাই। কিন্তু তৃতীয়টির বেলা তেমন স্পষ্টতা নাই বলিয়া দ্বিমত হইতে পারে। দৃশ্যতঃ জেনারেল আইউবের পতন ঘটে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু যাঁরাই ঘটনাবলী অবলোকন পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিয়াছেন তাঁরাই জানেন যে ছয় মাস আগেই ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে আইউবের পতন অবধারিত ও সুনিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট আইউবের ফুসফুসের সাংঘাতিক ব্যারামটা আসলে তাঁর অসুখের কারণ নয়, পরিণাম। আইউব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। 'দেওয়ালের লিখন' তিনি পড়িতে পারিয়াছিলেন। বিপদ আসন্ন তা তিনি

বুঝিতে পারিয়াছিলেন অনেক আগেই। জুয়ারী যেমন ডেস্পারেট হইয়া 'মরি বাঁচি যা থাকে কপালে' বলিয়া সর্বস্ব দিয়া শেষ 'দান' ধরে, আইউবও তার শেষ 'দান' ধরিয়াছিলেন 'উন্নয়ন দশকে।' 'শেষ দানে' জুয়ারীর ভাগ্য পরিবর্তনও হইতে পারে ; আবার পতন ত্বরান্বিতও হইতে পারে। প্রেসিডেন্ট আইউবের বেলা এই পরেরটাই ঘটিল।

নিমজ্জমান তরী ভাসাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আইউব 'উন্নয়ন দশক' উৎযাপনের আয়োজন করিলেন বছরের শুরুতেই। আইউব ও তাঁর ফন্দিবায উপদেষ্টাদের সমবেত চেষ্টায় আয়োজনটাও হইল নিখুঁত। উদ্‌যাপনটাও চলিল বিপুল জাক-জমকে। বছর দীঘালি উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। খবরের কাগজের খরিদ-করা পৃষ্ঠাকে-পৃষ্ঠায়, দালান-ইমারতের গাত্র-চূড়ায় অফিস-আদালতের ভিতর-বাহিরে, সরকারী-বেসরকারী চিঠি-পত্রে, কভার-লেটারহেডে, রেলষ্টেশনে ও বিমান-বন্দরের আষ্টে-পৃষ্ঠে, রাস্তা-ঘাটে, নদী-বন্দরে, ট্রেনে-বাসে, মানুষের বুকে-পিঠে, এক কথায় আসমান-জমিনের মধ্যেকার সকল স্থানে 'উন্নয়ন দশকে'র আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আগে কেউ বুঝিতে না পারিলেও এইবার সবাই বুঝিল, 'উন্নয়ন' সত্যই হইয়াছে। 'উন্নয়নের' আলোক-সজ্জায় রাত হইল দিন। কাজেই দিনও রাত হইবার সময় হইল আসন্ন।

ন বছরের নিরবচ্ছিন্ন জুলুম-সেতম, বঞ্চনা-প্রবঞ্চনা, নির্লজ্জ উন্নতশির দুর্নীতি, দুঃসাহসিক স্বজন-প্রীতি, রাষ্ট্রীয় তহবিলের বেপরোয়া ছিনিমিনি, জন-মতের প্রতি গর্বিত বুড়া আংগুল প্রদর্শন ইত্যাদি-ইত্যাদি নজিরবিহীন সুশৃংখল অরাজকতা দেখিয়া পাকিস্তানের গণ-মন যখন স্তম্ভিত অসাড় ও নিস্পন্দ, ঠিক সেই সময়ে 'কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা' দিয়া, 'জুতা মারার পরেও আরও অপমান' করিয়া ও 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' মারিয়া প্রেসিডেন্ট আইউব ও তাঁর সহকর্মীরা দেশের সেই অসাড় নিস্পন্দ দেহে ইলেকট্রিক শক ট্রিটমেন্ট করিলেন। 'আগড়তলা মামলা' এই থিরাপির শেষ বড় ডোয়। এর আশু ফল ফলিল। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভংগ হইল। আসহাব-কাহাফের ঘুম টুটিল। তারা জাগিল। চোখ কচলাইতে-কচলাইতে নয়। চমকিয়া উঠিয়া। বিছানায় বসিয়া নয়। লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া। ঘুমন্ত জনতার নিদ্রা ভংগ হয় এমনি করিয়াই।

ফল হইল এক বিস্ময়কর। অচিন্তনীয়। গণ-ঐক্যের ভাংগা কিল্লায় নিশান উড়িল। উন্নয়ন দশকের শেষ বছর শেষ হইবার আগের পাকিস্তানের রাষ্ট্র দেহের (বডি পলিটিক) বিভিন্ন প্রত্যংগে ব্রন ফোড়া ও ইপারশন দেখা দিল। মেলিগন্যান্ট টাইপের। শেষ পর্যন্ত গণ-বিক্ষোভের আকারে বিষফোড়া ফাটিয়া পড়িল। ১৯৬৮ সালের

অক্টোবর হইতে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চার–চারটা মাস দেশবাসী কাটাইল সুখের যন্ত্রদায়ক দুঃস্বপ্নের মধ্যে। একের পর আরেকটা বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ফাটিতে লাগিল উপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব ঘোষণা করিলেনঃ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তিনি আলোচনা করিতে রাযী আছেন। এতদিনের 'ধিকৃত ঘৃণিত জনগণ–কর্তৃক বর্জিত' নেতাদের সাথে ডিক্টেটর আইউবের আলোচনা? দেশবাসী যা বুঝিবার বুঝিল। আইউবের ভক্তরাও কি বুঝিলেন না? নিশ্চয় বুঝিলেন। তাঁদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি হইল। ইতিমধ্যে রাজনীতিক নেতারা প্রায় সব দল মিলিয়া ডিমোক্র্যাটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন করিয়াছিলেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে জানাইলেন : আলোচনায় বসিতে তাঁরাও রাযী।

তারপর ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব আরেক বিবৃতিতে ডাকের প্রেসিডেন্ট নবাবজাদা নসরুল্লা খাঁর দেশপ্রেমের মুখ–ভরা তারিফ করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রণ-যোগ্য নেতাদের তালিকা করিবার ভার একচ্ছত্রভাবে তাঁর উপর দিয়া দিলেন। তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি সে কথা নবাবজাদা নসরুল্লা খাঁ 'ডাকের' পক্ষ হইতে যাবেদাভাবে প্রেসিডেন্ট আইউবকে জানাইয়া দিলেন। সবই চলিতে লাগিল 'একর্ডিং টু প্ল্যান'। এরমধ্যে কোথায় কি ঘটিল জানা গেলনা। হঠাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারি (পূর্ব–বাংলার ভাষা–আন্দোলনের ঐতিহাসিক শহীদ দিবস) এক অঘোষিত বেতার–ভাষণে সকলকে বিস্মিত করিয়া প্রেসিডেন্ট আইউব ঘোষণা করিলেনঃ তিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আর কনটেস্ট করিবেন না। তিনি সম্ভবতঃ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন যে এমন ঘোষণায় তাঁর বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ প্রশমিত হইবে ; বিক্ষোভ নরম হইবে। হয়ত কোনও–কোনও কোয়ার্টার হইতে অনুরোধ আসিবে : 'না সার আপনি মেহেরবানি করিয়া অন্ততঃ আরেকটা টার্ম দেশবাসীকে নেতৃত্ব দান করুন।' কিন্তু কেউ কিছু বলিলেন না। বিক্ষোভ নরম হওয়ার বদলে আরও গরম হইল। ভক্তবৃন্দের সন্ত্রাস দিশাহারা আতংকে পরিণত হইল। 'চাচা আপন বাঁচা' বলিয়া ভক্তেরা ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের তারিখ আগেই স্থির করা হইয়াছিল। ন্যাপ–নেতা মওলানা ভাসানী ও পিপলস পার্টির নেতা জনাব ভুট্টো গোল টেবিলে যোগ দিবেন না জানাইলেন। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠকে যোগ দিতে রাযী হইলেন। কিন্তু আগড়তলা মামলার আসামী হিসাবে যোগ দিতে সম্মত হইলেন না। 'ডাক' নেতারাও শেখ মুজিবকে ছাড়া আলোচনায় যোগ দিবেন না, জানাইয়া

দিলেন। শেষ পর্যন্ত আগড়তলা মামলা প্রত্যাহার করিয়া শেখ মুজিবের গোলটেবিলে যোগদানের ব্যবস্থা করা হইল। কারামুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমান গোল টেবিলে যোগ দিলেন। তাঁর মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হইল।

নির্ধারিত দিন-ক্ষণে যথারীতি গোল টেবিল বৈঠক বসিল। যথারীতি পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও তারিফ-তারুফের শিষ্টাচারের পর আসন্ন ঈদের দরুন সম্মিলনী মুলতবি হইল। ১০ই মার্চ পরবর্তী বৈঠকের দিন স্থির হইল।

দুইদিন আগেই ৮ই মার্চ লাহোরে নেতৃবৃন্দের প্রস্তুতি বৈঠক বসিল। একটি সর্ব-সম্মত দাবি রচনা করাই ঐ বৈঠকের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যে একটি সাব কমিটিও গঠিত হইল। ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতি, সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোট, জন-সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিট বাতিল ইত্যাদি বিষয়ে নেতারা একমত হইলেন। কিন্তু আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাব-ফেডারেশন সম্বন্ধে তাঁরা একমত হইলেন না। শেষ পর্যন্ত মাত্র দুইটি বিষয়ে সর্বসম্মত একটি প্রস্তাব লইয়া নেতারা ১০ই মার্চ পিণ্ডিতে গোলটেবিলে যোগ দিলেন। সম্মিলনীর বৈঠক তিন দিন চলিল। নেতাদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা দিল। প্রেসিডেন্ট আইউব ১৩ই মার্চ সম্মিলনীর সমাপ্তি ঘোষণা করিলেন। পরবর্তী কোন বৈঠকের ব্যবস্থা না করিয়াই এটা করা হইল। তার মানে অশুভ লক্ষণ। সম্মিলনী ব্যর্থ হইয়াছে। কনফারেন্স হল হইতে বাহির হইয়াই আওয়ামী লীগ-নেতা শেখ মুজিব 'ডাক' হইতে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করিলেন। তাঁর সাথে যেন পাল্লা দিয়াই 'ডাক' প্রেসিডেন্ট নবাবজাদা নসরুল্লা 'ডাক' ভাংগিয়া দেওয়া ঘোষণা করিলেন। দুই নেতার কেউই যাঁর-তাঁর পার্টির কোনও বৈঠক দিয়া অন্যান্যের মতামত জিগ্‌গাসা করিলেন না। তার আর দরকারও হইল না। গোলটেবিল বৈঠকের ফলে বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে অনৈক্যই বৃদ্ধি পাইল। সেটা বুঝা গেল পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে। গোল টেবিলের ব্যর্থতার জন্য তাঁরা পরস্পরকে দোষাদুষি করিতে লাগিলেন। এতদিনের এত ত্যাগের এত সাধনার গণ-ঐক্য ভাংগিয়া খান-খান হইয়া গেল।

কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে নেতাদের এই অনৈক্যের সুবিধা প্রেসিডেন্ট আইউব পাইলেন না। নেতাদের অনৈক্য ছাত্র-জনতার মধ্যে সংক্রমিত হইল। গণ-আন্দোলন আর রাজনৈতিক আন্দোলন থাকিল না। হইয়া উঠিল তা অরাজনৈতিক উচ্ছৃংখলতা, বন্য হিংস্রতা। এর কারণে অথবা ফলস্বরূপ প্রেসিডেন্ট আইউব প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়াকে ২৪শে মার্চের লিখিত পত্রে দেশের শাসন-ভার গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। বেতারে নিজের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করিলেন।

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আবার মার্শাল ল' ঘোষিত হইল। জেনারেল ইয়াহিয়া চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও প্রেসিডেন্ট হইলেন। '৬২ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল হইল। চার মাসের মধ্যেই জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করিলেন ঃ তিনি অতিসত্বর দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। দেশময় সফর করিয়া সকল দলের নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া আরও চার মাস পরে ২৮শে নবেম্বর তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ আগামী ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জন-সংখ্যার ভিত্তিতে আইন-পরিষদ গঠিত হইবে। ইতিমধ্যেই ওয়ান ইউনিট ভাঙিয়া দেওয়া হইবে। নব-নির্বাচিত আইন-পরিষদ চার মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে বাধ্য থাকিবে। ঐ ঘোষণার চার মাস পরে ১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আগামী শাসনতন্ত্রের 'ফ্রেম ওয়ার্ক' ঘোষণা করিলেন। তাতে তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৩১৩ জন নির্ধারিত করিয়া দিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য তিনি ৭ জন মহিলা সদস্যসহ ১৬৯ জন ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য আলাদাভাবে ৭ জন মহিলা-সদস্যসহ মোট ১৪৪ জন মেম্বর নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ঐ সংগে তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে ২২শে অক্টোবর তিনি পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের জন্য ১০ জন মহিলাসহ মোট ৩১০ ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশের পরিষদের জন্য ১১ জন মহিলাসহ ৩২১ জন মেম্বর নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় আইন সভা গণ-পরিষদরূপে চার মাসে শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিবে। তার পরে মেজরিটি পার্টি বা কোয়েলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিবে। মার্শাল ল উঠিয়া যাইবে। নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে। ইহাই বর্তমানে আমাদের দেশের নেট রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

৩. আইউবের ভুল

জেনারেল আইউবের ভুল ভ্রান্তি ও স্বৈরাচারের সমালোচনা করিবার জন্য এই পুনশ্চের অবতারণা করা হয় নাই। আইউব আজ পরাজিত পদচ্যুত। তিনি আজ শক্তিহীন। সম্ভবতঃ অসুস্থ। আজ তাঁর নিন্দা করা অতি সহজ। সে জন্য আজ সবাই তাঁর নিন্দা করিতেছেন। নিন্দার তিনি যোগ্যও। কিন্তু আমার বিবেচনায় নিন্দার চেয়ে তিনি আফসোসের পাত্রই বেশি। তাঁর এক কালের সমর্থক অনুচররাও তাঁর নিন্দা করিতেছেন। এটা শুধু আইউবের দুর্ভাগ্য নয়। জাতিরও দুর্ভাগ্য। কারণ এতে আমাদের জাতীয় চরিত্র প্রকট। ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত যাঁরা অন্যায়কারীকে জিন্দাবাদ দেন, তাঁরা আসলে অন্যায়কারীর পূজা করেন না। নিজেদের স্বার্থেরই পূজা করেন। ওঁরাই যখন গদি চ্যুতির পর তাঁর নিন্দায় অন্য সবাইকে ছাড়াইয়া যান, তখনও তাঁরা দেশের স্বার্থে

তা করেন না, নিজেদের স্বার্থেই করেন। এঁরা সাধারণ স্বার্থপর ক্ষুদ্র অন্তরের বিষয়ী মানুষ। সব দেশেই সব জাতিরই মধ্যেই এই ধরনের কিছু লোক থাকে। থাকিবেও। কারণ মানুষ মানুষই, ফেরেশ্তা নয়। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য এই যে এই ধরনের লোকের সংখ্যা অন্য দেশের চেয়ে বেশী। এত বেশী যে আইউবও তার পরিমাণ আন্দায করিতে পারেন নাই। পারিলে তিনি হুঁশিয়ার হইতে পারিতেন।

আইউবের দুর্ভাগ্য এই যে যে-দৃষ্টি-শক্তির জোরে তিনি জনগণের অদৃশ্য অযোগ্যতা আবিষ্কার করিতে পারিলেন, তার জোরে তিনি নিজের অনুচরদের সুস্পষ্ট যোগ্যতা দেখিতে পারিলেন না। স্পষ্টতঃই তাঁর লং সাইটের মত শর্ট সাইটটা তেজী না। গোড়ায় তিনি পাকিস্তান রক্ষার জন্য নয়, বরঞ্চ ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লোভেই, পদাধিকারের অপব্যবহার করিয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ক্ষমতা দখলের পরে তিনি সত্য-সত্যই দেশের ভাল করিতে পারিতেন। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল। একাদিক্রমে আট বছর পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি এবং ঐ সংগে প্রায় বছর খানেক দেশরক্ষা মন্ত্রী থাকার ফলে তাঁর একটা আন্তর্জাতিক 'পুল' গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সংগে তিনি একটা ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী ছিলেন। এতসব গুণের অধিকারী হইয়াও কোনও লোক নির্বিঘ্নে দশ বছর দেশ শাসন করার সুযোগ পাইলে তিনি ভাল না হইয়া পারেন না। গোড়াতে যতই খারাপ হউন, মহান দায়িত্বই তাঁকে মহৎ করিয়া তুলে। আইউবের দোষ এইখানে যে তিনি দশ-দশটা বছরেও মহৎ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। 'ক্ষমতা মানুষকে খারাপ করে, চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্তভাবেই খারাপ করে।' লর্ড এ্যাকটনের এই কথাটা আইউব আগেই জানিতেন নিশ্চয়। তাঁর মত বুদ্ধিমান বিদ্বান লোকের পক্ষে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হওয়া উচিৎ ছিল না। তিনি বলিবেনঃ তাঁর স্বার্থপর স্তাবকেরা তাঁকে ভাল হইতে দেন নাই। তাঁর এতদিনের পূজারীরা বলিবেনঃ আইউবকে সুবুদ্ধি তাঁরা দিয়াছিলেন; আইউব তাঁদের পরামর্শ মানেন নাই।

দুই পক্ষের কথাই আংশিক সত্য আংশিক অসত্য। প্রথমতঃ স্তাবকের তুলনায় সুপরামর্শ-দাতার সংখ্যা ছিল নগণ্য। দ্বিতীয়তঃ সুপরামর্শ যাঁরা দিয়াছেন, তাঁরাও দেশ বা আইউবের ভালর জন্য দেন নাই, নিজেদের স্বার্থেই দিয়াছেন। কাজেই সুপরামর্শ হিসাবে ও-সবের কানাকড়ি দাম ছিল না। সভা-সমিতির জনতা দেখিয়া আইউব ঠিকই ভুল বুঝিয়াছিলেন যে ঐ বিপুল জনতা তাঁর সমর্থক। সব ডিক্টেররাই কুস্তিগিরের মতই তামাশার বস্তু। তাঁরাও ঐ ভুল করিয়াছেন। কিন্তু এটাও তাঁরা জানিতেন যে স্তাবক-অনুচররা সবাই নিজ নিজ স্বার্থের জন্যই তাঁদের স্তাবকতা করিতেছেন। আইউবের ভুল হইয়াছিল এইখানে যে এত এত স্বার্থপর লোকের মধ্যে বাস করিয়াও

তিনি নিজের আসল স্বার্থটা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁর আসল স্বার্থ ছিল দেশবাসীর ভাল করিয়া নিজেকে অমর করা। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা তাঁর মধ্যে কেন্দ্রীভূত গোটা জাতির ভাগ্য তাঁর হাতে নিহিত। এই হিসাবে তাঁর ভালমন্দ জনগণের ভাল-মন্দের সাথে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত। তিনি একা এখানে সমস্ত স্তাবক হইতে পৃথক। স্তাবকেরা তাঁর কাঁধে বন্দুক রাখিয়া যাঁর-তাঁর স্বার্থের পাখি মারিয়া যাইতেছেন। সব রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় দেশের অনিষ্টের জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ দায়ী নন। এই অবস্থা ও পরিবেশেই তিনি স্তাবকদের স্বার্থ শিকারের বন্দুকটা নিজের কাঁধে লইয়াছিলেন। এইখানেই তিনি ছিলেন স্তাবকদের অনুসারী। স্তাবকরা তাঁর অনুসারী ছিলেন না। স্তাবকদের কথা না রাখিয়া তাঁর উপায় ছিল না।

সব ডিক্টেটরের পরিণতি এই। গোড়াতে তাঁরা সত্যিই ডিক্টেটর থাকেন। কিন্তু শেষ দিকে ডিক্টেটররা হইয়া পড়েন অনুচরদের দ্বারা ডিক্টেটেড। ক্ষমতা, স্বার্থ ও সম্পদ হাসিলের পর ডিক্টেটররা ও-সব রক্ষার জন্যই স্তাবক-অনুচরদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। ওরা তখন হইয়া উঠেন ডিক্টেটরের সব ক্ষমতা ও সম্পদের শরিক। কাজে-কর্মে ব্যবহার-আচরণে ওঁরা তখন ডিক্টেটরকে বুঝাইয়া দেন তাঁরাও ঐ ক্ষমতা ও সম্পদের অংশ চান। 'না' বলিবার তখন উপায় থাকে না। দিতেই হয় তা যত অন্যায় পন্থায় হউক না কেন? অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ায় যে বিবেকের দংশনে অথবা পরিতৃপ্তিতে ডিক্টেটর যদি ক্ষমতা ও সম্পদ বর্জন করিতেও চান, তবু তিনি তা পারেন না। ডিক্টেটর তখন বড় দেরিতে বুঝিতে পারেন যে তিনি নিজেই ডিক্টেটরি যন্ত্রের গোলাম হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আর সে যন্ত্র চালান না। যন্ত্রই এখন তাঁকে চালায়। তিনি ক্ষুধার্ত সিংহের পিঠের সওয়ার। সে পিঠ হইতে নামার আর উপায় নাই। নামিলে তাঁর বাহন ঐ সিংহই তাঁকে খাইয়া ফেলিবে। সব ডিক্টেটরই পরিণামে এমনি করিয়া নিজের শিকার নিজেই হইয়া পড়েন।

আইউবের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা হইয়াছিল এই যে তিনি জনগণকে না চিনিয়া তাদের পরিচালক হইতে গিয়াছিলেন। দেশবাসীকে ঘৃণা করিয়া তিনি দেশের নেতা বনিতে চাহিয়াছিলেন। জনতার সমবেত বুদ্ধির চেয়ে নিজের বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন যাঁরা, তাঁরা দুই রকমে মানুষের নেতা হইতে পারেন। এক, বই-পুস্তক লিখিয়া তাঁরা চিন্তা-নায়ক হইতে পারেন। দুই, ত্যাগ ও সংগ্রামের পথে সশরীরে গণ-মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে পারেন। সারা-জীবন সুখের সরকারী চাকরি করিবেন, পান হইতে চুনটি খসিতে দিবেন না, আর শেষ জীবনে জোর করিয়া রাষ্ট্র-নায়ক হইবেন, তা হয় না। আইউব তাই করিতে চাহিয়াছিলেন। অমন চিন্তা-নায়ক, সফল

অফিসার ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক সবই দেশের জন্য দরকার। কিন্তু একের কাজ অপরের সাজে না।

৪. আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা

জেনারেল আইউবের সর্বশেষ ও সব চেয়ে আত্মঘাতী ভুল হইয়াছে, তথাকথিত আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা করা। যদি মামলায় বর্ণিত সব বিবরণ সত্যও হইত, তবু আইউব সরকারের এই মামলা পরিচালনা করা উচিত হইত না। দেশরক্ষা বাহিনীর পূর্ব-পাকিস্তানী অফিসারদের বিরুদ্ধে সে অবস্থায় বিভাগীয় দণ্ডবিধান করিলেই যথেষ্ট হইত। তা না করিয়া ঢাক-ঢোল পিটাইয়া পূর্ব-পাকিস্তানী অফিসারদের বিরুদ্ধে পূর্ব-বাংলা স্বাধীন করিবার অভিযোগে একটা রাজনৈতিক চাঞ্চল্যকর মামলা দায়ের করা হইল। তার উপর মামলার তদন্তাদি কার্য শেষ করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট করিবার পর পূর্ব-বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত এবং তথাকথিত ঘটনার সময়ের আগাগোড়া জেলখানায় বন্দী, তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নূতন করিয়া মামলার আসামী ত করা হইলই, এক নম্বর আসামী করা হইল। এই একটি মাত্র ঘটনায় মামলাটির অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি ধরা পড়িল। তিন-তিনজন সিনিয়ার পূর্ব-পাকিস্তানী সি. এস. পি. অফিসারকে কেন আসামী করা হইয়াছিল, মুজিবুর রহমানকে আসামী করা হইতে গণ-মনে তা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তিনজন সি. এস. পি অফিসারই কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ঐ তিন জনের মধ্যে একজন তাঁর মনীষা পাণ্ডিত্য ও শিষ্টাচারের জন্য অফিসারদের মধ্যে এবং সাধারণ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তার উপর ইনি হইলেন পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাবেক প্রধান মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর। এইভাবে এই মোকদ্দমা বাংগালী মিলিটারি অফিসারদেরেই শুধু নয় পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইজন রাজনৈতিক নেতাকেই কার্যতঃ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রে জড়ান হইল। এটা ত গেল মামলার বিশ্রী চেহারার দিক।

পরিবেশ ও সময়টাও ছিল তেমনি বিস্ফোরক। অবস্থাগতিকে মার্শাল-ল'র প্রেসিডেনশিয়াল শাসনটা চেহারা ও প্রকৃতিতে হইয়া পড়ে পূর্ব-পাকিস্তানীদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের সার্বিক ও সামগ্রিক শাসন। তার উপর প্রেসিডেন্ট আইউব মাত্র কয়েকদিন আগে পূর্ব-পাকিস্তানীদেরে 'ভারতের আদিম অধিবাসী ধর্ম-কৃষ্টিতে হিন্দু-প্রভাবিত স্বাধীনতায় অনভ্যস্ত ও স্বায়ত্তশাসনের অযোগ্য নাহক সন্দেহপরায়ণ ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের লোক' ইত্যাদি বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে

শুধু আর্থিক ও রাজনৈতিক অসাম্যই সৃষ্টি করেন নাই, গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের যুক্তিরও ডর দেখাইয়া দুই পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে 'আমরা'–'তোমরা' মনোভাব তীব্র করিয়াছিলেন। এমনি সময়ে এবং এই পরিবেশে আগড়তলা মামলা দায়ের করায় পূর্ব-বাংলায় দল-মত নির্বিশেষে জনগণের মনে এই প্রতিক্রিয়া হইল যে গোটা পূর্ব-বাংগালীর বিরুদ্ধেই এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে। সকল দলের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অমন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ভাব গড়িয়া উঠিল যে তাঁরা প্রায় সমস্বরেই বলিলেন ঃ আগড়তলা মামলা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইউব-প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে তাঁরা যোগ দিবেন না। ছাত্র-জনতার ফাটিয়া পড়া বিক্ষোভের সামনে নেতাদের অমন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

নিখিল-পাকিস্তান গণ-আন্দোলনের অংশ হিসাবেই পূর্ব-বাংলার ছাত্র তরুণদের নেতৃত্বে এই সার্বজনীন গণ-আন্দোলন চলিতেছিল। আগড়তলা মামলা এই আন্দোলনের বহ্নিতে বিশেষ ইন্ধন যোগাইল।

শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইউব গণ-আন্দোলনের চাপে জন-মতের সামনে মাথা হেট করিলেন। আগড়তলা মামলা প্রত্যাহৃত হইল। বড় দেরিতে জন-মতের সামনে মাথা হেট করিয়া মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল বলিয়াই একজন সম্মানিত বিচারপতিকে অপমান সহিতে হইয়াছিল। ঐ 'বেশি দেরি' হওয়ার কারণেই জন-মতের কাছে আইউবের মাথা হেট করাটা যথেষ্ট গ্রেসফুল হয় নাই। তাই আইউবের পতন তাতে প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। ব্যক্তি বিশেষের পতনে জাতির বিশেষ কিছু আসে যায় না। আইউবের পতনেও আসিয়া যাইত না। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য এই যে ঘটনাটা দুই অঞ্চলের মধ্যে তিক্ততা দুরপনেয় করিয়া তুলিয়াছে। এইদিক হইতে আইউবের আমলটা হইয়া পড়িয়াছে পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার যুগ।

৫. নেতাদের ভুল

পাকিস্তানের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী দেশের নেতৃবৃন্দ, এ কথা পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না। পাকিস্তানের মত এমন সমস্যাহীন নয়া রাষ্ট্র আর হয় না। এক ভৌগোলিক সমস্যা ছাড়া বলিতে গেলে পাকিস্তানের আর কোন সমস্যাই ছিল না। একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া গণতান্ত্রিক পন্থাতেই এ সমস্যারও সমাধান করা যাইত। তা না করিয়া নেতারা কেবল নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টিই করিয়া গিয়াছেন। ফলে আজ আমাদের জাতীয় জীবনে সমস্যার অন্ত নাই।

নেতাদের গোড়ার ভুল এই যে যে-একক মনীষা ও নেতৃত্বের বলে তাঁরা পাকিস্তান পাইলেন, সেই কায়েদে-আযমের ওসিয়তের বরখেলাফে পাকিস্তানের রাজনীতিকে তাঁরা ভুল পথে চালাইলেন। 'নেশন-স্টেট' হিসাবে পাকিস্তান গড়িবার প্রথম শর্ত যে পাকিস্তানী নেশন তৈয়ার করা, তাই তাঁরা করিলেন না। ফলে নেতারা নিজেরা গণতন্ত্রী হইলেন না। জনগণকে গণতন্ত্রের পথে শক্তিশালী করিলেন না। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ সরকারী কর্মচারিরা রাজনীতি করিতে লাগিলেন। নেতারাই তাঁদেরে রাজনীতি করাইলেন। অবস্থা-গতিকে সরকারী কর্মচারিরাই আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রিম। ক্ষমতাসীন অফিসার ও রাজনৈতিকের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে একজন নিয়োজিত আরেকজন নির্বাচিত। বিনা-নির্বাচনের রাজনীতিই যদি করিতে হয়, তবে আর অপেক্ষাকৃত কম ডিগ্রীধারী পলিটিশিয়ানদের নেতৃত্ব কেন? অপেক্ষাকৃত উচ্চ ডিগ্রিওয়ালা অফিসাররাই ভাল। অতএব তাঁরা নিজেরাই রাষ্ট্র-নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। স্থায়ী সরকারী কর্মচারিদের যে-রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাই পার্লামেন্টারি শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদ, পাকিস্তানে আজ সে বুনিয়াদই ভাংগিয়া পড়িয়াছে। সরকারী কর্মচারি অপেক্ষা রাজনৈতিক নেতাদের দোষেই এটা ঘটিয়াছে।

পলিটিশিয়ানদের এই দুর্বলতাই দেশের প্রধান সেনাপতির পক্ষে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। তাঁদের এই দুর্বলতাই আইউবী আমলকে দশ বছর স্থায়ী করিয়াছে। এই নিরংকুশ এক নায়কত্বের দরুন আইউব তাঁর 'উন্নয়ন দশকে' শাসনযন্ত্রের সমস্ত কাঠামোই এমন তছ্‌নছ্‌ করিয়াছেন যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এর সবগুলিই আবার 'কেচে গণ্ডুষ' করিতে হইবে।

কিন্তু কাজটা শুধু কঠিন নয়। প্রায় অসম্ভব। অবাধ্যতা, উচ্ছৃংখলতা কর্তব্যে অবহেলা, স্তাবকতা, উচ্চাকাংখা, রেষারেষি ও স্বজন-প্রীতি সব মিলিয়া আজ আমাদের শাসনযন্ত্র ঘৃণে ঝর-ঝরা হইয়া গিয়াছে। ভাংগিয়া পড়ার অবস্থা। সাম্প্রতিক কালে বর্তমান শাসনামলে '৩০৩ জন' উচ্চপদস্থ কর্মচারির আচরণই তার প্রমাণ। এ সম্পর্কে আমার নেতা শহীদ সাহেবের একটা কথা মনে পড়িতেছে। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে একবার তাঁকে জানান হয় যে পশ্চিমা গণতন্ত্রী দেশ সমূহের চাপে জেনারেল আইউব গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে রাযী হইয়াছেন এবং তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে বিভিন্ন দলের নেতাদের হাতে ক্ষমতা ফেরত দিতে রাযী হইয়াছেন। অবশ্য শহীদ সাহেবের এন্তেকালের পরে আইউব সাহেব তাঁর 'প্রভু নয় বন্ধু' বই-এ এই গুজবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু গুজবটার সত্য মিথ্যা বিচার

[illegible] এর উল্লেখের উদ্দেশ্য নয়। শহীদ সাহেবের অভিমতটাই এখানে বিচার্য। তিনি ঐরূপ অফার আসিবার খবর পাইয়া আমাদের সকলের সাথে সমবেত ও পৃথকভাবে আলোচনা করেন। তাঁর জিগ্‌গাস্য ছিলঃ অমন অফার আসিলে তিনি সে দায়িত্ব নিবেন কি না? আমরা সবাই প্রায় এক বাক্যে বলিলামঃ যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনের কথা ভাবিতেছি, আইউব সেটা স্বেচ্ছায় ফিরাইয়া দিতে চাহিলে তা না নেওয়া হইবে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। এই যুক্তিতে আমরা সর্বসম্মত রায় দিলামঃ 'তেমন অফার আসিলে তা নিতেই হইবে। তখন শহীদ সাহেব বলিলেনঃ 'এই তিন বছরে আইউব শাসনযন্ত্রে এমন অচিন্তনীয় বিশৃংখলা ঢুকাইয়াছেন যে আমার ভয় হয়, শাসন-ভার হাতে নিয়া আমরা গণতান্ত্রিক মামুলি উপায়ে সরকার চালাইতে পারি না; কঠোর হস্তে এমন ওলট-পালটের দরকার হইবে যে এক পার্টি-ডিক্টেটরশিপ ছাড়া তেমন কঠোরতা সম্ভব নয়। তেমন অবস্থা আমাদের দেশে নাই। করিতে গেলে গণতন্ত্র থাকিবে না।'

লিডারের কথায় ও মুখ-ভাবে অমন অতি নৈরাশ্য দেখিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ আইউব শেষ পর্যন্ত তেমন অফার দেন নাই।

শহীদ সাহেব যখন এ-কথা বলিয়াছিলেন, তারপরে আরও সাত বছর আইউবের ঐ ডিক্টেটরি চলিয়াছে। শাসনযন্ত্রে আরও বেশী ঘূণে ধরিয়াছে। শহীদ সাহেবের ঐ আশংকার কারণ গভীরতায় ও ব্যাপকতায় আরও বাড়িয়াছে। শাসনযান্ত্রিক ব্যাপারেও ব্যক্তিগতভাবে আমি শহীদ সাহেবের মতের মূল্য বরাবরই দিতাম। চিন্তার সেই অভ্যাস বশতঃই আজও আমার মনে হয়, আমাদের শাসনযন্ত্র মেরামতের স্তর পার হইয়া গিয়াছে। জেনারেল ইয়াহিয়ার আন্তরিক চেষ্টায় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার শুভ দিন যতই আসন্ন হইতেছে, গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের সুখ-সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া যতই উৎফুল্ল হইতেছি, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে জনগণের জীবনের রংগীন ছবির গোলাবী কল্পনায় যতই রোমাঞ্চ বোধ করিতেছি, শাসনযন্ত্রে উচ্ছৃংখলতার দিকে চাহিয়া ততই আতংকিত হইতেছি। সত্যই কি শাসনযন্ত্রে বিপ্লবী পরিবর্তন না আনিলে নির্বাচিত সরকার জন-কল্যাণের কিছু করিতে পারিবেন না? গণতন্ত্র কি এবার সত্য-সত্যই ফেল করিবে? যদি তাই হয় তবে তার প্রতিকারের জন্য সুশৃংখল সংঘবদ্ধ আদর্শবাদী তেমন শক্তিশালী পার্টি ডিক্টেটরশিপ পাইব কোথায়?

এমনি জটিল সমস্যার সামনে দেশকে নিক্ষেপ করিয়াছে জেনারেল আইউবের দশ বছরস্থায়ী ব্যক্তি-ডিক্টেটরশিপ। পার্লামেন্টারি আমলে এ বিপদ আমাদের ছিল না। যতই

অযোগ্য ও দিশাহারা হউন আমাদের পার্লামেন্টারি নেতারা পার্লামেন্ট অফিশিয়ালদেরে অত খারাপ করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ অফিসারই তখন বৃটিশ ঐতিহ্যের রাজনীতিক নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

ব্যক্তি-ডিক্টেটরশিপ ও পার্টি-ডিক্টেটরশিপ উভয়টাতেই অসাধারণ মনীষার দরকার। গণতন্ত্রে অসাধারণ প্রতিভাধর নেতৃত্বের দরকার নাই। এইখানেই ডিক্টেটরশিপের চেয়ে গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার অভাবই গণতন্ত্রকে ডিক্টেটরশিপের পদানত করিয়াছিল।

রাজনৈতিক নেতাদের অন্তর্নিহিত এই দুর্বলতার জন্যই আইউবী স্বৈরাচারের অবসান করিতে দশ বছর লাগিয়াছে। এটাও করিয়াছে প্রধানতঃ ছাত্র-তরুণদের নেতৃত্বে জনসাধারণ। নেতাদের কৃতিত্ব এতে সামান্যই আছে। নিঃস্বার্থ সংগ্রামী ছাত্র-তরুণদের নেতৃত্বের গণআন্দোলনের ফলে ডিক্টেটর আইউব মাথা নত করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি নেতাদের সাথে গোল টেবিল বৈঠকে বসিতে রাযী হইলেন। দেশের নেতৃত্বের ঐ অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই শেষ পর্যন্ত গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ করিয়া দিল।

গোল-টেবিল বৈঠক ফেল হইবার অনেক কারণ ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ এই যে এটা আসলে গোলটেবিল সম্মিলনীই ছিল না। প্রেসিডেন্ট আইউব ও নেতাদের কেউই এই সম্মিলনীর প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দেন নাই। এটাকে জাতির ভাগ্য নির্ধারণের একটা পবিত্র ঘটনা বলিয়া কেউ মনেই করেন নাই। করেন নাই বলিয়াই এই সম্মিলনীর কোন সিরিয়াস প্রস্তুতি ও ম্যাজিস্টিক গাম্ভীর্য ছিল না। একদিকে প্রেসিডেন্ট আইউব ফাটিয়া-পড়া গণ-আক্রোশের মুখে। আত্মরক্ষার তাগিদে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে একটা যাবে-তাবে বোঝা-পড়া করিতে চাহিয়াছিলেন যত পারেন কম দাম দিয়া। অপর দিকে ক্ষুধার্ত নেতারা প্রেসিডেন্ট আইউবের বর্তমান বিপদের সুযোগে গদি দখল করিতে চাহিয়াছিলেন যতটা পারেন বেশী দাম আদায় করিয়া। উভয়পক্ষের মনেই ছিল ত্রস্ত-ব্যস্ততার তাগিদ। তাঁদের প্রতি কাজে যে ব্যস্ততা ফাটিয়া পড়িতেছিল। একদিকে কনফারেন্সে সমবেত নেতাদের সাথে আন্দোলনের স্পিয়ারহেড ছাত্র-জনতার কোন যোগাযোগ ছিল না। নেতারা আন্দোলনকে শক্তিশালী সুসংহত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। এইভাবে আন্দোলনে নেতাদের কোন অবদান ছিল না বলিয়া স্বভাবতঃই তার উপর কোনও প্রভাব তাঁদের ছিল না। ছিল না বলিয়াই কনফারেন্সের মুদ্দতের জন্য কোনও আর্মিস্টিস্ও ঘোষণা করেন নাই। অপরদিকে নেতাদের ব্যস্ততা ও তাড়া-হুড়ায় ছাত্র-তরুণরা স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে। তাদের আশংকা হয়, নেতাদের অনেকেই গদির দামে গণতন্ত্র ও

গণ–স্বার্থ বিক্রয় করিয়া আইউবের সাথে আপোস করিয়া ফেলিতেছেন। মওলানা ভাসানী ও মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টোর মত জনপ্রিয় নেতৃদ্বয় সম্মিলনীতে যোগ না দেওয়ায় ছাত্র–তরুণ ও জনতার এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। কাজেই সম্মিলনীর বৈঠক চলিতে থাকা অবস্থায়ও দেশের সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করিবার ও সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নিবার উপযুক্ত আবহাওয়া সম্মিলনীর বৈঠকে বা বাহিরে দেশের মধ্যে সৃষ্ট হয় নাই।

এ ভুলটা প্রধানতঃ নেতাদের। প্রেসিডেন্ট আইউবের ভুল ততটা নয়। প্রেসিডেন্ট আইউব স্বভাবতঃই অতিমাত্রায় ত্রস্ত–ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নেতারা ইচ্ছা করিলেই তার প্রতিকার করিতে পারিতেন। সম্মিলনীতে কাকে–কাকে দাওয়াত দিতে হইবে, তা ঠিক করিবার ভার প্রেসিডেন্ট নেতাদের উপর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে দায়িত্ব পালনে নেতারা চরম শোচনীয় অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। সে অযোগ্যতার ও অদূরদর্শিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে সম্মিলনীতে (১) কোনও মাইনরিটি প্রতিনিধিকে, (২) কোনও নারী প্রতিনিধিকে দাওয়াত দেওয়া হয় নাই। পাকিস্তানের বারকোটি অধিবাসীর মধ্যে দেড়কোটি অমুসলমান। পূর্ব পাকিস্তানে এরা গোটা বাসেন্দার প্রায় এক–পঞ্চমাংশ। মুখে এদেরে সমান–অধিকারভোগী নাগরিক বলা হয়। গত দুই–দুইটা শাসনতন্ত্রেই এদের সকল প্রকার নাগরিক অধিকারের সুস্পষ্ট বিধান করা হইয়াছে। পার্লামেন্টারি আমলের কয়েক বছর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে যথেষ্ট–সংখ্যক মাইনরিটি মন্ত্রী নেওয়া হইত। তাঁরা সকলেই যোগ্যতা ও আনুগত্যের সাথে মেম্বরগিরি ও মন্ত্রিগিরি করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল হওয়ার পর হইতে এগারটি বছর পাকিস্তানের রাজনীতি হইতে গোটা মাইনরিটি সম্প্রদায় মুছিয়া গিয়াছে। এই দশ বছরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ও আইন পরিষদে একজন হিন্দুরও স্থান হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় প্রায় দুই ডজনের মধ্যে একজন মাত্র অমুসলমান মন্ত্রী কিছুদিনের জন্য নেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা–দীক্ষায় উন্নত, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুগ–যুগ ধরিয়া উৎসর্গীকৃত–প্রাণ, চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আজও পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসেবায় নিযুক্ত হিন্দুদের প্রতি এমন উপেক্ষা–অবহেলা দেখাইয়া আমরা কিরূপে তাঁদের মনে 'পাকিস্তানী জাতির' অনুগত ও গর্বিত মেম্বর হিসাবে 'আমরাত্ব' ও 'আমাদেরত্ব' সৃষ্টি আশা করিতে পারি? অবশ্য গত এগার বছরের ব্যাপারের জন্য গণতন্ত্রী নেতারা দায়ী ছিলেন না। ডিক্টেটর আইউবের খেয়াল–খুশী মতই রাষ্ট্র চলিয়াছে। মানিলাম। কিন্তু এ বঞ্চনা ও মাইনরিটির প্রতি এই অবিচারের প্রতিকারের প্রথম সুযোগ ছিল গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন। সেখানে নেতারা কি করিয়াছেন? প্রেসিডেন্ট আইউব নেতাদের হাতেই নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা,

প্রকৃতি ও নাম ঠিক করিবার ভার দিয়াছিলেন। রাউণ্ড টেবিল সফল হউক বা বিফল হউক, তাঁর কোনও ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, গোটাজাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই ঐ সম্মিলনী বসিয়াছিল। পাকিস্তানের শতকরা দশজন ও পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা বিশজন অধিবাসীকে বাদ দিয়া, আলোচনায় শরিক না করিয়া, জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করা উচিত বা সম্ভব, নেতারা কি রূপে তা ভাবিতে পারিলেন ?

তারপর ধরুন, নারীর প্রতিনিধিত্বের কথা। আর আর দেশের মতই পাকিস্তানেও নারী-পুরুষের সংখ্যা সমান। পাকিস্তানের নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় রাজনৈতিক কৃষ্টিক সাহিত্যিক জীবনে অন্যান্য বহু নয়া রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক উন্নত। পাকিস্তান আন্দোলনে ও পরবর্তীকালের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারীজাতির অবদান সামান্য নয়। দুই-দুইটা শাসনতন্ত্রে যতই কম হউক নারী জাতির জন্য আসন রিযার্ভ ছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও প্রস্তাবিত আইন পরিষদে কয়েকটি আসন নারীর জন্য রিজার্ভ রাখিয়াছেন। এর বাহিরে সাধারণ আসনেও নারীর ক্যানডিডেট হওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কালক্রমে সাধারণ আসনেও নারীরা নির্বাচিত হইবেন। অথচ আশ্চর্য এই যে গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিত্বের বেলা নারী জাতির কথা নেতাদের একবার মনেও পড়িল না। বর্তমান যুগে নারী জাতিকে বাদ দিয়া, আলোচনায় নারীকে অংশ গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ না দিয়া, যে-দেশের নেতারা জাতির রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিতে চান, তাঁরা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আমাদের গোলটেবিল ব্যর্থ হইবার এটাও একটা বড় কারণ।

৬. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভুল

জেনারেল ইয়াহিয়াও আমাদের জাতীয় ইন্টেলিজেন্শিয়ার অংশ। সেই হিসাবে আগের-আগের নেতাদের মত ভুল তিনিও করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এটা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার মৌলিক ত্রুটি। কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদি ভুল করিয়া থাকেন, তবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি মাত্র ভুলেরই বিচার আমরা এখন করিতে পারি। আর সব ভুলের বিচারের সময় এখনও আসে নাই। সেগুলি আদৌ ভুল কি না, তাও বলা যায় না। কারণ তাঁর কাজ আজও সমাপ্ত হয় নাই। যখন হইবে তখনই দুইটি কথা মনে রাখিয়াই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাজের বিচার করিতে হইবে।

সে দুইটি কথার একটি এই যে, যে-মার্শাল ল'র বলে তিনি চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর ও প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন, সে মার্শাল ল তাঁর ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি নয়। এইখানে আমাদিগকে জেনারেল আইউবের মার্শাল ল' এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার মার্শাল ল'র বুনিয়াদী পার্থক্যটা উপলব্ধি করিতে হইবে। জেনারেল আইউব মার্শাল ল' করিয়াছিলেন রাজনৈতিক অভিষ্ট হাসিলের জন্য আগে হইতে চিন্তা-ভাবনা করিয়া। সে কাজ করিতে গিয়া তিনি আনুগত্যের শপথ ভাংগিয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। পক্ষান্তরে জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্বকল্পিত কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া মার্শাল ল করেন নাই। সে কাজ করিতে গিয়া তাঁর আনুগত্যের শপথও ভাংগিতে হয় নাই। বরঞ্চ তিনি আনুগত্যের শপথ অনুসারেই মার্শাল ল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জেনারেল আইউব রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও দেশরক্ষা বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ড হিসাবে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার রাষ্ট্রীয় মনিব ছিলেন। তাঁরই কাছে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর আনুগত্য। সেই প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রিম কমাণ্ড লিখিতভাবে জেনারেল ইয়াহিয়াকে আদেশ দিয়াছিলেন। দেশের শাসন-ভার তাঁহার নিজের হাতে নিতে। জেনারেল ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্টের এই আদেশ মানিতে বাধ্য ছিলেন। না মানিলে বরঞ্চ অবাধ্যতা হইত ও আনুগত্যের খেলাফ কাজ করা হইত। কাজেই স্পষ্টতঃই জেনারেল ইয়াহিয়া ব্যক্তিগত ক্ষমতালোভে রাষ্ট্রের শাসন-ভার নেন নাই। বরঞ্চ বলা যায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা হইতে প্রথমটা পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি প্রথম হইতেই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি-সরকারের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা তুলিয়া দিবার সকল প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টায় তিনি দেশময় ভ্রমণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাদের সাথে পৃথক ও সমবেত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। এই আলাপ-আলোচনায় তিনি নেতাদের বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী মতবাদের ভিতরে একটা সমঞ্জস মধ্যপন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত মেয়াদে ও তারিখে সার্বজনীন ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই আইন পরিষদকে প্রাথমিক পর্যায়ে গণ-পরিষদ রূপে শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দিয়াছেন। মার্শাল ল'র অস্বাভাবিক ও অগণতান্ত্রিক অবস্থা হইতে গণতন্ত্রে ফিরিয়া যাইবার এর চেয়ে উত্তম আর কোন রাস্তা নাই। কাজেই এই পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্ভুল পথে অগ্রসর হইয়া ঠিক-ঠিক কাজই করিয়াছেন।

কিন্তু এই দিকে না গিয়া অন্য দিকে তাঁর যাওয়া উচিত ছিল। সেটা না করাই তাঁর প্রথম ভুল। এই ভুল '৫৬ সনের শাসনতন্ত্রটি পূনর্বহাল না করা। চীফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে তিনি এটা করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। এটা করিতে তাঁর জন-মত যাচাই করিবার দরকার ছিল না আইন বা নীতির কোনও দিক দিয়াই।

অথচ এটা করা দরকার ছিল। দরকার ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের ও সরকারের লেজিটিমেসি (বৈধতা) ও কন্টিনিউটি (সিল্‌সিলা)র জন্য। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সরকারের লেজিটিমেসি ও কনটিনিউটি বজায় ছিল। খাজা নাজিমুদ্দিনের বেআইনীভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়া, গোলাম মোহাম্মদের খাজা সাহেবকে ডিস্‌মিস করা এবং শেষ পর্যন্ত গণ-পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়া, কোনটাতেই রাষ্ট্রের বা সরকারের লেজিটিমেসি ও কনটিনিউটি ব্যাহত হয় নাই। গণ-পরিষদ ভাংগার দরুন যে সংকট দেখা দিয়াছিল, সুপ্রীমকোর্ট সেটা রেগুলারাইয করিয়া দিয়াছিল। রাষ্ট্রের ও সরকারের লেজিটিমেসি ভংগ ও কনটিনিউটি ছিন্ন হয় প্রথম ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর হইতে। এই দিন ইস্কান্দর-আইউবের ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বেআইনী বেদাঁড়াভাবে বাতিল করা হয়।

পাকিস্তানের মত ভৌগোলিক আকৃতির নয়া জাতির ও নয়া নামের নয়া রাষ্ট্রের জন্য লেজিটেমেসি ভাংগা কনটিনিউটি ছিন্ন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইতিহাস তার সাক্ষী। কাজেই যথাসম্ভব শীঘ্র ও প্রথম সুযোগেই এই লেজিটিমেসি ও কন্টিনিউটি পুনর্বহাল অত্যাবশ্যক। সেটা আজও হয় নাই। ১৯৬২ সালে আইউব ব্যক্তিগতভাবে যে শাসনতন্ত্র দিয়াছিলেন, তার দ্বারা এই কাজটি হয় নাই। ঐ শাসনতন্ত্র নিজেই বেদাঁরা ও বেআইনী ছিল। ফলে '৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তান রাষ্ট্রের ও সরকারের যে লেজিটিমেসি ও কনটিনিউটি ছিন্ন হইয়াছিল, '৬২ সালের তথাকথিত শাসনতন্ত্রে তা জোড়া লাগে নাই। রাষ্ট্র ও সরকারের বেদাঁরা ও বেআইনী অস্তিত্ব চলিতেই থাকে। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া যে মার্শাল ল ঘোষণা করেন তাতে আইউবের ঘোষিত মার্শাল ল'র বর্ধিত মেয়াদই চলিতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সোজাসুজি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে '৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের লেজিটিমেসি ও কনটিনিউটিতে পুনর্বহাল করিতে পারিতেন। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল করিলেই এটা ঘটিত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটি মাত্র ছোট ঘোষণায় ইহা করিতে পারিতেন। এতে এক সংগে দুইটা ব্যাপার ঘটিয়া যাইত। এক, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ও সরকারের

লেজিটিমেসি ও কন্টিনিউটি (বৈধতা ও সিল্‌সিলা) পুনর্বহাল হইয়া যাইত। দুই, ৭ই অক্টোবরের শাসনতন্ত্র বাতিলের বেআইনী কাজটি অননুমোদিত ও নিন্দিত হইয়া যাইত। এই দ্বিতীয় ঘটনাটির দ্বারা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য শাসনতন্ত্র বাতিলের আশংকা তিরোহিত হইয়া যাইত। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পাকিস্তানের জনগণ কোনও প্রকার শাসনতন্ত্রবিরোধী 'বিপ্লব' চায় না, এটা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এটা করেন নাই স্পষ্টতঃই এই জন্য যে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব-হেতু পূর্ব-পাকিস্তানে এবং ওয়ান ইউনিটের বিধান হেতু পশ্চিমা পাকিস্তানে অজনপ্রিয় ও অগ্রহণযোগ্য ছিল। এই পরিস্থিতিটা চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জন্য দুঃসাধ্য ও অসমাধ্য সমস্যা ছিলনা। তিনি তাঁর আইন-উপদেষ্টাদের দ্বারা ঠিকমত উপদিষ্ট হইলে সহজেই এর সমাধান করিতে পারিতেন। চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে খুব ন্যায় সংগতভাবে ও জোরের সাথে তিনি সমস্ত দলের নেতাদিগকে বলিতে পারিতেন ঃ 'রাষ্ট্রের ও সরকারের লেজিটিমেসি ও কনটিনিউটির জন্য আমি '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া রাষ্ট্রকে পূর্বের বৈধ অবস্থায় পুনর্বহাল করিতে বাধ্য। এ কাজে আপনারা আমার সহযোগিতা করুন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ওয়ান-ইউনিট রদ-বদলের বিধান সম্বন্ধে আপনারা একমত হইয়া সুপারিশ করুন। আমি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে সুপ্রিম কোর্টে রেফারেন্স করিয়া সে সব সুপারিশ আইনসিদ্ধ বাধ্যকর করিয়া লই।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার চার মাসের শর্তের মতই এই কথার প্রতিক্রিয়াও শুভ হইত। ঐ ধরনের সুপারিশের ভিত্তিতে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বহাল হইলে একদিকে যেমন লেজিটিমেসি-কনটিনিউটি জোড়া লাগিত, অপর দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক ঘোষণার কোন দরকার হইত না। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের বেশীর ভাগই '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রেই আছে।

পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও-পথে না গিয়া নিজ দায়িত্বে পঞ্চশিলা ঘোষণা করায় '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের সবগুলি মূলনীতি ঠিক থাকিল বটে, কিন্তু প্রথমতঃ রাষ্ট্র ও সরকারের লেজিটিমেসি-কনটিনিউটি পুনর্বহাল হইল না। দ্বিতীয়ত ঃ '৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর শাসনতন্ত্র বাতিলটা অনুমোদিত হইয়া গেল। ভবিষ্যতের জন্য খারাপ নযির স্থাপিত হইল। ভাবী রাজনৈতিক উচ্চাকাংখী পলিটিক্যাল এ্যাডভানচারিস্টদের জন্য একটা সুন্দর আশকারা হইয়া থাকিল।

অনেকে আশংকা করিয়া থাকেন যে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিলের আইউবী বিপ্লব বাতিল করিয়া রাষ্ট্র ও সরকারকে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর অবস্থায় ফিরাইয়া নিলে তৎকালের মন্ত্রী–মেম্বররা বকেয়া শুদ্ধা বেতন–ভাতা ও মন্ত্রীগিরি–মেম্বরগিরি দাবি করিয়া বসিবেন। তাতে রাষ্ট্রের কোষাগারে বিপদ ঘটিতে পারে। কথাটা নিতান্তই বাজে। আঞ্চলিক প্যারিটি ও স্বায়ত্তশাসন এবং ওয়ান ইউনিটের মত জটিল ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান চিফ–মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া করিতে পারিলে ঐ তুচ্ছ ব্যাপারটাই পারিতেন না, এটা কোনও কাজের কথা নয়।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই সোজা পথে না গিয়া অধিকতর জটিল গণতন্ত্রের পথে যাওয়ায় ভাল কাজটিই করিয়াছেন। তবে এই ভাল কাজটি করিতে গিয়াই তিনি এমন কয়টি কাজ করিয়াছেন বা আপাততঃ ও দৃশ্যতঃ ভাল। কিন্তু যার পরিণাম ভাল নাও হইতে পারে। যদি এসব কাজের পরিণাম ভাল হয়, তবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খুব দুঃসাহসিক পুণ্যের কাজই করিয়াছেন। সেজন্য পাকিস্তানের ইতিহাসে তাঁর নাম সোনার হরফে লেখা থাকিবে। কিন্তু যদি পরিণাম ভাল না হয়, তবে ইতিহাসে তাঁর বদনাম থাকিবে। সে বদনাম জেনারেল আইউবের বদনামের চেয়ে কম হইবে না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এমন কাজের মধ্যে দুইটি প্রধান। এক, দুই অঞ্চলের মধ্যে সম–প্রতিনিধিত্বের স্থলে জন–সংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দুই, পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া দিয়া প্রদেশগুলিকে পূর্ব অবস্থায় পুনর্বহাল করা। দৃশ্যতঃ দুইটি কাজই জনমতের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। কিন্তু আসলে এটাই জনমতের দাবি ছিল কি না তা যেমন বিচার করিতে হইবে, নয়া ব্যবস্থায় দেশের সমস্যা মিটিল কি না, লাভ কি ক্ষতি হইল তাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

এটা বিচার করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে এই দুইটি বিষয় পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি সতুন ও রুকনের অন্যতম। দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা ও চিন্তা–বিভ্রান্তির পরে এই পাঁচটি সতুন ও রুকন চূড়ান্তরূপে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল।

(১) পাকিস্তান পার্লামেন্টারি ফেডারেল রিপাবলিক।

(২) দুইটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। তার মানে পশ্চিমা ওয়ান ইউনিট।

(৩) দুই অঞ্চলের সার্বিক প্যারিটির প্রথম স্তর হিসাবে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি। তার মানে যুক্ত নির্বাচন প্রথা।

(৪) উর্দু ও বাংলা দুইটি সম-মর্যাদার রাষ্ট্র ভাষা।

(৫) করাচি ফেডারেশনের ক্যাপিটাল।

প্রেসিডেন্ট আইউব তাঁর ডিক্টেটরির শুরুতেই এই পাঁচটি সতুনের দুইটি (এক নম্বর ও পাঁচ নম্বর) ভাংগিয়া ফেলেন। পার্লামেন্টারি ফেডারেল পদ্ধতির বদলে তিনি প্রেসিডেনশিয়াল ইউনিটরি ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন। রাজধানী করাচি হইতে মিলিটারি হেড কোয়ার্টার পিণ্ডিতে লইয়া যান। মার্শাল ল করিতে জন-মত লাগে না। কাজেই রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে ও রাষ্ট্রের প্যাটার্ন বদলাইতেও জন-মতের দরকার নাই এটাই ছিল আইউবের এটিচুড। বাকী থাকিল তিনটি সতুন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভাংগিলেন আরও দুইটি (দুই নম্বর ও তিন নম্বর)। বাকী থাকিল মাত্র চার নম্বরেরটিঃ উর্দু ও বাংলা রাষ্ট্রভাষা।

পাকিস্তান নয়া রাষ্ট্র নামেও জাতিত্বেও। তেইশ বছরের কুশাসন ও ভুল পরিচালনার ফলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের বিদ্যমান সমস্যাগুলির এই পাঁচটি বাদে আর একটাও মিটান হয় নাই, বরঞ্চ নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি করা হইয়াছে। বহুদিনের ঝাকাঝাকি ও টানা-হেঁচড়ায় ঐ পাঁচটি ব্যাপারের মীমাংসা হইয়াছিল। আসল সমস্যাগুলি মিটাইবার রাস্তা পরিষ্কার হইয়াছিল।

অবশিষ্ট সমস্যাগুলির মীমাংসা করার বদলে মীমাংসিত বিষয়গুলি পুনরায় উন্মুক্ত করা খুবই ঘোরতর বিপজ্জনক কাজ হইয়াছে। এর ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরিয়াছে। এ সবের মধ্য করাচি হইতে রাজধানী স্থানান্তরের কথাটা আগেই আলোচনা করিয়াছি। নতুন কথার মধ্যে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে রাজধানীর সেটল্ড ব্যাপারটা যখন আনসেটলড হইয়াছে, তখন ন্যায্যতঃ যেখানে রাজধানী থাকা উচিৎ সেই মেজরিটির অঞ্চল পূর্ব-পাকিস্তানেই তাকে আনিতে হইবে। ন্যায়তঃ রাজধানী ঢাকাতেই হওয়া উচিৎ ছিল গোড়াতেই। শুধু জাতির পিতা কায়েদে-আযমের সম্মানে পূর্ব-পাকিস্তানীরা করাচি রাজধানী রাখিতে রাযী হইয়াছিল। কায়েদে-আযমের সম্মান রাখিতে যদি পশ্চিম-পাকিস্তানীরা রাযী না হয় তবে আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি ছাড়িব কেন? বস্তুতঃ কাউন্সিল মুসলিম লীগ তাদের সাত দফা দাবির মধ্যে ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের দাবি করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ দাবির জবাবে তাঁর ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : 'রাজধানী বারে-বারে পরিবর্তন করা যায় না।' প্রথমতঃ এ ব্যক্তিগত মত গণ-পরিষদের উপর বাধ্যকর নয়। দ্বিতীয়তঃ এ কথার জবাবে বলা যায় যে দেশবাসীর কোনও নির্বাচিত আইন পরিষদ রাজধানী বারে-বারে দূরের কথা, একবারও বদলায় নাই। প্রেসিডেন্ট আইউব তাঁর ব্যক্তিগত

খেয়াল–খুশীমত একবারই রাজধানী বদল করিয়াছেন। এই পরিবর্তন ঠিক রাখিতে হইলেও আসন্ন নির্বাচিত পার্লামেন্টের এতে নিশ্চয়ই অনুমোদন লইতে হইবে। সে অনুমোদনের বেলা ঢাকা ও করাচির কথা নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বা অন্য কোনও নেতা এটাকে 'ক্লোযড' প্রশ্ন বলিতে পারেন না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগের ঘোষণায় বুঝা গিয়াছিল প্রেসিডেনশিয়াল প্যাটার্ন হইতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ফিরিয়া আসা তাঁর মতে একটা সেট্‌লড্ প্রশ্ন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঘোষণায় তিনি পার্লামেন্টারি কথাটা না বলায় সংবাদপত্র রিপোর্টারা ঐ অমিশনের কারণ জিগ্‌গাসা করিয়াছিলেন। জবাবে প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেনঃ বারে বারে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা তিনি দরকার বোধ করেন না ইডিওলজি ফেডারেল ও ম্যাক্সিমাম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কথাগুলি বহুবার পুনরাবৃত্তি করিতে আপত্তি না হইলে পার্লামেন্টারি কথাটার পুনরাবৃত্তিও নিশ্চয়ই দোষের হইত না। এ বিষয়ে আমার আশংকা মিথ্যা হউক, এই মুনাজাত করি। কিন্তু সে আশংকার কথাটা না বলিয়া পারিতেছি না। বর্তমান সরকারের বিশ্বস্ত কেউ–কেউ আমাকে বলিতেছিলেন যে নিভাজ পার্লামেন্টারি ও নিভাজ প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেম পাকিস্তানের উপযোগী নয়। এখানে তুর্কী শাসনতন্ত্রের অনুকরণে উক্ত দুই সিস্টেমের মিশ্রনে একটি নয়া প্যাটার্ন বাহির করিবার চেষ্টা হওয়া উচিৎ। উক্ত ভদ্রলোকেরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তাঁহার আইন–উপদেষ্টাদের মনের কথা বলিয়াছেন কি না কে জানে ?

পশ্চিম-পাকিস্তানের ওয়ান ইউনিট ও দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি বাতিল করিয়া প্রেসিডেন্ট জন–মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। কথাটা বিচার–সাপেক্ষ। পশ্চিম পাকিস্তানের মাইনরিটি প্রদেশেসমূহ ওয়ান ইউনিটের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিল ; তাহাদের নেতাদের বিপুল মেজরিটি বরাবর ওয়ান ইউনিটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। ইহা ঠিক কথা। ওয়ান ইউনিট–বিরোধী এই আন্দোলনটা নিরর্থক ছিল না। উহার বিরুদ্ধে মাইনরিটি প্রদেশসমূহের বাস্তব ও গুরুতর অভিযোগ ছিল। সে অভিযোগের প্রতিকারের পন্থা হিসাবে সকল প্রদেশই যার তা স্বায়ত্তশাসিত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছিল, একথাও ঠিক। কিন্তু গোটা পশ্চিম পাকিস্তান ও সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যসমূহের সাধারণ স্বার্থের বিষয়গুলি এজমালিতে পরিচালনের পন্থা হিসাবে সবগুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমন্বয়ে একটি যোনাল ফেডারেশন করিবার আবশ্যকতা কেউ অস্বীকার করেন নাই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই দিককার কথাটা একদম বিচার না করিয়া শুধু সবগুলি প্রদেশকেই পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া নেন নাই, বরঞ্চ ওয়ান ইউনিট গঠনের আগে যে-সব দেশীয় রাজ্য স্বায়ত্তশাসিত ছিল,

সেগুলির বেশির ভাগকেই পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। এটা আইনের বিচারে ঠিক হয় নাই। রাজনীতির বিচারে ঠিক হইয়াছে কি না অল্পদিন পরেই বুঝা যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বাহওয়ালপুর হইতে প্রতিবাদ উঠিয়াছে। এটা কতদূর গড়াইবে কে জানে ? প্রেসিডেন্টের আইন-উপদেষ্টারা তাঁহাকে কি উপদেশ দিয়াছেন জানি না। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে এইসব দেশীয় রাজ্য পাকিস্তানেই এক্সিড করিয়াছিল, কোনও একটি প্রদেশে এক্সিড করে নাই। তারপর ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে বড়লাটের অর্ডিন্যান্স-বলে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর ঐসব দেশীয় রাজ্য পাকিস্তান সরকারের সহিত দস্তখতী চুক্তি বলে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশ ভাংগিয়া যাওয়ার পর প্রদেশসমূহের মতই দেশীয় রাজ্যগুলিও পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় ঐসব দেশীয় রাজ্যের সহিত নূতন চুক্তি না করিয়া তাদেরে পার্শ্ববর্তী কোনো প্রদেশের অংগ করা যায় না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যস্থতায় এরূপ কোনও চুক্তি তাদের সাথে হইয়াছে কিনা, সরকারী ঘোষণায় তা প্রকাশ নাই।

তারপর ধরুন, এর রাজনৈতিক দিকটার কথা। ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া দিবার সময় উহাদের সমন্বয়ে একটা যোনাল ফেডারেশনের সম্ভাবনার কথা ত কোথাও বলাই হয় নাই, বরঞ্চ তেমন কোনও যোনাল ফেডারেশন না হওয়ার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ ট্রাইবাল এরিয়াগুলিকে আলাদা করিয়া ঐগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে আনা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐসব এলাকার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হইয়াছে। এতে এটাই বোঝা যায় যে সিন্ধু উপত্যকা পরিকল্পনা, তারবেলা, মংলা, সুইগ্যাস, রেল, পোস্ট, টেলি, ইনফর্মেশন, ব্রডকাস্টিং, পানি বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিবার জন্য বর্তমান সরকার মনের দিকে তৈয়ার হইয়াই গিয়াছেন। সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সমন্বয়ে একটি যোনাল ফেডারেশন না হইলে পশ্চিমাঞ্চলের ঐ সব বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না আনিয়া উপায়ান্তরও নাই। পশ্চিমাঞ্চলে যদি তা হয় তবে পূর্বাঞ্চলে কি হইবে ?

এইখানেই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের ঐক্য ও বিভক্তির সাথে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। এইখানেই লাহোর প্রস্তাব, আঞ্চলিক বনাম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, দুই অঞ্চলের প্যারিটি, পশ্চিম-পাকিস্তানের ওয়ান ইউনিট, সব কথা অনিবার্যরূপে প্রাসংগিক হইয়া পড়ে। পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থের কথা বিচারে পশ্চিম পাকিস্তানের গঠন-প্রকৃতি-আকৃতির কথা অবান্তর এ কথা আর বলা চলে না। আবশ্যিকভাবেই এটা 'বান্তর' হইয়া পড়ে। একটু পরেই এসব

বিষয়ই যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তার আগে আরেকটা ব্যাপারের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আসন্ন নির্বাচিত আইন পরিষদের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া নিজ দায়িত্বে যে দুইটি ব্যাপারে দশ বছরের প্রচলিত ব্যবস্থা বাতিল করিয়াছেন, তার একটি ওয়ান ইউনিট, অপরটি প্যারিটি। ওয়ান ইউনিটের বিরুদ্ধে পশ্চিম-পাকিস্তানের মাইনরিটি প্রদেশসমূহে ঘোরতর আপত্তি উঠিয়াছিল এ কথা আগেই বলিয়াছি।

কিন্তু প্যারিটির বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে তেমন কোন আন্দোলন হইয়াছিল, তা বলা যায় না। পূর্ব-পাকিস্তান-ভিত্তিক যতগুলি জনপ্রিয় গণ-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-প্রতিষ্ঠান আছে তাদের ছয় দফা, সাত দফা, এগার দফা ও চৌদ্দ দফা নামে বহু পার্টি-প্রোগ্রাম আছে। আইউবী আমলের গোটা দশ বছরব্যাপি যুলুমের প্রতিবাদে এই সব প্রতিষ্ঠান অনেক দাবি-দাওয়া স্পষ্ট ভাষায় দেশবাসী ও গভর্ণমেন্টের সামনে পেশ করিয়া আসিয়াছে। তার একটিতেও প্যারিটি বাতিল করিয়া জন-সংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব চাওয়া হয় নাই। বরঞ্চ প্রতিনিধিত্বের প্যারিটিকে ভিত্তি করিয়াই ঐসব পার্টি দুই অঞ্চলের স্বকীয়তা, দুই ভাষা, দুই কৃষ্টি, দুই অর্থনীতি ও দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তার বাস্তবায়নের পন্থা হিসাবেই লাহোর-প্রস্তাব-নির্দেশিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দাবি করিতেছিল।

পক্ষান্তরে যাঁরা শক্তিশালী কেন্দ্রের নামে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিতেছিলেন, তাঁরাই প্রতিনিধিত্বের প্যারিটির বিরূপ সমালোচনা করিতেছিলেন। তাঁরা বলিতেছিলেন যে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি যাঁরা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁরা কার্যতঃ পাকিস্তানের দুই স্বতন্ত্র সত্তা মানিয়া লইয়া পাকিস্তানের একত্ব ও অবিভাজ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁদের মতে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি প্রবর্তন করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে দুর্নিবার করিয়া তোলা হইয়াছে।

এমনি সময়ে 'সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্রের' দাবিদার প্রেসিডেন্ট আইউবের এক পূর্ব-পাকিস্তানী সমর্থক, তাঁর সাবেক মন্ত্রী, হঠাৎ একদিন 'পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষ হইতে' প্যারিটির স্থলে জন-সংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবি করিয়া বসেন। যেমনি দাবি অমনি স্বীকার। যেই ইজাব অমনি কবুল। পূর্ব-পাকিস্তানের এই 'ন্যায় সংগত দাবি' মানিয়া লইবার জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানের সকল নেতা যেন এক পায় খাড়াই ছিলেন। কি উদ্দেশ্যে তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানের উপর ঐ 'অবিচারের প্রতিকার' করিতে উন্মুখ হইয়াছিলেন, পরের দিনই তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাঁরা বলিতে লাগিলেন :

'এখন যখন পূর্ব-পাকিস্তানের জন-সংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবি মানিয়া নেওয়া হইল, তখন আর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয় কোন মুখে ?'

এই কথার সংগে সংগে তাঁরা আরেকটি কথা বলিলেন। সেটি উচ্চ পরিষদের কথা। এটি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে উচ্চ পরিষদ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব-বাংলার মেজরিটি কনট্রোলই যদি করা হইল, তবে নিম্ন পরিষদে এই মেজরিটি লইয়া পূর্ব-বাংলার কি লাভ হইল ? প্রকারান্তরে সেই প্যারিটিই হইয়া গেল না কি ? তাতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আবশ্যকতা ও যৌক্তিকতা কিছু হ্রাস পাইল কি ?

এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার শুভ ও প্রশংসনীয় কাজটি করিতে গিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এবং সর্বোপরি দুই অঞ্চলের সম্পর্কের মধ্যে কি কি জটিলতা সৃষ্টি করিলেন এবং তার ফল পরিণামে কি কি অশুভ ও অবাঞ্ছনীয় রূপ ধারণ করিতে পারে, নিচে সংক্ষেপে তারই আলোচনা করিতেছি।

৭. আঞ্চলিক বনাম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর ঘোষণায় পাকিস্তান ফেডারেশনের ইউনিটগুলির জন্য 'সর্বাধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের' কথা বলিয়াছেন। তার মানে এই যে ইউনিটগুলির নাম তিনি 'প্রদেশ' রাখিয়াছেন। এক কানাডা ছাড়া দুনিয়ার আর সব ফেডারেশনের অংগরাজ্যকে 'স্টেট' বলা হয়। শুধু কানাডাতেই ওদের 'প্রভিন্স' বলা হয়। অস্ট্রেলীয় ফেডারেশনের শাসনতান্ত্রিক নাম কমনওয়েলথ-অব-অস্ট্রেলিয়া। আমাদের প্রতিবেশী ভারত ঠিক ফেডারেশন নয়। শাসনতান্ত্রিক নাম তার ইউনিয়ন। তবু তার অংগরাজ্যগুলিকে 'স্টেট' বলা হইয়াছে। 'প্রভিন্স' বলা হয় নাই।

সুতরাং নামে কিছু আসে যায় না। ফেডারেশন ও ফেডারেটিং ইউনিটগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনটাই আসল কথা। তবু আমাদের বেলা 'স্টেট' ও 'প্রভিন্স' দুইটা শব্দই খুব উপযোগিতার সাথে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশগুলির সমপর্যায়ের ও সমমর্যাদার 'প্রদেশ' করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বাধে নাই।

স্মরণীয় যে পূর্ব–পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতা ও চিন্তা–নায়করা বরাবর পূর্ব–বাংলার দাবিকে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' বলিয়াছেন, 'প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসন' বলেন নাই। কারণ অতি সোজা। পূর্ব–বাংলা কোনও অর্থেই একটি 'প্রদেশ' নয়। ইউনিটারি রাষ্ট্রের অংগরাজ্য হিসাবেও না, ফেডারেল রাষ্ট্রের অংগরাজ্য হিসাবেও না। বলা যাইতে পারে, পূর্ব–বাংলার রাষ্ট্রনেতাও চিন্তা–নায়করা প্রভিনশিয়াল অটনমি দাবির বদলে 'স্টেট অটনমি' দাবি করিতে পারিতেন। তা কেন করেন নাই ? তাঁরা 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' 'রিজিওনাল অটনমি' দাবি করিতেছেন কেন ? দুই কারণে। এক, দুনিয়ার অন্যান্য ফেডারেশনের অংগরাজ্যেরা স্বচ্ছন্দে ও নিজেদের সুবিধার খাতিরে যেসব বিষয় ফেডারেশনের হাওলা করিয়াছে, পূর্ব–বাংলা ভৌগোলিক কারণে তার সবগুলি ফেডারেশনকে দিতে পারে না। পূর্ব–বাংলা ঐ কারণে আরও কম বিষয় ফেডারেশনের হাতে দিতে বাধ্য। এই জন্যই 'স্টেট অটনমি' বলিলেও পূর্ব–বাংলার দাবির সবটুকু বোঝা যাইত না। দুই, পূর্ব–বাংলার নিজের স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবিবার সময় পশ্চিম–পাকিস্তানের প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের কথা ভুলিয়া যায় নাই। তাদেরও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবিয়াছে। কি উপায়ে তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়, সে চিন্তাও পূর্ব–বাংলা করিয়াছে কতকটা নিজের স্বার্থেই। এটা ঘটিয়াছে এইরূপে : পশ্চিম–পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে ও থাকিতে পারে, পূর্ব–বাংলার সাথে তাদের তেমন সম্পর্ক নাই ও থাকিতে পারে না। সোজা কথায় পশ্চিম–পাকিস্তানের প্রদেশগুলি যে অর্থে পাকিস্তানের অংগরাজ্য বা প্রদেশ, পূর্ব–বাংলা সে অর্থে পাকিস্তানের অংগরাজ্য বা প্রদেশ নয়। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার দিন পূর্ব–বাংলাকে পশ্চিম অঞ্চলের চারটি প্রদেশের মতই একটি প্রদেশ বলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভৌগোলিক বাস্তবতার দিক হইতে পূর্ব–বাংলা একাই পশ্চিম অঞ্চলের চারটি প্রদেশ ও সবগুলি দেশীয় রাজ্যের যোগফলের সমান। পূর্ব–বাংলা একাই একটি অঞ্চল। তাকে পাকিস্তান ফেডারেশনের একটি স্টেট বলা যাইতে পারে। আর পশ্চিম–পাকিস্তানের সকল প্রদেশ মিলিয়া আরেকটি অঞ্চল। একে পাকিস্তান ফেডারেশনের আরেকটি স্টেট বলা যাইতে পারে। শাসনতন্ত্র রচনার সময় শাসনতান্ত্রিক বিধানে শাসন–ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক অধিকার বন্টনে এই দুই পৃথক আঞ্চলিক পার্থক্যের মাপকাঠিতেই বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এই বাস্তব–জ্ঞান হইতেই পূর্ব–বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা–নায়করা বরাবর এটাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বলিয়াছেন ; প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলেন নাই। স্পষ্টতঃই ও–দুই জিনিস এক বস্তু নয়।

লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তান প্রস্তাব এটা সর্বসজনস্বীকৃত। এই প্রস্তাবই পাকিস্তানের দুই উইংকে দুইটি 'রিজিওন' করিয়াছে। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নেতারা পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনকে 'রিজিওনাল অটনমি' বলিয়া থাকেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে লাহোর প্রস্তাবের মর্ম আলোচনা করা হইবে। তা হইতেই পাঠকরা বুঝিবেন, পূর্ব-পাকিস্তানের দাবিকে 'রিজিওনাল অটনমি' বলিয়া এ অঞ্চলের রাষ্ট্র নেতারা পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই দেখাইতেছেন।

ফেডারেশন ও ইউনিটসমূহের মধ্যে বিষয় বন্টনের মূলনীতি এই যে, যে সব বিষয়ে সকল ইউনিটের সত্ত্ব ও স্বার্থ এক বা 'কমন' এবং যে সব বিষয় ইজমালিতে পরিচালন করিলে ফলের দিকে বেশি ও খরচের দিকে কম হয়, সেইগুলিই ফেডারেশনের হাতে দেওয়া হয়। আর যেসব বিষয়ে সকল ইউনিটের সত্ত্ব ও স্বার্থ এক ও কমন নয়, যেগুলির ইজমালি পরিচালনে কোনও বিষয়ে সুবিধা নাই, সে সব বিষয়ই ইউনিটসমূহের যার-তার পরিচালনাধীনে রাখা হয়।

এর মধ্যে ব্যতিক্রম দুইটি। দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র। সুস্পষ্ট কারণেই এই দুইটি বিষয় সকল প্রকার ফেডারেশনেই ফেডারেল সরকারের হাতে রাখা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানী নেতারা তাদের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিতে বরাবর এই দুইটি বিষয়ই ফেডারেল সরকারের হাতে রাখিয়াছেন। তাছাড়া যদিও কারেন্সি ফেডারেল সরকারে রাখাটা বাধ্যতামূলক নয়, তথাপি প্যাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীকরূপে কারেন্সিও ফেডারেল সরকারের হাতে রাখা হইয়াছে। এইভাবেই ইতিহাস-বিখ্যাত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা রচিত হইয়াছিল। এটাই পূর্ব-বাংলার জাতীয় দাবি। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে শতকরা সাড়ে সাতানব্বইটি ভোট দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানীরা একুশ দফার দাবি সমর্থন করিয়াছে।

এই তিনটি বিষয় ছাড়া আর সব বিষয় ইউনিটের হাতে থাকিবে। পূর্ব-বাংলার বেলা সে একাই এই ইউনিট। এ দাবি পূর্ব-বাংলার অন্যায়ও নয় ; কেন্দ্রকে দুর্বল করার অভিপ্রায়ও এতে নাই। এর অতিরিক্ত আর কোনও বিষয়েই পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সত্ত্ব ও স্বার্থ এক ও কমন নয়। সাধারণতঃ যেসব বিষয় ফেডারেশনের হাতে থাকা উচিত এবং অন্যান্য ফেডারেশনে যেসব বিষয় কেন্দ্রের হাতে আছে তার মধ্যে যোগাযোগ, রেলওয়ে, ডাক ও তার, ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং, ইরিগেশন, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্ল্যানিং-এর নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ভৌগোলিক দ্বিধাবিভক্তির দরুন পাকিস্তানে এর একটাও কেন্দ্রীয় বিষয় হইতে পারে না। সুখের বিষয় ও আশার কথা এই যে খুব দেরিতে হইলেও পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতারা এটা

বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তিন বিষয়ের ফেডারেশন করিতে তাঁরা মোটামুটি রাযী হইয়াছেন। কোন-কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ কর ধার্যের ক্ষমতা লইয়া, যেটুকু বিরোধ ও মতভেদ আজও দেখা যায়, জাতীয় ঐক্যবোধ ও বাস্তব জ্ঞান লইয়া সকলে আলোচনায় বসিলে সে-সব বিষয়েও সমঝোতা হইয়া যাইবে।

পূর্ব-পাকিস্তানের এই দাবির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝিতে গেলে পাকিস্তানের বুনিয়াদ যে লাহোর প্রস্তাব সেটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। পরের অনুচ্ছেদে সে আলোচনাই করিতেছি।

৮. লাহোর প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাবের আরেক নাম পাকিস্তান প্রস্তাব। পাকিস্তান রাষ্ট্র এই প্রস্তাব হইতেই জন্ম ও রূপ লাভ করিয়াছে। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আমরা লাহোর প্রস্তাব পাশের জায়গাটিতে এক সুউচ্চ, সুরম্য 'পাকিস্তান মিনার' নির্মাণ করিয়াছি।

কিন্তু বিস্ময়কর মজার কথা এই যে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার কাজে লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলে আমরা অনেকেই চটিয়া যাই। মুসলিম-মেজরিটির দেশে বাস করিয়া যাঁরা ইসলামের নাম শুনিলেই চটিয়া যান, তাঁরা নিশ্চিয়ই নিন্দার্হ। কিন্তু পাকিস্তানের নাগরিক হইয়া যাঁরা পাকিস্তান প্রস্তাবের নাম শুনিলে চটিয়া যান, তাঁরা কি নিন্দার্হ নন ? অথচ তাই ঘটিতেছে। লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই আমাদের রাষ্ট্র-নেতাদের অনেকেই তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন। এর হেতু কি ? একদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নেতাদের অনেকেই শাসনতন্ত্র রচনার কথা বলিতে গিয়া লাহোর প্রস্তাবের নাম উল্লেখ করেন। অপরদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতা লাহোর প্রস্তাবের নামোল্লেখ সহ্য করিতে পারেন না।

পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদের এই লাহোর-প্রস্তাব-বিরোধী মনোভাবের মূল কারণ মাত্র একটি। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম মন্ডলে (যোনে) দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলা হইয়াছে। এই কারণে পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদের অধিকাংশের মনে লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে একটা কমপ্লেক্স একটা ফোবিয়া আছে। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে লাহোর প্রস্তাবের নাম উঠিলেই ওঁরা মনে করেন যে পূর্ব-পাকিস্তানীরা বুঝি দুই স্বাধীন পাকিস্তানের কথা বলিতেছে।

ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। পূর্ব-পাকিস্তানের কোনও পার্টি বা নেতা এক পাকিস্তান ভাংগিয়া দুইটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িবার কল্পনাও করেন না। লাহোর প্রস্তাবে 'স্টেটস' শব্দ থাকা সত্ত্বেও কায়েদে-আযমের নেতৃত্বে উভয় অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ জানিয়া
৩২—

বুঝিয়াই এক পাকিস্তান কায়েম করিয়াছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিচারে একটা অভিনব এক্সপেরিমেন্ট। আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব এই অভিনবত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াই এই এক্সপেরিমেন্টে হাত দিয়াছেন। এই অভিনব এক্সপেরিমেন্টকে সফল করিতে আমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আমাদের পথে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক যত বাধাই থাকুক, রাজনৈতিক দূরদর্শী মনীষার দ্বারা সে-সব বাধা আমরা অতিক্রম করিবই। এক অখন্ড নেশন-স্টেট হিসাবে পাকিস্তানকে আমরা সফল ও চিরস্থায়ী করিবই। কোন বিঘ্নকেই আমাদের জাতীয় সংকল্প ব্যর্থ করিতে দিব না যদি পশ্চিমা ভাইএরা ব্যর্থ না করেন।

তবু আমরা পূর্ব-পাকিস্তানীরা শাসনতন্ত্রের কথা বলিতেই লাহোর প্রস্তাবের নাম করি কেন ! উত্তর অতি সোজা। এই প্রস্তাবটিই পাকিস্তান-সৌধের স্টিল ফ্রেম। লাহোর প্রস্তাবে দুই উইং-এ দুই স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন ছাড়াও আরও কথা আছে। রাষ্ট্রের রূপরেখা সম্পর্কে তাতে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান নির্দেশ আছে। কিন্তু পশ্চিমা ভাইএরা তা পড়িয়া দেখিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করেন না বলিয়াই মনে হয়। কারণ পড়িবার তাঁদের দরকার নাই। বিনা-লাভে মানুষ কিছু করেও না, পড়েও না। পশ্চিমা ভাইএরা পাকিস্তান পাইয়াছেন। পাকিস্তানের রাজধানী পাইয়াছেন। সরকার পাইয়াছেন। সরকারী সব চাকরি পাইয়াছেন। দেশরক্ষা বাহিনীর, সুপ্রিম কোর্টের, স্টেট ব্যাংকের, ন্যাশনাল ব্যাংকের, সব ইনশিওরেন্স কোম্পানীর, পি. আই. এ. ইত্যাদির সদর দফতর পাইয়াছেন। বিদেশী মিশন পাইয়াছেন। সবই তাঁদের। একটার ঠাঁই তিনটা রাজধানী ভাংগা-গড়ার কন্ট্রাকদারি তাঁরাই করিয়া থাকেন। সরকারী-বেসরকারী সব খরচা সেখানেই। অতএব আল্লার ফজলে তাঁরা সুখেই আছেন। সুখে থাকিলে মানুষ গরিব আত্মীয়ের কথা ভাবে না। কাজেই পূর্ব-পাকিস্তানীরা কেমন আছে, কি চায়, কি খায়, সে-সব কথা ভাবিবার অত সুখে তাঁদের সময় কই ? কেউ স্মরণ করাইয়া দিলেও উৎপাত মনে করেন। গরিব শরিক অংশ চাহিলে মুতাওল্লীরা 'ওয়াক্ফ আল্লার সম্পত্তি' ও 'মুসলমান ভাই-ভাই' বলেন। ওয়ারিসী আইনের কথা ওয়াক্ফনামার কথা তাঁরা ভাবিতে যাইবেন কেন ? বরঞ্চ তাঁরা মনে করেন, ওসব না থাকিলেই ভাল হইত।

সারা দুনিয়াই আল্লার। পাকিস্তানও আল্লার। আমাদের বাতিল দুইটা শাসনতন্ত্রেই একথা বলা হইয়াছে। আয়েন্দাতেও বলা হইবে। সেই হিসাবে পাকিস্তান ওয়াক্ফ সম্পত্তি ঠিকই। তা যদি হয় তবে লাহোর প্রস্তাবই এই ওয়াক্ফের তৌলিয়তনামা। এই তৌলিয়তনামার তৃতীয় দফাটিই আমাদের বিবেচ্য। এই দফায় তিনটি প্যারা। প্রথম প্যারায় দুইটি বিধান। একটি বিধানে 'স্টেটস্ বা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলা

হইয়াছে। একাধিকের স্থলে এক পাকিস্তান করিয়া আমরা বরাবরের জন্য সে তর্কের মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছি। দ্বিতীয় বিধানে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বর্ণনা করা হইয়াছে, এক পাকিস্তান করায় সেই রূপরেখার কি কি পরিবর্তন স্বতঃই ঘটিয়াছে, তা আমাদের বিচার করা দরকার। এই প্রস্তাবে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এক, 'যোন' বা মন্ডল ; দুই, রিজিওন' বা অঞ্চল ; তিন, 'ইউনিট' বা প্রদেশ। বলা হইয়াছে, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দুই যোন বা মন্ডলের মুসলিম মেজরিটি এলাকাগুলির সীমাসরহদ্দ প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করিয়া 'রিজিওন' গঠিত হইবে। রিজিওনগুলির অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলো 'সভারেন' ও 'অটনমাস' হইবে। মূল প্রস্তাবে 'রিজিওন' বা অঞ্চলগুলিতে স্বাধীন-স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার কথা। পরবর্তী ব্যবস্থায় যখন দুই রিজিওন মিলিয়া এক স্বাধীন রাষ্ট্র হইল, তখন স্বভাবতঃই এবং স্বতঃই রিজিওন বা অঞ্চল দুইটিই পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'কনস্টিটিউয়েন্ট ইউনিটের' স্থান দখল করিল। 'ইউনিটের' বর্ণিত অধিকার দুইটি 'সভারেইনটি' এবং 'অটনমি'ও স্বতঃই 'রিজিওনের' উপর বর্তাইল। 'রিজিওন' গঠনের বেলা তাদের প্রচলিত সীমা-সরহদ্দের পরিবর্তন হইতে পারে লাহোর প্রস্তাবে তা অনুমান করা হইয়াছিল। সে পুনর্বিন্যাস এমন সাংঘাতিক হইবে, তা মুসাবিদাকারীরা নিশ্চয়ই ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুনর্বিন্যাসের অনুমানটা তাঁদের ঠিকই হইয়াছে। পূর্বের 'রিজিওন' পুনর্বিন্যস্ত সীমার বাংলা-আসাম লইয়া হইবে, এটা তাঁরা অনুমান করিয়াছিলেন। কার্যতঃ তাই হইয়াছে। বাংলার অংশ ও আসামের অংশ লইয়া পুনর্বিন্যস্ত সীমার মধ্যে পূর্ব রিজিওন গঠিত হইয়াছে। ঠিক, তেমনি বিভক্ত পাঞ্জাব ও গোটা অন্য তিনটি প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া পশ্চিম রিজিওন গঠিত হইয়াছে।

অতএব দেখা গেল, লাহোর প্রস্তাবই দুই যোনে দুইটি রিজিওন সৃষ্টি করিয়াছে। লাহোর প্রস্তাবই দুই রিজিওনকে 'অটনমাস' ও 'সভারেন' ইউনিট করিয়াছে। লাহোর প্রস্তাবের বলেই আমাদের অটনমির নাম রিজিওনাল অটনমি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন; প্রভিনশিয়াল অটনমি বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নয়। লাহোর প্রস্তাবের 'সভারেনটি' কথাটাই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ফেডারেশন করিয়াছে। অন্য কিছুতেই নয়। রাজধানীসহ সবগুলি কেন্দ্রীয় সংস্থা। ঘরের দরজায় পাইয়া পশ্চিমা নেতারা 'স্ট্রংসেন্টারের' নামে ইউনিটরি স্টেট করিতে চান। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নামে এক রিজিওনকে অন্য রিজিওনের প্রদেশ করিতে চান। এ অবস্থায় লাহোর প্রস্তাবই ফেডারেল পাকিস্তান ও অটনমাস রিজিওনের একমাত্র রক্ষাকবচ। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই জানেন, ফেডারেশনে সভারেনটি থাকে ফেডারেটিং ইউনিট বা অংগ-রাজ্যগুলিতেই। রাজধানীর অবস্থিতি বৈগুণ্যে পূর্ব-বাংলার হক-সনদ লাহোর প্রস্তাব। রাজধানী এপারে

আসিলে এটাই হইবে পশ্চিম-পাকিস্তানের হক-সনদ। খোদ পশ্চিম-পাকিস্তানের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে লাহোর প্রস্তাবের উপর। পশ্চিমা ভাইদের বিবেচনার জন্য এই কথাটাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিব।

সকলেরই স্মরণ আছে যে ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বলে পাকিস্তান স্থাপিত হইয়াছে। এই আইনের তিন ধারার ২ উপধারা মতে রেফারেণ্ডামের মাধ্যমে আসামের সিলেট জিলা 'পূর্ব-বাংলার' অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে উক্ত আইনের ১৯ ধারায় ৩ উপধারা মতে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 'পাকিস্তানের' অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয় নাই। এ কথার তাৎপর্য এই যে সীমান্ত প্রদেশের উপর পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলির যে দাবি, পূর্ব-বাংলার দাবিও অবিকল তাই। তার মানে সীমান্ত প্রদেশের উপর পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলির কোনও বিশেষ অধিকার নাই। পূর্ব-বাংলার মোকাবিলায় সীমান্ত প্রদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ বলা বেআইনী ও শাসনতন্ত্র-বিরোধী হইবে। এ অবস্থায় পূর্ব-বাংলার সাথে প্যারিটির পাল্লা দিবার উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রদেশকে পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে ওয়ান ইউনিট করা হইয়াছিল, তা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ বে-আইনী ও যবরদস্তিমূলক হইয়াছিল। লাহোর প্রস্তাবই পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশকে এই অবৈধতা হইতে বাঁচাইয়াছে। লাহোর প্রস্তাবই পশ্চিম যোনের সমস্ত প্রদেশগুলির সমন্বয়ে একটি মাত্র রিজিওন করিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে যে কথা, পশ্চিম যোনের দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ২ ধারার ৪ উপধারায় দেশীয় রাজ্যগুলি কে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রদ্বয়ের যেকোন একটিতে সংযোজিত হইবার অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সেই ধারা-বলে উত্তর-পশ্চিম যোনের দেশীয় রাজ্যগুলি 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রে সংযুক্ত হইয়াছিল। কোনও একটি যোনের বা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

কাজেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে গোটা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বদলে খাস করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের অংশ দাবি করিতে গেলে লাহোর প্রস্তাবের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। অতএব, 'স্টেটস্' শব্দের 'এস্' হরফ বাদ দিয়া হিসাব করিলে লাহোর প্রস্তাব পূর্ব-পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানের স্বার্থের জন্যই বেশি দরকার।

সুতরাং দেখা গেল, লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ সাল ও ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্য যেমন সত্য ছিল, আজ ১৯৭০ সালেও তেমনি সত্য আছে। লাহোর প্রস্তাব সত্য-সত্যই পাকিস্তান রাষ্টীয় সৌধের ইস্পাতের কাঠাম। এ কাঠাম ভাংগিলে কারও রক্ষা নাই।

৯. পশ্চিম পাকিস্তানে ওয়ান ইউনিট

পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পশ্চিম-পাকিস্তানের ইউনিটির উপর নির্ভরশীল, একথা আজ সবাই বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের দাবি-মোতাবেক কেন্দ্রকে তিন সাবজেক্ট দিয়া অবশিষ্ট সব সাবজেক্ট পশ্চিমাঞ্চলের কোনও প্রদেশই একা বা স্বতন্ত্রভাবে নিতে পারে না। সেজন্য তাদের একটি যোনাল সাব-ফেডারেশন করিতেই হইবে। কিন্তু পনর বছরের ওয়ান ইউনিটের তিক্ত অভিজ্ঞতায় মাইনরিটি প্রদেশগুলি পাঞ্জাবের সাথে কোনও ঐক্য করিতেই রাযী না। চুন খাইয়া তাদের মুখ পুড়িয়াছে। দই দেখিয়াও তাদের ভয় হইতেছে। তাই তারা সাব-ফেডারেশনের বদলে নিখিল-পশ্চিম-পাকিস্তানী বিষয়গুলির জন্য ওয়াপদা পি.আই.ডি.সি. ইত্যাদির মত অটনমাস বডি স্থাপনের কথা ভাবিতেছেন।

কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই প্রদেশসমূহের নেতারা বুঝিতে পারিবেন, ঐ ব্যবস্থা কোনও সমাধান নয়। প্রথমতঃ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকেও কোনও-না কোন প্রদেশ বা কেন্দ্রের হাতে থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসনের স্থলে আমলাতান্ত্রিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া সাবেক প্রদেশগুলি পুনর্বহাল করিলেও রেল, পি.আই.ডি.সি. ওয়াপদা, সিক্ ইত্যাদি বিষয়গুলি কোনও প্রদেশকে না দিয়া নিজ হাতে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিয়াছেন। প্রকারান্তরে এতদিনের প্রাদেশিক বিষয়গুলি এখন কেন্দ্রীয় বিষয় হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তন আনিতে হইলে যোনাল সাব-ফেডারেশনই একমাত্র সমাধান।

১৯৫৪ সালে বড়লাটের অর্ডিন্যান্সে যে ইউনিট করা হইয়াছিল এবং যা ১৯৫৫ সালের পশ্চিম-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আইনে বলবৎ করা হইয়াছিল, তেমন ইউনিট আর হইবে না। মাইনরিটি প্রদেশসমূহ তা মানিবেও না। কিন্তু উপরোক্ত কারণে বিভিন্ন প্রদেশের স্বার্থেই তাদের সমন্বয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থা হওয়া অত্যাবশ্যক।

পশ্চিমাঞ্চলের সকল প্রদেশের সমন্বয়ে একটি মাত্র সাব-ফেডারেশন করা অত্যাবশ্যক আরও কতকগুলি কারণে। সংক্ষেপে সে কারণগুলির দিকেও আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মত পূর্ব-বাংলার স্বার্থের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এই কারণগুলির সাথে নাই। এগুলি বিশেষ করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানেরই স্বার্থের কথা। পশ্চিম-পাকিস্তানের স্বার্থও গোটা পাকিস্তানেরই স্বার্থ এই হিসাবে এসবে পূর্ব-পাকিস্তানেরও স্বার্থ রহিয়াছে নিশ্চয়ই।

(১) পশ্চিমাঞ্চলের দেশীয় রাজ্যসমূহ পশ্চিম–পাকিস্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কোনও বিশেষ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। সকলেরই স্মরণ আছে, ১৯৫৪ সালের ২২শে নবেম্বর তারিখে পাকিস্তান সরকার পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলি প্রদেশের সমবায়ে পশ্চিম–পাকিস্তান প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৪শে নবেম্বর সীমান্ত প্রদেশের আইন পরিষদ, ৩০শে নবেম্বর পশ্চিম–পাঞ্জাব আইন পরিষদ ও ১১ই ডিসেম্বর সিন্ধু আইন পরিষদ ঐ এক ইউনিট গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর ১৪ই ডিসেম্বর বেলুচিস্তান, বাহওয়ালপুর, খায়েরপুর ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ যাঁর–তাঁর রাজ্যের পক্ষ হইতে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া ঐসব রাজ্যকে পশ্চিম–পাকিস্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিতে সম্মত হন। এই চুক্তির বলে ঐসব দেশীয় রাজ্যকে এক ইউনিটের শামিল করিয়া ১৯৫৫ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে গণ–পরিষদে পশ্চিম–পাকিস্তান প্রদেশ প্রতিষ্ঠা নামে একটি বিল পেশ করা হয়। ঐ বিল ৩০শে সেপ্টেম্বর পাশ হয়। ৩রা অক্টোবর উহা বড়লাটের অনুমোদন লইয়া পাকিস্তান গেযেটে প্রকাশিত হয়।

এতে দেখা গেল যে পশ্চিম–পাকিস্তানের সবগুলি দেশীয় রাজ্য পশ্চিম–পাকিস্তানে ওয়ান ইউনিট গঠনের পর পাকিস্তান সরকারের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া পশ্চিম–পাকিস্তান প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। এখন ওয়ান ইউনিট ভাংগিবার পর অন্যান্য প্রদেশের মতই তারাও আইনতঃ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে। অতঃপর তারা ইচ্ছা করিলে নিজ–নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষাও করিতে পারে। অথবা তাদের ইচ্ছামত ও পছন্দমত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাথে সংযুক্ত হইতে পারে। যাই করুক, নূতন চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া নূতন–নূতন আইন করিতে হইবে। এতে সমস্যা ও জটিলতা বাড়িবে। অথচ যদি সাব–ফেডারেশনরূপে পশ্চিম–পাকিস্তান ইউনিট বজায় থাকে তবে পূর্ব চুক্তি মোতাবেক তারা এক ইউনিটের শামিল থাকিয়া যাইবে। নতুন জটিলতা বা সমস্যার সৃষ্টি হইবে না।

(২) ফেডারেল রাজধানী করাচি হইতে পিণ্ডি স্থানান্তরিত করার পর করাচি শহরকে পশ্চিম–পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কোনও একটি প্রদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয় নাই। এক ইউনিট ভাংগার পর করাচির অধিকার লইয়া তর্ক উঠিয়াছে। যদিও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর সর্বশেষ ঘোষণায় করাচিকে সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তবু এটাকে চূড়ান্ত মীমাংসা বলা যায় না। ফেডারেল ক্যাপিটালকে কায়েদে–আযমের অভিপ্রায়মত করাচিতে ফিরাইয়া আনিবার দাবির কথাও বাদ দেওয়া সহজ নয়। তেমনি করাচির উপর সারা পশ্চিম–পাকিস্তানের দাবিও তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। তাঁর উপর আছে করাচির স্বতন্ত্র একটি

প্রদেশ হইবার দাবি। এ দাবিও কম জোরদার নয়। এসবই জটিল ও সমস্যা-সংকুল প্রশ্ন। পশ্চিম-পাকিস্তানকে যোনাল ফেডারেশনের আকারে বজায় রাখিতে পারিলে এসব জটিলতার উদ্ভব হইবে না।

(৩) পশ্চিম-পাকিস্তানের ইউনিটি ভাংগিয়া প্রদেশগুলিকে পূর্বাবস্থায় বহাল করিবার পর যার-তার পূর্ব নাম গ্রহণ করিবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সর্বশেষ ঘোষণায় যার-তার পূর্ব নাম বহাল হইয়াও গিয়াছে। যোনাল ফেডারেশনের দ্বারা সে নাম বজায় না রাখিলে 'পশ্চিম-পাকিস্তান' নামে কোন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সংস্থা আর থাকিবে না। সে অবস্থায় পূর্ব-বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তান বলিবার কোনও যুক্তিসংগতি থাকিবে না। সে পরিস্থিতি ঘটিলে পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান নামের দুইটি অঞ্চলের যুক্তনাম যে 'পাকিস্তান' আছে, সে অবস্থাও আর থাকিবে না।

এই তিন নম্বর দফাটির আরেকটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব রহিয়াছে। যদি অবস্থা-গতিকে পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক নামধারী দুইটি ইউনিট নাও থাকে, তবু পাকিস্তানের ভৌগোলিক আকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দিক-নির্দেশক পরিচিতি হিসাবে পূর্বাঞ্চলীয় পাকিস্তান, ইংরাজীতে ইস্টার্ণ পাকিস্তান ও পশ্চিমাঞ্চলীয় পাকিস্তান, ইংরাজীতে ওয়েস্টার্ণ পাকিস্তান, বলিতেই হইবে। এতে অচিন্তনীয় ও অভিনব ধরনের বিভ্রান্তি ও জটিলতা দেখা দিতে পারে।

এই সম্পর্কে ইস্ট পাকিস্তান বা পূর্ব-পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান বা পশ্চিম-পাকিস্তান এই দুইটি শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-নামের প্রয়োজনীয়তার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আর একবার আকর্ষণ করিতেছি। পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার বেলা লাহোর প্রস্তাবের কথা বলেন। পক্ষান্তরে পশ্চিম-পাকিস্তানী অনেক নেতা লাহোর প্রস্তাবের নামে চটিয়া যান। তাঁরা ভুলিয়া যান লাহোর প্রস্তাবের 'স্টেটস' শব্দটার 'এস' বাদ দিয়া দুইটার বদলে এক পাকিস্তান করিয়াছি বটে, কিন্তু ভৌগোলিক দুই খণ্ডকে এক খণ্ড করিতে পারি নাই। তাঁরা ভুলিয়া যান লাহোর প্রস্তাবের 'এস'টাই শুধু কার্যতঃ বাদ গিয়াছে; আর সবই ঠিক আছে। এ অবস্থায় পশ্চিমের খণ্ডও পাকিস্তান, পূর্বের খণ্ডও পাকিস্তান। ভূগোলের বিচারে পাকিস্তান দুইটা। মাত্র এক খণ্ডই পাকিস্তান, অপর খণ্ড তার প্রদেশ বা উপনিবেশ, অবস্থা তা নয়। অবস্থাগতিকে পশ্চিমের অনেক নেতাই তা বুঝেন না। ভিন্ন রাষ্ট্রের দ্বারা বিযুক্ত দুই খণ্ডে বিভক্ত রাষ্ট্র পাকিস্তানের মত আর একটিও নাই, এই যুক্তির জবাবে এক পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতা বলিয়াছেন ঃ 'কেন থাকিবে না? যুক্তরাষ্ট্র ও আলাস্কাও ত কানাডার দ্বারা বিযুক্ত।' 'যদি আরও কোনও পশ্চিমা নেতা

আমেরিকা–আলাস্কা দিয়া দুই পাকিস্তানের সম্পর্ক বিচার করেন, তবে সেটা পাকিস্তানের জন্য সত্যই চিন্তার কথা।

পশ্চিম–পাকিস্তানের যোনাল ফেডারেশন হওয়ার পক্ষে আরও একটা বড় যুক্তি আছে। সে যুক্তি এই যে ফেডারেল ভিত্তি ছাড়া আর কোনও উপায়েই পশ্চিম–পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। কারণ পশ্চিম–পাকিস্তানের প্রদেশগুলির জনসংখ্যার অবস্থা এই যে পাঞ্জাব একাই পশ্চিম–পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০ জন লোকের অধিবাস। আর তিন প্রদেশ একত্রে মিলিয়া মাত্র শতকরা ৪০ জনের অধিবাস। এ অবস্থায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংযুক্ত পশ্চিম–পাকিস্তানের আইন পরিষদ গঠিত হইলে তাতে পাঞ্জাবের নিরংকুশ একাধিপত্য হইবে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই ওয়ান ইউনিট গঠনের সময় পাঞ্জাব দশ বছরের জন্য তার মেজরিটি কোরবানি করিয়া মাইনরিটি হইয়াছিল। পাঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৪০। আর মাইনরিটি প্রদেশগুলির ছিল ৬০। মাইনরিটি প্রদেশগুলিকে প্রলুব্ধ করা ছাড়া এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর কোনও যুক্তি ছিল না। পাঞ্জাবের এত বড় ত্যাগে কৃতজ্ঞ না হইয়া মাইনরিটি প্রদেশগুলি বরঞ্চ সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। তাই ওয়ান ইউনিট টিকে নাই। যদি গোড়া হইতেই ওয়ান ইউনিট ফেডারেল ভিত্তিক হইত তবে উহা টিকিত। ভবিষ্যতে উহা করিলেও টিকিবে। ওটা যখন হইবে একটা ফেডারেশন, তখন ওতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিত্ব হইবে কেন ? ফেডারেশনের প্রচলিত ও সর্বসম্মত নীতি অনুসারে যোনাল ফেডারেশনের আইন–পরিষদ হইবে বিভিন্ন প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া। সেখানে জনসংখ্যার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। জনসংখ্যা নির্বিশেষে সকল প্রদেশের সমান প্রতিনিধি লইয়া যোনাল ফেডারেশনের আইন–পরিষদ গঠিত হইলে কোনও প্রদেশই তাতে আপত্তি করিবে না বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব পশ্চিমাঞ্চলের ঐক্যের খাতিরে জন–সংখ্যায় বিপুল মেজরিটি হইয়াও পাঞ্জাব এই প্যারিটি ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব মানিয়া লইবে, এটা আশা করা যায়। এই সাবফেডারেশনের নাম হইবে স্টেট–অব ওয়েস্ট পাকিস্তান। পশ্চিম–পাকিস্তান নেতাদের সকলের, বিশেষতঃ পাঞ্জাবী নেতাদের, স্মরণ রাখা উচিত যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যদি পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে দুইটা স্বতন্ত্র পাকিস্তান হইত তবে তারাও হইত দুইটি ফেডারেশন।

কিম্বা ডাঃ ইকবাল বা চৌধুরী রহমত আলীর প্রস্তাবমত যদি পাকিস্তান শুধু পশ্চিম ভারতেই হইত তবু সেটা হইত স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশসমূহের সমন্বয়ের ফেডারেশন। কন্স্টিটিউয়েন্ট ইউনিটগুলি হইত অটনমাস ও সভারেন। দুই এর বদলে এক পাকিস্তান হওয়ায় দুই কোণে দুই স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হইয়াছে। পূর্ব–

পাকিস্তানকে এক করিয়াছে ভূগোল। পশ্চিম–পাকিস্তানকে এক করিতে পারে লাহোর প্রস্তাব। কাজেই পশ্চিমা ভাইএরা লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যে আঁতকিয়া উঠেন, এটা তাঁদের আহ্মকি।

পক্ষান্তরে মাইনরিটি প্রদেশের অনেকের আশংকা যোনাল ফেডারেশন হইলে প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের কোনও বিষয়ই থাকিবে না। এটা তাঁদের ভুল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলি ছিল স্বায়ত্তশাসিত। সাব–ফেডারেশন হওয়ার পরেও '৩৫ সালের প্রাদেশিক তালিকার বিষয়গুলি তাদের ত থাকিবেই, আরও কিছু বেশিও থাকিতে পারে। এই প্রসংগে বিষয়গুলির বিচার করা যাক।

১৯৩৫ সালের আইনে ফেডারেল তালিকায় ছিল ৫৯টি, কন্‌কারেন্ট তালিকায় ৩৬টি ও প্রাদেশিক তালিকায় ৫৪টি। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ফেডারেল তালিকায় ছিল ৩০টি, কন্‌কারেন্ট তালিকায় ১৯টি ও প্রাদেশিক তালিকায় ৯৪টি। আইউবী শাসনতন্ত্রে শুধু ফেডারেল তালিকায় ছিল ৪৯টি। বাকি সবই ছিল প্রাদেশিক। এই তিনটি শাসনতন্ত্রের তালিকা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মোট বিষয়ের সংখ্যা মোটামুটি ১৫০। এর মধ্যে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রেই সবচেয়ে কম সংখ্যা ৩০ কেন্দ্রে রাখিয়াছে। আমাদের নয়া শাসনতন্ত্র হইবে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক। তাতে সর্বসম্মত তিনটি বিষয়ের সাথে প্রয়োজনীয় আরও তিন–চারটি যোগ করিলেও সাতটির বেশি ফেডারেল বিষয় হইবে না। বাকি ১৪৩টি বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশিসংখ্যক প্রাদেশিক বিষয় যে '৫৬ সালের ৯৪টি, তাই প্রদেশগুলিকে দিলেও সাব–ফেডারেশনের ভাগে পড়িবে ৪৯টি। এর সাথে আরেকটি বিষয় সাব–ফেডারেশন তালিকায় আসিবে। সেটি সাব–ফেডারেশনের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। এটি হইবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রাদেশিক হাইকোর্টের আপিল আদালত।

সে অবস্থায় নিখিল–পাকিস্তান ফেডারেশনের সর্বোচ্চ আদালতের নাম হইবে ফেডারেল কোর্ট। এই অঞ্চলের দুইটি সুপ্রিম কোর্ট হইতে আপিল আসিবে পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে। তাছাড়া এটি হইবে শাসনতান্ত্রিক আদালত।

অতএব দেখা গেল যে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন–ভিত্তিক পাকিস্তান ফেডারেশনের স্বার্থে পশ্চিম–পাকিস্তানে একটি যোনাল ফেডারেশন হওয়া অপরিহার্য এবং প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিয়াও সেটা করা সম্ভব।

বলা যাইতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানে যোনাল ফেডারেশন না করিয়াও ত পূর্ব–বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি পূরণ করা যায়। তা যদি হয়, তবে পশ্চিমে যোনাল

ফেডারেশন হইল কি হইল না, তা লইয়া পূর্ব-বাংগালীদের মাথা ব্যথা কেন? হাঁ, এটা একটা অল্টারনেটিভ বটে। দুই উইং-এ 'প্রদেশ' থাকিল পাঁচটাই। কিন্তু পূর্ব-বাংলা 'প্রদেশ'কে পশ্চিমা প্রদেশগুলির চেয়ে অনেক বেশি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইল। এতে কি আপত্তি আছে ? আপত্তি দুইটা। এক, পূর্ব-বাংলার গ্রহণযোগ্য-মাফিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইলে সেটা নামে প্রাদেশিক হইলেও কাজে আঞ্চলিক হইতে হইবে। পূর্ব-বাংলার দাবিমত সেটা ফেডারেল তিনটি বিষয় ছাড়া আর সব। দুই, এইভাবে দুই অঞ্চলের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণে এত পার্থক্য থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, রাজস্ব, বাজেট ও কেন্দ্র-প্রদেশের সম্পর্কে এত জটিলতা দেখা দিবে যে তাতে পাকিস্তানের ঐক্য ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে বেশি দিন লাগিবে না। নেতারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

১০. প্যারিটি বনাম জন-সংখ্যা

আগেই বলিয়াছি, পশ্চিম-পাকিস্তানে ওয়ান ইউনিটের বিরুদ্ধে যেরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, পূর্ব-পাকিস্তানে প্যারিটির বিরুদ্ধে তেমন কোনও আন্দোলন ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানের জনপ্রিয় পার্টিসমূহের কোন একটিরও মেনিফেস্টোতে প্যারিটি-বিরোধী কোনও দফা ছিল না। আজও নাই। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যা-গুরুত্ব কাটিয়া যেদিন বড়লাটের অর্ডিন্যান্স-বলে প্রতিনিধিত্বে দুই অঞ্চলের মধ্যে প্যারিটি প্রবর্তিত হয়, সে দিন পূর্ব-বাংলার জনমত ত দূরের কথা আইন-পরিষদের মতও নেওয়া হয় নাই।

তবু শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসন, যুক্ত-নির্বাচন, বাংলা রাষ্ট্রভাষা ও কেন্দ্রীয় সর্ব-ব্যাপারে প্যারিটির স্বীকৃতির বিনিময়ে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি পূর্ব-বাংলা মানিয়া লইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত লাহোর-প্রস্তাব-ভিত্তিক দুই অঞ্চলের পূর্ণ অটনমি ও সমতার অন্যতম নিদর্শন হিসাবে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটিকে নীতি হিসাবেই মানিয়া নেওয়া হইয়াছিল। প্যারিটি চলিত থাকার দশ বছরের মধ্যে কেন্দ্রের দ্বারা পূর্ব-বাংলার উপর অত-সব অন্যায় অবিচারের মধ্যেও পূর্ব-পাকিস্তানীরা শুধু পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও চাকরি-বাকরিসহ সকল ব্যাপারে সমান অধিকারই দাবি করিয়াছে। কোনও নেতা বা পার্টিই প্রতিনিধিত্বে সংখ্যাগুরুত্ব দাবি করেন নাই।

প্যারিটি যদি শুধু পূর্ব-পাকিস্তানীদের মেজরিটি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই করা হয়, তবে স্পষ্টতঃই তাতে কেউ রাযী হইতে পারেন না। পাকিস্তানের রাজধানীসহ কেন্দ্রীয় সমস্ত শক্তি ও অর্থ-সংস্থাই পশ্চিম-পাকিস্তানে অবস্থিত। এ অবস্থায় জন-

সংখ্যাই পূর্ব পাকিস্তানের একটিমাত্র শক্তি। পাকিস্তানের বয়সের তেইশটি বছরে পূর্ব-পাকিস্তান তার এই সংখ্যা শক্তি নিজের কাজে লাগায় নাই। গোটা পাকিস্তানের নামে কার্যতঃ পশ্চিম-পাকিস্তানের খেদমতেই লাগাইয়াছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতারা তার বদলা দিবেন দূরের কথা, কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ সেসেশনের এলযাম লাগাইয়াছেন। তথাপি যদি পাকিস্তানের স্বার্থে পুনরায় প্যারিটি প্রবর্তনের দরকার হয়, তবে পূর্ব-পাকিস্তানীরা তা মানিতে আবার রাযী হইবে। কিন্তু সে 'পাকিস্তানের স্বার্থ' মানে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থও বুঝিতে হইবে। এই দিক হইতে বিষয়টার বিচার করা যাউক।

পাকিস্তানের স্থায়িত্বের সবচেয়ে গ্যারান্টি দুই অঞ্চলের জনগণের সমান শরিকানার মনোভাব। যেদিন উভয় অঞ্চলের জনগণের প্রত্যেকে অনুভব করিবে ঃ 'পাকিস্তান আমার সম্পদ ; ওতে আমাদের সমান অধিকার', সেইদিনই রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান এবং জাতি হিসাবে পাকিস্তানীরা অক্ষয় হইয়া যাইবে। গত তেইশ বৎসরে আমরা এই মনোভাবটিই সৃষ্টি করিতে পারি নাই। সৃষ্টি হইতে দেই নাই বলিলেই ঠিক কথা বলা হইবে।

আমাদের ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা-কৃষ্টি, গোষ্ঠী ও ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্যের দরুন আমাদের জাতীয় ঐক্য-বোধ সহজাত নয়। আমাদের নেশনহুড আপ্রায়রি নয়। এটা ইতিহাসের ওয়ারিসি নয়। আমরা আগেই রাষ্ট্র গড়িয়াছি। পরে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা গড়িতেছি। এটা আমাদের তৈয়ার করিয়া নিতে হইবে। সেজন্য আমাদের মধ্যে একটা সার্বিক ও সার্বজনীন 'আমরা' চৈতন্য ও 'আমাদের' বোধ সৃষ্টি করিতে হইবে। তার প্রথম পদক্ষেপ হইবে আমাদের দুই উইং-এর মধ্যে সাম্য ও সমতার নিশ্চিত, নিরাপদ ও অপরিবর্তনীয় অনুভূতি। উর্দু ও বাংলাকে সমান মর্যাদার দুইটি রাষ্ট্রভাষা করিয়া আমরা এই সমতাবোধ সৃষ্টির চমৎকার শুভ সূচনা করিয়াছি। এই সমতা-বোধকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করিতে হইলে আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে দুই উইং-এর জনগণকে সমান অধিকারী ও ক্ষমতাবান হইতে হইবে। এটা হইতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনে, দেশরক্ষায়, পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নে, এক কথায়, রাষ্ট্র-শাসনের সামগ্রিকতায়, দুই অঞ্চলের সমতা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত করিয়া। এ সুস্পষ্টতা ও নিশ্চয়তা দিতে পারে শুধু শাসনতান্ত্রিক বিধান।

শাসনতান্ত্রিক বিধান ছাড়াই কতকগুলি কনভেনশন গড়িয়া উঠিতেছিল। পার্লামেন্টারি পদ্ধতি ব্যাহত না হইলে আরও হইত। যথা ঃ প্রেসিডেন্ট ও প্রাইম মিনিস্টার পর্যায়ক্রমে দুই উইং হইতে হওয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দুই উইং হইতে

সমান সংখ্যক মন্ত্রী নেওয়া ইত্যাদি কনভেনশন গড়িয়াই উঠিয়াছিল। তবু শাসনতান্ত্রিক বিধানের দ্বারা এইগুলি এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার ও ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার অপর উইং হইতে লইবার নিশ্চিত ও তর্কাতীত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় চাকরি-বাকরিতেও তেমনি করা যাইতে পারে। করা উচিতও।

কিন্তু তাতেই আমাদের সমস্যা মিটিবে না। এ সবের সাথে দুই উইং-এর মধ্যে আর্থিক বন্টনে সমতাও আনিতে হইবে। পাকিস্তানের রাজধানীসহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা ও বিদেশী মিশনাদি পশ্চিম-পাকিস্তানে অবস্থিত। দুই অঞ্চলের মধ্যে মবিলিটি-অব-লেবার-ক্যাপিটাল না থাকায় ঐ সবের খরচের সুবিধা শুধু পশ্চিম-পাকিস্তান পাইতেছে। দুই অঞ্চলের আর্থিক অসাম্যের মূল কারণ এই। এইসব ব্যয় যাতে দুই অঞ্চলের সমান অংশ থাকে, তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অনেকে রাজধানী ঢাকায় আনার দাবি করেন। এ দাবি অন্যায় নয়। কিন্তু ঢাকায় রাজধানী হইলে ঐ একই কারণে পশ্চিম-পাকিস্তানীরা কেন্দ্রীয় ব্যয়ের আয় হইতে বঞ্চিত হইবে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অনেকে কুড়ি বছরের জন্য ঢাকায় রাজধানী আনিতে চান। তার মানে, কুড়ি বছর পরে রাজধানী আবার পশ্চিম-পাকিস্তানে যাইবে। স্পষ্টতঃই এটা স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। কাজেই অবাস্তব ও অযৌক্তিক। কায়েদে-আযমের করাচিতে রাজধানীকে চিরস্থায়ী করিয়া এবং উপকূল বাণিজ্য জাতীয়করণ ও নিম্নশ্রেণীর ভাড়া সাবসিডাইযড করিয়া জনগণের স্তরে জাতীয় সংহতি প্রসারিত করিলে রাজধানীর তর্ক স্থায়ীভাবে মিটিয়া যাইবে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের সাকুল্য ব্যয় দুই অঞ্চলের মধ্যে সমানভাবে বিতরণের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা করিলেই দুই উইং-এর আর্থিক অসাম্যের মূল কারণ দূর হইবে। এটা করা সম্ভব। শাসনতান্ত্রিক বিধানের বলে শাসনযান্ত্রিক সংস্কারই এই পন্থা। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার খাতিরে কোনও ব্যবস্থাই দুঃসাধ্য বিবেচিত হওয়া উচিৎ নয়।

কিন্তু এ সবই সম্ভব দুই উইং-এর বোঝা পড়া ও আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়া। দুই অঞ্চলের এই সার্বিক সমতা আনিতে হইলে পশ্চিম-পাকিস্তানীরা হয়ত প্যারিটি নয়ত উচ্চ-পরিষদের মাধ্যমে পার্লামেন্টের প্রতিনিধিত্বের সমতা চাহিবেন। এটা অসংগত দাবি নয়। পূর্ব-পাকিস্তানীদের উচিত উপরোক্ত শর্তে এই দাবি মানিয়া লওয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা মানিবেও। ১৯৫৫ সালে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সর্বক্ষেত্রে প্যারিটির বিনিময়ে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটিতে রাযী হইয়া হক সাহেব ও সুহরাওয়ার্দী সাহেব পাঁচদফা মারী চুক্তিতে দস্তখত করিয়াছিলেন। সার্বিক প্যারিটি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিয়া সেই চুক্তির পশ্চিম পাকিস্তানী অংশ রক্ষিত হয় নাই

বলিয়াই পূর্ব-পাকিস্তানীদের কেউ-কেউ এতদিন পরে জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করিয়াছে। পূর্ব-বাংলার মেজরিটির বিনিময়ে যদি পশ্চিম-পাকিস্তানীরা এবার উপরে-বর্ণিত ব্যবস্থা করিয়া দুই অঞ্চলের মধ্যে স্থায়ী সমতা স্থাপন করিতে রাযী হয়, তবে পূর্ব-পাকস্তানীরা নিশ্চয় তাদের মেজরিটি, ত্যাগে সম্মত হইবে। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানীরা তাদের মেজরিটি দিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের উপর প্রাধান্য করিতে চায় না, নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিতে চায় মাত্র। পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সম্মতিতে সেসব স্বার্থ যদি শাসনতন্ত্রে সুরক্ষিত হইয়া যায়, তবে মেজরিটি দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানীরা কি করিবে ?

প্রথম গণ-পরিষদে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন ৪৪ জন, পশ্চিম-পাকিস্তানের ছিলেন ২৮ জন। তবু ঐ গণ-পরিষদ পশ্চিম-পাকিস্তানীদের মতের বিরুদ্ধে নিজেদের সংখ্যাগুরুত্ব খাটায় নাই। বরঞ্চ এত উদার নিখিল-পাকিস্তানী মনোভাব দেখাইয়াছে যে তাতে পূর্ব-বাংলার ন্যায্য হকও কোরবানি হইয়া গিয়াছে।

তাছাড়া দুই উইং-এর মধ্যে মেজরিটি-মাইনরিটি কমপ্লেক্স দূর করিবার জন্যই প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি হওয়া দরকার। মেজরিটি ও মাইনরিটি কমপ্লেক্সে উইং-এর জন্য পৃথক-পৃথকভাবে এবং পাকিস্তানের জন্য সামগ্রিকভাবে অনিষ্টকর। অতীতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের এই মেজরিটি কমপ্লেক্স তাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব বুঝিতে দেয় নাই। পূর্ব-পাকিস্তানী মুসলিম লীগ নেতারা বলিতেন, বিশ্বাসও করিতেনঃ 'করাচি বসিয়াই আমরা সারা পাকিস্তান শাসন করিব, ঢাকায় ক্ষমতা আনিবার দরকার কি ?' বস্তুতঃ জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ার সাথে-সাথে অনেক পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতা এই কথাটাই বলা শুরু করিয়াছেন। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন রাজনৈতিক কারণে নয়, ভৌগোলিক কারণে। মেজরিটি-কমপ্লেক্স-ওয়ালারা এটা বুঝিতে পারেন নাই। এই মেজরিটি-কমপ্লেক্সের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে একটা মাইনরিটি-কপ্লেক্স সৃষ্টি হইয়াছে। এই কমপ্লেক্স তাদের মধ্যে নাহক, কিন্তু স্বাভাবিক, এটা পূর্ব-বাংলা-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে পশ্চিমা শাসকরা হস্টাইল হইয়াছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত দুর্গতি পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদের এই মনোভাবের ফলে। পূর্ব-বাংলার মেজরিটিই পশ্চিমা ভাইদের মধ্যে ঐ মনোভাবের স্রষ্টা।

অথচ পূর্ব-বাংলার এই মেজরিটি এ অঞ্চলের কোনও কাজে অতীতেও লাগে নাই, ভবিষ্যতেও লাগিবে না। এই মেজরিটির জোরে আমরা পাকিস্তানের রাজধানী ও

দেশরক্ষা বাহিনীর হেড কোয়ার্টার কার্যতঃ পূর্ব–পাকিস্তানে আনিতে পারিব না। বস্তুতঃ পশ্চিম–পাকিস্তানীদের অমতে কোন কিছুই করিতে পারিব না। এমনকি ভোটের জোরে শাসনতন্ত্রও রচনা করিতে পারিব না। পশ্চিমা ভাইদের সম্মতিই যদি অপরিহার্য হয়, তবে মেজরিটি আমাদের কোন কাজে লাগিবে ?

আরেক দিক হইতে দুই উইং–এ প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি হওয়া আবশ্যক। এটা দুই উইং–এর প্রতিনিধিত্বের চিরস্থায়ী নিশ্চয়তা। জনসংখ্যা পরিবর্তনশীল। জনসংখ্যার ভিত্তিতে দুই উইং–এর প্রতিনিধিত্ব থাকিলে সেটাও হইবে পরিবর্তনশীল। তার মানে অনিশ্চয়তা। সুস্পষ্ট কারণেই দুই উইং–এর মধ্যে গণতন্ত্রের মামুলি নিয়ম চলিতে পারে না। প্রতিনিধিত্বের অনিশ্চয়তা দুই উইং–এর সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা ও তিক্ততা সৃষ্টি করিতে পারে। যার–তার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অসাধু পন্থা গ্রহণ করিতে পারে। সত্য–সত্যই যদি তা না–ও হয়, তবু আন্তঃআঞ্চলিক সন্দেহ ও তিক্ততা বাড়িবে। পশ্চিম–পাকিস্তানের আয়তন অনেক বেশি। মাইল–প্রতি বসতি কম। কাশ্মির, সীমান্ত এলাকা ও ভারত হইতে আগত লোক–সমাগমে যদি ভবিষ্যতে পশ্চিম–পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বাড়িয়াও যায়, তবু সেন্সাস রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে পূর্ব–পাকিস্তানীরা ভুল বুঝিতে পারে। আগামী শাসনতন্ত্রে সেন্সাস যদি ফেডারেশনের বিষয় থাকে, তবে সেন্সাস কমিশনের হেড অফিস ও অফিসাররা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হইবেন এবং চূড়ান্ত সংখ্যা প্রকাশের ক্ষমতাও তাঁদের হাতেই থাকিবে। পক্ষান্তরে সেন্সাস যদি অংগ–রাজ্যের বিষয় হয়, তবে দুই উইং–এর সেন্সাসেই মেনিপোলেশন হইতে পারে। ফলে কেউ কারোটা বিশ্বাস করিবে না। এইভাবে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাছাড়া সত্য–সত্যই যদি পূর্ব–পাকিস্তান লোকসংখ্যায় মাইনরিটি হইয়া যায় তবে সে অবস্থায় বর্তমানে পূর্ব–পাকিস্তানের একমাত্র শক্তি যে সংখ্যাধিক্য তারও অবসান হইবে। সকলদিক হইতে পূর্ব–পাকিস্তানীরা অসহায় হইয়া পড়িবে। সে উপায়হীনতা আমাদের বরাতে অনেক বিপদ আনিতে পারে। কি কি বিপদ হইতে পারে তা চোখে আংগুল দিয়া দেখাইবার দরকার নাই। পাঠকগণ তা অনুমান করিতে পারেন।

১১. এক চেম্বার না দুই চেম্বার ?

জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইতে যাইতেছে। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছেঃ এক চেম্বার, না দুই চেম্বার ? প্রশ্নটা উঠিয়াছে স্বাভাবিকভাবেই। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি যখন উঠিয়া গিয়াছে তখনই ধরিয়া

নেওয়া হইয়াছে, দুই চেম্বারের পার্লামেন্ট হইতে হইবে। সভ্য জগতের বড়-বড় প্রায় সব দেশেই দুই চেম্বারের পার্লামেন্ট প্রচলিত আছে। ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্রে ত আছেই, ইউনিটরি পদ্ধতির রাষ্ট্রেও আছে। তাই অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে পাকিস্তান যখন ফেডারেল রাষ্ট্র তখন এরও পার্লামেন্ট দুই কক্ষ-বিশিষ্ট হইতে বাধ্য। এই দিক দিয়া কথাটা দৃশ্যতঃ ন্যায়সংগত। তাই এটা প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের কথা হইলেও পূর্ব-পাকিস্তানের কোনও-কোনও নেতাও এর সমর্থন করিতেছেন। এক চেম্বারের পার্লামেন্টে পূর্ব-পাকিস্তানীদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে। সেই মেজরিটির জোরে তারা দেশের শাসন ব্যাপারে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিবে। এই ভয় হইতেই পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা দুই পরিষদের কথা তুলিয়াছেন এটা কারো-কারো জন্য সত্য হইলেও সকলের জন্য সত্য নয়। দুনিয়ার সব ফেডারেল রাষ্ট্রেই দুই চেম্বারের পার্লামেন্ট আছে যে কারণে, ঠিক সেই কারণেই তাঁরাও দুই চেম্বারের কথা বলিতেছেন, এটা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর যদি এটাও সত্য হয় যে পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা পূর্ব-পাকিস্তানের মেজরিটি চেক্ করিবার উদ্দেশ্যেই দুই চেম্বারের কথা ভাবিতেছেন, তবু তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, ফেডারেল রাষ্ট্রে বড় অংগরাজ্যের যুলুম হইতে ছোট অংগরাজ্যগুলিকে বাঁচাইবার রক্ষা-কবচ হিসাবেই দুই চেম্বারের বিধান করা হইয়াছে।

দুনিয়ার রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে পার্লামেন্টে একটি উচ্চ পরিষদ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য দুইটি। এক, গণতন্ত্রের মোটরের ব্রেক, ঘোড়ার লাগাম। দুই, ফেডারেল রাষ্ট্রে ছোট-ছোট অংগরাজ্যের রক্ষা-কবচ। পাকিস্তানে প্রধানতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের মেজরিটির মোকাবেলায় পশ্চিম-পাকিস্তানের ছোট-ছোট অংগরাজ্যগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই দুই চেম্বারের কল্পনা করা হইয়াছিল। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার ইতিহাস আলোচনা করিলেই তা বোঝা যাইবে। এ ব্যাপারে লিয়াকত আলী, নাযিমুদ্দিন ও মোহাম্মদ আলী এই তিন প্রধানমন্ত্রী শাসনতন্ত্রের তিনটি মূলনীতির প্রস্তাব করিয়াছেন। লিয়াকত আলীর মূলনীতিতে ছিল নিম্ন পরিষদে জনসংখ্যার প্রতিনিধি ; উচ্চ পরিষদে পাঁচ প্রদেশের সমান-সমান প্রতিনিধি। নাযিমুদ্দিনের ফরমূলায় ছিল দুই চেম্বারই প্যারিটি-ভিত্তিক । এই ব্যবস্থায় পশ্চিম-পাকিস্তানের রক্ষা-কবচ ডবল করা হইয়াছিল। মোহাম্মদ আলী-ফরমূলায় ছিল নিম্ন পরিষদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে। উচ্চ পরিষদে পাঁচ প্রদেশের প্রত্যেকে দশ জন করিয়া। এতে দুই পরিষদকে সমান ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। অধিকন্তু ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, দুই পরিষদের যুক্ত বৈঠকে 'পূর্ব-বাংলা' ও 'পশ্চিম যোন'-এর মধ্যে প্যারিটি হইবে। অনাস্থা প্রস্তাবে ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুই অঞ্চলের প্রত্যেকটির

অন্ততঃ শতকরা ত্রিশ জনের ভোট পাইতে হইবে। অবশেষে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে নয়া গণ-পরিষদ 'ঘাড়ের পিছন ঘুরাইয়া' প্যারিটি প্রবর্তনের বদলে সোজাসুজি প্যারিটি ভিত্তিক এক চেম্বারের পার্লামেন্ট করিলেন।

এই বিশ্লেষণে বোঝা গেল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নেতারা বরাবরই দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বে সংখ্যা-সাম্য রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্ব-বাংলার মেজরিটির উপর একটা চেক। শুধু নাযিমুদ্দিন-ফরমূলাতে আরও একটা বেশি চেকের ব্যবস্থা ছিল। ঐ ফরমূলায় নিম্ন পরিষদের দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বে প্যারিটি থাকা সত্ত্বেও একটা প্যারিটি-ভিত্তিক উচ্চ পরিষদ রাখা হইয়াছিল। পূর্ব-বাংলার মেজরিটি চেক করা ছাড়াও তাতে আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল। সেটা গণতন্ত্রের মুখে লাগাম।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, উচ্চ পরিষদ গণতন্ত্রের মোটরের চাকার ব্রেক, ঘোড়ার লাগাম। এটার দরকার আছে। গণতন্ত্র সাধারণতঃ দ্রুত সংস্কারকামী। কারণ 'স্টেটাস কো', প্রচলিত সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থা, অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের স্বার্থ-বিরোধী। তাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিপ্লবাত্মক আইন করিয়া অতি দ্রুত সংস্কার সাধন করিতে চান। এতে ত্রস্ত-ব্যস্ততার দরুন অনেক সময় ভুল ও অনিষ্টকর আইন করা হইয়া যায়। উচ্চ পরিষদ এই বেপরোয়া আইন-কানুন ধীরে-সুস্থে বিচার-বিবেচনা করিয়া ওগুলির ভালমন্দ দেখিতে ও দেখাইতে পারেন। এক কথায় নিভাজ গণতন্ত্রের দ্রুত গতি একটু মন্থর করিয়া দেওয়াই উচ্চ পরিষদের কাজ। নাযিমুদ্দিন সাহেবের ফরমূলা এই কাজটিও করিতে চাহিয়াছিল। তিনি দুই অঞ্চলের প্যারিটি করিয়া পূর্ব-বাংলার মেজরিটি চেক করিয়াছিলেন এবং উচ্চ পরিষদ দিয়া গোটা পাকিস্তানের গণতন্ত্রের ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এটাও দোষের ছিল না। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ পরিষদ গঠন করার রেওয়াজ সারা দুনিয়াতেই আছে তবে এটা বোঝা গেল যে এক নাযিমুদ্দিন-ফরমূলা ছাড়া আর কোনও ফরমূলায় দুই অঞ্চলের সংখ্যা-সাম্য ব্যতীত উচ্চ পরিষদের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তা যদি তাঁরা চাহিতেন, তবে প্রাদেশিক পরিষদেও দুই চেম্বারের ব্যবস্থা করিতেন। আমাদের প্রতিবেশী ভারতে এবং বন্ধু রাষ্ট্র আমেরিকায় অনেক অংগ-রাজ্যেই দুই চেম্বারের পরিষদ আছে।

এখন এই দুই শ্রেণীর উচ্চ পরিষদের মধ্যে প্রথমটির আলোচনা করা যাক আগে। বোঝা গেল অবাধ গণতন্ত্রে পূর্ণ অবস্থার অভাবেই গোড়াতে উচ্চ পরিষদের প্রবর্তন হইয়াছিল। উচ্চ পরিষদ ছাড়া পার্লামেন্টকে তখন সত্যই ব্রেকহীন মোটর ও লাগামহীন ঘোড়া মনে করা হইত। ধরিয়া লওয়া যাক, গণতন্ত্রের বিকাশের প্রাথমিক

স্তরে এটার দরকার ছিল। নব-লব্ধ স্বাধীন ক্ষমতার অতি উৎসাহে ভুল করা অসম্ভব ছিল না। মাথার উপরে উচ্চ পরিষদের মত একটা প্রবীণ মুরুব্বির না হয় তখন দরকার ছিল। কিন্তু আজও কি দরকার আছে ? সব সভ্য দেশেই এর প্রচলন দেখিয়া মনে হইবে, বোধ হয় আজও দরকার আছে। কাজেই ব্যাপারটা একটু তলাইয়া দেখা দরকার।

দুই দিক হইতে এর বিচার করা যাইতে পারে। এক, কিভাবে উচ্চ পরিষদ গঠিত হইবে ? দুই, তার ক্ষমতা কতটুকু থাকিবে ? গঠন-পদ্ধতির কথাই আগে ধরা যাউক। এর আকার যে ছোট হইবে, এটা ধরিয়া লওয়া যায়। প্রশ্ন এই, এটা নির্বাচিত হইবে কি না ? নির্বাচিত হইলে প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ ভোট হইবে ? নির্বাচিত না হইয়া মনোনীত হইতে পারে। যথা ঃ ইংলণ্ডে লর্ড সভা। ওতে নির্বাচন নাই। ওটা বংশানুক্রমিকও। রাজা যদি কাউকে লর্ড পদবি দেন, তবে তিনিও লর্ড সভার মেম্বর হইবেন। নির্বাচিত উচ্চ পরিষদ যদি পরোক্ষ নির্বাচনে হয় তবে নিম্ন পরিষদ সদস্যদের ভোটে অথবা উভয়ের যুক্ত ভোটে হইতে পারে। যদি প্রত্যক্ষ ভোটে হয়, তবে ভোটারদের ও প্রার্থীদের এলাকা সংকীর্ণ করিয়া তা করা যাইতে পারে। যেমন ধরুন, শুধু আয়কর-দাতারাই ভোটার হইবেন। আর বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরাই প্রার্থী হইতে পারিবেন।

তারপর ধরুন ক্ষমতার কথা। উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা নিম্ন পরিষদের সমান থাকিতে পারে ; কমও থাকিতে পারে। এমন ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে যে উচ্চ পরিষদ নিজেরা কোনও ট্যাক্স বসাইতে বা আইন করিতে পারিবে না। শুধু নিম্ন পরিষদের রচিত আইন বা বসানো ট্যাক্স ঠেকাইয়া পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্ন পরিষদে ফেরত পাঠাইতে পারিবে।

ইংলণ্ডের লর্ড-সভার অনুকরণে মনোনীত উচ্চ পরিষদ আর কোনও দেশে নাই। ভবিষ্যতেও হইবে না এটা ধরিয়া নিলাম। বাকী থাকিল পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উচ্চ পরিষদ। যদি আইন পরিষদের মেম্বরদের দ্বারা পরোক্ষ নির্বাচনে উচ্চ পরিষদ হয়, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের দলের লোকই নির্বাচিত হইবেন। কারণ স্পষ্টতঃই তাঁরাই মেজরিটি। তাতে উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের ছায়া হইবে মাত্র। দৃশ্যতঃই এমন উচ্চ পরিষদের দরকার নাই। আর যদি তা সংকীর্ণ নির্বাচক-মন্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হয়, তবে সেটা হইবে আমের চেয়ে আঁটি বড় করা। গোটা দেশবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজে বাধা দিবার ক্ষমতা দেশের এক অংশের বা এক শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দেওয়া। ক্ষমতায় যদি তাঁরা নিম্ন পরিষদের সমান হন, তবে কথায়-কথায় ডেডলক হইবে। দেশের শাসনকার্য সাবলীল গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হইবে না। আবশ্যকতার দিক দিয়াও এমন উচ্চ পরিষদের দরকার নাই। প্রথমতঃ, একই ব্যক্তি

৩৩—

সব বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বরঞ্চ এক ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ লোক অন্য ব্যাপারে একেবারে উম্মি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। দ্বিতীয়তঃ বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ও সহযোগিতা সরকার সব সময়ই নিতে পারেন। তার জন্য বিশেষজ্ঞদের আইন পরিষদের মেম্বর হওয়ার দরকার নাই।

তারপর অর্ডিন্যান্স ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে ত্রস্ত-ব্যস্ততার সাথে আইন পাশ করা আজকাল সম্ভব নয়। খোদ আইন পরিষদের ভিতরেই 'জনমত যাচাই এর জন্য সার্কুলেশন মোশন' আছে ; সিলেক্ট কমিটি আছে ; জেনারেল ডিসকাশন, ক্লয-বাই-ক্লয ডিসকাশন ও থার্ড রিডিং-এর ব্যবস্থা আছে। বাইরে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের আলোচনা-সমালোচনা আছে। সভা-সমিতির বক্তৃতা-মঞ্চ আছে। এতসব আট-ঘাট পার হইয়া একটা বিল আইনে পরিণত হইতে এক সেশন পার হইয়া আরেক সেশনে চলিয়া যায়। এতে প্রায়শঃ বছর কাল কাটিয়া যায়। ফলে ত্রস্ত-ব্যস্ত আইন পাশ হওয়ার আশংকা আজকাল একরূপ নাই বলিলেই চলে। এর পরেও যদি কখনো এমন কোনও আইন হইয়াই যায়, তবে তাতে বাধা দেওয়ার জন্য হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে রীটের ব্যবস্থা আছে। ভারতে ব্যাংক জাতীয়করণের আইনটিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ব্যাপারে উচ্চ পরিষদ কাজে লাগে নাই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কাজে লাগিয়াছে।ফলে, উচ্চ পরিষদ অনাবশ্যক প্রমাণিত হইয়াছে।

তারপর থাকিল ফেডারেল রাষ্ট্রে ছোট অংগ-রাজ্যের রক্ষা-কবচের কথা। এখানেও উচ্চ পরিষদ অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সব গণতান্ত্রিক দেশেই আজ দলীয় রাজনীতি কায়েম হইয়াছে। মেম্বররা দলীয় শৃঙ্খলা মানিয়া চলেন। পার্টি ওয়ারি ভোট দেন। প্রদেশ-ওয়ারি ভোট দেন না। পাকিস্তানেও তাই হইতে বাধ্য। এখানেও নিখিল-পাকিস্তান-ভিত্তিক অনেক পার্টি আছে। তাদের মেম্বররাও পার্টি আনুগত্য অনুসারেই ভোট দিবেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান-ভিত্তিতে ভোট দিবেন না। কাজেই এখন আর এক অঞ্চলের মেজরিটির দ্বারা অপর অঞ্চলের উপর যুলুম হওয়ার আশংকা নাই। তা ঠেকাইবার জন্য কাজেই উচ্চ পরিষদেরও আবশ্যকতা নাই।

তবু-যে দুনিয়ার সব দেশের পার্লামেন্টে উচ্চ পরিষদ দেখা যায়, সেটাকে ফ্যাশন বা অভ্যাস বলা যাইতে পারে। বিলাতের পার্লামেন্টকে মাদার-অব-পার্লামেন্টস-অব-দি ওয়ার্ল্ড বলা হয়। গোড়াতেই ইংলন্ডের হাউস অব-লর্ডসের অনুকরণেই বিভিন্ন দেশে উচ্চ পরিষদের প্রবর্তন হইয়াছিল। সেটাই আজ অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে কোনও লিখিত কনস্টিটিউশন না থাকায় কমন্স সভা আইন করিয়া লর্ড সভার ক্ষমতা দিনের পর দিন কাড়িয়া লইতেছে। লিখিত শাসনতন্ত্রের দেশে একাজ সহজ হইবে না। শুধু জটিলতা বাড়িবে। ফেডারেল স্টেটে ছোট-ছোট অংগরাজ্যের স্বার্থ-রক্ষাই বর্তমানে উচ্চ পরিষদ রাখার একমাত্র যুক্তি। শাসনতন্ত্রে ফেডারেশন ও

অংগরাজ্যের অধিকারের সীমানির্দেশ করিয়া আদালতকে সে সীমারক্ষার ক্ষমতা দিলেই এই সমস্যার উচ্চ পরিষদের চেয়ে ভাল সমাধান হইবে। এই সব কারণে পাকিস্তানে উচ্চ পরিষদের দরকার নাই। এর পরেও যদি উচ্চ পরিষদ করা হয়, তবে সেটা হইবে বিনা-কাজে সাদা হাতী পোষা মাত্র। পাকিস্তানের মত গরিব রাষ্ট্রে সে বিলাসিতা না থাকাই ভাল।

১২. পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাম, প্রিয়েম্বল, ডিরেকটিভ প্রিন্সিপলস ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ও '৬২ সালের (সংশোধিত) শাসনতন্ত্রের বিধানসমূহ গণ-পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক করিয়া অন্ততঃ একটি ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষতি করিয়াছেন। এইসব বিধান পাকিস্তানী নেশন গঠনের বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের দিক হইতে পাকিস্তানী নেশনের ব্যাপারটা গুরুতর সুদূর-প্রসারী প্রশ্ন। এমন ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পক্ষে '৫৬ সাল ও '৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অনুসরণ করা উচিৎ ছিল না। '৬২ সালের শাসনতন্ত্র ব্যক্তির দান ; গণ-প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত নয়। '৫৬ শাসনতন্ত্রের আইন-গত বুনিয়াদ ছিল বটে, কিন্তু ওটা প্রকৃত অর্থে প্রস্তাবিত '৭০ সালের রচিত শাসনতন্ত্রের মত গণতান্ত্রিক পন্থায় রচিত হয় নাই। সার্বজনীন ভোটের প্রত্যক্ষ নির্বাচিত তিন শ' তেরজন প্রতিনিধির গণ-পরিষদে এবারই প্রথম পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে। এই শাসনতন্ত্র পাকিস্তানী নেশনহুডের বুনিয়াদে রচিত না হওয়া খুবই পরিতাপের বিষয় হইবে।

পাকিস্তান একটি নেশন-স্টেট, জাতি-রাষ্ট্র। জাতি-রাষ্ট্রের অধিবাসীরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যার-তার রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জাতি, নেশন। এই হিসাবে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে পাকিস্তানের সব বাশিন্দা লইয়াই পাকিস্তানী নেশন। এটা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের পয়লা সবক। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক রাজনীতিবিদ এটা মানেন না। তাঁরা বলেন, শুধু মুসলমানদের লইয়াই পাকিস্তানী জাতি গঠিত। পাকিস্তান 'মুসলিম জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা তাঁদের ভুল।' 'মুসলিম জাতি' নামে কোনও রাষ্ট্রীয় জাতি বা নেশন হইতে পারে না। পাকিস্তানের সব বাশিন্দারাই যদি মুসলমান হইত, তবু তাদের 'মুসলিম জাতি' বলা যাইত না। কারণ নেশন হইতে গেলেই একটি রাষ্ট্র লাগে। রাষ্ট্র হইতে গেলেই একটি ভূখণ্ড বা টেরিটরি লাগে। সেই টেরিটরির নাম অনুসারেই রাষ্ট্রীয় জাতির নামকরণ করা হয়। ধর্মের ভিত্তিতে কোনও নেশন হয় না। ধর্মের নামানুসরে রাষ্ট্রেরও নাম হয় না। কাজেই নেশনেরও নামে হয় না। এটা কার্যতঃ অসম্ভব। কারণ দুনিয়ায় ষাট কোটি মুসলমান আছে। তারা প্রায় ত্রিশটি মুসলিম প্রধান দেশের শাসক। তাদের একটাও 'মুসলিম রাষ্ট্র' বা 'ইসলামী রাষ্ট্র' নামে পরিচিত

নয়। অধিবাসীরাও 'মুসলিম নেশন' নামে নিজ দেশের বা জাতিসংঘে স্বীকৃত নয়। ধর্মের দিক দিয়া এই ষাট কোটি মুসলমানই এক জাতি। কিন্তু সে জাতির নাম নেশন বা কওম নয়। সে জাতির নাম 'মিল্লত'। দুনিয়ার সব মুসলমান এক মিল্লতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও রাষ্ট্রীয় জাতি বা নেশন হিসাবে পৃথক, স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন স্বার্থের অধিকারী। কারণ তাদের টেরিটরি ও নাগরিক অধিকার সীমাবদ্ধ। সে অধিকার লইয়া তাদের মধ্যে বিরোধ ও গোলাগুলিও হইয়া থাকে। টেরিটরিয়াল নামেই তাদের নেশন গঠিত। তাদের ন্যাশনালিযম ও টেরিটরির চতুঃসীমা এক ও অভিন্ন।

তারপর অবিভক্ত ভারতে মুসলিম-অমুসলিম মিলিয়া এক নেশন হইতে পারি নাই বলিয়া পাকিস্তানেও পারিব না, একথাও ঠিক নয়। অখন্ড ভারতে যা পারি নাই, পাকিস্তানে তা পারিব বলিয়াই দেশ ভাগ করিয়া পাকিস্তান বানাইয়াছি। এটাই পাকিস্তান ও অখন্ড ভারতের মৌলিক ও বুনিয়াদী পার্থক্য । অখণ্ড ভারতে হিন্দু মেজরিটি। পাকিস্তানে মুসলিম মেজরিটি। গণতন্ত্রে মেজরিটির শাসন। মুসলমানরাও হিন্দুদের মতই গনতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু গণতান্ত্রিক অখণ্ড ভারতে হিন্দু মেজরিটির শাসনে আমরা মুসলমানরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। আমাদের বিচারে হিন্দুরা ধর্মীয় ব্যাপারে সংকীর্ণ ও সামাজিক ব্যাপারে অনুদার। আমাদের বিবেচনায় এই সংকীর্ণতা ও অনুদারতার দরুন হাজার বছর এক দেশে বাস করিয়াও আমরা এক সমাজ, সুতরাং এক জাতি হইতে পারি নাই। এই কারণে এদের মেজরিটি শাসনে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবে, এই আশংকা মুসলমানদের ভিত্তিহীন ছিল না। তাই মুসলিম ভারতের নেতা কায়েদে-আযম হিন্দু নেতাদেরে বলিলেন ঃ 'চল, ভারতভূমিতে একটির বদলে দুইটি রাষ্ট্র করি। একটিতে তোমরা শাসন কর, আরেকটিতে আমরা করি। চল, আমরা প্রতিযোগিতা করি, কে কত উদার, কে কেমন গণতন্ত্রী, কে কি রকম জাতীয়তাবাদী।' এরই নাম পাকিস্তান দাবি। কায়েদে-আযম সারাজীবন এই একই গণতান্ত্রিক জাতীয়তার কথা বলিয়াছেন। পাকিস্তান গণ-পরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতায়ও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন। এই কথাটাই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের শেষ বাণী লাস্ট টেস্টামেন্ট, ওসিয়ত। ওটাই পাকিস্তানী জাতীয়তার মূলসূত্র। নেশন-স্টেট হিসাবে উহাই পাকিস্তানের বুনিয়াদ। এই মূলসূত্র অনুসারে ধর্ম-বর্ণ-জাতি গোষ্ঠী-নির্বিশেষে পাকিস্তানের সকল অধিবাসী হইবে পাকিস্তানী জাতির মেম্বর। পাকিস্তানে ধর্মে-বর্ণে, উচ্চে-নীচে, শরিফে-রযিলে, কালায়-ধলায় কোনও ভেদাভেদ, কোনও অসাম্য থাকিবে না। পাকিস্তান হইবে সাম্যের রাষ্ট্র। জনগণ হইবে এর মালিক। জনগণের সকলে ও প্রত্যেকে হইবে পাকিস্তানের সভারেনটির সমান অংশীদার। এই সাম্যের দিক হইতে পাকিস্তান হইবে ভারতের চেয়ে ত নিশ্চয়ই দুনিয়ার সব রাষ্ট্র হইতেই শ্রেষ্ঠ। এমন রাষ্ট্রকে সকল পাকিস্তানী অন্তর দিয়া ভালবাসিবে। এর নাগরিকতায়

গৌরববোধ করিবে। এমন নাগরিকতা কেউ হারাইতে চাহিবে না। প্রাণের বিনিময়ে তা রক্ষা করিবে। এখানে ধর্মে-ধর্মে কোন বিরোধ থাকিবে না। সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কোন সংঘাত হইবে না। সকল ধর্মবিশ্বাসই হইবে এখানে নিরাপদ। এমনি করিয়া পাকিস্তান হইবে আদর্শ রাষ্ট্র। পাকিস্তানী নেশন হইবে আদর্শ জাতি। পাকিস্তানে এটা করিবার ক্ষমতা আমাদের মুসলমানদের হাতে। কারণ আমরা এখানে মেজরিটি। অখন্ড ভারতে এটা আমরা করিতে পারিতাম না। কারণ সেখানে ছিলাম আমরা মাইনরিটি।

দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্তানে আমরা মুসলমানরা পৃথক নেশন থাকিলে এখানকার অমুসলামন মাইনরিটিরাও থাকিবে পৃথক-পৃথক নেশন। তাতে পাকিস্তান সুসংবদ্ধ এক-নেশন-স্টেট থাকিবে না। হইবে অসংবদ্ধ মালটি-নেশনে-স্টেট। জাতিসংঘের মানবাধিকার নীতি বলে তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, এমন কি পাকিস্তানের মধ্যে তাদের 'ন্যাশনাল হোমল্যান্ড' দাবি করিতে পারিবে। এতে কি পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বিরোধীদের লীলাভূমি হইয়া উঠিবে না? পাকিস্তানী নেশনের অংশীদার হইতে না পারিলে মাইনরিটিরা কি স্বাভাবিকভাবেই অন্য দেশীয় ধর্মভ্রাতাদের সহিত রাজনৈতিক মিতালি পাতিবার আশকারা পাইবে না? পাকিস্তান রাষ্ট্রের অহিতকামীরা, বিশেষতঃ ভারতের সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাষ্ট্র-নেতারা, সে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিবেন না?

তৃতীয়তঃ, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানে যদি বহু নেশন থাকিতে পারে, তবে রেশিয়াল ও ভাষা-ভিত্তিক বহু নেশনও থাকিতে পারে। বস্তুতঃ 'মুসলিম জাতীয়তা'র দাবিদার পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নেতারা রেশিয়াল ও লিংগুইস্টিক ন্যাশনালিযমের দাবিকে উস্কানী দিতেছেন ও জোরদার করিতেছেন। বাংগালী-সিন্ধী-পাঠান-পাঞ্জাবী-বেলুচী জাতীয়তার দাবি উঠিতেছে। মুসলিম-হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায়। ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের মতই বাংগালী-সিন্ধী-পাঠান-পাঞ্জাবী জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। অথচ উভয় পক্ষের কথাতেই আংশিক সত্য নিহিত রহিয়াছে।

একদিকে পাকিস্তানের বিপুল মেজরিটি মুসলমান। তাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলামী মূল্য-বোধ তাদের জীবনাদর্শের মাপকাঠি। সকলে সব সময়ে দৈনন্দিন জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সে মূল্য-বোধ প্রয়োগ করিতে পারি আর না পারি, ওটা আমাদের ধার্মিক ও কৃষ্টিক জীবনাদর্শ ও মূলনীতি। সে আদর্শ রূপায়ণের ও নীতি পালনের কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক ও শাসনযান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতাই আমরা বরদাশত করিব না। এই সবই ঠিক। বস্তুতঃ ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ও কৃষ্টিক স্বকীয়তার পূর্ণ বিকাশ লাভে কোন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে কেউ না পারে, পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাই।

অন্যদিকে পাকিস্তানের অধিবাসীরা রেশিয়ালি বিভিন্ন জাতে বিভক্ত। ভাষা-সাহিত্যে ও কৃষ্টি-শিল্পে তারা স্বতন্ত্র। এই রেশিয়াল জাত হিসাবে তারা বাংগালী, সিন্ধী, পাঠান, পাঞ্জাবী, বেলুচ নামে বিভক্ত। এই রেশিয়াল ঐতিহ্যে ও স্বাতন্ত্র্যে তারা লজ্জিত নয়। বরঞ্চ আরব, তুর্কী, ইরানীর মতই গর্বিত। কিন্তু পাকিস্তানে এরা 'ন্যাশনালিটি' মাত্র। কেউই নেশন নয়। তারা সবাই পাকিস্তান নেশনের অন্তর্ভুক্ত। এই হিসাবে রেশিয়াল স্বাতন্ত্র্যের বিচারে পাকিস্তান 'মালটি-নেশন' স্টেট নয়, 'মালটি-ন্যাশনালিটি' স্টেট। দুনিয়ার অধিকাংশ নেশন-স্টেটই গোড়াতে 'মাল্টি-ন্যাশনালিটি' স্টেট ছিল। দীর্ঘদিন একই গণতান্ত্রিক শাসনাধীনে থাকিয়া তারা আজ এমনভাবে এক নেশনে পরিণত হইয়াছে যে গোড়ার সে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। শুধু মার্কিনী জাতিই নয়, ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী জাতিও গোড়াতে বিভিন্ন রেশিয়াল জাতের সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছিল। শুধু মার্কিন মুল্লুকেই ইংলিশ, আইরিশ, ফরাসী, জার্মান জাতিসমূহের সমন্বয় হয় নাই, খোদ ইংরেজ জাতি ও এংলো স্যাকসন ও নর্মানদের মিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। ফ্র্যাংকিশ, টিউটনস, প্রুশিয়ানস, অস্ট্রিয়ানস লইয়া জার্মান জাতি গঠিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক সাম্যের দেশ পাকিস্তানেও আমরা একদিন পাকিস্তানী নেশনে সংগঠিত ও পরিণত হইতে পারিব। এটা তবেই সম্ভব যদি আমরা রাষ্ট্রীয় সামাজিক আর্থিক ও কৃষ্টিক সমস্যা না বাড়াই। যদি বর্তমান সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করি। যদি আমাদের ভৌগোলিক আঞ্চলিকতাকে রাজনৈতিক কৌশলে ডিংগাইতে পারি। যদি সমস্ত প্রদেশ অঞ্চলে, সকল ভাষা-কৃষ্টি এবং সমুদয় শিল্প সাহিত্যকে ইউনি-কালার করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার না করি। যদি আমরা পাকিস্তানকে হাজার ফুলের গুলবাগিচা বানাই।

এখানেই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ভুলে আমাদের লেখক-সাহিত্যিক-চিন্তানায়করা জাতিকে দুই বিপরীত দিক হইতে টানিতেছেন। একদল পাকিস্তানীদেরে মক্কা-মদিনা-দামেশ্‌ক-বাগদাদের দিকে টানিতেছেন। আরেক দল মস্কো-পিকিং কলিকাতা-শান্তিনিকেতনের দিকে টানিতেছেন। পাকিস্তানের দিকে কেউ টানিতেছেন। পাকিস্তানের রূহ তাঁরা সবাই পাকিস্তানের বাইরে তালাশ করিতেছেন। পাকিস্তানের ভিতরে সে রূহের সন্ধান কেউ করিতেছেন না। 'উর্দু-ফারসীতে', 'মাদেরেওতন' বলা গেলেও বাংলায় দেশ-জননী বলা যাইবে না' ঃ এক দল বলিতেছেন ধর্মের দোহাই দিয়া। 'দেশকে যদি 'মা' বলা নাই যায়, তবে চন্ডীকেই 'মা' বলিব' ঃ বলিতেছেন আরেক দল রেশিয়াল ঐতিহ্যের দোহাই দিয়া। একটা আরেকটার প্রতিবাদ, প্রতিধ্বনি। দুইটাই ব্যক্তির মত। জাতির মত নয় একটাও। এসব ব্যক্তিগত বাদানুবাদ ও রুচিঅতিরুচির গলার জোর খতম হইবে না যতদিন অবাধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জন-মতের বাদশাহি প্রতিষ্ঠিত না হইবে।

মুসলিম মেজরিটির দেশে গণতন্ত্রই ইসলাম বাঁচাইয়া রাখিবে। নেতাদের চেষ্টায় শাসনতন্ত্রে বিধান করিয়া ইসলাম রক্ষা করা যাইবে না। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিপদই আসলে ইসলামের বিপদ।

নিরংকুশ গণতন্ত্রই পাকিস্তান বাঁচাইয়া রাখিবে। পাকিস্তানের ইষ্ট-অনিষ্টই আমাদের বিচার্য। কারণ মানুষ এটা করিতে পারে। ইসলাম আল্লার-দেওয়া ধর্ম। মানুষ তার অনিষ্ট বা ধ্বংস সাধন করিতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তান মানুষের তৈয়ারী রাষ্ট্র। মানুষ এটার অনিষ্ট করিতে, এমন কি, এর ধ্বংস সাধনও করিতে পারে। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেও ইসলাম ছিল। খোদা-না-খাস্তা, পাকিস্তানের যদি কোনও অশুভ পরিণতি ঘটে, তবে তার পরেও ইসলাম থাকিবে। সে অবস্থায় ইসলামের কিছু হইবে না ; কিন্তু পাকিস্তানী মুসলমানের বরাতে দুঃখ আছে। তবু যে আমরা পাকিস্তান বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টার বদলে ইসলাম বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি, এ সবই আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার অপরিচ্ছন্নতার লক্ষণ। পাকিস্তানে বসিয়া পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ না বোঝা তারই প্রমাণ। যতদিন এই অপরিচ্ছন্নতা না ঘুচিবে, ততদিন গণতন্ত্রের নামে 'কনট্রোলড্', 'ব্যাসিক' ও 'গাইডেড' ডেমোক্র্যাসির কথা এবং জাতীয় পরিচিতির নামে 'মুসলিম জাতি' 'বাংগালী জাতি' 'সিন্ধী জাতি'র কথা শুনিতে হইবেই। চিন্তার এই অপরিচ্ছন্নতা দূর হইবে নিরংকুশ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়। তেমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ নির্বাচনে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠনে। সে গণতন্ত্রকে কোনও বিশেষ বিধানেই সংকুচিত করা চলিবে না। নিরংকুশ অসংকুচিত সার্বজনীন গণতান্ত্রিক নির্বাচন হইতে পারে শুধুমাত্র ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। পাকিস্তানের নিরাপত্তাও নিহিত হইয়াছে সেইখানেই।

শেষ কথা

আমার কথা প্রায় শেষ। যা-কিছু বলিয়াছি, তাতে পাকিস্তানের জাতীয় সমস্যাগুলির দিকে যদি নেতৃবৃন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সচেতন মন আকর্ষণ করিতে পারিয়া থাকি, তবে আমার কাজও প্রায় শেষ।

গত তেইশ বছরে নেতারা এ সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারেন নাই। কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও পারেন নাই। এতে বিস্ময়ের কিছু নাই। সমাধানের বদলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কতকগুলি মিটানো ব্যাপারে আবার তাজা করিয়াছেন। এতেও আশ্চর্যের কিছু নাই। নেতারা নিজেরাই এসব লইয়া গিরো দেওয়া ও গিরো খুলার কাজ বহুবার করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই বলুন, আর সাবেক প্রেসিডেন্ট আইউবই বলুন, পলিটিশিয়ানদের মতই তাঁরাও দেশের ইন্টেলিজেনশিয়ারই অংশ। অতএব তাঁরাও আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার আকারেরই প্রতিবিম্ব।

এ সবের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষত্ব এই যে তিনি আইউবের কাড়িয়া-নেওয়া গণতন্ত্র দেশবাসীকে আবার ফিরাইয়া দিতেছেন। এটাই আজ পাকিস্তানী রাজনীতির সবচেয়ে বড় কথা। এই কথারও সুন্দরতম দিক এই যে তিনি জনগণের স্তরে দেশের শাসনতন্ত্র রচনার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। এটাই নেতাদের মহা পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় পাস করিতেই হইবে। কোনও অজুহাতেই এ পরীক্ষায় ফেল করা চলিবে না। গণ-পরিষদের সার্বভৌমত্বের অভাবে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিলাম না বলাও যা, উঠানের দোষে ভাল নাচিতে পারিলাম না বলাও তাই। ও-কথা বলা না গেলে, এ কথাও বলা চলিবে না।

গণতন্ত্রই জনগণের সার্বভৌমত্ব দিয়া থাকে। গণতন্ত্রহীন পরিবেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব থাকে না। জনগণের সার্বভৌমত্ব না থাকিলে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও সার্বভৌমত্ব থাকিতে পারে না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ই জনগণের সার্বভৌমত্ব আসিবে। জনগণের সার্বভৌমত্বই তাদের নির্বাচিত পার্লামেন্টকে সার্বভৌমত্ব দিবে। অতএব আগে গণতন্ত্র। তারপরে সার্বভৌমত্ব।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার-দেওয়া লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। এই ত্রুটিপূর্ণ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্য দিয়াই জনগণের নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইতে পারে। এটাই বড় কথা। নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের হাতে ক্ষমতা আসিলে তাঁদের সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জ করিবার কেউ থাকিবেন না। তখন সেই সার্বভৌম পার্লামেন্টে ফ্রেমওয়ার্ক ও তজ্জনিত শাসনতান্ত্রিক দোষত্রুটি সবই সংশোধন করা যাইবে। এইভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের রাজনৈতিক মুক্তি ঘটিলে তাঁদের 'মনিব' যে

জনগণ, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিও আপনিই সাধিত হইবে। যে নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার মেহনতী জনতার অর্থনৈতিক মুক্তি আনিবেন না, জনগণ ব্যালট-বাক্সের বিপ্লবের মাধ্যমে তাঁদের অপসারণ ঘটাইবে। অন্য কোনও প্রকারের বিপ্লব দরকারই হইবে না।

কিন্তু একাজে নেতাদের খুব সাবধান হইতে হইবে। দুইশ' বছরের গোলামী শুধু আমাদের ভাতের দৈন্যই ঘটায় নাই, ভাবের দৈন্যও ঘটাইয়াছে। অভাব আমাদের চতুর্দিকে। কোনটা ফেলিয়া কোনটা আগে মিটাইব ? গরিবের সংসার আমাদের এমন দিকভ্রান্তি স্বাভাবিক। কিন্তু নেতৃত্বের পরীক্ষাও এইখানেই। দিকভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। আগে-পরের বিচার-বুদ্ধি হারাইলে সব ভণ্ডুল হইয়া যাইবে। অনেক নেতা ইতিমধ্যে এই ভুলই করিতে শুরু করিয়াছেন। এক দল বলিতেছেন ঃ 'আগে পরিষদের সার্বভৌমত্ব চাই।' এঁদের জবাব আগেই দিয়াছি। অপর দুইটি দলের একদল এক প্রান্ত হইতে বলিতেছেন ঃ 'ভাতের আগে ধর্ম চাই ; দুনিয়ার আগে দ্বিন চাই।' অপর প্রান্ত হইতে আরেক দল বলিতেছেন ঃ 'ভোটের আগে ভাত চাই।' দুই দলের উদ্দেশ্যই সাধু। ধর্মই যদি না থাকিল, আত্মাই যদি মরিয়া গেল, দুনিয়াবী সুখ-সম্পদ দিয়া তবে কি করিব ? অপর পক্ষে খোরাকির অভাবে যদি রাষ্ট্রের মনিব জনগণই মারা গেল, তবে এই ফাঁকা গণতন্ত্র কার কাজে লাগিবে ?

কিন্তু প্রশ্ন এই ঃ ধর্মই হউক, আর ভাতই হউক, আমরা চাহিতেছি কার কাছে? গোলামের ধর্ম, আর ভিক্ষার চাউলই কি আমাদের কাম্য ? কখনই না। ভোটের অভাব হইলেই যদি ভাত আসিত, তবে ভোটাধিকারহীন আইউব শাহির দশ বৎসরে আমাদের পাকঘর ভাতে ভাসিয়া যাইত। আর আযাদিহীন ধর্ম-সাধনাই যদি আমাদের কাম্য হইত, তবে ইংরাজ-শাসিত ভারত দারুল-হার্ব হইত না, দারুল-ইসলাম হইত। আগে গণতন্ত্র কায়েম হউক। আমরা নিজ হাতে গরিবের খানা পাকাইব। পেট ভরিয়া খাইয়া সুস্থ দেহে শান্ত মনে ধর্ম-কাজ করিব। অতএব আগে চাই গণতন্ত্র।

নেতারা বুঝুন, মার্শাল ল অথরিটি হিসাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার যা কর্তব্য ছিল, তা তিনি করিয়াছেন। এখন নির্বাচিত পরিষদের, সুতরাং নেতাদের, কর্তব্য শাসনতন্ত্র রচনা করা। অনুমোদনের প্রশ্ন লইয়া তাঁদের মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। তাঁরা জনগণের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করুন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উহা গ্রহণযোগ্য হইবেই। জনগণের অনুমোদিত শাসনতন্ত্র প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করিতে বাধ্য হইবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে গণতন্ত্রের চাবিকাঠি এখন আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হাতে নাই। এটা এখন নেতাদের, তথা নির্বাচিত পরিষদের হাতে। জনগণের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচনার মধ্যেই সে গোপন চাবি–কাঠি নিহিত। এ দায়িত্ব মামুলি গণতান্ত্রিক দায়িত্ব নয়। কারণ পাকিস্তান মামুলি ফেডারেল রাষ্ট্র নয়। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাই এটাকে করিয়াছে অসাধারণ। পাকিস্তান একটা, কিন্তু তাঁর পাকস্থলী দুইটা। দুই রিজিওনের ফ্রন্টিয়ার এক না হওয়ায় তাদের ইন্টিরিয়ারও কাজেই এক না। ইন্টিরিয়ার দুইটা হওয়ায় দুই পাকস্থলীর মুখও দুইটা। এই দুই মুখেই দুই পাকস্থলী ভরিতে হইবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব জাতীয় ঐক্য ও 'ষ্ট্রং সেন্টার' কোনও যুক্তিতেই এক পেট ভুখা রাখা চলিবে না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে এই সমস্যার সমাধান থাকিতে হইবে।

দেশকে এমন শাসনতন্ত্র দিতে পারে শুধু সার্বভৌম জনগণই, এটা ঠিক। কিন্তু এটাও তেমনি ঠিক। যে সার্বভৌমত্ব বাইরের কারও দেওয়া–নেওয়ার ব্যাপার নয়। ব্যক্তির যেমন আত্ম–মর্যাদা বোধ, জাতির তেমনি সার্বভৌমত্ব। উভয়টাই নিজের কাছে। ব্যক্তির আত্ম–মর্যাদার যা ডিগনিটি, জাতির সার্বভৌমত্বের তাই ম্যাজেস্টি। সুরুজের কিরণের মতই ওরা স্ব–প্রকাশ।

পাকিস্তানের নেতাদের এই ডিগনিটি ও পাকিস্তানী জনগণের এই ম্যাজেস্টি সুরুজের কিরণের মতই আত্ম–শক্তিতে প্রকট হউক, পাকিস্তানের জীবনে অমাবস্যার পুনশ্চ আর কোনও দিন না ঘটুক, এই মুনাজাত করিয়া এই পুনশ্চ লেখা শেষ বারের মত শেষ করিলাম। আল্লাহ পাকিস্তানের হেফাযত করুন। আমিন, সুম্মা আমিন।

নয়া অধ্যায়
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ
উপাধ্যায় এক
প্রথম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন

১. 'পুনশ্চে'র অবসান

খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাকে আর 'পুনশ্চ' লিখিতে হইল না। মেহেরবান আল্লা আমার মুনাজাত কবুল করিয়াছেন। আবার 'পুনশ্চ' লেখার দায়িত্ব হইতে আমাকে রেহাই দিয়াছেন। সে উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে নয়া যমানার সূচনা করিয়াছেন। ফলে আমিও এবার 'পুনশ্চের' বদলে 'নয়া অধ্যায়' লিখিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমার ইচ্ছা আমাদের জাতীয় জীবনের এই নয়া অধ্যায়টি আমার বই –এর এক অধ্যায়েই শেষ হউক। এটা করিতে গিয়া দেখিলাম, যত সংক্ষেপই করি, অধ্যায়টি খুব বেশি বড় হইয়া যায়। পাঠকের সুবিধার খাতিরে, এবং বইটির সৌষ্ঠবের জন্যও, অধ্যায়টি একাধিক ভাগে ভাগ করা দরকার।

এ অবস্থায় আমি অনেক চিন্তা–ভাবনা করিয়া এই অধ্যায়ের ভাগগুলোর নামকরণ করিলাম 'উপাধ্যায়' (উপ+অধ্যায়)। ইদানিং 'উপ' শব্দটা আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। 'জন' মানে এখানে 'বিদগ্ধ জন'। 'উপ' শব্দটার প্রচুর ব্যবহার আগেও ছিল। যেমন, 'উপকার', 'উপদংশ', 'উপদেশ' 'উপপতি', 'উপপত্নী', 'উপবাস', উপমা', 'উপযুক্ত', 'উপসর্গ', 'উপসংহার', 'উপহার' ও 'উপহাস'। আরও অনেক আছে। মাত্র এক ডজনের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু আমাদের বিদগ্ধ মনীষীরা সম্প্রতি 'উপ' শব্দটার প্রতি যে আসক্তি দেখাইতেছেন, তাতে 'উপপতি' ও 'উপপত্নীর' দিকেই পক্ষপাতিত্ব দেখান হইতেছে। ফলে 'উপাচার্য', 'উপরাষ্ট্রপতি', 'উপকমিটি', 'উপকর্মাধ্যক্ষ', 'উপমহাধ্যক্ষ' ইত্যাদির প্রচুর ব্যবহার চলিতেছে। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করিলাম। 'উপাধ্যায়ের' ভিন্ন অর্থ আছে, এই যুক্তিতে বিদগ্ধ মনীষীরা আমার এই নামকরণে আপত্তি করিতে পারিবেন না। তাঁদের আবিষ্কৃত 'উপরাষ্ট্রপতির' 'উপ' বিশেষণটি 'রাষ্ট্র' ও 'পতি' উভয়টার গুণবাচক হইতে পারে, এমন বিভ্রান্তির ঝুঁকিই যখন তাঁরা লইয়াছেন, তখন 'উপাধ্যায়ের' বিভ্রান্তির ঝুঁকিতে তাঁদের আপত্তি হওয়া উচিৎ নয়।

গত সংস্করণের 'শেষ কথা' অনুচ্ছেদে আমি লিখিয়াছিলাম : 'পাকিস্তানের নেতাদের এই ডিগনিটি ও পাকিস্তানী জনগণের এই ম্যাজেস্টি সুরুজের কিরণের মতই আত্মশক্তিতে প্রকট হউক, পাকিস্তানের জীবনের অমাবস্যার 'পুনশ্চ' আর কোনও দিন না ঘটুক, এই মুনাজাত করিয়া এই 'পুনশ্চ' লেখা শেষবারের মত শেষ করিলাম।'

কথাগুলি লিখিয়াছিলাম ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতাদের অনেকেই এল. এফ. ও.-র দরুন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন কি না, ভাবিতেছিলেন। তাঁদের মতে এল. এফ. ও. নির্বাচিত পরিষদের সার্বভৌমত্ব হরণ করিয়াছে। কাজেই ঐ ক্ষমতাহীন পরিষদে নির্বাচিত হইয়া জনগণের দাবিমত . এবং তাঁদের পার্টি মেনিফেস্টো মত শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করা যাইবে না।

২. আওয়ামী নেতৃত্বের দূরদর্শিতা

তাঁদের যুক্তি অসার ছিল না। কিন্তু প্রশ্নটার আরেকটা দিক ছিল। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনে এল. এফ. ও.-র কোনও প্রভাব ছিল না। এল. এফ. ও.-র প্রভাব শুরু হইত নির্বাচনের পরে, পরিষদের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর। কাজেই আমি দৈনিক সংবাদপত্রে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় ঘন-ঘন প্রবন্ধ লিখিয়া এই তরফটার দিকে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলাম। তার পক্ষে অনেক যুক্তি-তর্কও পেশ করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, আমাদের রাজনৈতিক জীবনে অমাবশ্যার 'পুনশ্চ' ঠেকাইবার উহাই একমাত্র পথ।

জনপ্রিয় পার্টিসমূহের মধ্যে কার্যতঃ একমাত্র আওয়ামী লীগই 'ছয় দফার' ভিত্তিতে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনগণ তাদের অন্তরের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছিল। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌমত্বের সামনে সামরিক প্রেসিডেন্ট এল. এফ. ও. ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মত উড়িয়া গিয়াছিল। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে আরেকবার 'পুনশ্চ' লেখার দায় হইতে বাঁচিয়া গেলাম। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে, সুতরাং 'আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে', একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের এই নয়া অধ্যায়ে কালে নিশ্চয়ই আরও নূতন-নূতন অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, দফা ও উপ-দফা যোগ হইবে। কিন্তু 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে' সেসব নূতন-নূতন দফা-উপদফা যোগ করিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিব না। থাকিয়া কোন লাভও নাই। তার দরকারও নাই। কারণ 'আমার -দেখা রাজনীতির' বয়স তখনও পঞ্চাশই থাকিবে। আমার বই-

এর নামও 'পঞ্চাশ বছর'ই থাকিবে। এই ধরুন না, ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে এই বই যখন প্রথম বাহির হয়, তখনও এর নাম ছিল 'রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'। দুই বছর পরে ১৯৭০ সালে জুন মাসে যখন দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, তখনও এর নাম ছিল 'রাজনীতির পঞ্চাশ বছর।' দুই বছরে 'আমার দেখা রাজনীতির' বয়স একদিনও বাড়িল না। তারপর আরও তিন বছর পরে ১৯৭৩ সালে যখন এর তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে, তখনও এর নাম 'পঞ্চাশ বছর'। এর কারণ তিনটা হইতে পারে। (১) 'পঞ্চাশ' শব্দটা এই বইয়ে সংখ্যার চেয়ে বেশি প্রতীক-নির্দেশক ; (২) লেখকের রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তার ওটাই ভ্যানিশিং লাইন ; (৩) এই মুদ্দতের রাজনীতি লেখকের 'দেখার' চেয়ে 'শুনাই' বেশি। কারণ এতে লেখকের ব্যক্তিগত ও দৈহিক যোগাযোগ একেবারে নাই বলিলেই চলে।

৩. এবারের 'দেখা' গ্যালারির দর্শকের

এ মুদ্দতের রাজনীতিটা লেখকের 'দেখা' মানে ইংরেজী 'সি' নয়, 'অবযার্ভ'। গ্যালারির দর্শকরা যেমন মাঠের খেলা দেখেন, নিজেরা খেলেন না। কিন্তু গ্যালারির এই দর্শকদের মধ্যেও দুই কেসেমের লোক থাকেন। এক কেসেমের লোক জীবন-ভর দর্শক। খেলা দেখিয়াই তাঁদের আনন্দ। নিজেরা কোনও দিন প্রতিযোগিতায় ত খেলেন নাই, জীবনে কোনও দিন পায়ে বল বা হাতে ব্যাট নিয়াও দেখেন নাই। আর এক কেসেমের দর্শক আছেন, যাঁরা আগে খেলিতেন। এখন খেলা থনে অবসর নিয়াছেন। এখন শুধু খেলা দেখেন। সাবেক খেলোয়াড় বলিয়া খেলার ভাল-মন্দ, খেলোয়াড়দের দোষ-ত্রুটি, নিখুঁতভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা এবং অধিকারও এঁদের আছে। বর্তমানের রাজনীতির খেলার মাঠের আমি এমনি একজন দর্শক মাত্র। এই উভয় খেলার মাঠের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য এই যে প্রবীণ সাবেক খেলোয়াড় দর্শকরা নবীনদের খেলার দোষগুণের নিখুঁত ও নির্ভুল বিচার করিতে পারেন ঠিকই এবং দোষ-ত্রুটি দেখাইতেও পারেন বটে, কিন্তু নিজেরা খেলিতে পারেন না।

৪. ফুটবল যাদুকর সামাদের কথা

খেলার কথাটা উঠিয়া পড়ায় এ সম্পর্কে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও আমি প্রায় প্রতিদিন কলিকাতার গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখিতে যাইতাম। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তখন দৈনিক 'কৃষকের' ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আর আমি এডিটর। ইউনিভার্সিটি হইতে খেলার মাঠে যাইবার পথে তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতেই তুলিয়া নিতেন। ফুটবলের যাদুকর সামাদ

সাহেব তখন খেলা হইতে সম্প্রতি রিটায়ার করিয়াছেন। নিয়মিত দর্শক। অনেক দিনই আমরা পাশাপাশি বসিয়া খেলা দেখিতাম। এমনি একদিন আমরা কৌতূহলে জিগ্গাস করিলাম ঃ 'তরুণ খেলোয়াড়দের খেলা আপনার কাছে কেমন লাগে ?' তিনি বিনা-দ্বিধায় জবাব দিলেন ঃ 'খুব ভাল লাগে।' একটু থামিয়া যোগ করিলেন ঃ 'অবশ্য যদি ভাল খেলে।'

'আর যদি খারাপ খেলে তবে আপনার কেমন লাগে ?'

'এক-একবার মনে হয় লাফায়ে মাঠে নেমে পড়ি।' ('লাফিয়ে'টা তখনও ভাষার মাঠে নামে নাই।) আমরা উভয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করিলাম ঃ 'তবে নেমে পড়েন না কেন?'

সামাদ সাহেব হাসিয়া জবাব দিলেন ঃ 'তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, সত্যসত্যই খেলার মাঠে নামলে ওদের মতও খেলতে পারব না।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এককালের লক্ষ দর্শকের হর্ষধ্বনির দ্বারা নন্দিত এই ফুটবলের যাদুকর বলিলেন ঃ 'সব কাজেরই একটা বয়স আছে। কি বলেন আপনারা ?' আমরা কেউ জবাব দিবার আগেই তিনি হাসিয়া বলিলেন ঃ 'বোধ হয় একমাত্র সাহিত্য-সেবা ছাড়া'। আমরা সানন্দে হাসিতে যোগ দিলাম।

৫. গ্যালারিতে কেন ?

ফুটবল খেলার বিশেষজ্ঞ সামাদ সাহেবের ফুটবল সম্পর্কে এই কথাটা আমার মতে রাজনীতিতেও প্রযোজ্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমার সমর্থক বেশি নাই। তবে আমার যুক্তিতে জোর আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার মতে সরকারী চাকুরিয়াদের মতই পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে রাজনীতিক নেতাদের সক্রিয় রাজনীতি থনে অবসর নেওয়া উচিৎ। কারণ এই বয়সের পরে রাজনীতিক নেতারা পার্লামেন্টারি রাজনীতির অযোগ্য হইয়া পড়েন। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেও, ডিক্টেটরি রাজনীতিতেও। গণতান্ত্রিক দলীয় রাজনীতিতে অযোগ্য হন এই কারণে যে তাঁরা তখন আর গণতান্ত্রিক থাকেন না। বয়স ও অভিজ্ঞতার দাবিতে তাঁরা বিরুদ্ধতা ও সমালোচনা সইতে পারেন না। আর ডিক্টেটরি রাজনীতি করিবার মত বেপরোয়া অযৌক্তিক মনোভাবের অধিকারীও তাঁরা এই বয়সে থাকেন না। এক কথায়, এই বয়সের লোকেরা গণতন্ত্রের জন্য একটু বেশি মাত্রায় শক্ত। আর ডিক্টেটরির জন্য বেশি মাত্রায় নরম। আমার এই যুক্তি কেউ মানেন না। প্রায় সবাই বলেন, বয়স বৃদ্ধির সংগে-সংগে মানুষের রাজনীতিক দক্ষতা বাড়ে। বাংলার ফজলুল হক ও সুহরাওয়ার্দী, ইংলণ্ডের চার্চিল, পশ্চিম জার্মানীর কনরাড অডনেয়ার,

ভারতের জওয়াহের লাল, যুগোস্লাভিয়ার টিটো প্রভৃতি সফল রাজনীতিকদেরে তাঁরা তাঁদের সমর্থনের নযির খাড়া করেন। আমার মতে ওঁরা দৃষ্টান্ত নন, ব্যতিক্রম মাত্র।

যা হোক, কেউ না মানিলেও আমি আমার যুক্তি মানিয়া লইয়াছি। পঞ্চাশ-ষাটে না করিলেও ষাট-পয়ষট্টিতে সক্রিয় রাজনীতি থনে অবসর গ্রহণ করিয়াছি। এটা স্বেচ্ছায় ঘটিয়াছে কি স্বাস্থ্যগত কারণে বাধ্যতামূলকভাবে ঘটিয়াছে, তা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ সক্রিয় রাজনীতি না করিলেও 'নিষ্ক্রিয় রাজনীতি' আজও করিয়া চলিয়াছি। কারণ সেই প্রবাদ বাক্যের কম্বল। আপনি কম্বল ছাড়িলেও কম্বল আপনাকে ছাড়িবে না। 'আমার দেখা রাজনীতির' এই অধ্যায়ে, যাকে কার্যতঃ এই বই-এর শেষ অধ্যায় বলা যাইবে, যা লিখিতে বসিয়াছি, তাতে সেই কম্বলের কাহিনীই সত্য প্রমাণিত হইবে।

৬. রাজনৈতিক 'হরিঠাকুর'

কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনে। কম্বলের সাথে রাজনীতির তুলনা না করিয়া রাজনীতিকের তুলনাই বোধ হয় ঠিক। কারণ আমি রাজনীতি ছাড়িবার পরও রাজনীতি আমাকে ছাড়ে নাই, এ কথা বলিলে রাজনীতির প্রতি অবিচার হইবে। রাজনীতি কখনও অনিচ্ছুক ব্যক্তির উপর ভর করে না। যাঁরা বলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা রাজনীতির শিকার হইয়াছেন, তাঁদেরে মিথ্যাবাদী না বলিয়াও একথা বলা চলে যে, তাঁদের মনে রাজনীতি করিবার একটু কুৎকুতানি ছিল। হইতে পারে সেটা ছিল অবচেতন মনে। কিন্তু ছিল তা অবশ্যই। সেটা প্রকাশ পাইয়াছে দৃশ্যতঃ বাহিরের একটু চাপে। চাপটাও হয়ত তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। এটাকে আমি অন্যত্র 'বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে' রাজনীতিতে, মানে ইলেকশনে, যোগদান বলিয়াছি।

অহংকারের দায়ে অপরাধী না হইয়াও আমি বলিতে পারি, আমি 'বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধের' স্তর পার হইয়াছি। ওতে আমি আর আকৃষ্ট হই না। ফুটবলের যাদুকর সামাদ সাহেবের মতই এ বুড়া বয়সেও যে মাঠে নামিতে সাধ যায় না, তা নয়। কিন্তু সামাদ সাহেবের মতই নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধেও আমি তীক্ষ্ণভাবে সজাগ। তাই আমি প্রথমদিকে বেশ আয়াসে এবং পরে বিনা-আয়াসে নিজেকে বিরত করিতে পারিয়াছি। এই কারণে আমি সক্রিয় রাজনীতি হইতে ধীরে ধীরে সরিয়াছি। মানে বায়োস্কোপের ছবির মত 'ফেড্-আউট' করিয়াছি।

কিন্তু রাজনীতিকরা আমাকে বাধ্য করিয়াছেন নেপথ্যে অভিনয় করিতে। অবশ্য একেবারে মৃত সৈনিকের পাঠ নয়। আমাকে তাঁরা রাজনৈতিক চিন্তা হইতে মুক্তি দেন

নাই। তাই আমি প্রায় এক যুগ হইতে 'এলডার স্টেট্‌স্‌ম্যান' হইয়াছি। আমাদের দেশী ভাষায় বলা যায় রাজনৈতিক 'হরিঠাকুর'। বন্ধুবর আতাউর রহমানের ভাষায় 'হৈরোতাঁতী'। হরিঠাকুরের কাহিনী বাংলার সব অঞ্চলেই চালু আছে। কারণ সব গাঁয়েই একজন বুড়া মুরুব্বির দরকার যাঁর জ্ঞান ও নিরপেক্ষতায় সকলের আস্থা আছে। কিন্তু আতাউর রহমান সাহেবের জন্মভূমি ঢাকা জিলার ধামরাই থানাটাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এই ধামরাই থানায় হরিঠাকুর নামে একজন 'এলডার-স্টেট্‌স্‌ম্যান' ছিলেন। তিনি 'হরিঠাকুর' নামেই বিখ্যাত ছিলেন। তাঁতী কূলে তাঁর জন্মের কথা কারও মনেই ছিল না। অসাধারণ জ্ঞানের জন্য 'দেশ-বিদেশে', মানে দশ গাঁয়ে, তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া দূরদূরান্ত হইতে লোকজন দল বাঁধিয়া তাঁর কাছে আসিত। তাঁর-দেওয়া সমাধান যেসব সময়ে নির্ভুল বা গ্রহণযোগ্য হইত, তা নয়। কিন্তু তাতে হরিঠাকুরের বুযুর্গিও কমিত না। তাঁর দরবারের, মানে আংগিনার, ভিড়ও কমিত না। একটা নযির দিয়াই আতাউর রহমান সাহেব 'হরিঠাকুরের', তাঁর দেওয়া আদরের নাম 'হৈরার', বুদ্ধিমত্তার গভীরতা প্রমাণ করিয়া থাকেন। ঘটনাটা ছিল এই ঃ একবার এই অঞ্চলের কয়েকজন পথিক একটা তালের আঁটি পথে পড়িয়া পাইল। ধামরাই অঞ্চলে খেজুর নারিকেল প্রচুর হইলেও সেখানে তালগাছ খুব কমই হয়। কাজেই তারা তালের আঁটি কখনও দেখে নাই। এ অবস্থায় ঐ অদ্ভুত জিনিসটা কি, তা লইয়া নিজেদের মধ্যে অনেক সলা-পরামর্শ ও বাদ-বিতণ্ডা করিল। একমত হইতে না পারিয়া শেষে তারা 'হরিঠাকুরের' কাছে গেল। হরিঠাকুর প্রকৃত প্রবীণ জ্ঞানীর মতই বস্তুটি অনেকক্ষণ উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিলেন। চোখ বুজিয়া ধ্যান করিলেন। চোখ বড় করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। অবশেষে তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। খানিকক্ষণ হাসিবার পর তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ কাঁদিবার পর ঠাকুর আবার হাসিতে লাগিলেন। সমবেত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অভূতপূর্ব আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। ঠাকুরকে এর কারণ জিগ্‌গাসা করিল। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর ঠাকুর বলিলেন ঃ 'এই একটা তুচ্ছ বস্তু তোরা চিনিতে পারিলি না, তাই আমি তোদের নির্বুদ্ধিতায় প্রথমে হাসিয়াছি। হাসিবার পরে তিনি কাঁদিলেন কেন, ভক্তদের এই প্রশ্নের জবাবে ঠাকুর বলিলেন ঃ 'আমার অবর্তমানে তোদের কি দশা হইবে, সে কথা ভাবিয়া আমি কাঁদিয়াছিলাম।' কাঁদিবার পর তিনি আবার হাসিলেন কেন, এই প্রশ্নের জবাবে ঠাকুর বলিলেন ঃ ''বস্তুটি কি আমি নিজেই তা বুঝি নাই, তোদের কি বুঝাইব ? এই ভাবিয়া আমি হাসি ঠেকাইতে পারি নাই।"

ধামরাইর এই ঐতিহাসিক হরিঠাকুরের দশা হইয়াছে আমার। গত এক দশক ধরিয়া এই অবস্থা চলিতেছে। বন্ধুবর আতাউর রহমানই আমার এই পদবি চালু

করিয়াছেন। নিজের দলীয় সহকর্মীদের সহিত রাজনৈতিক জটিল প্রশ্নসমূহের আলোচনায় মতভেদ তীব্র হইয়া উঠিলেই তিনি বলেন ঃ 'চল 'হৈরার' কাছে যাই।' এটা এখন সকল দলের মধ্যে চালু হইয়াছে। আওয়ামী লীগ, জাতীয় লীগ, সমাজতান্ত্রিক পার্টি, মুসলিম লীগ (কনভেনশন ও কাউন্সিল), জমাতে ইসলামী, নিযামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উভয় শাখা, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি পরস্পর-বিরোধী মতবাদ ও কর্মপন্থার সকল দলের নেতা-কর্মীরা আমার 'উপদেশ' ও 'পরামর্শ' নিতে আসিয়া থাকেন। সাধারণ জাতীয় প্রশ্নের বেলা ত বটেই, তাঁদের যাঁর-তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও কর্মপন্থার জটিল সমস্যাসমূহের মীমাংসা সম্বন্ধেও। ফলে আমার বাড়িতে সকাল-বিকাল ভিড় লাগিয়াই আছে। মনে হইবে আমি কতই না রাজনীতি করিতেছি। ডাক্তার বা উকিলের ব্যবসার দিক হইতে বিচার করিলে মনে হইবে আমার চেম্বার-প্র্যাকটিস একেবারে জমজমাট, যাকে বলে 'রোরিং প্র্যাকটিস'। আমার অসুখ-বিসুখ, অবসর বিশ্রাম কোন অজুহাতই চলিবে না। বিনা খবরে, উইদআউট এপয়েন্টমেন্টে, যখন খুশি আমার কাছে আসার অধিকার সকলেরই আছে। আমার 'না' বলিবার অধিকার নাই। দু'দশ মিনিট দেরি করিবার উপায় নাই। খবর পাওয়ামাত্র বৈঠকখানায় হাযির হইতে হইবে। 'অন্যত্র কাজ আছে,' 'বিলম্ব করিবার মত সময় নাই' এই ধরনের যুক্তিতে তাঁরা ঘন-ঘন তাকিদও পাঠাইয়া থাকেন। ত্রস্তব্যস্ত হইয়া আমি বৈঠকখানায় আসিলে তাঁরা আলোচনাকে দীঘে-পাশে ও গভীরতায় যেভাবে প্রসারিত ও দীর্ঘায়িত করেন, তাতে মনে হয় না যে তাঁদের 'হাতে সময় নাই' বা 'অন্যত্র কাজ আছে।'

গত এক যুগ ধরিয়া আমি এই 'হরিঠাকুরের' কঠোর ও শ্রম-সাধ্য দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ আমার সকলেরই জানা। রাজনীতিতে আমি সেকিউলার ডেমোক্র্যাট, অর্থনীতিতে আমি সমাজবাদী। এসব বিষয়ে আমি বইপুস্তক ও বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছি। সকল দলের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরাই তা জানেন। সক্রিয় রাজনীতি না করিলেও আমি আদর্শবাদ ও কর্ম-পন্থার দিক হইতে আওয়ামী লীগের সমর্থক, এটা জানিয়াও নন-আওয়ামী লীগাররা আমার পরামর্শ নিতে আসেন। আমি ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতির ঘোর বিরোধী জানিয়াও মুসলিম লীগ, জমাতে ইসলামী ও নিযামে ইসলামের নেতারাও আমার উপদেশ পরামর্শ চাহেন। উপদেশ দিবার আগে আমার সেকিউলার মতবাদের কথা, তাঁদের মত-বাদে আমার কঠোর বিরোধিতার কথা, স্মরণ করাইয়া দিলেও তাঁরা আমার উপদেশের জন্য যিদ করেন। তাঁরা বলেন এবং দৃশ্যতঃই বিশ্বাসও করেন যে, তাঁদের মতবাদের দিক হইতে আমি ঠিক পরামর্শই দিব। দেইও আমি। এ ব্যাপারে আমি উকিলের মতই

আচরণ করি। উকিল যেমন আসামী-ফরিয়াদী উভয় পক্ষকেই তাদের স্বার্থ-মোতাবেক নিরপেক্ষ উপদেশ দিতে পারেন, উপদেশ-প্রার্থীদের বিশ্বাস, রাজনীতিতে আমিও তা পারি এবং দেই। তবে আওয়ামী লীগের বেলায় আমার উপদেশ নিছক উকিলের মত নয়। আন্তরিকই। কারণ সংগঠনের দিক হইতে আমি আওয়ামী লীগার না হইলেও মনে-প্রাণে ও আদর্শে আমি আজও আওয়ামী লীগার। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক দলসমূহকেও আমি আন্তরিকতার সাথেই উপদেশ দিতাম। ধরুন, মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীকেও আমি বলিয়াছি ঃ 'আপনারা যে মতাদর্শের রাজনীতিই করুন না কেন, দুইটা কথা মনে রাখিতে হইবে। এক, ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে সাথে জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও বলিতে হইবে। দুই, পার্টির নেতৃত্ব ও হেড অফিস পূর্ব-পাকিস্তানে থাকিতে হইবে।' ওসব পার্টি-নেতারা যে আমার উপদেশ রাখিতেন, তা নয়। তবু তাঁরা উপদেশ চাইতে বিরত হন নাই। আমিও দিতে কৃপণতা করি নাই।

আমার অনেক হিতৈষী বন্ধু আমার এই আচরণের প্রতিবাদ করিতেন। অন্ততঃ আমার স্বাস্থ্যের নাযুক অবস্থার দরুন এ সব 'অকাজ' হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন। তাঁদের কথা ঃ যারা আমার উপদেশ মত কাজ করে না, তাদের নাহক উপদেশ দেই কেন ? আমার জবাব ; 'আমি ত কাউকে যাচিয়া উপদেশ দেই না। ওঁরাই উপদেশ নিবার জন্য তকলিফ করিয়া আমার কাছে আসেন। তাঁদের অনুরোধ না রাখা বেআদবি।' আমার একটা যুক্তি, আমার বৈঠকখানাটা খয়রাতী দাওয়াখানা। যাঁরা দাওয়াই চান, তাঁদেরই দেই। দাওয়াই ব্যবহার করা-না-করা রোগীদের ইচ্ছা।'

একটা নযির। জমাতে ইসলামীরা যখন দৈনিক বাংলা খবরের কাগয বাহির করা মনস্থ করিয়াছিলেন, তখন সম্পাদক পরিচালকসহ নেতৃবৃন্দ আমার কাছে আসিয়া কাগযের নাম সম্বন্ধে পরামর্শ চান। তাঁদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে তাঁরা 'সংগ্রাম' নামের কথা বলিলেন। আমি বাংগালী মুসলমানদের সাংবাদিকতার দীর্ঘদিনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া দেখাইয়া দিলাম যে আমাদের সাংবাদিকতার ঐতিহ্য খবরের কাগযের নাম সহজ-সরল চালু আরবী-ফারসী শব্দেই রাখা। 'সংগ্রামের' মত সংস্কৃত শব্দ নামে ব্যবহার করা এ দেশের রেওয়াজ নয়। উত্তরে তাঁরা যা বলিলেন এবং করিলেন তা বাংলাদেশে অবাংগালী মুসলিম নেতৃত্বের অসরল কমপ্লেক্স। সোজাসুজি বলিলেন ঃ আপনারা বাংগালীরা নির্ভয়ে আরবী-ফারসী নামের কাগয চালাইতে পারেন, কিন্তু জমাতে ইসলামী তা করিলে লোকে বলিবে, বাংগালীদের সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

কমপ্লেক্সটা গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই কারণেই রাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা বাংলা ভাষা ব্যবহারের সময় সংস্কৃত-ঘেষা ও কলিকাতার কথ্য বাংলাকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

এই সব পার্টির নেতারা আমার উপদেশ মানিতেন এটাও যেমন ঠিক নয়, কেউই যে আমার উপদেশ মানেন নাই, তাও সত্য নয়। বরং আমি যখন পাকিস্তানের রাজধানীর অবস্থিতিকেই পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতি ও পূর্ব-পাকিস্তানের অবনতির কারণ বলিয়া যুক্তি দিতেছিলাম, এবং এ বিষয়ে একাধিক ইংরাজী-বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তখন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) নেতৃত্বের উদ্যোগে পাকিস্তানের রাজধানী কুড়ি বৎসরের জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করিতে এবং অতঃপর পর্যায়ক্রমে দেশের রাজধানী উভয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মুসলিম লীগে গৃহীত হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে আমার ধানমণ্ডির বাড়িতে কেউ কেউ 'হরিঠাকুরের আস্তানা' না বলিয়া কাশিম বাজারের কুঠি (ষড়যন্ত্রের আড্ডা অর্থে) বলিয়াছিলেন। তাতেও তাঁদের প্রতি আমার বা আমার প্রতি তাঁদের মনোভাবের কোন অবনতি ঘটে নাই। প্রমাণ, তাঁরাও আমার 'উপদেশ' নিতে আসিতেন। আর সবার মতই তাঁরাও মনে করিতেন : স্বপক্ষেরটা উপদেশ, আর বিপক্ষেরটা ষড়যন্ত্র।

আমার দিককার আসল কথা, এই ধরনের উপদেশ দেওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ ছিল। বোধ হয় মনের কোণে একটা গোপন অহংকারও ছিল। সবাই আমার উপদেশ নিতে আসেন, এটা আমার কম গৌরবের কথা নয়। এমন একটা অহমিকার ভাব হয়ত আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। বাহিরে গিয়া নেতৃত্ব, বক্তৃতা ও মন্ত্রিত্ব করিয়া যশ-খ্যাতি অর্জন করিতে পারি না ; ঘরে বসিয়া একটু-একটু মুরুব্বিয়ানা করাটা মন্দ কি?

কাজেই এটা যে শুধু মৌখিক উপদেশেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। অনেক সময় হাতে-কলমে শারীরিক-মানসিক পরিশ্রমও করিতে হয়। আমার আপত্তি ত নাই, বরঞ্চ পরম উৎসাহেই এটা করিয়া থাকি। বক্তৃতা-বিবৃতি, মেনিফেস্টো ইত্যাদি রচনা করার দায়িত্ব এই বুড়া মানুষটাকে দেওয়া অনেক তরুণই নিষ্ঠুরতা মনে করিয়াছেন। কিন্তু এই বুড়ার উৎসাহ দেখিয়া হয়ত তাঁরা অবাকও হইয়াছেন। শুধু ওসব লিখিয়া দেওয়াই নয়, ওগুলো যাতে নির্ভুল রূপে ছাপা হয়, তার জন্য আমি নিজে প্রুফ দেখিবার জন্য যিদ করিয়াছি। যে লেখাটা আমার যত বেশি পছন্দ হইয়াছে, সেটা তত বেশি মনোযোগের সহিত প্রুফ দেখিয়াছি। আমার এই অভ্যাসের দরুন, অনেক কিছুর জন্যই নাহক আমাকে নিন্দা-প্রশংসা পাইতে হইয়াছে। একাধিক দৃষ্টান্তের মধ্যে

আওয়ামী লীগের 'ছয় দফার' নাম করা যায়। অনেকের, এমনকি খোদ আওয়ামী লীগারদেরও অনেকের, বিশ্বাস, 'ছয় দফা' আমিই রচনা করিয়াছি। যুক্তফ্রন্টের 'একুশ দফা'ও আমিই রচনা করিয়াছিলাম। এই সুপরিচিত তথ্য হইতেই সকলে অতি সহজেই 'ছয় দফাও' আমার রচনার কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন। আসল সত্য তা নয়। আমি 'ছয় দফা' রচনা করি নাই। 'ছয় দফার' ব্যাখ্যায় বাংলা-ইংরাজী যে দুইটি পুস্তিকা 'আমাদের বাঁচার দাবি' ও 'আওয়ার রাইট টু লিভ' প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত হইয়াছে, এই দুইটি অবশ্যই আমি লিখিয়াছি এবং বরাবরের মত নির্ভুল ছাপা হওয়ার গ্যারান্টি স্বরূপ আমি নিজেই তাদের প্রুফও দেখিয়া দিয়াছি। মুজিবের ভালর জন্যই একথাটা গোপন রাখা স্থির হইয়াছিল। সে গোপনতার হুঁশিয়ারি হিসাবে প্রুফ নেওয়া-আনার দায়িত্ব পড়িয়াছিল তাজউদ্দিনের উপর। মানিক মিয়া, মুজিব, তাজউদ্দিন ও আমি এই চারজন ছাড়া এই গুপ্ত কথাটা আর কেউ জানিতেন না। অথচ অল্প দিনেই কথাটা জানাজানি হইয়া গেল। মুজিব তখন জেলে। আমি ভাবিলাম, মুজিবের কোনও বিরোধী পক্ষ তাঁর দাম কমাইবার অসাধু উদ্দেশ্যে এই প্রচারণা চালাইয়াছে। কাজেই আমি খুব জোরে কথাটার প্রতিবাদ করিতে থাকিলাম। পরে শেখ মুজিবের সহকর্মী মরহুম আবদুস সালাম খাঁ ও যহিরুদ্দিন সাহেবানের মুখে যখন শুনিলাম, স্বয়ং মুজিবই তাঁদের কাছে একথা বলিয়াছেন, তখন আমি নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইলাম।

মোট কথা রাজনীতিক 'হরিঠাকুর' হইয়াও আমি কায়িক পরিশ্রম হইতে রেহাই পাই নাই। ধামরাইর হরিঠাকুর আমার মত পরিশ্রম নিশ্চয়ই করিতেন না। কিন্তু আনন্দ-ও গর্ব-বোধ নিশ্চয়ই করিতেন। দুনিয়ার সব দেশের সকল যুগের হরিঠাকুরদের বোধ হয় এটাই পুরস্কার এবং এ পুরস্কারের দামও কম নয়।

উপাধ্যায় দুই

নয়া যমানার পদধ্বনি

১. আওয়ামী লীগের বিপুল জয়

এই বইয়ের গত সংস্করণের শেষ পাতায় লিখিয়াছিলাম ঃ 'গণতন্ত্রের চাবিকাঠি এখন আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হাতে নাই। এটা এখন নেতাদের, তথা নির্বাচিত পরিষদের, হাতে।' কথা কয়টা লিখিয়াছিলাম ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মুখে। পরে সত্যসত্যই সে নির্বাচন হইয়াছিল ঐ সালের ৭ই ডিসেম্বর। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলেই এক দিনে। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের দুটি বাদে সব কয়টি, মানে ১৬৭টি দখল করিয়াছিল। ঘূর্ণিঝড়ের দরুন উপকূলের নয়টি নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন এক মাস পরে হইয়াছিল। তার সব কয়টিও আওয়ামী লীগই দখল করিয়াছিল বলিয়া সে কথা আলাদা করিয়া বলিলাম না। বস্তুতঃ নির্বাচনের ফলাফল ও পরিণামের দিক হইতে তা নিতান্তই অবান্তর। পশ্চিমাঞ্চলের নির্বাচনের ফলাফল ঠিক তেমন না হইলেও প্রায় কাছাকাছি। সেখানকার জাতীয় পরিষদ সদস্যের ১৪৪টির মধ্যে ৮৪টি আসন মিঃ ভুট্টোর পিপল্‌স্ পার্টি দখল করিয়াছিল। ফলে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে দুই পার্টি একক মেজরিটি লাভ করিল। কোনটিই অপর অঞ্চলে একটিও আসন লাভ না করায় দুইটিই আঞ্চলিক পার্টি হইয়া গেল। পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চল যে বস্তুতঃ দুইটির পৃথক স্বতন্ত্র দেশ, দুইটির রাজনৈতিক চিন্তায়, অর্থনৈতিক স্বার্থে, সুতরাং নেতৃত্বে, যে কোন ঐক্য বা সাদৃশ্য নাই, একথা পশ্চিমা নেতারা বা শাসকগোষ্ঠী কোনওদিন মানেন নাই। ১৯৭০ সালের এই নির্বাচনে পশ্চিমা নেতাদের দাবি মিথ্যা ও পূরবী নেতাদের দাবি সত্য, সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দেহরূপে তা প্রমাণিত হইল। পাকিস্তান পার্লামেন্টের জন্য যতদিন মেম্বর-সংখ্যার প্যারিটি ছিল, ততদিন ঐ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সত্য পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য বিপদজ্জনক ছিল না। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া প্যারিটির স্থলে জনসংখ্যা-ভিত্তিক আসনের বিধান করায় এই বিপদ অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন হইয়া গিয়াছিল।

২. প্যারিটির জাতীয় তাৎপর্য

পাঠকগণের স্মরণ আছে 'পুনশ্চ' শীর্ষক আগের অধ্যায়ে আমি জেনারেল ইয়াহিয়ার এ কাজের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম, পূর্ব-

পাকিস্তানের কোন জনপ্রিয় নেতা বা পার্টিই প্যারিটি বাতিলের দাবি করেন নাই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একরূপ নিজ দায়িত্বেই প্যারিটি ভাংগিয়া 'ওয়ানম্যান ওয়ানভোট' নীতির ভিত্তিতে এল. এফ. ও. জারি করিলেন। দৃশ্যতঃ তিনি পূর্ব-পাকিস্তানীদের উপর সুবিচার করিবার মতলবেই এটা করিয়াছিলেন। গোড়াতে যে প্যারিটির উপর পশ্চিমা নেতারা এত জোর দিয়াছিলেন, যে প্যারিটি না হইলে পশ্চিমারা কোনও সংবিধান রচিত হইতেই দিবেন না বলিয়াছিলেন, সেই পশ্চিমা নেতারাই হঠাৎ পূর্ব-পাকিস্তানীদের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য এতটা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন? পশ্চিমা নেতাদের বেশির ভাগ, অন্ততঃ প্রভাবশালী অংশের বেশির ভাগ, রাযী না হইলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্যারিটি ভাংগিয়া জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ফরমূলা পুনঃ প্রবর্তন করিতেন না, এটা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। দৃশ্যতঃ পূর্ব পাকিস্তানের উপর এই 'সুবিচারটা' তাঁরা স্বেচ্ছায় ও অযাচিতভাবে কেন করিলেন, সকলের মনে এ প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় পশ্চিমা নেতারা বেশ কিছুদিন দেখিয়া-শুনিয়া এটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি দাবি করিয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে সে দাবি আদায় করিয়া, নিজের ফাঁদে তাঁরা নিজেরাই পড়িয়াছিলেন। প্রতিনিধিত্বের প্যারিটির প্রতিদানে আওয়ামী লীগের সার্বিক প্যারিটি দাবি করায়, যুক্ত-নির্বাচন চালু করায় এবং সুহরাওয়ার্দী সাহেবের 'শতকরা ৯৮ ভাগ অটনমি পাওয়ার' উল্লাসে পশ্চিমা নেতারা ধীরে ধীরে প্যারিটির রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৯৫৫ সালের ঘটনা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা সবাই জানেন যে, সুহরাওয়ার্দী যখন প্যারিটির কথা লইয়া পূর্ব-বাংলায় আসেন, তখন হক সাহেব ও মওলানা ভাসানী উভয়েই তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। হক সাহেব খবরের কাগযে বিবৃতি দেন এবং পল্টন ময়দানে জনসভা করেন। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বর্দ্ধিত মিটিংয়ে তাঁর তীব্র বিরোধিতার ব্যাখ্যা করেন। তারপর শহীদ সাহেবের সংগে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব প্যারিটি মানিয়া নেন। হক সাহেব শুধু একা মানিয়া নেন নাই, তাঁর কে. এস. পি. পার্টিকে দিয়া মানাইয়াছিলেন। ঐ সময়কার কে. এস. পি. পার্টিতে অনেক বিদ্বান, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, তাও সকলের জানা আছে। তাঁরাও প্যারিটি মানিয়া নেন। বস্তুতঃ প্যারিটিভিত্তিক '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র তাঁরাই রচনা করেন।

এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব-বাংলার তৎকালীন নেতারা চোখ বুজিয়া বিনা বিচারে প্যারিটি মানিয়া নেন নাই। বরঞ্চ আগে তুমুল প্রতিবাদ করিয়া নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পরে মানিয়া লওয়ায় এটাই বুঝা যায় যে, সুহরাওয়ার্দী সাহেব

প্যারিটির পক্ষে জোরদার যুক্তি দিয়াছিলেন এবং হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব এবং তাঁদের পার্টিদ্বয় বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়াই তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হক সাহেব ও তাঁর দলের বিশেষ দায়িত্ব এই যে, তাঁরা পরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভার মেম্বর হিসাবে প্যারিটিকে শাসনতন্ত্রের ভিত্তি করিয়াছিলেন। এ দায়িত্ব নিশ্চয়ই তাঁরা দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা লইয়াই পালন করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে আমরা আওয়ামী লীগাররা শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়াছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াক-আউটও করিয়াছিলাম। কিন্তু সে ওয়াক-আউট প্রতিনিধিত্বে প্যারিটির প্রতিবাদে ছিল না। অন্যান্য ব্যাপারেও প্যারিটি না করায়, যুক্ত-নির্বাচন প্রথা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না করায়, এবং পূর্ব-পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না দেওয়ায়, এক কথায়, পাঁচ-দফা মারি চুক্তির খেলাফে সংবিধান রচিত হওয়ার প্রতিবাদেই আমরা ওয়াক-আউট করিয়াছিলাম এবং শাসনতন্ত্রিক বিলে দস্তখত দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম।

এইভাবে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর বছর না ঘুরিতেই আমাদের নেতা সেই সংবিধানের অধীনেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং সকলকে বিস্মিত করিয়া বলিলেন ঃ 'পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৯৮ ভাগ অটনমি হাসিল হইয়া গিয়াছে।' সকল দলের পূর্ব-পাকিস্তানীদের মত আমরা তাঁর অনুচরেরাও তাঁকে 'গাযী গাযী করিয়া' ধরিয়াছিলাম। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে স্বীয় উক্তির যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাতে আমাদের অনেকেরই চোখ খুলিয়াছিল। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আমাদেরে বিস্মিত-পুলকিত করিয়াছিল। সে ব্যাখ্যাটির সারমর্ম ও উপসংহার তাঁর ভাষায় ছিল এই ঃ '৪৬ সালে দিল্লী প্রস্তাব পেশ করিয়া আমি লাহোর প্রস্তাব 'বিট্রে' করিয়াছি, এটাই ছিল তোমাদের ক্ষোভ। প্যারিটি ও ওয়ানইউনিটে আজ পাকিস্তান লাহোর-প্রস্তাবের কাঠামোতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন তোমাদের ক্ষোভ দূর হওয়া উচিৎ।' আমাদের হইয়াছিলও তাই। তিনি বুঝাইয়াছিলেন, লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দুই কোণে দুইটি স্বাধীন স্বতন্ত্র পাকিস্তান হওয়ার কথা। দিল্লী প্রস্তাবে ঐ দুইকে এক করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাবটি পেশ করেন সুহরাওয়ার্দী সাহেব নিজে। এই প্রস্তাবে দুইয়ের জায়গায় এক পাকিস্তান হইয়াছিল বটে, লাহোর প্রস্তাবের আর সবটুকুই অপরিবর্তিত ছিল। সে প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিমের দুইটি ভূখণ্ডকে দুইটি অঞ্চল বা রিজিওন করা হইয়াছিল। দুই রিজিওনে দুইটি স্বাধীন ফেডারেশন না হইয়া দুই রিজিওন মিলিয়া একটি মাত্র ফেডারেশন হওয়ায় রিজিওন দুইটি স্বতঃই অটনমাস ও সভারেন ইউনিট হইয়া গিয়াছিল। এটাই পরবর্তীকালে অগ্রাহ্য করিয়া পাকিস্তানকে মামুলিকভাবে নামমাত্র ফেডারেশন ত করা হইলই, তার উপর পূর্ব-বাংলাকে পাকিস্তানের পাঁচটি

প্রদেশ ও অর্ধ-ডজন দেশীয় রাজ্যের ভিড়ের মধ্যে মাত্র একটি 'প্রদেশ' গণ্য করা হইল। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিটে। এই দিক হইতে প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিটে লাহোর প্রস্তাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া এটাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের 'শতকরা ৯৮' বলা যায় কেমন করিয়া ? সেটাও শহীদ সাহেব বুঝাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তার প্রমাণও দিয়াছিলেন। মারি চুক্তির প্যারিটির মধ্যে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি ছাড়া আরও দুইটি কথা ছিল ঃ এক, সর্ববিষয়ে সামগ্রিক প্যারিটি, দুই, যুক্ত-নির্বাচন। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে শুধু প্রতিনিধিত্বের প্যারিটিটাই ছিল। বাকী দুইটি ছিল না। হক সাহেব ও তাঁর পার্টির সবাই যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক হইয়াও '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উহা ঢুকাইতে পারেন নাই। কারণ কোয়ালিশনের অপর শরিক মুসলিম লীগাররা পৃথক নির্বাচনকে ঈমানের অংগ ও পাকিস্তানের ভিত্তি মনে করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সুহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হইয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের সেই পৃথক নির্বাচন ওয়ালাদেরেই যুক্ত-নির্বাচন গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই কাজের ভিতর দিয়া সুহরাওয়ার্দীর প্রজ্ঞা ও নেতৃত্ব প্রখর ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুদিন গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকিলে পশ্চিমা ভাইদেরে দিয়া তিনি প্যারিটির বাকী শর্ত 'সামগ্রিক প্যারিটিও' গ্রহণ করাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁর তখনও ছিল, পরেও সে বিশ্বাস ভাংগে নাই। আমি আজও বিশ্বাস করি, এ বিশ্বাস তাঁর ভিত্তিহীন ছিল না।

৩. পশ্চিমা নেতাদের বোধোদয়

এটাই বুঝিয়াছিলেন পশ্চিমা নেতারা হক সাহেব ও সুহরাওয়ার্দী সাহেবের মৃত্যুর পাঁচ-সাত বছর পরে। তাই প্যারিটির বদলে 'ওয়ানম্যান ওয়ান ভোট' পুনঃ প্রবর্তন করিয়া দুই পাকিস্তানকে এক পাকিস্তান, এক দেশ, এক রাষ্ট্র করিবার এবং পূর্ব-পাকিস্তানকে দুই শরিকের এক শরিকের বদলে ছয় শরিকের এক শরিক করার জন্য ইয়াহিয়া এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিমের ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া আগের মত শুধু চারটা প্রদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 'ট্রাইবাল এরিয়া' নামে প্রকারান্তরে একটি পঞ্চম প্রদেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াব দুইটা মতলব ছিল। এক, পূর্ব-পাকিস্তান দুই শরিকের একজন হইতে ছয় শরিকের একজন হইল। এটা শাসনতান্ত্রিক সংবিধানে নিশ্চিত হইয়া গেল। দুই, পূর্ব-পাকিস্তানের জন-সংখ্যা বেশি হইলেও এখানে কোন অবস্থাতেই এক পার্টি মেজরিটি হইতে পারিবে না। ইয়াহিয়া যখন এল্. এফ্. ও. করেন, তখন পূর্ব

পাকিস্তানে পার্টির সংখ্যা ছিল স্পষ্টতঃই তেরটা। '৭০ সালের নির্বাচনের সিম্বল' বিতরণের সময় দেখা গেল পার্টি–সংখ্যা আঠার।

তেরই হোক আর আঠারই হোক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াসহ পশ্চিমা নেতারা আশা করিয়াছিলেন যে : (১) সব দল না হইলেও বেশিরভাগ দলই কিছু কিছু আসন পাইবে, (২) যতই জনপ্রিয় হোক আওয়ামী লীগ ন্যাশনাল এসেমব্লির পূর্ব–পাকিস্তানের ভাগের ১৬৯টি আসনের মধ্যে একশ'র বেশি আসন পাইবে না, (৩) বাকি আসনগুলোর অধিকারী জমাতে ইসলামী, নিযামে ইসলাম ও দুই–তিনটা মুসলিম লীগের সকলেই স্ট্রং সেন্টারের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে পশ্চিমা পার্টিগুলির সাথে থাকিবেন। এমনকি সরকার গঠনের ব্যাপারে তাঁরা আওয়ামী লীগের চেয়ে পশ্চিমা দলগুলোর সাথেই কোয়েলিশন করিবেন। তাঁদের হিসাবটা স্পষ্টতঃই ছিল এইরূপ : কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগের তিন শাখা, নিযামে ইসলাম, জমাতে ইসলামী ও জমিয়াতুল ওলামায়ে ইসলামের দুই শাখা মূলতঃ, এবং শাসনতান্ত্রিক সংবিধানের ব্যাপারে একই 'ইসলাম–পছন্দ' পার্টি। এঁদের যে পার্টিই যত আসন দখল করুন, সবই শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা নেতৃত্বের স্ট্রং সেন্টারের সমর্থক দলের পুষ্টিসাধন করিবেন। ফলে তিন শ' আসনের মধ্যে পূর্ব–পাকিস্তান হইতে একশ' আসনও যদি আওয়ামী লীগ পায়, তবে বাকী দুইশ' আসনের 'অধিকারী' ইসলাম–পছন্দ দলসমূহই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মেজরিটি হইবে এতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না। আওয়ামী লীগের পূর্ব–পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে মেজরিটি পাইবার সম্ভাবনা ছিল খুবই বেশি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পশ্চিমা নেতারা এটার থনেও আওয়ামী লীগকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্র পাঠকদের সকলের স্মরণ আছে, কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনার পরে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হইবে, এটাই ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রথম ঘোষণা। তারপর কি মনে করিয়া তিনি সে ঘোষণা পাল্টাইয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের অব্যবহিত পরেই প্রাদেশিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। একই নির্বাচনী খরচায় দুইটা নির্বাচন হইয়া যাইবে, এটাই ছিল দৃশ্যতঃ এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। বাহ্য উদ্দেশ্যটা এতই গ্রহণযোগ্য ছিল যে, কোনও কোনও আওয়ামী নেতাও এই ফাঁদে পা দিয়াছিলেন। তাঁরাও এই পরিবর্তিত ব্যবস্থাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

৪. ইয়াহিয়ার মতলব

কিন্তু ইয়াহিয়ার আসল উদ্দেশ্য অত শুভ ছিল না। সংবিধানটা তাঁদের ইচ্ছামত স্ট্রং সেন্টারের দলিল হইবে, এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন। এই সংবিধানের পরে প্রাদেশিক নির্বাচন হইলে পূর্ব–পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের জোর দুর্বার হইয়া উঠিবে। কারণ স্ট্রং সেন্টারের শাসনতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতিক্রিয়া পূর্ব–পাকিস্তানে বিরূপ ও আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়েরঅনুকূল হইয়া পড়িবে। সংবিধানের আগে প্রাদেশিক নির্বাচন হইয়া গেলে আওয়ামী লীগ এই সুবিধা পাইবে না। ইহাই ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পেটের কথা।

এইভাবে আওয়ামী লীগের মিজরিটি পাইবার বিরুদ্ধে সকল প্রকারের ফুল–প্রুফ ব্যবস্থা করিয়াই নির্বাচন দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু নির্বাচনের ফল হইল উল্টা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সব পূর্ব–পাকিস্তানী আসন আওয়ামী লীগ জয় করিল। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হইল। ইতিমধ্যে মাত্র এক মাস আগে ১২ই নবেম্বর পূর্ব–পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূলবর্তী কয়েকটি জেলায় ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ঝড়–তুফান ও সাইক্লোন–টর্ণেডো হইয়াছিল। তার ফলে অসংখ্য জীবন নাশ ও বর্ণনাতীত ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল। সেজন্য কেন্দ্রীয় পরিষদের ৯টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ১৭টি আসনের নির্বাচন হইতে পারিল না। ঐসব এলাকার নির্বাচন পরবর্তী ১৭ই জানুয়ারি হইয়াছিল। ফলে কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে দুইটি বাদে আর ১৬০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টির মধ্যে ২৮০টি আসনই আওয়ামী লীগ দখল করিল। পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচিত মেম্বরদের ভোটে কেন্দ্রীয় পরিষদের ৭টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ১০টি মহিলা আসনের সব কয়টি আওয়ামী লীগ পাইল। একমাত্র পিডিপি. নেতা নূরুল আমীন সাহেব ছাড়া দুইটি কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম ইত্যাদি কেন্দ্র–ঘেষা সবগুলো দল নির্বাচনে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এইভাবে কেন্দ্রীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসন পাইয়া একক মেজরিটি পার্টি হইল। ইয়াহিয়াসহ সব পশ্চিমা নেতাদের মাথায় আসমান ভাংগিয়া পড়িল। সুফলের আশা যত উচ্চ হয়, বিফলের পতনটা হয় তেমনি গভীর খাদে। এটা শুধু পশ্চিমাদের নির্বাচনে হারার ব্যাপার ছিল না। তাঁদের জন্য ছিল এটা ভেস্টেড ইন্টারেস্টের বিপদ–সংকেত। তাই তাঁরা স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ ও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। অথচ মার্শাল ল'র ছাতার তলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই

নির্বাচনে নকল ভোট ইত্যাদি দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হইয়াছিল, এ কথাও বলা গেল না।

ফলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াসহ পশ্চিমা নেতারা অমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁদের পরবর্তী সব কাজই এই জ্ঞানশূন্যতার প্রমাণ। মুখে গণতন্ত্রের কথা বলিব অথচ নির্বাচনে যাঁরা জিতিলেন, তাঁদের হাতে ক্ষমতা দিব না, দিলে পাকিস্তান বিপন্ন হইবে, এমন মনোভাব শুধু অগণতান্ত্রিক নয় বুদ্ধি বিভ্রান্তিরও লক্ষণ। এমন বিভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে সুস্থ বুদ্ধি আশা করা যাইতে পারে না।

কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, ভুল শুধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও পশ্চিমা নেতারাই করেন নাই। ভুল আমাদের নেতা শেখ মুজিবও করিয়াছিলেন। সেসব কথাই পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা বুঝিতে পারি নাই। মানে বুঝিতে সময় লাগিয়াছিল। বরঞ্চ আমি প্রথমে ঠিক উল্টাটাই বুঝিয়াছিলাম। পশ্চিমা নেতারা তিন সাবজেক্টের সেন্টার আগেই মানিয়া লইয়াছিলেন। সেজন্য আমার বিভিন্ন লেখায়ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। পশ্চিমা নেতাদের দেখাদেখি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও গণতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এটাও যেন আমার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তানের ইতিহাসে শুধু পাকিস্তান কেন, পাক-ভারত উপমহাদেশে, এমন কি গোটা আফ্রো-এশিয়ায়, এই সর্বপ্রথম নির্বাচন প্রতিযোগিতায় শরিক সব পার্টির নেতাদের রেডিও-টেলিভিশনে নিজ নিজ পার্টি-প্রোগ্রাম সম্বন্ধে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার সুযোগ দেওয়া হইল। এটা করিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। আফ্রো-এশিয়ান গণতন্ত্রের জীবনে একটা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। দেশবাসী খুশী না হইয়া পারে ? আমি ত উৎসাহে ফাটিয়া পড়িবার মত হইলাম। এবার গণতন্ত্র না আসিয়া যায় না। শুধু গণতন্ত্রই পাকিস্তান টিকাইয়া রাখিতে পারে। আর কিছুতে নয়। সেই গণতন্ত্র নিশ্চিত হইল। অতএব পাকিস্তানের জীবনের মস্তবড় ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

৫. আমার হিসাবে ভুল

কত বড় মূর্খ আমি। জমাট-বাঁধা এই মূঢ়তার প্রথম পরত কাটিল নির্বাচনের পরে। পশ্চিমা ভাইয়েরা নির্বাচনের আগে ছয় দফার আপত্তি করিলেন না। নির্বাচনের পরেই তাঁদের যত আপত্তি। তাঁরা শুধু বেজার হইলেন না। ছয় দফা না বদলাইলে, মানে, নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ না করিলে আওয়ামী লীগের সাথে পশ্চিমারা সহযোগিতা করিতেই রাযী নহেন। সব দলের নির্বাচন প্রার্থীরাই এতকাল বলিয়া

আসিয়াছেন, এই নির্বাচনের আগেও বলিয়াছেন, নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করা সব পার্টির স্বভাব। আওয়ামী লীগও নির্বাচনের পরে তাই করিবে। নির্বাচনে হারিয়া পূরবী অ-আওয়ামী নেতারা চুপ মারিয়া গেলেন। কিন্তু পশ্চিমা নেতারা এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলিতে লাগিলেন, ছয়-দফা-ভিত্তিক সংবিধান তাঁরা মানিবেন না। কারণ তাতে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতি নষ্ট হইবে। এ সবই নির্বাচনের পরের কথা। নূতন কথা।

এ কথার রাজনৈতিক অর্থ ও ন্যায়নৈতিক তাৎপর্য কি, তার বিচার করা যাক। প্রথমতঃ আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ওয়াদা ছয় দফা রদ-বদল করিলে কি দাঁড়ায় ? সকলেরই স্মরণ আছে, বহুদিন ধরিয়া রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ভোটারদের সাধারণ ও কমন্ অভিযোগ ছিল এই যে, নির্বাচনের আগে নির্বাচন-প্রার্থী নেতারা যা বলেন, নির্বাচনের পরে তাঁরা তা ভুলিয়া যান। এক কথায় তাঁরা নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করেন। ভোটারদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও তঞ্চকতা করেন।

অভিযোগটা পুরাতন ও সত্য। মোটামুটি সব পার্টির সব নেতাদের সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। প্রমাণ অনেক। দু'চারটার কথা বলা যাক। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টি '৩৫ সালের ভারত শাসন 'ভিতর হইতে ভাংগিবার' (ট্র-রেক ফ্রম উইদ ইন) ওয়াদায় ভোট নিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষক-প্রজা-পার্টি জমিদারি উচ্ছেদের ওয়াদায় ভোট নিয়া ফ্লাউড কমিশন বসাইয়াছিলেন। মুসলিম লীগ '৪৬ সালের নির্বাচনে '৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভোট দিয়া নির্বাচনে জিতিবার পরে গুরুতর ওয়াদা খেলাফ করিলেন : লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত পূর্ব-পশ্চিমে দুই মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের বদলে পশ্চিম-ভিত্তিক এক পাকিস্তান বানাইলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট একুশ দফার ওয়াদায় নির্বাচিত হইয়া সব 'দফার' রফা করিলেন। মোট কথা, কি অবিভক্ত ভারতে, কি পাকিস্তানে, নির্বাচনের ইতিহাস এক ঢালা নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফের ইতিহাস। শেখ মুজিবসহ আমরা সংশ্লিষ্ট নেতাদের অনুসারীরা সব সময় না হোক, অধিকাংশ সময় নেতাদের এই সব ওয়াদা ভংগের প্রতিবাদ করিয়াছি। নেতারা 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি', 'দেশের বৃহত্তর কল্যাণ', ইত্যাদি ভাল-ভাল কথার যুক্তিতে নিজেদের কাজ সমর্থন করিয়াছেন। আমরা নেতাদের যুক্তি না মানিলেও কাজে-কর্মে তাঁদের নেতৃত্ব মানিয়া চলিয়াছি। কিন্তু মনের দিক হইতে আমরা কখনও সন্তুষ্ট ছিলাম না।

৬. মুজিবের দূরদর্শিতা

নেতাদের এই ওয়াদা খেলাফের ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে যখন ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নূতন নেতা শেখ মুজিব নির্বাচনী ওয়াদায় দৃঢ়তা দেখাইলেন, তখন ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর কাজে প্রীত ও গর্বিত হইলাম। শেখ মুজিব দুই দিক হইতে এই দৃঢ়তা দেখাইলেন। প্রথমতঃ নির্বাচনের আগে তিনি ছয় দফাকে সাধারণ ওয়াদা না বলিয়া রেফারেণ্ডাম বলিলেন। তাঁর কথার তাৎপর্য ছিল এই যে, হয় তাঁর পক্ষে 'হাঁ' বলিবেন, নয় 'না' বলিবেন। তার মানে, ভোটাররা হয় তাঁর পক্ষে সব ভোট দিবেন, নয়ত এক ভোটও দিবেন না। পূর্ব-পাকিস্তানের ভোটাররা সব হাঁ বলিলেন। শেখ মুজিব প্রায় সব আসন পাইলেন। শুধু নির্বাচনে নয়, তিনি রেফারেণ্ডামেও জিতিলেন। শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের একক মুখপাত্র হইলেন।

নির্বাচনের পরে শেখ মুজিব যা করিলেন সেটা আরও প্রশংসার যোগ্য। নির্বাচনের ইতিহাসে একটা অনুকরণযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। নির্বাচনের পরে ৩রা জানুয়ারি, ১৯৭১, তিনি সুহ্রাওয়ার্দী ময়দানে বিশ লাখ লোকের বিরাট জনসমাবেশে মেম্বরদেরে দিয়া হলফ করাইলেন,নিজে হলফ করিলেন ঃ 'ছয় দফা ওয়াদা খেলাফ করিব না।'

এই হলফ্নামা ছিল একটি মূল্যবান দলিল। হলফ্ গ্রহণ ছিল একটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সেজন্য এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি । ঘটনাটি নানা কারণে স্মরণীয়।

১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি বেলা ২টার সময় ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে(পরে সুহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমক্ষে আওয়ামী মেম্বররা হলফ্ উঠাইবেন, এটা আগেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। ফলে সে সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। আওয়ামী লীগ টিকিটে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় মেম্বর-সংখ্যা তখন ১৫১ এবং প্রাদেশিক মেম্বর সংখ্যা ২৬৭। কারণ ঘূর্ণীঝড়-বিধ্বস্ত উপকূল অঞ্চলের নির্বাচন তখনও হইতে পারে নাই। ফলে মোট ৪১৮ জন আওয়ামী সদস্যের সকলেই এই শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

হলফ্নামা একটি ছাপা দলিল। আল্লার নামে এই হলফ্নামার শুরু হইয়াছিল। আরবী 'বিসমিল্লাহিররাহমানির রাহিম'-এর হুবহু বাংলা তর্জমা করিয়া লেখা হইয়াছিল ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে হলফ্ করিয়া আমি অংগীকার করিতেছি যে আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা ছয় দফা অনুসারে শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করিব ;

এ কাজে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সহযোগিতা কামনা করিতেছি ইত্যাদি। হলফ্নামায় ব্যাংক, ইন্শিওরেন্স ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণের অংগীকারসহ আরও কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া দুইটি জয়ধ্বনিতে হলফ্নামার উপসংহার করা হইয়াছিল। এই দুইটি মুদ্রিত জয়ধ্বনি ছিল : 'জয় বাংলা', 'জয় পাকিস্তান'।

মুদ্রিত হলফনামার এক এক কপি সমবেত ও কাতারবন্দী মেম্বরদের প্রত্যেকের হাতে ছিল। পার্টি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বুলন্দ আওয়াযে হলফের এক একটি বাক্যাংশ পড়িয়া গিয়াছেন, আর সমবেত কাতারবন্দী মেম্বররা সমস্বরে নেতার কথা আবৃত্তি করিয়াছেন। এতে গোটা অনুষ্ঠানের পরিবেশটা একটা ধর্মীয় গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সমবেত প্রায় বিশ লাখের বিশাল জনতা পরম শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই হলফের প্রত্যেকটি কথা নীরবে শুনিয়াছে। একটি 'টু' শব্দও হয় নাই। অনুষ্ঠান শেষে জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি করিয়া তাদের সমর্থন ও উল্লাস জানাইয়াছে।

ধর্মীয় গাম্ভীর্যের হলফ্কে আরও রাজনৈতিক গুরুত্ব দিবার জন্য সমবেত জনতার কাছে শেখ মুজিব আরও বলিলেন : 'ছয় দফা নির্বাচনী ওয়াদা আপনাদের নিকট আমাদের দেওয়া আমাদের পবিত্র ওয়াদা। এ ওয়াদা যদি আমরা খেলাফ করি, তবে আপনারা আমাদেরে ক্ষমা করিবেন না'। আরও বেশি জোর দিবার জন্য শেখ মুজিব বলিলেন : 'আমি নিজেও যদি এই ওয়াদা খেলাফ করি, তবে আপনারা নিজ হাতে আমাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবেন।' নিজেদের নির্বাচনী ওয়াদার নির্ভুলতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকিলে এমন নিরংকুশ সুস্পষ্ট চরম অনঢ় ওয়াদা কেউ করিতে পারেন না। ফলতঃ এই ঘটনার পরে শেখ মুজিবের পক্ষে কোন কারণে, কোন যুক্তিতেই ছয়-দফা-বিরোধী কাজ করা সম্ভব ছিল না।

বস্তুতঃ আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে শেখ মুজিব ইচ্ছা করিয়াই এটা করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়াই এভাবে নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফের সব রাস্তা ও ছিদ্র বন্ধ করিয়াছিলেন। পাঠকগণ, তখনকার অবস্থাটা একবার বিবেচনা করুন। একেই ত ৪১৮ জন মেম্বরের এত বড় পার্টি। তাতে আবার সুস্পষ্ট কারণেই এঁদের মধ্যে সবাই পরীক্ষিত, অনুগত, পুরাতন ও নির্ভরযোগ্য নন। বোধগম্য কারণেই অনেক অজানা-অচেনা প্রার্থীকে নমিনেশন দিতে হইয়াছে। এঁদের মধ্যে কেউ সুযোগ-সুবিধা পাইলে দলত্যাগ করিবেন না, এমনটা আশা করা বুদ্ধিমানের কাজ হইত না। আরও একটা

কারণ ছিল। আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ পশ্চিমারা শুধু রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকারীই ছিলেন না, বিপুল ধন-বিত্ত-প্রতিপত্তিরও অধিকারী ছিলেন। পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে তাঁদের করণীয় কাজও খুব বেশি ছিল না। রাষ্ট্র-ক্ষমতা, অর্থ-বিত্ত ও প্রতিপত্তির সাহায্যে আওয়ামী লীগের অন্ততঃ গণপরিষদে নির্বাচিত নবাগতদের মধ্যে এক দলকে হাত করিয়া আওয়ামী লীগের, মানে পূর্ব পাকিস্তানের, মেজরিটিকে নিষ্ক্রিয় করা মোটেই কল্পনাতীত ছিল না। তাই শেখ মুজিব বিশ লাখ লোকের জনসমাবেশে মেম্বরদেরে দিয়া ঐ হলফ্ করাইয়াছিলেন। নিজেও হলফ্ নিয়াছিলেন। এতে এক সংগে দুইটা লাভ হইয়াছিল। এক আওয়ামী মেম্বরদেরে হুঁশিয়ার করা হইয়াছিল। দুই, পশ্চিমা নেতা ও ধন-কুবেরদেরেও হুঁশিয়ার করা হইয়াছিল। আওয়ামী মেম্বরদের মধ্যে যদি কারো কোনও উচ্চাভিলাষ থাকিয়াও থাকিত, তবে ঐ বিশাল জনতার দরবারে হলফ্ নেওয়ার ফলে সে উচ্চাকাংখা সেই মুহূর্তে পলাইয়াছিল।

আর পশ্চিমা ধন-কুবের নেতাদের কারও মনে যদি আওয়ামী দল ভাংগিবার পরিকল্পনা থাকিয়া থাকিত, তবে ঐ ঘটনার পরে তাঁরাও এই দিককার আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৭. পশ্চিমা নেতাদের সংকীর্ণতা

কাজেই শেখ মুজিবের এই দূরদর্শিতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু দুই মাস না যাইতেই আমার সে মোহ কাটিয়া গিয়াছিল। তখন আমার মনে হইয়াছিল শেখ মুজিব যদি আওয়ামী মেম্বরদের 'আনুগত্যকে অমন দুর্ভেদ্য না করিতেন, তবেই বোধ হয় মন্দের ভাল হইত। আওয়ামী লীগের মেম্বরদের আনুগত্যে অর্থাঘাত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াসহ পশ্চিমা নেতারা ভোটারদের অস্ত্রাঘাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন ? কারণ পশ্চিমা নেতারা পাকিস্তানের ঐক্য, পাকিস্তান-সৃষ্টির ইতিহাস, লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তানের 'স্বপ্নদ্রষ্টা' কবি ইকবালের কথা, সবই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অথচ এই তিনটি বস্তুর কথা পশ্চিমা শাসক ও নেতারা চব্বিশ ঘন্টা উচ্চারণ করিতেন। পাকিস্তানের ঐক্যে যদি তাঁরা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিতেন, তবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মেজরিটিশাসন তাঁরা মানিয়া লইতেন। তাঁরা ভাবিতেন গণতন্ত্রে মেজরিটিরই শাসন। আওয়ামী নেতৃত্বকে তাঁরা যদি গোটা পাকিস্তানের নেতা নাও মানিতেন, তবু তাঁরা ভাবিতে পারিতেন : 'তেইশ বছর পশ্চিমারা পাকিস্তান শাসন করিলেন, করুক না

পূরবীরা পাঁচ বছর।' তা তাঁরা পারেন নাই। পারেন নাই এইজন্য যে, পূর্ব-পাকিস্তানকে তাঁরা পাকিস্তানের সমান অংশীদার মনে করিতেন না। এ অঞ্চলটাকে তাঁরা তাঁদের উপনিবেশ মনে করিতেন।

কালক্রমে এটা তাঁদের সাধারণ মনোভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তানের সৃষ্টির গোড়াতে পশ্চিমা ভাইদের মনে যাই থাকুক, অবস্থা ও পরিবেশে দীর্ঘদিনের অভ্যাসে যেটা তাঁদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক দাবির রূপ পাইয়াছিল তা এই যে, পশ্চিম-পাকিস্তানটাই পাকিস্তান। পূর্ব-পাকিস্তানটা সেই পাকিস্তানের অংশ মাত্র। 'এক'টা 'অপর'টার অংশ হইলে 'অপর'টাও 'এক'টার অংশ, এটা তেমন ব্যাপার নয়। তাই এর উল্টাটাও সত্য নয়। অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানই পাকিস্তান, আর পশ্চিম-পাকিস্তানটা সেই পাকিস্তানের অংশ মাত্র, কোনও পশ্চিমা ভাই-ই এ ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন না। আলাস্কাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ মনে না করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই আলাস্কার অংশ মনে করিলে যেমনটি হয়, এখানেও তেমনটাই হইত। শুধু আয়তন নয়, রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিষ্ঠানও এই মনোভাব সৃষ্টির ও বৃদ্ধির গোড়ায় কার্যকরী ছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানে বসিয়া সার্ভে-অব-পাকিস্তান 'পাকিস্তানের' যে সরকারী ম্যাপ প্রকাশ করিতেন, সেটা আসলে পশ্চিম-পাকিস্তানেরই ম্যাপ। সেই ম্যাপের এক কোণে 'ইন্‌সেট' হিসাবে পূর্ব-পাকিস্তান, জুনাগড় ও মানবাদারের একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি ম্যাপ থাকিত। এটাই পশ্চিমা ভাইদের মনের ম্যাপ। এ মনোভাবের বিচারে, পশ্চিম-পাকিস্তানের আয়তন ছোট হইলেও বাধিত না। আকারে ছোট হইয়াও ইংল্যাণ্ড বৃহদাকারের আমেরিকাকে নিজের উপনিবেশ মনে করিত।

৮. পরিষদের বৈঠক আহ্বান

এমন পরিবেশে পূর্ব-পাকিস্তানী মেজরিটি সারা পাকিস্তান শাসন করিবে, এ সম্ভাবনা পশ্চিমা ভাইদের মনে দুঃসহ হইয়া উঠিল। নির্বাচনের পর দুই মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। তবু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিষদের বৈঠক ডাকিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে মেজরিটি পার্টির লিডার শেখ মুজিব ১৫ই ফেব্রুয়ারি পরিষদের বৈঠক ডাকিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জোর তাকিদ দিলেন। ইয়াহিয়া পরিষদের মেজরিটি লিডারের কথা অগ্রাহ্য করিয়া মাইনরিটি লিডার মিঃ ভূট্টোর পরামর্শ-মত ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ পরিষদের বৈঠক দিলেন। বৈঠকটার স্থান দেওয়া

হইল ঢাকায়। আমরা অনেকেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদার গণতান্ত্রিক মনোভাবের তারিফ করিয়া বিবৃতি দিলাম, প্রবন্ধ লিখিলাম।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, এটাও ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সুদূর-প্রসারী ষড়যন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ষড়যন্ত্রটার ধারাবাহিকতা এইরূপ ঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৩ই জানুয়ারি হইতে ১৫ই জানুয়ারি ঢাকায় অবস্থান করিয়া শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করিলেন। হাসিমুখে ঢাকা ত্যাগ করিলেন। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলিলেন। ছয় দফায় তাঁর খুব বেশি আপত্তি নাই বলিয়া গেলেন। কিন্তু ছয় দফা বা ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সোজাসুজি কোনও স্পষ্ট কথা বলিলেন না। কিন্তু ঘুরাইয়া-পেচাইয়া সর্বপ্রথম ছয় দফাকে পাকিস্তানের ঐক্য-বিরোধী এমনকি তাঁর নিজের রচিত এল.এফ.ও.-বিরোধী এই ধরনের নূতন কথা বলিলেন। তিনি ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে খুব নরম সুরে বলিলেন ঃ 'শাসনতান্ত্রিক সংবিধান সম্বন্ধে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ঐক্যমত হওয়া দরকার।'

৯. মুজিবের ভুল

এই সময় পশ্চিম-পাকিস্তানের কতিপয় নেতা শেখ মুজিবকে একবার পশ্চিম-পাকিস্তান সফরের দাওয়াত দিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, বিরোধী প্রচারে ছয় দফা সম্পর্কে পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হইয়াছে, শেখ মুজিবের এই সফরে তার অবসান হইবে। সহকর্মীদের পরামর্শে মুজিবর রহমান এই সফরে অসম্মতি বা অক্ষমতা জানাইলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, তিনি আওয়ামী পার্লামেন্টারি পার্টির কাজে এই সময়ে এতই ব্যস্ত থাকিবেন যে, তাঁর পক্ষে পশ্চিম-পাকিস্তান সফর সম্ভব হইবে না। প্রকাশ্যে এই যুক্তি দেওয়া হইল বটে, কিন্তু আমি জানিতে পারিলাম, সহকর্মীরা মুজিবকে এইরূপ বুঝাইয়াছেন যে, এই সফরের দাওয়াত আসলে শেখ মুজিবের জীবননাশের পশ্চিম-পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র মাত্র। আমি একথা বিশ্বাস করিলাম না। কারণ আমি শেখকে বেপরোয়া সাহসী যুবক বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু কারণ যাই হোক, মুজিবের এই সিদ্ধান্তে আমি দুঃখিত হইলাম। আমার তখনও বিশ্বাস ছিল, আজও আছে, মুজিব ঐ সফরে গেলে তার সুফল ফলিত, মুজিবের অসাধারণ বাগ্মিতায় পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণ তাঁর সমর্থক হইয়া উঠিত। পশ্চিম-পাকিস্তানের পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থীরা বিদ্বেষ-প্রসূত মিথ্যা প্রচারের দ্বারা ছয় দফা

ও মুজিবের বিরুদ্ধে জনগণের মনে যে ভ্রান্ত ও ভয়ংকর চিত্র আঁকিয়াছে, মুজিব অতি সহজেই তা দূর করিতে পারিতেন। আমি অতীতে অনেক বার নিজ চোখে দেখিয়াছি, শেখ মুজিব তাঁর ভাংগা-ভাংগা অশুদ্ধ উর্দূতে বক্তৃতা করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানী বড়-বড় জনসভা জয় করিয়াছিলেন এবারও তার অন্যথা হইত না।

কাজেই এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা মুজিবের উচিৎ হয় নাই, এটা আমি তখনও মনে করিতাম, আজও মনে করি। মুজিব ঐ সময়ে পশ্চিম-পাকিস্তান সফরে গেলে পরবর্তী মর্মান্তিক, হৃদয়-বিদারক ঘটনাসমূহ ঘটিত না। কারণ, তাতে শেখ মুজিবের ইমেজ পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের নযরে ইয়াহিয়া-ভূট্টোর ইমেজ ছাড়াইয়া যাইত।

উপাধ্যায় তিন

পৃথক পথে যাত্রা শুরু

১. ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র

২৭শে জানুয়ারি জনাব ভুট্টো সদলবলে ঢাকা আসিলেন। আসিবার আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ভুট্টো সাহেবের কয়েক দফা বৈঠক হইল। ভুট্টো সাহেব তিন-চার দিন ঢাকা অবস্থান করিলেন। আওয়ামী নেতাদের সাথে অনেক দেন-দরবার করিলেন। আওয়ামী লীগের ছয় দফার বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি-কুযুক্তি দিলেন। কিন্তু তাঁরা কি চান, কোন্ বিষয়ে ছয় দফার পরিবর্তন চান, এক কথায় তাঁরা কি ধরনের সংবিধান চান, ঘুণাক্ষরেও তা খুলিয়া বলিলেন না। সবশেষে 'আবার দেখা হইবে' বলিয়া বিদায় হইলেন। আওয়ামী লীগের সাথে ঘোরতর মতভেদ হইয়াছে, আলোচনা ভাংগিয়া গিয়াছে, আকারে-ইংগিতেও ভুট্টো সাহেব বা তাঁর সংগীদের কেউ এমন কোন কথা বলিলেন না । কিন্তু আমি ভুট্টো সাহেবের নীরব বিদায়ের মধ্যে একটা অশুভ ইংগিতের আভাস পাইলাম। এটা ছিল জানুয়ারির শেষ দিন। আমি ঐ রাত্রেই একটি বিবৃতি মুসাবিদা করিলাম। পরদিন খবরের কাগযে পাঠাইয়া সম্পাদকদেরে নিজে অনুরোধ করিলাম। নিউয এজেন্টদেরেও তেমনি বলিলাম। পরদিন 'অবযারভার' ও 'মর্নিং-নিউয' 'ডুয়েল সেন্টার' হেডিং দিয়া আমার বিবৃতিটা পুরা ছাপিলেন। বাংলা দৈনিকগুলিও তাই করিলেন। এজেন্সিরা পশ্চিম-পাকিস্তানে কোড্ করায় 'ডন', 'পাকিস্তান টাইমস' ইত্যাদি কাগযও যথেষ্ট স্থান দিলেন। আমি সে বিবৃতিতে শেখ মুজিব ও ভুট্টোকে আপোসের আবেদন জানাইলাম। ভুট্টো সাহেব করাচি ফিরিয়াই পিণ্ডি গেলেন। পিণ্ডিতে কয়েকদিন কাটাইয়া পেশওয়ার গেলেন। সেখানকার এক ক্লাবে বক্তৃতা করিতে গিয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করিলেন, তিনি ঢাকায় আহুত পরিষদ বৈঠক বয়কট করিবেন। বয়কটের হুমকি দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। অন্যান্য মেম্বরদেরেও তিনি শাসাইলেন। তাঁর বয়কট উপেক্ষা করিয়া যেসব পশ্চিম-পাকিস্তানী মেম্বর ঢাকা যাইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁদের ঠ্যাং ভাংগিয়া অথবা কাল্লা কাটিয়া ফেলিবেন। ঢাকাকে তিনি কসাইখানা বলিলেন। মিঃ ভুট্টোর এইসব বেআইনী ও অপরাধমূলক উক্তির বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বা সরকারী কেউ একটি কথাও বলিলেন না। মিঃ ভুট্টোর এই হুমকি সত্ত্বেও পিপল্স পার্টি ও কাইউম লীগের মেম্বরগণ ছাড়া আর সবাই ঢাকার টিকিট বুক করিয়া ফেলিলেন। কয়েকজন মেম্বর ঢাকা পৌঁছিয়াও গেলেন। শোনা যায়, খোদ্-পিপল্স্ পার্টির কয়েকজন মেম্বরও টিকিট

বুক করিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল, ভুট্টোর হুমকি সত্ত্বেও ঢাকা সেশন সফল হইবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

২. পরিষদের বৈঠক বাতিল

এমন সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৮শে ফেব্রুয়ারি করাচি আসিলেন। ভুট্টো সাহেবের বাড়িতে খানাপিনা করিলেন। ১লা মার্চ তারিখে করাচি রেডিও হইতে প্রেসিডেন্টের নিজের গলার ভাষণে নয়, পঠিত এক বিবৃতিতে, বলা হইল ঃ পরিষদের ৩রা মার্চের বৈঠক স্থগিত। এই ঘোষণায় আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবকে এই সর্বপ্রথম কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হইল।

সন্ধ্যা ছয়টার রেডিওতে প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণায় ঢাকাবাসী, সারা পূর্ব-পাকিস্তানবাসী, স্তম্ভিত, বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়া উপযুক্ত যোগ্য নেতার কাজ করিলেন। মেজরিটি পার্টির নেতা এবং ভাবী প্রধানমন্ত্রীকে জিগ্‌গাসা না করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরিষদ স্থগিত করিয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অনিয়মতান্ত্রিক অপরাধ করিয়াছিলেন। শেখ মুজিবের সময়োপযোগী অসীম ধৈর্যে ও স্থৈর্যে আমি মুগ্ধ ও গর্বিত হইয়াছিলাম। আমি অসুস্থ না থাকিলে নিজে তাঁর বাসায় যাইতাম। কিন্তু রাত্রি সাড়ে আটটার দিকে তিনি নিজে আমাকে ফোন করিয়া যা বলিলেন, তাতেই আমি পূর্বোক্ত-মত মুগ্ধ ও গর্বিত হইলাম। তিনি বলিলেন, তিনি সাত দিনব্যাপী সাধারণ হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন করা ঠিক করিয়াছেন। আমি সানন্দে আমার ঐকমত্য জানাইলাম। তবে অসহযোগের সাথে 'অহিংস' কথাটা যোগ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন, সেটা করাই হইয়াছে। আমি তাঁকে 'কংগ্রেচুলেট' করিলাম। তিনি জবাবে বলিলেন ঃ 'শুধু দোওয়া করিবেন।' আমি সত্য-সত্যই দোওয়া করিলাম। করিতে থাকিলাম বলাই ঠিক। কারণ ওটাই ছিল আমার জন্য সহজ।

৩. অহিংস অসহযোগের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত

পরদিন বিদেশীরা দেখিয়া ত বিস্মিত হইলেনই, আমরাও কম বিস্মিত হইলাম না। অভূতপূর্ব, অপূর্ব, অভাবনীয় সামগ্রিক সাড়া। যেন যাদু-বলে রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, অফিস-আদালত, হাইকোর্ট-সেক্রেটারিয়েট অচল, নিথর, নিস্তব্ধ। শুধু রাজধানী ঢাকা শহরে নয়। পরে জানা গেল, সারা পূর্ব-পাকিস্তানে ঐ একই অবস্থা। খবরের কাগযে সারাদেশের শহর-বন্দরের রিপোর্ট পড়িলাম। আর কল্পনায় পঞ্চাশ বছর আগের ১৯২০-২১ সালের খেলাফত-কংগ্রেসের অসহযোগ-হরতালের চিত্র দেখিতে লাগিলাম। মহাত্মা গান্ধী ও আলী ভাই এর ডাক সেদিন বাতাসের আগে

দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িত। তাঁদের আহ্বানে দেশবাসী একযোগে যে হরতাল অসহযোগ পালন করিত, তা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। মনে করিতাম, এমনটা আর হয় নাই, হইবে না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২রা মার্চের ঘটনা আমার বিস্ময় সকল সীমা ছাড়াইয়া গেল। কোথাও কোনও অনুরোধ–উপরোধ ক্যানভাস্–পিকেটিং এর দরকার হইল না। স্বতঃ–প্রণোদিত হইয়া সবাই যেন এ কাজ করিল। এটা যেন সকলেরই কাজ। ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিষদ মুলতবি করিবেন, এটা পূর্ব–পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ আগে হইতেই জানিতেন। ১লা মার্চ সকাল না হইতেই ঢাকা শহরে সৈন্য মোতায়েন হইল। কাজেই প্রেসিডেন্টের ঘোষণাটা জনসাধারণের বিস্ময় উদ্রেক করিলেও শাসকদের নিশ্চয়ই বিস্ময় উদ্রেক করে নাই। বরঞ্চ আওয়ামী–নেতারা যে হরতাল ঘোষণা করেন, সেটা ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁরা বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করেন। রাস্তায়–রাস্তায় টহল দিয়া জনগণের মনে ভীতি সৃষ্টির সকল প্রকার পন্থা গ্রহণ করেন। ঢাকা শহরে ও মফস্বলের অনেক জায়গায় গুলি–গোলা চলে। বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। সরকারী কর্মচারীদেরে অফিস–আদালতে হাযির করার জন্য, দোকানপাট খোলা রাখিবার জন্য, সকল প্রকার চেষ্টা–তদ্বির করা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

এ সবই অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। পাঠকদের প্রায় সকলেই নিজের চোখে দেখিয়াছেন। অনেকেই খবরের কাগযে পড়িয়াছেন। সকলেরই মনে থাকার কথা। তবু এ সবের উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে মাত্র ন'মাস পরে ক্ষমতায় বসিয়া শাসকদল সরকারী–বেসরকারী সকল প্রকার কর্মচারীসহ গোটা দেশবাসীর এই ঐক্যের কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে কথার আলোচনা করিব পরে।

৩রা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আরেকটা বাজে কাজ করিলেন । তিনি 'বার–নেতা'র এক বৈঠক ডাকিলেন। এই বার নেতার মধ্যে দুই জন পূর্ব–পাকিস্তানী, আর দশজন পশ্চিম পাকিস্তানী। পরিষদ বাইপাস করার ছিল এটা একটা ফন্দি। 'বার–নেতার' মধ্যে এক দিকে প্রেসিডেন্ট ও অপর দিকে আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্য কোনও ফরমূলা নির্ধারিত হওয়া অসম্ভব ছিল, এটা সবাই জানিতেন। তবু এমন বৈঠক ডাকা হইয়াছিল দুরভিসন্ধি–বলে। কাজেই আওয়ামী–নেতা শেখ মুজিব সংগত কারণেই এটা অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি এক প্রেস–কনফারেন্সে অহিংস অসহযোগ চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পূর্ব–পাকিস্তানের একচ্ছত্র প্রতিনিধি শেখ মুজিব ঐ বৈঠক অগ্রাহ্য করায় পূর্ব–পাকিস্তানের অপর একমাত্র নিমন্ত্রিত নেতা নূরুল আমিন সাহেবও বৈঠকে যোগ দিতে অসম্মতি জানাইলেন।

এক-লাগা পাঁচ দিন পূর্ব-পাকিস্তানে, মানে পাকিস্তানের মেজরিটি অঞ্চলে, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নির্দেশে। কেন্দ্রীয়-প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত অফিসাররাও আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতেছিলেন। সামরিক বাহিনী ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে আসা হইতে বিরত ছিল।

একটা নীরব অহিংস বিপ্লবের মধ্য দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে বিপুল ভোটাধিক্যে-নির্বাচিত আওয়ামী লীগের ডিফ্যাক্টো শাসন কায়েম হইয়া গেল। বিদেশীরাও স্বীকার করিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানীরা একাত্মভাবে, টু-এ-ম্যান, আওয়ামী লীগের সমর্থক।

৪. ডিক্টেটরের নতি স্বীকার

৬ই মার্চ সন্ধ্যা ছয়টার রেডিওতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজ গলায় ঘোষণা করিলেন, তিনি ২৫শে মার্চ ঢাকায় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করিলেন। প্রেসিডেন্টের সে ঘোষণায়ও রাষ্ট্রপতির মর্যাদা-উপযোগী শরাফত ছিল না। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় তাঁর মনের ক্ষোভ ভাষায় ফাটিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু ওসবকে আমি কোন গুরুত্ব দিলাম না। পরিষদের বৈঠক ডাকা হইয়াছে, এটাই আমার কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আওয়ামী লীগের জয়। জনমতের সামনে ডিক্টেটরের নতি স্বীকার।

প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণায় সবাই নিশ্চিন্ত ও খুশি হইয়াছিলেন। দুই-একজন করিয়া অনেকেই আমার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। সকলের মুখেই স্বস্তির ভাব। যাক্ একটা সংকট কাটিয়া গেল। রাত সাড়ে আটটার দিকে আমি মুজিবের নিকট হইতে টেলিফোন পাইলাম। প্রথমে তাজুদ্দিন সাহেব ও পরে শেখ মুজিবের সাথে কথা হইল। আওয়ামী লীগের কর্তব্য সম্বন্ধে আমার মত জানাইলাম। তাঁদের মত ছিল, বিনা-শর্তে তাঁরা ২৫শে মার্চের পরিষদে যোগ দিবেন না। আমার মত ছিল, শর্ত তাঁরা যাই দেন, ২৫শে মার্চের বৈঠকে তাঁরা অবশ্যই যোগ দিবেন । আমার যুক্তিটা ছিল এইরূপ ঃ ২৫শে মার্চের বৈঠকে আওয়ামী লীগ হাযির হইয়া নিজস্ব মেজরিটির জোরে আওয়ামী লীগ পার্টির একজন স্পিকার, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে দওলতানা ও ওয়ালি খাঁর সাথে পরামর্শ করিয়া সিনিয়র ডিপুটি স্পিকার ও পূর্ব-পাকিস্তান হইতে (তার মানে আওয়ামী লীগ) জুনিয়র ডিপুটি স্পিকার নির্বাচন করিবেন। এইভাবে স্পিকার, দুইজন ডিপুটি স্পিকার ও প্যানেল-অব-চেয়ারমেন নির্বাচন শেষ করিয়া মেজরিটি পার্টির নেতা ও লিডার-অব-হাউস হিসাবে শেখ সাহেব স্পিকারকে অনুরোধ করিবেন— এক সপ্তাহের জন্য হাউস মুলতবি করিতে। উদ্দেশ্য ঃ উভয় অঞ্চলের নেতাদের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সংবিধান সম্বন্ধে একটা সমঝোতার আলোচনা। ইতিপূর্বে ৩রা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে বার নেতার বৈঠক ডাকিয়াছিলেন, সম্ভব হইলে সেই নেতৃ-বৈঠকই লিডার-অব-দি হাউস হিসাবে শেখ মুজিবই ডাকিবেন।

উচিৎ বিবেচিত হইলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও সেই বৈঠকে দাওয়াত করা হইবে। বিশ্ববাসী জানিবে, নিরংকুশ মেজরিটি হইয়াও শেখ মুজিব পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতাদের সাথে সমঝোতায় আসিবার কতই না আন্তরিক চেষ্টা চালাইতেছেন। আওয়ামী লীগ ছয় দফা-ভিত্তিক সংবিধান রচনায় ধর্মতঃ হলফ-বদ্ধ। ওটা ছাড়া কিছুতেই রাযী হইতে পারেন না। স্পষ্টতঃই ঐ এক সপ্তাহের মুলতবিতে কাজ হইবে না। এক সপ্তাহ পরে পরিষদের বৈঠক হইবে। সেখানেও লিডার-অব-দি হাউস শেখ মুজিব আরও এক সপ্তাহের জন্য হাউস মুলতবি করিতে স্পিকারকে অনুরোধ করিবেন। এইভাবে যতদিন ইচ্ছা পর-পর হাউস মুলতবি করিয়া যাইবার ক্ষমতা ও অধিকার শেখ মুজিবের হাতে চলিয়া আসিবে। প্রেসিডেন্টের মর্যির উপর হাউস আর নির্ভরশীল থাকিবে না।

৫. আমার পরামর্শ

আমার পরামর্শটা শেখ মুজিব ও তাজুদ্দিন সাহেবের পসন্দ হইল বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু একটা অসুবিধা হইয়া গিয়াছে। তাঁরা পরিষদে যোগ দিবার পূর্ব-শর্ত রূপে চারিটি দাবি করিয়া ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া ফেলিয়াছেন, বলিলেন। সে বিবৃতি সার্কুলেট হইয়া বিদেশে ও পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়াও গিয়া থাকিবে। অগত্যা আর কি করা যায় ? তখন আমি জানিতে চাহিলাম, শর্ত চারিটি কি কি ? তাঁরা জানাইলেন, শর্ত চারিটি এই ঃ

(১) সৈন্যবাহিনী ব্যারাকে ফিরাইয়া নিতে হইবে।

(২) ১লা মার্চ হইতে সৈন্যবাহিনী যে হত্যাকাণ্ড ও যুলুম করিয়াছে, তার তদন্ত করিয়া পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। (বলা আবশ্যক, সামরিক কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বেই একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে তদন্তের রিপোর্ট সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের কথা ছিল। আওয়ামী লীগ দাবি করিয়াছে, সামরিক কর্তৃপক্ষের বদলে সিভিল গবর্নমেন্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।)

(৩) মার্শাল ল প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(৪) এই মুহূর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ট্রান্সফার করিতে হইবে।

আমি শর্ত চারিটির প্রথম দুইটি সমর্থন করিলাম। পরের দুইটিতে আপত্তি করিলাম। আমি বলিলাম, এ সময়ে মার্শাল ল প্রত্যাহারের দাবি চলিতে পারে না। একটা সংবিধান (ইন্টারিম হইলেও) না করিয়া মার্শাল ল প্রত্যাহারের অর্থ ভ্যাকিউয়াম সৃষ্টি করা। তাতে ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকিবেন না। তাঁর-দেওয়া এল.

এফ. ও. থাকিবে না। এল. এফ. ও.র অধীন নির্বাচন থাকিবে না। নির্বাচন বাতিল হইলে গণ-প্রতিনিধি থাকিবেন না। আর এই মুহূর্তে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে আমি বলিলাম ঃ ওটা তোমাদের চাহিতে হইবে না। ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নিজেই ব্যস্ত। কারণ আমাদের মহাজন রাষ্ট্রেরা আমাদের টাকা ডিভ্যালু করিবার ঘোরতর চাপ দিতেছে। ডিভ্যালু না করা পর্যন্ত নূতন ঋণ দিবে না, বলিয়া দিয়াছে। ইয়াহিয়ার ইচ্ছা তিনি নিজে টাকা ডিভ্যালু না করিয়া নির্বাচিত রাজনীতিকদের সিভিলিয়ান গবর্নমেন্টের হাত দিয়া ঐ বদকাজটা করাইবেন।

নেতারা ব্যাপারটা উপলব্ধি করিলেন, মনে হইল। এখন কি করা যায় ? গায়ে পড়িয়া ত শর্ত প্রত্যাহার করা যায় না। ঠিক হইল, আলোচনার সময় দরকষাকষিতে প্রথম দুইটার উপর জোর দিয়া দ্বিতীয় দুইটা স্যাক্রিফাইসের ভাণ করা হইবে। অপর পক্ষকে জিতিবার সান্ত্বনা দিতে হইবে।

৬. আমার পরামর্শ কাজে লাগিল না

শান্তিতেই রাতটা কাটাইলাম। কিন্তু পর দিন সকালে খবরের কাগয পড়িয়া আবার শান্তি হারাইলাম। ঐ চারটি শর্ত গৃহীত হইলেই আওয়ামী লীগ পরিষদে যোগ দিবে, এ কথাও বিবৃতিতে বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে ঃ প্রেসিডেন্ট চার শর্ত পূরণ করিলে আওয়ামী লীগ পরিষদে যোগ দিবে কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবে । কথাটায় আরো জোর দিয়া শেখ মুজিব বলিয়াছেন ঃ "আমি আমার দেশবাসীর মৃতদেহ পাড়াইয়া পরিষদে যোগ দিতে পারি না।"

বয়সে তরুণ হইলেও শেখ মুজিব 'ম্যান-অব-স্ট্রং কমন সেন্স' আমি তা জানিতাম। সগৌরবে এ কথা বলিয়াও বেড়াইতাম। সেই 'ম্যান-অব-স্ট্রং কমন সেন্স' এমন যুক্তি দিলেন কেমন করিয়া ? আমি তাঁকে টেলিফোনে ধরিবার চেষ্টা সারাদিন ধরিয়া করিলাম। শেখ মুজিব তখন কল্পনাতীত রূপে ব্যস্ত। স্বাভাবিক কারণেই অগত্যা ঠিক করিলাম, যাঁকে পাই তাঁকেই বলিব মুজিবকে আমার সাথে ফোনে কথা বলিতে। অত ব্যস্ততার মধ্যে মুজিবকে আসিতে বলা বা তা আশা করা উচিৎ না। আমার স্বাস্থ্যের যা অবস্থা, তাতে আমার পক্ষে যাওয়াও অসম্ভব। কাজেই প্রথম চেষ্টাতেই যখন কোরবান আলী সাহেবকে পাইলাম, তাঁকেই বলিলাম আমার অভিপ্রায়টা। কোরবান আলী চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না, বুঝা গেল। অগত্যা আমার পুত্র মহবুব আনামকে পাঠাইলাম। আমার ছেলের যাওয়ায়, অথবা কোরবান আলী সাহেবের চেষ্টায়, অথবা দুইজনের সমবেত চেষ্টায়, অবশেষে শেখ মুজিব কথা বলিলেন। আমি সোজাসুজি আমার কথায় গেলাম। বলিলাম ঃ পরিষদ তোমার। ন্যায়তঃ ও আইনতঃ তুমি হাউসের নেতা। ওটা আসলে তোমারই বাড়ি। নিজের বাড়ি যাইতে শর্ত কর কার সাথে ? ইয়াহিয়া অনধিকার প্রবেশকারী। তাঁর সাথে আবার শর্ত কি ?'

আমি বোধ হয় রাগিয়া গিয়াছিলাম। মুজিব হাসিলেন। বলিলেন : 'এত সব হত্যাকাণ্ডের পরও আবার আমাকে পরিষদে যাইতে বলেন ?' চট্ করিয়া খবরের কাগযে প্রকাশিত 'মৃতদেহ' কথাটা আমার মনে পড়িল। বলিলাম : 'হাঁ, নিজের লোকের মৃতদেহের উপর দিয়াই তুমি পরিষদে যাইবা। কারণ ও-বাড়ি তোমার। সে বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছে। তোমার বাড়ির কিছু লোকজন ডাকাতের হাতে খুন হইয়াছে। ডাকাত তাড়াইবার জন্যই তোমার নিজের লোকজনের মৃতদেহ পাড়াইয়া বাড়িতে ঢুকিতে হইবে। ডিক্টেটর ইয়াহিয়া জনমতের চাপে আওয়ামী লীগের দাবির সামনে মাথা নত করিয়াছেন। কাজেই আগামী কালের সভায় তুমি বিজয়-উৎসব উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিবা।' শেখ মুজিব আসলে রসিক পুরুষ। আমার উপমাটা তিনি খুব উপভোগ করিলেন। বিজয়-উৎসবের কথায় খুশি হইলেন। হাসিলেন। বলিলেন : 'আমার আজকার বক্তৃতা শুনিবেন। রেডিওতে ব্রডকাস্ট হইবে সোজাসুজি ময়দান হইতে। আপনার উপদেশ মতই কাজ হইবে। কোনও চিন্তা করিবেন না। দোওয়া করিবেন।' 'লিভ্ ইট টু মি', 'কোনও চিন্তা করিবেন না' 'দোওয়া করিবেন' কথা কয়টি মুজিব এর আগেও বহুদিন বলিয়াছেন। আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তার সুস্পষ্ট প্রকাশ। কথা কয়টা ওঁর মুখে শুনিলেই আমি গলিয়া যাইতাম। ও দিনও গলিলাম। মানে, আশ্বস্ত হইলাম।

৭. অশুভ ইংগিত

পূর্ব-নির্ধারিত সময়-মত ৭ই মার্চ সকাল সাড়ে আটটায় আমার স্ত্রীকে লইয়া আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই ; অথবা বলা যায় আমার স্ত্রীই আমাকে লইয়া হাসপাতালে যান। দুজনেরই অসুখ, দুজনেই ডাক্তারের পরীক্ষাধীন। দুজনেরই ই.সি.জি., দুইজনেরই এক্সরে। কাজেই দুইজন প্রায় সমান। দুজনারই ডাক্তার রাব্বি ও ডাঃ হকের চেম্বারে যাওয়ার কথা। আমার একজন ডাক্তার বেশি। কান ও নাকের জন্য আমার ডাঃ আলী আফ্‌যল খাঁর চেম্বারেও যাওয়ার কথা।

এসব সারিতে এগারটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারদের সবাই আমার স্নেহের বন্ধু। সবারই মুখে উদ্বেগ ও বুকে চাঞ্চল্য। তাঁদের সকলের জিগ্‌গাসা : আজ শেখ সাহেব ময়দানের বক্তৃতায় কি বলিবেন ? আমাদের ভাগ্যে কি হইবে ? ভাবখানা এই যে আমি যেন সবই জানি। যত বলিলাম 'আমি তাঁদেরই মত অন্ধকারে' ততই তাঁরা সকলে চাপিয়া ধরিলেন। রেডিওলজিষ্ট ডাঃ শামসুল হকের বিশাল চেম্বারে বসিলাম। ডাক্তার-ছাত্রদের ভিড়। চা-বিস্কুটের ফরমায়েশ হইয়া গেল। শুধু একা আমি কথা বলিলাম না। যাঁর-যা অভিজ্ঞতা-অভিমত সবাই বলিলাম। তার মধ্যে ডাঃ ফযলে রাব্বি সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিলেন। তিনি মাত্র ঘন্টা দুই আগে ধানমন্ডি রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। শেখ সাহেবের বাড়ির কাছেই তাঁর রোগী। তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, এক

বিশাল জনতা শেখ সাহেবের বাড়ির সামনে ভিড় করিয়াছে। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, জনতার পক্ষ হইতে শেখ সাহেবকে বলা হইতেছে, আজকার সভায় স্বাধীনতা ঘোষণার ওয়াদা না করিলে শেখ সাহেবকে বাড়ি হইতে বাহির হইতে দেওয়া হইবে না। ভিড়ের মধ্যে তরুণের সংখ্যাই বেশি, বোধ হয় সব ছাত্রই হইবে। ডাঃ রাব্বি আরও আশংকা প্রকাশ করিলেন, আজকার সভায় স্বাধীনতার কথা বলা হইলে সামরিক বাহিনী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিবে, এমন গুজব শহরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় একটা চরম বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়া সকলেই আশংকা প্রকাশ করিলেন। এ বিষয়ে আমার মত কি সবাই জানিতে চাহিলেন।

আমি সবাইকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম। আগের রাতে ও সকালে মুজিবের সাথে আমার টেলিফোনে আলাপের কথাটা প্রকাশ না করিয়া যতটুকু বলা যায়, ততটা জোর দিয়া বলিলাম ঃ 'এমন কিছুই ঘটিবে না। আজকার সভায় শেখ মুজিব ঠিকই উপস্থিত থাকিবেন। দূরদর্শী দায়িত্বশীল নেতার মতই বক্তৃতা করিবেন। গুলি-গোলার আশংকা তাঁদের অমূলক।' বলিলাম বটে, কিন্তু আমার নিজের বুকও আশংকায় দুরু-দুরু করিতে থাকিল। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদার প্রতি সামরিক বাহিনী ও পশ্চিমা নেতাদের অনমনীয় অগণতান্ত্রিক মনোভাব আমাকে সত্যই ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। 'বেলুচিস্তানের খুনী' বলিয়া মশহুর জেনারেল টিক্কা খান নয়া গবর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঢাকায় পৌঁছাইয়াছেন বা পৌঁছাইতেছেন, খবরটা জানাজানি হইয়া গিয়াছিল। প্রায় বারটার দিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হইতে বাসায় ফিরিলাম। ফিরিবার পথে দেখিলাম, তখন হইতেই ময়দানে জনতার ভিড় হইতেছে।

ভালয়-ভালয় শেখ সাহেবের সভা হইয়া গেল। আগেই জানাজানি হইয়া গিয়াছিল যে শেখ মুজিবের বক্তৃতা সোজাসুজি সভাস্থল হইতে ব্রডকাস্ট করা হইবে। এ খবর বা ধারণা ভিত্তিহীন ছিল না। আগের দিন ৬ই মার্চ রেডিও-টেলিভিশনের আর্টিস্টরা বাংলা একাডেমী-প্রাঙ্গণে এক সভা করিয়া জনগণের এই সংগ্রামে তাঁদের একাত্মতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বেগম লায়লা আর্জুমন্দবানু এই সভায় সভানেত্রিত্ব করিয়াছিলেন। কামরুল হাসান, গোলাম মোস্তফা, খান আতাউর রহমান, মোস্তফা যামান আব্বাসী, আনওয়ার হোসেন, রায্যাক, হাসান ইমাম, ওয়াহিদুল হক, আযিযুল ইসলাম প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা রেডিও- টেলিভিশন আর্টিস্ট মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কিন্তু মার্শাল ল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে সভাস্থল হইতে সে বক্তৃতা ব্রডকাস্ট হইতে পারিল না। তবে সভা-ফেরতা লোকের মুখে শুনিলাম, বিপুল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল। শেখ সাহেবও প্রাণখোলা বক্তৃতা করিয়াছেন। একাই। যা আশংকা করা হইয়াছিল তা হয় নাই। শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই। কাজেই জেনারেল টিক্কা খানও হাতসাফাই দেখাইতে পারেন নাই।

পরদিনই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। বেতার কর্মীদর দৃঢ়তায় সরকার নরম হইলেন। পরদিন সকাল আটটায় রেডিওতে ও সন্ধ্যায় টেলিভিশনে শেখ সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে ও সভার অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। স্বভাবতঃই ইতিমধ্যে গত পাঁচদিনে উভয় পক্ষের অবিবেচক ও উচ্ছৃংখল লোকজনের দোষে অনেক খুন-খারাবি হইয়া গিয়াছিল। ফলে সভায় ভীষণ উত্তেজনা। অত উত্তেজনার মধ্যেও শেখ মুজিব জন-নেতার উপযোগী ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়া বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন। অহিংস অসহযোগ চালাইয়া যাইবার বিস্তারিত নির্দেশ দিয়াছেন। রাষ্ট্র-পরিচালকের আস্থা লইয়াই নির্দেশগুলো উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁর ঐসব আদেশ-নির্দেশ পালিত হইবেই, সামরিক সরকার শত চেষ্টায়ও তাঁর নির্দেশ পালনে জনগণকে বা সরকারী কর্মচারীগণকে বিরত করিতে পারিবেন না, তেমন কর্তৃত্বের আত্মবিশ্বাস শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিল। আমি শুধু পুলকিত হইলাম না, আশ্বস্তও হইলাম। এমন অবস্থায় নেতার যে মনোবল ও আত্মবিশ্বাস একান্ত দরকার শেখ মুজিবের তা আছে। কাজেই এদিককার কোনও ভাবনা আমার হইল না।

আমার ভাবনা, শুধু ভাবনা নয়, দুশ্চিন্তা হইল অন্যদিকে। শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আহুত পরিষদের সভা আহ্বানকে আওয়ামী লীগের ও জনগণের বিজয়ের কথা বলিলেন না। বিজয়-দিবস উদ্‌যাপনের কথাও ঘোষণা করিলেন না। বরঞ্চ পূর্ব-প্রকাশিত চার শর্তেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন। ঐসব শর্ত পূরণ হওয়ার পরে পরিষদে যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করিবেন, সে কথারও পুনরুক্তি করিলেন। সেই একই কথা ঃ শহীদদের মৃতদেহের উপর দিয়া ২৫শে মার্চের পরিষদে যোগ দিতে না পারার কথা। আমার সমস্ত স্বপ্ন ও কল্পনা এক দমকা হাওয়ায় মিলাইয়া গেল। শেখ মুজিবের মত অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞানী ও বাস্তববাদী জননেতা পরিষদে যাওয়া-না-যাওয়ার আকাশ-পাতাল প্রভেদটা, দুই এর রাজনৈতিক তাৎপর্যটা এবং সংগ্রামের ট্যাক্‌টিক্সের পার্থক্যটা বুঝেন নাই, এটা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। সংগ্রামের এই সুস্পষ্ট ট্যাকটিক্যাল এডভান্‌টেজটা শেখ মুজিবের মত অভিজ্ঞ সংগ্রামী নেতা না বুঝিয়া শত্রুপক্ষের হাতে তুলিয়া দিতেছেন, এটা আমার মত কিছুতেই মানিয়া লইল না। কাজেই মনে হইল, ডাঃ ফযলে রাব্বির কথাই ঠিক। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ শেখ মুজিবের বাড়ি-ঘেরাও করা চার-পাঁচ হাজার তরুণকে যেভাবে স্বাধীনতা স্বাধীনতা চিৎকার করিতে তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাতে শেখ সাহেব নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিমত কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁর বিশ্বাস হইতেছিল না। আমি তাঁর কথাটা উড়াইয়া দিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম, ডাঃ রাব্বির ধারণাই ছিল ঠিক। অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী মুজিব তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই সত্য, তবে তরুণদের চাপে অন্ততঃ তাদের মন রাখিলেন। শুধু তাদের দেখাইবার উদ্দেশ্যেই পরিষদে যোগ না দিবার ব্যাপারটায় ঐরূপ বীরত্বব্যঞ্জক ব্র্যাভাডো প্রদর্শন করিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার

দাবিদার তরুণদেরে খুশি করিবার জন্য শেখ মুজিব আরো দুইটা কাজ করিলেন। প্রথমতঃ উপসংহারে তিনি বলিলেন ঃ আজিকার সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। দ্বিতীয়ত ঃ কিছুদিন ধরিয়া তিনি সব বক্তৃতার শেষ করিতেন এক সংগে 'জয় বাংলা' 'জয় পাকিস্তান' বলিয়া। এই দিনকার সভায় প্রথম ব্যতিক্রম করিলেন। শুধু 'জয় বাংলা' বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। যাঁরা নিজেরা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া দাবি করেন, তাঁদের কেউ কেউ আমার এই কথার প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেন, শেখ মুজিব ৭ই মার্চের সভাতেও 'জয় বাংলা' 'জয় পাকিস্তান' বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিয়াছিলেন। আমি যখন বলি যে পরদিন আমি রেডিও-টেলিভিশনে নিজ কানে তাঁর বক্তৃতা শুনিয়াছি এবং তাতে 'জয় পাকিস্তান' ছিল না, তার জবাবে তাঁরা বলেন, পরদিন রেকর্ড ব্রডকাস্ট করিবার সময় ঐ কথাটা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। যাক্ আমি নিজ কানে যা শুনিয়াছিলাম, তাই লিখিতেছি। বক্তৃতা শেষ করিয়াই মুজিব সভামঞ্চ ত্যাগ করিলেন। তাজুদ্দিন সাহেব মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া খপ্ করিয়া মাইকের স্ট্যাণ্ড চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন ঃ 'এইবার মওলানা তর্কবাগীশ মোনাজাত করিবেন। সভার কাজ শেষ।' মওলানা সাহেব তখনি মাইকের সামনে দুই হাত তুলিয়া মোনাজাত শুরু করিলেন। সমবেত বিশ-পঁচিশ লক্ষ লোকের চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ হাত উঠিয়া পড়িল। মোনাজাতের সময় এবং তক্‌বিরের সময় কথা বলিতে নাই। তাই কেউ কথা বলিলেন না। নড়িলেন না। যখন মোনাজাত শেষ হইল, তখন শেখ মুজিব চলিয়া গিয়াছেন। পট করিয়া মইকের লাইন কাটিয়া গিয়াছে। স্পষ্টতঃই বুঝা গেল, আর কেউ কিছু বলিতে না পারুক, এই জন্যই এ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এতে এটা নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে তথাকথিত ছাত্র-নেতা ও তরুণদের যবরদস্তি ও হুমকি ধমকেও সেদিন শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার ইচ্ছা ছিল না। আমার বিবেচনায় এটা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতারই প্রমাণ।

৮. পরিষদে যোগ দিলে কি হইত?

কিন্তু এই ঘটনার আর একটা দিক আছে। সে কথা আগেই বলিয়াছি। আরও আলোচনা একটু পরে করিতেছি। এখানে পরিষদে যোগ দেওয়ার ট্যাকটিকাল দিকটারই কথা বলিতেছি। ৬ই মার্চের রাতে ও পরের সকালে টেলিফোনের আলাপে এই দিকটার দিকেই আমি শেখ মুজিবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম ঃ 'তুমি পরিষদে যোগ দাও। প্রথম দিনে স্পিকার, ডিপুটি স্পিকার নির্বাচন কর।' এ বিষয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল যে কাকে স্পিকার করা হইবে, সে সম্বন্ধেও আমি আমার মত জানাইয়াছিলাম। আইউবের অনুকরণে দুইজন ডিপুটি স্পিকার করিতেও বলিয়াছিলাম। এক নম্বর ডিপুটি স্পিকার পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে ও দুই নম্বর ডিপুটি স্পিকার পূর্ব-পাকিস্তান হইতে (তার অর্থ

আওয়ামী লীগার হইতে) নিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। পশ্চিম–পাকিস্তানের কাকে এক নম্বর ডেপুটি স্পিকার করা হইবে, সে সম্বন্ধে ওয়ালী খাঁ ও দওলতানার মতামত লইতেও বলিয়াছিলাম। এসব খুঁটিনাটির সবগুলিই ছিল ট্যাকটিকাল পন্থা। কিন্তু আসল কথা ছিল স্ট্যাটেজির সুস্পষ্ট সুবিধার কথা। সে সম্পর্কে আমি বলিয়াছিলাম ঃ 'স্পিকার–ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের পরেই তুমি 'লিডার অব–দি–হাউসের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবা। তুমি স্পিকারকে সম্বোধন করিয়া বলিবা, উভয় পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে একটা সমঝোতা আনার জন্য প্রেসিডেন্ট যে অনুরোধ করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে স্পিকার মহোদয় যেন সাত দিনের জন্য হাউস মুলতবি করিয়া দেন। তোমার ইশারা–মত স্পিকার তাই করিবেন। তোমরা আলোচনায় বসিবা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপস্থিতিতেই এটা হইতে পারে। আলোচনা সভায় তোমাদের পক্ষের বক্তব্য হইবে ঃ 'সংবিধান সম্বন্ধে একমাত্র আওয়ামী লীগেরই ভোটারদের কাছে নির্বাচনী–ওয়াদা আছে। পশ্চিমা কোনও পার্টিরই তেমন কোন ওয়াদা নাই। তাছাড়া নির্বাচনের পরে আওয়ামী–মেম্বররা আল্লাকে হাযির–নাযির জানিয়া জনতার সামনে হলফ্ লইয়াছেন। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে ভিত্তি করিয়াই সংবিধান রচনা করা হউক।'

"তোমাদের পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া পশ্চিমা–নেতারা রাযী হইলে ত ভালই। রাযী না হইলেও তোমার কোনও অসুবিধা নাই। সাত দিন পরে আবার পরিষদের বৈঠক বসিবে। প্রথমেই তুমি দাঁড়াইয়া স্পিকারকে বলিবা ঃ আমাদের আলোচনা সাফল্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আরও একটু সময় দরকার। আরও সাত দিনের জন্য সভা মুলতবি হউক।

"যতদিন ইচ্ছা তুমি এমনি করিয়া হাউস মুলতবি করাইবা।

"এই পন্থার এড্ভানটেজ এই যে হাউসের উপর প্রেসিডেন্টের কোনও ক্ষমতা থাকিবে না। একক ক্ষমতা থাকিবে স্পিকারের। স্পিকার যতদিন ইচ্ছা এমনিভাবে হাউস চালাইতে থাকিবেন। প্রেসিডেন্ট কিছুই করিতে পারিবেন না, এল. এফ. ও. নির্ধারিত এক'শ বিশ দিনের আগে।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতদিন যাইবে না। তার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াসহ পশ্চিমা নেতারা বলিয়া ফেলিবেন যে, স্ট্যাটেজি ও ট্যাকটিক্স্ উভয়টাতেই পশ্চিমারা তোমার কাছে হারিয়া গিয়াছেন। তোমার কথামত শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করিতে তাঁদের অধিকাংশই রাযী হইবেন। তা নাও যদি হয়, তবু যে ডেডলক্ সৃষ্টি হইবে, তাতেও তোমার জয় হইবে।"

আমার ধারণা ছিল, মুজিব আমার যুক্তির সারবত্তা মানিয়া লইয়াছেন। তিনি সেমতেই কাজ করিবেন। কিন্তু ৭ই মার্চের বক্তৃতায় আমি নিরাশ হইয়াছিলাম। তবু আশা ছাড়ি নাই। পরবর্তী এক ঘোষণায় শেখ মুজিব বলিয়াছিলেন, তিনি মওলানা ভাসানী, জনাব আতাউর রহমান খাঁ ও অধ্যাপক মুযাফ্ফর আহ্মদের সংগে আলোচনা করিবেন। কথা শুনামাত্র ন্যাপ নেতাদেরে জানাইলাম, আতাউর রহ্মান খাঁ সাহেবকে নিজে বলিলাম, শেখ মুজিবের সংগে আলাপ করিতে। আতাউর রহমান সাহেব বলিলেন : যদিও এ ঘোষণা খবরের কাগযে পড়া ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না, মানে শেখ মুজিব তাঁকে টেলিফোনেও অনুরোধ করেন নাই, তবু তিনি যাইবেন এবং যাতে মওলানা সাহেব ও মুযাফ্ফর সাহেবও যান, তার চেষ্টাও তিনি করিতেছেন। আমি আতাউর রহমান সাহেবকে মুজিবের বরাবরে আমার উপদেশের কথা বলিলাম এবং তিনিও যাতে শেখ সাহেবকে অমন পরামর্শ দেন, সেজন্য তাঁকে অনুরোধ করিলাম। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসিবার আগেই যাতে এটা হয়, তারও আবশ্যকতা আতাউর রহমান সাহেবকে বুঝাইলাম।

তিনি রাযী হইলেন। একরূপ নিজেই উদ্যোগী হইয়া শেখ মুজিবের সাথে দেখা করিলেন। সেখান হইতে তিনি সোজা আমার বাসায় আসিলেন। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। সে আলোচনায় আমার মত পরামর্শ তিনিও দিয়াছেন। বরঞ্চ আরো বেশি দৃঢ়তার সংগে আরো অগ্রসর পরামর্শ তিনি দিয়াছেন। তাঁর পরামর্শ ও যুক্তি মোটামুটি আমারই মত হইয়াছে। তবে তিনি আরও একটু আগাইয়া বলিয়াছেন যে, নিজের মেজরিটির জোরেই ছয়-দফা ভিত্তিক একটি সংবিধান রচনা করিয়া ফেলাই শেখ মুজিবের উচিৎ। মোট কথা পরিষদ বয়কট করার তিনি বিরোধী, দৃঢ়তার সংগে সে কথা তিনি শেখ মুজিবকে বলিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

সুতরাং দেখা গেল, আমরা যাঁরা শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিবার দাবি রাখি, দায়িত্বও আছে এবং যাঁদের পরামর্শের দাম আছে বলিয়া আওয়ামী লীগের ও জনগণের অনেকে মনে করেন, তাঁদের অনেকেনা হউক, কেউ-কেউ আমরা মুজিবকে পরিষদে যোগ দিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম এবং সেটা দিয়াছিলাম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হইবার আগেই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা আসেন ১৫ই মার্চ এবং ঐ দিন হইতে অন্ততঃ ২৪শে মার্চ পর্যন্ত পুরা দশ দিন শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে কথাবার্তা হয়। এ কথাবার্তার বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। এখানে ও-কথাটার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে আমাদের পরামর্শ রাখিবার হইলে সে সুযোগ শেখ মুজিবের প্রচুর ছিল। তবু যে শেখ মুজিব আমাদের পরামর্শমত কাজ করেন নাই, তার অনেক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যা তখনও

ছিল, আজও আছে, তা এই যে, শেখ মুজিব চাপে পড়িয়াই আমাদের পরামর্শমত কাজ করিতে পারেন নাই। যা হোক, পরিষদে যোগ না দেওয়াটা, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, শেখ মুজিবের একটা মস্তবড় ভুল। এ ভুলের দরুনই ২৫শে মার্চের নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটিয়াছিল। অন্যথায় তা ঘটিত না। ব্যাপার অন্যরূপ হইত। তাতেও শেখ মুজিবেরই জয় হইত।

৯. অপর দিক

এ সমস্ত ব্যাপারটারই অন্য একটা দিক আছে, সে কথাও আগেই বলিয়াছি। সে দিকটারই আলোচনা এখন করা যাউক।

আমি যেমন মনে করি, ৭ই মার্চের সভায় শেখ মুজিব ভুল করিয়াছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পরিষদ ডাকার ব্যাপারটার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া, তেমনি একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা মনে করেন, ৭ই মার্চে শেখ মুজিব ভুল করিয়াছিলেন ঐ দিন স্বাধীনতা ঘোষণা না করিয়া। এঁদের কেউ কেউ কাগযে-কলমে সে কথা বলিয়াছেন, অনেকে আমার সাথে তর্কও করিয়াছেন। তাঁদের মত এই যে, শেখ মুজিব যদি ৭ই মার্চের ঘোড়-দৌড়-ময়দানের পঁচিশ লাখ লোকের সমাবেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গবর্নর হাউস, রেডিও ষ্টেশন ও ক্যান্টনমেন্ট দখল করিতে অগ্রসর হইতেন, তবে একরূপ বিনা-রক্তপাতে তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করিতে পারিতেন। তাতে পরবর্তী কালের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও নয় মাসের যুদ্ধ, তাতে ভারতের সাহায্য, এসব কিছুরই দরকার হইত না।

এই মতের আমি দৃঢ়তার সংগে প্রতিবাদ করি। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, এ ধরনের কথা যাঁরা বলেন অথবা চিন্তা যাঁরা করেন, তাঁদের রাজনীতি বা সমরনীতির কোনও অভিজ্ঞতা নাই। তাঁরা বড় জোর থিওরিস্ট মাত্র। ৭ই মার্চের সভায় 'স্বাধীনতা ঘোষণাটা' না করিয়া মুজিব কত বড় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেটা বুঝিবার মত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ঐসব থিওরিস্টের নাই। এ সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়। সে সব কথারই মোটামুটি দুইটা দিক আছে। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবের সামনে সে দুইটা দিকই সমান জোরে উপস্থিত ছিল। এক, যুক্তির দিক। দুই, বাস্তব দিক। সংক্ষেপে এই দুইটা দিক সম্বন্ধেই বলা চলে, কোন দিক হইতেই ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা সমীচীন হইত না। যুক্তির দিক হইতে হইত না এই জন্য যে, প্রেসিডেন্টের পক্ষে বেআইনীভাবে পরিষদের বৈঠক বাতিল করাটাই স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল না। আর বাস্তবতার দিক হইতে এটা সমীচীন হইত না এই জন্য যে তাতে সভায় সমবেত বিশ লাখ নিরস্ত্র জনতাকে সংগীন উচা-করা সুসজ্জিত সামরিক

বাহিনীর গুলির মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইত। তাতে নিরস্ত্র জনতাকে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের চেয়ে বহুগুণে বিপুল নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের শিকার বানানো হইত। হত্যাকাণ্ডের বাদেও যেসব নেতা বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁদেরে গ্রেফতার করা হইত। বিচারও একটা হইত। তার ফলও জানা কথা। ফলে স্বাধীনতার বা অটোনমির আন্দোলন বহু দিনের জন্য চাপা পড়িত। পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশের পক্ষে সেটাই হইত অনেক বেশি গুরুতর লোকসান ।

অতএব, ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা না করিয়া শেখ মুজিব যোগ্য জননেতার কাজই করিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রাজনীতির দিক হইতেও শেখ মুজিবের এই আচরণ যে নির্ভুল হইয়াছিল এবং জনগণের সমর্থন পাইয়াছিল, তার বড় প্রমাণ এই যে অসহযোগ আন্দোলন তাতে স্তিমিত না হইয়া বরঞ্চ আরও জোরদার হইয়াছিল। স্বাধীনতা ঘোষণা না করিয়াও শেখ মুজিব কার্যতঃ পরবর্তী আঠার দিন স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের শাসন-ভার হাতে পাইয়াছিলেন। স্টেট ব্যাংকসহ সবগুলি ব্যাংক, টেলি, পোস্ট অফিস সবই শেখ মুজিবের ডাইরেকটিভ-মত চলিয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দখল বা আধিপত্যই তখন ছিল না। রাজনীতির অবস্থাও তাই ছিল। ৯ই মার্চ মওলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খাঁ পল্টন ময়দানে এক জনসভায় আওয়ামী লীগ দাবির সমর্থন করেন। ইয়াহিয়া ও পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদেরে শেখ মুজিবের সাথে আপোস করিতে উপদেশ দেন। মুজিবের দাবি লাহোর-প্রস্তাব-ভিত্তিক, এ কথাও তাঁরা স্মরণ করাইয়া দেন। উভয় নেতাই পশ্চিমা-নেতৃবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেন ঃ 'শেখ মুজিবকে আপনারা অবিশ্বাস বা উপেক্ষা করিবেন না। পূর্ব-পাকিস্তানের গোটা জনতাই মুজিবের পিছনে।'

প্রশাসনিক পর্যায়ে চিফ সেক্রেটারি মিঃ শফিউল আযমের সভাপতিত্বে ১২ই মার্চ সি. এস. পি. এসোসিয়েশন ও ই. পি. সি. এস. পি. এসোসিয়েশনের যুক্ত বৈঠকে আওয়ামী লীগের দাবি ও আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিচার বিভাগেরও সেই কথা। ঢাকা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস মিঃ বদরুদ্দিন সিদ্দিকী নব-নিযুক্ত গবর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে হলফ্ পড়াইতে অস্বীকৃতি জানাইয়া ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এইভাবে মুজিবের জয় সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ হয়।

উপাধ্যায় চার

ইয়াহিয়া–মুজিব বৈঠক

১. ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন

এমনি অবস্থায় ১৫ই মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন। সে আসাটাও ছিল শেখ মুজিবের অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি ১২ই মার্চ পিণ্ডি হইতে করাচি আসিয়া যেন শেখ মুজিবের অনুমতির অপেক্ষাই করিতেছিলেন। ১৩ই মার্চ ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খাঁ শেখ মুজিবের সাথে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবনে অনেকক্ষণ আলোচনা করেন। এরপর শেখ মুজিব রিপোর্টারদেরে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা আসিলে তিনি তাঁর সাথে আলোচনায় বসিতে রাযী আছেন। ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে মুজিব–ওয়ালী আলোচনার এটাও একটা বিষয় ছিল। শেখ মুজিব এমন একটা কিছু বলুন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ইচ্ছাও বোধ হয় তাই ছিল। শেখ মুজিবের এই ঘোষণায় তাঁর দিক হইতে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হইয়াছিল। তবু কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অভিপ্রায় কিছুই বোঝা যাইতেছিল না। ১৫ই মার্চ বেলা অপরাহ্ন আড়াইটায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা বিমান–বন্দরে অবতরণের আগে পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানে বা সংবাদ–এজেন্সির তরফ হইতে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। কাজেই বোঝা যায়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমনটা গোপন রাখাই সরকারের ইচ্ছা ছিল। ফলে জনসাধারণ এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারে নাই। এয়ার পোর্ট হইতে প্রেসিডেন্ট ভবন পর্যন্ত সারা রাস্তায় সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ই.পি.আর. মোতায়েন দেখিয়া যা কিছু অনুমান করা গিয়াছিল মাত্র।

যা হোক বেলা আড়াইটায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা পৌছিলেন। তাঁর সাথে আসিলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবদুল হামিদ, পীরযাদা ও গুলহাসান প্রভৃতি আরো কয়জন জেনারেল। এঁদের সংগে আসিলেন সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এ. আর. কর্নেলিয়াসও। তিনি তৎকালে প্রেসিডেন্টের আইনমন্ত্রীও ছিলেন।

এয়ারপোর্টে প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা করিতে গবর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ও আরও কতিপয় সামরিক–অসামরিক অফিসার ছাড়া আর কেউ যান নাই। প্রেসিডেন্ট এয়ারপোর্টে সমবেত রিপোর্টারদেরে এড়াইয়া সোজা প্রেসিডেন্ট ভবনে চলিয়া যান।

৩৬—

প্রেসিডেন্ট ভবনে সাংবাদিকরা তাঁর সাথে দেখা করিতে চাহিলে প্রেসিডেন্ট তাতেও অসম্মত হন। প্রেসিডেন্টের পি. আর. ও. সাংবাদিকদেরে আরও বলেন যে, প্রেসিডেন্ট কতদিন ঢাকায় থাকিবেন, কবে ফিরিয়া যাইবেন, তাও তিনি বলিতে পারিবেন না। মোট কথা, সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল ঢাক্-ঢাক্ ঘুর-ঘুর অবস্থা। তবে প্রেসিডেন্ট আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সংগে সাক্ষাত করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্টের পি. আর. ও. সাংবাদিকদেরে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, প্রেসিডেন্ট গত জানুয়ারি মাসের ১১ই ও ১২ই তারিখে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পি. আর. ও. বোধ হয় পরোক্ষভাবে বলিতে চাহিয়াছিলেন যে প্রেসিডেন্ট আওয়ামী-নেতৃবৃন্দের সাথে কথাবার্তা বলিতেই আসিয়াছেন। কিন্তু এই সহজ কথাটাই সোজাভাবে বলিতে পারেন নাই। সব অবস্থা এমনই অনিশ্চিত ছিল। ১১ই ও ১২ই জানুয়ারি সত্যসত্যই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সাথে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। প্রথম দিনের সাক্ষাতটা ছিল ইয়াহিয়া-মুজিবের মধ্যকার একান্ত ব্যক্তিগত মোলাকাত। কারও পক্ষে কোন সহযোগী ছিলেন না। দ্বিতীয় দিনের মোলাকাতে শেখ মুজিবের সংগে ছিলেন তাঁর প্রথম কাতারের সহকর্মীদের মধ্যে সৈয়দ নযরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহ্মদ, খোন্দকার মুশতাক আহ্মদ, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মনসুর আলী, এ. এইচ. এম কামরুয্যামান। প্রেসিডেন্টের সহযোগী ছিলেন লেঃ জেঃ পীরযাদা ও পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালিন গবর্নর ভাইস-এডমিরাল আহ্সান। সে আলোচনা সন্তোষজনক হইয়াছিল বলিয়া তৎকালে জানান হইয়াছিল।

২. বৈঠক শুরু

সংবাদপত্র রিপোর্টাররা তথা জনসাধারণ আগে হইতে কিছু জানিতে না পারিলেও পরদিন ১৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বৈঠক শুরু হয়। প্রথম দিনের বৈঠক ১৫০ মিনিট স্থায়ী হয়। উভয় পক্ষেই কয়েকজন করিয়া সহকারী ছিলেন। দ্বিতীয় দিনের (১৭ই মার্চ) বৈঠকও ১৫০ মিনিট স্থায়ী হয়। এই দিনের বৈঠক ছিল একান্ত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বা শেখ মুজিবের সাথে কোনও সহকারী ছিলেন না। তবে দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে যোগদানের আগে শেখ সাহেব তাঁর প্রথম কাতারের নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

এই বৈঠক চলে বিরতিহীনভাবে ২০শে মার্চ পর্যন্ত। দুই পক্ষ হইতে যুক্তভাবে কিম্বা কোনও পক্ষ হইতে এককভাবে এইসব আলোচনার বিষয়বস্তু বা আলোচনার ধারার বিষয়ে কোনও বিবৃতি বাহির হয় নাই। কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শেখ

মুজিব নিজে, কখনও তাঁর সহকর্মীদের কেউ-কেউ, বলিয়াছেন ঃ আলোচনায় অগ্রগতি হইতেছে।

এই মুদ্দতের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতা শেখ মুজিবের সাথে তাঁর বাড়িতে দেখা-সাক্ষাত ও আলোচনা করেন। এঁদের মধ্যে ন্যাপ নেতা আবদুল ওয়ালী খাঁ মুসলিম লীগের নেতা মমতাজ দওলতানা, জমিয়তে-ওলামার নেতা মুফতি মাহমুদ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের সংগে শেখ মুজিবের কি আলোচনা হইয়াছে, তা প্রকাশ নাই।

৩. বৈঠক ব্যর্থ

তবে এই আলোচনা চলিতে থাকাকালেই ২১শে মার্চ তারিখে স্টুডেন্টস্ অ্যাকশন কমিটি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই আপিল করেন যে ২৩শে মার্চকে বরাবরের মত 'পাকিস্তান-দিবস' রূপে পালন না করিয়া 'প্রতিরোধ দিবস' উদযাপন করিতে হইবে এবং পাকিস্তান নিশানের বদলে 'স্বাধীন বাংলাদেশ পতাকা' উত্তোলন করিতে হইবে। বলা আবশ্যক যে 'স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা' রূপে একটি পতাকা একদল ছাত্র ইতিমধ্যেই চালু করিয়াছিল। ৭ই মার্চের ঘৌড়-দৌড় মাঠের সভায় এই পতাকা অনেক দেখা গিয়াছিল। শেখ মুজিবকে দিয়া এই পতাকা উড়াইবার মানে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার খুব জোর চেষ্টা হইয়াছিল। শেখ মুজিব বুদ্ধিমত্তার সাথে এই চেষ্টা প্রতিহত করেন।

এ অবস্থায় ২১শে মার্চ (বুধবার) ছাত্র-সংগ্রাম কমিটির ঐ ঘোষণায় অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। অনেকেই ধরিয়া নিয়াছিলেন যে, ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক ব্যর্থ হইতে যাইতেছে। একদিকে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী নেতৃবৃন্দ বলিতেছেন আলোচনার অগ্রগতি হইতেছে, অপর দিকে আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্ট বলিতেছেন, 'স্বাধীন বাংলা' পতাকা উড়াইতে এবং 'পাকিস্তান দিবস' পালন না করিতে। এটা স্পষ্টতঃ অনেকের জন্যই বিভ্রান্তিকর ছিল। কিন্তু আমার মত অনেক 'বুদ্ধিমান' এই বলিয়া ও ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন যে, আলোচনায় প্রেসিডেন্ট ও পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদেরে চাপ দিবার উদ্দেশ্যেই আওয়ামী নেতারা ছাত্রদেরে দিয়া ওটা করাইতেছেন। আসলে ওটা স্বাধীনতা-টাধীনতা কিছু নয়।

২১শে মার্চ ঘটনার বা দুর্ঘটনার আরও উন্নতি বা অবনতি হয়। পনর জন সহকর্মী লইয়া পিপল্স পার্টির নেতা যুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা আসেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ডাকেই তিনি আসিয়াছেন।

ঐ দিন তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন। শেখ মুজিবও ঐদিন প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। কিন্তু দুইজনই আলাদাভাবে।

৪. পরিষদ আবার মুলতবি

পরদিন সোমবারও (২২শে মার্চ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব ও মিঃ ভুট্টোর মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়। এর পর ২৩শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবন হইতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, ২৫শে মার্চ পরিষদের যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হইল। পরিষদ-বৈঠক স্থগিতের এই ঘোষণা শেখ মুজিবের সম্মতিক্রমে হইয়াছিল বলিয়া ঘোষণায় দাবি করা হইয়াছিল।

শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের তরফ হইতে এই স্থগিতের ঘোষণার কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। শেখ মুজিব ও মিঃ ভুট্টোর সহিত আলোচনার পরপরই প্রেসিডেন্ট এই ঘোষণা করায় যুক্তিসংগতভাবেই সকলেরই এই ধারণা হইয়াছিল যে, শেখ সাহেবের সম্মতিক্রমেই এটা ঘটিয়াছিল। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় প্রকৃত অবস্থাই বলা হইয়াছে।

এই কারণে এই ঘোষণা প্রকাশের সাথে-সাথেই আমার মনে হইয়াছিল যে শেখ মুজিব শুধু চালে ভুল করেন নাই, তিনি ইয়াহিয়া-ভুট্টোর পাতা ফাঁদে পা দিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আসন্ন পরিষদ-বৈঠকই ছিল শেখ মুজিবের হাতের প্রধান হাতিয়ার। এটা কি করিয়া তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের হাতে তুলিয়া দিলেন, একথা আমি তখনও বুঝি নাই, আজও বুঝিতে পারি নাই।

বস্তুতঃ মুজিবের আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী ও সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও, বরঞ্চ এই কারণেই, মুজিব-চরিত্রের এই দিকটা আমাকে পীড়া দিয়াছে। ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ না করিয়া বরঞ্চ ঘটনার দ্বারাই তিনি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন বেশি। মুজিব অক্লান্ত পরিশ্রমী, দুর্জয় সাহসী ও দক্ষ সংগঠক হওয়া সত্ত্বেও দরকারের সময় সিদ্ধান্ত নিতে তিনি দ্বিধা করিয়াছেন। এই দ্বিধার সুযোগে ঘটনা নিজের গতিতে বা অন্য কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাতেও মুজিবের দৃশ্যমান কোন ক্ষতি হয় নাই। দৃশ্যতঃ মুজিব কোনও কাজে অসফল হন নাই। কিন্তু তাঁর সবগুলো সাফল্যই চান্স বা ঘটনাচক্রের দান। এ বিষয়ে আমার জানা সব রাজনৈতিক নেতার মধ্যে শেখ মুজিবই সবচেয়ে ভাগ্যবান। শত্রু-মিত্র, পক্ষ-বিপক্ষ প্রকৃতি-পরিবেশ সবাই যেন মুজিবের অনুকূলে ষড়যন্ত্র করিয়াই বিভিন্ন দিকে ভিন্ন-ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি যাই করিয়া থাকুন, পক্ষেই করিয়া থাকুন, আর বিপক্ষেই করিয়া থাকুন, সব গিয়া

যোগ হইয়াছে মুজিবের জমার খাতায়। এতে নিঃসন্দেহে লাভ হইয়াছে প্রচুর। কিন্তু লোকসান হইয়াছে তার চেয়ে বেশি। তফাত শুধু এই যে, লাভটা দৃষ্টি-গোচর, আর লোকসানটা অদৃশ্য। উভয়টাই আপাত। ভাগ্য তাঁর পক্ষে, অগণিত ঘটনায় তা প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁর ধারণাও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে বিশ্বাসের কথা তিনি একাধিকবার সগৌরবে প্রকাশও করিয়াছেন। এই বিশ্বাসেই তিনি তাঁর ভাগ্যকে, তথা ঘটনাকে, নিজের কাজে লাগাইবার বদলে ঘটনা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। আলোচ্য ঘটনা এই দিককার সব চেয়ে বড় নযিরের একটি।

সকলেরই মনে থাকিবার কথা, ৩রা মার্চ তারিখে ঢাকায় ন্যাশনাল এসেমব্লির বৈঠক বসিবে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার পর হইতেই পশ্চিমা পাকিস্তানের বিভিন্ন পার্টির নেতারা ঢাকায় আসিয়া শেখ মুজিবের সাথে দেখা করিতে, ও তাঁকে সমর্থনের আশ্বাস দিতে শুরু করেন। আর পশ্চিম পাকিস্তানী এম. এন. এ.-রা পি. আই. এ.র ঢাকার টিকিট কিনিতে শুরু করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি মিঃ ভুট্টো পেশোয়ার হইতে ঢাকার বৈঠক বয়কট করার হুমকি দেওয়ার পরও পশ্চিম-পাকিস্তানী মেম্বরদের ঢাকার টিকিট কিনার এই হিড়িক অব্যাহত থাকে। এটা সংবাদপত্রে-প্রকাশিত সত্য যে, ভুট্টোর হুমকির পরও ৭৭ জন পশ্চিম-পাকিস্তানী এম. এন. এ. ঢাকার বৈঠকে যোগদানে আগ্রহী ছিলেন। পিপল্স পার্টি ছাড়া আর সব পার্টি-নেতারাই ভুট্টোর এই হুমকির নিন্দা করিয়াছিলেন। খোদ পিপল্স পার্টিরও কতিপয় মেম্বর তাই করিয়াছিলেন। পশ্চিম-পাকিস্তানের মোট এম. এন. এ. সংখ্যা ১৪৪ জনের মধ্যে ৮৫ জনই পিপল্স পার্টির। অবশিষ্ট ৫৯ জনই শুধু অন্য পার্টির। ঢাকা-যাত্রী মেম্বর সংখ্যা ৭৭ জন হওয়ায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ ১৮ জন পিপল্স পার্টির এম. এন. এ. মিঃ ভুট্টোর নির্দেশ অমান্য করিয়াই ঢাকা বৈঠকে যোগদানে ইচ্ছুক ছিলেন।

এটা পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে খুবই স্বাভাবিক। শেখ মুজিব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একক ক্লিয়ার মেজরিটি পার্টির নেতা। কিন্তু তাঁর এই একক মেজরিটিতে পশ্চিম-পাকিস্তানের কোনও মেম্বর না থাকায় তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানের যেকোনও পার্টির সহিত কোয়ালিশন করিয়া স্থায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব চালাইতে পারেন, এটা সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাই শেখ মুজিবের সমর্থন লাভের জন্য প্রতিযোগিতা লাগিয়া গেল। শুধু মন্ত্রিত্বের লোভের কথা নয়। মন্ত্রিত্বে শরিক হইতে পারিলে দলগত সুবিধাও আপনিই হইবে, এটাও সকলের জানা কথা। মিঃ ভুট্টো পশ্চিম-পাকিস্তানের রাজনীতিতে নবাগত। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভটা তাঁর একান্তই আকস্মিক সৌভাগ্য। মিঃ ভুট্টোর এই আকস্মিক বিজয়ে মিঃ মমতাজ

দওলতানা, মিঃ ওয়ালী খাঁ, মওলানা মওদুদী প্রভৃতি পশ্চিম-পাকিস্তানী প্রবীণ নেতারা নিশ্চয়ই খুবই বিস্মিত, দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। এটাকে নিতান্ত সাময়িক দুর্ঘটনা বলিয়াও তাঁরা মনে করিয়াছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের একক নেতা শেখ মুজিবের সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ঢুকিতে পারিলে অল্পদিনেই তাঁরা এই সাময়িক পরাজয় পাড়ি দিতে পারিবেন, এমন আশা তাঁরা নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন। এই আশায় তাঁরা ছয়-দফা-ভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনায়ও রাযী হইতেন। আসলে 'ছয়-দফা' যে পাকিস্তানের সংহতি-বিরোধী ছিল না, এ বিষয়ে ইয়াহিয়া-ভূট্টো, দওলতানা-ওয়ালী খাঁ, মওদুদী-মাহমুদ সবাই একমত ছিলেন। ছয়-দফার জন্য যে মুজিব ভূট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনা ভাংগে নাই, সত্য কথা এই যে আপোস আলোচনা মোটেই ভাংগে নাই, ২৫শে মার্চের হামলা যে সম্পূর্ণ অন্য কারণে হইয়াছিল, সে কথার বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। এখানে এ বিষয়টার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, ছয়-দফা-ভিত্তিক সংবিধান রচনায় শেখ মুজিবের সমর্থন করিতে পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্য সব পার্টিই রাযী হইতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সুস্পষ্ট মেজরিটি দল পিপলস পার্টিকে বাদ দিয়া পাকিস্তানের সংবিধান রচনা রাজনৈতিক বা ন্যায়নৈতিক দিক হইতে ঠিক হইত কি না, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু পিপল্স পার্টিকে বাদ দিয়া অন্য যে-কোনও বা সব পার্টিকে লইয়া মন্ত্রিত্ব গঠন যে কোনও দিক হইতেই শেখ মুজিবের পক্ষে অন্যায় হইত না, এ বিষয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নাই। শেখ মুজিবের মত সংগ্রামী ও অভিজ্ঞ নেতা এ ব্যাপারে কোনও ভুল করিতে পারেন না, এ বিশ্বাসেই পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্যান্য সব পার্টিসমূহের নেতারা সদলবলে শেখ মুজিবের এমন জোর সমর্থন দিয়াছিলেন।

ইয়াহিয়া-ভূট্টোর স্তোক বাক্যে বা চাপে শেখ মুজিব পরিষদের বৈঠক পুনরায় মুলতবি করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানী এম. এন. এ.-দের পৃথক-পৃথক অধিবেশনে রাযী হওয়াতেই ঐসব পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতার স্বপ্নভংগ হইল। শেখ মুজিবের সহায়তায় তাঁদের হারানো নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের আশা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। তার উপর পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে পৃথক-পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে শেখ মুজিব রাযী হওয়ায় পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা স্পষ্টই বুঝিলেন, শেখ মুজিব গোটা পাকিস্তানের নেতৃত্বে নিজ হাতে না রাখিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃত্ব ভূট্টোর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন এবং একেবারেই নীরব ও নিরুৎসাহ হইয়া গেলেন। নির্বাচনে একটি সীটও না পাইয়া শেখ মুজিব সেখানে যে শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, এভাবে তা হাতছাড়া হওয়ায়

অতঃপর শেখ মুজিবের ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে ইয়াহিয়া–ভুট্টোর হাতে ন্যস্ত হইয়া গেল। আমি সেদিনও বিশ্বাস করিতাম এবং আজও করি যে, পশ্চিম–পাকিস্তানের ঐসব নেতা শেখ মুজিবের সমর্থক থাকিলে ২৫শে মার্চের ঐ নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক মূঢ়তা সংঘটিত হইত না।

২৩শে মার্চ ছুটির দিন বলিয়া কোনও বৈঠক হয় নাই। যা হোক, ২৪শে মার্চও প্রেসিডেন্ট ভবনে আওয়ামী লীগের তিনজন নেতা জনাব সৈয়দ নযরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দিন আহ্‌মদ ও ডাঃ কামাল হুসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠক সম্পর্কে ২৫শে মার্চের দৈনিক খবরের কাগযে আওয়ামী লীগের তরফে এইরূপ সংবাদ বাহির হয় ঃ

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে মূলনীতি সংক্রান্ত যে সমঝোতা হইয়াছে, তদনুযায়ী বিশদ পরিকল্পনা গতকাল বুধবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে পেশ করিয়াছেন। বৈঠক শেষে জনাব তাজুদ্দিন আহমদ জানাইয়াছেন যে, বংগবন্ধুর সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর মূলনীতি সংক্রান্ত যে মতৈক্য হইয়াছে, তদনুযায়ী তাঁরা গতকাল উপদেষ্টাদের কাছে বিশদ পরিকল্পনা পূর্ণাংগভাবে পেশ করিয়াছেন। পরিস্থিতির যাতে আরও অবনতি না ঘটে, তার জন্য আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদেরে বিলম্ব–নীতি পরিহার করার আহবান জানাইয়াছেন। তাঁরা জানাইয়াছেন যে, আওয়ামী লীগের ফরমূলা পুরাপুরি পেশ করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

৫. পাক–বাহিনীর হামলা

এই পরিবেশে ২৫শে মার্চের রাত সাড়ে এগারটায় পাক–বাহিনী হামলা করে। হামলাটা ছিল স্পষ্টতঃই আকস্মিক। নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকা অবস্থায় এমন আকস্মিক সামরিক হামলা হওয়াতে অনেকেই মনে করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তাঁর সংগীদের আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাটা ছিল নিতান্তই লোক–দেখানো ব্যাপার। দস্তুর–মত শয়তানি। সামরিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে তাঁরা সময় নিতেছিলেন মাত্র।

যাঁরা এমন মনে করেন বা বলেন, তাঁদের পক্ষে অবশ্য এটা অনুমান মাত্র। কিন্তু এই অনুমান সমর্থিত হইয়াছে সরকারী কথার দ্বারা। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে 'ইস্ট পাকিস্তান

ক্রাইসেস ঃ হোয়াট হ্যাপেন্ড' শীর্ষক একটি হোয়াইট পেপার বাহির হয়। এটি একটি বড় আকারের পুস্তক। এই পুস্তকে বলা হয় যে, ২৫/২৬ মার্চের মধ্যরাত্রির পরে আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করিবার জন্য দিন-ক্ষণ (যিরো আওয়ার) নির্বাচিত করিয়াছিল। স্পষ্টতঃই ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রের আগেই সামরিক হামলার যুক্তিযুক্ততার সমর্থনেই পাকিস্তান সরকার এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। এই হোয়াইট পেপারে দাবি করা হইয়াছে যে, আলোচনা চলাকালেই সরকার এই ষড়যন্ত্রের কথা সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন। যে সব প্রমাণ সরকার পাইয়াছিলেন, হোয়াইট পেপারে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সে সব প্রমাণে বিশ্বাস স্থাপন করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে ২৫শে মার্চের রাত্রিবেলার হামলাটা ছিল নিছক একটা ডিফেন্সিভ মুভ্। যুক্তিটা এই ঃ 'ওরাই আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল। তাই আমরাই আগে হামলা করিয়া তাদের অসদুদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিলাম।' কথাটা তথ্য হিসাবে কতদূর সত্য, তার বিচারে তদন্ত দরকার। কিন্তু যুক্তি হিসাবে কথাটা কতটা টেকসই, তার বিচার এখনি করা চলে।

'ওরা ও আমরা' পক্ষ দুইটা এখানে আওয়ামী লীগ ও সরকার। আওয়ামী লীগ পার্টি সাম্প্রতিক নির্বাচনে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি দল। আর সরকার মিলিটারি বুরোক্রাসি সমর্থিত বিপুল ও অসাধারণ শক্তিশালী গবর্নমেন্ট। এই দুই পক্ষের মধ্যে সামরিক কায়দায় অফেনসিভ্-ডিপেনসিভ্ স্ট্র্যাটিজির কথা সরকারের মাথায় ঢুকাটা নিতান্তই অদ্ভুত ও অসাধারণ। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী মেজরিটি পার্টি হইলেও তখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই এ এই বিরোধের দুই পক্ষকে দুইটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরোধ বলা চলে না। পূর্ব-পাকিস্তানে নির্বাচন-বিজয়ী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পরও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনায় তাঁরা বেয়াড়া প্রতীয়মান হইলে তাঁদেরে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন একাধিকবার করা হইয়াছে। শেরে-বাংলা ফযলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে একটি ব্যালটবাক্স বিপ্লব আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মর্যাদায় ওটা একটা চরম আঘাতও বিবেচিত হইয়াছিল। প্রতিশোধ স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার হক মন্ত্রিসভাকে এবং স্বয়ং হক সাহেবকে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রকারী দেশদ্রোহী অভিহিত করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শেরে-বাংলাকে গৃহ-বন্দী করা হইয়াছিল এবং অন্যতম মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই এ সব কাজ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু হাতে-কলমে তা করিয়াছিলেন প্রাদেশিক সরকারের দেওয়ানী ও পুলিস অফিসাররাই। গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এইসব অফিসার মন্ত্রিগণকে মনিব বা বস্ মানিয়াছিলেন ; তাঁদের

হুকুমে কাজ করিয়াছিলেন। আর পর মুহূর্তেই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বসুকে গ্রেফতার করিতেও তাঁরা দ্বিধা করেন নাই। কারণ এটাই তাঁদের ট্রেনিং। নিজস্ব ও ব্যক্তিগত মতামত ও অভিরুচির উর্ধ্বে ও বাহিরে 'সরকারের' নির্দেশ পালনই এঁদের শিক্ষা। সরকার এখানে ইমপার্সনেল অব্যক্তিক একটা ইনস্টিটিউশান, একটা প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রীরা যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকেন, ততক্ষণ তাঁরাও কার্যতঃ সরকার। কিন্তু তাঁদেরে সরকারের অংগ বলাই ঠিক। কারণ তাঁদেরে ছাড়াও, তাঁদের বাইরেও, সরকারের অস্তিত্ব আছে এবং সেটাই আসল সরকার। এটা বুরোক্র্যাসি, আমলাতন্ত্র। এই তন্ত্র বা শাসনযন্ত্র কাজ করে প্রেসিডেন্ট, গবর্নর, চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি,আই. জি, ডি. আই. জি, ডি. সি., এস. পি· এই চ্যানেলের মাধ্যমে। এটাই বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেমের ধারা এঁরা পার্মানেন্ট অফিশিয়াল বা স্থায়ী সরকারী কর্তকর্তা। নির্বাচিত সরকার বা মন্ত্রীরা এঁদের মাধ্যমে ও সহযোগিতায় সরকার পরিচালনা করেন।

৬. সনাতন নীতির বরখেলাফ

এ বিষয়ে এখানে এত কথা বলিলাম এ জন্য যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে পাকিস্তান সরকার পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমে প্রচলিত নিয়ম ও ধারায় কাজ করেন নাই। পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট। তাঁর অধীনস্ত ও হুকুমবরদার গবর্নর। গবর্নরের হুকুমবরদার চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, আই. জি, ডি. সি, এস. পি. ইত্যাদি সরকারী অংগ-প্রত্যংগ সবই মওজুদ ছিল ঘটনার দিন। আওয়ামী লীগ নেতারা প্রেসিডেন্টের সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার আড়ালে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিতেছেন, এটা বুঝিতে পারার সংগে সংগেই তাঁদের সবাইকে এবং শহরে উপস্থিত আরও কিছু নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগারকে গ্রেফতার করিলেই সনাতন প্রচলিত সরকারী নিয়মে কাজ করা হইত। এই গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র-তরুণ ও জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিলে তারও প্রতিরোধ করার সনাতন পন্থা সরকারের জানা ছিল। শাসনযন্ত্রের মেশিনারি তাতে অভ্যস্তও ছিল। ঐ সনাতন পন্থায় সরকার অগ্রসর হইলে ২৫শে মার্চ ও তার পরে যা-যা ঘটিয়াছিল, তাও ঘটিত না। অত-অত লোক-ক্ষয়ও হইত না। শক্তিশালী যালেম শাসক ও নিরস্ত্র মযলুম শাসিতের সম্পর্কের বেলা বরাবর যা হইয়াছে, এখানেও তাই হইত।

কিন্তু ঐ দিনকার পাকিস্তান সরকার ঐ সনাতন শাসক-শাসিতের সনাতন পন্থা গ্রহণ না করিয়া, এমনকি সে চিন্তাও না করিয়া, দুই যুধমান শত্রু পক্ষের মনোভাব ও

কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। কঠিন বলিয়াই তৎকালীন পাক-সরকার পরবর্তীকালেও উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই। চেষ্টা করিবার পথও তাঁরাই রুদ্ধ করিয়াছিলেন। কারণ আওয়ামী লীগের নেতা, সরকারের নযরে সবচেয়ে বড় অপরাধী, শেখ মুজিবকে সত্য-সত্যই তাঁরা গ্রেফতার করিয়াছিলেন। শেখ মুজিবও বরাবরের মতই বিনা-বাধায় ধরা দিয়াছিলেন। সরকারের কথিত যুধমান প্রতিপক্ষের সেনাপতির মত তিনি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কোন বাধাও দেন নাই, আত্মগোপনের চেষ্টাও করেন নাই। এটা কি আক্রমণোদ্যত শত্রুপক্ষের সেনাপতির কাজ? নিশ্চয়ই না। অতএব শেখ মুজিবের ঐ দিনকার আচরণই 'হোয়াইট পেপারে'-বর্ণিত 'আওয়ামী লীগের পরিকল্পিত হামলার' অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে।

৭. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আচরণ

তারপর ধরা যাক, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৫শে মার্চের আচরণটা। ঐ দিনকার দৈনিক কাগযসমূহে প্রকাশিত খবরে জানা গিয়াছিল যে, আগের সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁদের চূড়ান্ত বক্তব্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট লিখিতভাবে পেশ করিয়াছেন এবং ২৫শের সন্ধ্যা-তক প্রেসিডেন্টের উত্তরের অপেক্ষা করিতেছেন। প্রেসিডেন্টের জবাব অনুকূল হইবে বলিয়াই তাঁরা আশা করিতেছেন। কিন্তু ২৫শে মার্চের সন্ধ্যায় বাস্তবে কি ঘটিয়াছিল? রাত আটটার দিকেও প্রেসিডেন্টের তরফ হইতে কোনও আহট না পাইয়া আওয়ামী নেতারা জানিতে পারিলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট ভবন ছাড়িয়া ক্যান্টনমেন্টে চলিয়া গিয়াছেন। পরে শুনিতে পাইলেন, তিনি সন্ধ্যা ছয়টার সময়েই করাচির পথে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন ২৬শে মার্চ পাকিস্তান রেডিওতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবকে গাল দিয়াও আওয়ামী লীগ বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে অসাধু ও অভদ্র বিবৃতি দিলেন, আওয়ামী লীগ নেতাসহ পূর্ব-পাকিস্তানীরা বিস্ময়ে সে বক্তৃতা শুনিল এবং বুঝিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সত্য-সত্যই আগের সন্ধ্যায় গোপনে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এটা কি একজন হেড-অব-দি-স্টেট ও হেড-অব-দি গবর্নমেন্টের যোগ্য কাজ হইয়াছিল? কেন তিনি নিজের এবং রাষ্ট্রের এমন মর্যাদাহানিকর কাজ করিলেন? যে সব কথা তিনি ২৬শে মার্চের রেডিও পাকিস্তানের ব্রডকাস্টে বলিয়াছিলেন, তার একটা কথাও তিনি ঢাকায় বসিয়া, আলোচনা চলাকালে অথবা আলোচনা শেষে, বলেন নাই। আলোচনা অচলাবস্থায় আসিয়াছে বা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, এমন কোনও আভাসও তিনি বা তাঁর পক্ষে অন্য কেউ দেন নাই। শেখ মুজিবকে ও আওয়ামী লীগকে তিনি যে 'দেশদ্রোহী' এবং সেজন্য যে 'অনেক আগেই তাঁদের

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল', একথা ঘুণাক্ষরেও তিনি দেশবাসীকে জানিতে দেন নাই। সে সব কথাই কি তিনি ঢাকা রেডিওতে বলিতে পারিতেন না ? তিনি কি আওয়ামী লীগ-নেতাদের সামনেই বলিতে পারিতেন না যে, তাঁদের দাবি-দাওয়া পাকিস্তানের অখণ্ডতা-ও স্থায়িত্ব-বিরোধী ; অতএব তিনি তা গ্রহণ করিতে পারিলেন না ? তিনি ঢাকা বসিয়াই আওয়ামী লীগকে সশস্ত্র ষড়যন্ত্রের দায়ে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারিতেন না ? তিনি কি নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভয় পাইয়াই এই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন ? সোজা কথায়, তিনি কি ভয়ে ঢাকা হইতে পলাইয়াছিলেন ? আমার বিশ্বাস হয় না। আমার বিবেচনায় তিনি ভয়ে পলান নাই, পলাইয়াছিলেন তিনি লজ্জায়। একজন জেনারেল ত দূরের কথা, একজন সামান্য সৈনিকও এমন ভীরু হইতে পারেন, আমার মন তা মানিয়া লইতে পারিতেছে না। তাছাড়া, তিনি যদি নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধেই এত ভয় পাইয়াছিলেন, তবে আর সবার নিরাপত্তার কথা তাঁর মনে পড়ে নাই কেন ? সামরিক গবর্নরসহ আরও অনেক কয়জন জেনারেল ও লক্ষাধিক সৈন্য তখনও ঢাকা ও পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে মোতায়েন ছিলেন। ওঁদের কারও নিরাপত্তার কথা তিনি ভাবেন নাই কেন ? কাজেই তিনি ভয়ে নয়, লজ্জায় পলাইয়াছিলেন। ২৬শে মার্চের বক্তৃতায় তিনি যেসব উক্তি করিয়াছিলেন, আওয়ামী নেতাদের মুখামুখি মোকাবেলায় তিনি সেসব কথা বলিতে পারিতেন না। জঘন্য অপরাধী মন লইয়া কারও মুখামুখি ওসব কথা বলা যায় না। রেডিওই ঐ ধরনের উক্তির উপযুক্ত মিডিয়াম। কথার মর্ম যাই হোক, আর যে মাধ্যমেই কথাগুলো বলা হোক, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কথায় ও আচরণে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগের সহিত আলোচনা ব্যর্থ হইবার এবং ফলে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার মূল দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার, আওয়ামী লীগের নয়।

৮. মিথ্যা অভিযোগ

আওয়ামী লীগকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য পরবর্তীকালের (৫ই আগস্ট) 'হোয়াইট পেপারে' আরো অনেক কথা বলা হইয়াছিল। তার মধ্যে প্রধান কথাটা এই যে, ২রা মার্চ হইতে আওয়ামী লীগের "তথাকথিত অহিংস অসহযোগ অন্দোলন" শুরু হওয়ার সাথে-সাথেই আওয়ামী লীগ ভলান্টিয়াররা এবং তাদের উস্কানিতে বাংগালীরা অবাংগালীদের উপর বর্বর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। কথাটা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ ৫ই আগস্টে প্রকাশিত 'হায়াইট পেপার' নিজেই। এই হোয়াইট পেপারের এপেণ্ডিক্স 'জি'তে যে হিংসাত্মক কাজের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাতে ২৬-২৭শে মার্চের চাটগাঁর ঘটনা হইতে শুরু করিয়া ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত মুদ্দতের

দিনানুক্রমিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণীয় যে এই সবই ২৫শে মার্চের পরের ঘটনা। সত্য হইলেও এগুলোকে আগ্রাসনী কাজ বলা চলে না। বড়জোর প্রতিশোধমূলক নৃশংসতা বলা চলে। এইসব বিবরণে কোনও-কোনও জায়গার নৃশংসতাকে '২৩শে মার্চ হইতে ১লা এপ্রিলের' ঘটনা বলিয়া এজমালি আকারে দেখান হইয়াছে। ২৩/২৪-এর ঘটনা বলিয়া আলাদা কোনও নৃশংসতার কথা বলা হয় নাই। অসদুদ্দেশ্যটা সুস্পষ্ট।

উপাধ্যায় পাঁচ

মুক্তিযুদ্ধ—জন-যুদ্ধ

১. সংগ্রাম শুরু

২৫শে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বরের ঘটনাবলী আমি সংক্ষেপে ডিংগাইয়া যাইতেছি। দুই কারণে। প্রথমতঃ, এইসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেশী-বিদেশী খবরের কাগযে, বই-পুস্তিকায় এত বেশি বলা হইয়া গিয়াছে যে, পাঠকরা সবই জানিয়া ফেলিয়াছেন। আমি সে সবের পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। সে সব বিবরণীর মধ্যে যেটুকু অসংগতি ও পরস্পর-বিরোধিতা আছে, তারও অনেকগুলি পাঠকগণ নিজেরাই ধরিতে পারিয়াছেন। সে সব আলোচনার স্থানও এই পুস্তকে নাই ; যোগ্যতাও আমার নাই। দ্বিতীয়ত : এই ঘটনাবলীর মধ্যে রাজনীতির চেয়ে যুদ্ধনীতিই বেশি। এর যতটুকু রাজনীতি, মাত্র ততটুকুই আমি প্রসংগত ও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

ন মাসের এই মুদ্দতটাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দুই মাসের মুদ্দতটা ছিল একটা নির্বোধ জংগী সরকারের পক্ষে নিরস্ত্র নিরপরাধী দেশবাসীর বিরুদ্ধে সরকারী দমন নীতির নামে একটা বর্বর ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ। পরের পাঁচ মাস ছিল একটা বিদেশী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গোটা দেশবাসীর সার্বিক জন-যুদ্ধ। শেষের দুই মাস ছিল এটা জনসমর্থনহীন পাকবাহিনী ও জন-সমর্থিত ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ।

প্রথম দুই মাসের নিষ্ঠুরতার অনেকখানি আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি। ২৫শে মার্চের পাকবাহিনীর অন্যতম টার্গেট পিলখানার ই. পি. আর. ছাউনি আমার বাড়ি থনে মাত্র তিন শ' গজ দূরে। আর একটি টার্গেট ভার্সিটি ক্যাম্পাসও এক মাইলের মধ্যে। ওখানকার গোলাগুলির আওয়ায ও আর্তনাদ কানে শুনিয়াছি। আর ই. পি. আর. ছাউনির গোলাগুলি চোখে দেখিয়াছি। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত থনে ২৭শের সকাল পর্যন্ত অবিরাম বত্রিশ ঘন্টা এই গুলি-বিনিময় হয়। তার বেশ কিছু সংখ্যক গুলি আমার বাড়িতেও পড়ে। আমার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা গাছ-পালার ঘন জংগলে ঢাকা। একদম পাড়াগাঁয়ের বাড়ির মত। এই কারণে ওইসব গুলির অধিকাংশ ঐ জংগলে বাধা পাইয়া ছরছর শব্দে মাটিতে পড়িয়াছে। মাত্র দু'চারটা দেওয়ালে-জানালায় লাগিয়াছে। আমার বাড়ির দক্ষিণ দিক্‌কার যে সব বাড়ি আমার বাড়ির মত

জংগলে সুরক্ষিত নয়, তাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি ও কিছু-কিছু খুন-জখমও হইয়াছিল।

দুই রাত ও একদিন এইভাবে ঘরে বন্দী থাকিবার পর ২৭শে মার্চের সকাল ন' টার দিকে রাস্তায় লোকজন ও কিছু-কিছু রিকশা দেখা গেল। শোনা গেল কারফিউ কয়েক ঘন্টার জন্য তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই রাস্তায় গমনশীল বিপুল জনতা দেখা গেল। সবাই শহর ছাড়িয়া পাড়াগাঁয়ের দিকে চলিয়াছে। কাঁধে-মাথায় বিছানাপত্র, হাতে হাড়ি-পাতিল। মনে হইল শহর বুঝি খালি হইয়া গেল। খবর লইবার জু নাই। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রি হইতেই টেলিফোন স্তব্ধ। গুজব রটিল, যারা যে ভাবে পারিতেছেন, শহর ছাড়িয়া পলাইতেছেন। আমাদেরও পলাইবার কথা উঠিল। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি অসুস্থ, অচল। আমার স্ত্রী যিদ ধরিলেন, রাস্তায় পড়িয়া মরার চেয়ে 'ঘরে মরা' ভাল। কারণ ঘরে মরিলে কাফন-দাফন হইবে। রাস্তায় মরিলে লাশ শিয়াল-কুত্তায় খাইবে। কাজেই ঘরে বসিয়াই আজরাইলের অপেক্ষা করিতে থাকিলাম। এ বিষয়ে এর বেশি বলিবার কিছু নাই। কারণ এই মুদ্দতে এ দেশের যাঁরা ভারতে পলাইয়া যান নাই, অথবা অন্য কারণে বিদেশে ছিলেন না, তাঁদের প্রায় সবারই এই একই অবস্থা ছিল। অধ্যাপক মফিযুল্লা কবির তাঁর বই-এ তাঁদের 'স্বদেশে নির্বাসিত' এই চমৎকার বিশেষণ দিয়াছেন। সত্যই আমরা সবাই এই মুদ্দতটায় নিজেদের দেশে নির্বাসিত, এক্‌যাইল, ছিলাম। এক্‌যাইলদের চেয়েও দুরবস্থায় কাটাইয়াছেন যাঁরা ছিলেন ফিউজিটিভ নিজের দেশেই। কারণ নিজেদের ঘরবাড়ি ফেলিয়া সপরিবারে এঁরা স্থান হইতে স্থানান্তরে পলাইয়া বেড়াইতেন বর্বর পাক-বাহিনীর ভয়ে। এই মুদ্দতের চোখে-দেখা নৃশংসতার অনেকগুলির মধ্যে দুইটির উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। প্রতি রাত্রে ঢাকা নগরের একাধিক স্থান হইতে আসমান-ছোয়া আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাইত। অনেকগুলি দুচার ঘন্টা এবং কোনও-কোনোটা সারা রাত আসমান লাল করিয়া রাখিত। পরে শোনা যাইত, বিভিন্ন বস্তি ও পুরাণ শহরের বিভিন্ন মহল্লায় পাক-বাহিনী এই অগ্নিকাণ্ড ঘটাইতেছে। বলা হইত, বস্তি ও মহল্লার বাশিন্দারা পলাইবার চেষ্টা করিলে পাক-বাহিনী তাদেরে গুলি করিয়া হত্যা করিত। কথাগুলির সত্যতা যাচাই করিবার জু ছিল না। তবে এটা ঠিক যে এইভাবে বেশ কিছুদিন ধরিয়া রাতের বেলা ঢাকা শহরে মহাকবি দান্তের 'ইন্‌ফার্নো' দেখা যাইত।

২. হিটলারের পরাজয়

আরেকটি ব্যাপার দেখিয়া হিটলারের ইহুদি-নির্যাতনের কথা মনে পড়িত। প্রায় প্রতিদিন পূর্বাহ্নে খোলা ট্রাক-বোঝাই লোক নেওয়া হইত। আমার বাসার সামনের সাত-মসজিদ রোড দিয়াই এসব ট্রাক যাতায়াত করিত। উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং

দক্ষিণ হইতে উত্তরে উভয়দিকেই এসব ট্রাক যাতায়াত করিত। সব ট্রাকেই একই দৃশ্য। সব ট্রাকই লোক-ভর্তি। লোকগুলোর শুধু মাথা দেখা যাইত। নিশ্চয়ই বসা। তবে কি ধরনের বসা, বাহির হইতে তা দেখা যাইত না। সবগুলি মাথা হেট করা। মাথার কালা চুল দেখিয়া বোঝা যাইত, সবাই হয়ত যুবক। অন্ততঃ বুড়া কেউ নয়। মাথা হেট করিয়া থাকিত বোধহয় সৈন্যদের কড়া নির্দেশে। কারণ ট্রাকের উপরেই সংগীন-তাক্-করা বন্দুকধারী দু-চার জন করিয়া সৈনিক দাঁড়াইয়া থাকিত। ভাবখানা এই যে, বন্দীরা মাথা নাড়িলেই গুলি করা হইবে। ওদের হাত-পা বাঁধা ছিল কি না, মানে তারা ইচ্ছা করিলেই ট্রাক থনে লাফাইয়া পলাইতে পারিত কি না, তা বুঝিবার জু ছিল না।

লোকমুখে শোনা যাইত দুই রকম কথা। কেউ বলিত, এইসব যুবককে হত্যা করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইতেছে। আর কেউ বলিত, এঁদেরে দিয়া বাধ্যতামূলক শ্রমিকের কাজ করান হইতেছে। এই দুই কথার একটারও সত্যতা যাচাই করার উপায় ছিল না।

দু'চার দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সরকার আমাকে আপাততঃ রেহাই দিতেছেন। কেন এমন দয়া করিয়াছিলেন, সেটা বুঝিয়াছিলাম আরও পরে জুন মাসের শেষ দিকে। সে কথা পরে বলিতেছি। প্রথম যখনই বুঝিতে পারিলাম, আমি আপাততঃ নিরাপদ, তখনই আওয়ামী নেতাদের নিরাপত্তার চিন্তায় পড়িলাম। শেখ মুজিব ধরা দিয়াছেন, একথা পাকিস্তান রেডিও ও অন্যান্য রেডিও হইতেই শুনিয়াছিলাম। পাকিস্তান রেডিও যখন মুজিবের গ্রেফতারির দাবি করিয়াছে, তখন তাঁর জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলাম। সহজেই বুঝিলাম, শেখ মুজিবকে প্রাণে মারিবার ইচ্ছা থাকিলে পাক-বাহিনী কদাচ তাঁর গেরেফতারের কথা স্বীকার করিত না। তখন অন্যান্য নেতাদের জীবনের নিরাপত্তা লইয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইলাম। আর কারও গেরেফতারের কথা পাক-বাহিনী স্বীকার করিতেছে না কেন ? নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই যে কয়জন বন্ধু-বান্ধব আমার সাথে দেখা করিলেন, তাঁদের মধ্যে নূরুর রহমান ও ইয়ার মোহাম্মদ খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুইজনই বড়লোক, গাড়ির মালিক। কিন্তু গাড়ি না চড়িয়া এঁরা পায় হাঁটিয়া আমার সাথে দেখা করিলেন। আমাকে বুঝাইলেন, গাড়ি চড়া অপেক্ষা পায় হাঁটা অনেক নিরাপদ। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পাক-বাহিনী। পথচারীর উপর ওদের নযরে নাই। গাড়ি দেখিলেই থামায়। যদিও দুইজন পৃথক-পৃথকভাবে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে আসিলেন, কিন্তু দুইজনই একটা যুক্তি দিলেন বলিয়া আমি তাঁদের কথা সত্য বলিয়া বুঝিয়া

নিলাম। এই দুই বন্ধুই খবর দিলেন, তাঁরা নিজেরা কয়েকজন প্রধান আওয়ামী নেতাকে ঢাকার বাহিরে পাচার করিয়া দিয়াছেন কাউকে টুপি আর কাউকে বোরকা পরাইয়া। তাঁরা অবশ্য নেতাদের নাম বলিয়াছিলেন। কিন্তু সুস্পষ্ট কারণেই আমি এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করিলাম না। যদিও এতে কোন লজ্জা বা অগৌরবের কিছু নাই ; বরং গৌরবের কথা আছে ।

বন্ধু বান্ধবদের সম্বন্ধে এইভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া সামরিক সরকারের নির্বুদ্ধিতার রাজনৈতিক পরিণতি ও বর্বরতার সামরিক পরিণামের কথা ধীরভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম। আমি লক্ষ্য করিলাম, জুন মাসের শেষার্দ্ধ হইতে জংগী সরকারের নীতির খানিকটা বদল হইতেছে। সেনাপতিদের যেন এই সর্বপ্রথম মনে পড়িল, দেশবাসীর অন্ততঃ একাংশের সমর্থন না পাইলে যুদ্ধেও জিতা যায় না। এই বোধোদয় ঘটিবার আশু বাধ্যকর কারণও ঘটিয়াছিল। এই সময় মুক্তিফৌজের 'বিচ্ছুরা' প্রতিরাত্রে ঢাকায় বোমা ফাটাইতে শুরু করিল। এতেই বোধহয় জংগী সরকারের মনে পড়িল, যেমন করিয়া হোক, জনগণের অন্ততঃ একাংশের সহযোগিতা পাওয়া দরকার। এই সময় হইতেই পাক বাহিনীর নেতারা দেশে সিভিলিয়ান সরকার, মহল্লায়-মহল্লায় 'শান্তি কমিটি', 'রেযাকার' 'আলবদর' ইত্যাদি তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনে তৎপর হইলেন।

৩. জন-যুদ্ধ শুরু

কিন্তু বড় দেরিতে এটা ঘটিয়াছিল। কাজেই এ পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগবিরোধী অনেক পার্টি ছিল। নির্বাচনে এরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেও এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে এরা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও দেশে এদের সমর্থক অনেকেই ছিলেন। নির্বাচনে এঁরা সকলেই বেশ কিছু সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন। এই সব দলের অনেকগুলোই সুগঠিত সংগঠন ছিল। তাঁদের নিষ্ঠাবান কর্মী-সংখ্যাও ছিল অনেক। কেন্দ্রীয় সরকার ২৫শে মার্চের আগে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে-কোন অগণতান্ত্রিক ও বে-আইনী দমননীতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেও এসব পার্টি মনে-মনে খুশীই হইত। ধরুন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে সব মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া ১লা মার্চ পরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, বা যে সব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করিয়া ৬ই মার্চ আবার পরিষদের বৈঠক ডাকিয়াছিলেন, ঐসব অভিযোগে যদি '৭০ সালের নির্বাচন বাতিল করিয়া পুনর্নিবাচন দিতেন, তবে পরাজিত পার্টিসমূহ সানন্দে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতেন, এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষাতেই আওয়ামী লীগকে

গালাগালি দিয়া ভোট ক্যানভাস করিতেন। এমন নির্বাচনের ফলাফল কি হইত বলা যায় না, তবে দেশবাসী ও ভোটারদের মধ্যে যে বড় রকমের বিভ্রান্তি ও মতভেদ দেখা দিত, তা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর, বিশেষ করিয়া জুলাই-আগস্ট মাসে, পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা তা ছিল না এই কয়মাসে পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতায় পার্টি-দল-মত-নির্বিশেষে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ ও শিক্ষিত সমাজ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। এদের মধ্যেকার আওয়ামী লীগ-বিরোধীরাও নূতন করিয়া চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এদের বেশকিছু লোক আওয়ামী লীগের সংগ্রামের সমর্থক হইয়া পড়িয়াছেন। আর বাকীরা অন্ততঃপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এক কথায়, পাঞ্জাবী নেতৃত্ব ও পাক-বাহিনী ততদিনে সারা পূর্ব-পাকিস্তানকে পিটাইয়া আওয়ামী লীগের দলে ভিড়াইয়া দিয়াছে। আমি-এর আগে আমার 'শেরে বাংলা হইতে বংগবন্ধু' পুস্তকে লিখিয়াছিলাম : '১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে পূর্ব-পাকিস্তানের একজনও পাকিস্তান ভাংগিবার পক্ষে ছিল না ; ২৫শে মার্চের পরে একজন পূর্ব-পাকিস্তানীও পাকিস্তান বজায় রাখিবার পক্ষে ছিল না।' কথাটা ছিল এই সময়কার সঠিক চিত্র। এ সময় পূর্ব-পাকিস্তানের জনতা সত্যসত্যই এক জন-যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশের কবি-সাহিত্যিক, লেখক-অধ্যাপক, সরকারী কর্মচারি, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই জন-যুদ্ধে শরিক হইয়া পড়িয়াছেন। এমন অবস্থায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত অন্যান্য দেশে যা-যা ঘটিয়াছে, আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। চিনে চিয়াং কাইশেকের তথাকথিত সমর্থকদের প্রায় সবাই যেমন কার্যতঃ মাও সেতুং-এর পক্ষে কাজ করিয়াছিলেন, চিয়াংবাহিনীকে-দেওয়া সমস্ত মার্কিন অস্ত্র যেমন মাও বাহিনীর হাতে চলিয়া গিয়াছিল, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সাহায্যে-দেওয়া অধিকাংশ অস্ত্র যেমন ভিয়েৎকং-এর হাতে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব-পাকিস্তানের বেলাও ঠিক তাই ঘটিয়াছে। শুধু ছোট-বড় অফিসাররাই না, পাক-সরকার নিয়োজিত শান্তি কমিটি, রেযাকার ও বদর বাহিনীর বহু লোকও তলে-তলে মুক্তি-যুদ্ধের ও মুক্তি-যোদ্ধাদের সহায়তা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নিজেদের স্বরূপ ঢাকিবার মতলবেই এঁদের বেশির ভাগ শান্তি কমিটি রেযাকার ও বদর বাহিনীতে নাম লেখাইয়াছেন। এমনকি পাক-বাহিনীর দেওয়া অস্ত্র দিয়াই এঁদের অনেকে পাক-সৈন্যকে গুলি করিয়াছেন। এইভাবে এই দুর্দ্দান্তের সংঘর্ষটা পূর্ব-পাকিস্তানীদের পক্ষে হইয়া উঠে একটা সামগ্রিক ও সর্বাত্মক জন-যুদ্ধ। এই পরিবেশে পাক-সরকার ও তাঁদের সৈন্য বাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানে যা কিছু ভাল-মন্দ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন

তা ব্যর্থ হইতে বাধ্য ছিল। এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগতভাবে জানা ও দেখা দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

৪. জন–যুদ্ধের বিচিত্র রূপ

প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু জনাব নূরুল রহমানের নাম। ইনি বর্তমানে ভাসানী ন্যাপের ভাইস–প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্ম হইতেই তিনি আমাদের অন্যতম প্রধান সহযোগী। ১৯৫৬–৫৭ সালে তিনি সুহ্‌রাওয়ার্দী ক্যাবিনেটে একজন স্টেট মন্ত্রী ছিলেন এবং সেটা তিনি ছিলেন আমারই সহকর্মী রূপে। আমার দফতর শিল্প–বাণিজ্যের তিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। দুই–একদিনেই তিনি যোগ্যতায় আমার এত আস্থা অর্জন করিয়াছিলেন যে আমি অনেকগুলি ডিভিশনই তাঁর হাতে হস্তান্তর করিয়া নিজের পরিশ্রম লাঘব করিয়াছিলাম।

তিনি একজন এক্সসার্ভিসম্যান। কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপটেন। তিনি অনেক সময় আমার কাজে লাগিতেন। প্রাইম মিনিস্টারের অনুপস্থিতিতে আমি যখন তাঁর এ্যাকটিনি করিতাম, তখন প্রধানমন্ত্রীর সব দফতরের সংগে প্রতিরক্ষা দফতরও আমার অধীনে আসিত। এ সময় আমি নূরুল রহমানের সাথে প্রায়ই পরামর্শ করিতাম। তার আগে আমি যখন জেনারেল আইউবের সাথে পূর্ব ও পশ্চিম–পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা লইয়া বাহাসে লিপ্ত হই, তখন আমার জেলার তৎকালীন এস. পি জনাব সাদেক আহমদ চৌধুরীই প্রতিরক্ষা ব্যাপারে আমার প্রাইমারি শিক্ষক ছিলেন বটে, তবে নূরুল রহমান সাহেবও কিছুটা সেকেণ্ডারি শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আইউব শাহি আমলে দুই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে নূরুল রহমান সাহেব আমাকে আরও নতুন –নতুন জ্ঞান দান করিয়াছিলেন।

১৯৭১ সালের জুলাই–আগস্ট মাসে নূরুল রহমান এক দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হইলেন। কাজটা হইল ঢাকায় আগত মুক্তি–যোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া ও রাতে শুইতে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ছদ্মনামে ষোলটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছিলেন। এসব খবর আমাকে দিয়াছিলেন তিনি পরে ও কিস্তিতে–কিস্তিতে। তাঁর এই গোপন কার্য–কলাপ আমার নযরে আসে প্রথমে আমার কনিষ্ঠ ছেলে মহফুয আনাম (তিতু)র মুক্তিযুদ্ধে যোগদান উপলক্ষ করিয়া। ততদিনে নূরুল রহমানের দুই পুত্রের উভয়েই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়া ফেলিয়াছে। তখনই আমি তাঁর কাছে জানিতে পারি, তিনি দুই–তিন মাস আগে হইতেই ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করিয়া আগরতলা সীমান্তে সোনাইমুড়ি ও ধর্মনগর পথে তাদেরে ত্রিপুরায় পার করিতেছেন। তথায় টেনিংপ্রাপ্ত গেরিলারা বোমাবাযি ও সাবোটাশ কার্য চালাইতে ঢাকায় আসিয়া তাঁরই আশ্রয়ে থাকিতেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরই

ব্যবস্থামত আমার ছেলেও আগরতলায় পাড়ি দিল। এ কাজে আমার ছেলেদের বন্ধু আমার পাতা ভাগিনা আবদুস সাত্তার মাহমুদ যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাতে আমি আমাদের তরুণদের প্রতি শ্রদ্ধায় নুইয়া পড়িয়াছি। এই আবদুস সাত্তার আমার কলিকাতা জীবনের প্রতিবেশী, আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক মওলানা সুলতান মাহমুদের পুত্র। সাত্তার কোহিনূর কেমিক্যালের একজন সাবেক চিফ-একযিকিউটিভ। পশ্চিমা মালিকের চাকুরি করিয়াও তিনি এ কাজের ঝুঁকি লইতেছেন দেখিয়া আমি শংকিত হইলাম। আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাঁর নিজের গাড়িতে নিজে ড্রাইভ করিয়া আমার ছেলেকে সোনাইমুড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন। পথে কত কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, সে এক দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর কাহিনী। এই ধরনের অনেক কাজই সাত্তার করিয়াছিলেন নিজের ও চাকুরির তোয়াক্কা না করিয়া। অবশ্য তাঁর পূর্ব-পাকিস্তানী-প্রীতির জন্য ইতিপূর্বেই তিনি মালিকের কুনযরে পড়ায় তাঁকে চাকুরি হইতে বরতরফ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাতেও তাঁর কর্মোদ্যম বিন্দুমাত্র কমে নাই। সান্ত্বনার কথা এই যে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার সাত্তারকে কোহিনূর কেমিক্যালের প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া তাঁর যোগ্যতার মর্যাদাদান ও দেশ-সেবার সাহসিকতাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। তিনি এখন পরম যোগ্যতার সাথেই দেশের এই বৃহত্তম শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালাইতেছেন।

এর পর নূরুর রহমান সাহেব ঘন-ঘন আমাকে তাঁর কার্য-কলাপের রিপোর্ট দিতে লাগিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোট, কম্বল, সোয়েটার ইত্যাদি গরম কাপড় সংগ্রহে আমার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যের সহযোগিতা নিতে লাগিলেন। তার মধ্যে একটি পন্থা এই ছিল যে, তিনি তাঁর গাড়ির 'বুটে' করিয়া বাণ্ডিল-বাণ্ডিল উল-সূতা আনিয়া আমার বাড়িতে রাখিয়া যাইতেন। আমার স্ত্রী সেসব উল পুত্র-বধু, বোন-ভাগিনী ও অন্যান্য বিশ্বস্ত আত্মীয় জনদের মধ্যে বিলি করিতেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁরা সোয়েটার বুনিয়া আমার বাড়িতে পৌঁছাইতেন। নূরুর রহমান সাহেব নির্ধারিত সময়ে আসিয়া সেগুলো নিয়া যাইতেন। এ সব কাজ অতি সাবধানেই করা হইত সত্য, কিন্তু পাক-বাহিনীর গোয়েন্দা-গিরিও কম যাইত না। তবে আমাদের তরুণরাও ইতিমধ্যে বেশ খবরদার হইয়া উঠিয়াছিল। তাদের জমা-করা সেই সব কাপড়-চোপড় এমনকি অস্ত্রপাতিও তারা এক-একদিন এক-এক জায়গায় লুকাইত। একবার আমার এক আত্মীয়া বিধবা মহিলা বিপদে পড়িতে-পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। এই মহিলার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তার বন্ধুরা গেরিলাদের পোশাক-পাতি ও অস্ত্রশস্ত্র এই মহিলার বাড়িতে এক গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পাক-বাহিনীর গোয়েন্দারা জানিতে পারিয়া এই বাড়ি থানা-তল্লাসি করে। কিন্তু ছেলেরা আগের দিন

এই তল্লাসির আঁচ পাইয়া জিনিসপত্র সরাইয়া ফেলিয়াছিল। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সরকারী গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি করার কৌশলও আমাদের ছেলেরা ইতিমধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এইসব ঘটনা যতই আমার কানে আসিতে লাগিল, আমি নূরুল রহমানের নিরাপত্তা সম্পর্কে ততই ভীত-সন্ত্রস্ত ও চিন্তান্বিত হইতে লাগিলাম। একদিন তাঁরে ফেলিয়াই বলিলাম : 'তুমি এত সব করিয়াও পাকবাহিনীর হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতেছ কেমন করিয়া ?' উত্তরে হাসিয়া বন্ধুবর যা বলিলেন, তার অর্থ 'হান্টিং উইথ দি হাউণ্ড এণ্ড রানিং উইথ দি হেয়ার'—অর্থাৎ তিনি আর্মি অফিসারদের সাথে দোস্তি বজায় রাখিয়াছেন। সাবেক ক্যাপটেন বলিয়া পাক-বাহিনীর কোনও-কোনও অফিসার তাঁকে জানিতেন। সেই সুবাদে তিনি আর্মি ক্লাবে যাতায়াত করিতেন এবং অফিসারদের সাথে বন্ধুত্ব করিতেন। তাঁদেরে খাওয়াইতেন। অর্থাৎ ভারত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুজিব নগরী সরকার যাকে দালালি আখ্যা দিলেন, নূরুল রহমান সাহেব সেই কাজটিই করিয়াছেন ঢাকায় বসিয়া এবং জান-মালের রিস্ক লইয়া। নূরুল রহমানের জন্য ছিল এটা ঘোরতর রিস্ক। কারণ তাঁর দুই পুত্রই যে মুক্তিযোদ্ধা এটা গোপন রাখা আর সম্ভব ছিল না। ততদিনে দুই পুত্রই মুক্তিযুদ্ধে আহত হইয়াছিল। একজন গুরুতর রূপে। এত গুরুতর যে তাকে যুদ্ধ চলাকালেই নিজের খরচে লণ্ডনেও স্বাধীনতার পরে সরকারী খরচে জি.ডি. আরে অনেকদিন চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল।

এই সময়কার আরেকটি ঘটনা দল-মত-নির্বিশেষে সকল পূর্ব-পাকিস্তানীর ঐক্যমত ও সংগ্রামের জন-যুদ্ধ প্রকৃতি প্রমাণিত করিয়াছিল। এই সময়ে পাকিস্তানী রেডিও-টেলিভিশন হইতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রচার করা হইতেছিল যে শেখ মুজিবের তথাকথিত বিচার হইয়া গিয়াছে এবং সে বিচারে মুজিবের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। এর কিছুদিন আগে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে সরকার মুজিবের সম্মতিক্রমে মিঃ এ.কে. ব্রোহীকে আসামী পক্ষের উকিল নিযুক্ত করিয়াছেন। এই ঘোষণা হইতে পূর্ব-পাকিস্তানীরা ধরিয়া নিয়াছিল যে উকিল হিসাবে মিঃ ব্রোহীর যোগ্যতা সত্ত্বেও শেখ মুজিব সুবিচার পাইবেন না। তার পর পরই মুজিবের ফাঁসির হুকুমের গুজব শুনিয়া সকল দলের সকল শ্রেণীর পূর্ব-পাকিস্তানীরা উদ্বেগ ও ব্যাকুলতায় অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠে। আমি নিজেও দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই মুদ্দতে যে দলের যে শ্রেণীর যাঁরাই আমার সাথে দেখা করিতেন, সবাই একবাক্যে আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতেন : শেখ মুজিবের প্রাণরক্ষার জন্য আমার সাধ্যমত সব চেষ্টা করা উচিৎ। আমি নিতান্ত অসহায়, নিরুপায়, শক্তিহীন, প্রভাব-প্রতিপত্তিবিহীন জানিয়াও তাঁরা আমাকে এই অনুরোধ

করিতেন। দল-মত-নির্বিশেষে সবাই এই এক কথা বলায় দুইটা কথা প্রমাণিত হইত। এক, শেখ মুজিবের বাঁচিয়া থাকার রাজনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে সারাদেশে ঐক্যমত আছে। দুই, পাকিস্তানের সামরিক সরকার মুজিব হত্যার মত নিষ্ঠুর ও অদূরদর্শী কুকর্ম করিতে পারেন। প্রথমটায় শেখ মুজিবের প্রতি জাতীয় আস্থা সূচিত হইত। দ্বিতীয়টায় পাকিস্তান সরকারের প্রতি পূর্ণ অনাস্থা প্রমাণিত হইত।

৫. আওয়ামী লীগে ভাংগনের অপচেষ্টা

শেখ মুজিবের জীবন সম্বন্ধে পূর্ব-পাকিস্তানীদের মধ্যে যখন এমনি একটা সামগ্রিক আশংকা বিদ্যমান, যে-সময়ে ওয়ার্ল্ড কমিশন-অব-জুরিস্টস্ ও ওয়ার্ল্ডপিস কাউন্সিলসহ দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়করা মুজিবের সামরিক বিচার ও তাঁর জীবনাশংকা লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং অনেকেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট তারবার্তা পাঠাইতেছিলেন, এমনি সময়ে আমাদের প্রিয় পরোলোকগত নেতা শহীদ সাহেবের একমাত্র আদরের কন্যা এবং আমাদের সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্রী মিসেস আখতার সোলেমান ঢাকায় আসেন। আমার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত কথা হয় নাই। কাজেই আমি জানিতাম না তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বা পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে কোন মিশন লইয়া আসিয়াছেন কিনা। তবু আমি খুশী হই। কারণ এই ঘটনায় আমি মুজিবের জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করি যে মুজিবের প্রাণনাশের ইচ্ছা পাকিস্তান সরকারের নাই। তবে তাঁর জীবন নাশের হুমকি দিয়া পলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেইল করিবার দুরভিসন্ধি তাঁদের খুবই আছে। অনেকদিন পরে আমার পরম স্নেহাস্পদ ও বিশ্বস্ত আওয়ামী নেতা যহিরুদ্দীন আমার সাথে দেখা করিলেন। আমার ধারণা ছিল, তিনি কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। কারণ আওয়ামী নেতাদের মধ্যে তাঁরই কলিকাতা যাওয়ার সুবিধা ছিল সবচেয়ে বেশি। যহিরুদ্দীনের বাপ-দাদারা কলিকাতার সংগতিপূর্ণ ভদ্র পরিবার। পাকিস্তান হওয়ার পরেও তাঁর পরিবারের অনেকেই কলিকাতায় থাকিয়া যান। আজও তাঁরা প্রতিপত্তি ও সম্মান লইয়া কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন। প্রথম চোটেই যহিরুদ্দীনের পক্ষে কলিকাতা যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু তিনি কলিকাতা যান নাই। বিভিন্ন জায়গায় তিনি চার-পাঁচ মাস আত্মগোপন করিয়াছিলেন। মিসেস সোলেমান ঢাকায় আসায় তাঁর আত্মগোপনের আবশ্যকতা আপাততঃ আর নাই। তাই তিনি গোপন স্থান হইতে বাহিরে আসিতে সাহস পাইয়াছেন।

আমি খুশী হইলাম। তাঁর সাথে একাধিকবার লম্বা আলোচনা করিলাম। মুজিবের জীবন লইয়া রাজনৈতিক দর কষাকষির পাকিস্তানী অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। দর কষাকষির ভাব দেখাইয়া পাকিস্তানকে হিউমারে রাখা মন্দ নয়। এ বিষয়ে যহিরুদ্দীনের সাথে আমি একমত হইলাম। এ বিষয়ে আমার অনুমোদনক্রমে দুই-একটি বিবৃতিও তিনি দিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী নেতাদের দাবি-মত শেখ মুজিবের বদলে নিজে আওয়ামী লীগের নেতা হইতে বা আওয়ামী লীগের নাম পরিবর্তন করিয়া নতুন নামের পার্টি করিতে তিনি রাযী হন নাই। এ বিষয়ে তৎকালে খবরের কাগযে যহিরুদ্দীনের রাজনীতি সম্পর্কে যে সব জল্পনা-কল্পনা বাহির হইয়াছিল, তার অধিকাংশই ছিল হয় ভিত্তিহীন, নয় ত বিকৃত ও অতিরঞ্জিত।

পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর ঐ সব বিকৃত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া আওয়ামী নেতারা যহিরুদ্দীনের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তা ছিল যহিরুদ্দীনের প্রতি ঘোরতর অবিচার। আওয়ামী লীগও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। আমি কোনও কোনও প্রভাবশালী আওয়ামী নেতার কাছে যহিরুদ্দীনের কথা তুলিয়াছিলাম। আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁর অতীতের নিঃস্বার্থ সেবার উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাতে এক সুরসিক আওয়ামী নেতা হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন ঃ 'বিনা-ফিসে আওয়ামী নেতাদের রাজনৈতিক মামলায় উকালতি করাই ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি যহিরুদ্দীনের বড় অবদান। আমরা আওয়ামী লীগাররাই এখন সরকার হওয়ায় তাঁর আর দরকার হইবে না। বরঞ্চ আওয়ামী লীগ-বিরোধীদের জন্যই যহিরুদ্দীনের সেবার বেশি দরকার হইবে।'

যহিরুদ্দীনের মত দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান আওয়ামী লীগে আর থাকিবেন না, একথাও বলিয়াছিলাম আরেকজন বড় নেতার কাছে। জবাবে তিনিও বলিয়াছিলেন ঃ 'আপনাদের আমলের মত পার্লামেন্ট আর থাকিবে কি না, তাই আগে দেখিয়া নেন।'

এ কথার তাৎপর্য বুঝিয়াছিলাম আরও অনেক পরে। সংবিধান রচনার পর ১৯৭৩ সালের মার্চের সাধারণ নির্বাচনের ফলে যে পার্লামেন্ট গঠিত হইল, তাতে 'লিডার-অব-দি হাউস' আছে, কিন্তু 'লিডার-অব-দি অপযিশন' নাই। মাত্র আটজন অপযিশন মেম্বরের নেতা বলিয়া জনাব আতাউর রহমান খাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান 'লিডার অব-দি-অপযিশন' মানিয়া লন নাই। ফলে সারা দুনিয়ায় একমাত্র বাংলাদেশেই লিডার-অব-দি অপযিশন-হীন পার্লামেন্ট বিরাজ করিতেছে।

৬. উপ–নির্বাচনের প্রহসন

যা হোক, আমাদের স্বাধীনতা–যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরে জন–যুদ্ধের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। জন–যুদ্ধ মুদ্দতের পাঁচ মাস সময়ের সরকারী দিশাহারা পাগলামির আরেকটা প্রমাণ তথাকথিত উপ–নির্বাচনের ব্যবস্থা। মিসেস আখতার সোলেমানের 'নরম আওয়ামী লীগ নেতাদের' মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরই সামরিক সরকার প্রথমে ৭৮ জন আওয়ামী এম. এন. এ. ও ১০৫ জন এম. পি. এ.-কে এবং পরে আরও ৮৮ জন এম. পি. এ.-কে ডিসকোয়ালিফাই করিয়া তাঁদের সীটে উপনির্বাচনের হুকুম জারি করেন। পাকিস্তান সরকারের এই আহাম্মকিতে বাংলাদেশের এই সময়কার জন–যুদ্ধের বুনিয়াদ গণ–ঐক্য আরও দৃঢ়তরভাবে প্রমাণিত হইল। এই তথাকথিত উপ–নির্বাচনের জন্য প্রার্থী পাওয়া দুষ্কর হইল। গত নির্বাচনে যামানত বাযেয়াফ্‌ত শ্রেণীর কয়েকজন ঝট্‌পট প্রার্থী হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু অত–অত ভ্যাকেন্ট সীটের জন্য যথেষ্ট প্রার্থী পাওয়া গেল না। এমনকি, জমাতে ইসলামী ও পিপল্‌স্‌-পার্টির মত আওয়ামী লীগ–বিরোধীরাও প্রার্থী দাঁড় করাইতে সাহস পাইলেন না। একমাত্র এয়ার মার্শাল আগসর খাঁর ইস্‌তেকলাল পার্টি পূর্ব–পাকিস্তানের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হইতে পারে না, এই যুক্তিতে এই উপ–নির্বাচন বয়কট করিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে সামরিক অফিসাররা মফস্বলে ঘুরিয়া–ঘুরিয়া প্রার্থী যোগাড়ে লাগিয়া গেলেন। অনেককে ভয় দেখাইয়া, লোভ দেখাইয়া, যবরদস্তি করিয়া প্রার্থী রাযী করিলেন। অনেকের যামানতের টাকাও এঁরাই যোগাড় করিয়া দিলেন।

ফলে ৫৫ জন প্রার্থী 'বিনা–নির্বাচনে নির্বাচিত' হইয়া গেলেন। আমার কিছু–কিছু সাংবাদিক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, এঁরা 'বিনা–প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন' না লিখিয়া 'বিনা–নির্বাচনে নির্বাচিত' লেখাই উচিৎ। উর্দুভাষী বন্ধুদের বলিলাম ঃ 'বেলা–ইন্‌তেখাব মুন্‌তেখাব'। বন্ধুরা আমার রসিকতাটা উপভোগ করিলেন। অনেক সাংবাদিকরাও 'বিনা–নির্বাচনে নির্বাচিত' লিখিলেন।

অবিশিষ্ট আসনসমূহের জন্য ডিসেম্বরের শেষের দিকে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হইল। কিন্তু অবস্থা–গতিকে সে সব উপ–নির্বাচন আর হইতে পারিল না। 'বিনা–নির্বাচনে নির্বাচিত'দের অনেকেই পিন্ডিতে পাড়ি জমাইলেন। কারণ এটা ঠিক হইয়া গিয়াছিল যে ন্যাশনাল এসেম্‌বলির পয়লা বৈঠক ঢাকার বদলে পিন্ডিতেই হইবে।

৭. পাক–ভারত যুদ্ধ

এইবার আসা যাক্, মুক্তি–যুদ্ধের তৃতীয় স্তরের দুই মাসের আলোচনায়। নবেম্বর–ডিসেম্বরের মুদ্দতটা আসলে বাংলাদেশের মুক্তি–যুদ্ধের চেয়ে পাক–ভারতের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ–মদ্দুতই ছিল বেশি। নবেম্বর মাসে প্রথম দিক হইতেই, বরং অক্টোবরের শেষ দিক হইতে, ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে পরস্পরের সীমা লংঘন ও আগ্রাসনের অভিযোগ প্রত্যভিযোগ শুরু করেন। নোয়াখালি জিলার বিলোনিয়া, ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর, ময়মনসিংহ জিলার কামালপুর ইত্যাদি স্থানের নাম উভয় সরকারের রেডিওতে ঘন–ঘন শুনা যাইতে লাগিল। শুধু স্থল সৈন্যের দ্বারা নয়, বিমান বাহিনীর দ্বারাও পরস্পরের স্থল ও আকাশ–সীমা লংঘনের কথা বলা হইতে লাগিল। শুধু তাই নয়। উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষের কথাও প্রকাশিত হইতে লাগিল। এক পক্ষ আর এক পক্ষকে হারাইয়া দিয়াছে বলিয়া দাবি করা হইলেও স্পষ্ট ভাষায় এমন আশ্বাসও দেওয়া হইতে লাগিল যে 'অপর পক্ষের আক্রমণকারী সৈন্যদেরে মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাড়াইতে–তাড়াইতে তাদের পিছু ধাওয়া করার বেলা 'অপর পক্ষের ভূমিতে প্রবেশ করা হয় নাই। বরঞ্চ পলায়মান অপর পক্ষের সৈন্যদেরে ধাওয়া করিতে করিতে আন্তর্জাতিক সীমায় গিয়াই আমাদের পক্ষের সৈন্যরা একদম থামিয়া গিয়াছিল। একেবারে দ্রুতগামী মোটর গাড়ির ব্রেক কষার মত আর কি! প্রতিদিন সকালে–বিকালে রেডিওতে এই ধরনের সংবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। তার মানেই পাক–ভারত সরকারদ্বয়ের মধ্যে লড়াই নাই বা লাগুক, উভয় সরকারের সৈন্যদের মধ্যে লড়াই তখন বাধিয়া গিয়াছে। ভারতের পক্ষ হইতে বলা হইল পাক–বাহিনীর লোকেরা বোমা পাতিবার উদ্দেশ্যে ভারতের ভূমিতে ঢুকিয়া পড়িতেছে। আর পাকিস্তানের পক্ষ হইতে বলা হইতে লাগিল ভারতের স্থলবাহিনী ও গোলন্দায বাহিনী পাকিস্তানের ভূমিতে ঢুকিয়া পড়িতেছে। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে ভারতীয় অভিযোগের কোন জবাব দেওয়া হয় নাই। কারণ বোধ হয় জবাব দিবার মত তাদের কিছু ছিল না। কিন্তু ভারতীয় পক্ষ হইতে বলা হইল ভারতীয় সৈন্য শুধু বাংলাদেশের 'লিবারেটেড এরিয়া'তেই ঢুকিয়াছে। বস্তুতঃ এটাকেই বলে অঘোষিত যুদ্ধ। এ সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই অঘোষিত যুদ্ধই চলিতেছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় সব রাষ্ট্র–নায়ক ও সংবাদপত্রই এটাকে পাক–ভারত সংঘর্ষই বলিতেছিলেন। পূর্ব–পাকিস্তানের এই সময়কার দাবিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিই বলা হইক, আর পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামই বলা হউক, এর পিছনে ভারতের উস্কানি আছে, ফলে সংঘর্ষটা আসলে পাক–ভারত সংঘর্ষ, বিশ্ববাসীকে ওটা দেখাইয়া পূর্ব–পাকিস্তানের

সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক রূপ দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানীদের দাবিকে মেঘাবৃত করিবার চেষ্টা পাকিস্তানের আগাগোড়াই ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের যে কোনও ছোট-বড় গণ-আন্দোলনকে ভারতের উস্কানি বলিয়া চিহ্নিত করার প্রয়াস পাকিস্তানী শাসকদের সনাতন নীতি। কিন্তু আগের-আগের বার পাকিস্তানের নেতারা হাজার প্রভোকেশন দিয়াও ভারতীয় নেতাদেরে চেতাইতে পারেন নাই। ভাষা আন্দোলনের সময় নূরুল আমিন সাহেব যা পারেন নাই, আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়া আইউব সাহেব যা পারেন নাই, এবার ইয়াহিয়া সাহেব তা পারিলেন। ভারতীয় নেতৃত্ব এবার সত্য-সত্যই চেতিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের জনতার উপর ২৫শে মার্চের বর্বর হামলার জন্য সভ্য মানুষ ও সরকারের মত অনুতপ্ত না হইয়া ইয়াহিয়া সরকার রাজনৈতিক ও সামরিক সব কাজের সমর্থনে ১৯৭১ সালের ৫ই আগস্ট 'হোয়াট হ্যাপেন্‌ড' এই শিরোনামায় একটি বিশালাকারের হোয়াইট পেপার বাহির করিলেন। এতে আওয়ামী লীগ এবং দেশরক্ষা ও পুলিশ বাহিনীর উপর, এমনকি সরকারী কর্মচারীদের উপর, ঢালাও মিথ্যা অপবাদ ত দিলেনই, ভারত সরকার ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপরও সত্য-মিথ্যা অভিযোগ করিলেন। এক কথায়, পূর্ব-পাকিস্তানের গোটা ব্যাপারটাকেই ভারতের উস্কানি, উৎসাহ, সহায়তা ও সক্রিয় সাহায্যের দ্বারা পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বলা হইল। এই সংগে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার দৃঢ় সংকল্পের কথা যে ভাবে যে ভাষায় বলা হইল, তাকে ভারতের বিরুদ্ধে হুমকি বলিলে অসংগত হইবে না।

কিন্তু পাকিস্তান সরকারের পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যাপারে এইবারই ভারত সরকার ও ভারতের নেতৃবৃন্দ বরাবরের নিরপেক্ষ নীতি পরিহার করিয়া একটু বেশি মাত্রায়, এমনকি আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন ও নীতি-প্রথা লংঘন করিয়া, 'পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে' সোজাসুজি মত প্রকাশ ও হস্তক্ষেপ করিতে শুরু করেন।

৮. ভারতের উদ্দেশ্য

বলা যাইতে পারে এবং বলা হইয়াছেও যে পূর্ব-পাকিস্তানে পাক সামরিক বাহিনীর বর্বরতায় পার্শ্ববর্তী ভারতীয় এলাকায় প্রায় এক কোটি লোক শরণার্থী হওয়ায় ভারতের অভ্যন্তরে যে আর্থিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইন-শৃংখলার সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাতে এ ব্যাপারে কথা বলিবার ও পন্থা গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ভারত সরকারের ও ভারতবাসীর উপর বর্তাইয়াছিল। এর জবাবে বলা যাইতে পারে এবং বলা হইয়াছেও যে ওসব সমস্যা সৃষ্টি হইবার অনেক আগে হইতেই ভারত সরকার ও ভারতবাসীর হস্তক্ষেপ শুরু হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২৭শে মার্চের ভারতীয়

লোকসভার প্রস্তাবের কথা বলা যায়। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রে পূর্ব–পাকিস্তানে পাক–বাহিনীর হামলা শুরু হয়। ২৭শে মার্চ, মানে একদিনে ভারতের ভূমিতে কোনও শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয় নাই। ভারতীয় লোকসভার প্রস্তাবেও কাজেই ঐ ধরনের কোনও ভারতীয় সমস্যার কথা বলা হয় নাই। প্রস্তাবে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তার সবই ভাল–ভাল কথা। কাজেই কারও প্রতিবাদের বা আপত্তির কিছু নাই। পূর্ব–বাংলায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করার এবং তার বদলে নগ্ন শক্তি প্রয়োগের নিন্দা করাও দোষের নয়। সাড়ে সাত কোটি পূর্ব–বাংগালীর সংগ্রামে সহানুভূতি ও সহায়তার আশ্বাসকেও দোষের বলা যাইতে পারে না। তবে এটাও সত্য কথা যে শরণার্থী–সমস্যা সৃষ্টি হইবার আগে হইতেই ভারত সরকার ও ভারত্বাসী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে, সুতরাং পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন। ভারতের এ কাজকে আমি অন্যায়ও বলিতেছি না, এর নিন্দাও করিতেছি না। ইতিমধ্যে আমার লেখা একাধিক বই–পুস্তকে ও প্রবন্ধে ভারতের এ কাজের বরং সমর্থনই করিয়াছি এবং এর চেয়ে গুরুতর কিছু করিলেও দোষের হইত না, বলিয়াছি। কিন্তু এখানে আমার প্রতিপাদ্য এই যে, শরণার্থী সমস্যায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইবার আগেই ভারতীয় নেতৃত্ব পূর্ব–পাকিস্তানের ব্যাপারে কিছু কিছু ভাল–মন্দ কার্য–কলাপ শুরু করিয়াছিলেন। ভারতীয় নেতৃত্বের জন্য এটা নূতন। তাঁদের সাবেক সনাতন নিরপেক্ষ নীতির এটা খেলাফ। এই কারণেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ৫ই আগস্টের হোয়াইট পেপারে ভারত সরকার ও ভারতীয় নেতৃত্বকে পূর্ব–পাকিস্তানের পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা সম্ভব হইয়াছিল।

যা হোক, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই সত্য–মিথ্যা–মিশ্রিত হোয়াইট পেপার ভারতের খুব কাজে লাগিয়াছিল। ৫ই আগস্ট পাকিস্তান সরকারের হোয়াইট পেপার বাহির হয়। আর তার তিন দিনের মধ্যে ৮ই আগস্ট রুশ–ভারত চুক্তি সম্পাদিত হয়। যদিও চুক্তিটির নাম দেওয়া হইয়াছিল শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি। আসলে এটা ছিল কিন্তু একটা দস্তরমত সামরিক চুক্তি। চুক্তির মুদ্দা কথা ছিল : যদি কেউ ভারত বা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তবে তারা পরস্পরকে সাহায্য করিবে। একে অপরের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিবে না। শান্তি–মৈত্রী সম্বন্ধে অনেক ভাল–ভাল কথার মধ্যে এই সামরিক সহযোগিতার কথাটাই ঝলমল করিয়া সকলের চোখে পড়িল। জোটনিরপেক্ষতা ও সামরিক চুক্তি–বিরোধিতা নেহরুর বহু বিঘোষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ও কড়াকড়িভাবে প্রতিপালিত পররাষ্ট্র নীতি। তাঁরই মেয়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পিতার এই দীর্ঘদিনের নীতি পরিত্যাগ করিয়া সামরিক জোটবদ্ধ

হইলেন, এতে দেশের ভিতরে-বাহিরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শত্রুদের ত কথাই নাই, বহু বন্ধু ও সমর্থকও ইন্দিরা দেবীর সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু অল্পদিনেই সমালোচকদের কণ্ঠ নীরব হইল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দূরদর্শিতার তাঁরা মুখে না হইলেও মনে মনে তারিফ করিতে বাধ্য হইলেন। পাকিস্তানের জংগী সরকার যে পূর্ব-পাকিস্তানের নিতান্ত ন্যায়-সংগত গণতান্ত্রিক সংগ্রামটাকে পাক-ভারতের আন্তর্জাতিক সংঘাত রূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তার প্রধান উদ্দেশ্যেই ছিল এই সংঘাতে চীন-মার্কিন ইত্যাদি কতিপয় বন্ধুরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের পক্ষে জড়াইয়া ফেলিবার অপচেষ্টা। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যথাসময়ে এই রুশ-ভারত চুক্তির লাঠি উচা না করিলে পাকিস্তানের চেষ্টা যে সফল হইত না, তা কেউ জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না। পাক-ভারত যুদ্ধের শেষ অবস্থায় পাকবাহিনীর পরাজয়ের সম্ভাবনার মুখে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ভারত মহাসাগরে প্রবেশ ও পশ্চাদপসারণের পিছনে সোভিয়েত ভীতি মোটেই কাজ করে নাই, এ কথাও বলা চলে না। কারণ মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করার খবরের সাথে সাথে এমন খবরও দেশ-বিদেশের বেতারে প্রচারিত হইয়াছিল যে সোভিয়েত নৌবহরও মার্কিন নৌবহরের অনুসরণ করিতেছে।

৯. পাকিস্তানের আক্রমণ

ভারতের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা অভিযোগ করিয়া কার্যতঃ ও পরিণামে পাকিস্তানের সামরিক শাসন-কর্তারা ভারতের সুবিধা করিয়াই দিতেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের অসন্তোষ ও বিদ্রোহ যে পরিণামে ভারতের স্বার্থেরই অনুকূল, এটা ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণ বরাবর বুঝিতেন। যে-কোন কান্ডজ্ঞানীরই তা বুঝিবার কথা। পাকিস্তানী শাসকদের তা বুঝা উচিৎ ছিল। কিন্তু তাঁরা তা বুঝেন নাই বলিয়াই মনে হয়। এ অবস্থা ভারতের অনুকূল হওয়ায় ভারত সরকার ও ভারতবাসী যে পূর্ব-পাকিস্তানের অসন্তোষে ও বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাইবেন, এটাও স্বাভাবিক। সবাই এমন করেন। পাকিস্তানীরাও সুযোগ পাইলে তাই করিতেন। এটা পাকিস্তানী শাসকরাও নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে তার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ নির্বুদ্ধিতার দরুন ভারতের উদ্দেশ্য পূরণের সহায়তাই করিয়াছেন। ফলে ২৭শে হইতে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় লোকসভার বিতর্কে ও প্রস্তাবটায় যে টুকুন ভুল ছিল, পাকিস্তানের শাসকরা ভারতের সে ভুল অসামান্য দ্রুতগতিতে সংশোধন করিয়াছিলেন। গতির সে দ্রুততায় পাকিস্তান ভারতকে অনেক পিছনে ফেলিয়া দিয়াছিল। ভারতের সে দ্রুততা ছিল বস্তুতঃ অতিআগ্রহ ও অতিব্যস্ততার ফল। ২৫শে

মার্চের শেষ রাত্রে পাক-বাহিনীর হামলার মাত্র একদিন পরেই ভারতীয় লোকসভার বিতর্ক শুরু হওয়ার ব্যাপারটা, বিশেষতঃ তার ভাষা ও মর্ম সবই ছিল অতিরিক্ত ব্যস্ততার অশোভন প্রকাশ। ওটাকে নিরপেক্ষ বিদেশী রাষ্ট্র, সরকার ও নেতারা অতি সহজেই অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলিতে পারিতেন এবং বলিয়াও ছিলেন। মার্চ মাসে ওটা না করিয়া এপ্রিল মে-জুনে করিলে ভারতকে কেউ দোষ দিতে পারিতেন না। পাক-বাহিনী যখন মিলিটারি এ্যাক্শন শুরু করিয়াছে, তখন পূর্ব-পাকিস্তানিদের এক বিরাট অংশ ভারত-ভূমিতে আশ্রয় লইবেই, ওটা বরাবরের জানা কথা। দুদিন অপেক্ষা করিয়া শরণার্থীদের ভিড়ের যুক্তিতে ৩০শে মার্চের প্রস্তাবের চেয়েও কঠোর প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও ভারতকে কেউ কিছু বলিতে পারিতেন না। ২রা এপ্রিল তারিখে অর্থাৎ মিলিটারি এ্যাক্শনের সাতদিনের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগর্নী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নামে যে সুন্দর পত্রখানা লিখিয়াছিলেন, ভারতের প্রেসিডেন্ট ঐরূপ একখানা পত্র লিখিবার পর যদি লোকসভা বিতর্কে বসিত, তবে ব্যাপারটা কতই না সুন্দর হইত। সুন্দর হয় নাই বলিয়াই ওটা অশোভন হইয়াছে। অতি-উৎসাহ, অতি-আগ্রহ ও অতি-ব্যস্ততার সময় অমন এক আধটু অশোভন কাজ হইয়াই থাকে।

কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা ভারতের এই ভুল সংশোধন করিয়া দিলেন ৫ই আগষ্ট হোয়াইট পেপার বাহির করিয়া এবং ৩রা ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করিয়া পাকিস্তানী শাসকদের মাথায় এটা ঢুকেই নাই যে ভারত এটাই চাইতেছিল। কিন্তু বাইরে এই আগ্রহ চাপিয়া রাখিতেছিল। মার্চ মাসে অতি উৎসাহ দেখাইয়া ভারতীয় নেতৃত্ব যে ভুল করিয়াছিলেন, পরবর্তী আট মাস অসাধারণ ধৈর্য্য ধরিয়া সে চপলতার ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলেন।

৩রা ডিসেম্বর (১৯৭১) বিকাল সাড়ে পাঁচটায় (ভারতীয় সময়) পাকিস্তানী বিমান বাহিনী অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রা ইত্যাদি ভারতীয় বিমান ঘাটিতে হাওয়াই হামলা চালায়। পাকিস্তান এটা করে কোন যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই। বিনা-নোটিসে ও বিনা কারণে। জবাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী রাত সাড়ে এগারটায় শিয়ালকোট, সারগোদা, মিয়ানওয়ালী, করাচি, রিসালপুর ও লাহোর বিমানঘাটি আক্রমণ করে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ফর্মাল যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের রেডিও হইতে এবং বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা হইতে যথাসময়ে মোটামুটি একই ধরনের খবর শুনিলাম। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল পাকিস্তানই আগে হামলা করিয়াছে। ভারত জবাবী হামলা করিয়াছে।

তখনই আমার মনে হইয়াছিল পাকিস্তান ভুল করিয়াছে। ভারতের পাতা ফাঁদে পা দিয়াছে। বেশ কিছুদিন ধরিয়া পাকিস্তানের ভুলের আশায় ভারত অপেক্ষা করিতেছিল। ৩রা ডিসেম্বরের সন্ধ্যাকালে পাকিস্তান ভারতের সে আশা পূর্ণ করিল। পাকিস্তানকে দিয়া এই ভুল করাইবার জন্য ভারতকেও কিছু বুদ্ধি-কৌশল ও ফন্দি-ফিকির করিতে হইয়াছিল। সে কৌশলটা ছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর ৪ঠা ডিসেম্বরের নির্ধারিত কলিকাতার গড়ের মাঠের জন-সভাকে অত্যন্ত অকস্মাৎ ৩রা ডিসেম্বরে আগাইয়া আনা। মিসেস ইন্দিরার কলিকাতার জন-সভার সাথে পশ্চিম সীমান্তে আগ্রাসনের একটা আচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের দরুনই ইন্দিরা গান্ধী ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা জন-সভা করায় পাকিস্তানও ৩রা তারিখে ভারত আক্রমণ করিল। তার ফলে ঐ রাতেই মিসেস গান্ধী তাঁর বেতার ভাষণে বলিতে পারিলেন ঃ 'বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতেরই যুদ্ধ'। অতঃপর এই ঘোষণা-মতই কাজ হইল। পক্ষান্তরে যদি মিসেস গান্ধী ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা জন-সভা না করিয়া পূর্ব-নির্ধারিত ৪ঠা তারিখে করিতেন, তবে পাক-বাহিনী ৪ঠা ডিসেম্বর বিকালে পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করিত। বাংলাদেশের যুদ্ধকে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণা করিতে একদিন দেরি হইয়া যাইত। এই একদিন বিলম্বে কি অসুবিধা হইত, তা আরও কেউ-কেউ হয়ত জানিতেন। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানিতেন। সেই কারণেই তিনি উক্ত সভার উদ্যোক্তা, পশ্চিম-বাংলা সরকার ও কংগ্রেস নেতাদের প্রতিবাদ ও জনগণের অসন্তোষ অগ্রাহ্য করিয়া নির্ধারিত দিনের মাত্র একাদশ ঘন্টায় সভার দিন-ক্ষণ আগাইয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীমতি ইন্দিরার বক্তৃতায় সমবেত জনতা নিরাশ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। চমকপ্রদ কথা ত তিনি কিছুই বলিলেন না। তবে কেন তিনি এই সভা ডাকিয়াছিলেন? কেনইবা তিনি সেই সভার দিন আগাইয়া আনিলেন? শুধুই কি এটা প্রধানমন্ত্রীর খাম-খেয়াল? পন্ডশ্রম? না। মিসেস গান্ধী জানিতেন, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এমন সফল সভা তিনি জীবনে আর করেন নাই। কলিকাতা বসিয়াই তিনি খবর পাইলেন, পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছে। তিনি মুখে গাম্ভীর্য ও দুশ্চিন্তা ফুটাইয়া এবং মনে-মনে হাসিয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। নিয়মমাফিক ইমার্জেন্সি ও যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

এতে একটা জটিল ব্যাপার খুবই সহজ হইয়া গেল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত কাজে-কর্মে চার-পাঁচ মাস আগে হইতেই প্রত্যক্ষভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। তেমনভাবে জড়াইয়া পড়িবার ন্যায়নৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অনেক সংগত কারণ ছিল। সে সব কারণের কথা আমি আমার একাধিক বই-এ লিখিয়াছি। এই বইয়েও পরে বলিব। এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে ওসব

কারণ সত্ত্বেও ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মাটিতে তার সৈন্যবাহিনী নামাইতে পারিতেছিল না। আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন তার প্রতিবন্ধক ছিল। অক্টোবর-নবেম্বর পর্যন্ত প্রায় আশি-নব্বই লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক যখন ভারতে শরণার্থী হইয়াছে, তার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সেটাকে সিভিল এগ্রেশন (দেওয়ানী আগ্রাসন) বলিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের সৈন্য নামাইতে পারেন নাই। ফর্মালি মানে দস্তর-মাফিক পারেন নাই। ইনফর্মালি, বে-দস্তুরভাবে, পারিয়াছেন এবং যথেষ্ট করিয়াছেন। মুক্তি ফৌজ গঠনে, প্রশিক্ষণে ও পরিচালনে প্রচুর অর্থ ও লোক নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁদের সহায়তায় ও আবরণে পূর্ব-পাকিস্তানের ভূমি দখলও করিয়াছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক কানুনহেতু এ সবই করিতে হইয়াছে মুক্তিবাহিনীর নামে। তাতে এ কাজে প্রচুর অর্থ ও দীর্ঘ সময় নষ্ট হয়। দস্তুর মাফিক, সুতরাং প্রকাশ্যভাবে, ভারত যদি পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করিতে পারে, তবে এক সপ্তাহেই দখল সমাপ্ত করিতে পারে। ১৯৫৫ সালে জেনারেল আইউবের এস্টিমেট ছিল ছয় দিন। ১৯৭১ সালের ভারতীয় বাহিনী ন দিনে এ কাজ সমাপ্ত করিয়াছিল। জেনারেল আইউবের আন্দাযে খুব ভুল ছিল না।

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার ভারতের পাতা ফাঁদে পা দিয়া এই কাজটিই সহজ করিয়া দিলেন। পাকিস্তান আক্রমণ করা ভারতের উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই ৩রা ডিসেম্বর শেষ রাত্রে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পশ্চিম-পাকিস্তানে হামলা করিল বটে, দ্রুতবেগে অনেক জমি দখলও করিল বটে, কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ মুক্ত করা। এই উদ্দেশ্যেই ভারত সরকার কালবিলম্ব না করিয়া স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন। বাংলাদেশের জনগণ পক্ষে থাকায় ভারতীয় বাহিনী অতি সহজেই এটা সম্পন্ন করিল। দুর্ধর্ষ পাক-বাহিনীর এক লক্ষ সৈন্য কিছুই কাজে আসিল না। ভারতীয় বাহিনী ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতে থাকিল। আর সে ঝড়ের মুখে পাক-বাহিনী স্রোতের মুখে তৃণখন্ডের মত ভাসিয়া গেল। কথাটা নিতান্ত ভাষার অলংকার নয়। সত্য-সত্যই ভারতীয় বাহিনীর ৩রা ডিসেম্বরের হামলার দুই-তিন দিনের মধ্যেই, মানে ৬ই/৭ই ডিসেম্বর তারিখেই ঢাকার বিমানঘাটি নীরব হইয়া গেল। দুই একবারের বেশি আকাশ যুদ্ধ হইল না। বিমান-ধ্বংসী কামানের আওয়ায একদিনেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ভারতীয় বোমারু বিমান ঝাঁকে-ঝাঁকে একরূপ বিনা-বাঁধায় তেজগাঁও বিমান বন্দরে, কুর্মিটোলা বিমান-ঘাঁটিতে ও ছাউনিতে বেদেরেগ হামলা চালাইতে লাগিল। খোদ ঢাকা নগরীর উপর দিয়া, বলিতে গেলে আমাদের কানের কাছ দিয়া, ভারতীয় জংগী বিমান ভন ভন করিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু শহরের অসামরিক অঞ্চলে বোমা ফেলিল না।

৬ই/৭ই ডিসেম্বরেই চৌগাছাসহ যশোর ছাউনি ও পূর্ব দিকে কুমিল্লা ছাউনির পতন ঘটিল। ৮ই ডিসেম্বর হইতে ভারতীয় প্রধান সেনাপতি জেনারেল মানিকশাহ্ পাক–বাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহবান জানাইলেন। পাক–বাহিনীর জিতিবার আর কোনও আশা নাই, আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নাই, আত্মসমর্পণ করিলে জেনেভা কন্‌ভেন্‌শন অনুসারে তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হইবে, ইত্যাদি ভাল–ভাল আশ্বাসবাণী দিয়া এই আত্মসমর্পণের আহ্বান সারা দিন আকাশবাণী হইতে পুনরুচ্চারিত হইতে লাগিল। ইংরেজী, উর্দু, বাংলা, পুশ্‌তু ভাষায় মুদ্রিত এই আহ্বানের লাখ লাখ কপি হাওয়াই জাহাজ হইতে ছড়ান হইতে লাগিল। পাক–বাহিনীও লড়াই ছাড়িয়া আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, মনে হইল। কিন্তু আত্মসমর্পণ করিল না।

অবশেষে ১৪ই ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান গবর্নর হাউস আক্রমণ করিল। গবর্নর ডাঃ এ. এম. মালিক ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া হোটেল ইন্টারকনে নিউট্রাল–যোনে আশ্রয় নিলেন।

ঢাকার জনতা তখন রাস্তায় নামিয়া উল্লাস করিতেছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে ভারতীয় বিমানের হামলার সময়েও জনতা রাস্তায় রাস্তায়, খোলা ময়দানে ও বাড়ির ছাদে ভিড় করিয়া তামাশা দেখিতেছিল। যেন বিমান মহড়া বা ঈদের চাঁদ দেখিতেছে। জনগণের উল্লাস–ধ্বনির মধ্যে ভারতীয় বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় প্রবেশ করিল। পাক–বাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। ভারতীয় প্রধান সেনাপতি জেনারেল মানিকশার আশ্বাসমাফিক পাক–বাহিনীর সকলকে ভারতে নিয়া যাওয়া হইল ক্রুদ্ধ জনতার রোষ হইতে তাঁদেরে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হইল। পাক–বাহিনীর দখলমুক্ত হইয়া বাংলাদেশের জনতা আনন্দ–উল্লাসের মধ্য দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

স্বস্তি আসিল। কিন্তু শান্তি আসিল না। কারণ আমাদের প্রবাসী সরকার আরও ৮/১০ দিন কলিকাতা হইতে ঢাকায় আসিলেন না। তাঁদের অনুপস্থিতিতেই জনতা উল্লাস করিতে লাগিল। ভারতীয় সৈন্য ও সেনাপাতিদের সাথে জনতা কোলাকুলি করিতে লাগিল। বহুদিন পরে দোকান–পাট খুলিল। সে সব দোকনপাট হইতে ভারতীয় সৈন্যদেরে কৃতজ্ঞতার উপহার দেওয়া হইল। সর্বত্র উল্লাস। এত উল্লাসের মধ্যে দোকানী ও জনতা একটা মজার অভিজ্ঞতা লাভ করিল। যালেম পাঞ্জাবী সৈন্যের মতই এই বন্ধু ভারতীয় সৈন্যেরাও উর্দু ভাষায় কথা কয়, কি আশ্চার্য। ওরা তবে একই অঞ্চলের একই ভাষার লোক? কিন্তু ব্যবহারে কত পার্থক্য।

ঢাকায় তখন আরও সপ্তাহখানেক কোনও সক্রিয় সরকার বা তাঁদের শান্তি–রক্ষক বা আইন–কানুন প্রয়োগকারী শাখা–প্রশাখা ছিল না। মনে হয়, তার দরকারও ছিল না। জনতা ও নাগরিকদের সবাই যেন ঐ কয় দিনের জন্য ফেরেশ্‌তা হইয়া গিয়াছিল। চোর–ডাকাত, পকেটমার–দাংগাকারীরা সবাই যেন নিজেদের উপর চুয়াল্লিশ ধারা জারি করিয়াছিল।

ক্ষণিকের জন্য মনে হইল কার্ল মার্কস এ অবস্থাকেই বোধ হয় স্টেটলেস–সোসাইটি বলিয়াছেন।

হঠাৎ মনে পড়িল ঃ ওভার অল কমান্ডে ত ভারতীয় বাহিনী আছে।

উপাধ্যায় ছয়

মুজিবহীন বাংলাদেশ

১. অতিদ্রুত স্বাধীনতা

এটা স্বীকার করিতেই হইবে, ভারতের সহায়তায় আমরা বড় তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পাইয়া ফেলিয়াছিলাম। বস্তুতঃ নয় মাস সংগ্রামে স্বাধীনতা আর কোনও জাতি পায় নাই। ভারত সক্রিয় সহায়তা না করিলে আমরাও পাইতাম না। পাকিস্তান সরকার ভুল করিলে ভারত সরকার তেমন সাহায্য করিবেনই, এটাও একরূপ জানা কথাই ছিল। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা এবারই প্রথম এমন ভুল করিয়াছিলেন। ফলে আমাদের স্বাধীনতা যে কল্পনাতীত অল্প সময়ে আসিতেছে, এটা ৩রা ডিসেম্বর তারিখে আমার মত অল্প-বুদ্ধি লোকের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বাধীনতার পদধ্বনিতে লোকের আনন্দিত হইবার কথা। কিন্তু আমি উল্টা ঘাবড়াইতে ছিলাম। মুজিব-বিহীন আওয়ামী নেতৃত্ব কি ভাবে দেশ চালাইবেন, তা আমি ভাবিয়া পাইতাম না। তাই স্বাধীনতা যতই আগাইয়া আসিতেছিল, আমার ভাবনা ততই বাড়িতেছিল। মুজিবের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য আমি ততই সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছিলাম। ততদিনে ইয়াহিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে মুজিব বাঁচিয়া আছেন ও ভাল আছেন।

কিন্তু আমার মোনাজাত কবুল হইল না। যদিও আমার মোনাজাত ছিল স্বাধীনতা ও মুজিব একসংগে আসুক, কিন্তু মুজিবকে পিছে ফেলিয়া স্বাধীনতা আগেই আসিয়া পড়িল। মুজিবের অনুপস্থিতিতে যে সব অশুভ ঘটনা ঘটিতে পারে বলিয়া আমার আন্দায ছিল, আসলে তার চেয়ে অনেক বেশী অশুভ ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এ সব ঘটিতে লাগিল চিন্তায় ও কাজে উভয়তঃই। এটা শুরু হইল প্রবাসী সরকার দেশে ফিরিবার আগে হইতেই।

প্রথম ঘটনাটা ঘটিল স্বাধীনতার প্রায় শুরুতেই-১৮ই ডিসেম্বরে। ঐ দিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের জন্য দিল্লির রামলীলা ময়দানে এক বিরাট জন-সভা হইল। সে সভায় ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগজীবনরাম বক্তৃতায় বলিলেনঃ 'এতদিন পাকিস্তানের গর্বের বিষয় ছিল, সে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। গত

পরশু হইতে সে গৌরব বর্তাইয়াছে বাংলাদেশের উপর। বাংলাদেশই এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র।' আকাশবাণীর খবর অনুসারে মিঃ রামের এই উক্তি সেই বিরাট জনসভায় বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সদ্য-দীক্ষিত একজন অফিসার মিঃ রামের ঐ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেনঃ 'মিঃ রামের স্মরণ রাখা উচিৎ ছিল বাংলাদেশ একটি সেকিউলার রাষ্ট্র, মুসলিম রাষ্ট্র নয়।' আমি বুঝিলাম এটা যদি বাংলাদেশ সরকারের সরকারী অভিমত হয়, তবে বিপদের কথা। বাংলাদেশের পরিচালন-ভার এমন সব 'অতি-প্রগতিবাদী' লোকের হাতে পড়িতেছে যাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রের পার্থক্য বুঝেন না বা বুঝিতে চাহেন না।

২. অতি প্রগতিবাদী নেতৃত্ব

প্রবাসী সরকার ঢাকায় ফিরার সংগে সংগে প্রমাণিত হইল যে এটা সরকারী অভিমত। দেশে ফিরিয়াই তাঁরা যা দেখাইলেন, তাতে রেডিও-টেলিভিশনে কোরান-তেলাওয়াত, 'খোদা হাফেয,' 'সালামালেকুম' বন্ধ হইয়া গেল। তার বদলে 'সুপ্রভাত', 'শুভ সন্ধ্যা', 'শুভরাত্রি' ইত্যাদি সম্বোধন প্রথা চালু হইল।

মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। গুজব রটিতে লাগিল, আযান নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে। কেউ বলিলেনঃ অমুক জায়গায় জন-সভায় বক্তৃতা চলিবার সময় নিকটস্থ মসজিদ হইতে আযান দিতে গিয়া মুয়ায্যিন সাহেব বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা-সম্ভব নেতৃস্থানীয় লোকজনকে ব্যাপারটা জানাইলাম। তাঁরা আযানের ব্যাপারটা ভিত্তিহীন জানাইলেন। কিন্তু রেডিও টেলিভিশনের ব্যাপারটায় তর্ক জুড়িলেন। আমাদের আশংকা দৃঢ় হইল। দুশ্চিন্তা বাড়িল।

এই সংগে যোগ দিল পাকিস্তান ও চীনের উদ্যোগে উত্থাপিত জাতিসংঘে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অবস্থান সম্বন্ধে প্রতিবাদ ও তদুত্তরে ভারত সরকারের তরফের উক্তিসমূহের বিভ্রান্তিকর পরিণাম। ভারত সরকারের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বলিলেনঃ 'প্রয়োজনের এক দিন বেশীও ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে থাকিবে না।' এই প্রয়োজনের মেয়াদটার আভাস পাওয়া গেল দিল্লি হইতে ভারত সরকারের মুখপাত্রের কথায়। তাঁরা বলিলেনঃ 'শরণার্থীদের নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে পুনর্বাসন করিতে যেটুকু সময় লাগিবে, ততদিনই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বাংলাদেশে মোতায়েন থাকা দরকার হইবে।'

এই সময়ে ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মানিকশাহ বাংলাদেশে আসিলেন। তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নযরুল ইসলামের মেহ্‌মান হইলেন। দুইজন একত্রে টেলিভিশন ক্যামেরাও ও সংবাদপত্র রিপোর্টারদের সামনে দাঁড়াইলেন। আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিলেনঃ 'ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে আছে আমার অনুরোধে, আমাদের সহায়তার জন্য।' জাতি-সংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি আমাদের রাষ্ট্রপতির ঘোষণার পুনরুক্তি করিলেন।

৩. অহেতুক ভুল বুঝাবুঝি

এই সব কারণে বাংলাদেশের জনগণের মনে ভারত সরকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই ধরনের সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ দিলেন বাংলাদেশ সরকার ও নেতৃবৃন্দ নিজেরাই। স্বাধীনতা লাভের পরেও দশ-দশটা দিন তাঁরা ভারতে অবস্থান করিলেন। পাকিস্তান ও তার বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের জন্য এটা ছিল মস্তবড় সুযোগ ও অকাট্য প্রমাণ। তাঁরা বলিতে লাগিলেনঃ 'ভারত যে পূর্ব-পাকিস্তান দখল করিয়াছে, তা এবার প্রমাণিত হইয়া গেল। নইলে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় যান না কেন? আসলে ভারত সরকারই যাইতে দিতেছেন না।'

এ সব সন্দেহ ও অভিযোগ খন্ডনের কোনও প্রমাণ আমার হাতে নাই। পাকিস্তানী-বাহিনীর আত্মসমর্পণের সংগে-সংগেই যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য নেতা ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাদের সাথে দেখা করিয়াছিলেন, তাঁরা মন্ত্রী-স্তরের লোক ছিলেন না। তবু তাঁরা সবই প্রভাবশালী নেতা। খবরাখবরও তাঁরা রাখিতেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তাঁদের সহিত বিস্তারিত খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা হইয়া ছিল যে, ভারত সরকারের ইচ্ছায় নয়, বাংলাদেশ সরকারের নিজেদের ইচ্ছা-মতই তাঁদের ঢাকায় আসায় বিলম্ব ঘটিতেছে।

বাংলাদেশ সরকারের এমন ইচ্ছাটাও আমার বিবেচনায় অহেতুক বা অযৌক্তিক ছিল না। সহজ কথায়, এ বিলম্বের সংগত কারণ ছিল। ঘটনার দুই বছর পরে এখন অবশ্য তৎকালীন মন্ত্রীরা বা তাঁদের সহকর্মীরা এ ব্যাপারে প্রকৃত ব্যাপার নাও প্রকাশ করিতে পারেন। কথাটা যুক্তি সংগত বা উচিৎ বিবেচিত নাও হইতে পারে। আবার বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উক্তিও করিতে পারেন। এক রকমের কথা বলার একমাত্র উপায় এ বিষয়ে সরকারী বিবরণ দেওয়া; সে কাজটা আজও হয় নাই। হইবে কি না, হইলে কবে হইবে; তারও কোন নিশ্চয়তা নাই। শোনা যায়, সরকারের প্রচার দফতর হইতে

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার চিন্তা ভাবনা হইতেছে। তাতে অবশ্যই বেশ সময় লাগিবে। কয়েক বছর লাগিয়া যাইতে পারে। ততদিনে অবস্থার পরিবর্তনও হইতে পারে। সে পরিবর্তিত পরিবেশে আমাদের সরকারের মনোভাবেরও পরিবর্তন হওয়াটা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া, অনেকদিন পরে ভারতের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা-বোধটাও কিছুটা পুরাতন হইয়া যাইবে। তেমন অবস্থায় আমাদের সরকারের ঢাকা ফিরার বিলম্বটার কারণ সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী দুই রকমে বলা হইতে পারে। ভারতের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব বর্তমানের মত গাঢ় থাকিলে এক ধরনের কৈফিয়ত দেওয়া হইবে। আর সে বন্ধুত্বে কিছুটা ফাটল ধরিলে অন্যরূপ কৈফিয়ত দেওয়া হইবে। ধরুন, বন্ধুত্বটা ঘাঢ় থাকিবে। সে অবস্থায় সরকারী বিবরণে বলা হইতে পারে ঃ ভারত সরকারের মেহমানদারির পীড়া-পীড়িতেই আমাদের বাড়ি ফিরিতে দেরি হইয়াছে। এটা বিশ্বাসযোগ্য কথাও। হিন্দু ও মুসলমান আমরা উভয় সম্প্রদায়ই অতিশয় অতিথি-পরায়ণ। গিরস্থরা মেহমানকে সহজে ছাড়িতে চান না। আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বাপ-দাদার আমল হইতে প্রবাদ বাক্য চালু আছে ঃ গিরস্থরা মেহমানদের বলিয়া থাকেনঃ 'আসিয়াছেন আপনার ইচ্ছায়, যাইবেন আমার ইচ্ছায়। এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ভারতের হিন্দু গৃহস্বামী যদি বাংলাদেশের মুসলমান মেহমানদেরে বলিয়া থাকেন ঃ 'আসিয়াছেন আপনাদের ইচ্ছায়, যাইবেন আমাদের ইচ্ছায়', তবে ঐ একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মুসলমান মেহমানরা স্বভাবতঃই তা মানিয়া চলিতে বাধ্য ছিলেন।

আর যদি কোনও কারণে বর্তমানের বন্ধুত্বের চির ধরে, তবে সে চিরের কারণে অথবা সেই বিদ্যাসাগরী 'উপকারীর মাথায় লাঠির' সনাতন নীতি অনুসারে আমাদের সরকার বলিতে পারেনঃ 'ভারত সরকার আমাদের পায়ে বেড়ি দিয়া আটকাইয়া রাখিয়া ছিলেন।' উদ্দেশ্য? আমাদের সম্পদ বিশেষতঃ পাক-বাহিনীর পরিত্যক্ত যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিজেরা একা কুক্ষিগত করিবার লোভে।

স্পষ্টতঃই এ দুইটার একটাও নির্ভেজাল সত্য হইবে না। ঘটনা পুরান হইবার আগেই তা লিপিবদ্ধ করাই সত্য রক্ষার একমাত্র উপায়। নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে এটা করা আমার উচিৎও। আমার পক্ষে সম্ভবও। কিন্তু অসুবিধা এই যে, আমার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। যা কিছু সবই শোনা কথা। আর সে সব শোনা কথার উপর নির্ভরশীল অনুমান। অগত্যা তাই লিখিতেছি।

৪. বিলম্বের হেতু

সদ্য-প্রত্যাগত বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলোচনা করিয়া যা বুঝিয়াছিলাম, তাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের সাথে সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার প্রধানতঃ দুইটি কারণে ঢাকা ফিরাটা বিলম্বিত করিতে চাহিতেছিলেন। এক, তখনও তাঁরা ঢাকায় আসা নিরাপদ মনে করিতেছিলেন না। দুই, কিছুদিন দেরি করিলে শেখ মুজিবকে নিয়াই তাঁরা ঢাকায় ফিরিতে পারিবেন। প্রথম কারণটি বর্ণনায় কিছু বেশী কথা বলিতে হইবে। তাই সেটা পরে বলিতেছি। দ্বিতীয় কারণটিই আগে আলোচনা করিতেছি।

মুজিবের নিরাপত্তা, তাঁর মুক্তির আশা ও সম্ভাবনার কথা যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থাতেও দেশ-বিদেশের বেতারে ও খবরের কাগজে এবং শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘেও উঠিতেছিল। বাংলাদেশে পাকিস্তান-বাহিনীর আত্মসমর্পণের পরদিনই পশ্চিম সীমান্তে ভারত একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করায় এবং পাকিস্তান সরকার খপ্ করিয়া তা গ্রহণ করায় মুজিবের মুক্তির সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল। তারপর ১৯শে ডিসেম্বর ইয়াহিয়ার বদলে ভুট্টোর প্রেসিডেন্ট হওয়ার খবরটা অন্যান্য দেশসহ ভারতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এটাকে অনেকে মুজিবের মুক্তির পূর্ব লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। কারণ ভুট্টো প্রেসিডেন্ট হইয়াই শেখ মুজিবকে জেলখানা হইতে প্রেসিডেন্ট হাউসের নিকটবর্তী এক বাড়িতে গৃহবন্দী রূপে আনাইয়াছেন, এমন খবরও বিভিন্ন বেতারে প্রচারিত হইয়াছিল। পরদিন হইতেই ভুট্টো বলিতে শুরু করিলেন, যদি দেশবাসী চায়, তবে তিনি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিবেন। সংগে সংগে তিনি জন-মত যাচাইয়ের জন্য জনসভায় ভোট নিতে লাগিলেন। প্রত্যেক সভায় বিপুল জনতা রায় দিলঃ শেখ মুজিবের মুক্তি চাই। এর সাথে যোগ হইল লাহোর করাচি ইসলামাবাদ ও পেশোয়ারের সমস্ত দৈনিক পত্রে মুজিবের মুক্তির দাবিতে সম্পাদকীয় লেখা হইতে লাগিল।

এ সব খবরই মুজিব নগরী বাংলাদেশের সরকারের কানে যাইতেছিল। মুজিবের আশু মুক্তির আশা করা, সুতরাং তাঁদের পক্ষে অবাস্তব আশা ছিল না। স্বাধীনতা লাভের আনন্দের দিনে একাএকা দেশে ফিরার থনে নেতাকে সাথে লইয়া ফিরার আশায় দু'চার দিন দেরি করা নিশ্চয়ই দোষের নয়।

এবার প্রথম কারণটার আলোচনা করা যাউক। এ কারণ ঢাকায় প্রবাসী সরকারের নিরাপত্তা-বোধের অনিশ্চয়তা। একটা অঘোষিত স্বাধীনতার সংগ্রাম যখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়, এবং নেতাদের অনুপস্থিতিতে যখন সে সংগ্রাম জন-যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়, তখন সংগ্রামের নেতৃত্বের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা খুব সহজ নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইলে সে নেতৃত্ব সংগ্রাম চলিত থাকা অবস্থায় দানা বাঁধে এবং সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়া স্থির বিন্দুতে অবস্থান করে। আলজিরিয়া ও ভিয়েতনামে এটা ঘটিয়াছিল কালক্রমে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এটা ঘটিতে পারে নাই। প্রথমতঃ নেতা শত্রুর হাতে বন্দী থাকায় এবং দ্বিতীয় মুক্তি-যোদ্ধাদের মধ্যে পূর্ব-সংগঠিত ঐক্য না থাকায় প্রাথমিক অস্পষ্টতা কাটিতে সময় লাগিতেছিল। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক কারণে ভারতের বিপুল শক্তিশালী দেশরক্ষা বাহিনী আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের সাহায্য করায় কল্পনাতীত দ্রুততার সংগে আমাদের স্বাধীনতা হাসিল হইয়া যায়। এ অবস্থায় ভারতীয় বাহিনীকে বাদ দিলে তৎকালে রাষ্ট্রক্ষমতা যাদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাঁরা ছিলেন বেংগল রেজিমেন্টের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের ই. পি. আর.ও পুলিশ বাহিনী। রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের ঐতিহ্য পাক-বাহিনীর ও পাক ব্যুরোক্র্যাসির মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ সব কথা মুক্তি-সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতাদের ভুলিয়া যাওয়ার কথা নয়। ভারতীয় নেতারা এ বিষয়ে আরও বেশী সচেতন ছিলেন।

৫. মুজিব বাহিনী

কথাটা যখন উঠিলই, তখন কিছুকাল আগের কথাটাও বলিয়া রাখা ভাল। বাংলাদেশ সরকারের দেশে ফিরার বিলম্ব উপলক্ষ করিয়া যখন বিদেশে এবং জাতিসংঘ সার্কেলে নানা কুকথা উঠিতেছিল এবং সে সব কথা ভিত্তি করিয়া ঢাকা নগরীতে সন্দেহ-অবিশ্বাস দানা বাঁধিতেছিল, তখনও আমি সে সব সন্দেহে অবিশ্বাসে বিচলিত হই নাই। ভারত সরকারের সদিচ্ছায় তখনও আমার আস্থা অটল ছিল। তার ভিত্তি ছিল আমার একটা পূর্ব অভিজ্ঞতা। মাত্র ছয় মাস আগে এক ব্যাপারে আমি নিজেই ভারত -সরকারের মতলব সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলাম। অল্প দিন পরেই আমার সে সন্দেহ দূর হইয়াছিল। আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম, যে কাজটাকে আমাদের অনিষ্টকর ভাবিয়াছিলাম, সেটা ছিল আসলে আমাদের হিতকর। ব্যাপারটা এইঃ

জুলাই–আগস্টের দিকে আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হইতে পর পর কয়েকটা সংবাদে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলাম। সংবাদ কয়টি ছিল এইরূপঃ মুক্তিফৌজের বদলে মুক্তিবাহিনী করা হইয়াছে। কয়েকদিন পরে শুনলাম, আলাদা করিয়া মুজিব–বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। এ সব পদক্ষেপকে আমি অশুভ ইংগিত মনে করিলাম। ধরিয়া নিলাম, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করা হইতেছে। যদি ভারত সরকারের উদ্যোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাঁদের মতলব ভাল হইতে পারে না।

মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা করিতেন। প্রথম দিকে আমি তাঁদেরে সন্দেহ করিতাম। বন্ধুবর নূরুল রহমানের মধ্যস্ততায় আমার সন্দেহ দূর হয়। তখন তাঁদের সাথে আলাপ করিতাম। সশস্ত্র সংগ্রাম বা গেরিলা যুদ্ধের আমি কিছুই জানিতাম না। কাজেই আমাদের আলোচনা মোটামুটি থিওরিটিক্যাল ও প্রপাগান্ডা বিষয়–বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত।

এঁদেরই দুই–একজনের সংগে মুজিব–বাহিনী গঠনের কথাটা পাড়িলাম। তাঁদের মধ্যে একজন নিজেই মুজিব–বাহিনীর লোক বলিয়া দাবি করায় আমার আলোচনার সুবিধা হইল। তাঁদের রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং, অধ্যয়ন ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় তিনি আমাকে জানাইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই অপর যে একজন তাঁর বর্ণনা সমর্থন করিলেন তিনি ছিলেন একজন এম. এস. সি. এবং এক কলেজের লেকচারার। উভয়ের কথায় মিল হওয়ায় আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। তাঁদের কথা হইতে আমি এই বুঝিলাম যে, নির্বাচিত প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি পদ্ধতি বাঁচাইয়া রাখিবার মহৎ উদ্দেশ্যেই ভারতীয় নেতৃত্ব মুজিব–বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতা আসিলে দেশের রাষ্ট্র–ক্ষমতা সশস্ত্র বাহিনীর হাতে যাইতে বাধ্য, ভারতীয় নেতারা তা বুঝিতেন। সশস্ত্র লড়াই করিয়া এত–এত প্রাণ বিসর্জন দিয়া স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্র–ক্ষমতা 'আর্মড–চেয়ার' পলিটিশিয়ানদের হাতে তুলিয়া দিবেন, পাকিস্তানী আইউবী ঐতিহ্যবাহী বেংগল রেজিমেন্ট বাহিনীর কাছে এমন আশা করা একরূপ দুরাশা। তার উপর আট–দশ হাজার ট্রেনিং–প্রাপ্ত সৈন্যের সংগে আরও আশি–নব্বই হাজার মুক্তি ফৌজ যোগ দিয়াছেন। এঁদের অধিকাংশই ছাত্র। ছাত্রদের মেজরিটি আবার ছাত্র ইউনিয়নের লোক। ছাত্রলীগাররা সেখানে মাইনরিটি। রাজনীতিতে শুধু ছাত্রলীগাররাই

আওয়ামী লীগের সমর্থক। ছাত্র ইউনিয়নীরা প্রায় সবাই ন্যাপ। ন্যাপ মানেই কমিউনিস্ট। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের দেশে বরাবর নিষিদ্ধ ছিল। ছাত্র ইউনিয়নীদের বিপুল মেজরিটি বিপ্লবে বিশ্বাস করেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রকে তাঁরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র বলেন। কাজেই এই বামপন্থী ছাত্রদের দ্বারা-গঠিত মুক্তি-বাহিনী স্বাধীনতা লাভের পর সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা দখলই সমর্থন করিবেন। আওয়ামী লীগকে করিবেন না। এটা ভারতীয় নেতৃত্বের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। গোটা পাকিস্তানে সামরিক শাসন পাক-ভারত শান্তি ও মৈত্রীর পক্ষে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও সামরিক শাসন কায়েম হউক, এ সম্ভাবনাকে ঠেকাইয়া রাখা ভারত সরকার নিজেদের কর্তব্য বিবেচনা করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ সেকিউলার গণতন্ত্রী দল, এ বিশ্বাস কংগ্রেস নেতৃত্বের বরাবরই ছিল। তাই স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ মুজিব-নেতৃত্বের আওয়ামী লীগের দ্বারা পরিচালিত হউক, এটাই ছিল ভারতীয় নেতৃত্বের কাম্য। তাই তাঁরা সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষিতে সাবধানতা হিসাবেই রাজনৈতিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত ডেমোক্র্যাটিক পলিটিক্স ওরিয়েন্টেড মুজিব বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন এবং স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ওঁদের কথা আমার পসন্দ হইয়াছিল। তাই তাঁদের রিপোর্টে আমি বিশ্বাসও করিয়াছিলাম। তাঁরা এটাও বলিয়াছিলেন যে পলিটিক্যাল মোটিভেশন হিসাবে 'মুজিববাদ' কথাটারও জন্ম হইয়াছিল ওখান হইতেই।

মুজিব বাহিনীতে ত বটেই সাধারণ কমিশনড্ র‍্যাংকে রিক্রুটমেন্টের বেলাতেও ছাত্রলীগারদেরেই প্রাধান্য দেওয়া হইত। রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের উপর এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া ছিল। উল্লেখিত তরুণ বন্ধুরা অতিশয় সংকোচের সাথে আমাকে এ সংবাদটাও দেন যে এই কারণে আমার ছোট ছেলে মহফুয আনাম (তিতু)র কমিশন পাওয়ায় অসুবিধা হইতেছে। মহফুয আনাম ছিল ছাত্র ইউনিয়নের লোক। সে ছাত্রলীগের ছিল না। এটা গোপন করারও উপায় ছিল না। কারণ ছাত্র-সমাজে সে ছিল মশহুর। সে নিখিল পাকিস্তান ইউনির্ভাসিটি ডিবেটে পর-পর তিন বছর চ্যাম্পিয়নরূপে ছিল সুপরিচিত। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে ছিল দাগী ইউনিয়নিস্ট। এই কারণেই সে শক্তিশালী বাঁধার সম্মুখীন হইতেছে।

বন্ধুদের কাছে খবরটা পাইয়া দুঃখিত হওয়ার বদলে খুশীই হইয়াছিলাম। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উভয় কারণেই। এখানেই আগেকার কথা একটু প্রাসংগিক হইয়া পড়ে।

মহফুয আনাম সম্পর্কে মাতাপিতার স্বাভাবিক দুর্বলতা ছাড়াও আমাদের একটা অভিজ্ঞতাভিত্তিক ধারণা ছিল, সে একেবারেই কোমলপ্রাণ দার্শনিক। বাড়িতে সে গরু-ছাগল ত দূরের কথা, একটা মুর্গি যবেহও সহ্য করিতে পারিত না। চাকর-বাকর, কুলি-রিক্শাওয়ালাকেও 'আপনি' বলিত। একবার এক ছোকরা চাকর তার হাতঘড়ি চুরি করে। তাকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়া তার কঠোরতম ভাষায় তাকে বলিয়াছিলঃ 'আপনি আমার ঘড়ি চুরি করিলেন কেন?'

এমন সদাশিব যখন মুক্তিফৌজে যোগ দিবার সংকল্পের কথা আমাদেরে জানাইল, তখন তার মা একমাত্র এই শর্তে রাযী হইলেনঃ 'তুমি অস্ত্রের যুদ্ধে যাইবা না। শুধু লেখায় ও বক্তৃতায় প্রচার করিবা।' আমিও তাঁর সমর্থন করিলাম। আমাদের শর্তে রাযী হইয়া সে ভারতে চলিয়া গেল। আমার অনুরোধে নূরুর রহমান সাহেব মুক্তি-বাহিনীর কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ মর্মে একটি পত্রও পাঠাইলেন।

যথাসময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হইতে মহফুয আনামের ইংরেজী বক্তৃতা শুনিলাম। আমরা নিশ্চিত হইলাম। প্রথম প্রথম সে ছদ্মনামে বক্তৃতা করিত। কিন্তু আমরা তার গলা চিনিতাম। তারপরে প্রায় মাস খানেক কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লি, আলীগড়, এলাহাবাদ ইত্যাদি ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুক্তি-যুক্ততা ও ন্যায়-নৈতিকতার উপর বক্তৃতা করিয়া খুব নাম করে। বিভিন্ন রাজ্যের সংবাদ পত্রে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়। তার কিছু-কিছু আমাদের হাতে ও আসে।

এই অবস্থায় পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে যখন আমরা খবর পাইলাম যে তিতু কমিশন পাইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভাবনায় পড়িলাম। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সে বাধা পাইতেছে শুনিয়া খুশীও হইলাম। পরে অবশ্য তিতু কমিশন পাইয়াছিল। কিন্তু এর কোনও কথাই আমার স্ত্রীকে জানাইলাম না। আমার খুশী হওয়ার ব্যক্তিগত কারণ ছিল এটা। কিন্তু বিজয়ী সশস্ত্র বাহিনীর হাতে গণতন্ত্র বিপন্ন না হয়ে, সে বিষয়ে ভারত সরকার ছিদ্রহীন সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন, আমার আদর্শগত আনন্দের কারণও এটাই।

এই অভিজ্ঞতার দরুনই আমি দেশে-বিদেশে ভারতীয় মতলব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হই নাই। তবু সত্য কথা এই যে শেখমুজিবের অবর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দ যে মেরুদন্ডহীনতার ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তারই কুফলে ভারত বাংলাদেশ-মৈত্রীর গাথুনিতে ফাটল ধারাইবার মত কিছু শিকড়ের বীজ ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল। এর কুফলের হাত হইতে ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীকে বাঁচাইবার জন্য পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিতে হইয়াছে।

উপাধ্যায় সাত

নৌকার হাইলে মুজিব

১. শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন

আমাদের স্বাধীনতা হাসিলের ঠিক পঁচিশ দিন পরে আমাদের নেতা শেখ মুজিব ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরেন। বিপুল জনতা তাঁকে প্রাণ-ঢালা অভ্যর্থনা দেয়। গোটা দেশ আনন্দ-উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।

যদিও বিগত এক সপ্তাহ ধরিয়াই আমরা শেখ মুজিবের মুক্তির খবর শুনিবার আশায় প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলাম,কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই মুক্তির খবরটা একেবারে দুশ্চিন্তামুক্ত ছিল না। মুজিবের মুক্তির খবরটা কতকটা রহস্যাবৃত হইয়া উঠিল। আমরা খবর পাইলাম, প্রত্যাশিত মুক্তি-দিবসের আগের দিন ভারত সরকার মুজিবকে আনিবার জন্য রেডক্রসের একটি বিমান ভাড়া করিয়া পিন্ডি এয়ারপোর্টে হাযির রাখিয়াছেন। অথচ শেখ মুজিব ৮ই জানুয়ারি সে বিমানে না চড়িয়া পি. আই. এ.-এর একটি বিশেষ বিমানে চড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তিনি কোথায় গিয়াছেন কেউ জানেন না। রেডিও পাকিস্তানের খবরানুসারে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোও মুজিবের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তিনি নিজে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকিয়া পি. আই. এ. বিমানে মুজিবকে তুলিয়া দিয়াছেন। অথচ শেখ মুজিবকে কোথায় নেওয়া হইতেছে, তা তিনি বলেন নাই। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি রসিকতা করিয়া বলিয়াছেনঃ 'পিঞ্জরার পাখী উড়িয়া গিয়াছে।' সাংবাদিকদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে মিঃ ভুট্টো বলিলেনঃ 'শেখ মুজিবের অনুরোধেই তাঁর গন্তব্যস্থান গোপন রাখা হইতেছে। গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া তিনি নিজেই সে কথা বলিবেন।' মিঃ ভুট্টোর এ ঘোষণায় ঢাকায় আমরা কোনও তসল্লি পাইলাম না। ভুট্টোর বিরুদ্ধে আমাদের আক্রোশ তখনও একেবারে তাজা। আমাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য ইয়াহিয়ার চেয়ে ভুট্টোর অপরাধ এক রত্তি কম নয়, এ কথা আমরা তখনও ভুলি নাই। অতএব সেই ভুট্টো আমাদের নেতার জীবন লইয়া আবার কোন খেলা শুরু করিয়াছেন, তা ভাবিয়া আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলাম। মাত্র এক রাত্রি আমাদের দুশ্চিন্তায় কাটিল। ৯ই জানুয়ারি আমরা বিভিন্ন রেডিও মারফত জানিলাম শেখ মুজিব পি. আই. এ. বিমানে চড়িয়া লন্ডনে পৌছিয়াছেন। এ সংবাদে আমরা মুজিবের মুক্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলাম বটে, কিন্তু আরেকটা চিন্তা আমাদেরে ভাবনায় ফেলিল। ভারতের ভাড়া-করা রেডক্রস বিমানে না চড়িয়া এবং সোজা ঢাকায় না আসিয়া পি. আই. এ. বিমানে চড়িয়া লন্ডন গেলেন কেন? ভারতের সংগে মন-কষাকষি ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটা

মিঃ ভুট্টোর একটা চাল বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইল। শেষ পর্যন্ত আমাদের সে সন্দেহও দূর হইল। শেখ মুজিব বৃটিশ রয়েল এয়ারফোর্সের বিমানে চড়িয়া দিল্লি হইয়া ১০ই জানুয়ারি ঢাকা পৌছিলেন। দিল্লিতে ভারত সরকার তাঁর বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। আমাদের আশংকা তখনকার মত দূর হয়। পরে জানিয়াছিলাম, আমাদের আশংকা নিতান্ত ভিত্তিহীন ছিল না। ঐ ধরনের কিছুটা চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের, বিশেষতঃ তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আযাদের চেষ্টায় সবই ভালয়-ভালয় সমাধা হইয়া যায়।

২. মুজিবের উপস্থিতির আশু ফল

যা হোক, শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের ফল ফলিতে লাগিল। প্রায় পাঁচ লাখ লোকের বিশাল জনতা সুহরাওয়ার্দী ময়দানে নেতার মুখের কথা শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। শেখ মুজিব এয়ারপোর্ট হইতে সোজা সুহরাওয়ার্দী ময়দানে গিয়া জনসভায় বক্তৃতা করেন। বরাবরের ওজস্বী বাগ্মী শেখ মুজিব। সে হিসাবে ঐদিনকার বক্তৃতা তেমন ভাল হয় নাই। সে কথা তিনি নিজেই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন রাষ্ট্রের পথনির্দেশক হিসাবে শেখ মুজিবের সেদিনকার বক্তৃতা অতিশয় মূল্যবান ও ঐতিহাসিক ছিল। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে, তাঁর স্থলবর্তী হইবার যোগ্য প্রবীণ নেতৃত্বের অবর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা তাৎপর্য আওয়ামী তরুণ নেতাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না। 'ছয় দফা' মেনিফেস্টোর ভিত্তিতে নির্বাচন বিজয়ী আওয়ামী নেতৃত্বের এই বিভ্রান্তিকর কারণ পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে একটা বিভ্রান্তি সত্যই সৃষ্টি হইয়াছিল। সে বিভ্রান্তি পাকিস্তানের পরিণাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জাতীয় স্বকীয়তা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত ছিল। ফলে তাদের মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি ইয়াছিল যে, নিজেদের 'মুসলমান' ও নিজেদের রাষ্ট্রকে 'মুসলিম রাষ্ট্র' বলিলে সাধারণভাবে হিন্দুরা বিশেষভাবে ভারত সরকার অসন্তুষ্ট হইবেন। এ ধারণা যে সত্য ছিল না, তা বুঝিতে যে রাজনৈতিক চেতনা ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, তরুণ আওয়ামী নেতা মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেরই তা ছিল না। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম বাংলাদেশকে 'মুসলিম রাষ্ট্র' আখ্যা দিয়া যে সদিচ্ছা প্রণোদিত প্রশংসা করিয়াছিলেন, অতিউৎসাহী 'ধর্মনিরপেক্ষ' একজন অফিসার সে প্রশংসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এই হীনমন্যতা হইতেই। আমাদের রেডিও-টেলিভিশন হইতে কোরআন তেলাওয়াত আস্সালামু আলায়কুম ও খোদা হাফেয বিতাড়িত হইয়াছিল এবং ও-সবের স্থান দখল করিয়াছিল 'সুপ্রভাত' 'শুভসন্ধ্যা' ও 'শুভরাত্রি' এই কারণেই। বাংলাদেশের জনসাধারণ আমাদের স্বাধীনতার এই রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল এমন পরিবেশেই।

শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন এক মুহূর্তে এই কুয়াশা দূর করিয়া দিয়াছিল। ১০ই জানুয়ারির ঐ একটি মাত্র বক্তৃতার তুফানে বাংলাদেশের আসমান হইতে ঐ বিভ্রান্তিকর কালমেঘ মিলাইয়া গিয়াছিল। শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আশু প্রয়োজনীয় ঘোষণা করিয়াছিলেন : (১) আমি মুসলমান; আমার বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র; (২) আমাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি মিঃ ভুট্টোর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতার দরুন আমি দুই অঞ্চল মিলিয়া এক পাকিস্তান রাখিবার তাঁর অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রই থাকিবে; (৩) তাঁদের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের জনগণের উপর যে অকথ্য যুলুম করিয়াছে, দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা নাই। তবু বাংগালী জাতি তাদেরে ক্ষমা করিয়া প্রমাণ করিবে, বাংগালী জাতি কত উদার। আমি মিঃ ভুট্টোর সাফল্য কামনা করি। তিনি আমাদের সাফল্য কামনা করুন। তাঁরা সুখে থাকুন, আমাদেরও সুখে থাকিতে দিন।

শেখ মুজিবের এই তিনটি ঘোষণাই জনগণের অন্তরের কথা ছিল। বিপুল হর্ষধ্বনি করিয়া সেই বিশাল জনতা শেখ মুজিবের উক্তি সমর্থন করিয়াছিল। উপ-নেতা ও কর্মচারীরা না জানিলেও নেতা জানিতেনও জনগণ বুঝিতেন, বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র নয় বটে কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র।

চিন্তার বিভ্রান্তি এইভাবে দূর হইবার অল্পদিনের মধ্যে কাজের বিভ্রান্তির অবসান করিলেন মুজিব নেতৃত্ব। রেডিও-টেলিভিশনে আবার কোরআন তেলাওয়াত, আস্সালামু আলায়কুম, খোদা হাফেয বহাল হইল। 'ধর্ম ও জীবন' সম্পর্কে কোরআন-হাদিস-ভিত্তিক সাপ্তাহিক আলোচনা আবার শুরু হইল। সরকারী ফাংশনেও মিলাদ-মহ্ফিল হইতে লাগিল। জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

শেখ মুজিবের দক্ষ সুনিপুণ ডিপ্লোমেটিক কৌশলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যেকার ভুল বুঝাবুঝির একটা মুনাসিব সুরাহা হইয়া গেল। এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন সমাপ্ত হইবার বহু আগেই দুই মাসের মধ্যে ১২ ই মার্চ তারিখে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের মাটি হইতে সরিয়া গেল। ভারত-বাংলাদেশ-মৈত্রীর বিরুদ্ধে প্রচারণার একটা আন্তর্জাতিক ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

৩. পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা প্রবর্তন

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নযরুল ইসলাম আওয়ামী লীগেরও ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহ্মদ আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এইভাবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ধারা মানিয়া চলাতে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে

তাঁর অনুপস্থিতিতেই বাংলাদেশ সরকারেরও প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার ক্যাবিনেট প্রথার না প্রেসিডেন্ট শিয়াল প্রথার সরকার ছিলেন, তা বুঝিবার উপায়ও ছিল না; দরকারও ছিল না। সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকিলেই তা যেমন ক্যাবিনেট সরকার হয় না: আবার প্রেসিডেন্ট কোনও সরকারী আদেশ-নির্দেশ দিলেই তা প্রেসিডেন্শিয়াল হইয়া যায় না।বিশেষতঃ যুদ্ধ চলাকালে, যখন পার্লামেন্টে বসিবার সুযোগ-সুবিধা নাই, তখন সরকারের সাংবিধানিক চরিত্র লইয়া চিন্তা করিবার দরকার বা সুযোগ ছিল না।

স্বাধীনতার দিন দশেক পরে সরকার ঢাকায় আসিয়া কোনও কাজ শুরু করিবার আগেই পনর দিনের মধ্যে শেখ মুজিব ঢাকায় আসেন বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসাবেই। এই সময়েই বাংলাদেশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক চরিত্র নির্ধারণের সুযোগ আসে। শেখ মুজিব কালবিলম্ব না করিয়া দিন-পাঁচেকের মধ্যেই ১৪ই জানুয়ারী তারিখে নিজে প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে আইনমাফিক প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করেন। গোটা দেশবাসী আনন্দে উল্লসিত হয়। পার্লামেন্টারি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যও, উভয় পদাধিকারীর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও যোগ্যতার বিচারেও। নয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য দুই ব্যক্তির চেয়ে যোগ্যতর পদাধিকারী কল্পনা করা যাইত না। শেখ মুজিবের অভিপ্রায় অনুসারেই এটা ঘটিয়াছে, জনগণের মধ্যেও সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। আওয়ামী লীগ বরাবর পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সমর্থক, তার ছয় দফা মেনিফেস্টো অনুসারে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার গঠন করিতে শেখ মুজিব বাধ্য ছিলেন, এ সব যুক্তি দিয়া শেখ মুজিবের ঐ পদক্ষেপকে ছোট করার উপায় ছিল না। কারণ শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে একদল তরুণের মধ্যে এই অভিমত খুবই সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাংলাদেশের এই সরকার বিপ্লবী সরকার। পাকিস্তানী আমলের নির্বাচনও সে নির্বাচনের মেনিফেস্টো বর্তমান সরকারের জন্য প্রাসংগিকও নয়, বাধ্যকরও নয়। এ ধরনের কথা যাঁরা বলিতেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই তথাকথিত বামপন্থী। ৭০ সালের নির্বাচনে তাঁরা একটি আসনও দখল করিতে না পারায় একরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদের যথেষ্ট অবদান ছিল। মুক্তি বাহিনীতে তাঁদের জোর ছিল। কাজেই তাঁদের মনে আশা হইয়াছিল, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে যে নতুন সরকার গঠিত হইবে, তাতে অংশ পাইবার অধিকারও তাঁদের আছে। পাকিস্তানী আমলের নির্বাচনের অধ্যায়টা আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেই এটা সম্ভব। এতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইয়া যাইবে। এক, বামপন্থীরা সরকারের অংশীদার হইতে পারিবেন। দুই, পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সম্ভাবনারও অবসান হইবে। একমাত্র বিপ্লবী সরকারের শ্লোগানের মাধ্যমেই এটা সম্ভব ছিল। কিন্তু যতই বিপ্লবী সরকার বলা হোক শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ছাড়া কোন সরকার পরিচালনই

সম্ভব ছিল না। কাজেই ঐ 'বিপ্লবী'দের দাবি ছিল, শেখ মুজিবকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়া একটি বিপ্লবী সরকার গঠিত হউক।

সর্বময় ক্ষমতার লোভে অনেক রাজনৈতিক নেতারই মাথা ঠিক থাকে না। শেখ মুজিব যদি পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের ট্রেনিং প্রাপ্ত নেতা না হইতেন, তিনি যদি পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে অগাধ বিশ্বাসী না হইতেন, তবে ঐ বিপ্লবীদের লোভনীয় প্রস্তাবের ফাঁদে পা দিতেন। কিন্তু শেখ মুজিব সে ফাঁদে পা দিলেন না। অথরিটারিয়ানিযমের ক্ষমতা-লোভের সামনেও তিনি মাথা ঠিক রাখিলেন। বরঞ্চ সাবধান হইলেন। অতি ক্ষিপ্রতার সাথে তিনি বিচারপতি আবু সাঈদের মত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ ও পন্ডিত ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট করিয়া নিজে প্রধান মন্ত্রিত্বে নামিয়া আসিয়া সহকর্মী বিপ্লবীদেরে, দেশবাসীকে এবং বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিলেন, তিনি বাংলাদেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করিতে চান, আর কোনও গণতন্ত্র নয়। আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরেও তিনি সত্যি-সত্যি সভারেন পার্লামেন্ট রূপেই স্থাপিত করিতে চান, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরে তা দেখাইবার জন্য সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ শ্রদ্ধেয় ও আদর্শবাদী প্রবীণ নেতা শাহ্ আবদুল হামিদ সাহেবকে স্পিকার ও দীর্ঘদিনের সহকর্মী, নিষ্ঠাবান ও চরিত্রবান আওয়ামী লীগার মোহাম্মদ উল্লাকে ডিপুটি স্পিকার নিয়োগ করাইলেন। প্রতিভাবান উচ্চশিক্ষিত নির্বাচিত সহকর্মীদেরে লইয়া তিনি একটি মর্যাদাবান মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন।

৪. চাঁদে কলংক

কিন্তু অকস্মাৎ ২৪ শে জানুয়ারি আমাদের রাজনৈতিক চাঁদে কলংক দেখা দিল। কলংক ত নয়, একেবারে রাহু। সে রাহুতে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হইল। রাহু দুইটি। প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার নম্বর ৮ ও ৯। একটার নাম দালাল আইন। আরেকটার নাম সরকারী চাকুরি আইন। উভয়টাই সর্বগ্রাসী ও মারাত্মক। একটা গোটা জাতিকে, অপরটা গোটা প্রশাসনকে দ্বিখন্ডিত করিয়াছে। দুইটাই রাষ্ট্রের বিপুল ক্ষতি করিয়াছে। সে সবের প্রতিকার দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। অথচ এ দুইটা পদক্ষেপই ছিল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

সব দমননীতি-মূলক আইনের মতই দালাল আইনেরও ফাঁক ছিল নির্বিচারে অপপ্রয়োগের। হইয়াও ছিল দেদার অপপ্রয়োগ। ফলে নির্যাতন চলিয়াছে বেএন্তেহা। যে আওয়ামী লীগ নীতিতঃই নিবর্তনমূলক আইনের বিরোধী, একজন লোককেও বিনা-বিচারে একদিনও আটক না রাখিয়া দেশ শাসন যে আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য, সেই আওয়ামী লীগেরই স্বাধীন আমলে অল্পদিনের মধ্যেই ত্রিশ-চল্লিশ হাজার নাগরিক গ্রেফতার হইয়াছেন এবং বিনা-বিচারের প্রায় দুই বছর কাল আটক আছেন। বেশী না হইলেও প্রায় সম-সংখ্যক লোক বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন

করিয়া বেড়াইতেছেন। গ্রেফতারিত ব্যক্তিরা যামিনাদি ব্যাপারে আদালতী সুবিধা পাইতেছেন না। অতি অল্প-সংখ্যক লোক ছাড়া কারো বিরুদ্ধে চার্জশীট হইতেছে না। এমনকি, তদন্তও শেষ হয় নাই। এই সবই সর্বাত্মক দমন আইনের উলংগ রূপ ও চরম অপপ্রয়োগ।

তবু এটাই এ আইনের চরম মারাত্মক রূপ নয়। নাগরিকদের ব্যক্তিগত ভোগান্তি ছাড়াও এ আইনের একটা জাতীয় মারাত্মক দিক আছে। এই আইন গোটা জাতিকে 'দেশপ্রেমিক' ও 'দেশদ্রোহী' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। অথচ দেশবাসীর চরিত্র তা নয়। ১০ই জানুয়ারি শেখ মুজিব যখন দেশে ফিরেন, তখন তিনি কোনও দলের নেতা ছিলেন না। নেতা ছিলেন তিনি গোটা জাতির। তাঁর নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা আনিয়াছিলেন সেটা কোন দল বা শ্রেণীর স্বাধীনতা ছিল না। সে স্বাধীনতা ছিল দেশবাসীর সকলের ও প্রত্যেকের। এমন কি, যাঁরা স্বাধীনতার বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁদেরও। সব দেশের স্বাধীনতা লাভের ফল তাই। ভারতের স্বাধীনতা আনিয়াছিলেন কংগ্রেস; অনেকেই তার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা আনিয়াছিলেন মুসলিম লীগ। অনেকেই তার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সবাই সে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করিতেছেন। স্বাধীনতার বিরোধিতা করার অপরাধে কাউকে শাস্তি ভোগ করিতে হয় নাই। কোনও দেশেই তা হয় না। কারণ স্বাধীনতার আগে ওটা থাকে রাজনৈতিক মতভেদ। শুধু স্বাধীনতা লাভের পরেই হয় ওটা দেশপ্রেম ও দেশদ্রোহিতার প্রশ্ন। সব স্বাধীনতা সংগ্রামের বেলাই এটা সত্য। বাংলাদেশের ব্যাপারে এটা আরও বেশি সত্য। বাংলাদেশের সংগ্রাম শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়, নির্বাচনের মাধ্যমে। সে নির্বাচনে স্বাধীনতা নির্বাচনী ইশ্যু ছিল না। আওয়ামী লীগও অন্যান্য পার্টির মতই পাকিস্তান-ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচন লড়িয়াছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক বিজয়ী হয়। পাকিস্তানের সামরিক সরকার সে নির্বাচন না মানিয়া তলওয়ারের জোরে পূর্ব-পাকিস্তানীদেরে শিখাইতে চায়। তখনই সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। এ সংগ্রামের জন্য আওয়ামী লীগও প্রস্তুত ছিল না। অন্য সব দল ত নয়-ই। এই সশস্ত্র সংগ্রাম অন্যান্য দেশের মত দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ন মাসেরও কম সময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। এটা সম্ভব হইয়াছিল শুধুমাত্র ভারতের সামরিক সহায়তায়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি দীর্ঘস্থায়ী হইত, তবে সংগ্রাম চলিতে থাকা অবস্থায় দলীয় স্তরেও আমাদের ঐক্য সাধিত হইয়া যাইত। মাত্র ন মাসের যুদ্ধেই আমাদের দেশবাসী জনগণের স্তরে ঐক্যবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, আমি 'জন-যুদ্ধ' অনুচ্ছেদে তা আগেই বলিয়াছি। জনগণের সে ঐক্য নেতৃস্তরেও প্রসারিত হইত, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু-মুক্তি-যুদ্ধ হঠাৎ অল্পদিনেই শেষ হইয়া যাওয়ায় সকল দলের জাতীয় স্তরে সেটা দানা বাঁধিতে পারে নাই। ৭০ সালের নির্বাচনের সময়ে যে নেতার বা পার্টির যে

মতই থাকুক না কেন, ২৫শে মার্চের পরবর্তী নৃশংসতার পরে নিশ্চয়ই সে মত বদ্লিয়াছিল। প্রমাণ, নির্বাচনের আগে পর্যন্তও যে-সব বড় বড় নেতা বরাবর আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করিয়াছেন, এবং যাঁদের অনেকেই দালালি আইনে আটক হইয়াছেন, তাঁদের বেশীর ভাগেরই পুত্র-নাতিসহ পরিবারের লোকেরা মুক্তি-যোদ্ধাদের সহযোগিতা করিয়াছেন। মত ও মনের এই পরিবর্তন সর্বাত্মক ও সর্বজনীন হয় কালক্রমে। রাষ্ট্র নায়কের উচিৎ বিরোধীদেরে সে সময় দেওয়া।

১০ই জানুয়ারির বক্তৃতার জের টানিয়া শেখ মুজিব যদি বলিতেনঃ 'স্বাধীনতার আগে আপনাদের যাঁর যে মতই থাকুক না কেন, আজ স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার কাজে সবাই আমাকে সহায়তা করুন। এ স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব গোটা দেশবাসীর। কারণ এ স্বাধীনতা তাদের সকলের, তবে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস, সকল দলের নেতারা শেখ মুজিবের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেন।

তা না করিয়া যে পদক্ষেপ নেওয়া হইল, তার ফল হইল বিরূপ। ১০ই জানুয়ারি যেখানে শেখ মুজিবের বিরোধী একজনও ছিলেন না, কয়েক দিনের মধ্যে সেখানে চল্লিশ হাজার লোক তাঁর বিরোধী হইলেন। কয়েক মাস পরে চল্লিশ হাজার বাড়িয়া চল্লিশ লাখ হইল। তাঁদের বিরোধিতা সক্রিয় না হইলেও ক্রিয়াশীল হইল। নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থায় ফাটল ধরিল। আনাস্থা হইতে সন্দেহ, সন্দেহ হইতে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস হইতে শত্রুতা পয়দা হইল। পল্লী গ্রামের স্বাভাবিক সামাজিক নেতৃত্ব যে আলেম সমাজ ও মাতব্বর শ্রেণী, তাঁদের প্রভাব তছনছ হইয়া গেল। ছাত্র-তরুণদের উপর শিক্ষক-অধ্যাপকদের আধিপত্যের অবসান ঘটিল। সে সামগ্রিক সন্দেহ, দলাদলি ও অবিশ্বাসের মধ্যে মুক্তি-যোদ্ধাদের অস্ত্র প্রত্যর্পণ ব্যাহত হইল। দেশের আইন-শৃংখলার প্রতি কারো শ্রদ্ধা থাকিল না। স্বভাব-দুষ্কৃতিকারীরা এর সুযোগ গ্রহণ করিল। সে সার্বজনীন অশান্তি ও বিশৃংখলা পুলিশ বাহিনীর আওতার বাহিরে চলিয়া গেল।

তারপর প্রায় দুই বছর পরে যখন সরকার তথাকথিত দালালদেরে 'ক্ষমা' করিলেন, তখন সে ক্ষমায় মহত্ত্ব ত থাকিলই না, দুই বছরের তিক্ততায় তা রাষ্ট্রের কোনও কল্যাণেই লাগিল না। চাকা আর উল্টা দিকে ঘুরিল না।

এই একই প্রসেসে সরকারী চাকুরি আইন প্রশাসন-যন্ত্রের মেরুদন্ড ভাংগিয়া দিয়াছে। আজো তা আর জোড়া লাগে নাই। সকল রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর মত হিসাবে গণতান্ত্রিক দুনিয়ার সর্বত্র এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলিয়া গৃহীত ইয়াছে যে প্রশাসনিক নির্বাহীদের চাকরির উপর নির্বাচিত নির্বাহীদের প্রভাব যত কম হইবে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য ততই মংগল। চাকুরির নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা না থাকিলে রাষ্ট্রের সমূহ

৩৯ —

ক্ষতি হয়। এক দিকে প্রশাসনিক নির্বাহীরা সততার সংগে নিজেদের কর্তব্য পালন করিতে পারে না। অপর দিকে দেশের প্রতিভাশালী উচ্চ-শিক্ষিত তরুণরা সরকারী চাকুরি গ্রহণে অনুৎসাহী হইয়া পড়েন। বহু কালের অভিজ্ঞতার ফলে তাই প্রশাসনিক নির্বাহী নিয়োগের কাজটা নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক চাকুরি কমিশনের উপর দেওয়া হইয়াছে। প্রমোশন-ডিসমিযাল ও উন্নতি-অবনতির জন্যও তেমনি কড়া নিয়ম-কানুনের একটা ঐতিহ্য গড়িয়া তোলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে দেশের যেখানেই এর ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেখানেই দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। প্রশাসনিক কাঠামোতে ঘুণে ধরিয়াছে। রাষ্ট্রের ঘোরতর অকল্যাণ হইয়াছে।

এটাই ঘটিয়াছে বাংলাদেশের প্রশাসন-যন্ত্রে। ৯ নং অর্ডার এই কাজটি করিয়াছে। এত কালের স্থায়ী প্রশাসনিক নির্বাহীদের চাকুরির স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও উন্নতি এক চোটে নির্বাচিত নির্বাহীদের মর্যির উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে। এতে প্রশাসনিক নির্বাহীদের যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতা নৈতিক সততা ও প্রশাসনিক দক্ষতা হইতে এক লাফে বাণিজ্যিক লাভ-লোকসানের দাড়ি পাল্লায় চড়িয়া বসিয়াছে। বুদ্ধি-বিবেকমতে দায়িত্ব পালনের চেয়ে এখন হইতে কর্তা-ভজাই উন্নতির একমাত্র সোপান হইয়া গিয়াছে।

বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারীদের বরাতে এমনটা ঘটার কোনও কারণ ছিল না-না এফিশিয়েনসির দিক হইতে, না দেশের প্রতি কর্তব্যবোধের দিক হইতে। স্বাধীনতার আগে এঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতায় কেউ সন্দেহ করেন নাই। এতদিন পাকিস্তান সরকারের চাকুরি করিয়াছেন বলিয়া স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারী কর্তব্য করিতে পারিবে না, এটা মনে করিবারও কোনও কারণ ছিল না। সরকারী কর্মচারীর প্রচলিত দায়িত্ব-বোধ ও মাথার উপর সামরিক শাসনের খড়্গ লইয়াও যাঁরা ২রা মার্চ হইতে ২৫শা মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নির্দেশিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া চাকুরি ও জান খোয়াইবার ঝুঁকি লইয়াছিলেন, তাঁদের বিপদ মুক্তি-যোদ্ধাদের বিপদের চেয়ে কম সাংঘাতিক ছিল না। যাঁদের নেতা চীফ সেক্রেটারী মিঃ শফিউল আযম এসোসিয়েশনের সভা করিয়া আওয়ামী লীগের দাবির সমর্থন করিয়াছিলেন, যে জুডিশিয়ারির নেতা চীফ জাস্টিস বদরুদ্দীন সিদ্দিকী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নব নিয়োজিত গভর্নর টিক্কা খানকে হলফ পড়াইতে অস্বীকার করিয়া চাকুরি ও জীবন উভয়টার বিপদের ঝুঁকি লইয়াছিলেন, সেই প্রশাসন-যন্ত্র ও বিচার বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের হাতে এমন ব্যবহার পাইবেন, এটা কেই ভাবিতে পারেন নাই। তার ফলও রাষ্ট্রের জন্য ভাল হয় নাই। আমরা আজ তার সাজা ভোগ করিতেছি।

জনগণের আস্থা, প্রশাসনিক সততা ও আদালতের স্বাধীনতাই সকল রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি, এটা শুধু রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা নয়, আওয়ামী লীগেরও দীর্ঘকাল-পোষিত মূলনীতি। যতই সাময়িক বিচ্যুতি ঘটুক শেষ পর্যন্ত তার নীতির প্যান্‌ডিউলাম ঠিক জায়গায় আসিয়া স্থির হইবেই।

৫. প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব ৭ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা সফরে গেলেন। গড়ের মাঠে বিশাল জনসভায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের নাগরিক সম্বর্ধনার জবাবে এবং কলিকাতা প্রেস-ক্লাবের সভায় ভারতের জনগণ, ভারত সরকার ও ভারতীয় সংবাদ-পত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁর স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তিনিও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় গড়ের মাঠের জনসভায় বক্তৃতা করেন। গবর্নমেন্ট হাউসে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে তিনি এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। ভোজ-শেষের বক্তৃতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সরকারের জন্য এগার শ মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক ইত্যাদি উপহার দেন।

৮ই ফেব্রুয়ারির রাতের খবরে টেলিভিশনে যখন এই খবর প্রচারিত ও প্রদর্শিত হয়, তখন আমি আমার পরিবারের এবং সমবেত বন্ধু-বান্ধবের কাছে ভারত-সরকারের বন্ধুত্ব ও উদারতার তারিফ করিবার সুযোগ পাইলাম ও করিলাম। সমবেত বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। আমার ইন্দিরা প্রশংসায় বাধা দিয়া বলিলেনঃ 'মাত্র ওয়ানফিফ্‌থ্‌ ফেরত পাইলাম, সার।'

কৌতূহলে সবাই তাঁর পানে তাকাইলেন। আমিই প্রশ্ন করিলামঃ 'এ কথার মানে?'

তিনি জবাবে বিস্তারিত যা বলিলেন, তার সারমর্ম এই যে, ২৫শে মার্চের পর আমাদের দেওয়ানী, পুলিশ ও জংগী অফিসাররা এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষীয় লোকেরা বিভিন্ন জেলা-মহকুমা ট্রেজারি ও ব্যাংক হইতে হাজার হাজার কোটি টাকা ছাড়াও সাড়ে পাঁচ হাজার বিভিন্ন শ্রেণীর অটোমোবাইল নিয়া ভারতে আশ্রয় নিয়াছিলেন। আজ শ্রীমতি ইন্দিরা তার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ ফেরত দিলেন।

সমবেত সবাই তাঁর কথা কৌতূহলের সাথে শুনিলেন। আমি ভদ্রলোকের অকৃতজ্ঞতা, নীচতা ও এমন ব্যাপারে বিচারের মাপকাঠির ক্ষুদ্রতায় চটিতে ছিলাম। তাঁর কথা শেষ হওয়া মাত্র আমি বিদ্রূপের ভাষার বলিলামঃ 'আপনারা ঐসব মোটরগাড়ি ভারত-সরকারের কাছে জমা রাখিয়াছিলেন বুঝি?'

ভদ্রলোক চুপ করিয়া রহিলেন। আমি আবার বলিলামঃ 'ঐ এগারশত গাড়িও যদি তাঁরা না দিতেন, তবে কি করিতেন আপনারা?' একটু থামিয়া আবার বলিলামঃ 'ঐ অবস্থায় ওসব আপনাদের হাতে পড়িলে একটাও ফেরত দিতেন না।'

আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে সহায়তা করিবার ভারতের এক 'শ একটা কারণ ছিল, আমি তা বুঝিতাম। তার মধ্যে ভারতের নিজস্ব স্বার্থও ছিল, তাও আমি জানিতাম। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের সাহায্যের মহৎ দিকটা এত তাড়াতাড়ি আমরা ভুলিয়া যাইব, এটা আমি কিছুতেই মার্জনা করিতে পারি নাই।

পরদিন উভয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা সম্পর্কে একটি সুন্দর যুক্ত-বিবৃতি প্রকাশিত হইল। তাতে উভয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার কথা ছাড়াও বলা হইল যে, আগামী ২৫শে মার্চের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের কাজ সমাপ্ত হইবে।

আমি এ ঘোষণায় আহলাদিত হইলাম এবং শেখ মুজিবের কূটনৈতিক সাফল্যে গর্বিত হইলাম।

কার্যতঃ বাংলাদেশ হইতে সৈন্য অপসারণের কাজটা নির্ধারিত তারিখের অনেক আগেই সমাপ্ত হইল। ১২ই মার্চ তারিখে ভারতীয় সৈন্য ঢাকা ত্যাগ করিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান একটি প্রাণস্পর্শী সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন।

পাঁচ দিন পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় আসিলেন। ঢাকাবাসী তাঁকে সাড়ম্বরে প্রাণঢালা বিপুল সম্বর্ধনা জানাইল। সুহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত সুউচ্চ মঞ্চেও উভয় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা করিলেন। মিসেস গান্ধী তিনদিন ঢাকায় অবস্থান করিয়া বিভিন্ন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। অবশেষে ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকা ত্যাগ করিলেন। ঐ তারিখে উভয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা সম্পর্কে একটি যুক্ত ইশতাহার বাহির হইল।

৬. ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী-বাণিজ্য চুক্তি

মিসেস গান্ধীর তিনদিন স্থায়ী বাংলাদেশ সফরের ফলে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে দুইটি মূল্যবান সুদূরপ্রসারী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। একটি ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি, অপরটি ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি। প্রথমটি স্বাক্ষরিত হয় যুক্ত ইশতেহার প্রকাশের তারিখেই ১৯শে মার্চ। দ্বিতীয়টি স্বাক্ষরিত হয় দশ দিন পরে ২৮শে মার্চ।

এই দুইটি চুক্তি লইয়াই বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিশেষতঃ রাজনৈতিক মহলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়োছিল এবং ফলে প্রকাশ্যে তুমুল প্রতিবাদের ঝড়

উঠিয়াছিল। মৈত্রী চুক্তির ফলে বাংলাদেশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হইয়াছে বলিয়া বিরোধী দলসমূহের নেতারা এই চুক্তির নিন্দা করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্র-নায়কদের কৃতজ্ঞতা-বোধ ও দুর্বলতা ও অসহায় অবস্থার সুযোগ লাইয়া শক্তিমান ভারত এই অসম চুক্তি আদায় করিয়াছেন বলিয়া ভারত-বিরোধী একটা মনোভাব আপনি মাথা-চাড়া দিয়া উঠিল।

ঐ অবস্থায় বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় পরিবেশটা আরও তিক্ত হইয়া উঠিল। মৈত্রী চুক্তিকে যেমন ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্যের দলিল বলা হইতেছিল, বাণিজ্যচুক্তিকে তেমনি ভারতের অর্থনৈতিক আধিপত্যের দলিল বলা হইতে লাগিল।

কিন্তু আমার বিবেচনায় বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি করার অনেক কিছু থাকিলেও মৈত্রী চুক্তিতে আপত্তির বিশেষ কিছু নাই। ভারতের সহিত মৈত্রী ও সহযোগিতা বাংলাদেশের জন্য একটা অমূল্য সম্পদ। পাকিস্তান আমলেও আমি বলিতাম ও বিশ্বাস করিতাম, পাক-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা উভয় দেশের জন্য কল্যাণকর ও অপরিহার্য। বাংলাদেশের বেলা এটা আরও সত্য। ভারতের সহিত বন্ধুত্ব না রাখিয়া বাংলাদেশ কখনও নিরাপদ হইতে পারে না। এই দিক হইতে বিচার করিলে আলোচ্য মৈত্রী চুক্তিকে বাংলাদেশের স্বার্থেই অভিনন্দিত করিতে হয়। এই চুক্তির হায়াত ২৫ বছর হওয়াটাও সে কারণেই সমর্থনযোগ্য। এই চুক্তির সমালোচকরা ৯ ও ১০ দফা বিরোধিতা করেন যে কারণে আমার বিবেচনায় সে কারণটাও যুক্তিপূর্ণ নয়। চুক্তির দুই পক্ষের কেউই অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাতের কোন সাহায্য করিতে পারিবেন না, একপক্ষ তৃতীয়-পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষ তার সাহায্যে আসিবেন, অথবা একপক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় কোন পক্ষের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন না, এর একটাও আমার বিবেচনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে নাই।

আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের বিচার এভাবে করা হয় না। চুক্তি মাত্রেই পক্ষগণের স্বাধীনতা খানিকটা ক্ষুণ্ন হয়। আলোচ্য চুক্তিতে তার বেশী কিছু হয় নাই। চুক্তির যে শর্তে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হইয়াছে, তাতে ভারতের সার্বভৌমত্বও সমভাবে ক্ষুণ্ন হইয়াছে। তা না হইলে কোন চুক্তিই হইতে পারে না। কাজেই আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মৈত্রী চুক্তির বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই।

কিন্তু বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে একথা বলা চলে না। এই চুক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহল যেভাবে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠিয়াছে, গোটা দেশবাসী যেভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তা মোটেই অযৌক্তিক নয়। বাংলাদেশের স্বার্থ এই চুক্তিতে সত্যই ঘোরতর ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই চুক্তির সীমান্ত বাণিজ্যের বিধানটা যেন বাংলাদেশের পক্ষ হইতে চোখ বুজিয়া সই করা হইয়াছে। বহু ক্রটির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্রটি দশ মাইল এলাকাকে সীমান্ত

আখ্যা দেওয়া। বাংলাদেশের মত দীঘে-পাশে ক্ষুদ্রায়তন দেশের মোট আয়তনের এক-চতুর্থাংশের বেশী এলাকাকে সীমান্ত বলার অর্থ কার্যতঃ গোটা দেশটাকেই সীমান্ত বলিয়া স্বীকার করা। বাংলাদেশ ও ভারতের মোট চৌদ্দ শ মাইল ব্যাপী সীমান্ত রেখার দশ মাইল এলাকাকে বর্ডার ট্রেডের জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়ার পরিণাম কি, যে-কোন কান্ডজ্ঞানী লোকের চোখে তা ধরা পড়া উচিৎ ছিল। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশের গোটা বর্ডার এলাকাই চোরাচালানের মুক্ত এলাকা হইয়া পড়ে। এটা বুঝিতে বাংলাদেশ সরকারেরও বেশি সময় লাগে নাই।

অথচ বাংলাদেশের (তৎকালে পূর্ব-পাকিস্তান) যে জিরাতিয়াদের স্বার্থ রক্ষাই গোড়ায় বর্ডার-ট্রেডের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যে জিরাতিয়াদের বিশেষ সুবিধাই ছিল ১৯৫৭ সালে সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার সম্পাদিত পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির প্রধান শর্ত, ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তির বর্ডার-ট্রেড হইতে সেই জিরাতিয়াদেরেই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

সুখের বিষয় বছর না ঘুরিতেই এই চুক্তি বাতিল করা হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তি যে বিপুল আয়তনের চোরাচালান বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে তার কব্জা হইতে বাংলাদেশ আজও মুক্ত হইতে পারে নাই।

আরও সুখের বিষয় এই যে এই বাণিজ্য চুক্তি বিশেষতঃ এর বর্ডার ট্রেডের অংশ, যে বাংলাদেশের স্বার্থ-বিরোধী ভারত সরকারও তা মানিয়া লইয়াছেন। বর্তমান ভারত সরকার এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব যে সত্য-সত্যই বাংলাদেশের হিতৈষী, আমাদের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সার্বিক স্বকীয়তা স্বনির্ভরতা যে তাঁদের কাম্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই। বিশাল ভারতে অসংখ্য দল ও মতের মধ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও কৃষ্টিক স্বকীয়তা-বিরোধী কিছু লোক থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁদের কথাবার্তা ও কার্য-কলাপে ভারত সরকারেরও কংগ্রেস পার্টির আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করিব।

উপাধ্যায় আট

সংবিধান রচনা

১. আওয়ামী নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক চেতনা

শেখ মুজিব-নেতৃত্বের আওয়ামী লীগ পার্টির সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ তড়িৎ গতিতে দেশের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা। তড়িৎ গতিতে মানে বিনা-বিচারে সাত তাড়াতাড়িতে নয়। এ তড়িৎ গতির অর্থ স্বাধীনতা হাসিলের অল্প কালের মধ্যে দেশের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনা। এটা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় এই জন্য যে এই অঞ্চলের বিশেষতঃ আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য এটা নয়। এখানকার ঐতিহ্য এই যে বিনা-সংবিধানে যতদিনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আকড়াইয়া থাকা যায়। পাকিস্তান আমাদের রাজনৈতিক পূর্বগামীরা শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনায় পাক্কা নয় বছর লাগাইয়া ছিলেন। অধিকতর গণতন্ত্র চেতন আমাদের প্রতিবেশী ভারতও তিন বছরের আগে সংবিধান রচনা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই।

সেস্থলে আওয়ামী-নেতৃত্ব স্বাধীনতা লাভের সাড়ে তিন মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল গণপরিষদের বৈঠক ডাকেন। তাতে সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির মুসাবিদা আলোচনার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে গণ-পরিষদের বৈঠক দেওয়া হয়। গণ-পরিষদের দ্বারা সংবিধান গৃহীত হয়। মোট কথা স্বাধীনতা হাসিলের এক বছরের মধ্যে সংবিধান রচনা, গ্রহণ ও প্রবর্তন হয়। ১৬ই ডিসেম্বরে সংবিধান চালু হয়। অত তাড়াতাড়ি করিবার কোন তাকিদও ছিল না। সমসাময়িক নযিরও ছিল না। শেখ মুজিবের দেশে ফিরিবার পরদিনই ১১ই জানুয়ারি তারিখে একটি অস্থায়ী সংবিধান রচনা করিয়া বাংলাদেশের সরকারকে পার্লামেন্টারি সরকারে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। ১৪ই জানুয়ারী শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট পদ হইতে নামিয়া আসিয়া প্রধান মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় শেখ মুজিব যদি শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনায় দুই-চার বছর বিলম্বও করিতেন, তবু তাঁকে কেউ দোষ দিতে পারিতেন না। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে ছিন্নমূল দেশবাসীকে পুনর্বাসন, ঝড়-বন্যা-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশবাসীকে খাওয়ান-পরান ফেলিয়া সংবিধান রচনা না করিলে তাঁকে কেউ কর্তব্য-চ্যুতির এল্যামও দিতে পারিতেন না।

তবু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে খুব সম্ভবতঃ তাঁর তাকিদে, আওয়ামী লীগ পার্টি শুধু সংবিধানই দিলেন না, তার বুনিয়াদে ১৯৭৩ সালের মার্চের মধ্যে একটা সাধারণ

নির্বাচনও দিয়া ফেলিলেন। এত তাড়াতাড়ি নির্বাচন দিবারও কোন তাকিদ ছিল না। ১৯৭০–৭১ সালের নির্বাচনের বলে আওয়ামী লীগ বিনা–তর্কে ১৯৭৪–৭৫ সালতক মেম্বর থাকিতে পারিতেন। একই দিনের নির্বাচনে পশ্চিম–পাকিস্তানের (বর্তমান পাকিস্তান) মেম্বররা আজও মেম্বর আছেন।

আওয়ামী লীগ–নেতৃত্ব সংবিধান প্রবর্তনের পরে নির্বাচন দেওয়া তাঁদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য মনে করিলেন। গণ–পরিষদের আওয়ামী লীগই ছিলেন একমাত্র পার্টি। অপযিশন বলিতে একজন মেম্বরও ছিলেন না। এমন এক দলীয় গণ–পরিষদ সংবিধান রচনার পর ঐ সংবিধানেই 'অস্থায়ী বিধান' হিসাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেনঃ 'এই গণপরিষদই পার্লামেন্টে রূপান্তরিত হইল।' তারপর সেই পার্লামেন্টের আয়ু কতদিন হইবে, কতদিন পরে পার্লামেন্টের নয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, এ সব ব্যাপারেই তাঁদের সুবিধা–মত বিধান করিয়া লইতে পারিতেন। আওয়ামী লীগ এসব কিছুই করেন নাই। বরঞ্চ অবিলম্বে নির্বাচন দিয়া পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় আদর্শ নযির স্থাপন করিলেন। এই নির্বাচনের কথা পরে বলিতেছি। আগে শাসনতান্ত্রিক সংবিধানের কথাটাই আলোচনা করিয়া লই।

২. সংবিধানের ভাষিক ত্রুটি

আওয়ামী লীগ–নেতৃত্ব কালহরণ না করিয়া শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনায় হাত দেওয়ায় আমি যেমন খুশী হইয়াছিলাম, সংবিধানের মুসাবিদা দেখিয়া তেমন খুশী হইতে পারিলাম না। আমার মনের ভাব আনন্দ বিষাদ মিশ্রিত হইল। একদিকে ভোটারের বয়স–সীমা ১৮ বছরে নামানোতে যেমন আনন্দিত ও গর্বিত হইলাম, মৌলিক অধিকার, শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃতিতে কৃপণতা দেখিয়া তেমনি বিষণ্ন ও লজ্জিত হইলাম। বাংলা মুসাবিদার পাণ্ডিত্য ও সাংস্কৃত্য দেখিয়া ঘাবড়াইলাম। খুব চিন্তিত হইলাম। প্রভাবশালী কয়েকজনের কাছে আমার মনের কথা বলিলামও। তাঁদের কেউ বোধ হয় শেখ মুজিবের কাছে কথাটা তুলিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কয়েকজন আসিয়া এক কপি মুসাবিদা সংবিধান দিয়া বলিয়া গেলেন, প্রধানমন্ত্রী বলিয়া দিয়াছেনঃ আপনি যা যা সংশোধনী দিবেন, সবই তিনি মানিয়া লইবেন। মুজিব–ইয়াহিয়া বৈঠকের সময় আমার খাটুনির যে দশা হইয়াছিল, এবারও তাই হইল। আমি তাই সংবাদ–পত্রে নিজের কথা বলিয়া সংবিধান রচয়িতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম। বিশেষ করিয়া দৈনিক 'ইত্তেফাকে' ধারাবাহিক অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিলাম। আমার এই বই যতজন পাঠক পড়িবেন, তার চেয়ে বহু গুণ বেশী পাঠক 'ইত্তেফাকে' আমার ঐ সব লেখা পড়িয়াছেন। কাজেই সে–

সব কথা বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করিলাম না। শুধু মূল ত্রুটিগুলির দিকেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

আমাদের সংবিধানের মূল ত্রুটি দুইটিঃ এক, বিধানের ত্রুটি; দুই, ভাষার ত্রুটি। ভাষার ত্রুটির আলোচনাটা সহজ ও স্বল্প কাজেই সেই কথাটাই আগে আলোচনা করিতেছি। মাতৃভাষায় আধুনিক দেশের আধুনিক সংবিধান রচনার ইচ্ছা প্রশংসনীয় এবং উদ্যম সমর্থনযোগ্য। বাংলাদেশের সংবিধান–রচয়িতারা এই কারণে আমার শ্রদ্ধার পাত্র। শাসনতান্ত্রিক সংবিধান একটা আইন। দেশের শ্রেষ্ঠ আইন। গণ–পরিষদের মেম্বরদের বিপুল মেজরিটি আইনবিদ ও আইন–ব্যবসায়ী। তাঁদের জন্য সংবিধান রচনা খুব কঠিন ছিল না। ইংরাজ আমলের দুইশ' বছর ও পাকিস্তান আমলের পঁচিশ বছর ধরিয়া আদালতের সর্বোচ্চ স্তর বাদে আর সর্বত্র মোটামুটি বাংলাভাষা চালু থাকায় আমাদের দেশে একটা আইনের ভাষা ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাজেই একটা সহজবোধ্য পরিভাষাও গড়িয়া উঠিয়াছিল। শুধু গণ–পরিষদের মেম্বররা তাঁদের আইন–আদালতের অভিজ্ঞতা লইয়া শাসনতান্ত্রিক আইন রচনা শেষ করিলে কোনও অসুবিধা বা জটিলতা সৃষ্টি হইত না। তাঁরা প্রচলিত সহজ ও পরিচিত শব্দই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাঁরা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনের দলিলটিকে সাহিত্যে উন্নত করিবার ইচ্ছা করিলেন। ভাষা বিজ্ঞানীর সাহিত্যিকদের আশ্রয় লইলেন। ভাষার পন্ডিতেরা অভিধান ঘাটিয়া সংস্কৃত শব্দের দ্বারা ইংরাজি শব্দের 'বাংলা' তর্জমা করিলেন।

এইখানে সংবিধান–রচয়িতারা শিশু–সুলভ সাদা–মাটা একটা চালাকি করিলেন। তাঁরা বলিলেন, মুসাবিদাটি তাঁরা প্রথমে বাংলা–ভাষায় রচনা করিয়া উহার ইংরাজি তর্জমা করিয়াছেন। কথাটা বলার কোনও দরকার ছিল না। আমাদের দেশের কনস্টিটিউশনের মুসাবিদা আগেই ইংরাজিতে রচিত হইয়া পরে বাংলায় তার তর্জমা হইয়াছিল, না আগে বাংলা হইয়া পরে ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছিল, এটা বলার বা জানার কোনও দরকার ছিল না। বলাটাও খুব সহজ, নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। কারণ দুনিয়ার বহু দেশেই ইংরাজিতে সংবিধান রচিত হইয়াছে। আমাদের গণ–পরিষদের মেম্বরদের অনেকেই তার অনেকগুলি পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে ইতিপূর্বে আর কোনও দেশেই বাংলায় সংবিধান রচনার নযির নাই। অতএব আমাদের রচয়িতারা যদি বলিতেন, তাঁরা দুনিয়ার সব ভাল ভাল সংবিধানগুলি গভীর মনোযোগে পড়িয়া এবং ভাবনা করিয়া প্রথমেই ইংরাজিতে একটা মুসাবিদা খাড়া করিয়াছেন এবং তারপর সেই অনুমোদিত মুসাবিদার বাংলা তর্জমা করিয়া তাই বাংলা ভাষা–বিশারদগণকে দেখাইয়াছেন, তবে তাতে আমাদের রচয়িতাদের কোনও অসম্মান হইত না। 'বাংলা ভাষায় রচিত খসড়া সংবিধানেরই ইংরাজি অনুবাদ' হওয়ার ফলেই সংবিধানের ১৫৩

নং অনুচ্ছেদের শেষে লিখিতে হইয়াছে ঃ 'বাংলা ও ইংরাজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে। এই একটিমাত্র কথা দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য কত যে বিরোধের বীজ বপন করা হইয়াছে, তার হিসাব করা কঠিন। সংবিধানের যে কোনও অনুচ্ছেদের বাংলা ও ইংরাজি পাঠ মিলাইয়া পড়িলেই বোঝা যাইবে যে সুস্পষ্ট সুন্দর ও প্রাঞ্জল ইংরাজি পাঠটির অস্পষ্ট, দুর্বল ও দ্ব্যর্থবোধক অক্ষম, অনুবাদ করা হইয়াছে। সাধারণ আইন-আদালতে বা সাংবিধানিক আদালতে কোনও বিধানের ব্যাখ্যার উপর বিতর্ক বাধিলে সংবিধানের প্রকৃত মর্মার্থ ও আইন-রচয়িতার উদ্দেশ্য হৃদয়ংগম করিতে হইলে ইংরাজি-পাঠটির প্রাধান্য না দিয়া উপায় নাই। অথচ আমাদের সংবিধানে এই কাজটিই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

এই ধরনের অনেক জটিলতা সৃষ্টি ছাড়াও অনেক সহজ কাজকে কঠিন করা হইয়াছে। আমরা স্মরণাতীত কাল হইতে সরকারের তিনটি মূল বিভাগঃ এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেটিভ ও জুডিশিয়ারিকে যথাক্রমে শাসন বিভাগ, আইন-বিভাগ ও বিচার বিভাগ অভিহিত করিয়া আসিতেছি। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর জনগণের কাছেই এই নামে এরা সুপরিচিত। কিন্তু আমাদের সংবিধান-রচয়িতারা বোধ হয় ভাষা-বিজ্ঞানীদের পরামর্শে মৌলিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'শাসন বিভাগ' না বলিয়া 'নির্বাহী বিভাগ' বলিয়াছেন। অনুবাদের দ্বারা পরিভাষা সৃষ্টির চুলকানি হইতেই এটা করা হইয়াছে।

আমাদের পার্লামেন্টকে ঐ নামে না ডাকিয়া 'জাতীয় সংসদ' সংক্ষেপে সংসদ বলা হইয়াছে। জাতীয় সংসদের ইংরাজি ন্যাশনাল এসেম্রি। অথচ আমাদের সংবিধানের ইংরাজি পাঠে একে পার্লামেন্ট বলা হইয়াছে। পার্লামেন্টের সভারেনটি ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সভারেনটির অসীম ব্যাপকতার দ্বারা সুনির্দিষ্ট। আর ন্যাশনাল এসেম্রি বা সংসদের নিজস্ব কোনও সভারেনটি নাই ; সংবিধান দ্বারা বর্ণিত ক্ষমতাতেই তা সীমাবদ্ধ। এখন ধরুন যদি বাংলাদেশের আদালতে সংসদের সভারেনটি লইয়া তর্ক উঠে, তবে একে কেউ পার্লামেন্টের অসীম সভারেনটির অধিকারী বলিয়া দাবি করিতে পারিবেন না। খোদ সংসদ শব্দটারই কোন তাৎপর্যগত অর্থ নাই।

ঠিক সেইরূপ পরিচিত ইংরাজি শব্দের 'পরিভাষা' রূপে 'অভিসংশন', 'অধিগ্রহণ' 'অধ্যাদেশ' 'প্রবিধান' 'ন্যায়পাল' ইত্যাদি যে সব অপরিচিত নিরাকার শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, সেগুলির বোধগম্য অর্থ হইতে পারে তাদের নিজ-নিজ ইংরাজি প্রতিশব্দের দ্বারা। হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের বেলাও উচ্চ-আদালত ও সর্বোচ্চ-আদালত বলিয়াই রেহাই পাওয়া যাইবে না। ইংরাজি শব্দের ব্যবহারেই তাদের এলাকা সুস্পষ্ট হইবে। সংবিধানে এটাও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

৩. সংবিধানের বিধানিক ত্রুটি

ডিমক্র্যাসি, সোশিয়ালিযম, ন্যাশনালিযম ও সেকিউলারিযমঃ এই চারটিকে আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতি করা হইয়াছে। এর সব কয়টির আমি ঘোরতর সমর্থক। শুধু এমনি সমর্থক না, মুলনীতি হিসাবেও সমর্থক। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আধুনিক যুগে সব রাষ্ট্রকেই সেকিউলার ডিমক্র্যাটিক নেশন-স্টেট হইতে হইবে।

কিন্তু আমার মত এই যে, এর কোনওটাই সংবিধানে মূলনীতিরূপে উল্লিখিত হইবার বিষয় নয়। গণতন্ত্র ছাড়া আর বাকী সবকটিই সরকারী নীতি-রাষ্ট্রীয় নীতি নয়। দেশে ঠিকমত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই আর সব ভাল কাজ নিশ্চিত হইয়া যায়। ভাল কাজ মানে জনগণের জন্য ভাল ; জনগণের ইচ্ছামতই সে সব কাজ হইবে। জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা সবই জনগণের জন্য, সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য, কল্যাণকর। নিরংকুশ গণতন্ত্রই সে কল্যাণের গ্যারান্টি। গণতন্ত্র নিরাপদ না হইলে ওর একটাও নিরাপদ নয়।

এই কারণে শাসনতান্ত্রিক সংবিধানে গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা বিধান করিয়া আর-আর বিষয়ে যত কম কথা বলা যায়, ততই মংগল। সাধারণ কথাবার্তার মতই শাসনতন্ত্রেও যত বেশী কথা বলা হয়, ভুল তত বেশী হইবার সম্ভাবনা বেশী। সে জন্য দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে শুধু নিরংকুশ গণতন্ত্রের নিশ্ছিদ্র বিধান করিয়া বাকী সব ভাল কাজের ব্যবস্থা করা উচিৎ পার্লামেন্টের রচিত আইনের দ্বারা তা না করিয়া আইনের বিষয়বস্তুসমূহ সংবিধানে ঢুকাইলে সংবিধানের স্থায়িত্ব, পবিত্রতা ও অপরিবর্তনীয়তা আর থাকে না। নির্বাচনে যে দল বিজয়ী হইবেন, সেই দলই তাঁদের পছন্দমত সংবিধান সংশোধন করিয়া লইবেন, এমন হইলে শাসনতান্ত্রিক সংবিধানের আর কোনও দাম থাকে না।

এই ধরনের একটি বিচ্যুতির কথা বলিয়াই আমি আমাদের সংবিধান রচয়িতাদের ত্রুটির প্রমাণ দিতেছি। এটা সমাজবাদের বিধান। সমাজবাদ একটা অর্থনীতি। এটাকে সংবিধানের মূলনীতি করার কোনও দরকার ছিল না। যেকোনও গণতন্ত্রী পার্টি যদি সমাজবাদ-প্রতিষ্ঠাকে তাঁদের পার্টি-প্রোগ্রাম রূপে গ্রহণ করেন, তবে বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশের জনগণের বিপুল সমর্থন তাঁরা পাইবেনই। তবু আওয়ামী লীগ পার্টি অনাবশ্যকভাবে সমাজবাদকে সংবিধানের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এ ব্যাপারে আমি মুখে-মুখে ও সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে ভারতের নেতা পণ্ডিত জওয়াহেরলালের পদাংক অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। বর্তমান যুগে

গণতন্ত্রী দুনিয়ায় জওয়াহেরলালই একমাত্র নেতা যিনি আজীবন গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু আওয়ামী নেতারা সংবিধান রচনায় জওয়াহেরলাল-নেতৃত্বের কংগ্রেসের অনুসরণ না করিয়া চৌধুরী মোহম্মদ আলীর নেতৃত্বের মুসলিম লীগকেই অনুসরণ করিয়াছেন। এটা করিয়া আওয়ামী লীগ-নেতৃত্ব সংবিধানের প্রস্তাবনায় মুসলিম লীগের মতই ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। পাকিস্তানের দুইটি সংবিধানেরই প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে ঃ 'পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানকে ইস্‌লামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করিতে চাহিয়াছিলেন।' কথাটা সত্য নয়। কায়েদে আযম তাঁর গণ-পরিষদ উদ্বোধনী ভাষণে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন ঃ 'রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সহিত ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই।' পাকিস্তানের সংবিধান-রচয়িতারা নিজেরা 'ইসলামী রাষ্ট্র' করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই যুক্তি হিসাবে কায়েদে-আযমের নামে ঐ ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন।

আমাদের সংবিধান রচয়িতারাও তাই করিয়াছেন। প্রস্তাবনায় তাঁরাও বলিয়াছেন ঃ 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার মহান আদর্শই আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।' তথ্য হিসাবে কথাটা ঠিক না। আওয়ামী লীগের ছয়-দফা ও সর্বদলীয় ছাত্র এ্যাকশন কমিটির এগার-দফার দাবিতেই আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম শুরু হয়। এইসব দফার কোনটিতেই ঐ সব আদর্শের উল্লেখ ছিল না। ঐ দুইটি 'দফা' ছাড়া আওয়ামী লীগের একটি মেনিফেস্টো ছিল। তাতেও ওসব আদর্শের উল্লেখ নাই। বরঞ্চ ঐ মেনিফেস্টোতে 'ব্যাংক-ইনশিওরেন্স পাট-ব্যবসা ও ভারি শিল্পকে' জাতীয়করণের দাবি ছিল। ঐ 'দফা' মেনিফেস্টো লইয়াই আওয়ামী লীগ ৭০ সালের নির্বাচন লড়িয়াছিল এবং জিতিয়াছিল। এরপর মুক্তি সংগ্রামের আগে বা সময়ে জনগণ, মুক্তি যোদ্ধা ও শহীদদের পক্ষ হইতে আর কোনও 'দফা' বা মেনিফেস্টো বাহির করার দরকার বা অবসর ছিল না। আমাদের সংবিধান রচয়িতারা নিজেরা ঐ মহান আদর্শকে সংবিধানভুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাই জনগণ ও মুক্তি যোদ্ধাদের নামে ঐ ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের মতাদর্শকে জনগণের মত বা ইচ্ছা বলিয়া চালাইয়াছেন বহু বার বহু দেশে। সব সময়েই যে তার খারাপ হইয়াছে, তাও নয়। আবার সব সময়ে তা ভালও হয় নাই। পাকিস্তানের সংবিধানের বেলায় 'ইসলাম' ও বাংলাদেশের সংবিধানের বেলায় 'সমাজতন্ত্র, জাতীয়তা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতাও' তেমনি

অনাবশ্যকভাবে উল্লিখিত হইয়া আমাদের অনিষ্ট করিয়াছে। আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বহু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। এসব জটিলতার গিরো খুলিতে আমাদের রাষ্ট্র-নায়কদের অনেক বেগ পাইতে হইবে।

পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনার সময় আমি বলিয়াছিলামঃ 'পাকিস্তানে ইসলাম রক্ষার চেষ্টা না করিয়া গণতন্ত্র রক্ষার ব্যবস্থা করুন। গণতন্ত্রই ধর্মের গ্যারান্টি।' বাংলাদেশের সংবিধান রচয়িতাদেরও আমি বলিয়াছিলাম ঃ বাংলাদেশের সমাজবাদের কোনও বিপদ নাই, যত বিপদ গণতন্ত্রের। গণতন্ত্রকে রোগমুক্ত করুন, সমাজবাদ আপনি সুস্থ হইয়া উঠিবে।' পাকিস্তানের নেতাদের মতই আমাদের নেতারাও এই 'বৃদ্ধের বচন' শুনেন নাই। ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করিবার চেষ্টায় পাকিস্তানের নেতারা তার অনিষ্ট করিয়াছেন। আমাদের নেতারা 'সমাজতন্ত্র'কে রাজনৈতিক হাতিয়ার করিবার চেষ্টায় আমাদের রাষ্ট্রের তেমন কোনও অনিষ্ট করিয়া না বসেন, সেটাই আমার দুশ্চিন্তা। আমাদের নেতৃবৃন্দ ও তরুণদের মধ্যে এক শক্তিশালী গোষ্ঠী আছেন, যাঁরা মনে করেন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক সংগে চলিতে পারে না। পাকিস্তানের চিন্তা-নায়কদের মধ্যেও একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিলেন যাঁরা বলিতেন, ইসলাম ও গণতন্ত্র এক সংগে চলিতে পারে না। বাংলাদেশের কোনো-কোনো প্রভাবশালী নেতা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছেনঃ 'যদি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক সাথে চলিতে নাই পারে, তবে আমরা গণতন্ত্র ছাড়িয়া সমাজতন্ত্র ধরিব।' অবশ্য এ কথার জবাবে কোনও-কোনও নেতা এমন কথাও বলিয়াছেনঃ 'যদি দুইটা এক সংগে নাই চলে তবে আমরা সমাজতন্ত্র ছাড়িয়া গণতন্ত্রই ধরিব।' জনগণের উপর নির্ভর করিলে এই 'ধরা-ছাড়ার' কোনও প্রয়োজন হইবে না।

কিন্তু বিপদ এই যে আমরা যারা বিপ্লবে বিশ্বাস করি, তারা জনগণের উপর নির্ভর করি না। মাশাআল্লাহ্, আমাদের মধ্যে বিপ্লবীর অভাব নাই। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপ্লব ও আমাদের সরকারকে 'বিপ্লবী সরকার' বলার লোক নেতাদের মধ্যেই অনেক আছেন। তাঁরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই-এর বেলা যদি 'বিপ্লব' করিয়া বসেন, তবে গণতন্ত্রের পরাজয় অবধারিত। বীর জনগণকে জিগ্‌গাসা না করিয়াই যদি তেমন বিপ্লব হইয়া যায়, তবু সেটাকে বীর জনগণের অভিপ্রায় বলিয়াই চালান হইবে। বলা হইবে পশ্চিমা গণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্র। তার চেয়ে বিপ্লবী সর্বহারার গণতন্ত্র অনেক ভাল।

আমাদের সংবিধানে তেমন বিপদের সংকেত অনেক আছে। তার মধ্যে প্রধানটি এই যে, নির্বাচিত কোনও সদস্য দলত্যাগ করিলে বা দল হইতে বহিষ্কৃত হইলে তাঁর

মেম্বরগিরি আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, ভোটারদের নির্বাচনটা কিছু নয়, পার্টির মনোনয়নটাই বড়। এটা একদলীয় শাসন ও পার্টি ডিক্টেটরশিপের পূর্ব লক্ষণ। পার্টি ডিক্টেটরশিপই পরিণামে ব্যক্তি-ডিক্টেটরশিপে পরিণত হয়। গণতন্ত্রের বিপদ এখানেই।

বিপদ আরও আছে। গণতন্ত্রকে যখন বিশেষণে বিশেষিত করা হয়, তখনই গণতন্ত্রের অসুখ শুরু হয়। পাকিস্তানে ও দুনিয়ার অন্যত্র পাঠকগণ তা দেখিয়াছেন। তেমনি রাষ্ট্রনামের প্রজাতন্ত্রের যদি কোনও বিশেষণ দেওয়া হয়, তখনই সেটাকে ব্যতিক্রম মনে করিতে হইবে। প্রজাতন্ত্র মানেই জনগণের শাসন। সেটাকে যদি গণপ্রজাতন্ত্র বলিয়া ডাবল গ্যারান্টি দেওয়া হয়, তবে সেটা 'ব্যাসিক ডেমোক্র্যাসির' রূপ ধারণ করিলে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না।

উপাধ্যায় নয়

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন

১. জন–যুদ্ধের গণতান্ত্রিক রূপ

স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে দেশের কনস্টিটিউশন রচনা সমাপ্ত করা বা নয়া কনস্টিটিউশন প্রবর্তনের তিন মাসের মধ্যে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন দেওয়া গণতান্ত্রিক দুনিয়ার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের সকল কৃতিত্ব আওয়ামী নেতৃত্বের। সব প্রশংসা তাঁদেরই। স্বাধীনতা–সংগ্রামের জন–যুদ্ধেরই এটা ছিল গণতান্ত্রিক রূপ।

নয়া রাষ্ট্র ও নতুন জাতির এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যে বিপুল উল্লাস, উদ্যম ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছিল, সেটাও ছিল সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী। আমাদের সংবিধানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় বিধান আঠার বছর–বয়স্কদের ভোটাধিকার। এ বিধানের জন্য আমরা ন্যায়তঃই গর্ববোধ করিতে পারি। আফ্রো–এশিয়ান সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশই সর্বপ্রথম ভোটাধিকারকে এমন গণ–ভিত্তিক করিয়াছে।

শুধু আফ্রো–এশিয়ান রাষ্ট্রেই নয়, বহু প্রবীণ–প্রাচীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও আজ পর্যন্ত ভোটাধিকারকে এমনভাবে তরুণদের স্তরে প্রসারিত করা হয় নাই। যে সব সভ্য ও উন্নত দেশে শিক্ষার প্রসার প্রায় সার্বজনীন, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু আমরা আফ্রো–এশিয়ান দেশের যে-যেখানে শিক্ষিতের হার মাত্র শতকরা বিশ, যে–সব দেশের শতকরা আশিজনই নিরক্ষর, সে সব দেশের স্কুল–কলেজের ছাত্রদের অধিকাংশই একুশ বছরের কম বয়স্ক। এসব দেশের ভোটাধিকারকে একুশে সীমাবদ্ধ করিলে শিক্ষিত সমাজের এক বিরাট অংশকেই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এ ব্যবস্থা আরও ঘোরতর অন্যায় এই জন্য যে আমাদের দেশের সকলপ্রকার জাতীয় অধিকারের আন্দোলনে ছাত্র–তরুণরাই পয়লা কাতারের সৈনিক হিসাবে ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরে নাবালকত্বের অজুহাতে তাঁদেরই ভোটাধিকার হইতে, তার মানে রাষ্ট্র–পরিচালক নির্বাচনের অধিকার হইতে, বঞ্চিত রাখা ন্যায়তঃও অসংগত, রাষ্ট্রের স্বার্থের দিক হইতেও ভ্রান্তনীতি। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রথম সুযোগেই এই অন্যায় ও ভ্রান্ত নীতির অবসান করিয়াছেন বলিয়া তাঁরা সারা দেশবাসীর বিশেষতঃ তরুণ–সমাজের, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

২. নির্বাচনে আশা–প্রত্যাশা

এই নির্বাচনটা ছিল বাংলাদেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রথম পদক্ষেপ। আওয়ামী লীগই দেশকে এই পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সংবিধান দিয়াছে। হঠাৎ দেয় নাই; কারো চাপে পড়িয়াও দেয় নাই। আওয়ামী লীগ আজন্ম পার্লামেন্টারি পদ্ধতির দৃঢ় সমর্থক। সেই কারণেই তাঁরা দেশকে পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, পার্লামেন্টারি পদ্ধতিই বাংলাদেশের জন্য একমাত্র উপযুক্ত পন্থা।

কাজেই আসন্ন নির্বাচনে যাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয়, সে চেষ্টা আওয়ামী লীগেরই করা উচিত ছিল। তাঁদের বোঝা উচিৎ ছিল, পার্লামেন্টারি পদ্ধতির অসাফল্য কার্যতঃ আওয়ামী লীগেরই অসাফল্য রূপে গণ্য হইবে।

পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন মানে বিরোধী দলের যথেষ্ট সংখ্যক ভাল মানুষ নির্বাচিত হউন, সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। সে দৃষ্টিতে যথেষ্ট উদারতা ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। রাজনৈতিক হরিঠাকুর হিসাবে আমি আওয়ামী নেতাদের কাউকে–কাউকে আগে হইতেই উপদেশ দিয়াছিলাম। মুখে–মুখেও দিয়াছিলাম, 'ইত্তেফাকে' একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াও তেমন উপদেশ দিয়াছিলাম। আমি এ বিষয়ে বিশেষ নযর রাখিবার উপদেশ দেওয়া দরকার মনে করিয়াছিলাম দুইটি কারণে। প্রথমতঃ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের জন–প্রিয়তার মধ্যে গোটা জাতির একটা ভাবাবেগ মিশ্রিত আছে। দ্বিতীয়তঃ আওয়ামী লীগ নৌকাকেই তাঁদের নির্বাচনী প্রতীক করিয়াছেন। নৌকা–প্রতীকের সাথে বাংলাদেশের ভোটারদের মধ্যে ভাবাবেগের ঐতিহ্য আছে। '৭০ সালের নির্বাচনে এই প্রতীক লইয়াই আওয়ামী লীগ অমন বিপুল জয়লাভ করিয়াছিল। তার আগে শেরে-বাংলার নেতৃত্বে যুক্ত–ফ্রন্ট ঐ নৌকা প্রতীক দিয়াই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী করিয়াছিল।

কাজেই নির্বাচনে সরকারী দল আওয়ামী লীগের বিরোধী দলের প্রতি উদার হওয়া উচিৎ ছিল। উদার হইতে তাঁরা রাযীও ছিলেন। রেডিও–টেলিভিশনে বিরোধী দল সমূহের নেতাদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেও তাঁদের আপত্তি ছিল না।

কিন্তু পর–পর কতকগুলি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আওয়ামী নেতারা কঠিন হইয়া পড়িলেন।

সরকারী দল হিসাবে দেশের সমস্ত দুর্দশা–দূর্ভাগ্যের জন্য সরকার দায়ী, এই মনোভাব হইতে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হারাইবার যথেষ্ট কারণ ত ছিলই, তার উপর বছরের শুরুতেই ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারিতেই, ভিয়েৎনাম উপলক্ষে

ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলি চালনার দরুন দুইজন ছাত্র নিহত ও অনেক আহত হয়। পরদিন দেশব্যাপী হরতাল হয়। ফলে দৃষ্টতঃই আওয়ামী লীগ ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারায়। মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র-ইউনিয়নই সরকার-বিরোধী এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেছিল। এই কারণেই ছাত্র-লীগের লোকেরা ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের অফিস পোড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া খবর বাহির হয়। তাতেও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়। এই অজন-প্রিয়তা প্রসারিত হয় মফস্বলে সরকারের বর্ডার প্যাক্ট ও পাটনীতি উপলক্ষ করিয়া।

৩. হিসাবে ভুল

এই দৃশ্যমান অজনপ্রিয়তার অতিরঞ্জিত ওভার এস্টিমেট করিলেন উভয় পক্ষই। আওয়ামী লীগাররা ঘাবড়াইলেন। আর বিরোধী পক্ষ উল্লসিত হইলেন। পার্লামেন্টারি রাজনীতির খাতিরে আওয়ামী নেতৃত্ব নির্বাচনে কিছুটা উদার হওয়ার যে ইচ্ছা করিতেছিলেন, পরিস্থিতির এই অতিরঞ্জিত ভুল অর্থের ফলে সে মতের পরিবর্তন হইল। অপর দিকে বিরোধী দল সমূহের মধ্যে একটা যুক্ত-ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা হইতেছিল তা ভণ্ডুল হইয়া গেল। ভাবখানা এই যে আওয়ামী লীগ যেখানে এমনিতেই হারিয়া যাইতেছে, সেখানে বিরোধী পক্ষের ঐক্য ফ্রন্ট করিবার দরকারটা কি? বিরোধী দল সমূহের আস্থা ও জয়ের আশা এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল যে, একুশে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যখন বিশেষ করিয়া মুক্তি-যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার জন্য সুহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভা করিতেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বদলীয় বিরোধী নেতা মওলানা ভাসানী সাহেব পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় সরকার-বিরোধী বক্তৃতা করিতেছিলেন। একই সময়ে এই দুই সভায় দুই জনপ্রিয় নেতা বক্তৃতা করায় কোন সভায় বেশী লোক-সমাগম হইয়াছিল, তা লইয়া তর্ক পর্যন্ত বাধিয়াছিল।

এমন অবস্থায় একদিকে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচারে আরও বেশী জোর দিলেন। অপর দিকে বিরোধী দলসমূহের কোন্ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হইবেন, তাই লইয়া তাঁরা বিতর্কে অবতীর্ণ হইলেন। স্মরণযোগ্য যে, এই সময়ে কথা উঠিয়াছিল স্বয়ং মওলানা ভাসানীও নির্বাচনে দাঁড়াইবেন। বিরোধী দল নির্বাচনে জয়লাভ করিলে জনাব আতাউর রহমান খাঁই প্রধানমন্ত্রী হইবেন, অধিকাংশ দলের মতে এটা ঠিক হইয়াই ছিল। আওয়ামী লীগের কল্পিত আন্‌পপুলারিটি যখন বিরোধী দলসমূহের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন মওলানা সাহেবের দলের এক নেতা প্রকাশ্যভাবেই বলিয়া ফেলিলেন যে মওলানা সাহেবের জন-প্রিয়তার সুযোগ লইয়া যেখানে বিরোধী দল

নির্বাচনে জিতিতেছে, সেখানে মওলানা সাহেব প্রধানমন্ত্রী না হইয়া অপরে প্রধানমন্ত্রী হইবেন কেন?

আমি কিন্তু ঘরে বসিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলাম, আওয়ামী লীগের ডর ও বিরোধী দলের আশা দুইটাই অমূলক। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরংকুশ মেজরিটিই পাইবে। আওয়ামী-বন্ধুদের কাছে মুখে-মুখে যেমন একথা বলিতেছিলাম, কাগযেও তেমনি লিখিতেছিলাম ঃ 'আওয়ামী লীগ শুধু আসন্ন নির্বাচনেই নয়' আগামী পঁচিশ বছরের নির্বাচনে জিতিবে এবং দেশ শাসন করিবে। আমি এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ শাসনকে ভারতের কংগ্রেসের পঁচিশ বছরের আমলের সাথে তুলনা করিয়াছিলাম। লিখিয়াছিলাম, নেহরু-নেতৃত্বের কংগ্রেসের মত মুজিব-নেতৃত্বের আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের পথে দৃঢ় থাকিলেই এটা অতি সহজ হইবে।

এই বিশ্বাসে আমি আওয়ামী-নেতৃত্বকে পরামর্শ দিয়াছিলাম, বিরোধী পক্ষের অন্ততঃ জন-পঞ্চাশেক নেতৃস্থানীয় প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে দেওয়া উচিৎ। তাতে পার্লামেন্টে একটি সুবিবেচক গণতন্ত্রমনা গঠনমুখী অপযিশন দল গড়িয়া উঠিবে।

আমার পরামর্শে কেউ কান দিলেন না। বিরোধী দলসমূহের ঐ নিশ্চিত বিজয়-সম্ভাবনার উল্লাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে অমন উদার হওয়াটা, বোধ হয়, সম্ভবও ছিল না। রেডিও-টেলিভিশনে অপযিশন নেতাদের বক্তৃতা দূরের কথা, যান-বাহনের অভাবে তাঁরা ঠিকমত প্রচার চালাইতেও পারিলেন না। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব হেলিকপ্টারে দেশময় ঘূর্ণীঝড় টুওর করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীরাও সরকারী যান-বাহনের সুবিধা নিলেন।

অপযিশনের স্বপ্ন টুটিল। মওলানা সাহেব অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাথে হাসপাতালে দেখা করিয়া তাঁর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া সর্বশেষ তুরুফ মারিলেন।

নির্বাচনে অপযিশনের ভরাডুবি হইল।

৪. নির্বাচনের ফল ও কুফল

৭ই মার্চ নির্বাচন হইল। ৩০০ সীটের মধ্যে ২৯২টি আওয়ামী লীগ ও মাত্র ৭টি অপরপক্ষ পাইল। একটি সীটে একজন প্রার্থী মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ায় তার নির্বাচন পরে হইল। সেটিও আওয়ামী লীগই পাইল। বিরোধী পক্ষের ৭টির মধ্যে জাসদের ৩, জাতীয় লীগের ১ ও নির্দলীয় ৩ জন নির্বাচিত হইলেন। দুইটি ন্যাপ ও

কমিউনিষ্ট পার্টি কোন সীট পাইল না। জাতীয় লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান খাঁ নির্বাচিত হইয়া তাঁর পার্টির নামটা জীবন্ত রাখিলেন। পরে নির্বাচিত মেম্বরদের ভোটে যে ১৫টি মহিলা আসনের নির্বাচন হইল তার সব কয়টি অবশ্যই আওয়ামী লীগই পাইল। এইভাবে পার্লামেন্টের ৩১৫ জন মেম্বরের মধ্যে ৩০৮ জনই হইলেন আওয়ামী লীগের। মাত্র ৭ জন হইলেন অপযিশন।

এতে আওয়ামী-নেতৃত্বের আরও বেশি সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সে কর্তব্য অবশ্য শুরু হইয়াছিল আগেই। নির্বাচন চলাকালেই। গোড়ার দিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে উভয়-পক্ষের ভ্রান্ত ধারণা থাকার দরুন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব উদার হইতে পারেন নাই। কিন্তু নমিনেশন পেপার বাছাইর দিনেই আওয়ামী লীগের বিপুল জয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। শেখ মুজিব দুটি আসন হইতেই বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলেন। আওয়ামী লীগের আরও ৭ জন প্রার্থী বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলেন। এই সময়ে আওয়ামী নেতৃত্বের উদার হওয়ার কোনও অসুবিধা বা রিস্ক ছিল না। বিরোধী দলসমূহের প্রার্থীদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খাঁ, প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ, ডাঃ আলিমুর রাযী, জনাব নূরুর রহ্‌মান, রাজশাহীর মিঃ মুজিবুর রহ্‌মান, জনাব অলি আহাদ, মিঃ সলিমুল হক খান মিল্কী, মিঃ আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, মিঃ যিলুর রহিম, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মিঃ বযলুস-সাত্তার প্রভৃতি জন-পঁচিশেক অভিজ্ঞ সুবক্তা পার্লামেন্টারিয়ানকে জয়ী হইতে দেওয়া আওয়ামী লীগের ভালর জন্যই উচিৎ ছিল।

তিনশ' পনর সদস্যের পার্লমেন্টে জনা-পঁচিশেক অপযিশন মেম্বর থাকিলে সরকারী দলের কোনই অসুবিধা হইত না। বরঞ্চ ঐ সব অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান অপযিশনে থাকিলে পার্লামেন্টের সৌষ্ঠব ও সজীবতা বৃদ্ধি পাইত। তাঁদের বক্তৃতা বাগ্মিতায় পার্লামেন্ট প্রাণবন্ত, দর্শনীয় ও উপভোগ্য হইত। সরকারী দলও তাতে উপকৃত হইতেন। তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনার জবাবে বক্তৃতা দিতে গিয়া সরকারী দলের মেম্বররা নিজেরা ভাল-ভাল দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হইয়া উঠিতেন। বাংলাদেশের পার্লামেন্ট পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের একটা ট্রেনিং কলেজ হইয়া উঠিত। আর এ সব শুভ পরিণামের সমস্ত প্রশংসা পাইতেন শেখ মুজিব।

৫. আওয়ামী-নেতৃত্বের ভ্রান্ত-নীতি

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এই যে শেখ মুজিব এই উদারতার পথে না গিয়া উল্টা পথ ধরিলেন। এই সব প্রবীন ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানকে পার্লামেন্টে ঢুকিতে না দিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন। জনাব আতাউর রহ্‌মানকে হারাইবার জন্য

আওয়ামী-নেতৃত্ব যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, সেটাকে কিছুতেই নির্বাচন প্রচারণার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক নীতি বলা যায় না। বরঞ্চ আমার বিবেচনায় সেটা ছিল খোদ আওয়ামী লীগের জন্যই আত্মঘাতী। তাঁর মত ধীরস্থির অভিজ্ঞ গঠনাত্মক চিন্তাবিদ পার্লামেন্টের অপযিশন বেঞ্চের শুধু শোভা বর্ধনই করেন না, সরকারকে গঠনমূলক উপদেশ দিয়া এবং গোটা অপযিশনকে পার্লামেন্টারি রীতি-কানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এমন একজন ব্যক্তিকে পার্লামেন্টে ঢুকিতে না দিবার সর্বাত্মক চেষ্টা আওয়ামী নেতৃত্ব কেন করিলেন, তা আমি আজও বুঝিতে পারি নাই। কারণ এমন চেষ্টা যে মনোভাবের প্রকাশ, সে মনোভাব পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সাফল্যের অনুকূল নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ পার্লামেন্টারি নেতা কিছুতেই এমন আত্মঘাতী নীতির সমর্থক হইতে পারেন না। যদি খোদা-না-খাস্তা শেখ মুজিব কোনও দিন তেমন মনোভাবে প্রভাবিত হন, তবে সেটা হইবে দেশের জন্য চরম অশুভ মুহূর্ত।

কিন্তু আমি দেখিয়া খুবই আতংকিত ও চিন্তাযুক্ত হইলাম যে নির্বাচন চলাকালে আওয়ামী নেতৃত্ব অপযিশনের প্রতি যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেটা সাময়িক অবিবেচনা-প্রসূত ভুল ছিল না। তাঁরা যেন নীতি হিসাবেই এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্বাচনের ফলে অপযিশন একরূপ শূন্যের কোঠায় পৌঁছিয়াছিল। কয়েকটি দলের এবং নির্দলীয় মেম্বর মিলিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁরা হইলেন মাত্র ৮ জন। অপযিশন ছাড়া পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ হয় না। কাজেই এই ছিন্ন-ভিন্ন অপযিশনকে লালন করিয়া আমাদের আইন সভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেন্টের রূপ ও প্রাণ দিবার চেষ্টা শাসক দলেরই অবশ্য কর্তব্য ছিল। শাসক দল সে কর্তব্য পালন ত করিলেনই না, ভিন্ন-ভিন্ন দলের মেম্বররা নিজেরাই যখন একত্রিত হইয়া জনাব আতাউর রহমানকে লিডার নির্বাচন করিলেন, তখনও সরকারী দল তাঁকে লিডার-অব-দি অপযিশন স্বীকার করিলেন না। নির্বাচনের পরে ন মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হইয়াছে। এর মধ্যে পার্লামেন্টের দুই-দুইটা অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে। তবু আমাদের পার্লামেন্টে কোন লিডার-অব-দি-অপযিশন নাই। তার মানে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রীতি-অনুসারে আমাদের আইন-পরিষদ আজও পার্লামেন্ট হয় নাই। যা হইয়াছে, সেটা আসলে একদলীয় আইনসভা। এটা নিশ্চিতরূপে অশুভ। প্রশ্ন জাগেঃ আমরা কি একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছি? কিন্তু তা বিশ্বাস করিতে মন চায় না। কারণ এটা শুধু আওয়ামী লীগের বিঘোষিত মূলনীতি-বিরোধীই নয়, তার নির্বাচনী প্রতীক নৌকারও তাৎপর্য-বিরোধী। নৌকা চালাইতে যেমন দুই কাতারের দাঁড়ী লাগে, গণতন্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালনায়ও তাই লাগে। যদি কোনও দিন নৌকার সব

দাঁড়ি এক পাশে দাঁড় টানিতে শুরু করে, তবে সেদিন নৌকা আর যানবাহন থাকিবে না। হইবে সেটা মিউযিয়মের দর্শনীয় বস্তু।

৬. ভোটারদের কর্তব্য ও দায়িত্ব

এই অবস্থার জন্য আওয়ামী লীগ–নেতৃত্ব যতটা দায়ী, আমাদের ভোটারদের, জনগণের, দায়িত্ব তার চেয়ে কম নয়। বাংলাদেশের ভোটাররা রাজনীতিক জ্ঞানে সচেতন বলিয়া একটা কথা আছে। পার্লামেন্টের নির্বাচনে তাঁদের আরও সচেতন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ভোট দেওয়া উচিৎ ছিল। গণ–ঐক্যের ভাবাবেগে এই নির্বাচনে সকলের একই পার্টিকে ভোট দেওয়া যে পরিণামে ভোটারদের জন্যই ক্ষতিকর, এটা তাঁদের বোঝা উচিৎ ছিল। একদলীয় শাসনই পরিণামে ব্যক্তি–স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। তেমন শাসনে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় এটা ধরিয়া নিলেও জাতির মানস ও মননশীলতার যে ক্ষতি হয় তা অপূরণীয়। ভোটারদেরে এ কথা বুঝাইয়া দিবার লোকের অভাব ছিল না। বিরোধী দলের প্রার্থী ও নেতারা ত বুঝাইয়াছিলেনই আমার মত নিরপেক্ষ রাজনৈতিক হরিঠাকুরও এটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি 'ইত্তেফাকে' লিখিয়াছিলামঃ '৭০ সালের নৌকা ও এবারকার নৌকার মৌলিক পার্থক্য আছে। ৭০ সালেরটা ছিল চড়িবার নৌকা। এবারকারটা চালাইবার নৌকা। নৌকা চালাইতে ডাইনে–বাঁয়ে দুই সারি দাঁড়ি লাগে। নৌকার হাইল ধরিবেন শেখ মুজিব নিজেই ঠিকই, কিন্তু দাঁড়ী হইবেন দুই কাতারের। সব দাঁড়ী একদিক হইতে দাঁড় টানিলে নৌকা সামনে চলিবার বদলে ঘুরপাক খাইয়া ডুবিতে পারে।'

এই পার্টিকে সব ভোট দেওয়ার বিরুদ্ধে এরচেয়ে বড় হুঁশিয়ারি আর কি হইতে পারে? হুশিয়ারি ছাড়া ভোটারদের সমর্থনে তাঁদের রাজনৈতিক চেতনার প্রমাণস্বরূপও, অনেক কথা বলিয়াছিলাম। এবারকার নির্বাচনের প্রাক্কালে অনেক রাষ্ট্র–দার্শনিক ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন ঃ 'বাংলাদেশের ভোটাররা বরাবর এক বাক্সে ভোট দেন,' আর 'তাঁরা বরাবর সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেন।' আমি ঐ সব রাজনৈতিক গণকদের কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তাঁরা '৪৬ সাল, '৫৪ সাল ও '৭০ সালের নির্বাচনের নযির দিয়া তাঁদের কথার সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি তাঁদের কথার প্রতিবাদে বলিয়াছিলাম, ঐ তিন সালের কোনওটাই সরকার গঠনের মামুলি নির্বাচন ছিল না। সেগুলি ছিল মূলনীতি নির্ধারণের ভোট। '৪৬ সালেরটা পাকিস্তান বনাম অখণ্ড ভারতের ভোট, ৫৪ সালের একুশ দফা ও ৭০ সালের ছয় দফা উভয়টাই ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বনাম স্ট্রংসেন্টারের ভোট। ঐ সব নির্বাচনে এক বাক্সে ভোট না

দিয়া উপায় ছিল না। কারণ উভয়টাই ছিল জনগণের দাবি। কিন্তু '৭৩ সালের নির্বাচনে ঐ ধরনের কোন মূলনীতি নির্ধারণের প্রশ্ন ছিল না। ওটা ছিল নিতান্তই সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনের প্রশ্ন। অবশ্য কোন-কোনও আওয়ামী নেতা এই নির্বাচনকে সদ্য রচিত সংবিধানের র‍্যাটিফিকেশনের ভোট আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাতেও ভোটারদের কর্তব্যের কোনও ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম ঘটিবার কথা ছিল না। আওয়ামী লীগ নিরংকুশ মেজরিটি পাইলেই তাঁরা সরকারও গঠন করিতে পারিতেন ; সংবিধানটাও কার্যতঃ র‍্যাটিফাইড্ হইয়া যাইত। এক বাক্সে সব ভোট পড়িবার, প্রকারান্তরে অপযিশন ক্রাশ করিয়া পার্লামেন্টকে 'ঠুটো জগন্নাথ' করিবার, কোনও দরকার ছিল না। বাংলাদেশের ভোটাররা এবার তাই করিয়াছেন। নির্বাচিত সরকাররা যে সব ভুল করেন, গণতন্ত্রের বিচারে সে সব ভুলের জন্যও ভোটাররাই দায়ী। আর ভোটাররা নিজেরা যে ভুল করেন, তার জন্য দায়িত্ব বহন ও ফলভোগ তাঁদের করিতেই হইবে।

উপাধ্যায় দশ

কালতামামি

১. কাল তামামির সময় আসে নাই

পাঠক, আগের অধ্যায়ে যে কালতামামি পড়িয়াছেন, এটা কিন্তু তেমন কালতামামি না। আগের-আগের কালতামামিগুলি ছিল কালের বা যুগের হিসাব-নিকাশ। আর এখানে যে যুগের কথা বলিতেছি, তার হিসাব-নিকাশ করিবার সময় আজও আসে নাই। এ যুগের দুইটা স্তর। আসলে একই যুগের এপিঠ-ওপিঠ। এক স্তরে লাহোর প্রস্তাবের পঁচিশ-বছর স্থায়ী বিট্রেয়ালের অবসান; অপর স্তরে নয়া যুগের শুরু। লাহোর প্রস্তাবের বিট্রেয়াল-সম্পর্কে ইতিপূর্বেই অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমিও করিয়াছি। আমার সম্প্রতি-প্রকাশিত বাংলা বই 'শেরে বাংলা হইতে বংগবন্ধু' ও ইংরাজী বই End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution এ সম্ভাব্য সকল দিক হইতে এই স্তরের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সে সবের পুনরুক্তি করা উচিৎ হইবে না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাহোর-প্রস্তাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর বেশী কিছু নয়।

আর এই যুগের অপর পৃষ্ঠাকে আমাদের জাতীয় জীবনের নয়া যমানা বলিয়াছি। এটা আমাদের স্বাধীনতার যুগ। এ যুগ শুরু হইয়াছে মাত্র। এই স্বাধীনতারই আবার অনেক দিক। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, কৃষ্টিক বা সাহিত্যিক স্বাধীনতা, জাতীয় ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভের স্বাধীনতাঃ এই সবের সমন্বিত প্রকাশ ও বিকাশের নামই স্বাধীনতা। লাহোর প্রস্তাবের বিট্রেয়ালটা প্রমাণিত হইতে এবং সে বিট্রেয়ালের অবসান ঘটানোর মত নিগেটিভ কাজটা করিতেই দীর্ঘ পঁচিশ বছর লাগিয়াছে। লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ও রূপায়নের মত পযিটিভ কাজ করিতে তার চেয়ে দীর্ঘতর সময় লাগিলেও তাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। অথচ আমাদের স্বাধীনতার আজ মাত্র দুই বছর সমাপ্ত হইতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি আমরা অনেক করিয়াছি। কিন্তু ভাল কাজও কম করি নাই। কল্পনাতীত ও আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দেশকে একটি শাসনতান্ত্রিক সংবিধান দিয়াছি। পার্লামেন্টারি শাসন পদ্ধতিকে দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আঠার বছর বয়স্ককে ভোটাধিকার দিয়া আমরা গণতন্ত্রকে গণের দিকে প্রসারিত করিয়াছি। দুই বছরের ইতিহাসটা কম কৃতিত্বের রেকর্ড নয়। কিন্তু এটা শুরু মাত্র। সমস্যা আমাদের

অনেক বলিয়াই দায়িত্বও আমাদের বেশী। করণীয় আমাদের অনেক। আমাদের গরিবের সংসার। গরিবের সংসার বলিয়াই সমস্যাও আমাদের অনেক। শুধু সংখ্যায় নয়। বিস্তৃতি ও গভীরতায়ও। শুধু ভিতরের নয়, বাহিরেরও। শুধু দেহের নয়, মনেরও। শুধু পায়ের নয়, মাথারও। শুধু চলার নয়, চিন্তারও। এমন সর্বব্যাপী সমস্যার সমাধান কেউ দুই বছরে আশা করিতে পারেন না। ঠিক পথে চলিয়াছি কি না, সেটাই আমাদের বিচার্য। যদি তা করিয়া থাকি, তবে 'ওয়েল বিগান হাফ্ ডান।' এই ওয়েল বিগানের পথে যদি কোনও বাধা, বিভ্রান্তি বা কন্টক সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে সেটা অবশ্যই সর্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। এমন কয়টি বিভ্রান্তি সত্যই সৃষ্টি হইয়াছে। সেগুলিকে কন্টক বলা যায়। সে কয়টির দিকে দেশবাসীর, রাষ্ট্র–নায়কদের এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই কালতামামির উদ্দেশ্য।

২. জাতীয় ক্ষতিকর বিভ্রান্তি

এইসব বিভ্রান্তির মধ্যে প্রধান এইঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তান ভাংগিয়া গিয়াছে ; 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।' এটা সাংঘাতিক মারাত্মক বিভ্রান্তি। অন্যান্য ক্ষতিকর বিভ্রান্তি মোটামুটি এটা হইতেই উদ্ভূত। এই বিভ্রান্তির সর্বপ্রথম ও প্রত্যক্ষ কুফল এই যে, এতে ভারত সরকারকে নাহক ও মিথ্যা বদনাম পোহাইতে হইতেছে। পাকিস্তান যদি ভাংগিয়া থাকে, তবে ভারতই ভাংগিয়াছে। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হাসিলে ভারত সরকার সক্রিয় ও সামরিক সাহায্য করিয়াছেন। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' যদি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে '৪৭ সালের ভারত বাঁটোয়ারার আর কোনও জাস্টিফিকেশন থাকিতেছে না। কোরিয়া ভিয়েৎনাম ও জার্মানির মতই ভারতেরও পুনর্যোজনের চেষ্টা চলিতে পারে। ভারতবর্ষের বেলা সে কাজে বিলম্ব ঘটিলেও বাংলার ব্যাপারে বিলম্বের কোন কারণ নাই। উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পক্ষে এই ধরনের কথা ও চিন্তা যে কত মারাত্মক, 'বিদগ্ধ' পণ্ডিতেরা তা না বুঝিলেও ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্র–নায়করা তা বুঝিয়াছেন। তাই উভয় পক্ষই কালবিলম্ব না করিয়া এ বিষধর সাপের মাথা ভাংগিয়া দিয়াছেন। ভারত সরকার এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া পশ্চিম প্রান্তে একতরফাভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়া পাকিস্তানের দিকে মৈত্রীর হাত বাড়াইয়াছেন। ওদিককার দখলিত ভূমি ও যুদ্ধবন্দী ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর এদিকে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। বাংলাদেশের মাটি হইতে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করিয়াছেন। বাংলাদেশের সাথে মৈত্রী ও বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছেন। বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মেম্বর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে আমাদের প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম সুযোগেই ঘোষণা করিয়াছেন ঃ 'বৃহত্তর বাংলা গঠনের কোনও ইচ্ছা আমার

নাই। পশ্চিমবংগ ভারতেই থাকিবে। আমার দেশের বর্তমান চৌহদ্দি লইয়াই আমি সন্তুষ্ট। অন্যের এক ইঞ্চি জমিও আমি চাই না।'

বাংলাদেশ-নেতৃত্ব আরো একটা ভাল কাজ করিয়াছেন। বাংগালী জাতির সংখ্যা-সীমা নির্দেশ করিয়াছেন সাড়ে সাত কোটি। এটা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের লোক-সংখ্যা। এই ঘোষণার দরকার ছিল। আমাদের বাংগালী জাতীয়তার মূলনীতিতে ভারতের আতংকিত হইবার কারণ ছিল। ভারতে পাঁচ-ছয় কোটি নাগরিক আছেন যাঁরা গোষ্ঠী গোত্র ও ভাষায় বাংগালী। এঁরা এককালে ছিলেন সারা ভারতের চিন্তা-নায়ক। রাজনীতিতেও তাঁরা সারা ভারতকে নেতৃত্ব দিয়াছেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কংগ্রেস-নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তা গ্রহণ করিবার আগেতক এঁরা বাংগালী জাতীয়তার, বাংগালী কৃষ্টির, বাংলার স্বাতন্ত্র্যের মুখর প্রবক্তা ছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তার বৃহত্তর উপলব্ধিতে সেদিনকার সে বাংগালী-ভাষাবেগের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় এবং সে রাষ্ট্রের বাংগালী জাতীয়তাবাদের স্লোগানে ভারতীয় বাংগালীদের মধ্যে 'যুক্ত-বাংলা' ও 'বৃহত্তর-বাংলার' আকর্ষণে বিভ্রান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। এমনিতেই পূর্ব-ভারতে একটু অস্থিরতা বিরাজ করিতেছে। তার উপর বাংগালী জাতীয়তার আবেগের ছোঁয়াচ লাগিতে দেওয়া উচিত হইবে না। এই কারণেই বাংগালী জাতীয়তার ব্যাপারে ভারত একটু সতর্ক। আমাদের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির এক নীতি জাতীয়তায় তাই ভারত সরকারের অনীহা। ভারত সরকারের দলিল-দস্তাবেযে, নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে আমাদের মূলনীতির তিনটার উল্লেখ থাকে। জাতীয়তাবাদের উল্লেখ থাকে না। বাংলাদেশের নেতৃত্ব ভারত সরকারের ও ভারতীয় নেতৃত্বের এই ইশারা বুঝিয়াছেন। তাই ঐ 'সাড়ে সাত কোটি বাংগালী'র উল্লেখ। বস্তুতঃ ভারতীয় বাংগালীরা আর রাজনৈতিক অর্থে নেশন নন। তাঁরা এখন ভারতীয় নেশন। বাংগালীর পলিটিক্যাল নেশনহুডের ওয়ারিসি এখন ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের উপর বর্তাইয়াছে।

৩. লেজের বিষ

উভয় রাষ্ট্রের এই সুস্পষ্ট দৃঢ়তার লগুড়াঘাতে বিভ্রান্তির সাপের মাথাটা গুড়া হইয়াছে সত্য। কিন্তু সাপ আজও তার লেজ নাড়িতেছে। এবং সাপের বিষ লেজে। তাই উভয় রাষ্ট্রের কোনও কোনও অরাজনীতিক ও 'বিদগ্ধ' বুদ্ধিজীবীরা 'পাকিস্তান ভাংগা'র ও 'দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতা'র একাডেমিক ও থিওরেটিক্যাল 'নির্ভুলতা' আজও কপ্‌চাইয়া যাইতেছেন। এই সব বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিসহ মন-অন্তর ও কলিজা দগ্ধ হইলেও তাঁদের মুখটা দগ্ধ হইতে এখনও বাকী আছে। তাই তাঁদের মুখে 'শাশ্বত

বাংলা', 'প্রবহমান বাংলা,' 'সোনার বাংলা', 'হাজার বছরের বাংলা,' 'গুরুদেবের বাংলা,' 'বাংলার কৃষ্টি,' 'বাংলার ঐতিহ্য,' ইত্যাদি নিতান্ত ভাবাবেগের কবিত্বপূর্ণ কথাগুলিও রাজনৈতিক চেহারা লইয়া দেশে-বিদেশে বিষ ছড়াইতেছে। আমাদের দিক হইতেও 'বংগবন্ধু', 'জয় বাংলা,' 'সোনার বাংলা,' 'কবিগুরুর বাংলা,' 'রূপসী বাংলা' ইত্যাদি প্রতিধ্বনি করিয়া 'এপার-বাংলা–ওপার-বাংলার' ব্যাপারটাকে দুইটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সীমান্তরেখা মসিলিপ্ত হইতে দিতেছি। আমাদের বিশেষ পরিস্থিতি ও অবস্থা, আমাদের বাংগালী জাতীয়তাবাদ, আমাদের ধর্ম–নিরপেক্ষতা, আমাদের জাতীয় সংগীত ও ভারতীয় জাতীয় সংগীত একই কবিগুরুর রচনা হওয়াটারও বিকৃতি করণের সুযোগ করিয়া দিতেছে। পাকিস্তানসহ দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যে আজও আমাদের দেশকে স্বীকৃতি দিতেছে না, আমাদের দেশবাসীসহ দুনিয়ার সব মুসলমানরা যে ভারত সরকারের প্রতি নাহক ও অন্যায় বৈরীভাব পোষণ করিতেছে, তার প্রধান কারণও এই বিভ্রান্তি।

অথচ প্রকৃত অবস্থাটা এই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাংগে নাই; 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর–প্রস্তাব মত দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নামই পাকিস্তান হয় নাই, তাতেও বিভ্রান্তির কারণ নাই। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু 'মুসলিম–মেজরিটি রাষ্ট্রের' উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র–নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্র–নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান'। আমরা পূরবীরা রাখিয়াছি বাংলাদেশ। এতে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নাই।

৪. অবিলম্বে কি করিতে হইবে?

অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া নর্মাল অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। পাকিস্তান–বাংলাদেশ পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়া তিন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে আপোস আলোচনার মাধ্যমে নয়া ও সাবেক সমস্ত বিবাদ–বিতর্ক মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। যুদ্ধ–বন্দীদের মুক্তি দিয়া আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ১০ই জানুয়ারির বিঘোষিত উদার–নীতি কার্যকর করিবে বাংলাদেশ। আর পঁচিশ বছরের না হোক, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জায়দাদের অংশ দিয়া বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে সাহায্য করিবে পাকিস্তান। পঁচিশ বছরের এজমালী সংসারের লেনদেনে দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক যে পারস্পরিকতা গড়িয়া উঠিয়াছে, আজ দুই সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সেই পারস্পরিকতাকে জনগণের

উপকারে লাগাইতে হইবে। লড়াই করিয়া পাকিস্তান-বাংলাদেশ পৃথক হইয়াছে বলিয়াই তাদের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা হইবে না, এটা কোন কাজের কথা নয়। মার্কিন মুলুক ও ইংলণ্ড লড়াই করিয়াই পৃথক হইয়াছিল। লড়াইর সে তিক্ততা, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি, প্রতিশোধের স্পৃহা, ক্ষয়ক্ষতির ধ্বংস লীলা, কোনোটাই ইংগ-মার্কিন মৈত্রী ও সহযোগিতায় বাধা দিতে পারে নাই। যুদ্ধশেষে তারা এমন মিত্র হইয়াছে যে দুই শ বছরের সুদীর্ঘ মুদ্দতও সে-মৈত্রী ও সহযোগিতায় ফাটল ধরাইতে পারে নাই। পাক-বাংলাদেশ সম্পর্ক তেমন হইতে পারে।

শিমলা চুক্তি এ সব ব্যাপারে হইবে একটি আদর্শ দলিল। এটা দৃশ্যতঃ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত হইলেও কার্যতঃ এটা তিন রাষ্ট্রেরই চুক্তিপত্র। এর মধ্যে গোটা উপমহাদেশের কল্যাণের পন্থা নির্ধারিত ও নির্দেশিত হইয়াছে। এই চুক্তি আন্তরিকতার সাথে কার্যকর করিলেই স্পিরিট-অব-পার্টিশন বাস্তবায়িত হইবে। উপমহাদেশের চিরস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রীর যে মহা পরিকল্পনা লইয়া '৪৭ সালে ভারত বর্ষ ভাগ হইয়াছিল, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে উন্নতি অগ্রগতির যে সোনালী স্বপ্ন দেখিয়া কংগ্রেস-নেতৃত্বে হিন্দুরা দেশের তিন-চতুর্থ মেজরিটি হইয়াও এক-চতুর্থ মাইনরিটি মুসলমানদের দাবিতে দেশ ভাগ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সেই স্পিরিটকে পুনরুজ্জীবিত ও বাস্তবায়িত করিয়া সেই সোনালী স্বপ্নকে সফল করিতে হইবে। পঁচিশ বছরের পাক-ভারত সহযোগিতা যে স্পিরিট-অব-পার্টিশন রূপায়িত করিতে পারে নাই, আজ বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের সহযোগিতা সেটাকে বাস্তবায়িত করিবেই। তিন রাষ্ট্রের মধ্যে এই দৃঢ় মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। স্পিরিট-অব-পার্টিশন বাস্তবায়নের পঁচিশ বছরের ব্যর্থতা হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। অপরের কাঁধে দোষ চাপাইয়া সে ব্যর্থতার কৈফিয়ত দিলে চলিবে না। দোষ নিশ্চয়ই উভয় পক্ষেরই আছে। অপর পক্ষ দেখাইয়া দিবার আগেই যদি আমি নিজের দোষ বুঝিতে পারি, তবে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়। উভয় পক্ষেরই এই সুবিধার কথাটা আগে পশ্চিম ফ্রন্টে প্রয়োগ করা যাক।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার স্থায়ী শান্তির কাঁটা জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যা। পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা উভয় পক্ষকে বাস্তববাদী হইবার ইংগিত দিতেছে। পাকিস্তানকেও স্বীকার করিতে হইবে, তার পক্ষে জাতিসংঘের প্রস্তাব পঁচিশ বছরেও কাজে লাগে নাই। ভারতকেও স্বীকার করিতে হইবে, শুধু দখলটাই ন্যায় সৃষ্টি করে না, শান্তি প্রতিষ্ঠা ত করেই না। কাজেই উভয় পক্ষকেই কাশ্মির বাটোয়ারায় রামি হইতে হইবে। নেহরুজী বাঁচিয়া থাকিলে '৬৫ সালের যুদ্ধের আগেই এটা মিটিয়া যাইত। নেহরু-আইউবের মধ্যে কাশ্মির বাঁটোয়ারার যে স্কিম প্রায় গৃহীত হইয়া

গিয়াছিল, সেই ধরনের কিছু–একটা পুনরায় বিবেচনা করিতে হইবে। উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তির যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব '৪৭ সালে ভারত বর্ষ–বাটোয়ারায় রাযি হইয়াছিলেন, সেই মহান উদ্দেশ্যের সাফল্যকে নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনেই কাশ্মির–বাটোয়ারায় রাযি হইতে হইবে। এটা না করাকেই আমি ১৯৫৭ সালে পণ্ডিত নেহরুর কাছে 'শান্তির জন্য গাছ–বাটোয়ারার পর পাতা-পুতুড়ি লইয়া অশান্তি জিয়াইয়া রাখার' সাথে তুলনা করিয়াছিলাম। পণ্ডিতজীর নামটা যখন উঠিয়াই পড়িল, তখন শুধু কাশ্মীর সম্পর্কে কেন, বাংলা সম্পর্কেও তাঁর চিন্তা ধারার সাথে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। 'এপার বাংলা–ওপার–বাংলার' প্রগতিবাদীদের জন্যই এটা বেশী দরকার। এ সম্পর্কে এই বই–এর চব্বিশা অধ্যায়ের 'ভারত সফরের' ৪৪১ পৃষ্ঠায়' নেহরুর সাথে নিরালা তিনঘন্টা' শীর্ষক অনুচ্ছেদটির দিকে আমি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সেখানে দেখিবেন, পণ্ডিতজীর মতে 'ভারত নিজের স্বার্থেই দুই বাংলার একত্রীকরণের বিরোধী।' এই বিরোধের কারণ সুস্পষ্ট। 'যুক্ত বাংলা' স্বাধীন সার্বভৌমই হউক, আর ভারত ইউনিয়নের অংগ–রাজ্যই হউক, উভয়টাই সংঘাতের পথ। বাস্তবতার বিচারে ওটা অসম্ভব, ভারত–বাংলাদেশ-মৈত্রীর দিক হইতে অবাঞ্ছনীয়, উপ–মহাদেশীয় শান্তির পরিপন্থী। এ সব জানিয়াও যাঁরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও অপর স্বাধীন রাষ্ট্রের একটা অংগ–রাজ্যকে সমমর্যাদার স্তরে আনিয়া কথা বলেন, তাঁরা সাধারণভাবে উপমহাদেশীয় শান্তির বিরুদ্ধে ও বিশেষভাবে ভারত–বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেন। উভয় রাষ্ট্রের শান্তিবাদী দেশপ্রেমিকদেরই এটা বিষবৎ পরিত্যজ্য। পূর্বাঞ্চলের স্থাপিত শান্তির বিরুদ্ধে নতুন উস্কানি না দিয়া অবশিষ্ট বিরোধ মিটানোর দিকেই সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। কাশ্মির–প্রশ্নটাই এই অবশিষ্ট বিরোধ। এর সমাধান–চেষ্টাই পুনঃপুনঃ করা উচিৎ। ১৯৬২ সালে যেটা হইতে–হইতে হয় নাই, ১৯৭৩ সালে সেটা হইতে পারে। দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতেই আপোস হইয়া যাইবার পরিবেশ এখন সৃষ্টি হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে এমন মহৎ কাজে বাংলাদেশ মধ্যস্থতা করিতে পারে। উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তিতে তিনটি রাষ্ট্রেরই স্বার্থ সমভাবে জড়িত। এ অবস্থায় বাংলাদেশ–পাকিস্তান বিরোধ মিটাইতে ভারত, ভারত–পাকিস্তান বিরোধ মিটাইতে বাংলাদেশ এবং ভারত–বাংলাদেশ বিরোধ মিটাইতে পাকিস্তান আগাইয়া আসিবে, এটা শুধু স্বাভাবিক নয়, পারস্পরিক কর্তব্যও বটে।

:

৫. বাংলাদেশের কৃষ্টিক স্বকীয়তা

পূর্ব–প্রান্তের সমস্যাটা রাজনৈতিক না হইলেও তার গুরুত্বও কম নয়। ইংরাজ আমলের দুই শ' বছর আজকার বাংলাদেশ ছিল কলিকাতার হিন্টারল্যাণ্ড। কাঁচামাল

সরবরাহের খামার বাড়ি। পঁচিশ বছরের পাকিস্তান আমলে এই খামারে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কিছু শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু কৃষ্টিক স্বকীয়তা আজিও গড়িয়া উঠে নাই। পাকিস্তান সরকারের এদিককার চেষ্টা ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিম-পাকিস্তানী কৃষ্টি চালাইবার অপচেষ্টা, পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব কালচার উন্নয়নের কোনও চেষ্টা হয় নাই। বাংগালী মুসলমানদের যে নিজস্ব কোনও কালচার আছে, সে উপলব্ধিই পশ্চিমা শাসকদের ছিল না। তাঁরা বাংলা ভাষাকে যেমন হিন্দুর ভাষা মনে করিতেন, বাংলার কৃষ্টি অর্থেও তেমনি হিন্দু কৃষ্টি বুঝিতেন। পাঞ্জাবী-সিন্ধী ভাষা-কৃষ্টির মতই বাংলাদেশেও একটা মুসলিম-প্রধান দৈশিক ভাষা-কৃষ্টি গড়িয়া উঠিতে পারে তা যেন তাঁদের মাথায় ঢুকেই নাই। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্য এখন যেমন তাকে অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর করিবে, নিজস্ব কৃষ্টি সাহিত্যেও তেমনি এ দেশ জাতীয় স্বকীয়তা লাভ করিবে। বাংলাদেশ আর আগের মত কলিকাতার সাহিত্য-কর্মের বাজার থাকিবে না।

বাংলাদেশের জাতীয় রূপ ও তার শিল্প-সাহিত্যের প্রাণ ও আংগিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে গত ছয়শ বছরের বাংলার ইতিহাসকে দুইভাগে বিচার করিতে হইবে। ইংরাজ আমলের দুই শ বছর বাংগালী মুসলমানদের অন্ধকার যুগ। এই যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাদের কোনও অবদান বা শরিকি নাই। এটা সম্পূর্ণভাবে একক হিন্দুদের সাহিত্য-সংস্কৃতি। এই যুগের মুসলমানদেরে দেখিয়াই হিন্দু লেখক-সাহিত্যিকরা বলিয়া থাকেনঃ 'বাংগালী মুসলমানদের কাছে একটি মাত্র কালচার-তার নাম এগ্রিকালচার।' এ অবস্থায় 'বাংগালী কালচার', 'বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি' বলিতে তাঁরা যে হিন্দু-বাংলার সংস্কৃতি বুঝিয়া থাকেন, তাতে তাঁদেরে দোষ দেওয়া যায় না। সে কালচার যে অবিভাজ্য, তাও সত্য কথা। কারণ সে কালচারের হেঁসেল শ্রীকান্তের টগর বৈষ্টবীর হেঁসেলের মতই অলংঘ্য।

কিন্তু ইংরাজ আমলের আগের চারশ বছরের বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। সেখানেও তাদের রূপ বাংগালী রূপ। সে রূপেই তারা বাংলাভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। সেই রূপেই বাংলার স্বাধীনতার জন্য দিল্লীর মুসলিম সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। সেই রূপেই বাংলার বার ভূঁইয়া স্বাধীন বাংলা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন। এই যুগ বাংলার মুসলমানদের রাষ্ট্রিক, ভাষিক, কৃষ্টিক ও সামরিক মনীষা ও বীরত্বের যুগ। সে যুগের সাধনা মুসলিম নেতৃত্বে হইলেও সেটা ছিল উদার অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু-বৌদ্ধরাও ছিল তাতে অংশীদার। এ যুগকে পরাধীন বাংলার রূপ দিবার উদ্দেশ্যে 'হাজার বছর পরে আজ বাংলা স্বাধীন হইয়াছে' বলিয়া যতই গান গাওয়া ও স্লোগান দেওয়া হউক, তাতে বাংলাদেশের জনগণকে ভুলান

যাইবে না। আর্য্য জাতির ভারত দখলকে বিদেশী শাসন বলা চলিবে না; তাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, কায়েস্থকে বিদেশী বলা যাইবে না, শুধু শেখ সৈয়দ-মোগল-পাঠানদেরেই বিদেশী বলিতে হইবে, এমন প্রচারের দালালরা পাঞ্জাবী দালালদের চেয়ে বেশী সফল হইবে না। এটা আজ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সর্বজন-স্বীকৃত সত্য যে, কৃষ্টিক স্বকীয়তাই রাষ্ট্রীয় জাতীয় স্বকীয়তার বুনিয়াদ। কাজেই নয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশের কৃষ্টিক স্বকীয়তার স্বীকৃতি উপমহাদেশের তিন জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌম সমতা-ভিত্তিক স্থায়ী শান্তির ভিত্তি হইবে।

৬. উপমহাদেশীয় ঐক্যজোট

এইভাবে তিনটি জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যকার সাবেক ও বর্তমান বিরোধসমূহ এবং ভবিষ্যৎ বিরোধের সম্ভাবনা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মিটাইয়া ফেলিবার পরই আমাদের প্রকৃত গঠনমূলক কাজ শুরু হইবে। তিনটি রাষ্ট্র আজ নিজ-নিজ প্রতিরক্ষার নামে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেছে, তার আর দরকার থাকিবে না। সে অর্থ অতঃপর জনগণের সেবায় নিয়োজিত হইবে। উপমহাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে তখন সামগ্রিকভাবে বিচার করিবার সময় আসিবে। সমবেত বৈজ্ঞানিক কারিগরি উপায়ে সে সম্পদের সমবায়িত সদ্ব্যবহার হইবে। শুরু হইবে সেটা উপমহাদেশের অর্থনৈতিক জোটে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিটি ধরনের ঐক্য-জোট হইবে আমাদের মডেল। এটা সফল হইলে চোরাচালান ও কালোবাজারি ইত্যাদি উপমহাদেশীয় অনেক অর্থনৈতিক সমস্যারই সমাধান হইবে। পরিণামে এই ঐক্য-জোটে শ্রীলঙ্কা, বার্মা, নেপাল, ভূটান, সিকিম ও আফগানিস্তান আকৃষ্ট হইবে। আকৃষ্ট তাদের হইতেই হইবে। শান্তি-নিরাপত্তা তাদেরও দরকার। শান্তি আসিতে পারে ঐক্য-জোটের মাধ্যমেই। মনে রাখিতে হইবে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াইবার একমাত্র উপায় বিশ্ব-শান্তি। বিশ্ব-শান্তি বড় কাজ। এক ধাপে তা আসিবে না। আঞ্চলিক শান্তি হইতে মহাদেশীয় শান্তি এবং মহাদেশীয় শান্তি হইতেই বিশ্ব-শান্তি। তাই বিশ্ব-নেতৃত্ব আজ আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার ধারণাটা মানিয়া লইয়াছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে তার আলোচনা করিব। এখানে শুধু আঞ্চলিক শান্তির কথাই বলিতেছি। আঞ্চলিকই হউক আর বিশ্বই হউক শান্তির বড় শত্রু অস্ত্র নির্মাতা ও অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। অস্ত্র-শিল্প যাদের কায়েমী স্বার্থ হইয়া গিয়াছে, শান্তি তাদের স্বার্থ-বিরোধী। রোগ-ব্যাধি না থাকিলে ডাক্তার-ফার্মেসীর যে দশা, মামলা-মোকদ্দমা না থাকিলে উকিল-টাউটদের যা অবস্থা, যুদ্ধ না থাকিলে অস্ত্র-শিল্পপতিদেরও সেই অবস্থা। সৌভাগ্যবশতঃ উপমহাদেশের তিন রাষ্ট্র ও তাদের উপরোল্লিখিত পড়শীদের কেউই আমরা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে আজো 'শিল্পোন্নত' হই নাই। যুদ্ধ ফেলিয়া শান্তি ধরিবার এটাই আমাদের মাহেন্দ্র ক্ষণ। এটা-এখন আমাদের লাভের কারবার। আমাদের মধ্যে অস্ত্র-নির্মাণের

কায়েমী স্বার্থ একবার গড়িয়া উঠিলে শান্তি-স্থাপন হইবে তখন লোকসানের কারবার। শান্তির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দানা বাঁধিবে তার পরিণতি খুবই শুভ হইবে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ধারাটি যেমন রাজনৈতিক ঐক্যের দিকে হাত বাড়াইতেছে, আমাদের ঐক্য-জোটও তেমন পরিণতি লাভ করিতে পারে। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে স্ট্রং সেন্টারিস্ট ও ইউনিয়নিস্টদের মোকাবিলায় ফেডারেলিস্টদের প্রাধান্য যত বাড়িবে, সর্ব ভারতীয় ও সর্ব-উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক ঐক্য ও পুনর্মিলন ততই বাঞ্ছনীয় ও সহজ হইয়া উঠিবে।

উপমহাদেশীয় এই ঐক্য-জোটে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কারণেই নেতৃত্ব দিবে ভারত। ভারতের এটা দাবি করিতে হইবে না। প্রতিবেশীদের আস্থা অর্জন করিলেই তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাকে নেতা মানিবে। দাবি করিলে বরঞ্চ এই স্বাভাবিক গতি বিঘ্নিত হইবে। তা ছাড়া ভারত যখন সকল ব্যাপারে সত্যই বড়, সেই কারণেই উদার হওয়া তারই পক্ষে সম্ভব। এটা তার কর্তব্যও। ছোটদের মধ্যে যে কমপ্লেক্স থাকিবার কথা, ভারতের তা থাকিতে পারে না। ছোট ও দুর্বলের জন্য যেটা হীনমন্যতা, বড় ও সবলের জন্য সেটাই উদারতা ও মহত্ব। এই কারণেই ভারত যখন এর ব্যত্যয় করে, তখন আমি দুঃখিত হই। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনও রাষ্ট্র যখন নিতান্ত সদিচ্ছা লইয়াও ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ মিটাইবার কথা বলে, তখন ভারতের কেউ-কেউ বলিয়া বসেন, ভারত ও পাকিস্তানকে সমপর্যায়ে ফেলিয়া বিচার করা উচিৎ না। কথাটা যে-অর্থেই বলা হউক না কেন, এটার ভুল ব্যাখ্যা হইতে পারে। বরঞ্চ ভারতের নেতৃত্ব যখন প্রকৃতির দান, তখন ভারত বলিবেঃ 'আমি নেতা নই; এই উপমহাদেশের সবাই সমান; এখানকার নেতৃত্ব সমবেত নেতৃত্ব। নেতা যত বেশী বলেনঃ 'আমি নেতা নই,' তাঁর নেতৃত্ব তত জোরদার ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৮. এশীয় ঐক্যজোট

এই পথে উপমহাদেশীয় ঐক্য-জোট গঠিত হইলে পরবর্তী পদক্ষেপই হইবে এশীয় ঐক্য-জোট। আজ ইউরোপীয় ঐক্য ও ইউরোপীয় নিরাপত্তার মতই এশীয় ঐক্য ও এশীয় নিরাপত্তার কথা সত্য হইতে চলিয়াছে। ঐক্য ও নিরাপত্তা আজ আর অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় সীমিত নয়। সেটা বরঞ্চ আজ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতায় রূপান্তরিত হইতেছে। ইউরোপীয় ঐক্য ও নিরাপত্তার জন্য আজ সোভিয়েট ব্লক ও পশ্চিমা গণতন্ত্রী রাষ্ট্ররা সমবেতভাবে চেষ্টা করিতেছে। এশিয়াতেও এটা হইতে বাধ্য। বলিতে গেলে এশিয়া মহাদেশই এ বিষয়ে অন্যান্য মহাদেশের পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। মার্কিন মহাদেশের প্রায় সকল রাষ্ট্রই অর্গেনিযেশন-অব-আমেরিকান স্টেট্স (ও. এ. এস.) গঠন করিয়াছে সকলের আগে। আফ্রিকা মহাদেশের জাতীয় রাষ্ট্রগুলিও ইতিপূর্বেই অর্গেনিযেশন-অব-আফ্রিকান ইউনিটি (ও. এ. ইউ) গঠন করিয়া ফেলিয়াছে।

ইউরোপীয় মহাদেশের পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ই. ই. সি. সংস্থা ও রাশিয়ার নেতৃত্বে পূর্ব-ইউরোপীয় সমাজবাদী ব্লকের মধ্যে ঐক্য-জোটের চেষ্টার কথা ত আগেই বলিয়াছি। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্রের এসোসিয়েশন-অব-সাউথ-ইস্ট এশীয়ান স্টেট্স (এশিয়ান), আরব লীগ ও তুরস্ক-ইরান-পাকিস্তানের আর. সি. ডি.-কে এশীয় ঐক্য-জোটের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বিচার করিতে হইবে। এশীয় ঐক্য-জোটের নেতৃত্ব পাইবে চীন প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কারণেই। চীন ও ভারতের বিরোধ এই ঐক্য-জোটের প্রতিবন্ধক হইবে, মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি যে পরিবেশের কল্পনা করিতেছি, তাতে চীন-ভারত বিরোধের অবসান হইবেই। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেকার কাশ্মির-বিরোধের মীমাংসা হইতে পারিলে চীন-ভারতের ম্যাকমেহন লাইনের বিরোধ মিটান যাইবে না কেন? চীন-ভারতের বিরোধ মিটানোর ব্যাপারে আগামীতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে। এ বিষয়ে এবার বাংলাদেশ-পাকিস্তান যে ভূমিকা পালন করিবে, সেটা হইবে ৬০-৬২ সালের ভূমিকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্ব-শান্তি আজ গোটা দুনিয়ার শ্লোগান। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই এটা অপরিহার্য্য। এই বিশ্ব-শান্তির পদক্ষেপ হিসাবে এশীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা যখন সম্যক উপলব্ধ হইবে, তখন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দুইটি রাষ্ট্র ভারত ও চীন সে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কোনও ত্যাগ স্বীকারকেই অসাধ্য বিবেচনা করিবে না।

অতএব দেখা গেল, বিশ্ব-শান্তির জন্য এশীয় ঐক্য এবং এশীয় ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই উপমহাদেশীয় ঐক্য-শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা হইবে অনন্য সাধারণ। বস্তুতঃ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য এই বিপুল সম্ভাবনার বিশাল তোরণ-দ্বার খুলিয়া দিয়াছে।

বাংলাদেশের নয়া নেতৃত্ব এই বিপুল সম্ভাবনাকে সফল করিয়া তুলুন, খোদার দরগায় এই মোনাজাত করিয়া আমার এই বই সমাপ্ত করিলাম। খোদা হাফেজ। ১৬ই নবেম্বর ১৯৭৩।

ইংগিত

অ

আ

ই

উ

এ

ঘ

চ

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

য

র

শ

স

—খতম—